সন ১৩২১ সালের

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

বিষয় — পৃষ্ঠা

চিত্র-সূচী

মহাত্মা যিশুর শবরক্ষা

ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ

৩৮শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩২১ [৭ম সংখ্যা

লাইকা

(১৮)

পথে পথেই দিন কাটিতেছিল, ক্রমে বর্ষা আসিল। সন্ন্যাসিনী বলিলেন "তোমরা এইবার কোন অতিথিশালায় থাক সাবিত্রি! এখন আর বারিকে লইয়া পথে ঘুরাইব না।"

সাবিত্রী বলিল, "ক্ষতি কি! কিন্তু তোমরা বলিলে কেন মা? তুমি কি থাকিবে না?"

"থাকিব, কিন্তু এখন কয়দিন নয়; কাশী হইতে আমার ডাক আসিয়াছে, গুরুদেব আমায় স্মরণ করিয়াছেন, আমি দিনকতক থাকিব না,—তাহার পরই আসিব।"

বারির মুখেও ভীতিচিহ্ন দেখা গেল কিন্তু সে কিছু বলিল না, সাবিত্রী দৌড়িয়া তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "না না না? তুমি আমাদের একলা ফেলিয়া যাইও না! না হয় সেবারের মত পার্ব্বতী মাসীর নিকট চল আমরা সেইখানেই থাকিব —কিন্তু একলা কোথায় যাইও না।"

সাদরে তাহার গায়ে হাত দিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"কি বলিতেছ মা! একা কি তোদের কোথায় রাখিয়া যাইতে পারি? উপযুক্ত স্থান ছাড়া কি আমার বারিকে রাখিয়া যাইতে পারি? পঞ্চানন দ্বিবেদীর বিধবা রাণীদেবীকে ত তুমি চেন,—তাঁহাকেই তোমাদের কথা বলিয়াছি, তিনি আগ্রহ সহকারে তোমাদের নিজের গৃহে রাখিতে সম্মত হইয়াছেন, তাহাই বলিতেছিলাম কালই তোমরা সেই খানে চল,—পূর্ণিমার দিন আমার সেখানে প্রয়োজন—কাজ শেষ হইলেই আমি চলিয়া আসিব—ফিরিতে বড় জোর দেড় কি দুই মাস হইবে।"

সাবিত্রী আর কিছু বলিল না, সন্ন্যাসিনী বারিকে বলিলেন, "চুপ করিয়া কেন বারি? তোমার কোন আপত্তি আছে কি?"

বারি শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল— "না।" সন্ন্যাসিনী একদৃষ্টে তাহার মুখভাব

লক্ষ্য করিতেছিলেন,—চক্ষু অত্যন্ত স্থির-তাহা হইতে কিছু উপলব্ধ হয় না, কিন্তু ওষ্ঠপ্রান্তের মৌন দৃঢ়তা ভেদ করিয়াও একটি শান্ত বিষাদের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা তিনি বুঝিলেন। তাঁহার মুখেও সে ম্লান রেখার ছায়া পড়িল—অতি স্নিগ্ধ স্বরে তিনি বলিলেন,—

"না মা, কিছু লুকাইও না আমাকে বল—তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে আমায় বল, আমি যাইব না।"

ঈষৎ ভীতিপূর্ণ চক্ষে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সাবিত্রী এই সব কথা শুনিতেছিল,—তাহার প্রতি একবার মৃদু হাস্যপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বারি বলিল, "না মা লুকাইব কেন? একটু ভয় হয় বৈ কি! কিন্তু তাই বলিয়া আপনি যেখানে বিশ্বাস করিয়া রাখিতে পারেন আমরা সেখানে থাকিতে পারিব না কেন? কি বল দিদি?"

মুখ ফিরাইয়া সাবিত্রী বলিল "কি জানি ভাই! কেবল তোমার জন্যই আমার ভয় হইতেছে! নতুবা আমি—"

বাধা দিয়া দ্রুতকণ্ঠে বারি বলিল, "আমার জন্য?—না না দিদি, তুমি আমার জন্য কিছু ভাবিও না,—" পরে সন্ন্যাসিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল— "দেখুন মা! সত্যই আপনি যাইবেন শুনিয়া প্রথমটা আমার বেশ একটু ভয় হইয়াছিল কিন্তু এখন আর কিছু ভয় নাই জানিবেন, আমি দিদিকে লইয়া বেশ থাকিব।"

মৃদু হাসিয়া সন্ন্যাসিনী তাহার মুখচুম্বন করিলেন, বলিলেন—"জানি জানি! আমি তোমাকে প্রথম দেখিয়াই চিনিয়াছি রাজকুমারি! তুমি—"

বারি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—ওকি ও কি মা! তুমি জ্ঞান হারাইয়াছ? পথে ঘাটে কাকে কি বল?"

বলিতে বলিতে বারি হাসিয়া উঠিল, দেখাদেখি সাবিত্রীও হাসিল।

(১৯)

রাণী দেবীর বাটীর সংলগ্ন অথচ বহির্মুখী একখানি ক্ষুদ্র গৃহে তাহারা রহিল; সমস্ত দিনমান রাণীর পুত্রবধূ কন্যা প্রভৃতির সঙ্গে কাটাইয়া রাত্রিতে সেই ঘরে দুইজনে শয়ন করিত। কোন অভাব ছিল না, ভয় ছিল না,—সাবিত্রী বেশ প্রফুল্ল থাকিত—বারিও ভালই ছিল কিন্তু মধ্যে মধ্যে যেন বিষণ্ণ হইত,—রাণীর কনিষ্ঠা কন্যা মীরা বলিত "ছোট মায়ি! তোমার বিবাহ করিয়া ঘর করা উচিত।—কেন তোমাদের সন্ন্যাসিদের কি বর মেলে না?

সাবিত্রী বলিত—"না, নহিলে আমরা এমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াই।

তোমার বরটি উহাকে দাও ত ভাল হয়! সতীন সহ্য করিতে পারিবে ত?"

মীরা বলিতেছিল যে "অমন সতীন—" কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ হইল না বারি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল,—বলিল,—"ছি ছি মীরা! তুমি যে আমায় মা বল! ও কথা কি উচ্চারণ করিতে আছে! আর দিদি তুমিই বা কি বেহায়া মানুষ ভাই!"

সাবিত্রী হী হী করিয়া হাসিতে লাগিল, মীরা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,—"না

মাসি, আমি তোমার কথা বলি নাই, মোটের উপর একটা কথা বলিতে ছিলাম মাত্র! বড় মামী বড় ঠাট্টা করিতে পারেন!"

তখন মীরার ভ্রাতৃবধূ ললিতা বলিল, "আমি কিন্তু ঠাট্টা করিয়া বলি নাই—বল দেখি মামী, সত্যই কি তোমাদের এইরূপ যৌবন এমনি ছাই মাখিয়া কাটাইবার জন্যই হইয়াছিল?"

উচ্চ হাসিয়া সাবিত্রী বলিল "কেন আমার ত বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহা বুঝি জান না?"

ললিতা বলিল "সত্য নাকি! হাঁ ছোট মাসি!"

বারি একটু হাসিল, তাহার মুখ বিষণ্ণ একটু ভীতভাব যুক্ত।

মীরা বলিল, "তুমি কি শুনিতেছ ভাই,—বড় মামী কেবলি হাসি করেন!"

সাবিত্রী বলিল, "না সত্যই মীরা, আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বারি ত তা জানে না!"

মীরা বলিল, "বিবাহ হইয়াছে ত বরের ঘর কেন করেন না?"

"করিব, শীঘ্রই যাইব, আমি ত এক্ষণই যাইতে চাই,—তাহারা ডাকে কৈ?"

মীরা পুলকিত হইয়া বলিল,—সত্য নাকি? কোথায় বিবাহ হইয়াছে মাইজি!"

"দক্ষিণে!"

"দক্ষিণে!" কোথায়? বর কেমন?"

একটু চাপা হাসি হাসিয়া সাবিত্রী বলিল, "আঃ ওই কথা শুধাসনে ভাই!

ওই জ্বালাতেই ত মরিয়া আছি! বর বড় কালো!"

সকলে হাসিয়া উঠিল। ললিতা বলিল, "আর আমাদের ছোট মাসিরও তবে বিবাহ হইয়াছে?"

অম্লানমুখে সাবিত্রী বলিল "না, এখনও উহার বর পাওয়া যায় নাই—মা ত উহার বর খুঁজিতেই গিয়াছেন!"

"সত্য?" সকলেই বারির প্রতি চাহিল। বারি সাবিত্রীকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, "তুই কি মিথ্যাবাদী!—না মীরা, আমারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে!

বারির ঈষৎ ক্রুদ্ধ সলজ্জ মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সাবিত্রী মৃদু মৃদু হাসিতেছিল—মীরা একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "তা ত আমি জানি. উনি কেবলি ঠাট্টা করেন! কিন্তু তুমি আপনার স্বামীর কাছে থাক না কেন মা! না সন্ন্যাসীদের স্ত্রী লইয়া বেড়াইতে নাই?"

"তা জানি না; আমার স্বামী এখন নিরুদ্দিষ্ট,—তাই—

"বারি থামিয়া গেল,—সাবিত্রী একটু একটু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—

"বটে। তাত জানিতাম না ভাই! তোর বরের উদ্দেশ নাই! তা তুই ঘাট বাট মাঠ পথ যমুনা কিনারি" খুঁজিয়া ফিরিস না কেন! নিশ্চয় সে চোরকে মিলিবে!"

বারি ভ্রূকুঞ্চিত করিল, সাবিত্রী তাহা দেখিয়াও দেখিল না—বলিতে লাগিল,—"বড় সুন্দর সময় বারি! শাওন মেঘের কালো রঙে আজ রাতি কত আঁধার দেখিয়াছিস? চল, আমরা দুজনে তোর শ্যামকে খুঁজিতে বাহির হইয়া পড়ি!"

এমন সময় মীরা বলিল, "চুপ কর বড় মাসি! দেখিতেছ না ইনি এসকল কথায় কত ব্যথা পাইতেছেন?"

সবেগে সাবিত্রী বলিল—"হাঁ জানি খুব জানি—ইনি বরের কথায় খালি ব্যথাই পান! কেন! কেন তা হবে? যে জিনিস্‌টা হাতের কাছে না পাইলাম তাহার স্মৃতিটিকে শুধু যে চোকের জলে দিনরাত ভিজাইয়া রাখিতে হইবে, এমন কি কথা?"

ব্যাকুলভাবে বারি বলিল "দিদি! দিদি! তুমি—"

সাবিত্রী বলিল,—"হাঁ, আমিত ওই কথাই বুঝি ভাই! যে হৃদয়ে তোমার স্বামী দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছ তাহা দীপ জ্বালিয়া দিনরাত আঁধার করিয়া রাখা বা তাঁর চরণে কেবল ঝরা ফুলেরই অর্ঘ্য দেওয়া কতদূর ভাল বা মন্দ তা আমি জানি না! পৃথিবীর সমস্ত আনন্দকে খাটো করিয়া নিজের বেদনাকে এত বড় করিয়া রাখা—আমিত বুঝিনা বারি যে ইহাতে কাহাকে ফাঁকি দেওয়া হয়!—আমার মনে হয় ইহা ভগবানের উপর বিদ্রোহ—মানুষের সঙ্গে ঝগড়া আর নিজের আত্মাকে একটা জন্মের কায হইতে বঞ্চিত করা মাত্র!"

বারি কাতর ভাবে বলিল,—"বিদ্রোহ? দিদি! ভগবানের উপর বিদ্রোহ? কেন একথা বলিলে?—তোমরা বুঝিবেনা কিন্তু আমার অন্তর্যামীও কি বুঝিবেন না যে কত কষ্ট কত ব্যথা আমি পাইতেছি? মনে করি যে এ কথা আর ভাবিব না—ভাবিয়া দুঃখ পাইব না, একমাত্র ভগবান্‌কে ভাবিয়াই দিন কাটাইব। কিন্তু পারি না কেন ভাই? তোমাদের মত নিশ্চিন্ত হইতে পারিনা কেন দিদি?—আমি কি করিলে ভাল হয় তুমিই বল না?"

সাবিত্রী চমকিত হইয়া উঠিল। কথাগুলি বলা অন্যায় হইয়াছে বুঝিল। সহসা ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া সহাস্যে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—

"বটে! রাগ করিলি যে—বারি?—আমি বুঝি সেই কথা বলিলাম?—ভাব্‌না কেন তাকে—বারণ করি নাই ত। তবে আমিই কি বাণে ভাসিয়া আসিয়াছি না কি?—আমার কথা একবারও ভাবিবি না?"

বারিও হাসিল,—বলিল, "তুমি?—তোমার কথা আর বিশেষ করিয়া কি ভাবিব দিদি!—তুমি যে আমার নিশ্বাস বায়ু, তুমি যে আমার শরীরের রক্ত,—ভাবি বা নাভাবি তোমাকে হারাইলে কি এতদিন আমি বাঁচিতাম?—"

প্রফুল্ল বিদ্রূপে সাবিত্রী বলিল, "সত্য নাকি? বারি,—আমি কি বাতাসের মত লঘু?—তবে ত হঠাৎ উড়িয়াও যাইতে পারি!"—

বারি বলিল,—"সেই ভয়েই ত মরিয়া থাকি ভাই,—আমার কপাল যে বড় মন্দ!"

তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কপট রাগে সাবিত্রী দূরে গিয়া বলিল,—"তুই যা! তোর জ্বালায় আমি পারিব না। সব তাতেই নাকীসুর?—"

হাসিয়া বারি বলিল,—"কেন? নাকীসুরটা কি এত মন্দ নাকি?"—

'না খুব ভাল! ঠিক্ যেন ভুঁতুল্ কেঁদে মেঁলা!"—

বারি হাসিতে লাগিল, বলিল "না দিদি! তা নয় ভাই,—নাকীসুরটা বড় মিষ্টি সুর, —বড় করুণ বড় মধুর! আমায় বড় ভাল লাগে।—"

সাবিত্রী বলিল "ইস্ দেখিস! ঢলিয়া পড়িলি যে! ভূতের আওয়াজ তোকে এত ভাল লাগে—তা ত জানিতাম না!"—

তাহার পিঠে মৃদু করাঘাত করিয়া বারি বলিল, "দূর পাজি!—ভূতের সুর কে বলিল?—তবে ঐ যে সুরকে লক্ষ্য করিয়া তুমি প্রথমত কথা তুলিয়াছ সেই সুরের কথা বলিতেছি! সে যে বুকের কথা প্রাণের কথা!—নাকের ভিতর দিয়া সর্ব্বদা বুকের ভিতরের হাওয়া আসা যাওয়া করিতেছে—তাই বোধ হয় সে প্রাণের সব সংবাদ জানে!—মুখ কথা কয় নিজের—আর নাক বুঝি সেই মরণের ভাষাটিই গেয়ে যায়! জিভ কয় কথা—নাক গায় গান; কোনটা মিষ্টি দিদি?"—

সাবিত্রী বিস্মিত পুলকে তাহার কথা শুনিতেছিল, কথা শেষ হইলে তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল,—"ওরে আমার ভূতের রাণী—নাকীসুরের পেত্নি!—তোমার ও সুর তোমাতেই থাক্! আমি গান-শুনিতে চাহিনা!—মিষ্টি যতই মিষ্টি হোক্ দিন কত তাহা খাওয়া যায়? মাঝে মাঝে টক্ চাই!"

হাসিয়া বারি বলিল, "তা তোমার এখন কি চাই তাই বল না! দেখি যদি জোগাড় করিতে পারি!"

"চাই যে তুই একটু আমার সঙ্গে ঝগড়া কর!"

বারি বলিল,—"গায়ে পড়িয়া না কি?"

অলস ভঙ্গীতে দেয়ালে গা হেলাইয়া সাবিত্রী বলিল,—

"আরে তাইত সাধ যায় বোন্! কিন্তু করে কে? আহা হা থাকিত যদি সতীন্ তবেই না মনের সব সাধ মিটিত!"

সকলে তাহার ভাব দেখিয়া হাসিয়া উঠিল,—ললিতা বলিল, "সে সাধও হয় আপনার?"

'খুব হয় রে খুব হয়! কিন্তু বারিটা এমন নির্ব্বোধ যে কিছুতেই আমার বরকে বিবাহ করিতে চায় না!"

বারি হাসিয়া বলিল,—"তোর কালো কুৎসিৎ বরকে লোকে বিবাহ করিবে কেন?"

চোখ ভুরু নাচাইয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া সাবিত্রী বলিল,—"করিতেই হইবে! এখন ইচ্ছায় করিতিস ত ভাল ছিল, না হয় ত দেখিস্ একদিন জোর করিয়া মাথায় সিঁদুর দিয়া বিবাহ করিবে!"—

উচ্চ হাসিয়া বারি বলিল, "সত্য নাকি? তবে ত তুই আমার হবু সতীন! তবে গায় পড়িয়া ঝগড়াটা বাকী কেন থাকে—আগে হোক!" বলিয়া বারি সাবিত্রীর প্রসারিত ক্রোড়ে শুইয়া পড়িল। তখন সাবিত্রী তাহাকে আরও টানিয়া লইয়া বলিল,—"অহ হ!—ঘুম পাইয়াছে আমার 'খুকীর বড় ঘুম পাইয়াছে,"—পরে সুর করিয়া বলিল, "আব আব রে নিদাঁ হামারা ঘর; শুতল দুলালীয়া পালঙ্গা পর!"—

সে আরও কি বলিতেছিল—কিন্তু

সবেগে বারি উঠিয়া বসিল ; বলিল, "ইহারই নাম বুঝি ঝগড়া ?—"

সাবিত্রী বলিল, "নিশ্চয় ! না হইলে তুই এত রাগিলি কেন ?"

রাত্রি অধিক হইয়াছিল,—মীরা বলিল, "বহু ! তুমি যাও, ভাইএর আসিবার সময়— হইয়াছে !" ললিতা হাসিয়া বলিল, "সময় হইয়াছে ত আমার কি ? তুমি উঠনা !

মীরা বলিল, "তুমি আগে গিয়া জল ও আসন রাখ গিয়া আমি পরিবেশন করিব। আর হাঁ মায়ীদের জন্য যে খাবারটা আমি তুলিয়া রাখিয়াছি তাহা এখনই আনিয়া দাও !"

সাবিত্রী বলিল, "আমাদের জন্য আবার কি খাবার করিয়াছ ললিতা—? আমরাত খাইয়াছি !—"

মৃদু হাসিয়া ললিতা বলিল,—"সেদিন ছোট মামি যে সন্দেশ করিতে শিখাইয়াছেন তাহাই করিয়াছি,—ভাল হয় নাই, তবু আপনারা একটু খাইবেন না কি ?"—

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"খাইব বৈ কি !—কি বলিস্ বারি ?—কিন্তু—"

বারি বলিল,—"খাইবেই যদি তবে আর কিন্তু কি ?—তবে হাঁ, বহু মা ?—এখন আর আমাদের প্রয়োজন নাই কাল সকালে দিও।"—

ললিতা তাহাতে সম্মত হইল।—

(২০)

তাহারা উঠিয়া গেলে সাবিত্রী শয্যা বিছাইয়া শয়ন করিল।—বারি দ্বারে অর্গল দিয়া প্রদীপ নিবাইয়া তাহার পাশে আসিল। সাবিত্রী বলিল, "আমি আজ কি হইয়াছি তা জানিস্ বারি ?"

বারি হাসিয়া বলিল—"না, তুমি আবার হইবে কি ?"—

স্বর ভারি করিয়া সাবিত্রী বলিল,— "বলিতেছি। কিন্তু দেখ দেখি বাহিরে কি বড় মেঘ ? বিজুলী জ্বলিতেছে ?"

বারি বলিল, "নিশ্চয় ! মেঘের ডাক্ শুনিতে পাইতেছ না ?"

"কিন্তু কৈ মৌলসরীর গন্ধ ত পাইতেছি না ?"—

বারি বলিল—"সে কি ? এখন দুয়ার দিলাম তাই নতুবা এতক্ষণ ত ফুলের গন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছিল ! কেন বল দেখি— আজ এমন সুগন্ধের তলব করিতেছ ?"—

"প্রয়োজন ছিল,—বারি !"

"কেন !"

"কাছে সরিয়া আয়—আরো, আরো আরো কাছে !"

তাহার ঘন আলিঙ্গনে বিব্রত হইয়া বারি বলিল,—"দিদি তোমার কি হইয়াছে বল না !"

মৃদু গদ্‌গদ ভাবে সাবিত্রী বলিল, "বারি ! আজ আমি তোর নাইকা—তুই আমার রাজকুমারী বলিয়া গান ধরিল,—

আজু মাহ ভাদর, গরজত মেঘবর মিলল শয়ন পর রাজ কুমারী !"—সহসা তাহার গান থামিয়া গেল,—বারির শিথিল দেহ তাহার বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়াছে !—বিকল ভাবে সাবিত্রী ডাকিল,—"বারি ! বারি ! ওভাই অমন করিলি কেন ?"

বারির স্বর রুদ্ধপ্রায়, সে ক্ষীণ হাসির

সহিত বলিল,—"কিছু না ভাই! কিজানি কেন বুকের ভিতর যেন সব চুপ হইয়া গিয়াছিল! ভয় নাই।"

সাবিত্রী আর কিছু বলিল না, সে বুঝিল কথা কহিতে বারির কষ্ট হইতেছে। কপাল ঘর্ম্মাক্ত,—আঁচল দিয়া দিয়া মুছাইয়া সে তাহাকে বাতাস দিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে বারিই কথা কহিল,—"দিদি, তুই ভয় পাইয়াছিলি না?"

সাবিত্রী বলিল,—"হাঁ, কিন্তু তুই এখন থাম্. কথা কহিস না।"

বারি বলিল, "তবে তুই পাখা রাখ, শুইয়া পড়।" সাবিত্রী নীরবে তাহার পাশে শুইল।

রাণীর অন্তঃপুরের সকল কোলাহল থামিয়া গিয়াছে। গৃহপালিত কুকুর মাঝে মাঝে বিকট শব্দে ডাকিয়া উঠিতেছে। প্রবল ঝিল্লী রবের মিলিত একতানে বর্ষা রজনীর অকাল প্রগাঢ়তা সূচিত!

আপনার শীতল হস্তখানি বারির ললাটে রাখিয়া অতি মৃদুস্বরে সাবিত্রী ডাকিল—"বারি!"

বারিও বুঝি এই ডাকটুকুরই অপেক্ষা করিতেছিল! সাদরে সাগ্রহে বলিল,—"কি বহিন্!"

বারি আর উত্তর পাইল না, কিন্তু মাথার উপর সাবিত্রীর শ্বাসকম্পিত ওষ্ঠ চিবুকের স্পর্শ অনুভব করিল। অন্ধকার ঘর, নীরব শয্যামধ্যে পরস্পরের মনোভাব দুজনেই বুঝিতেছিল! সংসার ত অভাবময় কিন্তু সহসা কোথা হইতে কেমন করিয়া একটি কথা একটু আদর অথবা বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখা দিয়া হৃদয়ের সকল ব্যথা সকল জ্বালা দূর করিয়া দেয়!

দুইজনে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহাদের হাতে হাতে একটি নিবিড় বেষ্টন, নিশ্বাসে নিশ্বাস মিশিতেছে। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে রাত্রি আরও গভীর হইয়া উঠিল। তখন সাবিত্রী প্রশ্ন করিল,—"বল্ বারি! হাসির ছলে আমি আজ তোকে কত কষ্ট দিয়াছি! বল্ তুই কি ভাবিতেছিস্?"

বাহুতে ভর দিয়া বারি একটু উঁচু হইয়া বসিল। বলিল,—"কষ্ট? কৈ কি কষ্ট দিলে ভাই! কিছু না, বিশ্বাস কর দিদি, কিছু কষ্ট পাই নাই! আর কি ভাবিতেছি? সে কথাও কি বলিতে হইবে তোকে?"

সাবিত্রী বিস্ময়ে মুখ তুলিল—বারি কি বলিতেছে? তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে?—ধীর স্বরে বলিল, "কষ্ট পাস্ নাই ভাই?—সত্য বল বারি!—আমি বড় ব্যথা পাইতেছি! তোর—"

বাধা দিয়া বারি বলিল—! "তুমি কিছু ক্ষোভ করিও না দিদি!—বোধ হয় কষ্টে আমি তেমন হই নাই।"

ব্যগ্রভাবে সাবিত্রী বলিল,—"কষ্টে নয়! তবে কিসে! লাইকার নাম করিয়া ঠাট্টা করা অন্যায় জানিয়াও আমি তোকে সেই কথা বলিলাম—"

সাবিত্রী থামিয়া গেল,—এবং তৎক্ষণাৎ বারি বলিয়া উঠিল,—"অন্যায়! কে বলিল অন্যায়! সে নাম সে প্রসঙ্গ জীবনে আমি কবার শুনিয়াছি যে ঠাট্টা হোক তামাসা

হোক্ তাহাতে কষ্ট পাইব? সুখে,—বড় আহ্লাদের আবেশেই আমার দেহ অবশ হইয়াছিল দিদি! তুমি বুঝিবে না আজ আমার জীবনের অন্ধকারের মধ্যে যেন সূর্য্যালোকের স্বপ্ন দেখিয়াছি বলিয়া বোধ করিতেছি!”

স্তম্ভিত ভাবে সাবিত্রী তাহার কথা শুনিতেছিল। হাত বাড়াইয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া সে বলিল,—“না সত্যই বুঝিলাম না, এত সুখের কথাই বা কি হইল ইহাতে?”

বারি কিছুক্ষণ উত্তর করিলনা,—পরে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল,—“বুঝিবে না তাহা বুঝিয়াছি! কেহই বুঝে নাই! দিদি, কেন জানি না যে ওই নামটি—শুধু ওই নামটি মাত্র শুনিবার জন্য আমার প্রাণে কতখানি তৃষ্ণা জাগিয়া থাকে। কিছু জানি না,—স্বামী কেমন সে কথা ত বড় দূরের, দিনান্তে মাসান্তে কেহ একবার সে নামও করিত না! আমি যে কত কষ্টে ঘর ছাড়িয়াছি—তুই তাহা বোঝ দিদি!

বারি চুপ করিল। স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে তাহার শ্বাসের দ্রুত শব্দ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। কিন্তু সাবিত্রী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল,—“বারি! ভগিনি! তুই কি বলিতেছিস্ ভাই! কেন অমন সুরে কথা বলিস্ বল? আমার সহ্য হয় না—তোর কথা ভাবিলে আমার মন এত খারাপ হইয়া উঠে—তাই আমি ভাবিতে পারি না!”

তাহার হাত লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বারি বলিল,—‘কেন দিদি! কেন ভাবিতে পারিবে না! ভাবিও।—আমার বড় ইচ্ছা করে কেউ আমার কথা ভাবুক অর্থাৎ কাউকে ‘আমি আমার সব কথা মন খুলিয়া বলি—প্রাণের কথা প্রাণে রাখিয়া আমার বুক যেন লোহার মত শক্ত হইয়া গেছে ভাই!”

এতক্ষণে বারি বুঝিল সাবিত্রী কাঁদিতেছে, তাহার চোখের জল বড় বড় ফোঁটায় তাহার হাতে পড়িতে লাগিল। ঘন শ্বাসের পরিস্ফুট কাতরতা ঘরখানিকে যেন বেদনা পূর্ণ করিয়া দিল। বারি তাহার রোদন দেখিয়া প্রথমত স্তম্ভিত হইয়া ছিল,—তাহার পর বুঝিল যে করুণহৃদয়া রমণীর প্রাণে তাহার বেদনা যে সহানুভূতির সৃষ্টি করিয়াছে তাহার অন্য মূর্ত্তি নাই ভাষা নাই,—বিগলিত অশ্রুজলেই তাহার আকৃতি প্রতিফলিত—রোদনরুদ্ধ অস্ফুট কণ্ঠগুঞ্জনই তাহার একমাত্র বাক্য!

বারি নীরবে সাবিত্রীর অশ্রুজল উপভোগ করিতে লাগিল! সংসারে সে পিতামাতার একমাত্র স্নেহাধার ছিল,—তাহার কষ্টে ক্লান্তিতে সেবা করিবার শত শত সখী ও দাসী ছিল, কিন্তু হৃদয় দিয়া হৃদয় অনুভব করিবার লোক ছিল কি? তাহার প্রাণের অশ্রু তাহার চোখে আসিবার পূর্ব্বেই অন্যের নয়নে তাহা প্রবাহিত হয়, এমন দিব্য বন্ধুতা সে আর কোথাও পাইয়াছে কি?

বারির রুদ্ধ অশ্রু নয়নকোণে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু হৃদয় তাহাকে অশ্রু বলিয়া স্বীকার করিতেছিল না;—তাহা ব্যথা,—কিন্তু তখন প্রাণ যেন সাগ্রহে তাহাকেই

বরণ করিয়া লইতেছিল। সে বুঝিল না যে ইহা সুখ না দুঃখ।

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিল। তাহার পর কখন বারির আকর্ষণে সাবিত্রী শয্যায় শুইয়াছিল ঠিক নাই—কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে বুঝিল তাহার বাহুতে মাথা রাখিয়া সাবিত্রী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বারি আর নড়িল না,—নিজের হাতখানি তেমনি এলায়িত করিয়াই অতি ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে শয়ন করিল। শ্রীহেমনলিনী দেবী।

মার্কটোয়েন

আমেরিকার মার্কটোয়েন একজন বিখ্যাত লেখক; তাঁহার কৌতুক রচনা পাঠকদের মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ রসের সৃষ্টি করে। ইনি কেবল রচনাতে নয় কথা বার্ত্তাতেও সকলের মনোমুগ্ধ করিতেন। তাঁহার প্রত্যেক বর্ণনভঙ্গিতে হাসির ফোয়ারা ছুটিত। সকলের কথা মিষ্ট লাগে না; যাহাদের চিত্তহরণ ক্ষমতা আছে তাহাদের সামান্য কথাটীও বলিবার ভঙ্গিতে অতি উপভোগ্য হইয়া ওঠে। মার্কটোয়েন এই স্বাভাবিক শক্তিতে শক্তিমান্ ছিলেন। ইহার উপর তাঁহার স্বভাবও সাতিশয় মধুময় ছিল!

কোনও বিষয় পড়িবার সময় তার ভিতরকার ভাল কথাগুলিতে দাগ দেওয়া মার্কটোয়েনের একটা অভ্যাস ছিল। একখানি পত্রিকায় এই কথা গুলির নীচে তিনি দাগ দিয়াছিলেন।

"It has been said that a man's last will and testament best expresses his character. Does it? Do we not know a man best from the simple act, look or speech of daily life, when the consciousness is unaware?"

মার্কটোয়েনের ছোট বড় সকল কাজে ও কথা বার্ত্তায় তাঁহার চরিত্রের মধুরতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত। জীবনের শেষ কয়েক মাস তিনি বার্ম্মদার (Bermuda) কোন এক ভদ্র মহিলার আতিথ্যে যাপন করিয়া ছিলেন। ইনি মার্কটোয়েনের এই সময়কার কার্য্যকলাপ কথাবার্ত্তা একত্র গ্রথিত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মার্কটোয়েন ছোট মেয়েদের বড় ভাল বাসিতেন। এই ভদ্রমহিলার হেলেন নামে একটি মেয়ে ছিল। মার্কটোয়েন এই মেয়েটীর স্নেহাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই বার্ম্মদাতে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, সংসারে কেবল ছোট মেয়েদেরই অস্তিত্ব থাকা উচিত। ছেলেরা যেপর্য্যন্ত মানুষ না হয় সে পর্য্যন্ত সংসারের পক্ষে তারা অশোভন। তিনি সব জিনিসই নবীন চাহিতেন। তিনি বলিতেন অল্পবয়স্ক গুবড়ে পোকা হওয়াও বৃদ্ধ নন্দনপক্ষীর চেয়ে ভাল। (১)

তিনি সাধারণতঃ প্রাতঃকালটা বই লইয়া

(১) "It is better to be a young beetle than a bird of paradise."

মার্কটোয়েন
"Innocence At Home"

মার্কটোয়েন এবং হেলেনের সমুদ্র স্নান

কাটাইতেন। বই ও সিগার (cigar) তাঁহার চিরসঙ্গী হইয়া থাকিত। তাঁর বিছানাময় পুঁথি রাশি, হাতের লেখা কাগজ এবং লিখিবার সরঞ্জাম বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া থাকিত।

কি দিনে কি রাত্রিতে অবসরের ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত তিনি পড়িয়া কাটাইতেন। কোথাও যাইতে হইলেও প্রায়ই তিনি কোন একটা বই সঙ্গে রাখিতেন। কার্লাইলের ফরাসী বিদ্রোহ, পেপির ডায়ারি, কিপলিঙের গ্রন্থাবলী এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি সর্ব্বদাই হাতের কাছে রাখিতেন। এছাড়া সমসাময়িক কত রকম পুস্তকই প্রতিদিনের ডাকে যে তাঁহার নিকট আসিত।

বার্ম্মদাতে মার্কটোয়েনের শেষ দিনগুলি বেশ সুখ শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁর প্রিয় বন্ধুরাও এইখানে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন।

একবার তিনি কোনও মহিলাক্লাবে বক্তৃতা করিবার জন্ত অনুরুদ্ধ হইয়া সেক্রেটারী মহাশয়ের উপকারার্থ "Rules of Etiquete in reaching heaven" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেক্রেটারী মিষ্টার পেন যদি গাইড্ ছাড়া একা স্বর্গে উপস্থিত হন তবে সে বিপদ হইতে ইহার সাহায্যে তিনি উদ্ধার লাভ করিবেন।

বৈকালে সাগরতীরে গিয়া চা পান করিতে তিনি বেশ আমোদ অনুভব করিতেন। সে সময় তিনি গল্পগুজব করিয়া বা ছেলে মেয়েদের সহিত খেলায় যোগ দিয়া কাটাইতেন। একদিন এই অপরাহ্ণিক বিশ্রাম কালে তিনি একটী গল্প বলিয়াছিলেন তাহা এই।

তখন তিনি স্যান্‌ট্রানসিস্কোর সংবাদদাতা। একটা নৌকাদৌড়ের সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাঁকে অনেক দূরে যাইতে হইয়াছিল। বাচ খেলার আগের দিন রাত্রিকালে অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তিনি সহরে পৌছিলেন। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে শুনিতে পাইলেন বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। তাই তিনি আবার নিশ্চিন্ত মনে শয্যা গ্রহণ করিলেন। ভাবিলেন সেদিন আর বাচ খেলা হইবে না। বৈকালে অনেক বিলম্বে ঘুম হইতে উঠিয়া যখন বাহিরে আসিলেন তখন ত একেবারে অবাক্। দেখিলেন পরিষ্কার ফুটফুটে দিন। বৃষ্টির নাম গন্ধও নাই। বাচ খেলা বেশ নির্ব্বিঘ্নে সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যে বৃষ্টির শব্দ তিনি শুনিয়াছিলেন তাহা তাঁর জানালার অদূরস্থিত একটী ঝরণার জল পড়ার শব্দ।

কি ঔৎসুক্যের সঙ্গেই না এই সামান্য গল্পটী সকলে উপভোগ করিতেছিল! অন্যের মুখে এ গল্প গল্পই নয়, কিন্তু মার্কটোয়েন যখনই কোন গল্প বলিতেন তাহা নিতান্ত সামান্য বা পুরাতন হইলেও লোকের চিত্ত বিমোহিত করিত। নহিলে আর তিনি মার্কটোয়েন কেন!

একবার সেখানকার বায়োস্কোপ কোম্পানী তাঁহার চিত্র দেখাইতেছিল। মার্কটোয়েন সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁর অবিকল একটি চিত্র বসিয়া ধূমপান করিতেছে। তিনি সাতিশয় প্রমোদিতভাবে বলিলেন, এ চিত্র এতদূর অবিকল যে,

তাঁহার মনে হইতেছে তিনি যেন আরসিতে মুখ দেখিতেছেন। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গী এবং স্বরও রেকর্ডে ঠিক উঠিয়াছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় দৈবাৎ সেগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বর্ম্মুদায় হেলেনকে তিনি পড়াইতেন। শিক্ষা দেওয়ার তাঁর একটী প্রণালী ছিল এই, শিক্ষার্থিণীকে তাহার প্রত্যেক ভুলগুলি ৫০ বার করিয়া সংশোধন করিতে হইত। তাঁর লেখার খাতার অনেক পাতাই এইরূপ সংশোধন করা শব্দে এবং ফরাসী তর্জ্জমায় পূর্ণ।

মার্কটোয়েন বার্ম্মুদায় অবস্থানকালে শেষ চিত্র

তিনি সুন্দর সুন্দর শব্দ নির্ব্বাচন ও ব্যবহার করিতে বড় ভাল বাসিতেন।—একটি শ্রবণসুখকর কোনও শব্দ পাইলে তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত সেটীকে সযত্নে রক্ষা করিতেন। কোন লেখায় সে শব্দটী উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে কেবল কৌতুক-কথার রচয়িতা ছিলেন তাহা নহে, ভাব ও চিন্তাসম্পদেও তাঁর সমস্ত লেখাই সম্পদশালী।

সন্ধ্যা বেলা তিনি তাস্ খেলিতেন। রাত্রির পর রাত্রি তাস খেলায় বসিয়া বিরক্তি বা ক্লান্তি বোধ করিতেন না। Heart খেলা তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। ইহার প্রধান কারণ এ খেলাটীতে তিনি নিপুণ ছিলেন। প্রথম প্রথম অনবরত তিনি জিতিতেন। কিন্তু যখন আর সকলেও

তাঁর মত খেলায় দক্ষ হইয়া উঠিল তখনো কিন্তু তাঁর খেলার উৎসাহ একটুও কমে নাই। যদিও খেলায় হারিতে তাঁর বড়ই খারাপ লাগিত। তিনি একবার Bridge খেলা শিখিতে আরম্ভ করেন—কিন্তু এতগুলি গোলমেলে নিয়ম শিখিবার ধৈর্য্য তাঁর নাই, এই বলিয়া সে শিক্ষা ত্যাগ করেন।

বৃষ্টির দিন গুলি তিনি বড়ই উপভোগ করিতেন। একবার Bermuda অবস্থান কালে তিন দিন তিন রাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলিয়াছিল। মার্কটোয়েনের তখনকার আনন্দ দেখে কে! বাড়ীর সকলে তাঁর ঘরে মজলিস্ জমাইয়া বসিতেন। আর তিনি কত রকম গল্পই করিতেন। Suffragette প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন "যত দেরীই হউক যত সময়ই লাগুক এই দাবী তাহারা লাভ করিবেই,—যদিও তাঁহার বিশ্বাস অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহাদের দাবী গ্রাহ্য হইবে।"

স্বর্গ এবং পরলোক সম্বন্ধে তাঁহার মত ও বিশ্বাস, মার্কটোয়েনের চিহ্নিত একটী পুস্তকের নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতে অনেকটা বুঝা যাইবে।—

"স্বর্গ এমন কোনও উজ্জ্বল স্থান যে সেখানে সোনার রাস্তা ও মুক্তার প্রাচীর বিরাজিত এমন আমি মনে করিনা। বরং সে স্থান কোনও নির্জ্জন বনদেশ যেখানে তৃণরাজি সবুজ এবং ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সারাটী দিন কুলু কুলু গীতে বহিয়া যায়। আমি স্বর্গকে এইরূপ ভাবে ভাবিয়াছি যে, যাহারা পরস্পর ভালবাসে সেখানে তারা মিলিত হইবে এবং বিচ্ছেদের ভাবনা তাহাদের থাকিবে না। (২)

একদিন সন্ধ্যাবেলা দুইটী ছেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। প্রথমে ছেলে দুটী তাঁহার সঙ্গে মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল তাই আলাপ ভাল রকম জমিতেছিল না। মার্কটোয়েন সহজ সুন্দর ভাবে গল্প বলিয়া অবিলম্বে তাহাদের সে সঙ্কোচ দূর করিলেন।...তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া একটী ছেলে স্বাভাবিক ভাবে একটী গল্প আরম্ভ করিল।

গল্পের অনেকটা বলা শেষ হইলে ছেলেটী মার্কটোয়েনের চোখে এমন একটী ভাব লক্ষ্য করিল যাহাতে তাহার মনে হইল তিনি গল্পটী জানেন। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করিল "তিনি কি গল্পটী আগে শুনেছেন?" তিনি বলিলেন "না।" সে গল্প বলিতে লাগিল। কিন্তু আবার সেই অর্থপূর্ণ চোখের ভাবটী প্রকাশ পাওয়ায় সে পুনরায় সেই প্রশ্ন করিল—কিন্তু উত্তর সেই একই "না"। পরে গল্প বলা শেষ হইলে সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যই মার্কটোয়েন কি গল্পটী আগে শুনেন্ নাই?" এবার মার্ক প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া স্বীকার করিলেন, গল্পটী তাঁর

(2) "I do not think of heaven as a glittering place with streets of gold & walls of pearl but more like the quiet woods where the grass is green & the little brook sings all day. I have thought of heaven as a place where those who love shall be together, free from all thought of parting,

নিজেরই রচনা। ছেলেটী বলিল—"তবে যে দু'বার বলিলেন, শোনেন্‌নি ?"

"তুমি ত মাত্র দুবার জিজ্ঞাসা করেছ,—তা বিনয়ের খাতিরে দুবার নির্ব্বিঘ্নে মিথ্যা উত্তর দেওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয়বার যখন জিজ্ঞাসা করলে তখন সত্য কথা বলতেই হ'ল।"—

শ্রোতারা এই ঘটনার পর হইতে সাবধান হইয়াছিলেন।—কোনও বিষয়ে তিনি কাহাকেও অপ্রস্তুত করিতে চাহেন এরূপ

শেষ সমুদ্র-যাত্রাকালীন—ছবি। হাঁটিতে অসমর্থ তাই চেয়ারে স্থানান্তরিত হইতেছেন।

সন্দেহ হইলে সকলেই তাঁকে তিনবার প্রশ্ন করিতেন।

একদিন রবিবারে (৩রা এপ্রিল) এইরূপ একটী টেলিগ্রাম আসিল !—

"To,—Mark Twain
Hamilton, Barmuda"

"The clowns of Barnum & Bailey's circus, recognising you as the worlds greatest laugh-maker, will consider it an honour if you will be their guest at Madison Sq Garden, Sunday afternoon, April 3rd, at two. Will you please answer collect—Barnum & Balley.

("A reply of fifty words has been prepaid on this message.")

তিনি পড়িয়া খুব হাসিলেন, তার পর আমাদের পড়িতে দিলেন।—বলিলেন "এখনি আমায় উত্তর দিতে হবে, তাদের উৎকণ্ঠায় রাখ্‌বনা।" উত্তর লিখিলেন—

"I am very, very sorry, but all last weeks dates are full. I will come week before last, if that will answer.—Mark Twain "Twenty five collect."

Widrow Wilson তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। মার্কটোয়েন তাঁহাকে খুব প্রশংসা করিতেন আর বলিতেন –তাঁর সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। Mr. Wilson সে সময় Princeton Universityর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।—

সে সময় ক্রিকেট খেলার সময়। সকলেরই মুখে ও চিন্তায় ক্রিকেট খেলার কথা। মার্কটোয়েন তখনও ভাল করিয়া এ খেলা বুঝিতেন না তবু বলিতেন—যখন সমস্ত জাতটা এ খেলায় মেতে গেছে তখন নিশ্চয়ই এ ভাল খেলা হবে।"

ক্রমে এমনি হইল যে তিনিও ক্রিকেট খেলার একজন দৈনিক ও মনোযোগী দর্শক হইয়া পড়িলেন। প্রথম দিন খেলা দেখার পর তিনি স্থির করিলেন, দর্শকদের ভদ্রতা রক্ষা-কল্পে নিম্নলিখিত নিয়ম গুলি প্রতিপালন করা আবশ্যক।

"নির্ব্বোধ দর্শকের পক্ষে তাহার বুদ্ধিমান্ পার্শ্ববর্ত্তীকে ক্রমাগতই খেলার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা ভাল নয়।—

"জিজ্ঞাসা করিতে হইলেও ২।১ মিনিট পর পর প্রশ্ন করা উচিত। না হইলে পার্শ্ববর্ত্তীর বিরক্ত হইয়া যাওয়ার কথা।

"সাধারণতঃ যেরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় ও যেরূপ উত্তর দেওয়া হয় তাহা নিম্নলিখিত রূপ। খুব ভালরূপে এগুলি পড়িয়া দেখিয়া চুপ করিয়া থাকা উচিত।

নির্ব্বোধ দর্শক। "ওখানে ওই জিনিসগুলি কি ?"

বুদ্ধিমান পার্শ্ববর্ত্তী। "উইকেট।"

নিঃ।—"ওগুলি কিসের জন্য ?"

বুঃ।—"পরিশ্রান্ত হইলে এর উপর বসিবার জন্য।"

উপরে যাহা লিখিলাম তাহা তাঁর শেষ বয়সের কথা। এই ঘটনাগুলির অতি অল্প দিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই সময় তিনি যে ভদ্রমহিলার অতিথি ছিলেন তিনি মার্কটোয়েনের কতকগুলি ছবি তুলিয়াছিলেন। তাহার দু একখানি প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত হইল।

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী

বৈজ্ঞানিক জীবনী

ডারুইন

উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যত বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছিল একহিসাবে ডারুইন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এমন অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁহারা সারা-জীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কাটাইয়াছেন, ফলও যথেষ্ট লাভ করিয়াছেন কিন্তু সেগুলি তাদৃশ কার্য্যকরী নহে। আবার এরূপ অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা আছে যাহা স্বল্পায়াসে সিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু তাহার ফল বহুদূরগামী। ডারুইনের বৈজ্ঞানিক সাধনা একদিকে যেমন বহুআয়াসসাধ্য অপর দিকে তাঁহার আবিষ্কারগুলির প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত। উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বহুশাস্ত্র তাঁহার আবিক্রিয়ার ফলে নূতন নূতন আলোক লাভ করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে যে সকল বৈজ্ঞানিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কাহারও আবিক্রিয়া এত অধিক পরিমাণে ফলপ্রসূ হয় নাই বলিয়া ডারুইন তাঁহাদের মধ্যে অবিসম্বাদীরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

চার্লস রবার্ট ডারুইন ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী স্রুবেরী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রবার্ট ওয়ারিং ডারুইন। তিনি একজন সুচিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ সুপ্রসিদ্ধ ইরাসমাস ডারুইন। ইনিও একজন বড় ডাক্তার ছিলেন এবং অনেক গ্রন্থ ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ডারুইনের বয়স যখন মাত্র আট বৎসর তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। এখন হইতে তাঁহার লালন পালন ও শিক্ষার ভার তাঁহার বড় ভগিনীগণের উপর পড়ে। ডারুইনের ভ্রাতা ভগিনী ছিলেন পাঁচজন, তিনি সকলের কনিষ্ঠ। ডারুইন পিতাকে খুব ভাল বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁহার কথা অনেক স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৮১৮ সালে তিনি স্রুবেরী স্কুলে প্রেরিত হন। এই স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন ডাক্তার বাটলার; ইনি পরে লিচফিল্ডের বিশপ হন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে ডারুইন তাঁহার মত চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। সেইজন্য ১৮২৫ সালে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। চিকিৎসা বিজ্ঞান তাঁহার আদৌ ভাল লাগিল না। কিন্তু এইখানে তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের কার্য্যের প্রথম সূচনা আরম্ভ করিবার তিনি সুযোগ পাইয়াছিলেন। অধ্যাপক ডাক্তার গ্রাণ্টের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে ডারুইন সমুদ্রতীরস্থ জীবজন্তুর নমুনা সংগ্রহ করিতে যাইতেন। এইরূপে ১৮২৬ সালে তিনি প্লিনিয়ান সোসাইটিতে দুইটি মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এবং এই প্রবন্ধে "চার্লস

ডারুইন কর্তৃক ধৃত" এই কথাগুলিতে যে তিনি কত আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার একখানি পত্রে. অবগত হওয়া যায়।

দুইবৎসর এডিনবরাতে থাকার পর তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের সংকল্প পরিত্যাগ করেন। তাহার পর ধর্ম্মযাজকের কার্য্য তাঁহার জন্য অবধারিত হয়। সেই জন্য তিনি ১৮২৭ সালে বিখ্যাত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ক্রাইষ্ট চার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি হন। এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হেন্সলোর সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণভাবে অন্যদিকে পরিচালিত হইয়া যায়। অধ্যাপক হেন্সলো প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান, উদ্ভিদ পরে খনিজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, এবং ছাত্রদিগের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারিতেন। সেইজন্য ছাত্রদিগের মনের উপর তাঁহার প্রভুত ক্ষমতা ছিল। ডারুইন হেন্সলোর খুব প্রিয় পাত্র হইলেন, এমন কি বেড়াইতে যাইবার সময়ও হেন্সলো তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতেন। সেইজন্য ডারুইনের সহপাঠীরা তাঁহাকে "হেন্সলোর সহচর" বলিয়া ঠাট্টা করিতেন। ডারুইনের মনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পাঠের আগ্রহ জন্মাইয়া দিবার জন্য অধ্যাপক হেন্সলোর নিকট সমস্ত জগৎ বিশেষ ভাবে ঋণী। তাঁহার সংসর্গ না পাইলে ডারুইন ডাইরুন হইতে পারিতেন কি না সন্দেহের বিষয়। ১৮৩১ সালে হেন্সলোর পরামর্শে ডারুইন ভূবিদ্যা পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ভূবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে হেন্সলোর সহিত ওয়েলস্ প্রদেশে যাত্রা করেন। এই ভূবিদ্যা বিষয়ক পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তীকালে তাঁহার বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল।

ডারুইন

"বিগল্"এ সমুদ্র যাত্রা

তিনি শিকার বড় ভাল বাসিতেন। একদিন শিকার হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অধ্যাপক হেন্সলোর একখানি পত্র পাইলেন। এই পত্রে অধ্যাপক হেন্সলো তাঁহাকে

লিখিয়াছিলেন যে "বিগ্ল্" নামক জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা সার্ভে করিতে যাইতেছে এবং জাহাজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন ফিজরয় সঙ্গে লইবার জন্য একজন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের অন্বেষণ করিতেছেন। তিনি ডারুইনকে এই কার্য্যের যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করেন এবং ডারুইনকে এই পদ গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন। ডারুইন এই পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণের এই সুযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার আপত্তির কারণ এই যে, এই সমুদ্রযাত্রা ডারুইনের ধর্ম্মযাজকের পদোপযুক্ত পাঠের বিঘ্ন উপস্থিত করিবে। অবশেষে তাঁহার খুল্লতাতের সবিশেষ অনুরোধে তাঁহার পিতা সম্মতি প্রদান করিতে বাধ্য হন। পিতার সম্মতি পাইয়া ডারুইন ১৮৩১ সালে ২২এ ডিসেম্বর তারিখে বিগ্ল্ জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করেন। তাঁহার মাহিনার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না, কাপ্তেন সাহেবের ঘরেই তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

এই সমুদ্রযাত্রা ডারুইনের পরবর্ত্তীকালের শিক্ষা ও সাধনার প্রধান সহায়ক হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হমবোল্ট সাহেবের "আত্মজীবনী" পাঠ করিয়া দেশ ভ্রমণে ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিবার আগ্রহ তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। পৃথিবী ভ্রমণের এই সুবিধাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য তাঁহার সমধিক বর্দ্ধিত হইল। এই সময়কার তাঁহার চিঠি পত্রে জানা যায় যে বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে তিনি মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেন, নানা দেশের পশুপক্ষী তরু বৃক্ষরাজি, মৃত্তিকা প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া এতই আনন্দ লাভ করিতেন যে সময় সময় রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রাই হইত না। তিনি "বিগ্ল্" এ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কোনও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু স্বভাবের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া পাঁচ বৎসর পরে যখন দেশে ফিরিলেন তখন তিনি ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ও উদ্ভিদবিদ্যায় সম্পূর্ণ পারদর্শী। দক্ষিণ আমেরিকার বিবিধ জীবকঙ্কাল (fossils), গ্যালাপেগো দ্বীপের বিবিধ পক্ষী, সমুদ্রের মধ্যস্থিত প্রবালস্তূপ (coralreep) প্রভৃতি স্বচক্ষে দর্শন ও পরীক্ষার পর তাঁহার মনে ক্রমবিবর্ত্তনবাদ (theory of evolution) ক্রমশঃ সুস্পষ্টাকারে প্রতীয়মান হইতেছিল। ১৮৩৬ সালে ৬ই অক্টোবর তারিখে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্মযাজকের কার্য্য করিবার কল্পনা স্বতই ত্যক্ত হইল। আমেরিকা হইতে তিনি নানা প্রাণীর এবং খনিজ কঙ্কাল প্রভৃতি আনিয়াছিলেন, এখন এইগুলি শ্রেণীবিভাগ করিতে এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইলেন। সরকারি তহবিল হইতে এক হাজার পাউণ্ড (পনের হাজার টাকা) প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণের সহায়তায় গত সমুদ্রযাত্রার ফলস্বরূপ আহৃত প্রাণিবিদ্যা ও ভূবিদ্যা বিষয়ক অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। ১৮৩৮ হইতে ১৮৪১ সাল পর্য্যন্ত তিনি "জিওলজিক্যাল

সোসাইটির" সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ভূবিদ্যা বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ এই সভায় পঠিত হইয়াছিল।

১৮৩৯ সালে ২৯এ জানুয়ারী তিনি বিবাহ করেন। বিবাহ করিয়া প্রায় তিন বৎসর লণ্ডন সহরে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার পর লণ্ডন হইতে ষোল মাইল দূরবর্ত্তী ডাউন নামক একটি নিভৃত ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে বাস করিতে যান। এই স্থানেই তিনি বরাবর ছিলেন এবং তাঁহার যাবতীয় গবেষণা এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। ডারুইনের সকল গবেষণার পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভবপর নহে; কয়েকটি স্থূল বিষয়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রাচীন ভারতে ক্রমবিবর্ত্তনবাদ

ডারুইনের ক্রমবিবর্ত্তনবাদের পরিচয় দিবার পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতের ক্রমবিবর্ত্তনবাদের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ক্রমবিবর্ত্তনবাদ দার্শনিক অনুমানরূপে প্রাচীন গ্রীস দেশে ও ভারতে প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনার স্থান এখানে নাই, তবে মনে হয় যে প্রাচীন ভারতে এই ক্রমবিবর্ত্তনবাদ দুইটি অনুমানে বেশ সুস্পষ্ট—প্রথম দশাবতার বাদ, দ্বিতীয় আত্মার পরাবর্ত্তনবাদ (transmigration of soul)। এই দশাবতারবাদের মধ্যে ক্রমবিবর্ত্তনের একটা দিক আছে, তাহা অনেকে বড় একটা লক্ষ্য করেন না। এই দশাবতারবাদে বলা হইতেছে যে ভগবান মানবরূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বে প্রথমে মৎস্য (জলজ) পরে কূর্ম্ম, (জলজ ও ভূচর) বরাহ, (পশু) নরসিংহ (অর্দ্ধমানব), ক্রমশঃ বামন (ক্ষুদ্রাকার মানব) রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ক্রমে বামনাকার ছাড়িয়া পরশুরাম অর্থাৎ যুদ্ধোপজীবী আদিম মানুষে (primitive man) পরিণত হন। পূর্ণ মানবধর্ম্মাবলম্বী হইতেছেন রামচন্দ্র। ক্রমবিবর্ত্তনবাদ স্বীকার না করিলে এই দশাবতারবাদের প্রচলন ভারতে আদৌ সম্ভবপর হইত না।

প্রাচীন ভারতে ক্রমবিবর্ত্তনবাদের অস্তিত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ—আত্মার পরিভ্রমণ বা জন্মান্তরবাদ। এই জন্মান্তরবাদ যোনিভ্রমণবাদে পরিণত হইয়াছিল। এই যোনিভ্রমণবাদে দেখিতে পাই যে আত্মা মানবদেহে অধিষ্ঠান করিবার পূর্ব্বে বহু যোনি ভ্রমণ করিয়াছে। বহু পুরাণে এই যোনিভ্রমণবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণে আছে :—

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকং।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষং য পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশলক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং য বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য তত কর্ম্মানি সাধয়েৎ॥

মানবজন্ম লাভ করিবার পূর্ব্বে প্রথমে স্থাবর (বৃক্ষাদি), পরে ক্রমশঃ জলজ (মৎস্যাদি), কূর্ম্ম (জলচর ও স্থলচর), পক্ষী ও পশু জন্মলাভ করিতে হয়। তৎপরে বানরজন্ম এবং বানরজন্মের পরই মানরজন্ম। এই যোনিভ্রমণ বাদে প্রথমে বৃক্ষ, ক্রমশঃ জলজ, উভজ, পক্ষী, পশু, বানর ও সর্ব্বশেষে মানবের উৎপত্তির বিষয় লক্ষ্য করিয়া কেহই প্রাচীন ভারতে ক্রমবিবর্ত্তনের অস্তিত্বের উপর সন্দেহ করিতে পারিবেন না। বাস্তবিক ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় যে "বানরজাতি মানবজাতির অব্যবহিত আদিপুরুষ" এই আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য বহু প্রাচীন কালে ভারতে দার্শনিক

অনুমানরূপে বিদ্যমান ছিল। শুধু ইহাই নহে—আধুনিক ভূবিদ্যাবিশারদেরা পরীক্ষার দ্বারা জীবকঙ্কালের (fossil) ক্রমবিবর্ত্তনের যে বিভিন্ন স্তর নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার পৌর্ব্বাপৌর্য্য উল্লিখিত যোনিভ্রমণবাদের পৌর্ব্বাপৌর্য্যের সহিত অবিকল মিলে। ভূবিদ্যাবিদেরা দেখিতে পাইয়াছেন যে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন যুগের পর্ব্বত সমূহে কেবল মাত্র জলজ জন্তুরই কঙ্কাল (যথা মৎস্যের কাঁটা) দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন প্রকার উন্নত জীবের অস্তিত্ব তথায় মিলে না। ইহা অপেক্ষা আধুনিক যুগের পর্ব্বতসমূহে মৎস্যের সঙ্গে বেঙ কুম্ভীরের মত উভচর (জলচর ও ভূচর) জন্তুর কঙ্কালও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার পরবর্ত্তী যুগের পর্ব্বত সমূহে পাখাবিশিষ্ট জন্তু ও ক্রমশঃ পক্ষীর দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আধুনিক কালের মৃত্তিকার স্তরে ক্ষুদ্র চতুষ্পদ পশু, ক্রমশঃ বৃহৎ চতুষ্পদ জন্তুর দেহাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই সকল চতুষ্পদ জন্তু আধুনিক অশ্ব, গণ্ডার প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তু হইতে বহু পরিমাণে ভিন্ন। সমকালীন মৃত্তিকাস্তরের ভিতর বানরের হাড় প্রথম পাওয়া গিয়াছে। ভূবিদ্যাবিদ্‌গণের এই পরীক্ষামূলক আবিষ্কার ভারতের যোনিভ্রমণবাদের পৌর্ব্বাপৌর্য্য সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছে।

ক্রমবিবর্ত্তনের সমর্থক পরীক্ষামূলক তথ্য নিরূপণ

ডারুইনের ক্রমবিবর্ত্তনবাদ প্রচারের পূর্ব্বে অনেক পরীক্ষামূলক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যাহাকে ভিত্তি করিয়া ডারুইন তাঁহার মত প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ভূবিদ্যাবিদ্‌গণের জীবকঙ্কাল আবিষ্কার ডারুইনের ক্রমবিবর্ত্তনবাদ প্রচারকল্পে সহায়ক হইয়াছিল। এমন অনেক জন্তুর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, সে সকল জন্তু এককালে জীবিত ছিল কিন্তু এখন পৃথিবীতে নাই। এক প্রকার "পক্ষী-সরীসৃপ" আবিষ্কৃত হইয়াছে; উহার আকৃতি পক্ষীর মত কিন্তু সরীসৃপের মত দাঁত ও মাড়ি আছে। আমেরিকায় একপ্রকার অশ্বকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে—ইহার খুর বিভক্ত, আর এক প্রকার অশ্বের খুর কেবল অবিভক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এখনকার অশ্বের খুর সম্পূর্ণরূপে অবিভক্ত। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে আধুনিক অশ্ব এই সকল মৃত জন্তু হইতে ক্রমশঃ জন্মলাভ করিয়াছে। ফ্রান্সদেশে একপ্রকার প্রকাণ্ড হস্তী ও ও গণ্ডারের দেহাবশেষ মৃত্তিকামধ্যে পাওয়া গিয়াছে—এই সকল জন্তু আধুনিক হস্তী ও গণ্ডার হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন। এই সকল কঙ্কাল হইতে স্বতই প্রশ্ন উঠে কিরূপে আধুনিককালের জন্তুরা পূর্ব্ববর্ত্তীকালের জন্তুগণের বংশধর হইতে সক্ষম হইয়াছে?

জন হণ্টার ও সেণ্ট-হিলেয়ার প্রভৃতি প্রাণিবিদ্যাবিদেরা দেখান যে সমজাতীয় জন্তুদের হাড়ের মধ্যে অদ্ভুত ঐক্য আছে। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জন্তুদিগের (vertebrates) ক্ষুদ্রতম হাড়ের মধ্যেও ঐক্য দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায় যে বাদুড়ের ডানা,

শুশুকের পাখনা, ঘোড়ার সামনের পা ও মানুষের হাতের গঠনপ্রণালী একইরূপ, কেবল বিভিন্নকার্য্যের উপযোগী করিবার জন্য কাহারও হাড় ছোট, কাহারও বৃহৎ, কাহারও ছড়ান, কাহারও বা গুটান। এইরূপ ঐক্য বশতত একই শ্রেণী হইতে ক্রমান্বয়ে এই সকল জন্তুর সৃষ্টি সপ্রমাণিত হইতেছে।

আবার অনেক জন্তুর এমন অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, যাহা তাহার কোনও কাজে লাগে না। মানবদেহের প্লীহার উপযোগিতা চিকিৎসকেরা এখনও দেখিতে পান না। অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদের (mamalia) মত তিমি মাছের দাঁত আছে বটে, কিন্তু সে দাঁতগুলি কোন কাজে আসে না, কারণ তাহা মাড়ির ভিতর ফুঁড়িয়া যায় নাই। একপ্রকার সরীসৃপ আছে—তাহার চামড়ার ভিতর হইতে পিছনদিকে দুইটি পা দেখা যায়, কিন্তু সে পা মাটিতে ঠেকিতে পারে না, সুতরাং কাজে লাগে না। এইরূপ অব্যবহার্য্য ইন্দ্রিয়গুলি অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদিগের নিকট উত্তরাধিকারীসূত্রে পাইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

ভন বায়ার নামক একজন বৈজ্ঞানিক আর একটা আশ্চর্য্য তথ্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন। চতুষ্পদ (quadrupeds) প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর জীবের ভ্রূণাকৃতি পুষ্ট হইবার আগে মৎস্য সরীসৃপ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর জীবের অপুষ্ট ভ্রূণের আকৃতির তুল্য। যদি প্রত্যেক জীব আলাহিদা করিয়া সৃষ্ট হইত তাহা হইলে কুকুর প্রথমে মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষীর আকৃতি পাইবে কেন এবং কেনই বা অপ্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয় বা অংশগুলি ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিবে? এমন কি পুষ্ট হইবার আগে মানবের ভ্রূণ ও কুকুরের ভ্রূণ প্রায় আকৃতিতে একইরূপ।

উদ্ভিদরাজ্যেও এইরূপ ঐক্য ও পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। এক গণভুক্ত বিভিন্ন উপগণের (species) পার্থক্য এরূপ মিলাইয়া গিয়াছে যে ধরা কঠিন। ডারুইন দেখাইয়া দিলেন যে এই পার্থক্য এত অল্প অল্প করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে যে প্রকার (varieties) এবং উপগণের (species) মধ্যগত পার্থক্য ধরা যায় না। বিভিন্ন গোলাপগাছ একজন সতের উপগণে বিভক্ত করিয়াছেন, আর একজন তাহাদের মধ্যে পাঁচটির বেশী উপগণ খুঁজিয়া পান নাই। আবার একশ্রেণীর উদ্ভিদ জন্তুর মত ব্যবহার করে। ইহারা কীটভোজী, কীটপতঙ্গ ধরিয়া খায়। তাহাদের পাতার উপর কীটপতঙ্গ বসিলেই পাতাগুলি আপনি মুড়িয়া যায় এবং যেমন ভোজনের সময় ও পরে প্রাণীদেহে পাকরস বহির্গত হয়, কীটভোজী উদ্ভিদ হইতেও সেই প্রকারের রস বহির্গত হওয়াতে কীটগুলিকে উদ্ভিদ শীঘ্রই হজম করিয়া ফেলে। এই সকল উদ্ভিদ প্রাণীরাজ্য ও উদ্ভিদ-রাজ্যের মধ্যবর্ত্তীভাবে সৃষ্ট হইয়াছে।

ডারুইন এই সকল তথ্য প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কত অসংখ্য পুস্তক, সাময়িক পত্র, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ যে এই সময়ে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া নিজেই ডারুইন পরে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন যে, কেমন করিয়া তিনি এত পরিশ্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহা ভিন্ন

বিভিন্ন জাতীয় পায়রা পুষিয়া পাছ পালা পুঁতিয়া বিস্তর পরীক্ষা করিতেন। তাঁহার গবেষণার ফলে তিনি ক্রমশঃ ক্রমপরিবর্ত্তন বাদের সত্যতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ করেন। কিন্তু এই তথ্য প্রকাশ করিবার কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। ১৮৫৮ সালে তাঁহার বন্ধু বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ সার চার্লস লায়েলের অনুরোধে তিনি তাঁহার পরীক্ষার ফল ও সিদ্ধান্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হন। ইতিপূর্ব্বে ১৮৪৪ সালে তাঁহার অভিমত একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন—তাহাও প্রকাশ করেন নাই। এখন দেখিলেন যে তাঁহার পরীক্ষা ও গবেষণার ফল এত জমিয়া গিয়াছে যে তাহা একখানি পুস্তকে বাহির করা অসম্ভব; সেইজন্য তিনি তাঁহার কিয়দংশ প্রকাশ করিতে মানস করিলেন।

এই সময়ে ১৮৫৮ সালে ১৮ই জুন তারিখে তিনি ওয়ালেস নামক আর একজন বৈজ্ঞানিকের নিকট হইতে কতকগুলি পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন। ওয়ালেস মালয় দ্বীপপুঞ্জে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং তাঁহার স্বকীয় গবেষণার দ্বারা তিনিও ডারুইনের উদ্ভাবিত সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন—এমনকি দুইজনের লেখাতে স্থানে স্থানে ভাষারও মিল ছিল। বলা বাহুল্য ওয়ালেস ডারুইনের কার্য্যাবলীর কোনও সংবাদ জানিতেন না। ডারুইন এই পাণ্ডুলিপিগুলি লায়েল, হুকার প্রভৃতি তাঁহার বন্ধুদিগকে দেখাইলেন। তাঁহারা ঠিক করেন যে ওয়ালেস ও ডারুইন এই দুইজনের প্রবন্ধই একসঙ্গে পঠিত ও মুদ্রিত হইবে, উভয় প্রবন্ধই ১৮৫৮ সালে ১লা জুলাই তারিখে লিনিয়ান সোসাইটিতে পঠিত এবং ঐ সভায় প্রক্রিয়ার বিবরণে প্রকাশিত হয়। এই ঘটনাটি বিজ্ঞান জগতের পক্ষে শুভ হইয়াছিল, কারণ এ ঘটনাটি না ঘটিলে ডারুইনের অভিমত কোনও কালে প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহস্থল। এমন কি ১৮০০ সালে তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি একখানি পত্রে তাঁহার স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর ৪০০ বা ৫০০ পাউণ্ড দিয়া একজন পুস্তক প্রকাশকের দ্বারা এই প্রবন্ধ যেন প্রকাশ করা হয়।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

ভাষাতত্ত্ববিষয়ে কাহারা নাবালক ?

মনীষী মোক্ষমুলর তদীয় Ancient Sanskrit Literature বা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস-নামক গ্রন্থের একত্র বলিয়াছেন যে,

"And yet Indian philology is still its infancy, P. 2.

অর্থাৎ এখনপর্য্যন্তও ভারতীয় ফাইলোলোজী বা ভাষাতত্ত্ববিষয়কবিদ্যা বাল্যাবস্থাতেই আছে, উহার কোনও উন্নতিই হয় নাই।"

কিন্তু মোক্ষমূলরের এ কথা যে সম্পূর্ণই অলীক ও অমূলক, তাহা আমরা সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ করিয়াছি, এই প্রবন্ধেও

দেখাইব যে তাঁহারাই ভাষাতত্ত্ববিদ্যারূপ মহার্ণবের বেলাভূমিতে উপলখণ্ডসংগ্রহকারী বালক ভিন্ন কিশোরবয়াও নহেন। মূলার তাঁহার উক্ত গ্রন্থের স্থলান্তরে বলিয়াছেন যে—

The distinction of the Genders is the only point on which the Greeks may claim a priority to the Hindus. It was known in Greece to Protagoras ; wheaas in India the "pratisakhyas" seem to have passed it over, and it appears first in Panini, P. 83.

অর্থাৎ পুং, স্ত্রী, ক্লীব, এই তিন লিঙ্গের প্রয়োগগত প্রভেদবিষয়েও গ্রীকেরা আপনাদিগকে হিন্দুদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া দাবী করিতে পারেন। ইহা গ্রীশদেশে পিথাগোরাসের সময়ে জ্ঞাত হইয়াছিল কিন্তু প্রাতিশাখ্যপাঠে জানা যায় উহাতে লিঙ্গভেদের কোনও প্রসঙ্গই নাই, পাণিনিতেই সর্ব্বপ্রথম লিঙ্গগত ভেদের প্রসঙ্গ দেখা যায়।

মোক্ষমূলরের এই কথাগুলি পাঠ করিয়া আমাদিগের কথামালার বাঘ ও মেষশাবকের গল্প মনে পড়িয়া গেল। যবন গ্রীকজাতির গ্রীকজাতিতে ও তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস মিশরদেশ স্থলে পরিণত হইবারও বহু সহস্র এমন কি প্রায় লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে জগতের আদি গ্রন্থ সামবেদে হিন্দুরা লিঙ্গগত ভেদ-জ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে কি প্রকারে নাবালক গ্রীকের পূর্ব্ব-বর্ত্তিতা হইতে পারে? বেদ, শ্রৌতসূত্র, কল্পসূত্র, উপনিষৎ, দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিষ, গণিত খগোল, ভূগোল, ব্যাকরণ, রামায়ণ, মহাভারত, প্রাচীনতম পুরাণ ও প্রাচীনতম তন্ত্র সকল লিখিয়া হিন্দুরা যখন জ্ঞান-রাজ্য হইতে জগতের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, যখন তাঁহাদের মহাপতন আসিয়া দেখা দিয়াছিল, তখন ভারতীয়-তুর্ব্বসন্তান যবনগণের নেদিষ্ঠ অনন্তরবংশ্য গ্রীকগণ জগতে মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে আরম্ভ করেন। সুতরাং এহেন অপরিণত বয়াঃ গ্রীকগণ লিঙ্গজ্ঞানবিষয়ে কি প্রকারে জ্যেষ্ঠতাতেরও অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ হিন্দুগণের অগ্রগামী হইতে পারেন? হিন্দুরা এহেন গ্রীকের নিকট জ্যোতিষ ও কলাবিদ্যা শিখিয়া মানুষে পরিণত হইয়াছিলেন ইহাও কি ষোল আনা মিথ্যা কথা নহে?

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাৎ অগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।
২০—২অ—মনু।

ভগবান্ মনু বলিতেছেন যে পৃথিবীর সকল লোক এই ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতের ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে স্ব স্ব চরিত্র অর্থাৎ আচার ব্যবহার ও জ্ঞানবিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিতেন।

সুতরাং এহেন জগদ্বন্দ্য জগদ্গুরু ভারতীয় ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্রবালক গ্রীকের নিকট "দেহি" বলিয়া হাত পাতিয়া ছিলেন, লিঙ্গজ্ঞান বিষয়ে তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? পাণিনিব্যাকরণের আবির্ভাবও কি গ্রীকজাতির অভ্যুত্থানের পূর্ব্বেই হইয়াছিল? মহামান্য মুইর বলিতেছেন যে—

The poems of Homer which form the oldest relic of the extensive literature of ancient Greece, are supposed to have been written about 2700 years ago.

S. Tex. Vol. II. P. 225.

এইরূপ অনুমান যে গ্রীকের অতীব প্রাচীনতম পদ্যগ্রন্থ, যাহা গ্রীকসাহিত্যের পরিণত অবস্থায়

লিখিত হোমরকৃত সেই ইলিয়ড (যাহা রামায়ণের সম্পূর্ণ অনুকরণ) বর্ত্তমান সময়ের ২৭০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।

ইহা স্বদেশ ও স্বদেশের prestige রক্ষণতৎপর সাহেবদিগের নিজের অনুমান, তাঁহারা এখানে ফাঁক না রাখিয়া বা ঠকিয়া অনুমান করেন নাই, তথাপি আমরা আরও ৫০০ বৎসর বাড়াইয়া দিয়া মনে করিয়া লইলাম যে হোমরের ইলিয়ড বা গ্রীক-সাহিত্যের পরিপক্কতার বয়স ৩০০০ বৎসর। তাহা হইলে কি আমাদিগকে বলিতে হইবে না যে মহাভারত, পাণিনি ও অধিকাংশ পুরাণ লিখিয়া জগদ্‌গুরু ভারত মহাপতনের দিকে হেলিয়া পড়িলে তবে গ্রীক-জাতির অভুত্থান সমারব্ধ হয়? মহাভারতের বয়স হিন্দু মতে ৫০২৫ বৎসর বৈলাতিক মতেও ৩১০০ বৎসর (বিলাত গন্ধি বি-এ বঙ্কিমচন্দ্র এরূপ নির্দ্দেশ করেন); পাণিনি ও প্রাচীনতম পুরাণসমূহও ৪০০০ বৎসরের এদিকের নহে। সুতরাং যে জাতির শেষ আর্ষ ব্যাকরণ গ্রীক জাতির মানুষে পরিণত হইবারও বহুকালপূর্ব্বে লিঙ্গের খবর লইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সেই হিন্দুজাতি কি প্রকারে লিঙ্গগত ভেদজ্ঞানবিষয়ে অর্ব্বাচীনতম গ্রীকের অবরজবয়াঃ হইতে পারে?

আর পিথাগোরাস্ কোনও গ্রীশ দেশবাসী বা গ্রীকসন্তান নহেন। মহামতি পোকক তাঁহার Indian in Greece নামক গ্রন্থের শেষে বিশদাক্ষরেই বলিয়া গিয়াছেন যে একজন বৌদ্ধ গুরু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার জন্য গ্রীশদেশে গমন করিয়া তথায়ই উপরত হয়েন। সেই "বৌদ্ধ-গুরু" কথাটাই অপভ্রষ্ট হইয়া putha Goras (পুথা গোরাস) শব্দে পরিণত হইয়া শেষে Pytha goras হইয়াছিল। কেহ কি গ্রীকদিগের কোনও কুল-পঞ্জিকাহইতে পিথা গোরাসের একটি বংশাবলী বাহির করিয়া দিতে পারিবেন? কেহ কি এপর্য্যন্ত লিখিয়া দিতে পারিয়াছেন যে পোথা-গোরাসের পিতার নাম অমুক ও মাতার নাম তমুক? ফলতঃ ভারতীয় একজন বৌদ্ধ গুরুই গ্রীশে যাইয়া লিঙ্গজ্ঞান বিষয়ে গ্রীকগণকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। সত্যভীরু হারবাস সাহেবও এ কথা অম্লান বদনেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং মোক্ষ মূলরও লিখিতেছেন যে—

Hervas was likewise aware of the great grammatical, similarity between Sanskrit and Greek * * *. He even pointed out that the terminations of the three jender in Greek, as, e, on, are the same as the Sanskrit, as, a, am. But believing, as he did that the Greeks derived their philosophy and mythology from India, he supposed, that they have likewise borrowed from the Hindus some of their words and even the art of distinguishing the gender of words.

S. L. Vol. I. P. 157.

হারবাস ঐরূপ সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে একটা গুরুতর সমতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি ইহাও অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইয়া দিয়াছেন যে গ্রীকদিগের os, e, on (ওস্ এ এবং

ওন্) হিন্দুদিগের পুং-অস্, স্ত্রীং আ ও ক্লীবলিঙ্গের অম্ ভিন্ন আর কিছুই নহে —

বীরস্—Heros

গুহা—Gupe

দানম্—Doron

দেখিলেই মনে হইবে যে সংস্কৃত পদের বিকারে গ্রীক পদ সকল গঠিত হইয়াছে। হারবাস ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে গ্রীকেরা হিন্দু-দিগের নিকট হইতেই দর্শন-শাস্ত্র ও পৌরাণিক গল্প গ্রহণ করিয়াছেন। হারবাস ইহাও অনুমান করেন যে গ্রীকেরা তাঁহাদের বহুশব্দ সংস্কৃতহইতে ধার করিয়াছেন এবং লিঙ্গগতপ্রভেদজ্ঞান ও উহার প্রয়োগবিধিও তাঁহারা হিন্দুদিগের নিকট হইতেই ধার করিয়া নিয়াছিলেন।

হারবাসের একথাগুলি অতি প্রামাণ্য ও সত্যগন্ধি। ফলতঃ তিনি যদি জানিতেন যে গ্রীকেরা ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান, ভারতীয় সংস্কৃতের বিকারেই গ্রীক ও লাটিনপ্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, যদি সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহে হারবাসের প্রকৃত দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে তিনি আপনার কথাগুলি ঠিক এ ভাবে না বলিয়া আমাদের ন্যায়ই বলিতেন।

আর আশ্চর্য্য এই যে মূলার প্রাতিশাখ্যে লিঙ্গ-প্রকরণ না দেখিয়া হিন্দুগণকে এ বিষয়ে অর্বাচীন বলিয়া ঠাহরাইয়াছেন। কিন্তু প্রাতিশাখ্যগুলি কি ব্যাকরণ? ঐ সকল গ্রন্থ কি ভিন্ন ভিন্ন বেদের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র-প্রযুক্ত পদের ব্যুৎপত্তি বা নির্বচন লইয়া প্রণীত নহে? লিঙ্গবিধি ব্যাকরণে থাকে—এবং পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী গালব, স্ফোটায়ন, চান্দ্র, মাহেশ, ঐন্দ্র, আপিশলি, শাকল্য, ও শাকটায়ন প্রভৃতি সমগ্র ব্যাকরণেই উহা রহিয়াছে। আর সাহিত্যেই লিঙ্গগত ভেদের প্রয়োগ থাকে—তাহাও সাম, ঋক্, যজুঃ, অথর্ব্ব প্রভৃতি বেদ এবং রামায়ণ ও মহাভারতাদি প্রাচীন এবং অপ্রাচীন (অবশ্য এ সকলই অর্বাচীন গ্রীকের পূর্ব্ববর্ত্তী) সকল ভারতীয় সাহিত্যেই রহিয়াছে। মূলার—চারিবেদ চৌদ্দ শাস্ত্র ঘাটিয়াও কেন যে ঐরূপ প্রলাপোক্তির উদ্বমন করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন।

যাহা হউক আমরা সমস্ত বৈদিক সাহিত্য হইতে লিঙ্গগত ভেদের প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া মূলারের উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিব।

সামবেদে ১। ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা,
বিশ্বেষাং হিতঃ।২—১ পৃ।

হে অগ্নি তুমি যজ্ঞের হোতা ও পৃথিবীর সকলের হিতকারী।

জীবানন্দী সংস্করণের সামবেদের এই বাক্যদ্বয়ে পুংলিঙ্গ পদের প্রয়োগ রহিয়াছে। অগ্নি শব্দ পুংলিঙ্গ, এইজন্য উহার বিশেষণ হোতা ও হিত পুংলিঙ্গেই প্রযুক্ত হইয়াছিল। তথাহি—

২। অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনৎ।৪।৩পৃ
অগ্নি র্হব্যানি অক্রমীৎ।
দধৎ রত্নানি দাশুষে।১০—১৫পৃ

অগ্নিদেব বৃত্রাসুরের সৈন্যগণকে নিহত করিয়া-ছিলেন। অগ্নিদেব যজ্ঞের হবি সকলে ব্যাপ্ত হইয়া-ছিলেন। এবং তিনি হবিঃপ্রদাতা যজমানকে রত্ন সকল প্রদান করিয়া থাকেন।

সৈন্য শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, একারণ উহার বিশেষণ বৃত্রাণি পদও ক্লীবলিঙ্গ হইয়াছে। হব্য ও রত্ন শব্দও ক্লীবলিঙ্গান্ত বলিয়া উহাদের প্রয়োগও ক্লীবলিঙ্গে হইয়াছিল।

৪। পাহি নো অগ্নে একয়া পাহি উত দ্বিতীয়য়া
পাহি গীর্ভিঃ তিসৃভিঃ উর্জাং পতে পাহি চতসৃভিঃ
বসো ॥২—১৮পৃ।

হে অন্নপতি বসু অগ্নিদেব! তুমি আমাদিগকে এক দুই তিন বা চারিটী বাক্যদ্বারা রক্ষা কর।

এখানে গির্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া উহার বিশেষণ একয়া, দ্বিতীয়য়া; তিসৃভিঃ ও চতসৃভিঃ প্রভৃতি হইয়াছিল। সুতরাং জানা গেল যে যখন জগতের আদিগ্রন্থ সামবেদ বিরচিত হয়, হিন্দুজাতির পূর্ব্বপুরুষেরা তখনই লিঙ্গগত প্রয়োগভেদ সম্যক্ অবগত ছিলেন। সামবেদের বয়ঃক্রম এক লক্ষ বৎসরের ন্যূন হইবে না। মোক্ষ মূলর কি বলিতে চাহেন যে সামবেদ বয়সে গ্রীক জাতি হইতে অবরজ?

অনেকের বিশ্বাস যে ঋগ্‌বেদই সকল বেদের আদি, ইহা ফলতঃ সম্পূর্ণই প্রমাদ। পরমার্থতঃ সামবেদ জগতের আদি গ্রন্থ ও বিশ্বদেবনিষিৎসমূহ আদি পন্থ। যাহা হউক আমরা সেই ঋগ্‌বেদহইতেও লিঙ্গগত প্রয়োগভেদের উদাহরণ সমাহৃত করিব।

ঋগ্‌বেদ ১। মহৎ ধনং জয়েম।
৯—৫৭সূ—৮ম
স্ত্রিয়া অশাস্যং মনঃ
১৭—৩৩সূ—৮ম
ত্রীণি এক উরুগায়ো বিচক্রমে।
৭—২৯সূ—৮ম।

আমরা মহৎ ধন জয় করিব। স্ত্রীলোকের মন শাসনের অযোগ্য। বহুদেশ ভ্রমণকারী একক বিষ্ণু ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন ভুবন ভ্রমণ করিয়া ছিলেন।

বেশ দেখা যাইতেছে যে ঋগ বেদের ঋষিরা ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগভেদবিষয়ে পূর্ণাভিজ্ঞ ছিলেন।

২। সুতা ইমে (সোমাসঃ)।
৪—৩সূ—১ম
স কেতুরগ্নিঃ। ৪—১০—৩ম
তস্মৈ ইন্দ্রায় গায়ত।
১০—৪সূ—১ম
সদা সুগঃ পিতুমান্ অস্তু পন্থাঃ।
২১—৫৪সূ—৩ম

এই সোমরস সকল অভিষুত বা প্রস্তুত হইয়া আছে। সেই ইন্দ্রের গুণ গান কর। পথ সর্ব্বদা সুগম ও খাদ্যযুক্ত হউক (পিতু—food) সোম ইন্দ্র, অগ্নি ও পথিন্ শব্দ পুলিঙ্গ, এজন্য উহাদের বিশেষণ ইমে, তস্মৈ, সঃ, ও পিতুমান্ এবং সুগঃ পুংলিঙ্গান্ত হইয়াছে।

৩। ইমা ধানা ঘৃতস্নুবঃ।
২—১৩ সূ—১ম
চোদয়িত্রী সুনৃতানাং
সরস্বতী। ১১ | ৩ সূ—১ম
অগ্নে সা তে সুমতিঃ।
৭—১৫ সূ—৩ম

সেই ঘৃতনিষ্যন্দিনী ধানা (ভৃষ্ট যব) সকল।
সরস্বতী সুনৃতের প্রেরণকারিণী।
হে অগ্নি সেই তোমার সুমতি।

এখানে ধানা, সরস্বতী ও সুমতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গান্ত, এজন্য উহাদের বিশেষণও যথাক্রমে ইমাঃ, চোদয়িত্রী ও সা, স্ত্রীলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অতএব বুঝা গেল যে ঋগ্‌বেদের যুগের লোকেরাও লিঙ্গগতপ্রভেদ ও তৎপ্রয়োগ বিষয়ে পূর্ণাভিজ্ঞই ছিলেন।

শুক্ল যজুঃ...১। অস্মাৎ অন্নাৎ
অস্যৈ প্রতিষ্ঠায়ৈ।
৬৯ পৃ।

অয়ং গৌঃ প্রগ্নন্ স্বঃ।
৮০ পৃ।

কাস্বিৎ আসীৎ পূর্বচিত্তিঃ।
৯১৭ পৃ।

কঃ স্বিৎ একাকী চরতি,

৯৭৮ পৃ।

কিংস্বিৎ আসীৎ বৃহদ্বয়ঃ।

৩৯ পৃ।

এখানহইতে (স্বর্গহইতে) অন্নের জন্য।
এই বাসস্থানের (প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত)।
এই সূর্য্যদেব স্বর্লোকে গমন করিতেছেন।
আমাদের পূর্ব্বনিবাস কি? কে একক ভ্রমণ-করে? বৃহৎ কূপ কোন্‌টী?

বেদে দেখা যাইতেছে যে ঋষিগণ ক্লীবলিঙ্গের বিশেষণ অস্মাৎ (অস্মাৎ) করিয়াছেন, আবার স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণে অস্যৈ (প্রতিষ্ঠা শব্দ) করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। গৌঃ পুংলিঙ্গ এজন্য অয়ং ও প্রযন্ বিশেষণও পুংলিঙ্গান্ত। পূর্ব্বচিত্তি, কঃ ও বৃহদ্বয়ঃ; ক্রমে স্ত্রী, ও ক্লীব লিঙ্গের শব্দ উহাদের বিশেষণও ঠিক কা—একাকী (কঃ) ও কিং হইয়াছে।

অথর্ববেদ———

যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেৎ
নৈষা গব্যূতিঃ।

১৮ কাণ্ড—৭৬।

ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা

ঐ—১২৮ পৃ

অপশ্যং যুবতিং নীয়মানাং

ঐ—১৩১ পৃ

যানি নক্ষত্রাণি দিবি।

১৯ কাণ্ড—২৮৮ পৃ।

যম আমাদের গমনপথ সকলের পূর্ব্বেই জানেন। ইহা (এষা) গব্যূতি (ক্রোশদ্বয়) না। এই রমণী পতিলোক বরণ করিতেছে। যুবতীকে নীয়মানা দেখিলাম। আকাশে যে সকল নক্ষত্র।

এখানেও দেখা যাইতেছে যে ঋষিরা লিঙ্গগত ভেদবিষয়ে পূর্ণাভিজ্ঞই ছিলেন। বেদ চারিখানি জগতের সকল সভ্য জাতির সকল গ্রন্থের বিশেষতঃ গ্রীক ও পাণিনি অপেক্ষা যে বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা বোধ হয় সত্যভীরু সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং হিন্দুরা পাণিনিব্যাকরণ. ও গ্রীকজাতির পূর্ব্বে লিঙ্গগত ভেদবিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন না, এ বিষয়ে গ্রীকগণই প্রথম অভিজ্ঞ, এ কথা মিথ্যা হইতেছে?

ইহা গেল বৈদিক সাহিত্যের কথা। অতঃপর আমরা ব্যাকরণের কথা বলিব। কেননা, লিঙ্গগত ভেদবিষয়ে ব্যাকরণই প্রমাণস্থল, কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য-বশতঃ ঐন্দ্র, চান্দ্র, মাহেশ, গালব, স্ফোটায়ন ও শাকল্যপ্রভৃতি প্রাচীনতম ব্যাকরণ সকল এখন আর নাই। অতএব আমরা যথাসম্ভব একমাত্র শাকটায়ন ব্যাকরণহইতে লৈঙ্গিক ভেদজ্ঞান ও তৎপ্রয়োগবিষয়ে প্রমাণ-প্রদর্শন করিব।

অবশ্য তোমরা ছাড়িবেনা, বলিবে শাকটায়ন যে পাণিনি অপেক্ষা বর্ষীয়ান্, সে বিষয়ে প্রমাণ কি? প্রমাণ ঐ বর্ষীয়ান্ পাণিনি ও তদ্‌বর্ষীয়ান্ মহর্ষি যাস্কদেব। পাণিনি বলিতেছেন যে—

যস্কাদিভ্যো গোত্রে।

গোত্র বা অপত্য বুঝাইতে যস্কপ্রভৃতি শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়। তৎপর—ভট্টোজি দীক্ষিত, যস্কস্য অপত্যং পুমান্ (যাস্কঃ) এই পদ সাধিয়াছেন।

সুতরাং পাণিনি অপেক্ষা যাস্ক পূর্ব্বকালীন? সেই পাণিনি ও যাস্কই বলিতেছেন যে—

১। ত্রিপ্রভৃতিষু শাকটায়নস্য।

৮।৪।৫০। পা।

১। তত্র—ভট্টজিঃ...ত্র্যাদিষু বর্ণেষু সংযুক্তেষু বা ন দ্বিত্বম্।

এইটী শাকটায়নের মত যে স্বর বর্ণের পরবর্ত্তী শব্দে তিন কি ততোঽধিক ব্যঞ্জন সংযুক্ত থাকিলে তথায় নকারের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। যথা—ইন্দ্র ;—ইন্‌ন্দ্র ; রাষ্ট্র—রাষ্‌ষ্ট্র। কিন্তু "হৃতে" এই নকারের দ্বিত্ব হইবে না, কেন না ইহা স্বরবর্ণের পরবর্ত্তী নহে।

২। উপসর্গা অর্থান্নিরাহুঃ।

ইতি শাকটায়নঃ। ৪৪১ পৃ যাস্ক।

২। তত্র দুর্গচার্য্যঃ—"ন নির্ব্বদ্ধা উপসর্গা; অর্থান্ নিরাহুঃ"—শাকটায়নঃ। নেতি প্রতিষেধে নিষ্কৃষ্য নামাখ্যাতমধ্যাৎ পদবাক্যরূপেণ বিরচিতাঃ সন্তঃ কে পুন স্তে ? উপসর্গাঃ। আখ্যাত মুপগৃহ্য অর্থবিশেষম্ ইমে তস্যৈব সৃজন্তি ইতি উপসর্গাঃ।

অর্থাৎ যাহারা আখ্যাতের পূর্ব্বে বসিয়া অর্থ বিশেষের সৃষ্টি করে, তাহারাই উপসর্গ।

অতএব জানা গেল যে যাস্ক পাণিনি হইতে বর্ষীয়ান্ ও শাকটায়ন আবার পাণিনি যাস্ক এই উভয় ঋষি হইতেও বর্ষিষ্ঠ। কিন্তু সেই বৃদ্ধতম শাকটায়ন ব্যাকরণেই আছে—

১। নান্তঃ পুংসঃ।১।১।৭৯
পুংলিঙ্গস্য অকঃ সাচো নান্তো দীর্ঘো ভবতি।

২। না ঘ্রৌটঃ—১।২।৪৭
ঘিসংজ্ঞকাৎ পরস্য টঃ—"না"
ইত্যাদেশো ভবতি'।

৩। পুংসি ইদঃ অয়্।১।২।২১০
ইদমঃ ইদ্রূপস্য অয়্ ভবতি
পুংলিঙ্গীয়ে।

৪। অথ অজন্তাঃ স্ত্রীলিঙ্গা উচ্যন্তে।

৫। স্ত্রিয়া বাট্।১।২।২৯
স্ত্রীলিঙ্গাৎ ইকারান্তাৎ
উকারান্তাচ্চ পরস্য ঙিতঃ
সুপঃ আঙ্ বা ভবতি।

৬। ত্রি চতুরঃ স্ত্রিয়াং তিসৃ চতসৃ।১।২।২২০
স্ত্রীলিঙ্গে ত্রিচতুরোঃ তিসৃ চতসৃ
ইতি ক্রমেণ আদেশৌ ভবতঃ সুপি পরে।

৭। অথ অজন্তা নপুংসকলিঙ্গা উচ্যন্তে।

৮। অথ হলন্তাঃ পুলিঙ্গাঃ উচ্যন্তে।

৯। অথ হলন্তাঃ স্ত্রীলিঙ্গা উচ্যন্তে।

১০। অথ স্ত্রীপ্রত্যয়া উচ্যন্তে।

১১। পাণিগৃহীতী ইতি পত্নী।১।৩।২৫

আমরা এই যে সকল শাকটায়ন সূত্রের সমাহার করিলাম, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও কি কেহ আর এ কথা মুখেও আনয়ন করিবেন যে—হিন্দুরা পাণিনির পূর্ব্বে লিঙ্গগত ভেদবিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন না ? মোক্ষমূলর শাকটায়ন ব্যাকরণ নাও দেখিতে পারেন, কিন্তু তিনিই ত বেদের বৈলাতিক বেদব্যাস ? তবে বৈদিক সাহিত্যে লিঙ্গের এত ছড়াছড়ি দেখিয়াও কেন তিনি যাহা তাহা বলিয়া ফেলিলেন। আমি এই জন্যই পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকি যে, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা স্বগদর্শী সাহেব ও চতুষ্পাঠীর ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের কোনও কথা সহসা গ্রহণ করিও না।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

পিপীলিকা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হুবার একবার রুফেসিন জাতীয় (F. Rufescene) কয়েকটী পিপীলিকাকে একস্থানে আবদ্ধ করিয়া—কতকগুলি গুটী কীট, (laiva, pupa) এবং প্রচুর খাদ্য সেস্থানে রাখিয়া দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গুটী ও কীটগুলির তত্ত্বাবধান করা দূরের কথা, নিজেদেরই খাদ্য মুখে তুলিয়া খাইতে না পারায় অনেকগুলি পিপীলিকা অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অতঃপর তিনি কতকগুলি দাস-পিপীলিকা সে স্থানে ছাড়িয়া দিলেন; উহারা তৎক্ষণাৎ মৃতপ্রায় প্রভুদিগকে খাদ্যাদি প্রদান করিল এবং গুটী ও কীটগুলির প্রতিপালনের প্রতি মনোনিবেশ করিল। মাটী খুঁড়িয়া উহাদের জন্য কয়েকটী প্রকোষ্ঠও নির্ম্মাণ করিল।

অন্য একজন বৈজ্ঞানিক (১) এই জাতীয় একটী পিপীলিকাগৃহের নিকট একটুকরা শর্করা রাখিয়া দেন; শীঘ্রই এই সুমিষ্ট খাদ্য একটী দাস-পিপীলিকার দৃষ্টিগোচর হওয়ায় সে তাহার রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আরও কয়েকটী দাসপিপীলিকা সন্ধান পাইয়া সেখানে আসিয়া আহারে মনোনিবেশ করিল। অতঃপর কয়েকজন প্রভু আসিয়া ভৃত্যদের পা টানিয়া তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিলেন, যে তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছে। তিরস্কৃত ভৃত্যেরা তৎক্ষণাৎ নিজেদের কার্য্যে লজ্জিত হইয়াই যেন, প্রভুদিগকে খাদ্য পরিবেষণ করিতে লাগিল। এই পরীক্ষার সত্যতা ফোরেলও সমর্থন করিয়াছেন।

F. Sanguinea-জাতীয়েরা সাধারণতঃ F Fusea-জাতীয় পিপীলিকাকেই দাস করিতে চাহে। কারণ ইহারা স্বভাবতই শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ; সহজেই ইহারা ধরা দেয় ও পরাধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু F. Flavaদের ধৃত করা বড় সহজ ব্যাপার নয়—অতি কঠোর সংগ্রাম ব্যতীত উহাদের পরাস্ত করা যায় না। তাই ইহাদের কাছে F. Sanguineaরা সহজে ঘেঁসে না। কীট দেখিয়া এই বিপরীত জাতীয় পিপীলিকার পার্থক্য ইহারা নির্ণয় করিতে পারে কি না ডারুইন তাহা পরীক্ষা করেন। তিনি দেখিলেন, F. fusca দের কীট ইহারা অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিল, কিন্তু F. Flavaর কীট দেখিতে পাইয়া সশঙ্কিত হইয়া দূরে সরিয়া পালাইল।

---

(1) Les Pes.

ইহারা যে কেবল পিপীলিকাকেই দাসত্বে নিয়োজিত করে এরূপ নহে। ব্রেজিল দেশের জঙ্গলে একপ্রকার কীট (leaf bugs) আছে, তাহারা পিপীলিকার ভারবাহী দাস। দূর প্রদেশ হইতে সঞ্চিত খাদ্য বা অন্য জিনিস গৃহে আনিতে হইলে ইহাদিগকে ভারবহন কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। দুই দুইটী করিয়া সারি বাঁধিয়া ইহারা পথে চলে, যাহাতে বিপথে না যাইতে পারে কিম্বা পলায়ন না করে, শ্রেণীভঙ্গ না করে সেই উদ্দেশ্যে কতকগুলি শান্ত্রী-পিপীলিকা ইহাদিগকে দুইদিকে পাহারা দেয়। কার্য্য সমাপনান্তে ইহাদিগকে অতি সামান্য আহার প্রদানে অল্পপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। (১)

(৫)

শুবরে ও অন্যান্য কয়েক জাতীয় পোকা পিপীলিকা-গৃহে অতিথিরূপে বাস করে। সাধারণতঃ কোনও কার্য্যে ইহাদিগকে নিযুক্ত হইতে দেখা যায় না—মনের সাধে ইহারা চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া খেলিয়া বেড়ায়। দিন ভাল থাকিলে বাহিরে আসিয়া ক্রীড়ায় রত হয়—আবার বর্ষার দিনে কিছুতেই গৃহের বহির্ভাগে আসে না। Romanes বলেন, পিপীলিকারা তাহাদের এই পোষা পোকাদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে বাস করে এবং গৃহপরিবর্ত্তনের সময় ইহাদিগকে পিঠে বহন করিয়া লইয়া যায়। (২) কেহ কেহ অনুমান করেন—এগুলিকে পিপীলিকারা সখ করিয়াই পুষিয়া থাকে। *আবার কেহ কেহ বলেন, পিপীলিকারা* এই পোষা প্রাণীদের নিকট হইতে কোন-না-কোনও রূপ সাহায্য বা সুবিধা নিশ্চয় লাভ করিয়া থাকে—নতুবা, কেবল খেয়াল ও সন্তোষের বশবর্ত্তী হইয়া ইহারা যে কতকগুলি প্রাণীর জন্য অনর্থক পরিশ্রম করিতে যাইবে এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু পিপীলিকারা ইহাদের নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য লাভ করিয়া থাকে তাহা এ পর্য্যন্ত কোনও বৈজ্ঞানিক নির্ণয় করিতে পারেন নাই!

(৬)

পিপীলিকারা কেবল পরিশ্রম করিতেই ভালবাসে শুনিয়াছি; বিশ্রামের কোনও চিন্তা বা ইচ্ছা তাহাদের মনে উদিত হইতে পারে এরূপ শুনি নাই। বৈজ্ঞানিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন—ইহারা মধ্যে মধ্যে (অন্ততঃ কোনও কোনও জাতি) বিশ্রাম এবং ক্রীড়াকৌতুকও উপভোগ করিতে ভাল বাসে। এমন কি সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর নিদ্রার মনোরম ক্রোড়ে মধ্যে মধ্যে ইহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে নিম্নে আমরা কয়েকজন বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদের পর্য্যবেক্ষণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সেদিন দিনটি বেশ পরিষ্কার ছিল। হুবার দেখিতে পাইলেন কতকগুলি পিপীলিকা (Pratensis) তাহাদের গৃহের বাহিরে "ময়দানে" একত্র হইয়া এরূপভাবে ব্যবহার করিতেছে যাহা দেখিয়া তাঁহার স্বতঃই মনে হইল—ইহারা নিশ্চয় কোনও

(1) See "Intellectual life of animals" by Parçy (2nd Ed. p. 309)
(2) See "Animal Intelligence"—Romanes (8th Ed. p. 84.)

প্রকার উৎসবের ক্রীড়া কৌতুকে রত হইয়াছে। পিছনের পায়ে ভর দিয়া কেহ কেহ উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং সেই অবস্থায় সম্মুখের পায়ের সাহায্যে পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইতেছিল, এবং শুঁড় (Antennae) কিম্বা অন্য পায়ের সাহায্যে একে অন্যকে শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া যেন কুস্তি লড়িতেছে, এই ভাবে খেলা করিতেছিল। এ খেলার মধ্যে শত্রুতার ভাব কিম্বা রাগারাগি ছিল না। তারপর কুস্তি ছাড়িয়া দিয়া একটী পিপীলিকার পশ্চাতে অন্য পিপীলিকারা দৌড়াইতে লাগিল এবং এইরূপে লুকোচুরি খেলায় প্রবৃত্ত হইল।

বুক্‌নার বলেন—(৪) হুবারের এই বৃত্তান্ত অনেক গ্রন্থে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে বটে—কিন্তু ইহার পরিষ্কার বর্ণনা সত্ত্বেও জনসাধারণ একথা একেবারেই বিশ্বাস করিতে নারাজ। ফোরেল লিখিয়াছেন—"হুবারের পর্য্যবেক্ষণ বৃত্তান্ত পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও তাহা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই—যতদিন না আমি নিজেই এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। তিনি একদল pratensisকে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন—খেলোয়াড়রা পরস্পরকে পা এবং হাতের সাহায্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া মাটীতে গড়াইতেছে। কাহাকেও বা টানিয়া গৃহের ভিতর প্রবিষ্ট করাইতেছে, এবং পরক্ষণেই পুনরায় দৌড়িতে দৌড়িতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। এইরূপ ক্রীড়ায় রত হইয়াও উহারা পরস্পরের প্রতি সখ্যতা ভুলিয়া যায় নাই। ফোরেল আরও বলেন—"আমি বুঝিতে পারি—যাঁহারা স্বচক্ষে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট ইহা অত্যাশ্চার্য্য বলিয়া বোধ হইবে। বিশেষতঃ আমরা যখন জানি যে ইহার মধ্যে স্ত্রীপুরুষের প্রণয়াকর্ষণ সম্বন্ধে কোনও কথাই উঠিতে পারে না।"

মেক্‌কুক্‌ লিখিয়াছেন—একস্থানে একই সঙ্গে প্রায় ৬।৭ জন রাজকুমারী গৃহের বাহিরে আসিয়া প্রবেশ-দ্বারের নিকটে অবস্থিত একটী বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর আরোহণ করিতে লাগিল। বাতাসের বিপরীত দিকে তাহারা আরোহণ করিতেছিল। কয়েকজন একই সঙ্গে প্রস্তরের উপর আরোহণ করিতে সমর্থ হওয়ায়—তাহাদের মধ্যে বেশ ছোটখাট একটী প্রীতি যুদ্ধ সংঘটিত হইল। সকলেই চেষ্টা করিতেছি কে আগে সুবিধামত স্থানটী অধিকার করিতে পারে। একজন ভাল স্থানে উপস্থিত হইলে—অন্য একজন আসিয়া তাহাকে সেস্থান হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করিল।

রাজকুমারীরা কিন্তু শ্রামিকদের সহিত কোনোরূপ কলহ করিল না। শ্রামিকেরা রাজকুমারীদের দেহরক্ষীরূপেই তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাহারা রাজকুমারী দিগকে শুঁড় নাড়িয়া শুধু অভিবাদন এবং অন্যান্য উপায়ে সম্ভ্রম প্রকাশ করিতে লাগিল; এই ক্রীড়াকৌতুকে যোগ দিল না!

পিপীলিকার বিশ্রাম সম্বন্ধে বেট্‌স

(4) Geistesleben der Thiere (p. 163.)

(Bates) লিখিয়াছেন :—পিপীলিকার জীবন যে কেবলি কর্ম্মময় এরূপ মনে হয় না, কেননা আমি প্রায়ই এ সিটন (citon) জাতীয় পিপীলিকাদিগকে এরূপ ভাবে সময় কাটাইতে দেখিয়াছি যাহাতে মনে হইয়াছে ইহারা বিশ্রাম উপভোগ করিতেছে।

নিভৃত বনপ্রদেশে সূর্য্যকিরণ আসিয়া পড়িয়াছে এইরূপ স্থানে, ইহারা দলে দলে আসিয়া মিলিত হয়। খাদ্য ও শিকার অন্বেষণে তখন আর তাহারা এদিক ওদিকে ছুটিয়া বেড়ায় না। দেখিলে মনে হয় অকস্মাৎ কোথা হইতে যেন এই নিত্যকর্ম্মী পিপীলিকাদের মনে গভীর আলস্যের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া ইহাদের কেহবা মৃদুপদক্ষেপে হাঁটিয়া বেড়ায়, কেহবা পদসাহায্যে নিজ নিজ দেহ পরিষ্কৃত করিতে থাকে আবার কেহ কেহ একে অন্যের গা চাটিয়া দিয়া পরস্পরের প্রসাধন কার্য্য সম্পন্ন করে। ইহাদের কার্য্যকলাপ দেখিলে মনে হয় যেন উহারা আলস্যের দাস হইয়া পড়িয়াছে।

(৭)

শ্রমের পর বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা সকলেরই পক্ষে স্বাভাবিক তাই পিপীলিকারা যদি হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর অবকাশ মত একটু বিশ্রাম প্রত্যাশী হইয়া নিদ্রার ক্রোড়শায়ী হয় তবে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া চলে না। বৈজ্ঞানিকদের পর্য্যবেক্ষণের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে পিপীলিকারাও নিদ্রিত হয়।

কেকৃকুক্ এক জাতীয় পিপীলিকার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :—

"আটটার সময় আমি এক ঝাঁক পিপীলিকার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলাম। রাত্রি যখন প্রায় ১১টা তখন দেখিলাম সে ঝাঁকের প্রায় সমস্ত পিপীলিকাই অন্তর্হিত হইয়াছে—কেবল এখানে সেখানে দুই একটী নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া আছে। ইহাদের নিদ্রার গভীরতা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে আমি আমার কলমের কোমল পালকের দিকটা অতি মৃদু ভাবে একটী নিদ্রিত পিপীলিকার গাত্রে স্পর্শ করাই লাম। পাগুলি গুটাইয়া জড়সড় হইয়া আমার বাতিটার দিকে মুখ করিয়া পিপীলিকাটী শুইয়াছিল। আমি ধীরে ধীরে তাহার শরীরের উপর দিয়া পালকের সূক্ষ্মাগ্রভাগটী 'বুলাইয়া' নিলাম কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ নাই। বার বার আমি এই উপায় অবলম্বন করিয়া ইহাকে জাগরিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম—ক্রমেই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোরে পালকের আঘাত করিতে লাগিলাম কিন্তু তাহার গভীর নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হইল না। উহার মাথার দিকে আঘাত করিয়াও কোনও ফল হইল না। অবশেষে কয়েকমিনিট চেষ্টার পর হঠাৎ পিপীলিকাটি জাগরিত হইল। জাগরিত হইয়া মাথাটী বাড়াইয়া পাগুলি প্রসারিত করিয়া ঝাড়িয়া বাতিটীর নিকটবর্ত্তী হইল এবং উক্তরূপ প্রসাধন কার্য্যে রত হইল। নিদ্রার পর এইরূপ প্রসাধন ব্যাপার পিপীলিকাদের নির্দ্ধারিত কার্য্য।

শ্রীসুধাংশু কুমার চৌধুরী।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

(৭)

এতদিনে জ্যোতিবাবু সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। "কিঞ্চিৎ জলযোগ" নামক একখানি প্রহসন তাঁহার প্রথম রচনা। তিনি বলিলেন যে "এ সময়ে আমি পুরাতনপন্থী ছিলাম, তাই মেয়েদের স্বাধীনতা ব্যাপার লইয়া এই গ্রন্থে একটু হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলাম। প্রহসনখানি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় প্রত্যহই দেখিতাম Indian mirrorএ আমার উপর কিছু-না-কিছু আক্রমণ চলিয়াছে। আক্রমণ-কারীদের মতে বইখানি অশ্লীল বিবেচিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে পুস্তকে আমার নাম ছিল না, তবুও কি-করিয়া যেন আমার নাম প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সমস্ত আক্রমণ আমার নামেই হইত। এই বই লইয়া—নব্যপন্থীদলে—খুব একটা হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল। সমালোচনার জন্য "বঙ্গদর্শনে" এক কাপি পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভালই বলিয়াছিলেন। সেই সংখ্যা বঙ্গদর্শনেই "কিঞ্চিৎ জল যোগ" প্রহসনের এবং স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" গ্রন্থের এক প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হয়। Christion Herald বলিয়াছিলেন "এই প্রহসনে দূষ্য কিছুই নাই।" এই সময়ে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় বিলাত হইতে দেশে ফিরেন। আমি যখন Calcutta Collegeএ পড়িতাম তখন হইতেই তিনি আমায় একজন খুব নিরীহ ভালমানুষ বলিয়া জানিতেন। কিন্তু আমার রচিত প্রহসনে খুব একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে শুনিয়া তিনি "কিঞ্চিৎ জলযোগ" খানি পড়িতে চাহিলেন। পড়িয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—এতে দোষের কথা ত আমি কিছুই দেখিতেছিনা। পালিত মহাশয়ের মত শুনিয়া আমি অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। আবার ইহার মধ্যেই National Theatreএ বইখানির অভিনয়ও হইয়া গিয়াছিল।

"এর কিছুদিন পরে মেজদাদা বিলাত হইতে ফিরিয়া আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্ত্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন তখন আমারও মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তখন হইতে আর আমি অবরোধপ্রথার বিরোধী নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম। তখন স্ত্রীস্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত করিয়া আমি "কিঞ্চিৎ জলযোগ" লিখিয়া-ছিলাম, বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। "কিঞ্চিৎ জলযোগের" দ্বিতীয় সংস্করণ আর আমি ছাপাই নাই। স্ত্রীস্বাধীনতার সম্বন্ধে শেষে আমি এত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে, আমি যখন গঙ্গার ধারের কোন বাগান

বাড়ীতে সস্ত্রীক অবস্থান করিতেছিলাম, তখন আমার স্ত্রীকে আমি ঘোড়ায় চড়া শিখাইতাম। তারপর জোড়াসাঁকো আসিয়া দুইটি আরব ঘোড়ায় দুজনে পাশাপাশি চড়িয়া বাড়ী হইতে গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত রোজ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে দুইজনে ঘোড়া ছুটাইতাম। এই রূপে অন্তঃপুরের পর্দ্দা ত উঠাইলামই সেই সঙ্গে আমার চোখের পর্দ্দাটিও একবারে উঠিয়া গেল! দরোয়ানেরা অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। রাস্তার লোকেরা কৌতূহল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত। আমার ভ্রুক্ষেপ নাই। আমি তখন উদ্দাম নব্যভাবের নেশায় মাতোয়ারা!

এর পরেই আমার উপর আমাদের জমিদারী পরিদর্শন ও সংসারের ভার পড়িল। পিতৃদেব স্বহস্তে আমাকে জমিদারী সংক্রান্ত অনেক কাযকর্ম্ম শিখাইয়াছিলেন। জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষ্যে একবার গুণদাদার সঙ্গে আমাকে কটক যাইতে হইয়াছিল। হিন্দুমেলার পর হইতেই আমার মনে হইয়াছিল—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্ত্তন করিলে বোধহয় কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কটকে থাকিতে থাকিতেই "পুরু বিক্রম"নাটক রচনা করিলাম। লিখিয়াই গুণদাদাকে আদ্যোপান্ত শুনাইলাম। তাঁহার নাটকখানি খুব ভাল লাগিয়াছিল। তিনি ছাপাইতে বলিলেন। "পুরু বিক্রম" প্রকাশিত হইল বটে কিন্তু প্রথম সংস্করণে আমি নাম গোপন করিলাম। পুরু বিক্রমের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে "পুরুবিক্রম বীররসের খতীয়ান্!" সেই সঙ্গে বলিয়াছিলেন যে "এই রকম লোক যদি নাটক লেখেন, দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন হইতে পারে।" তাঁহার এরূপ মন্তব্য প্রকাশের একটা কারণ ছিল। তখন যে সব নাটক বাহির হইত—তাহার অধিকাংশই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট, কিন্তু পুরু বিক্রমে সেরূপ কিছুই ছিল না।

"পুরুবিক্রম শেষে গুজ্‌রাটী ভাষায় অনূদিত হয়। ইয়ুরোপের বিখ্যাত সমালোচক ও সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী Sylvin Levi সাহেব গুজ্‌রাটী সাহিত্যের সমালোচনায় পুরুবিক্রমের প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু এখানি যে আমারই পুরুবিক্রমের অনুবাদ, তাহা তিনি জানিতেন না।"

"পুরু বিক্রম প্রকাশিত হওয়ার পর একদিন Great National Theatre-এর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতা এই নাটকখানির অভিনয় করিবার জন্য আমার অনুমতি লইতে আসিয়াছিলেন। তখন তরুণ অমৃতলাল সামান্য একজন অভিনেতা মাত্র, কিন্তু তখনই তাঁহার উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে প্রতিভার আলোক দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

সত্যেন্দ্রনাথের "গাও ভারতের জয়" গানটি পুরু বিক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

হিন্দুমেলার সময়ে বিষ্ণুবাবু এ গানটিতে একটা চলিত খাম্বাজ সুর বসাইয়া দিয়াছিলেন,—সে সুরে যেন তেমন জোর ছিল না। পরে গানটির বেশ একটা জোরাল সুর ইহাঁরা দিয়াছিলেন, সেই সুরেই ইহা এখনও গীত হয়।

তার পর বেঙ্গল থিয়েটারেও নাটকখানি অভিনীত হয়। ছাতুবাবুদের বাড়ীর শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুরু সাজিয়া ছিলেন। শরৎ বাবুর একটি অতি সুন্দর শাদা আরব ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি যেমন তেজীয়ান্ তেমনি সায়েস্তাও ছিল। এই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি উন্মুক্ত অসি হস্তে অল্পপরিসর নাট্যমঞ্চের উপর আস্ফালনপূর্ব্বক ঘোরা-ফেরা করিতেন এবং সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতেন। ঘোড়াটি কিন্তু এমন সায়েস্তা যে নীচে ফুট লাইট (foot light), চারিদিকে গ্যাসের উজ্জ্বল আলো, দর্শকগণের ঘনঘন করতালি ধ্বনি, যুদ্ধের বাজনা প্রভৃতিতে কিছুমাত্র ভীত হইত না। এইরূপে এই দৃশ্যে বীর রসের অতি চমৎকার অবতারণা করা হইত।

ইতিপূর্ব্বে হইতে বড় লোকদের ভিতরে ঘোড়ায় চড়ার একটা খুব সখ্ হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত শরৎবাবু, ঠাকুরদাস মাড়, অম্বু গুহ প্রভৃতি অনেকে মিলিয়া কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে একটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ ঠিক করিয়াছিলেন। ঘোড়দৌড়ও দুই একবার হইয়াছিল। তারপর রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের পুত্র ঘোড়া হইতে পড়িয়া যেমন মারা গেলেন অমনি সকলের ঘোড়াচড়ার বাতিকও ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিবাবু আর একটি কথা বলিলেন। "Lord Mayor মৃত্যুরপর তাঁহার ভাল ভাল সব ঘোড়াগুলি নীলামে বিক্রীত হইতেছিল। সেই নীলামে আমিও Iron grey রঙের একটা খুব বড় জাঁকালো ঘোড়া কিনিয়া ফেলিলাম। ঘোড়াটি দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে কোনরূপ দোষ ইহার নাই, বিশেষ যখন লাটসাহেবের ঘোড়া। পরে দেখা গেল যে সামান্য কিছু একটা দেখিলেই সে চমকাইত। একদিন বৈকালে সেই ঘোড়ায় চড়িয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাই। তখন Eden's Park-এর ভিতর Band বাজিতেছিল। দেখিলাম অনেক সাহেবও Bandstand-এর নিকট পর্য্যন্ত ঘোড়া লইয়া গিয়া Band শুনিতেছে, আমিও তবে না যাইব কেন? যেমন Bandএর শব্দ তাহার কানে গেল, অমনি সে প্রবল বেগে লম্ফ ঝম্ফ আরম্ভ করিয়া দিল। ফলে রাশ্ রেকাব ছিঁড়িয়া গিয়া আমি পড়িয়া গেলাম। ঘোড়াও ঊর্দ্ধ শ্বাসে ছুটিল। আমার এই দুরবস্থা দেখিয়া কয়েক জন সহৃদয় ইংরাজও আমার সাহায্যে আসিলেন। তখন আমরা খানিক দূর ছুটিয়া গিয়া দেখি যে ঘোড়াটি একটা ঘাসের জমিতে নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খাইতেছে। আমি সঙ্গে একজন সহিষও আনিয়াছিলাম। দেখিলাম কিয়দ্দূরে একজন সহিষ নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাকে আমার সহিষ মনে করিয়া—খুব এক চোট ভৎর্সনা করিয়া ঘোড়া ধরিয়া আনিতে বলিলাম। সে বেচারা ধমক শুনিয়া আমার আদেশ প্রতিপালন করিল। তারপর যখন

সে নিকটে আসিল, তখন দেখিলাম যে সে আমার সহিষ নয়! তখন হইতেই আমি Short sighted. এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আবার সেই Band-এর ধার দিয়া আমাকে ফিরিতে হইবে! সৌভাগ্যক্রমে কিছুক্ষণের জন্য Band তখন থামিয়াছিল। কোনও প্রকারে সেই ছিন্নাবশিষ্ট রা'শটুকু ধরিয়া ধীরে ধীরে গাড়ী ঘোড়ার ভীড়ের মধ্য দিয়া লালবাজারের মোড় পর্য্যন্ত আসিলাম। কিন্তু চিৎপুরের ভিড় ঠেলিয়া যাইতে আর সাহস হইল না! তাই একটা মুটের হাতে ঘোড়া দিয়া সেই খান হইতে পাল্কী চড়িয়া বাড়ী ফিরিলাম। আমার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া বাড়ী শুদ্ধ সকলেই খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

"দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থানকালে ঘোড়ায় চড়িয়া আর একবার আমি খুব বিপদে পড়িয়াছিলাম। ঘোড়া ভয় পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে একেবারে খাদের নীচে পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল। তখন আমি ইচ্ছা করিয়া—পড়িয়া গিয়া রক্ষা পাইলাম। গায়ে একটু আধটু রক্তপাত হইয়াছিল কিন্তু একটা খুব বড় পাগ্‌ড়ি ছিল বলিয়া মাথায় আঘাত লাগে নাই।"

তার পর কটক হইতে কলিকাতা আসিয়া—জ্যোতিবাবু "সরোজিনী" রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বাড়ীতে রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। জ্যোতিবাবু ও রামসর্ব্বস্ব দুইজনে রবিবাবুর পড়ার ঘরে বসিয়াই "সরোজিনীর" প্রুফ্‌ সংশোধন করিতেন। রামসর্ব্বস্ব খুব জোরে জোরে পড়িতেন। পাশের ঘর হইতে রবিবাবু শুনিতেন ও মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া কোন্‌ স্থানে কি করিলে ভাল হয় এমনি মতামত প্রকাশ করিতেন। রাজপুত মহিলাদের চিতা প্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্ব্বে জ্যোতিবাবুর একটা গদ্য রচনা ছিল, কিন্তু রবিবাবু তাহার স্থানে "জ্বল্‌ জ্বল্‌ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" কবিতাটি রচনা করিয়া সেই গদ্যটার স্থানে বসাইতে বলেন। জ্যোতিবাবু দেখিলেন যে এই কবিতাটিই সেখানে সুপ্রযুজ্য, তাই তিনি গদ্যের পরিবর্ত্তে এই কবিতাটিতে সুরসংযোগ করিয়া সেইস্থানে সন্নিবিষ্ট করিলেন।

"সরোজিনী" প্রকাশিত হইবা মাত্রই কলিকাতার সাধারণ থিয়েটারে অভিনীত হইয়া গেল। পুরুবিক্রম ও সরোজিনী দুইখানিই জনসমাজে খুব প্রশংসিত হইতে লাগিল। জ্যোতিবাবুর নাট্যকার নামে খ্যাতিও বাড়িতে লাগিল। বিশেষতঃ সরোজিনীঅভিনয়ের পর বাঙ্গলাদেশে আনন্দের একটা বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। সকলেই একটা অমৃত আস্বাদনের তৃপ্তিসুখে বিভোর হইয়া গেল। এক কথায় সরোজিনী তখন বাঙ্গলা নাটকে এক নব যুগের সৃষ্টি করিয়া দিল।

কলিকাতার আর্ট স্কুলের তদানীন্তন শিক্ষক শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বাক্‌চী মহাশয় সরোজিনীর শেষ দৃশ্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সে চিত্রখানি পৌরাণিক দেব দেবীর চিত্রের সঙ্গে বাজারে বহুদিন পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়াছিল। যাত্রার দলেও সরোজিনী অভিনীত হইতে লাগিল।

সরোজিনী যাত্রা একবার জ্যোতিবাবুদের বাড়ীতেও হইয়াছিল। সরোজিনীর গান তখন সভায়, মজ্‌লিশে, বৈঠকে সর্ব্বত্র গীত হইত।

একদিন হাওড়ার একটা থিয়েটারে সরোজিনীর অভিনয় হয়, জ্যোতিবাবুও তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যে দৃশ্যে বিজয়সিংহ কর্তৃক সরোজিনীর উদ্ধার সাধিত হয় সেই দৃশ্যে কিয়ৎক্ষণের জন্য সমগ্র রঙ্গালয় ঘনঘন মুখরিত করিয়া দর্শকগণ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে চীৎকার করিয়াছিল, "Thanks, thanks to the young author".

জ্যোতিবাবু বলিলেন "সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে আমাদের দলে প্রোমোশন্ দিয়া উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্য চর্চ্চাতে আমরা তিনজন হইলাম—আমি অক্ষয় (চৌধুরী), ও রবি। পরে জানকী বিলাত যাইবার সময় আমার ভগিনী এখনকার ভারতী সম্পাদিকা আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায় সাহিত্য চর্চ্চায় তাঁহাকেও আমাদের একজন সঙ্গীরূপে পাইলাম।"

ভারতী প্রকাশের ইতিহাস এইরূপ। একদিন জ্যোতিবাবু তাঁহার তেতালার ঘরে বসিয়া পূর্ব্বোক্ত দুইজনের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে সাহিত্যবিষয়ক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে হইবে। যেমন কথা অমনি কায। তৎক্ষণাৎ জ্যোতিবাবু দ্বিজেন্দ্রবাবুকে এ কথা জানানাইলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুও এ প্রস্তাবে মত দিলেন। এখন এ পত্রের নাম কি হইবে, এই সমস্যার সমাধানে সকলে যত্নবান্ হইলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু নাম বলিলেন "সুপ্রভাত" কিন্তু এ নাম জ্যোতিবাবুদের মনোনীত হইল না, কারণ ইহাতে যেন একটু স্পর্দ্ধার ভাব আছে, অর্থাৎ এতদিনে যেন বঙ্গসাহিত্যের সুপ্রভাত হইল। সুপ্রভাত নাম যখন গ্রাহ্য হইল না, তখন দ্বিজেন্দ্র বাবু আবার তাহার নাম রাখিলেন "ভারতী"।

সেই ভারতী আজও পর্য্যন্ত তাঁহার ভগিনীদেবীর যত্নে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের বাল্যস্মৃতি-রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "ভারতী" প্রকাশ উপলক্ষে আমাদের আর একজন বন্ধু লাভ হইল। ইনি কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। আগে তিনি বড়দাদার কাছে কখন কখনও আসিতেন কিন্তু আমার সঙ্গে তেমন আলাপ ছিল না। এখন "ভারতী"র জন্য লেখা আদায় করিতে আমরা প্রায়ই তাঁহার বাড়ী যাইতাম, তিনিও আমাদের বাড়ী ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত—একজন খাঁটি কবি। সর্ব্বদাই তিনি ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। একটা ডাবা হুঁকা টানিতে টানিতে তিনি আমাদের সঙ্গে গল্প করিতেন। যখন কোনও সাহিত্য আলোচনা হইত অথবা কোনও বিষয় চিন্তা করিতেন, তখন তামাক টানিতে টানিতে চক্ষু দুইটি বুজিয়া তিনি ভাবে ভোর হইয়া যাইতেন। আমাদের বাড়ী যখনই

আসিতেন তখনই তিনি আমায় বেহালা বাজাইতে বলিতেন। তন্ময় ভাবে বেহালা শুনিতেন।”

ভারতীর প্রথম বর্ষে ‘সম্পাদকের বৈঠকে’ “গল্পিকা” নামে একটা ভাগ ছিল। তাহাতে কেবল ব্যঙ্গকৌতুকের কথাই থাকিত। এইভাগে দ্বিজেন্দ্রবাবুই প্রায় সব লিখিতেন। জ্যোতিবাবু “উনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ বা রামিয়াড্” নামে কেবল একটা নক্সা লিখিয়াছিলেন। জ্যোতিবাবু তখন অনেক বিষয়েই লিখিতেন। প্রথম বর্ষের “ভারতী”তে রবিবাবু ও অক্ষয়বাবুর লেখাই বেশী প্রকাশিত হইয়াছিল। “ভারতী”তে রবিবাবুর “মেঘনাদবধ” কাব্যের সমালোচনা ও কবিতা প্রথম বাহির হয়। অক্ষয়বাবু তখন বঙ্গ-সাহিত্যের সমালোচনা এবং হৃদয়-ভাবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতেন, যেমন “মান ও অভিমানে কি প্রভেদ?” ইত্যাদি। লোকের এসব খুবই ভাল লাগিত।

ভারতীর দ্বিতীয় বর্ষ হইতে শ্রীমতী স্বর্ণ কুমারী দেবীর রচনায় পত্রিকার অনেক পৃষ্ঠা পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। ছিন্নমুকুল মালতী গাথা এবং পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি প্রবন্ধ ভারতী হইতে পুনর্মুদ্রিত।

অক্ষয়বাবুর কথায় জ্যোতিবাবু বলিলেন “অক্ষয় M. A. B. L. পাশ করিয়া Attorney হইয়াছিলেন। বিধাতার বিড়ম্বনা আর কি! তাঁহার মত শিশুর ন্যায় সরল, বিশ্বাসপ্রবণ, ভাবুক এবং আসল কবি মানুষ কি কখনও সংসারকার্য্যে উন্নতি লাভ করিতে পারে? তিনি Shakespear-এর বড় ভক্ত ছিলেন; বাড়ীর কয়েকটি ছেলেকে তিনি Shakespeare পড়াইতেন, কিন্তু পড়াইতে পড়াইতে নিজেরই চক্ষুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। তিনি যেখানে বসিতেন, সে জায়গাটা চুরুটের ভুক্তাবশেষ ছাই এবং দেশলাইয়ের কাঠিতে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। কোনও কল্পনা যদি কখনও তাঁহার মাথায় একবার ঢুকিত, তবে সেটা বাহির হওয়া বড়ই মুস্কিল হইত। তাঁহাকে অতি সহজেই April fool করা যাইত। একবার রবি গোঁপ দাড়ি পরিয়া একজন পার্শী সাজিয়া তাঁহাকে বড় ঠকাইয়াছিলেন। আমি বলিলাম—বোম্বাই হইতে একজন পার্শী ভদ্রলোক এসেছেন, তোমার সঙ্গে ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চান। অক্ষয় অমনি তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন। রবি ছদ্মবেশী পার্শী হইয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাহিত্যআলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই রবিকে তিনি কতবার দেখিয়াছেন, কণ্ঠস্বর তাঁর পরিচিত, কিন্তু ঐ যে পার্শী বলিয়া তাঁর ধারণা হইয়াছে সে ত শীঘ্র যাইবার নয়! অক্ষয় বাবু Byron, shelly প্রভৃতি আওড়াইয়া খুব গম্ভীর ভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপ চলিতেছিল, আমরা হাস্য সংবরণ আর করিতে পারি না, এমন সময় শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই তিনি “এ কে?—রবি?” বলিয়া রবির মাথায় যেমন এক থাপ্পড় মারিলেন, অমনি কৃত্রিম দাড়ি গোঁপ সব খসিয়া গেল! তখন অক্ষয়বাবু কিছুক্ষণ বিহ্বলনেত্রে চাহিয়া রহিলেন;

তখনও কল্পনার নেশাটা তাঁহার মাথা হইতে যেন সম্পূর্ণ ছুটে নাই!

আরও দুই একবার তাঁহাকে এপ্রিল ফুল করিবার মৎলব করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহার ঘরের চতুর মন্ত্রীটি সব ভণ্ডুল করিয়া দিতেন।"

"উদাসিনী" নামে একটি কবিতা তিনি প্রথম রচনা করেন। ইহা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার খুব প্রশংসাও তখন হইয়াছিল। তারপর "ভারত গাথা" নামে কবিতায় তিনি একখানি ইতিহাস লেখেন। ইহাতে আর্য্যদের ভারতে আগমন হইতে ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ই সংক্ষেপে কবিতায় বর্ণিত ছিল। এখানি তখন কোন কোনও বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক রূপেও নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। অক্ষয়বাবু বাঁয়া বাজাইতেও বড় ভালবাসিতেন। আসল যন্ত্রের অভাবে তিনি অনেক সময় টেবিলেই কায সারিয়া লইতেন। অনেক সময় জ্যোতিবাবু বেহালা বাজাইতেন, আর অক্ষয়বাবু বাঁয়ায় সঙ্গত করিতেন। অক্ষয়বাবু প্রেমের গানই বেশী রচনা করিয়াছিলেন, তাহার দুই একটি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সর্ফর্দা—মধ্যমান

নিতান্ত না রইতে পেরে
দেখিতে এলাম আপনি
দেখ আর না দেখ আমায়
দেখিব ও-মুখখানি।
মনে করি আসিব না
এ মুখ আর দেখাব না
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে
কেন যে তাহা নাহি জানি।
[illegible]সেছি দিব না ব্যথা
তুলিব না কোন কথা
সাধিব না, কাঁদিব না
রব অমনি।
যেথা আছ সেথাই থাক
আর কাছে যাব না কো
চোখের দেখা দেখ্‌ব শুধু
দেখেই যাব এখনি॥

বেহাগ—মধ্যমান্

কেনইবা ভুলিব তোমায়
কে ভোলে হৃদয়-ধনে।
শূন্য হৃদয় লয়ে
কি সুখ বাঁচিয়ে প্রাণে।
আশাতে নিরাশা বলে'
তোমারে কি যাব ভুলে
সে ত নয় রে ভাল বাসা
—সুখ আশা সংগোপনে।
রাখিব না সুখ-আশা
চাহিব না ভাল বাসা
ভাল বেসেই সুখী রব
মনে মনে।
প্রেমের প্রতিমা খানি
দলিত হৃদয়ে আনি
জীবন-অঞ্জলি দিয়ে
পূজিব অতি যতনে॥

এক সময় জ্যোতিবাবু পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতেন। জ্যোতিবাবুর দুই পার্শ্বে অক্ষয়বাবু ও

রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। জ্যোতিবাবু যেমন একটি সুর রচনা করিলেন অমনি ইঁহারা সেই সুরের ভাবের সঙ্গে কথা বসাইয়া গান রচনা করিতেন। একটি সুর তৈরি হওয়ার পর জ্যোতিবাবু আরও কয়েক বার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতেন। সে সময় অক্ষয়বাবু চক্ষু মুদিয়া বর্ম্মা সিগার টানিতে টানিতে মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন। পরে যখন তাঁহার নাক মুখ দিয়া অজস্র ভাবে ধূম প্রবাহ বহিত তখনি বুঝা যাইত যে এইবার তাঁহার মস্তিষ্কের ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি অমনি চুরুটের টুকরাটি পিয়ানোর উপরেই রাখিয়া দিয়া, হাঁফ্ ছাড়িয়া, "হয়েছে হয়েছে" বলিয়া লিখিতে সুরু করিয়া দিতেন। রবিবাবু কিন্তু বরাবর শান্তভাবেই রচনা করিতেন। অক্ষয় বাবুর যত শীঘ্র হইত, রবিবাবুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ

তেমন হইত না। সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুর সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু ইঁহাদের এক উল্টা পদ্ধতি ছিল। সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত।

স্বর্ণকুমারী দেবীও অনেকসময় তাঁহার সুরে গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য এবং সঙ্গীত চর্চ্চায় তাঁহাদের তেতালার মহলের আবহাওয়া তখন পূর্ণ হইয়া থাকিত। রবিবাবুর প্রথম গীতিনাট্য "কালমৃগয়া এবং পরবর্ত্তী গীতিনাট্য "বাল্মীকি প্রতিভা"তেও উক্তরূপে রচিত সুরের অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল।

একদিন জ্যোতিবাবুরা ষ্টীমারে চন্দন নগর যাইতেছিলেন। পথে খুব ঝড় জল তুফান আরম্ভ হইয়া সমস্ত ষ্টীমারকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইঁহাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। জ্যোতিবাবু সুর রচনা করিতেছিলেন ও অক্ষয়বাবু তার সঙ্গে গান বাঁধিতেছিলেন। ইঁহারা গান বাজনায় একবারে তন্ময় হইয়া ছিলেন। এই দিনকার রচিত গানগুলি হইতে শেষে "মানভঙ্গ" নামে একখানি গীতিনাট্য প্রস্তুত হইয়া গেল। "মানভঙ্গ" প্রথম জোড়াসাঁকো বাড়ীতে অভিনীত হয়, তার অনেক দিন পরে শেষে যখন "ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ" স্থাপিত হয়, তখন জ্যোতিবাবু এই "মানভঙ্গে"র আখ্যান বস্তু লইয়া পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে "পুনর্বসন্ত" নামে আর একখানি গীতিনাট্য প্রকাশ করেন। "পুনর্বসন্ত" সঙ্গীতসমাজে অনেকবার অভিনীত হইয়াছিল। লোকেরও এখানি খুব ভাল লাগিয়াছিল।

এই সময়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে জ্যোতিবাবুরা প্রতি বৎসর একটি "সম্মিলনী" আহ্বান করিতেন। উদ্দেশ্য—সাহিত্যসেবীদের মধ্যে যাহাতে পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয়। মহর্ষি যে চারিজন ছাত্রকে বেদ শিক্ষার জন্য কাশীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়, এই সম্মিলনের নামকরণ করিয়াছিলেন—"বিদ্বজ্জনসমাগম।" এ 'সমাগমে' তখন বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবীগণকে নিমন্ত্রণ করা হইত। এই উপলক্ষ্যে রচনা, কবিতাদি পঠিত হইত, গীত বাদ্যের আয়োজন থাকিত, নাট্যাভিনয় প্রদর্শিত হইত এবং শেষে সকলের একত্রে প্রীতিভোজ হইয়া শেষ হইত।

কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের সম্বন্ধে জ্যোতি বাবু এই মজার গল্পটি বলিলেন।

"রাজকৃষ্ণ বাবু যখন 'বিদ্বজ্জন সমাগমে' আসিতেন, তখন তিনি উদীয়মান্ কবি। সবে মাত্র সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে একবার আমি, গুণুদাদা, আমার এক ভগ্নীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ও আমাদের একজন আত্মীয় কেদার, এই কয়জনে পূজার সময় পশ্চিম বেড়াইতে যাইতেছিলাম। মধ্যে একটা কি ষ্টেশনে রোগা ময়লা-কাপড়-পরণে, খালি-পা' একটি ছোক্‌রা আসিয়া আমাদিগকে বলিল—আমি মামার বাড়ী যাইব, হাতে কিছুই পয়সা নাই, যদি অনুগ্রহ করিয়া

আমার ভাড়াটি আপনারা দিয়া দেন ত বড় উপকৃত হই। যদুবাবু বড় আমুদে লোক ছিলেন। তিনি তামাসা করিতে বড় ভাল বাসিতেন, তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি কবিতা টবিতা লিখিতে পার?" বালক বলিল, "হাঁ পারি।" যদুবাবু অধিকতর কৌতূহলী হইয়া রহস্যচ্ছলে আবার বলিলেন "তা বেশ বেশ, দেখ এই কেদার আমার প্রেয়সী তারার নিকট হইতে আমায় ছিনাইয়া লইয়া চলিতেছে,—আর এমনি করিয়া আমায় দুঃখ দিতেছে। তুমি এই বিষয়ে একটা কবিতা আমায় লিখিয়া দাও দেখি!" বালক তৎক্ষণাৎ একখানি চোতা কাগজে পেন্সিল দিয়া ফস্ ফস্ করিয়া একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তার প্রথম দুই ছত্র আমার এখনও মনে আছে

"কেদার দেদার দুখ দিলেন আমায়
তারা ধনে হারা করে' আনিয়া হেথায়।"

ইত্যাদি।

রাজকৃষ্ণ রায়

এই বালকই তথনকার উদীয়মান্ কবি রাজকৃষ্ণ রায়। আজ বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি—তাঁহার রচিত নাটক এখনও কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।"

ইঁহাদের বাড়ীতে "কাল-মৃগয়া" অভিনয়কালে রবিবাবু অন্ধ মুনি ও জ্যোতিবাবু দশরথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। "বাল্মীকি প্রতিভা"য় জ্যোতিবাবু কোনও পাঠ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার উপর সঙ্গীত ও কন্‌সার্টের ভার ছিল। অক্ষয় মজুমদার "বাল্মীকি প্রতিভা"য় ডাকাতের সর্দ্দার সাজিতেন। তাঁহার অভিনয়ভঙ্গীতে লোক হাসিয়া গড়াগড়ি যাইত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অক্ষয় বাবুর ন্যায় হাস্যরসের অভিনেতা তথন আর কেহই ছিল না। সকল অভিনয়েই Comic অংশ তিনি গ্রহণ করিতেন।

ইহার কিছু দিন পরে তদানীন্তন লাট সাহেবের পত্নী লেডী ল্যান্সডাউন (Lasndowne) ও অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও সাহেবদিগকে জোড়াসাঁকো বাড়ীতে "বাল্মীকি প্রতিভা" অভিনয় দর্শনে নিমন্ত্রণ করা হয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও (এখন স্যর) ছিলেন। রবিবাবু নিজে বাল্মীকি এবং বালিকা প্রতিভাদেবী (এখন মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী) সরস্বতী সাজিয়াছিলেন, ও বাড়ীর অন্যান্য বালিকারা বনদেবী সাজিয়াছিলেন। অভিনয় পারিপাট্যে ও গানে সকলেই প্রীত হইয়াছিলেন। ঝড় বৃষ্টির একটা দৃশ্য ছিল—সত্য সত্যই ঝর্ ঝর্ করিয়া যথন জলধারা পড়িতে লাগিল তথন অনেকের তাহা প্রকৃত বৃষ্টিধারা বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। লেডী ল্যান্স্‌ডাউন্ অভিনয় দর্শন করিতে করিতে অক্ষয় মজুমদারকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট একজন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "He is my man" এই কথা শুনিয়া অক্ষয় বাবু পরে মনে মনে খুব গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময় রহস্য করিয়া বলিতেন "লেডী ল্যান্সডাউন্ আমাকে my man বলিয়াছেন।"

প্রথম যথন তাঁহাদের বাড়ীতে বাল্মীকি-প্রতিভা" অভিনয় হয় তথন জ্যোতিবাবু নূতন শীকারী; বন্দুক চালনা, প্রভৃতিতে তথন তাঁর একান্ত ঝোঁক; অভিনয় উপলক্ষে তিনি নিজেই শীকার করিতে বাহির হইলেন, সত্যিকার একটা পাখী অভিনয়ে দেখাইবেন এই অভিপ্রায়। কিন্তু বিধাতার এমনি পরিহাস যে সারা দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু একটা পাখীও মারিতে পারিলেন না। শেষে সন্ধ্যার পর হতাশ হইয়া যথন বাড়ী ফিরিতেছিলেন তথন দেখিলেন যে এক ব্যক্তি কতকগুলি জীবন্ত বক্ লইয়া যাইতেছে। তাহার নিকট হইতে তিনি দুইটি বক ক্রয় করিয়া মারিয়া আনেন—তাহাই অভিনয়ে প্রদর্শিত হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত সকলেই জানে যে সেই ক্রৌঞ্চমিথুন জ্যোতিবাবু শীকার করিয়াই আনিয়াছিলেন।

জ্যোতিবাবুর এ সময়ে শীকারের ঝোঁকটা খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতি রবিবারে সদলবলে তিনি শীকারে

বাহির হইতেন। এই দলে মেট্রোপলিটান্ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্রজনাথ দে, রবীন্দ্রনাথ ও আরও অনেক লোক ছিলেন। বাটি হইতে প্রচুরপরিমাণ খাবার লইয়া ইঁহারা বহির্গত হইতেন। শীকারের জায়গা ছিল ধাপার মাঠ।

একদিন শীকার হইতে ফিরিতে ফিরিতে পথে একটা কাহার বাগানে দেখিতে পাইলেন বেশ সুন্দর সুন্দর ডাব রহিয়াছে—ডাব খাইতে হইবে। ব্রজবাবু বাগানে ঢুকিয়াই বলিলেন, "ওরে মালি, মামা কই?" মালি ভাবিল ইনি তবে বুঝি মালিকেরই ভাগিনেয়। সে বলিল, "তিনি ত' আসেন নাই।" তখন ব্রজবাবু তাহাকে কতকগুলি ডাব আনিতে বলিলেন। মালী শশব্যস্তে সে আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ পালন করিল।

বাঙ্গালীদের মধ্যে সৎসাহস বর্দ্ধিত করিবার জন্য জ্যোতিবাবু এই বন্দুক ছোঁড়া ও শীকারের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কবি অক্ষয়চন্দ্রকে কিন্তু কিছুতেই ইহার মধ্যে ভিড়াইতে পারেন নাই। একদিন জ্যোতিবাবু অক্ষয়বাবুকে ধরিয়া বলিলেন, তোমাকে বন্দুক ছুঁড়িতেই হইবে। অক্ষয়বাবু ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, তালু শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল; কিন্তু জ্যোতিবাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন—অক্ষয়বাবু প্রমাদ গণিলেন। কি করিবেন, উপায় নাই! শেষে তিনি চক্ষু বুজিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত দাঁড়াইলেন, আর জ্যোতি বাবু তাঁহার হাত ধরিয়া বন্দুকের ঘোড়াটি টিপাইলেন। অনেকের ভয় এমনি করিয়া ভাঙ্গিয়াছিল, অনেকে কিছু কিছু শিখিয়াও ছিল, কিন্তু অক্ষয় বাবুর ভয়ের আর ক্ষয় হইল না।

ক্রমশঃ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আধুনিক ভারতের সভ্যতা

(Mazeliereএর ফরাসী হইতে)

উপক্রমণিকা

এসিয়া ও ভারতের উপর য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব।

সংশ্লেষণ পদ্ধতির দ্বারাই বিশ্বমানবের ক্রমবিকাশ চলিতে থাকে। এই সংশ্লেষণক্রিয়া খুব সাধারণ ধরণের ও খুব জটিল। কতকগুলি পরিবারের সম্মিলনে গোত্র, গোত্র-সমূহের সম্মিলনে শাখাজাতি, শাখাজাতি-দিগের সম্মিলনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠিত হয়; এবং এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি ক্রমশ বড় বড় সাম্রাজ্যে বিলীন হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, সামরিক অভিযান ও বাণিজ্য-সম্বন্ধ হইতে কতকগুলি জাতি, সভ্যতার কতকগুলি প্রধান মূলসূত্র লাভ করিয়া থাকে। এইরূপে য়ুরোপীয় সভ্যতা, এসিয়িক-য়ুরোপীয় সভ্যতা,

সাধারণ সমস্ত সভ্যতাই, সমস্ত পৃথিবীময় অধুনা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যে সকল জাতি স্বকীয় ভৌগোলিক সংস্থানের প্রভাবে একটি সমগ্র রাষ্ট্র গড়িয়া তুলে, একতায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে অনেকগুলি যুগ অতিক্রম করিতে হয়। প্রথমে তাহারা একটি সাধারণ সভ্যতা লাভ করে, পরে মৈত্রীবন্ধনের দ্বারা, অথবা দিগ্বিজয় দ্বারা তাহারা একটি রাষ্ট্রজাতিতে (nation) পরিণত হয়। পরিশেষে, এই রাষ্ট্রজাতির মধ্যে মূলবংশঘটিত উপাদান ও বিচিত্র সামাজিক উপাদান-সকল উত্তরোত্তর সংমিশ্রিত হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে একটি রাষ্ট্রজাতি হইতে গেলে, প্রাদেশিক বাক্‌-রীতি, প্রথা, বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রকৃতি কাল সহকারে অন্তর্হিত হওয়া আবশ্যক; এবং তাহার স্থানে এক ভাষা, এক বিধিব্যবস্থা, এক জাতীয় চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। তখন আইন, সামাজিক শ্রেণীদিগের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য আর স্বীকার করিবে না, এবং রীতিনীতির মধ্যেও এই বৈষম্য ক্রমশ বিলুপ্ত হইবে। অতএব গণতন্ত্রের কেন্দ্রিকতা ভিন্ন কোন জাতি সম্যকরূপে এই একতা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু এই কেন্দ্রিকতা হইতে যে শাসনতন্ত্র উৎপন্ন হয় তাহা অতীব জটিল। প্রদেশগুলিতে নূতন কিছু আরম্ভ করিবার শক্তি থাকে না, কোন প্রকার মৌলিকতাও থাকে না, গ্রামপল্লী লোকশূন্য হইয়া, কতকগুলি বিশেষ কেন্দ্র কিম্বা একটি নাগরিক কেন্দ্র সেই সকল লোকের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। গণতন্ত্র হইতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য উৎপন্ন হয় এবং এই অপরিপক্ক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিণামে স্বদেশানুরাগ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, একস্বার্থমূলক জমাটভাবের অভাব হয়। দৈহিক গঠন-বিধানের ন্যায় সামাজিক গঠন-বিধানেও, উন্নতির একটা প্রথম যুগ পরিলক্ষিত হয়;—তাহার পর উন্নতির চরম যুগ, তাহার পর অবনতির যুগ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, তখনও ভারতবাসীদের সেই সভ্যতা ছিল যে-সভ্যতা তাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে, অশোকের সাম্রাজ্য হইতে, হিন্দুধর্ম্ম হইতে, এবং সংস্কৃত সাহিত্য হইতে, পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হয়। ইসলামধর্ম্মের প্রচারে, সামন্ততন্ত্রের সংস্থাপনে,—রাষ্ট্রজাতি সমূহ, ভাষাসমূহ ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায়সমূহ গঠিত হইয়াছিল। পরে এই সভ্যতার সম্পূর্ণ অবনতি হইল; কিন্তু মোগলসাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলেও, একতার ভাবটি রহিয়া গেল এবং বর্ণভেদ পদ্ধতির মূলবর্ণগুলি উপবিভাগে বিভক্ত হইয়া সামাজিক উপাদানগুলি যাহাতে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়, তাহার পথ প্রস্তুত করিল।

যাহাতে ভারতীয় সভ্যতা পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারে, স্বকীয় স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ অবাধে অনুসরণ করিতে পারে, তাহার জন্য উন্নতির ত্রিধারা আবশ্যক; ভৌমিক একতা লাভ; ক্রমশ বর্ণভেদের অন্তর্ধান; জরাজীর্ণ উপাদানগুলির বিলোপ-সাধন করিয়া, সবল সুস্থ উপাদানগুলিকে পরিপুষ্ট করিয়া, এবং কোন একটি নূতন মূলসূত্রের তত্ত্বের দ্বারা এই সকল বিচিত্র উপাদানকে

সংশ্লিষ্ট করিয়া সমগ্র ভারতের জন্য একটি সাধারণ সভ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

স্বয়ং ভারত এই কার্য্যটি সাধন করিতে অসমর্থ হইয়াছিল।

ভারতীয় কোন রাষ্ট্রজাতিই দীর্ঘকালের জন্য একাধিপত্য কখনই রক্ষা করিতে পারিত না।

একতা অর্জ্জন করিবার জন্য অনেক দেশের লোক, একই বংশের কতকগুলি লোকের প্রধান্য স্বীকার করিয়া থাকে; সেই সব লোক সভ্যতার হিসাবে নিকৃষ্ট হইলেও চরিত্রের হিসাবে অপেক্ষাকৃত সমুন্নত। এইরূপে গ্রীশ, ম্যাসিডোনিয়া কর্ত্তৃক বশীভূত হয়; ইতালী রোমকর্ত্তৃক বশীভূত হয়; জর্ম্মাণী প্রুসিয়া কর্ত্তৃক বশীভূত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে, মূলজাতিগত ভেদাভেদ বড়ই সুনির্দ্দিষ্ট, আবার মুসলমানের অধিষ্ঠান, এই সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। তা ছাড়া যাহারা সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই, সেই মরাঠারা সৈনিক ও দস্যু মাত্র ছিল, তাহাদের এমন কোন গুণ ছিল না যাহার বলে তাহারা বড় বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারে।

এমন কোন সামাজিক শ্রেণীও ছিল না যে ভারতে একটা মহাবিপ্লব আনয়ন করিতে পারে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী অন্তর্হিত হইয়াছিল, ইতরসাধারণ লোক ভূস্বত্বাধিকার-বর্জ্জিত কৃষিমজুরে পরিণত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণেরা বৈরভাবাপন্ন কতকগুলি উপবর্গে বিভক্ত হইয়াছিল; তা ছাড়া ব্রাহ্মণ-শাসনতন্ত্র তিরোহিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগের অবনতি হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই গুরুর আসন হইতে বিচ্যুত হইয়া সামান্য গৃহস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের আর শাসনকর্ত্তৃত্ব ছিল না। সামরিক শ্রেণীর মধ্যে—সকল বংশের, সকল *রাষ্ট্রের, সকল ধর্ম্মের লোকই ছিল।* তাহাদের বিভিন্ন মতিগতি, বিভিন্ন ব্যবসায়। তাহাদের মধ্যে রাজা ছিল, মনসবদার ছিল, রাজস্বের ইজারদার ছিল, সামান্য কৃষকও ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ বা অশ্বারোহী সৈনিক, কেহ বা দস্যু, কেহ বা আমীর ওমরাও। সকলেই স্বার্থপর, উন্নত-নীতিবর্জ্জিত, ভ্রষ্টচরিত্র এবং সকলেই দলে দলে বিভক্ত এবং সকলেই—কি অবজ্ঞাত বেণিয়া কি প্রপীড়িত রায়ৎ—উভয়েরই নিকট ঘৃণিত।

যাহাতে ভারতের একতার কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে তজ্জন্য ভারত কি কোন এসিয়িক রাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল? না, এই সকল রাষ্ট্র তখন অবনতিগ্রস্ত; পরে যেসকল প্রতিষ্ঠান ভারতের প্রকৃতির উপযোগী ঐ সকল প্রতিষ্ঠান, বরং সেই সকল রাষ্ট্র ভারতের নিকট হইতেই ধার করিয়াছিল। অতএব ভারতের ক্রমবিকাশের জন্য য়ুরোপীয় প্রভাবের বশবর্ত্তী হওয়া ভারতের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

(১)

ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত, এসিয়িক সভ্যতা ও য়ুরোপীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ কতকটা সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছিল। এই ক্রমবিকাশের মুখ্য অভিব্যক্তিগুলি এই:— সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী দেশসমূহে বড় বড়

রাষ্ট্রস্থাপন; মধ্য-এসিয়ার বর্ব্বরগণ কর্ত্তৃক এই সকল রাষ্ট্রের উচ্ছেদসাধন; বর্ব্বর জাতিসমূহ ও প্রাচীন জাতিসমূহের সম্মিলনে নূতন জাতির সংগঠন; সামন্ত তন্ত্র; কেন্দ্রীভূত বড় বড় রাজ্যের সংস্থাপন; তাহা হইতে আভ্যন্তরিক শান্তি, অপেক্ষাকৃত ন্যায়সঙ্গত বিধিব্যবস্থা, বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের পরিপুষ্টি।

তাছাড়া, ঐ উভয় সভ্যতার মধ্যেই, ঐতিহ্য ও প্রথানুবর্ত্তিতার প্রাদুর্ভাব ছিল। যে সকল গুণ অধুনা প্রাচ্য মানসপ্রকৃতির নিজস্ব বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার অধিকাংশই মধ্যযুগের অথবা পুরাকালের য়ুরোপীয়দিগের মধ্যেও পরিলক্ষিত হইত। এই গুণগুলি, তাবৎ মানবসমাজের ক্রম-বিকাশেরই একটা সাময়িক অবস্থা।

তাহার পর, আবার যদি, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এসিয়া য়ুরোপের মধ্যে তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখিবে এসিয়ার নিকৃষ্টতা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায় না।

আকবরের শাসনাধীনে ভারতের, Mangsদিগের শাসনাধীনে চীনের, To Kugovaদিগের শাসনাধীনে জাপানের একটা শাসনতন্ত্র ছিল, একটা রাজস্বসংগ্রহ পদ্ধতি ছিল, সৈন্যমণ্ডলী ছিল, রাস্তা ছিল, ডাকের ব্যবস্থাও ছিল; এবং এই রাস্তা ও ডাক য়ুরোপীয় রাষ্ট্রদিগের সমতুল্যই ছিল। য়ুরোপ অপেক্ষা ঐ সকল দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী কম ধনশালী ও কম শিক্ষিত ছিল সত্য; কিন্তু, ঐ সকল দেশের ইতরসাধারণের দুঃখ কষ্ট কম ছিল। সাহিত্য ও শিল্পের অনুশীলনে উহারা সাফল্য লাভ করিয়াছিল। সেই সঙ্গে বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল, শ্রমশিল্প পরিপুষ্ট হইয়াছিল, সামুদ্রিক প্রদেশ হইতে অভিযান হইত, উপনিবেশের বিস্তার হইত। (১)

সপ্তদশ শতাব্দীতে এই তুলনা এসিয়ার পক্ষে ততটা অনুকূল নহে। কিন্তু সে যাহাই হউক, এই দুই মহাদেশের সভ্যতার ক্রম-বিকাশ হইতে সদৃশ ফলই উৎপন্ন হইয়াছে।

শা-জাহান ও ঔরংজেব ভারতে, এবং য়েমিৎসু জাপানে, স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মঞ্চুদিগের বিজয়াভিযানে, চীনের স্বাভাবিক উন্নতি কিয়ৎকালের জন্য অবরুদ্ধ হইলেও ঔরংজেব ও য়েমিৎসুর রাজত্বের সহিত কাং-হীর রাজত্বের তুলনা হইতে পারে। এই সমস্ত রাষ্ট্র শক্তিশালী ও সুশাসিত ছিল। কিন্তু শিল্প ও সাহিত্যে অনুকরণের ভাব, শাসন কার্য্যে বাঁধা-নিয়মের অনুসরণপ্রবৃত্তি, আসন্ন অবনতি বিজ্ঞাপিত করিল। যদিও রাজকরের আদায়ের পরিমাণ বেশী হইল, কিন্তু দেশ সমৃদ্ধ হইল না, বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প অবসাদগ্রস্ত হইল। আর সে সামরিক খ্যাতি প্রতিপত্তি রহিল না; উপনিবেশের বিস্তারও রহিত হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বৈসদৃশ্য আরও বেশী করিয়া চখে পড়ে। ভারত অরাজ-কতার মধ্যে নিমগ্ন, জাপান বহির্জগৎ হইতে

(১) একটি মাত্র জাতির উপনিবেশ বিস্তার বাস্তবিকই কৌতুহলজনক। ষোড়শ শতাব্দীতে জাপানীরা শ্যামে ও ফর্মোজায় উপনিবেশ স্থাপন করে।

বিচ্ছিন্ন, চিরবর্দ্ধনশীল জনসংখ্যা সত্ত্বেও চীন আর তত সমৃদ্ধ নহে। যখন য়ুরোপ সমস্ত বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিতেছিল, তখন এসিয়ায় একজনও বৈজ্ঞানিক ছিল না। যে সময়ে য়ুরোপ—দর্শন, রাজ্যশাসন ও অর্থশাস্ত্রের সমস্ত সমস্যা নূতন করিয়া সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন এসিয়ার একটিও তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত, একটিও রাজনীতিকুশল রাষ্ট্রপরিচালক ছিল না। যে সময়ে য়ুরোপ অতীব সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, আধুনিক সমস্ত শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তখন এসিয়ার অতীব দৈন্যদশা, তখন সেখানে কোন ব্যবহারিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার হয় নাই।

* * *

যে দুই সভ্যতা, কত শতাব্দী ধরিয়া একত্র পাশাপাশি চলিয়াছিল, কি কারণে তাহারা হঠাৎ ভিন্ন পথ ধরিল?

সমন্তরালগামী উন্নতিরূপে প্রতীয়মান হইলেও, কতকগুলি দূরবর্ত্তী হেতু, হঠাৎ উন্নতি প্রতিরোধের আয়োজন করিল। এই সকল হেতু ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও এসিয়িক সভ্যতার ক্রমবিকাশের স্থূল রেখাগুলির পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। এক দিকে যেমন মধ্য-মালভূমির বিস্তীর্ণ মরুক্ষেত্র, এসিয়িক লোকসঙ্ঘের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনে ব্যাঘাত জন্মাইল, অন্য দিকে সেইরূপ ভূমধ্যসাগর,—দক্ষিণ য়ুরোপ, এসিয়া-মাইনর এবং আফ্রিকার উত্তরাংশের লোকদিগকে একত্র সম্মিলিত করিল। এই সকল লোক সকল জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল—ইহারা তিন মহাদেশের অধিবাসী; এবং এই তিন মহাদেশের মৃত্তিকার প্রকৃতি, ভৌগোলিক সংগঠন, আব-হওয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এসিয়া মাইনরের, গ্রীসের ও দক্ষিণ ইতালীর বিকর্ত্তিত উপকূল, স্বাধীন রাষ্ট্রজাতির গঠনের অনুকূল। তাই তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজস্ব শিল্পকলা, নিজস্ব রাষ্ট্রীক ও সামাজিক পদ্ধতি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জর্ম্মাণী ও রুশে আরও বিলম্বে সভ্যতা ও রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি সেখানকার বড় বড় নদী সহজেই অন্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। ভূমধ্যসাগর যেরূপ দক্ষিণের অধিবাসীদিগকে সম্মিলিত করিয়াছিল, সেইরূপ ইংলণ্ডের সমুদ্র-খাড়ী ও বলটিক্-সাগর উভয় প্রদেশের লোকদিগকে সম্মিলিত করিয়াছিল।

যেমনি একজাতি হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে, অমনি আর এক তরুণ জাতি আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এবং সেই তরুণ জাতি স্বকীয় বীর্য্য ও সরলতা হইতে পরিভ্রষ্ট না হইয়া, একটা প্রবল সভ্যতার অধিকারী হয়। তবে, তত্রত্য প্রাচীন জাতিরা এই নবীন জাতিদিগের অতিরিক্ত তেজ একটু সংযত করে, অথবা কমাইয়া দেয়। গল্, আইরিশ জর্ম্মাণ ইহারা সকলেই মিসরবাসীদিগের, আসিরীয়দিগের, হিব্রুদিগের, ফিনিসীয়দিগের, গ্রীকদিগের ও রোমকদিগের আবিষ্কারাদির কথা অবগত ছিল। শ্লাভ, হঙ্গারীয়, ফিনলণ্ডীয়,—ইহাদের এই সকল কথা জানিবার জন্য আরও কম প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। এইরূপে সমস্ত য়ুরোপ একই

সভ্যতার অধিকারী হইয়াছিল। এবং অন্য মনীষীরা, অন্য চরিত্রবান লোকেরা, সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া এই সভ্যতাকে ক্রমাগত নূতনভাবে নূতন আকারে গঠিত করিয়াছিল।

এই সম্মিলনের প্রথম পরিণাম ধর্ম্মের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। সমস্ত প্রাচীন ধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। গ্রীক্-নগরগুলির দেবতারা বিলীন হইয়া একমাত্র জিহোভায়, একমাত্র হীরায়, একমাত্র হিরাক্লিসে পরিণত হইল। এই সকল দেবতা, রোমকদিগের সহিত, পরে ইজিপ্সীয় ও প্রাচ্যখণ্ডের দেবতাদিগের সহিত একীভূত হইয়াছিল; পরে, সকল দেবতাই জুপিতর দেবের অধীনে আসিয়াছিল—আবার এই জুপিতরও ইজিপ্সীয়দিগের "আমন-রা-র মধ্যে বিলীন হইয়া যায়।

সেই সঙ্গে পৌরাণিক উপকথাগুলি, সাংকেতিক বিগ্রহে পরিণত হইল। চারিত্রনীতিও পরিশোধিত হইল। নিজ নিজ ক্রমবিকাশের পথ অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক দেশের লোকই অসভ্য অবস্থা হইতে বিমুক্ত হইল। মনুষ্য,—পিতা পুত্র, পতি বন্ধু ও পৌরজন প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা উচ্চতম আদর্শের ধারণা করিল। এবং বিভিন্ন দেশের অধিবাসীর সহিত বাণিজ্য চলিতে থাকায়, এমন একটা বিশ্বজনীন চরিত্র-নীতির উদ্ভব হইল, যাহাতে সকলেরই শ্রেষ্ঠগুণগুলি মিলিয়া মিলিয়া একটা সমন্বয় সাধন করিল। হিব্রুদিগের ঈশ্বরভক্তি ও সাম্য ভাব, রোমকদিগের রাষ্ট্রীক ও সামরিক গুণরাশি, ইজিপ্টের গুহ্য যোগধর্ম্ম, ভারতের তপশ্চর্য্যা, গ্রীক্‌দিগের দৈহিক ও নৈতিক সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম—এই সমস্ত একত্র মিশিল।

এইরূপে, একটা বিশ্বজনীন ধর্ম্মের সমন্বয়াত্মক রূপ গড়িয়া উঠিবার জন্য পথ প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই সমন্বয়ের মূলসূত্রগুলি গোড়ায় খৃষ্টধর্ম্মই প্রবর্ত্তিত করে। খৃষ্টধর্ম্মই স্বাধীন নির্ব্বাচনের শিক্ষা দিল। কোন প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র তৎপূর্ব্বে, অদৃষ্টবাদ একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই, ঈশ্বর খামখেয়ালিভাবে যাহা-তাহা করিতে পারেন —এই যে বিশ্বাস, ইহা কোন প্রাচীন ধর্ম্মই একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই। খৃষ্টধর্ম্মের যে নীতি তাহা প্রকৃতভাবে মানব-নীতি। কোন বিদ্বেষপূর্ণ ঈর্ষাপরায়ণ দেবতা মানুষকে পাপে প্রবৃত্ত করেন না, পরন্তু পাপের জন্য প্রথম-মনুষ্য নিজেই অপরাধী। এই বৈজিক পাপপ্রবণতা জয় করিবার জন্য একটা অতিপ্রাকৃতিক প্রসাদ (grace) লাভ করা আবশ্যক; কিন্তু এই প্রসাদ মানব দেহধারী ঈশ্বরপুত্র হইতেই মানুষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাছাড়া, কি গোড়ার পাপ, কি মুক্তিদাতার প্রসাদ—ইহার কোনটাই স্বাধীন নির্ব্বাচনের বিরোধী নহে। খৃষ্টধর্ম্মের নীতি প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিনিষ্ঠ নীতি ছিল। এই নীতি কুল-গত ধর্ম্ম ও স্বদেশীয় ধর্ম্মকে রহিত করিয়া দেয়। নিজের মুক্তিসাধনের জন্য মানুষ স্বকীয় সামাজিক কর্ত্তব্যসকল লঙ্ঘন করিতে পারে,—ইহাই এই নীতি মানুষকে শিক্ষা দেয়। (২)

(২) বৌদ্ধধর্ম্মও একটি ব্যক্তিনিষ্ঠ ধর্ম্ম, কিন্তু ইহা কেবল ভিক্ষুদের জন্যই।

এসিরার, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, কংচুস্-ধর্ম্ম, তাও-ধর্ম্ম, শিস্তো-ধর্ম্ম, জেন্দাবেস্তার ধর্ম্ম—এই সমস্ত স্বদেশনিষ্ঠ ধর্ম্ম—পৌরাণিক উপকথা ও কিংবদন্তী হইতে আপনাকে বিনির্ম্মুক্ত করিতে পারে নাই। প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার মধ্যে যে একটা যুঝাযুঝি অবিরাম চলিতে থাকে, উক্ত কোন ধর্ম্ম হইতেই এই যুঝাযুঝির ভাব উৎপন্ন হয় না—এবং এই যুঝাযুঝির ভাব হইতেই সুগভীর তত্ত্বকথা ও সুদৃঢ় সন্ধল্পের উদ্‌ভব হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও ইসলামধর্ম্ম এই দুই ধর্ম্মই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম, কিন্তু যে-অর্থে খৃষ্টধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক, ইহারা সে-অর্থে সার্ব্বভৌমিক নহে। খৃষ্টধর্ম্ম পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মসমূহের এই সার্ব্বভৌমত্বের বিশেষ-অর্থটি বিলুপ্ত করে এবং য়ুরোপ, এই অর্থের পরিবর্ত্তে এমন একটি অর্থ বসাইয়া দেয় যে, সেই ধর্ম্মগুলি অন্তর্হিত হইতে আর বেশী বিলম্ব হইল না। পক্ষান্তরে, যে ধর্ম্ম গোড়ায় হিন্দুধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, সেই বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুই রহিয়া গেল। এবং যে ধর্ম্ম আরবদেশে উৎপন্ন তাহা আরবই রহিয়া গেল।

বৌদ্ধধর্ম্ম, পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্ম-সমূহকে রূপান্তরিত করিলেও এবং তাহাদের দ্বারা নিজেও রূপান্তরিত হইলেও,—তাহাদিগকে বিনষ্ট করে নাই, কিংবা তাহাদের মধ্যে বিলীন হইয়া যায় নাই। সামরিকভাবাপন্ন ইসলাম—বিজয়ীদিগেরই ধর্ম্ম, কিন্তু বিজিত-দিগের ধর্ম্ম, ইস্‌লাম-প্রভাবের বশবর্ত্তী না হইয়াও বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং ইসলাম ধর্ম্মও আপনাকে অন্য ধর্ম্মের বেশী প্রভাবাধীনে আসিতে দেয় নাই।

ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধেও এই একই কথা। *বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল ভিক্ষুদিগকেই মুক্তির* আশ্বাস দেয়। বিধর্ম্মিদিগের প্রতি ইসলামের কোন দয়া নাই; তাহাদিগকে দীক্ষিত করিবার যে-একমাত্র উপায় ইসলামধর্ম্ম অবগত আছে—তাহা বাহুবল। উক্ত দুই ধর্ম্মই সার্ব্বভৌমিক নীতিউপদেশ প্রচার করিয়াছে বটে কিন্তু "স্বাধীন নির্ব্বাচন"-রূপ কোন ফলগর্ভ মতবাদ স্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ করে নাই। ইসলাম অদৃষ্টবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং বৌদ্ধধর্ম্ম যোনিভ্রমণের মতবাদটি বজায় রাখিয়াছে। শিক্ষাসম্বন্ধে উক্ত তিন ধর্ম্মের মূল্য উপলব্ধি করিতে হইলে, কার্য্যতঃ উহারা কি করিয়া থাকে তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। মুসলমানেরা বলে :—

"কি মুক্তি, কি নরকভোগ,—ইহার জন্য মানুষের অদৃষ্ট ঈশ্বরকর্ত্তৃক পূর্ব্বহইতেই নির্দ্দিষ্ট। যেহেতু ইসলামই মুক্তির একমাত্র নিশ্চিত প্রতিভূ, অতএব তৎবর্জ্জনই স্বর্গলাভের একমাত্র অন্তরায়।" বৌদ্ধেরা বলে :—পূর্ব্ববর্ত্তী অসংখ্য জন্মের পরিণামস্বরূপ আমার এই যে বর্ত্তমান জন্ম, এই জন্ম হইতে আরও অসংখ্য জন্মের উৎপত্তি হইবে। অবশ্য, মুক্তিলাভের জন্য আমার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এই চেষ্টার পরিণাম কি হইবে? অসংখ্য জন্মের পর (এবং প্রত্যেক জন্মেই, মুহূর্ত্তের পদস্খলনে সমস্ত চেষ্টা বিফল হইবে) হয়ত নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করা যাইবে।" পক্ষান্তরে খৃষ্টানেরা বলেন :—"এই কার্য্য" আমি করিতেও পারি, না করিতেও পারি—এই বিষয়ে

আমার স্বাধীন কর্তৃত্ব আছে। এই কার্য্য করিয়া আমি মৃত্যুর কবলেও পতিত হইতে পারি। ধার্ম্মিকের জন্য অনন্ত স্বর্গ, পাপীর জন্য অনন্ত নরক।" যাহারা এই প্রকার মতবাদ অবলম্বন করে, সেই য়ুরোপীয়দের চরিত্র এসিয়িকদিগের চরিত্র অপেক্ষা কম পাপাসক্ত,—এই মতবাদ (৩) য়ুরোপীয়দিগের চরিত্রকে ধর্ম্মপথে আরও দৃঢ় রাখিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম, মূলে সার্ব্বভৌমিক হওয়ায়, উহার ক্রমবিকাশেও খৃষ্টধর্ম্ম এই তত্ত্বটিকে স্থির রাখিয়াছে। অবশ্য, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য খ্রীষ্ট সমাজের মধ্যে শীঘ্রই একটা পার্থক্য আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তথাপি সমস্ত খ্রীষ্টান মণ্ডলী, আপনাদিগকে একস্বার্থাধীন বলিয়াই বিবেচনা করিত। মধ্যযুগে পোপতন্ত্র য়ুরোপের নৈতিক একতা রক্ষা করিয়াছিল। এমন কি প্রসিদ্ধ "খৃষ্টধর্ম্মসংস্কার," এক রাজ্যের প্রজাদিগের মধ্যে ভেদ প্রবর্ত্তিত করিলেও সেই সঙ্গে, শত্রুরাজ্যের প্রজাদিগকে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল, বিভিন্ন য়ুরোপীয় দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে নৈকট্য স্থাপনের পক্ষে সাহায্য করিয়াছিল।

পক্ষান্তরে, য়ুরোপের, ইজিপ্টের, পূর্ব্ববর্ত্তী এসিয়ার সমস্ত ধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবে বিলুপ্ত হইল; ঐ সকল অঞ্চলে, যে সকল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—তৎসমস্তই রোমক-সাম্রাজ্যে পর্য্যবসিত হইল; বিভিন্ন দেশের স্বতন্ত্র শাসনপদ্ধতি,—রোমকশাসন তন্ত্রের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। উহার অনেকগুলি শাসন-নীতি এসিয়া ও য়ুরোপের যুগল সভ্যতায় অন্তর্ভূত; এইরূপে কেন্দ্রগত অনিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্র প্রথম ইজিপ্টে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, উহাই পারসীকেরা প্রণালীবদ্ধ করে এবং পরে গ্রীক ও রোমকদিগের নিকট সংক্রামিত হয়। কিন্তু য়ুরোপীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে যে তত্ত্বটী সর্ব্বাপেক্ষা ফলগর্ভ, তাহা এসিয়ার কোথাও ছিল না। সেটি (city) পৌরতন্ত্র। এই পৌরতন্ত্র গোড়ায় গ্রীস ও ইতালীতে উৎপন্ন হয়, এবং অনেক পরে উহা গল ও জর্ম্মান দেশসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌর শাসনের ভিত্তিমূলে আমরা পারিবারিক গঠনব্যবস্থা দেখিতে পাই। কিন্তু তথাপি, যেহেতু পিতৃশাসনতন্ত্রই এসিয়িকদিগের নিজস্ব শাসনপদ্ধতি এবং এসিয়ার বড় বড় নগর, পৌরতন্ত্র কস্মিনকালেও অবগত ছিল না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, য়ুরোপীয় কৌলিক ক্রমবিকাশের উপর বিদেশীয় শাসননীতির প্রভাব মুদ্রিত হওয়ায়, এই কৌলিক ক্রমবিকাশের গতি একটা বিশেষ দিক্‌ লইয়াছিল। এই সকল তত্ত্বগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ব—ভূস্বত্বাধিকার। কেবল গ্রীক ও ল্যাটিন লোকদিগেরই এই বিষয় সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। কেননা, তাহাদের উজ্জ্বল বুদ্ধি ছিল ও রূপপ্রদায়িনী কল্পনা ছিল; এই গুণই তাহাদিকে পৌত্তলিক করিয়া তুলিয়াছিল। ভূস্বত্বাধিকার মানুষকে ভূমির প্রতি আসক্ত করে। আপন জমির মালিক,—ক্ষুদ্রতম ভূম্যধিকারীও অধীন প্রজা নহে--সে একজন স্বাধীন নাগরিক (citizen) বলিয়া পরিগণিত।

ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করিবার জন্য, যুদ্ধ ও

(৩) কি-ধর্ম্মান্ধতা।—শ্রীজ্যো—

শান্তির কথা স্থির করিবার জন্য পৌরজনেরা একত্র সম্মিলিত হয়। রাজস্ব-বিভাগ ও পূর্ত্তবিভাগের কর্ম্মচারিগণ, বিচারপতি, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, সচিব প্রভৃতি এই পৌরজনমণ্ডলী হইতেই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এবং যখন রোম একটা সাম্রাজ্য জয় করিয়াছিল, এই নির্ব্বাচিত পৌরজনেরাই তখন ঐতিহাসিক রাজবংশ সমূহের রাজ্য শাসন করিত। এই সকল ব্যবস্থাপদ্ধতিই য়ুরোপীয়দিগের চরিত্র গঠন করিয়াছিল। এসিরিকদিগের কিংবা মান্দারিনদিগের ব্যবস্থাপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। তাহা স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের অনুকূল।(৪)

মনে হইতে পারে, বর্ব্বরদিগের আক্রমণে বুঝি সমস্ত প্রাচীন সমাজই বিধ্বস্ত হইয়াছে। কিন্তু সে যাহাই হউক, এই সমাজের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলি রহিয়া গিয়াছে। যেমন এক দিকে বৈজেনসিয়া ও প্রাচ্যখণ্ড,—রোমের প্রথাদি অনুসরণ করিতে ক্ষান্ত হইল না; অপর দিকে, গথ্, লম্বার্ড, ও মেরোভিজিয়েনেরা, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা করিতে লাগিল। charlemagne এই সাম্রাজ্য স্থাপনে সফল হইলেন। তাঁহার পরেও, জার্ম্মান সম্রাটগণ, অষ্ট্রীয়ার রাজবংশ, চতুর্দ্দশ লুই, নেপোলিয়ান, তাঁহার পদানুসরণ করিলেন। এই সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য-কল্পনার বিরুদ্ধে—ষোড়শ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় শক্তি-সামঞ্জস্যের কল্পনা আসিয়া খাড়া হইল। ইহা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য কল্পনার একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপমাত্র; কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিকদিগের নীতিকৌশল,—য়ুরোপের বিজয়লব্ধ একতার স্থলে, মৈত্রীবদ্ধ য়ুরোপের বাস্তব একতা স্থাপনে সমুৎসুক হইল। এমন কি, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রোমক ঐতিহ্যও আবার দেখা দিল। রোমক ব্যবস্থাভিজ্ঞ ব্যবস্থাপকেরা আধুনিক রাষ্ট্রগঠনে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন এরূপ আর কেহ করে নাই।

ভূস্বত্বভোগের নিয়মটি পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। তাহার সহিত আশ্রয়-আশ্রিতের নীতিটি মিশিয়া সামন্ততন্ত্রের সৃষ্টি করিল। এই সামন্ততন্ত্র য়ুরোপীয় চরিত্রে আর একটি নূতন গুণ সংযোজিত করিল—সেটি আত্মসম্মানবোধ। গ্রীশীয় city-র ভাব বজায় রাখিয়া এবং তাহার সহিত জার্ম্মান প্রতিষ্ঠানাদি সম্মিলিত করিয়া, এই সামন্ততন্ত্রের মূলনীতিই মধ্যযুগের সাধারণ-মণ্ডলীর (commune) সৃষ্টি করিল। পৌর-স্বায়ত্ত-তন্ত্র ও পঞ্চায়ৎতন্ত্রই য়ুরোপীয় মধ্যপদবী পৌর-জনশ্রেণীগঠনে সাহায্য করিয়াছিল। এই পৌর জন-শ্রেণীকে ("বুর্জোয়া") বাদ দিলে,--দোকানদারও থাকে না, শ্রমশিল্পীও থাকে না, মহাজন কুঠিওয়ালাও থাকে না, চিকিৎসকও থাকে না, বৈজ্ঞানিকও থাকে না, কারিগরও থাকে না, সাহিত্যিকও থাকে না।

এসিয়ার লোকের মধ্যে এমন কোন

(৪) কোন কোন গ্রন্থকারের মতে, হিন্দুদিগের পৌরতন্ত্র সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি গ্রীক—রোমক পৌরতন্ত্রের অনুরূপ। সে যাহাই হউক, ভারতের এই পৌরতন্ত্র কখনই রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি হইয়া দাঁড়ায় নাই। মানব সভ্যতা একই জিনিস, কিন্তু তাহার ক্রমবিকাশের গতি অদৃষ্টাধীন; বিভিন্ন দেশে এই সভ্যতা বিশেষ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গ্রীস ও রোমে পিতৃকুলতন্ত্রের বিকাশ-পরিণাম—পৌরতন্ত্র; এবং ভারতে উহার বিকাশ-পরিণাম—বর্ণভেদ প্রণালী।

রাষ্ট্রীয় মতবাদ নাই যাহা সকলেরই মধ্যে সাধারণ। অশোকের শাসনকালে, ও মুসলমান রাজবংশের শাসনকালে, পারসীকদিগের *প্রথাদি ভারতের উপর প্রভাব বিস্তার* করিলেও, ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানাদির সংগঠনে চীনের হাত প্রায় কিছুই ছিল না, এবং চীনের প্রতিষ্ঠানাদির সংগঠনে ভারতেরও কোন হাত ছিল না। ভূস্বত্বের নিয়মটা এসিয়া কোনকালেই স্পষ্টরূপে বুঝে নাই। জাপান ও রাজপুতনার বাহিরে, সামন্ততন্ত্র কোথাও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহাদের নিকট "City" অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং য়ুরোপের নাগরিক শ্রেণীও ছিল না, মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ছিল না। তাহা হইতেই প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানাদির বিকাশ স্থগিত হইয়া গিয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসনাধিকারের অসদ্ভাব ঘটিয়াছে।

যাতায়াতের সুবিধা, ধর্ম্মের একতা, রোমীয় কিংবদন্তী এই সমস্ত—এসিয়ার সভ্যতা অপেক্ষা য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে অধিকতর গভীরতা ও সমজাতীয়তা আনিয়াছিল। ভারতের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশ, চীনীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ হইতে স্বতন্ত্র, এবং এসিয়ায় বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে একই প্রকার সাহিত্যিক ঐতিহ্য পরিলক্ষিত হয় না।

পক্ষান্তরে, কোন বিজ্ঞানকে বা দর্শনকে,—ইংরাজি, জার্ম্মান বা ফরাসী দর্শন বিজ্ঞান বলা চলে না, সমস্তকেই য়ুরোপীয় বিজ্ঞান বা দর্শন বলিতে হয়। যে সকল তত্ত্ববীজ গ্রীস রোপণ করিয়া গিয়াছিল,—আলেকজান্দ্রিয়ায়, রোমে, বৈজন্-শিয়ায় তাহাই অঙ্কুরিত ও বিকসিত হইয়াছে। ঐ সকল বীজ আরবেরা ফ্রান্স ও ইতালীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংক্রামিত করিয়াছিল। প্রাচীন ও রোমের বিদ্যা অনুশীলন করিয়া, *বেকন্ ও দেকার্ত্ত নূতন দর্শনের সৃষ্টি করিলেন*; এবং ইহুদী-ওলন্দাজ স্পিনোজা, ও জর্ম্মন লাইবনিজ—ইহাঁরাই দেকার্ত্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র; আবার ইংরাজদিগের মতবাদগুলা—একদিকে ফরাসী কন্দিয়াকের ঐন্দ্রিয়িক দর্শনে পর্য্যবসিত হইল, অপরদিকে জর্ম্মান কান্ত ও সোপেনহেয়রের অতীন্দ্রিয় দর্শনে পর্য্যবসিত হইল। এই প্রকার বিজ্ঞানেও। কেপলার, গালিলিও, নিউটন্, প্যাসকাল, লাপলাষ, লাভোয়াসিয়ে ফ্যারাডে, ডার্ব্বিন, হেলম্‌হোল্‌জ—এই সকল বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোক—বিজ্ঞানের কার্য্য অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিল—সম্পূর্ণ করিতে লাগিল। সাহিত্যেও এই প্রকার। ষোড়শ শতাব্দীতে ইটালী, পরে স্পেন্ সাহিত্যে একটা নূতন সুর প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল; কিন্তু সকল দেশেই সেই একই প্রকার বাগ্মিতার অগ্নি-উচ্ছ্বাস, সেই একই প্রকার কাব্যসুলভ কৃত্রিম রীতি-রুচি। সপ্তদশ শতাব্দীতে, ফ্রান্স, ক্লাসিক রীতি স্থাপন করিল। এমন কেহ ছিল না যে তাহার অনুকরণ করিত না; ইংলণ্ডের সাহিত্য-গুরুগণ যে সকল গুণের প্রশংসা করিতেন, ফরাসী সাহিত্য-গুরুগণও সেই সকল গুণের প্রশংসা করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমস্ত য়ুরোপই ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া উঠিল, কৃত্রিম হইয়া উঠিল—পরে দার্শনিক, তাহার পর ভাবুকতাপ্রবণ, অবশেষে বৈপ্লবিক হইয়া উঠিল। উনবিংশতি শতাব্দীতে, এক সময়েই

সর্ব্বত্র দেশে ঔপন্যাসিকতা, উদারতা, ও স্বাতা-বিকতার আবির্ভাব হইল। রুসো, ম্যাক্‌ফর্সন ও গস্তের সহিত পরিচিত না হইলে, কেমন করিয়া শাতোব্রিয়াঁকে বুঝিবে? বায়রণের রচনাবলী ব্যতীত, পুচকিন্‌ ও লের্‌মন্টের রচনা কি হৃদয়ঙ্গম করা যায়?

* * *

কেবল ষোড়শ শতাব্দীর পরে, য়ুরোপীয় ও এসিয়িক চরিত্রের এই বৈসদৃশ্য কেন স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

ক্রমশঃ সাধারণ উন্নতির বৃদ্ধি হইতে থাকিলে তাহার পরেই সভ্যতার ক্রমবিকাশ আরম্ভ হয়।

ফলতঃ, যাহারা এই সভ্যতার বশ্যতা স্বীকার না করে তাহারা জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারে না—তাহারা ক্রমশ বিলোপ প্রাপ্ত হয়। যাহারা আপনাদিগকে এই সভ্যতার উপযোগী করিয়া লয়, অভ্যাসের দ্বারা ঐদিকে তাহাদের প্রবৃত্তি ও রুচিও বলবতী হইয়া উঠে। এইরূপেই ধীরে ধীরে জাতিবিশেষের মন ও প্রকৃতি গড়িয়া উঠে। তখন ঐ সকল জাতির লোক যাহা উৎপাদন করা আবশ্যক তাহা শীঘ্রই উৎপাদন করে। কোন সাহিত্যিক ভাষার পুষ্টিসাধনে যতটা সময় লাগে, কোন' 'ভাষা'কে সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত করিতে আরও অধিক সময় লাগে। এবং বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বগুলির কার্য্যফল নির্ণয় করিবার জন্য বুদ্ধিশক্তির যতটা প্রযত্ন আবশ্যক, ঐ প্রাথমিক তত্ত্বগুলি নির্ণয় করিবার জন্য তদপেক্ষা আরও অধিক প্রযত্ন আবশ্যক।

ষোড়শ শতাব্দীতেই, য়ুরোপীয় চরিত্র দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। প্রথমে হৃদয়ভাবের তীব্রতা হইতে এই দৃঢ়তা উৎপন্ন হয়। এই তীব্রতাই য়ুরোপীয় চরিত্রকে এসিয়াবাসীর চরিত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিয়া তুলে। আক্‌বর ও jeyasu দুজনেই প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রপরিচালক, কিন্তু machiavel-এর লেখায়, William of Orange-এর কার্য্যে, যেরূপ যথার্থতা এবং সঙ্কল্পের নিশ্চিততা লক্ষিত হয়, সেরূপ উক্ত দুই-জনের চরিত্রে লক্ষিত হয় না। পোর্টুগী নবদেশান্বেষীদিগের সহিত তুর্ক পোতাধ্যক্ষ ও জাপানী নবদেশান্বেষীদিগের তুলনা করা যাইতে পারে। উহাদের মধ্যে কেহই দুঃসাহস ও প্রতিভায়, কলম্বসের সমকক্ষ নহে। যদিও আবুল-ফজলের মতামত কতকটা geordano brunoকে স্মরণ করাইয়া দেয়, যদিও তাঁহার মানসিক বহুদিকদর্শিতা কতকটা montaigne এর সমতুল্য,—কিন্তু কোন এসিয়িক গ্রন্থকার সেক্‌সপিয়ারের মত' মানব-হৃদয় কি অবগত ছিল? মোগল ও শোগুনদিগের গৃহ-সন্নিবেশকেরা, (architect) চীন ও জাপানের চিত্রকরেরা, বেশ নিপুণ ওস্তাদ বটে—তাহাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও শ্রমশীলতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু উহাদের মধ্যে কেহ কি র‍্যাফেলের ভাবব্যঞ্জকতা ও মাইকেল আঞ্জেলোর দুঃখময় গভীর দৃশ্য সমূহের ধারণা পর্য্যন্ত করিতে পারিত—রচনা ত দূরের কথা।

ধর্ম্মে, এসিরিক ও য়ুরোপীয় মর্ম্ম-ভাবের বৈসদৃশ্য আরও বেশী। জাপানে, চীনদেশে,—সংশয়বাদ। হিন্দুদের মধ্যে যোগবাদী কতকগুলি ধর্ম্মসংস্কারের আবির্ভাব দেখা যায়। একে ত হিন্দুরা ইচ্ছাশক্তিবিবর্জ্জিত, তাহাতে আবার ঐ সকল মতবাদ উহাদিগকে আরও নির্ব্বীর্য্য করিয়া তুলিয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যে সুফীরা নিশ্চেষ্টতাবাদের অনুরাগী, সুন্নি-সম্প্রদায় অত্যন্ত গোঁড়া, ইসমাএল সম্প্রদায় পৌত্তলিক। কেবল "মিলেনিয়ম-" বাদী মুসলমানদিগের প্রকৃত ধর্ম্মোৎসাহ আছে, কিন্তু এই উৎসাহ হইতে অদৃষ্টবাদ উৎপন্ন হইয়াছে। য়ুরোপে,—ধর্ম্মোৎসাহ হইতে, মত বিশ্বাসের দৃঢ়তা হইতে, ধর্ম্ম-সংস্কারের সংগ্রাম উৎপন্ন হইল। একটা নিজের মতামত পোষণ করিতে মানুষ বাধ্য হইল। ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে মতামত:—যথা, জলসেচন-দীক্ষা, খৃষ্টরক্তমাংস-আত্মসাৎকরণ দীক্ষা, পদনিয়োগ-দীক্ষা, বিশপ-শাসন, পোপের একাধিপত্য তুমি স্বীকার কর, না অস্বীকার কর? রাষ্ট্রীয়জনের (citizen) কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মতামত:—যে রাজা "খৃষ্টপ্রসাদ" হইতে বঞ্চিত, সে রাজার আদেশ পালন করা উচিত কি না? পিতা, পুত্র পতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মতামত:—ব্যভিচারিণী ও বন্ধ্যা পত্নীকে তুমি ত্যাগ করিতে পার কি না?—পুরোহিত বিবাহ করিতে পারে কি না?—তাহার বিবাহ করা উচিত কি না? এবং এই-মতামত অনুসারে কার্য্য করিলে হয়ত ইহ লোকেই তুমি কষ্ট পাইবে—তুমি বলিস্থানীয় হইবে, হয়ত পরলোকে অনন্ত নরক ভোগ করিবে। মধ্যযুগের মতবিশ্বাস, সামন্ততন্ত্র, অনিয়ন্ত্রিত রাজার একাধিপত্য, যে মানুষকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, সেই মানুষ নরকের ভয় ব্যতীত, প্রথম রাষ্ট্রবিপ্লব সেই ইংলণ্ডীয় রাষ্ট্রবিপ্লব কি ঘটাইতে পারিত? বৈজ্ঞানিক মর্ম্মভাব:—কেবল ব্যাপ্তিগ্রহের দ্বারা (induction) পরীক্ষা পদ্ধতির নিয়মাবলী স্থাপিত হয়; ব্যাপ্তি-গ্রহ—অর্থাৎ কোন অচিন্তিতপূর্ব্ব তত্ত্বের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য সর্ব্বজনগৃহীত মত অস্বীকার করিবার দুঃসাহস; এবং পরীক্ষা পদ্ধতি—অর্থাৎ ঘটনা সকলের ধৈর্য্যসহকৃত যথাযথ পর্য্যবেক্ষণ। দেকার্ত্ত, সমস্ত মত বিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করিয়া, "অলিখিত পূর্ব্ব সাদা কাগজের" উপর স্বীয় দার্শনিক গবেষণা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহা নিঃসন্দেহ যে, ভারতবাসীদের দার্শনিক চিন্তা দেকার্ত্ত অপেক্ষা অধিকতর মৌলিক ছিল; তাহাদের কল্পনা অন্যপ্রকারে নির্ভীক ছিল, কিন্তু তাহাদের চরিত্র সেরূপ ছিল না; এবং তাহাদের যে সকল চিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাহসী, তাহা ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর দেকার্ত্তের "সাদা" কাগজে কেবলি প্রত্যাহার প্রক্রিয়া, সামান্যীকরণ ও বিশ্লেষণ। কোন প্রকার সাদৃশ্য বা প্রতিবিম্বের দ্বারা চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে না দিয়া, প্রথমে একটি বিষয়ের উপর, তাহার পর আর একটি বিষয়ের উপর সমস্ত মনকে নিবিষ্ট করিবার শক্তি তাঁহার ছিল। অতএব বৈজ্ঞানিক মনোভাবটি—বিশেষরূপে চরিত্রেরই পরিণাম ফল। কয়েক বৎসর হইল, একজন জাপানী গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন,—"জাপানী

দের রীতিমত বিজ্ঞান যে ছিল না, অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র তাহার কারণ নহে, স্মৃতিশক্তির অভাবও তাহার কারণ নহে, পরন্তু বিচারের অসামর্থ্যই তাহার হেতু।”

শ্রমশিল্পের উন্নতি, বাণিজ্যের উন্নতি —বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহিত অনুস্যূত। অভিযানের জন্য, উপনিবেশবিস্তারের জন্য, ব্যাঙ্কের জন্য, বড় বড় শ্রমশিল্পের জন্য, কাজের লোক হওয়া আবশ্যক; এবং ঐ সমস্ত ব্যাপার কাজের লোককে আরও বেশী কাজের লোক করিয়া তুলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে বৈজ্ঞানিক মনোগতি, শ্রমশিল্পঘটিত মনোগতির সহিত মিলিত হইয়া জটিল যন্ত্রজালের সৃষ্টি করিল। এই সকল যন্ত্রের আরও উৎকর্ষবিধান করিবার জন্য, উহাদের পরিচালনার জন্য, উহাদের সংরক্ষণের জন্য অবিরাম মনোযোগ আবশ্যক। তাই, দৈহিক শ্রম যতই কষ্টকর হউক না, তাহা অপেক্ষা এই মানসিক শ্রম, শ্রমশিল্পীকে আরও বেশী অবসন্ন করিয়া ফেলে। এসিয়িক বরাবর শিশুই রহিয়া গিয়াছে, এরূপ উদ্যমের কার্য্যে সে অসমর্থ; চীনের লোক ও য়্যানাম দেশের লোক "এন্‌জিন’ চালাইতে পারে না। (৫)

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে, এসিয়ার ন্যায় য়ুরোপেও অল্প লোকই প্রকৃতরূপে সভ্য ছিল। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে—জটিলতর সভ্যতার প্রয়োজনে, বহুসংখ্যক লোকের সম্মিলন আবশ্যক হইল। সুশিক্ষিত লোক ভিন্ন--ব্যাঙ্ক, উপনিবেশ-কোম্পানী, নূতন ব্যবসায়াদির বিষয় কেহই বুঝিতে পারিত না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, উনবিংশ শতাব্দীতে, যন্ত্রাদির ব্যবহারপ্রয়োগের প্রয়োজনে, সমস্ত শ্রমজীবিদিগকে, পরে সমস্ত কৃষকদিগকে শিক্ষিত করা আবশ্যক হইল। এবং এইরূপে কালক্রমে লোকের ক্রমশঃ ধনবৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং এই ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের অভাবও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, জ্ঞানশিক্ষার স্পৃহাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

শিক্ষিত হইয়া, কৃতবিদ্য হইয়া, সৈনিক-কার্য্য স্বীকার করিয়া, লোকেরা স্বায়ত্ত শাসনের যোগ্যতা লাভ করিল। বাধ্যতা-মূলক শিক্ষার বিস্তার হইলে, গণতন্ত্র ভিন্ন আর কোনও শাসনতন্ত্র সম্ভব হয় না।

কিন্তু গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় একতা, সামাজিক একতা, মতবিশ্বাসের স্বাধীনতা, সমস্ত প্রাচীন স্মৃতির বিলোপ, স্ত্রীস্বাধীনতা, অত্যাচার হইতে শিশুর মুক্তি—এই সমস্ত আসিয়া পড়ে।

আমাদের মূলতত্ত্বসমূহ হইতে যে সকল কার্য্যফল প্রসূত হয়, অনেক সময় প্রাচ্যদেশ-বাসীরা সেই কার্য্যফলগুলা ধরিতে পারিয়াছে দেখা যায়,—যদিও তাহারা বাস্তব-জীবনের প্রয়োজনের দ্বারা তাহা পরিশোধিত করিয়া লইতে পারে নাই।

য়ুরোপীয়েরা যে স্বাধীনতা-তত্ত্বের পক্ষপাতী একজন জাপানী অভিনেতা সেই তত্ত্বটির এইরূপ মর্ম্মগ্রহ করিয়াছে :—

“যে স্বাধীনতা পিতা সম্ভোগ করে, পিতার ন্যায় পুত্রও সেই স্বাধীনতা সম্ভোগ করে। যে স্বাধীনতা প্রভু সম্ভোগ করে,

(৫) হিন্দুরা আজকাল কোন কোন কল চালাইতেছে—উহারা বাষ্পপোতও চালাইয়া থাকে।

প্রভুর ন্যায় ভৃত্যও সেই স্বাধীনতা সম্ভোগ করে। যে স্বাধীনতা পতি সম্ভোগ করে, পতির ন্যায় পত্নীও সেই স্বাধীনতা সম্ভোগ করে। সকলেরই স্বাধীনতা লাভ করা চাই।"

শিক্ষা, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, চরিত্রবল এই সমস্তের পরিণাম—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। কি এসিয়িক, কি য়ুরোপীয় সমস্ত জনসমাজই পরিবারের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধুনা, ব্যক্তির স্বত্তাধিকার ছাড়া য়ুরোপীয় আইন আর কোন স্বত্তাধিকার স্বীকার করে না। বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের উপর পিতা কোন প্রকার প্রভুত্ব চালনা করিতে পারেন না। পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের প্রভু নহেন, তিনি তাহার অবিভাবক মাত্র। অভিভাবকের হস্ত হইতে পুত্রকে অপসারিত করিবার ক্ষমতা আদালতের আছে, এবং সেই ক্ষমতা অনুসারে আদালত কাজও করিয়া থাকেন।

অবশেষে বক্তব্য, য়ুরোপীয় সভ্যতায় শেষ লক্ষণ—উন্নতিতে বিশ্বাস। ঐকান্তিক উন্নতি ও ঐকান্তিক অবনতি বিজ্ঞান স্বীকার করে না। দেহযন্ত্রের ন্যায় সমাজ যন্ত্রাদির সম্বন্ধেও দেখা যায়, এক অংশের অতিমাত্র উন্নতিতে আর এক অংশের ক্ষতি হইয়া থাকে। তথাপি একথা বলা যাইতে পারে যে, মানুষ তৃতীয় বৎসরের কাছাকাছি, একটা সুলক্ষিত উপচয় লাভ করে; এবং পঞ্চমবর্ষ হইতে তাহার স্পষ্টলক্ষিত অপচয় আরম্ভ হয়। কোন এক জাতির সম্বন্ধেও এই কথা বুঝা যাইতে পারে। আন্টনিয়সের সময় হইতে রোম উন্নতির পথে চলিয়াছিল, কনষ্টানটাইনের মৃত্যুর পরে রোমের অবনতি আরম্ভ হয়। বিশ্বমানবের সম্বন্ধেও এই কথা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি শতাব্দী পর্য্যন্ত, বিশ্বমানব ক্রমাগত উন্নতি পথে চলিয়াছে। তাহা সত্বেও মানুষের কতক গুলি মানসিক শক্তির হ্রাস হইয়াছে। আদিম মনুষ্যের ন্যায় আর তাহার সেরূপ দৈহিক বল নাই, সেরূপ ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র নাই; মহাকাব্যের যুগ শেষ হইয়াছে। গ্রীসে যেরূপ মূর্ত্তিশিল্প ও বাস্তুশিল্পের উৎকর্ষ হইয়াছিল, তাহা আর কোনকালে হইবে না। ইতালীর "নবজীবন"সময়কার চিত্রকর্ম্মের সহিত তুলনা হইতে পারে এরূপ ওস্তাদি হাতের চিত্রকর্ম্ম আর কখন হইবে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীতে, একটা পরিবর্ত্তনের আকাজ্ক্ষা হইয়াছিল, উৎকর্ষের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিবার জন্য যুবকদিগের মধ্যে একটা আগ্রহ হইয়াছিল। যে সকল জনসমাজ পিতৃতন্ত্র ও চিরাগত প্রাচীন প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল সমাজে পিতৃগণের নিকট পুত্রেরা নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, এবং তাহারা বিশ্বমানবের অবনতি স্বীকার করে। যে সকল জনসমাজ দ্রুতভাবে রূপান্তরিত হয়, সেই সকল সমাজে পুত্রগণ পিতৃগণ অপেক্ষা আপনাদিগকে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করে, এবং তাহারা, উন্নতির সীমা নাই এইরূপ বলিয়া থাকে। পূর্ব্বে, কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠের অধীনতা স্বীকার করিত; অধুনা, নবীনেরা মনে করে, যে তাহারা খ্যাতনামা লোকদিগের অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ—শুধু এই কারণে যে তাহারা তাঁহাদের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক। চিত্রকর্ম্মে তাহারা যে "ধারণা-লব্ধ চিত্র"Impressionism ও "বিভূষণী" (Decoratum) রচনানীতিই শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ বলিয়া প্রদর্শন করে—তাহার একমাত্র কারণ উহাই সর্ব্বশেষে অবির্ভূত হইয়াছে। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, রাষ্ট্রীক ও সামাজিক বিজ্ঞানেও এইরূপ। তথাপি পূর্ব্বকালে অভিজাতবর্গের বিশেষ অধিকারধারী ব্যক্তিরা যত শীঘ্র খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিত, গণতন্ত্রের আমলে, প্রতিযোগিতার বহুলতা হেতু অত শীঘ্র খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা যায় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবাব

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আতুর-আশ্রম।

বেথলিহাম! নামটি গালভরা হইলেও স্থানটি বড় রমণীয় নহে। রেলওয়ে লাইনের উভয় পার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি,—মধ্যে মধ্যে বড় ডোবা শৈবালে সমাচ্ছন্ন; তাহা হইতে পঙ্ক-দুষ্ট একটা গন্ধ রৌদ্র-তপ্ত হাওয়ায় ভাসিয়া ফিরিতেছে। ডোবার পশ্চাতে ঘন বৃক্ষশ্রেণী, অধিকাংশই বন্য—সেই বৃক্ষশ্রেণীর পিছনে কয়েককটা বড় চিমনি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এগুলা হাড়ের কল।

ষ্টেশনের নাম রুয়েল। ষ্টেশনটি ক্ষুদ্র। ষ্টেশন হইতে একটা সরু পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া বরাবর গ্রামের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। এই পথ ধরিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হয়। পথের চারিদিকে অস্বাস্থ্যকর ডোবা ও জলা প্রভৃতি দেখিয়া চোখ এমনি ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে যে এই অট্টালিকার শিল্পচাতুর্য্যে সে যেন আর বসিতেই চাহে না। না বসুক, তথাপি এ অট্টালিকাখানি নির্ম্মাণ করিতে যে অজস্র অর্থ ও মস্তিষ্ক-ঘৃত ব্যয়িত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সংশয়ের লেশমাত্র নাই। এই অট্টালিকাখানিই বেথলিহাম আতুর-আশ্রম; নবাবের ব্যয়শালিতার চিহ্ন এবং তাঁহার উপর জেঙ্কিন্সের প্রভাবেরও অকাট্য পরিচয়! ফটকের দুই ধারে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মুক্ত প্রান্তর—তথায় বড় বড় কয়েকটা ছাগী শষ্পাহারে নিযুক্ত। মানুষ দেখিলে তাহাদের পানে যে দৃষ্টিতে মূর্খ পশুগুলা মুখ তুলিয়া ফিরিয়া চাহে, তাহা যেমন করুণ, তেমনই ম্লান!

সত্য কথা বলিতে কি, এই আতুর আশ্রমটি তাহার বিরাট নির্জ্জনতায় আগন্তুকের প্রাণে যেন পাষাণ চাপিয়া ধরে।

দরিদ্র অভিভাবকদিগকে নানা স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া যে কয়টি ছেলেকে এখানে আনা হইয়াছিল, তাহারা এ বিরাট পুরীর মধ্যে পদার্পণ করিয়াই রোগে পড়িল; কয়েকজন প্রাণ দিল, এবং যাহাদের অভিভাবকের দল পাড়ার সংবাদ পাইয়া ত্বরিতে আসিয়া আশ্রম হইতে ছেলেদের সরাইয়া লইল, তাহাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—এ-যাত্রা তাহারাই বাঁচিয়া গেল!

মৃত্যুর করাল ছায়ায় আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল। সে আশ্রমে প্রসন্নতার চিহ্ন কি করিয়া দেখা যাইবে! জেঙ্কিন্সের মস্তিষ্কের তারিফ আছে, নবাবের অর্থও প্রচুর ব্যয় হইয়াছে, তথাপি গোড়াতেই এমন গলদ ঘটিলে মানুষ দমিয়া যায়। কিন্তু জেঙ্কিন্স দমিলেন না। এত বড় অনুষ্ঠানটাকে খাড়া করিয়া তুলিতে গেলে দুই-চারিটা বিঘ্ন ঘটিবেই—এ তুচ্ছ ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে! বিশেষতঃ যে ছেলেগুলা মরিয়াছে, তাহারা যখন দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছে, তখন ললাটে মৃত্যুর টীকা আঁকিয়াই ত তাহারা আসিয়াছিল। গৃহে থাকিলেও সে অভাগারা না খাইতে পাইয়া মরিত; তবে দুইদিন পূর্ব্বে না মরিয়া আশ্রমে পা দিয়া মরিয়াছে! এই না প্রভেদ!

পারি হাঁসপাতালের ছাত্র এম, পদির্ভেঁকে আনাইয়া তাহার উপর আতুর-আশ্রমের তত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল—পদির্ভেঁই প্রধান চিকিৎসক। মাদাম পুল ধাত্রীদিগের নেত্রী। এ দুই জনকে বেশ মোটা মাহিনায় নিযুক্ত করা হইয়াছিল। আরও বিস্তর লোকজন ছিল, ভৃত্য, রজক, ধাত্রী প্রভৃতি। আশ্রমের জন্য একখানি ওমনিবাস গাড়ীও ছিল, কোচম্যান-সহিসের তক্‌মা-আঁটা পোষাক-পরিচ্ছদ। প্রত্যহ ট্রেনের সময় রুয়েল ষ্টেশনে ঘণ্টা বাজাইয়া গাড়ী ছুটিত, আতুর শিশুকে আশ্রমে বহিয়া আনিবার জন্য। আশ্রমের ছাগগুলা ছিল তিব্বতী—দুগ্ধবতী; গায়ে রেশমের ঝালরের মত কেশের রাশি, দেখিতে যেমন পুষ্ট তেমনি সুন্দর! অর্থাৎ আশ্রমে আয়োজনের কোনরূপ ত্রুটি ছিল না। শুধু এক জায়গায় একটু যাহা ভুল ঘটিয়াছিল, তাহা এই রুগ্ন শিশু-গুলাকে কৃত্রিম উপায়ে দুগ্ধ পান করাইবার ব্যবস্থায়। ঐ ব্যবস্থাটা কোনমতেই তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে এতটুকু অনুকূল হয় নাই।

মৃত্যুর হার দেখিয়া ম্যানেজার প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গেল। পদির্ভেঁ লোক মন্দ ছিল না। সে যখন দেখিল, তিব্বতীয় দুগ্ধ কচি ছেলেগুলার আদৌ রুচিতেছে না, তখন আপনা হইতেই সে কয়েকজন সুস্থ সবল-দেহা সদ্যঃ-প্রসূতা গ্রাম্য নারী আনাইল। ইহাতে কয়েকটা অভাগা শিশু প্রাণ পাইল বটে, কিন্তু পদির্ভেঁর চাকুরিটি খোয়া যাইবার উপক্রম হইল।

সপ্তাহান্তে জেঙ্কিন্স আসিয়া এই নারীদের দেখিয়া চটিয়া লাল হইয়া উঠিলেন। "বেথলিহামে এই সব ছোট লোকের মেয়েদের দিয়ে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে! তুমি পাগল হয়েছ, পদির্ভেঁ! এত টাকা খরচ করে তিব্বত থেকে ছাগল আনালুম, তাদের চরে বেড়াবার জন্য এমন মাঠ করে দিলুম—এ সব কি অনর্থক! আমার বৈজ্ঞানিক চেষ্টাটাই শুধু তুমি নিষ্ফল করে

দেবার উদ্যোগ করছ, তা নয়, আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা নবাব বাহাদুরের টাকাটারও এতে অপব্যয় হচ্ছে!"

পদিভেঁ মাথা নত করিয়া ঈষৎ কম্পিত স্বরে কহিল, "কিন্তু দেখুন, এ ছাগলের দুধ তাদের সহ্য হচ্ছে না—কতগুলো মরে হেজেও গেল যখন—"

"মরুক—যাদের মুখে না রুচবে, তারা উপোস করে থাকুক, তবু এখানকার ধারা পাল্টানো হবে না। এখনি ও মাগীগুলোকে বিদেয় করে দাও। আর সাবধান, ভবিষ্যতে এমন হলে তোমার সঙ্গে একত্রে কাজ করবারও সম্ভাবনা থাকবে না—"

পদিভেঁ নিরুত্তর রহিল। জেঙ্কিন্স আরও কহিলেন, "বিজ্ঞানের রাজ্যে এ একটা মস্ত 'এক্সপেরিমেণ্ট' চলছে—বুঝচ না—কত বড় বিষয়ে আমরা হাত দিয়েছি—আর কত টাকা আমার এ 'আইডিয়া'কে সাহায্য করছে। কতকগুলো মরে যদি, মরুক। কোন্ বড় কাজে ত্যাগ-স্বীকার নেই! এ মরণ মাথা পেতে আমাদের নিতে হবে।"

পদিভেঁ আর কথা কহিল না। এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে একটা চাকুরি সংগ্রহ করা কি কঠিন—বিশেষ এমন চাকুরি!—সে তাহা জানিত। সে স্ত্রীলোকগুলাকে তখনই বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। এবং মহাসমারোহে নিরীহ শিশুমেধযজ্ঞ চলিতে লাগিল। মৃতের সংখ্যা যেমন বাড়িয়া চলিল, ষ্টেশন হইতে ওমনিবাস গাড়ীও তেমন শূন্য ফিরিতে লাগিল। কে আর ছেলেকে মরিতে পাঠাইবে! মরে যদি, না খাইয়া তাহারা মা-বাপের কোলের কাছেই পড়িয়া মরুক, প্রাসাদের ঊর্দ্ধ কক্ষে সোনার পালঙ্কে শুইয়া মরিলে মা-বাপের শোকের মাত্রা এতটুকু কমিবে না ত! সুতরাং চিত্রগুপ্তের জিম্মায়,—গ্রামের লোক পদিভেঁকে খেতাব দিয়াছিল, চিত্রগুপ্ত —ছেলে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

ছেলেদের শীর্ণ মুখগুলি দেখিলে চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয়। তাহাদের মৌন দৃষ্টি গভীর অর্থপূর্ণ—যেন মৃত্যুর পদধ্বনি তাহারা শুনিয়া ফেলিয়াছে—প্রতিমুহূর্ত্তেই এখন যেন তাহারা প্রতীক্ষা করিয়া আছে —ঐ বুঝি আসিয়া মৃত্যু ডাকিল, এস, আমার কাছে এস।

সেদিন আহারাদির পর পদিভেঁ বসিয়া মাদাম পুলকে এই কথাটাই বুঝাইতেছিল, এমন সময় ওমনিবাসের চাকার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ শুনা গেল। শব্দটা অন্য দিনের মত নহে। পদিভেঁ কহিল, "গাড়ী আজ খালি আসছে বলে ত মনে হচ্ছে না!"

সত্যই গাড়ী আজ ষ্টেশন হইতে একেবারে খালি ফিরে নাই। ভিতরে একজন লোক ছিল—সে জেঙ্কিন্সের কাছ হইতে সংবাদ লইয়া আসিয়াছে। সংবাদ,—ডাক্তার জেঙ্কিন্স, নবাব ও অপর একজন লোককে সঙ্গে লইয়া এখনই দুই ঘণ্টা পরে আশ্রম-পরিদর্শনে আসিতেছেন! ডাক্তার জেঙ্কিন্স বলিয়া পাঠাইয়াছেন, উঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য সকলেই যেন প্রস্তুত থাকে! এত শীঘ্র এ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, পদিভেঁকে যথোচিত অবসর দিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই, তথাপি ডাক্তার জেঙ্কিন্স আশা রাখেন, পদিভেঁ যথাসাধ্য আয়োজন করিবেন।

যথাসাধ্য! পদিভেঁ বিরক্ত হইয়া

ভাবিল, যথাসাধ্য! একটু চিন্তারও কারণ ছিল। আশ্রমের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। জেঙ্কিন্সের 'ধারা' একেবারেই ব্যর্থ প্রমাণ করিয়া ছেলেরা অনেকেই মরিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে—যে কয়টা অবশিষ্ট আছে, সে কয়টাকে জীবিত বলিয়া লোকের সম্মুখে বাহির করিতেও লজ্জা হয়। তাহাদের অস্থি-চর্ম্মসার দেহের আবরণে প্রাণবায়ুটুকু কোন মতে যেন ধুক ধুক করিতেছে!

পদিভেঁ কহিল, "মাদাম পুল, উপায় ত দেখি, একটি আছে। এই ছেলেগুলোকে আশ্রম থেকে বার করে সেই ওধারকার আস্তাবলের পাশের ঘরে আজকের মত রাখা যাক—! কতক্ষণের জন্যই বা! এতে আর বিশেষ কি খারাপ হবার ভয় আছে? তারপর বেছে-গুছে এর মধ্য থেকে দু-চারটে ছেলেকে ভালো পোষাক পরিয়ে মাঠের ধারে ক্রিকেট খেলতে পাঠিয়ে দি। ছুটোছুটি করতে মানা করে দেব। বলে দেব, নেহাৎ নিরীহর মত যেন খেলে! আর ছুটোছুটি করবার মত বলই বা ওদের কার আছে! তবু এতে একটু ভালো দেখাতে পারে।"

মাদাম পুলও একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল,—সেটা চাকুরির মায়ায়। সে কহিল, "তা ছাড়া আর কি সুব্যবস্থা করা যেতে পারে?"

তখনই ঘণ্টায় ঘা পড়িল। চারিদিকে ব্যস্ততার ধুম পড়িয়া গেল। হাঁক-ডাক চীৎকারে নিদ্রিত নির্জ্জন পুরীর অসাড় ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইল। ওধারে ঝাঁটার ধুলা উড়িতেছে, পাইপে জল ছুটিয়াছে—ধোয়া-মোছা—সে এক বিরাট ধুম বাধিয়া গেল। সহসা-ব্যস্ত লোকজনকে দেখিয়া মনে হয় যেন, বেথলিহামে আগুন লাগিয়াছে। সকলের মুখে-চোখে তেমনই চাঞ্চল্য, তেমনই উৎকণ্ঠার চিহ্ন!

দুই ঘণ্টার মধ্যে আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। আগাগোড়া মাজা-ঘষা আশ্রম অতিথি-অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য-পরিজন যে যাহার জায়গায় দাঁড়াইয়া পড়িল। গরু ছাগলগুলাকে ছবির মত সাজাইয়া মাঠে ছাড়িয়া দেওয়া হইল—ম্যানেজার পদিভেঁ শুভ্র পরিচ্ছদে দেহ সজ্জিত করিয়া অফিস কামরায় আসিয়া বসিল—কর্ত্তৃপক্ষ এখনই পরিদর্শনে আসিবেন!

ঐ যে তাঁহারা আসিয়াছেন। পদিভেঁ শশব্যস্তে আগাইয়া যাইয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিল। নবাবের প্রকাণ্ড সজ্জিত গাড়ী হইতে ডাক্তার জেঙ্কিন্স, নবাব ও কৌন্সিলের এক জন সদস্য অবতরণ করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

অভিবাদন, কর-কম্পন প্রভৃতিতে অভ্যর্থনার ঘটা পড়িয়া গেল। জেঙ্কিন্সের প্রাণটা ঈষৎ সশঙ্ক ছিল। কি জানি, দুই ঘণ্টার মধ্যে আশ্রমের সজ্জা অতিথিগণের চক্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে কি না! কিন্তু চারিদিকে শৃঙ্খলা দেখিয়া একটা সবিস্ময় পুলকে তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। এঘর ওঘর ঘুরিয়া পরিদর্শন শেষ করিয়া জেঙ্কিন্স নবাব ও সদস্যকে লইয়া গাড়ী-বারাণ্ডার সম্মুখস্থ ছোট বাগানটিতে আসিয়া বসিলেন। চা আসিল, বিস্কুট আসিল—মদিরার পাত্র ফেনিলোচ্ছল গোলাপী তরল পদার্থে পরিপূর্ণ

হইয়া উঠিল। সদস্যবর পূর্ণপাত্র মুখের কাছে ধরিয়া 'বেথলিহামের স্বাস্থ্য'—বলিয়া সাগ্রহে তাহা শূন্য করিলেন। জেঙ্কিন্সের সুখ্যাতিতে সদস্য পঞ্চমুখ হইলেন। নবাবের নাম ভুলিয়াও কেহ উচ্চারণ করিল না। তিনিও একটু অপ্রতিভভাবে ডাক্তারের সুখ্যাতি করিলেন। ডাক্তার তাহাতে বাধা ত দিলেনই না, যাঁহার অর্থে এ আইডিয়া প্রাণ পাইয়াছে, তাঁহাকে একটা ধন্যবাদ দেওয়াও ভদ্রতার খাতিরে উচিত বলিয়া মনে করিলেন না। তারপর বিদায়-সম্ভাষণান্তে ধীরে ধীরে সকলে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিতেছিল। চারিধারকার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নবাবের প্রকাণ্ড গাড়ী গ্রামের রাস্তা ধরিয়া সহরের দিকে ছুটিয়া চলিল। মোড় বাঁকিবার সময় সকলে পিছনে একবার চাহিয়া দেখিলেন—প্রকাণ্ড আঁধার পুরীর ত্রিতলের এক কক্ষ হইতে শুধু মৃদু-কম্পিত আলোক-কণা, অন্ধকার আকাশের গায় ক্ষুদ্র একটা নক্ষত্র-বিন্দুর মতই ঝিক্ ঝিক্ করিতেছিল। ব্যস্ত পরিদর্শন-রত নবাব বা সদস্য কেহই বুঝিলেন না, এ আলোক কিসের আভাষ! জেঙ্কিন্স শুধু ঈষৎ শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি নিমেষে বুঝিলেন, আর এক অভাগা শিশু আপনার ক্ষুদ্র জীবনের অভিনয় অসমাপ্ত রাখিয়া চিরবিদায় লইয়া চলিয়াছে—এ আলোটুকু তাহারই সে অনির্দ্দেশ্য পথে মৃদু কিরণের সঞ্চার করিতেছে!

* * *

১৬ তারিখের "জর্ণাল অফিসিয়াল" কাগজখানার একটা পৃষ্ঠা হইতে নবাবের চক্ষু যেন আর সরিতে চাহিতেছিল না। সে জায়গাটায় লেখা ছিল,—

"১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ তারিখের ডিক্রি কর্ত্তৃক রাজ্য পরিচালক সমিতির উপর যে ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে, সেই ক্ষমতার বলে মন্ত্রীসভা সানন্দ চিত্তে, বেথলিহাম আতুর-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি সর্ব্বজনপ্রিয় বিচক্ষণ ডাক্তার জেঙ্কিন্স মহোদয়কে 'নাইট' উপাধিতে আজ ভূষিত করিলেন। ডাক্তার মহোদয়ের বিরাট বিশ্ব-প্রেমের কথঞ্চিৎ সমাদর করিতে পারিয়া সভা প্রকৃত পক্ষে আপনাকে আজ কৃতার্থ বোধ করেন।"

নবাব এ সংবাদ পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ইহাও সম্ভব! জেঙ্কিন্সের সমাদর—জেঙ্কিন্সের উপাধি-লাভ! তাঁহার নহে! অথচ এই আতুর-আশ্রম—কাহার টাকায়—! আশ্চর্য্য!

তিনি দুইবার তিনবার এ ছত্রকয়টি পাঠ করিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, পায়ের তলায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা যে সবেগে দুলিয়া উঠিয়াছে! অক্ষরগুলা তাঁহার চোখের সম্মুখে যেন অট্টহাস্য করিয়া নাচিতেছিল। তিনি যে ঐখানটিতে নিজের নাম আশা করিয়া বসিয়াছিলেন। আতুর আশ্রম-পরিদর্শনান্তে জেঙ্কিন্সও সেদিন আসিয়া নবাবকে দৃঢ় স্বরে বলিয়া গিয়াছিল, "সব ঠিক—নবাব বাহাদুর। এবার আপনি 'নাইট' হচ্ছেন, সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।" তাহার পর, এ কি! কাগজখানা ভুল সংবাদ ছাপিল না ত! না! এ যে গভর্ণমেণ্টেরই মুখপত্র। ভুল হইবার জো কি!

সে গেরি কক্ষে প্রবেশ করিলে, নবাব তাহার পানে চাহিয়া কহিলেন, "গেরি, আজকের কাগজ দেখেচ? ডাক্তার 'নাইট' হয়েছে,—আমি নই!"

নবাব হাসিবার চেষ্টা করিলেন—হাসি বাহির হইল না। মুখ তাঁহার লাল হইয়া উঠিয়াছিল—চোখে জল আসিয়াছিল। কোন মতে মনটাকে তিনি দাবিয়া রাখিয়া সনিশ্বাসে কহিলেন, "আমার মনে একটু লেগেছে! এটা আমি আশাই করিনি।" তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ডাক্তার জেঙ্কিন্স ব্যস্ত-সমস্তভাবে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একখানা কাগজ, চোখে-মুখে দারুণ উত্তেজনা আগুনের মত ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কাগজখানা সশব্দে তিনি টেবিলের উপর আছড়াইয়া ফেলিয়া বিরক্তির সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "অবিচার! দারুণ অবিচার! এ হতে পারে না, পারেই না। হতে আমি দেব না।"

কথাগুলা যেন বিদ্যুতের মত ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাহার পর ডাক্তার পকেট হইতে একখানা বড় খাম ও ছোট একটা বাক্স বাহির করিয়া নবাবের সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন, "এই আমার ক্রশ—এই আমার সনদ! এতে আমার কোন অধিকার নেই—নবাব বাহাদুর। এ আপনার—আপনি নিন—আমি এ রাখতে পারি না—"

কথাগুলা শুনিতে গভীর হইলেও কাজে নেহাৎ ফাঁকা। নবাব যদি এই ক্রশ ধারণ করেন, তাহা হইলে বে-আইনী কাজ করার অপরাধে নিঃসন্দেহ শাস্তি বহন করিতে হইবে। এ কথা ডাক্তারও বিলক্ষণ জানিতেন। কিন্তু অভিনয়,—হোক বন্ধুত্বের অভিনয়,—কখনও আইন-কানুন মানিয়া চলে না। ডাক্তারের অভিনয়টিও চমৎকার হইয়াছিল। তাঁহার বাক্-ভঙ্গীটি আশ্চর্য্য নিপুণতার পরিচয় দিতেছিল। সরল-চিত্ত নবাব এ অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি শান্তভাবে কহিলেন, "না, না, অমন কথা বলো না, ডাক্তার। এ উপাধি আমার হল না, তাতে কেন দুঃখ করছ! হয়ত আর বছর গভর্ণমেণ্ট আমার কথা মনে করবেন—"

ডাক্তার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হয় ত কি—নিশ্চয়—মনে করাব আমি! এ আমি শপথ করছি—"

ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইল। চা পান করিয়া ডাক্তার গাত্রোত্থান করিলেন।

নবাবের চিত্তে আর-কোন চপলতা দেখা গেল না। ভোজনে বসিয়া নিত্যকার মতই তিনি হাস্য-পরিহাস করিলেন। সারাদিনের মধ্যেও তাহার এতটুকু পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

সন্ধ্যার সময় নবাব আপনার বসিবার ঘরে বসিয়া একখানা পুরানো খাতা খুলিলেন। এ পাতা ও পাতা উল্টাইয়া অজস্র অস্পষ্ট অক্ষর বাছিয়া একখানা সাদা কাগজে তিনি আঁক পাড়িতে লাগিলেন। হিসাবের মধ্যে যখন তিনি একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন, গেরি তখন কক্ষে প্রবেশ করিল। সে নবাবকে অন্ধকারে কাগজ-পত্রের মধ্যে নিমগ্ন দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অতিশয় বিস্ময়ে সে নবাবের পানে চাহিয়া রহিল।

নবাব মুখ তুলিয়া কহিলেন, "আমি কি করছি, জানো পল ?"

"না ।"

"হিসেব করছি—" তাহার পর হাসিয়া খাতা মুড়িয়া কাগজখানার দিকে চাহিয়া নবাব কহিলেন, "হিসেব করে কি দেখলুম, জানো ? ঐ হতভাগা জেঙ্কিন্সটাকে 'নাইট' করবার জন্ত এত কাল ধরে আমি চার লাখ ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক খরচ করেছি ।"

চার লাখ ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক ! কিন্তু হায়, এইখানেই ইহার শেষ নহে !

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

"দামিন্-ই-কো"

"দামিন্-ই-কো" পারসিক শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার প্রকৃত অর্থ পর্ব্বতের উপত্যকা-ভূমি অর্থাৎ পার্ব্বত্য প্রদেশ। ইহা গভর্ণমেণ্টের খাসমহল। সাঁওতাল পরগণার (১) দেওঘর (২) জামতাড়া (৩) রাজমহল (৪) পাকুড় (৫) গড্ডা ও (৬) সদর এই ছয়টি মহাকুমার মধ্যে ১ম ও ২য় ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি জেলায় যে অসমতল, বনাকীর্ণ, গিরি ও নদনদী বেষ্টিত উচ্চ উপত্যকাভূমি দেখা যায় তাহাকেই দামিন-ই-কো বা সংক্ষেপে "দামিন্" বলে।

সেই আদিম তামস যুগে যখনও ভারত গগন আর্য্য সভ্যতায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই, যখনও পূত বৈদিক সঙ্গীত ভারতের কানন প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করে নাই, যখনও অতি ভীম আর্য্যবীর্য্যে জগৎ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয় নাই, সেই স্মৃতির অতীত কাল হইতে শত্রুর দুরধিগম্য শ্বাপদসঙ্কুল গিরিকানন পরিবৃত এই প্রাকৃতিক দুর্গগুলি ভারতের আদিম অধিবাসী 'পাহাড়িয়া এবং সাঁওতাল দ্বারা অধিকৃত হইয়া আসিতেছে। বিংশ শতাব্দীর সুসভ্যতর যুগে ইংরাজ রাজত্বের পূর্ণ ক্ষমতা, গৌরব ও গর্ব্বের দিনেও এই অসভ্য পাহাড়িয়াগণ প্রায় উলঙ্গ বেশে পর্ব্বতের সানুদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন তাহারা সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ করে না। পাহাড়ের ঢালুদেশে তাহারা প্রচুর পরিমাণে, মাড়ুয়া, গুঁধলি, জনার প্রভৃতি চাষ করে এবং তাহারই উপর সমস্ত বৎসর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। ঝরণার বারি এবং বন্য বৃক্ষের ফলমূল তাহাদের অনেক সময়েই ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করে। আমাদের চক্ষে ইহারা হীন অসভ্য বর্ব্বর হইলেও ইহাদের হৃদয়ে এখনও যে স্বাধীনতার দীপ্ত বহ্নি জাগরূক আছে, একতার যে অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। একবার কোনও এক সময়ে গবর্ণমেণ্টের আমিনগণ এই সকল পাহাড় জরীপ করিতে আসিয়া মহা বিপদে পড়িয়াছিলেন; তাঁহারা

কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট এই সংবাদ প্রেরণে বাধ্য হইলেন। ভাগলপুরের তদানীন্তন বিভাগীয় কমিশনার সাহেব স্বয়ং কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইয়া তিনিও প্রথমে পাহাড়ে উঠিতে পারেন নাই; কারণ পাহাড়িয়াগণ বলিল, যে এ সকল পাহাড় ত তাহাদের নিজস্ব, তবে কেন উহারা তাহা জরীপ করিবে?

সাঁওতাল এবং পাহাড়িয়াগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট এই অংশকে সাধারণ দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্য ভাবে শাসন করিয়া থাকেন। ইহার নিয়ম কানুন আইন আদালত সবই স্বতন্ত্র—সবই ইহার অধিবাসীবর্গের উপযোগী। সাধারণ পুলিসের এলাকার মধ্যে এস্থান গণ্য নহে। ইহাদের প্রত্যেক গ্রামে নিজেদের পঞ্চায়েৎ, মস্তাগির, চৌকিদার, চাকলাদার এবং সর্ব্বোপরি একজন পরগণায়েৎ Headman স্বরূপ অনেকগুলি মৌজার উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। মহাকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্য কোনও উদ্দেশ্য লইয়া কোনও লোকের এই প্রদেশে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। বাস্তবিক, ইহারা অতি স্বাধীন, উদ্বেগশূন্য, উদ্দেশ্যহীন, স্বাস্থ্যপূর্ণ, সহজ, সুন্দর জীবন অতিবাহিত করে।

নিসর্গ সুন্দরীর প্রিয়তম নিকেতনে যাহারা আজীবন বর্দ্ধিত, প্রকৃতির চির নূতন চির সুন্দর দৃশ্যে যাহাদের চক্ষু সূতিকাগার হইতে অভ্যস্ত, স্বচ্ছ স্বাধীন পার্ব্বত্য সমীরণ যাহাদের জীবন হর্ম্ম্যের পুষ্টি সাধনে সহায়তা করিতেছে, উপলভরা কল্লোলময়ী গিরিনদী সর্ব্বদাই যাহাদের তৃষ্ণা দূর করিতেছে, প্রভাত সন্ধ্যায় বনবিহঙ্গের সুমধুর কাকলিধ্বনি যাহাদের কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত করিতেছে, প্রিয়দর্শন বৃত্তাকার গিরিপাদশোভী শ্যামল গহনবনরেখা যাহাদের অফুরন্ত শীতল সমীরণের ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে—সে দেশের দুঃখ কি?

যে দেশের অধিবাসীরা কৃত্রিমতা জানে না, যাহাদের হৃদয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনলে দগ্ধ হয় না, যাহাদের শরীর ও মন বিলাস লালসায় কলুষিত হয় নাই সে দেশের প্রজাদের দুঃখ কি?

যাহারা সারাদিন মাঠে মাঠে গোধন চরাইয়া, বাঁশী বাজাইয়া পরিতৃপ্ত হয়, যাহারা স্ত্রী পুরুষে সম্বৎসর কৃষি কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া অপার আনন্দ অনুভব করে, যাহারা দীর্ঘ দিবসের কর্ম্মাবসানে গোধূলি আলোকে, সারি বাঁধিয়া সমতাল বিক্ষেপে "ঝুমুর" গাহিতে গাহিতে নিজেদের কোলাহলবিরল শান্তিময় পার্ব্বত্যগ্রামে প্রত্যাগমন করে, সেই চির প্রফুল্ল, চিরসুখী, চির উৎসাহী জাতির দুঃখ কি?

যে জাতির শরীরে ব্যাধি নাই, মনে অশান্তি নাই, হৃদয়ে উদ্বেগ নাই, কর্ম্মে আলস্য নাই; দুর্দ্দিনের বর্ষা,—দুঃখের অন্ধকার কুহেলিকা তাহাদের জন্য সৃষ্টি হয় নাই। বাস্তবিক এই সাঁওতালদিগের শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের প্রফুল্লতা দেখিলে যথেষ্ট আনন্দিত হইতে হয়। হাট বারে যখন ইহারা বহুদূর হইতে নিজেদের ক্ষেত্রশষ্য বেচাকেনা করিতে

আসে এবং হাট শেষে যখন ইহারা নিঃশঙ্কচিত্তে স্ত্রী পুরুষে গলা ধরাধরি করিয়া দল বাঁধিয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে বাঁশী বাজাইয়া গান করিতে করিতে স্বস্থানে ফিরিয়া যায় সে দৃশ্য বাস্তবিকই হৃদয়গ্রাহী। বিদায়ের বহুপরেও সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে তাহাদের উচ্চ হাস্য ধ্বনি এবং বিচিত্র বাঁশরীর করুণ কোমল রাগিণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি নৈশবায়ু সংযোগে ভাসিয়া আসিতে শুনা যায়।

সাঁওতাল রমণীদিগের ফুল অতি প্রিয় বস্তু। মাথার খোপায় অনেক সময় ফুলের ডালি সাজাইয়া রাখে। পিত্তলের, পুঁথির এবং কখনও বা রৌপ্যের দু'একখানি গহনা ব্যতীত ইহাদের গহনা বলিতে আর কিছুই নাই। ইহাদের গৃহগুলি সমস্তই মাটির তৈয়ারী এবং উপরের 'চাল' খড় দিয়া ছাওয়া। কিন্তু পাথরের দেশের মাটি বলিয়া প্রায়ই ইটের সমান মজবুৎ হয়। দেওয়াল গুলি সমস্তই গোময়লিপ্ত; তাহার উপর শাদা মাটির 'পালিস্তারায়' নানারূপ পশুপক্ষী উদ্ভিদ ফুলের চিত্র অঙ্কিত। উঠান ঘর প্রভৃতি সমস্তই উত্তমরূপে গোময় দ্বারা মার্জ্জিত। ইহাদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, ভেড়া, কুক্কুট এবং শূকরই প্রধান। ইহারা খাদ্যাখাদ্যের কিছুই বিচার রাখে না। কুক্কুট এবং শূকরই ইহাদের অতি প্রিয় খাদ্য। ভেক সর্পও ইহাদের অখাদ্য নহে।

বলিতে দুঃখ এবং লজ্জা হয় যে এই অসভ্য বর্ব্বর জাতির বিবাহ প্রথা আমাদিগের বর্ত্তমান সভ্য সমাজের বর বিক্রয় অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়ঃ, সহস্র গুণে উদার। ইহাদের

সাঁওতাল বালক ও স্ত্রীলোকগণ শস্যক্ষেত্রে কাজ করিতেছে।

বিবাহে কন্যার পিতাকে বাঙ্গালীর কন্যার পিতার ন্যায় সর্ব্বস্বান্ত এবং ঋণগ্রস্ত হইয়া জীবন্তে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

সাঁওতালদিগের বিবাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'কোর্টসিপ' করিয়া হয়। হাটই উহাদের সাধের মিলন স্থান। বিবাহার্থী যুবক যুবতীরা সেদিন বেশ সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়া আসে। যুবতীদের মাথার খোঁপায় সে সময় ফুলের বাগান বসিয়া যায়। বর এবং ক'নে উভয়েই যুবক এবং যুবতী এবং উভয়েরই বয়স প্রায় সমান থাকা চাই। পরস্পর পরস্পরকে মনোনীত এবং বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলে পর বরের পক্ষ হইতে একজন ঘটক স্বরূপ এই সুসংবাদ কন্যার পিতার নিকট বহন করিয়া লইয়া যায়। সাধারণ লোক ১০৲ হইতে ১৫৲ এবং কেহ কেহ বেশী পণ কন্যার পিতাকে দিয়া শুভ বিবাহের দিন স্থির করিয়া লয়। ইহাদের বিবাহে বরকে কনের বাড়ী যাইতে হয়। যাহাতে সকলের সম্মুখে প্রকাশ্য ভাবে বিবাহ হয় এবং যাহাতে সকলেই দেখিতে পায় এই জন্য বিবাহ কার্য্য দিনেই সম্পন্ন হয়। বিবাহ ভিন্ন গ্রামে হইলে, বিবাহের দিন প্রাতঃকালে বরমহাশয় পিতা, ভ্রাতা এবং অন্যান্য বরযাত্রী সহ বাজনাবাদ্য করিয়া, পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া, নদী নালা ক্ষেত বন অতিক্রম করিয়া কুক্কুট, ছাগল, এবং হাঁড়ি হাঁড়ি হাঁড়িয়া (১) সহ কন্যা পক্ষের গৃহে উপস্থিত হন। প্রাঙ্গণে বিকট দামামা, মাদল এবং অন্যান্য শ্রুতিভীষণ বাদ্য যন্ত্রাদি বাজিতে থাকে। এবং দুর্গন্ধময় (অবশ্য আমাদের পক্ষে) হাঁড়িয়ার স্রোত চলিতে থাকে। সেই মদ্য স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সমভাবে পান করিয়া দীর্ঘ সারি বাঁধিয়া বাজনার তালে তালে "ঝুমুর" নাচিতে থাকে। গ্রীষ্মের দারুণ দ্বিপ্রহরে অনাবৃত স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া মহা সমারোহে এইরূপ নৃত্য গীত চলে। এদিকে বরমহাশয় সুখে তাহার ভাবী শ্যালকের স্কন্ধে—উপযুক্ত শ্যালক অভাবে কোনও জ্ঞাতির স্কন্ধে,—আরোহণ করিয়া বিবাহ আসরে উপস্থিত হন। এবং একটি প্রকাণ্ড ঝুড়ির মধ্যে আসীনা হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রখণ্ড পরিহিতা কন্যা ভাবী উপযুক্ত দেবর প্রভৃতিগণ দ্বারা বাহিত হইয়া পাত্রের সন্মুখীন হয়েন। পাত্র তখন বধূর ললাটে সিন্দুর লেপন করিয়া দিলে চতুর্দ্দিকে হর্ষধ্বনি উঠে এবং দামামা বিকট বোলে বাজিয়া উঠিয়া শুভকার্য্য সমাপ্ত এই কথা গ্রামবাসীদিগকে জানাইয়া দেয়। তাহার পরে কুক্কুট, ছাগ মাংস এবং হাঁড়িয়া সকলে পরিতৃপ্ত ভাবে সেবন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করে। অবশ্য বর পক্ষীয়েরা সেদিন কন্যার গৃহেই যাপন করে। পরদিন আবার সেইরূপ বিকট বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে বর এবং বধূ "বরিয়াৎ" সহ আপন আলয়ে উপস্থিত হয়। বিদায়ের দিন নববধূ আপন স্বামী সহ নিজ সখী, জ্ঞাতি প্রভৃতির নিকট সাশ্রু নয়নে বিদায় ভিক্ষা করে। তাহারা নব দম্পতিকে গুড় এবং

(১) চাউল হইতে উৎপন্ন একপ্রকার মদ যাহাকে বাংলায়—"পচাই মদ" বলে।

জল খাইতে দিয়া আপ্যায়িত করে এবং পূর্ব্বকৃত অপরাধ প্রভৃতি মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া ধীরে ধীরে বিদায় দেয়। দুই দিন স্বীয় গৃহে অবস্থানের পর নব জামাতা বধূসহ পুনরায় শ্বশুরালয়ে বাস করিতে আইসে।

ইহাদের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহও দেখা যায়। সাঁওতালী সমাজে Divorce (বিচ্ছেদ) প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই ক্ষমতা সমান। যদি, স্বামী তাহার স্ত্রীকে বর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে ক্ষতি পূরণ স্বরূপ স্ত্রীকে বারো টাকা দিয়া তাহা করিতে পারে। আর যদি কোনও স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে বিবাহের পণস্বরূপ যে অর্থ তাহার পিতা লাভ করিয়াছিল সে অর্থ সমস্তই ফেরৎ দিতে হয়।

সাঁওতালেরা তাহাদের জ্ঞানবৃদ্ধ ওঝাকেই ধন্বন্তরির মহামান্য পদে বরণ করিয়া রাখিয়াছে। কাহারও কোনরূপ পীড়া বা জটিল ব্যাধি হইলেই তাহারা ওঝা মহাশয়ের শরণাগত হয়! তাঁহার দর্শনী ১৲ হইতে ২৲ এবং একখানি কাপড়। কঠিন বা দুরারোগ্য রোগে অবশ্যই বেশী। তবে সৌভাগ্যের বিষয় দক্ষিণাটা ব্যায়ারাম আরোগ্য হইয়া গেলেই দিতে হয়। তিনি ঔষধের অনুসন্ধানে পাহাড়ে জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া উদ্ভিদের শিকড় ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহা হইতে ঔষধ প্রস্তুত পূর্ব্বক রোগীকে সেবন করিতে দেন। ব্যাধি মুক্তির পর রোগীর গৃহে একদিন মহা ধুমধামের সহিত ছাগল, কুক্কুট এবং হাঁড়িয়ার ভোজ হয়। রোগীর বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই সে দিন নিমন্ত্রিত হন। ওঝামহাশয়ই অবশ্য সে দিন শ্রেষ্ঠ অতিথি।

সাঁওতালদিগের নাচ

সাঁওতালদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাস কিন্তু অদ্ভুত রকমের। পৌষ মাসে "সোহরাই" (বান্ধনা) পূজা এবং ফাল্গুন মাসে "সাল সেই" বা বন দেবতা এবং "বোঙা বুঙি" (ভূত পেত্নী) প্রভৃতি অপদেবতার পূজাই প্রধান।

"সোহরাই" পূজা অর্থে শূকর এবং মুরগীর পূজাই বুঝিতে হইবে। পূজার দিন প্রাতঃকালে প্রত্যেক গৃহস্থই নিজ নিজ গোশালা উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া একটি কুমারী শূকরীকে তথায় বাঁধিয়া রাখে এবং তাহাকে অতি পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিতে দেয়। তাহার পরে সকলে মিলিয়া তাহার নিকট গৃহ পালিত পশু পক্ষী এবং সাধারণ মানব প্রভৃতির স্বাস্থ্য এবং মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া বাহিরের আঙ্গিনায় লইয়া যায় এবং অবশেষে শাণিত কুঠারের একটি মাত্র আঘাতেই তাহাকে হত্যা করে। তাহার পর সমস্ত গৃহস্থ এবং তাহার আত্মীয় কুটুম্ব সকলে মিলিয়া অতি হৃষ্ট চিত্তে সেই বরাহ মাংস এবং হাঁড়িয়া সেবন করিয়া থাকে। বৎসরান্তে একটি মহাপূজা এইরূপেই সম্পন্ন হয়। মুরগী পূজাও ঠিক এইরূপে হইয়া থাকে।

অসভ্যতার কত সুগভীর অন্ধকার গর্ভে এখনও উহারা নিমগ্ন তাহা উহাদের কুসংস্কারের সামান্য মাত্র উদাহরণ হইতেই বুঝা যায়। যদি কোন গ্রামে কখনও কোনও সংক্রামক পীড়ার আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই গ্রামের প্রধান প্রধান মাতব্বর ব্যক্তিরা মিলিত হইয়া একটি সভা আহ্বান করে। এবং সেই গ্রামের মধ্যে কোনও বৃদ্ধা ডাইনি (witch) হইয়াছে এইরূপ স্থির মীমাংসা করিয়া লয়। কারণ তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ডাইনি ব্যতীত কখনও কোনও সংক্রামক পীড়ার সূচনা হইতে পারে না। তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে-নির্ব্বাচিতা সেই হতভাগিনা ডাইনির প্রতি গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে মিলিয়া ভীষণ অত্যাচার করিতে থাকে। তাহাকে অশেষবিধ দুঃখ, কষ্ট যন্ত্রণা দিয়া গ্রাম হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়; সময়ে সময়ে তাহাকে একেবারে জীবনের খেয়া পার করিয়া সেই অজানিত দেশের অজানিত গ্রামে পহুঁছিয়া দিতেও ত্রুটি করে না।

ইহাদের সরলতা দেখিলে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়। সরকারী কর্ম্ম উপলক্ষ্যে যখন আমি বাইসিকলে চড়িয়া ইহাদের গ্রামের মধ্য দিয়া চলিতে থাকি তখন গ্রামশুদ্ধ লোক নিজ নিজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাস্তায় আসিয়া বাহির হয় এবং ভীত, পুলকিত, বিস্মিত এবং কৌতুহলান্বিত ভাবে, উচ্চ স্বরে চীৎকার করিতে থাকে। কখনও কখনও সেই বিচিত্র দল বহুদূর পর্য্যন্ত বাইসিকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে।

একবার একটী বাঙালী ভদ্রলোক তথায় বাঙালীর খাদ্যোপযোগী তরকারীর বড়ই অভাব অনুভব করিয়া এক সাঁওতাল মালীকে দু'চারিটী সীম জোগাড় করিয়া আনিতে বলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সে চারিটি বড় বড় মুরগী (সাঁওতালী ভাষায় সীম অর্থে মুরগী) আনিয়া বাবুর সম্মুখে হাজির।

খৃষ্টান পাদরিগণের চেষ্টায়, কৃপায় এবং প্রলোভনে আজকাল অনেক সাঁওতাল ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিতেছে এবং অন্ততঃ পোষাক পরিচ্ছদে বেশ 'সভ্য' হইতেছে। সেদিন মফস্বলে জনৈক সাঁওতাল খৃষ্টান নিম্নপ্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক আমার সহিত আলাপ করিতে আসিলেন। তিনি হিন্দি এবং বাংলা একরূপ বলিতে পারেন এবং যৎসামান্য ইংরাজীও জানেন। তিনি কোন্ চার্চ্চভুক্ত এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, উত্তর করিলেন যে তালপাহাড়ী 'চার্চ্চ। তালপাহাড়ী সন্নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম। তথায় খৃষ্টান মিশনরিদিগের একটি গির্জ্জা ঘর এবং 'আড্ডা' আছে।

সাঁওতাল দিগের মৃতদেহ দাহ এবং প্রোথিত করা,—এই উভয়বিধ রীতিই প্রচলিত আছে। তবে অসমর্থ পক্ষেরাই সমাধি দিয়া থাকে। মৃত ব্যক্তির হাড় তাহারা অতি যত্নসহকারে রাখিয়া দেয়—এবং সুবিধা পাইলেই গ্রামের কয়েক ব্যক্তি মিলিয়া সেগুলি পবিত্র দামোদরের জলে বিসর্জ্জন দিয়া থাকে।

শ্রীঅমলচন্দ্র দত্ত।

দুঃখী

রাস্তার ধারেই আমার বসিবার ঘর। আমি সকালবেলা আপনার মনে খবরের কাগজ পড়িতেছি একটা জোয়ান চেহারার লোক সটান্ আমার ঘর-চড়াও হইয়া আমার মুখের সামনে আসিয়া ধমক দিয়া বলিল—"বাবু, বখশিস দাও!"

কোথাও কিছু নাই, একটা অচেনা লোক থাম্‌কা বখশিস চায় দেখিয়া আমি বিস্মিত ভাবে তাহার দিকে চাহিলাম।

সে জোর-গলায় আবার বলিল—"বখশিস চাই!"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"বখশিস কিসের!"

সে আমার বিরক্তিতে একটুকু দমিল না। বেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া আমাকে যেন হুকুম করিতেছে এমনি ভাবে বলিল—"দুদিন খাওয়া জোটেনি; কিছু দিতে হবে!"

লোকটার ভাবগতিক আমার বড় মজার লাগিল। আমি বলিলাম—"খেতে পাওনি তো ভিক্ষে চাচ্চ না কেন? বখশিস চাও কিসের জন্য!"

ভিক্ষার কথা শুনিয়া সে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়া উঠিল, ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—ভিক্ষে চাইব কেন? আমি কি ভিখিরী!"

আমি বলিলাম—"তবে তুমি কি?"

সে তাহার মুষ্টিবদ্ধ হাতটাকে লইয়া শূন্যের উপর সজোরে একটা ঘা দিয়া বলিল—"গায়ের জোরে আদায় করি;—ভিক্ষে চাইব কেন?"

বলিয়া লোকটা আমার সামনে স্ফীত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখভাবে বোধ হইল যেন ভিক্ষা করার উপর তাহার আন্তরিক ঘৃণা আছে।

আমি বলিলাম—"এমন করলে তোমায় জেলে যেতে হবে জানো!"

সে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—"জেল থেকেই তো কাল ফিরিচি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জেল হল কেমন করে?"

সে চোখ দুটা পাকাইয়া বলিল—"দশ ব্যাটায় মিলে আমায় জোর করে নিয়ে গেল। হাতে পায়ে লোহার বেড়ি দিয়েছিল;—নইলে এই দুঃখীকে ধরে কার সাধ্যি!"

এমন সময় একটা গোলমাল শোনা গেল। আমি উঁকি মারিয়া রাস্তার দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, একটা লোককে একজন পাহারাওয়ালা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে।

দুঃখীও উদ্‌গ্রীব হইয়া উঁকি মারিল। উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"দেখুন বাবু, গরীব লোকটাকে ধরেচে—এখনি ওকে জেলে পুরবে!"

এই বলিয়া সে একেবারে ঝড়ের মতো গিয়া রাস্তায় পড়িল। চোখের নিমেষে পাহারাওয়ালার হাতের দড়িটা সে এক-ঝটকায় ছিনাইয়া লইল। বন্দী লোকটা মুক্তি পাইয়া তখনি ছুট্ দিল—মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে অদৃশ্য। রাস্তার লোক অবাক।

পাহারাওয়ালা আসিয়া দুঃখীর হাত ধরিল।

দুঃখী আহত সিংহের মতো গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া এমন জোরে এক ঠেলা দিল যে মুহূর্ত্তের মধ্যে পাহারাওয়ালা ভূমিসাৎ।

দুঃখী ছুটিয়া আসিয়া আমার ঘরের মধ্যে আশ্রয় লইল।

আমি বলিলাম—"এ কি করলি দুঃখী! আবার যে তোকে জেলে যেতে হবে!"

আমার কথা শুনিয়া দুঃখী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে একবার চাহিল; তার পর কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া উঠিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"ওরা গরীব লোকগুলোকে ধরে ধরে জেলে পুরবে কেউ কিছু বলবে না।"

পাহারাওয়ালা আসিয়া আসামীকে চাহিল।

আমি বলিলাম—"দুঃখী, ধরা দে।"

দুঃখী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"সে কি বাবু! তুমিও ওদের দলে!"

আমি বলিলাম—"তুই যে অপরাধ করেছিস দুঃখী! তোকে ধরা দিতেই হবে।"

দুঃখী গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—"কখ্‌খনো না! ধরুক দেখি আমাকে! কার বাপের সাধ্যি ধরে!"

এই বলিয়া সে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। তাহার সেই উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া পাহারাওয়ালা আর অগ্রসর হইবার সাহস করিল না;—সে জড়সড় হইয়া একেবারে এতটুকু হইয়া গেল।

আমি দুঃখীকে বলিলাম—"তুই যদি ধরা না দিস তো আমায় ফ্যাসাদে পড়তে হবে।"

দুঃখী চোখ দুটা বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"কেন?"

আমি বলিলাম—"তুই যে আমার ঘরে

লুকিয়েছিস—এখন তোর জন্যে যে আমি দায়ী। তুই ধরা না দিলে আমায় ধরবে।”

দুঃখীর মুখ দেখিয়া বুঝিলাম সে আমার কথার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে বুঝিতে চেষ্টাও করিল না। সে শুধু বলিল—“সত্যি বলচ বাবু! আমি না ধরা দিলে তোমায় ধরবে?”

আমি বলিলাম—“হাঁ দুঃখী! সত্যি বলচি।”

দুঃখী তার সেই সরল চোখ দুটি আমার আশঙ্কা-পীড়িত মুখের উপর একবার বুলাইয়া লইল; তারপর ধীরে ধীরে বলিল—“আচ্ছা বাবু, ধরা দিলুম।” বলিয়া সে পাহারা-ওয়ালার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—‘চল্, কোথা যেতে হবে চল্।”

এতক্ষণ দুঃখীকে আমার তেমন করিয়া দেখা হয় নাই। সে যখন আত্মসমর্পণ করিল, তার সেই ঔদ্ধত্যের রেখাগুলা যখন একটা নৈরাশ্যের পীড়নে মুহূর্ত্তের জন্য ভাঙিয়াচুরিয়া মুইয়া পড়িল তখন তাহার সমস্ত দেহের উপর এমন একটি সরল বিষাদ ফুটিয়া উঠিল যাহার মধ্যে তার সমস্ত জীবনের একটি করুণ ছবি আমি একনিমেষে দেখিতে পাইলাম।

আমি চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিলাম—“দুঃখী তুই যে বল্লি তোর দুদিন খাওয়া হয়নি, কিছু খাবি?”

আমার কথা শুনিয়া দুঃখী আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে শুধু একবার চাহিল;—কোনো উত্তর করিল না।

আমি চাকরকে ডাকিয়া দুঃখীর জন্য খাবার আনিতে বলিলাম। দুঃখী চুপ করিয়া বসিয়া সমস্ত খাবারগুলা শেষ করিল; তার পর আমার দিকে ফিরিয়া উদাসভাবে বলিল—“চল্লুম বাবু!”

পাহারাওয়ালা তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

(২)

অনেক দিন চলিয়া গেছে, ঠিক কতদিন আমার মনে নাই। সে দিন দুপুরবেলা আমার বাহিরের ঘরে বসিয়া একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছি এমন সময় দুঃখী আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

আমি বলিলাম—“কি রে দুঃখী! খবর কি? কোত্থেকে এলি?”

সে বলিল—“বাবু, জেল থেকে!”

আমি বলিলাম—“কেমন ছিলি?”

সে বলিল—“ছিলুম বাবু, মন্দ না!”

আমি বলিলাম—“জেলে তোর কষ্ট হতনা?”

সে বলিল—“কষ্ট আর কি?”

—“পাথর ভাঙতে হত না? ঘানী টানতে হত না?”

দুঃখী তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—“সে আর বেশি কষ্ট কি!”

আমি হাসিয়া বলিলাম—“তাহ’লে তুই জেলে থাকিস ভালো বল।”

সে বলিল—“বাবু! ঘানী টানতে পাথর ভাঙতে আমার গায়ে লাগে না। ঐ যে দিনরাত আটকে রাখে—বেরুতে দেয় না—ঐতেই বুকের ভিতরটা কেমন হুহু করতে থাকে।”

আমি এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই;

—দুঃখীর পিছনটিতে জড়সড় হইয়া লুকাইয়া একটি ছেলে তার পা জড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ দুঃখী একটু নড়িতেই সেই ছেলেটার শীর্ণ মুখের উপর ছোটো ছোটো দুটি, চোখের চকিত দৃষ্টি, দুঃখীর দেহের আড়াল হইতে একবার একটু বাহির হইয়াই আবার লুকাইয়া পড়িল।

আমি বলিলাম—"ও কে রে দুঃখী?"

দুঃখী ছেলেটাকে পিছন হইতে টানিয়া আনিয়া বুকের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল—"এ আমার ভাই-পো গো বাবু!" বলিয়া সে ছেলেটাকে মাটিতে নামাইয়া দিয়া বলিল—"গড় কর্, বাবুকে গড় কর!"

ছেলেটা হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া একবার আমার মুখের দিকে আর-একবার মাটির দিকে কেবল তাকাইতে লাগিল।

"গড় কর্‌না"—বলিয়া দুঃখী তার ঘাড়টা ধরিয়া সজোরে মাটিতে নোয়াইয়া দিল।

আমি বলিলাম—"দুঃখী এ তো তোর ভাই-পো! বাড়িতে আর তোর কে আছে?"

দুঃখী বলিল—"কেউ নেই বাবু! এ ছোঁড়াটাও ছিল না, আজ একে আবার পেয়েছি। ওটাকে বড় ভালোবাসতুম গো! ওর মা মরে যাবার পর থেকে আমিই ওকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। আজ ওটাকে পেয়ে আমার বুক যেন দশহাত হয়ে উঠেছে!"

বলিয়া দুঃখী ছেলেটাকে বুকের মধ্যে পুরিয়া সজোরে চাপিয়া ধরিল। সেই চাপুনিতে ছেলেটার মাছের মতো ছোটো ছোটো দুটো চোখ ঠেলিয়া বাহিরে আসিবার উপক্রম করিল। ছেলেটা তাহাতে কোনো বাঙনিষ্পত্তি করিল না;—দুঃখীর বুকের ভিতর সে ক্রমেই জড়সড় হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া যাইতে লাগিল।

আমি বলিলাম—"একে আজ কোথায় খুঁজে পেলি?"

দুঃখী বলিল—খুঁজতে হয়নি বাবু! আপনিই পেয়েছি। ওর বাপের যে জেল হয়ে গেছে। জেলে যাবার সময় ছেলেটার জন্যে ওর বাপ নাকি ভারি কেঁদেছিল, বলেছিল ওর আর কেউ নেই, ওকে সুদ্ধ তার সঙ্গে জেলে পাঠাতে! কিন্তু জজসাহেব সে কথায় কান দেয় নি। ছেলেটা অনাথ হল দেখে আমাদের সব ভাই-ব্রাদারিয়া ওকে আড্ডায় নিয়ে এসেছে—আমি আজ ফিরে এসে পেলুম।"

বলিয়া দুঃখী ছেলেটাকে আর-একবার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

আমি বলিলাম—"ওর বাপ এদ্দিন ছিল কোথায়?"

দুঃখী বলিল—"কি জানি বাবু! তার তো কোনো খবরই জানতুম না—একেবারে জেলের খবর শুনলুম। ওর বাপটা শয়তান। সেই তো ছেলেটাকে আমার কাছথেকে চুরি করে নিয়ে যায়!"

আমি বলিলাম—"চুরি করে? সে কি রকম?"

দুঃখী বলিল—"তবে শোনো বাবু। দেশে আমাদের সব মরে হেজে যেতে দাদা একদিন বল্লে—দুঃখী, চল কলকেতায় যাই, এখানে তো আর দিন চলে না,

সেখানে গেলে তবু রোজগার হবে। আমি বল্লুম—বেশ তো দাদা, চল না। দাদা জিনিষপত্র মাথায় নিলে, ছেলেটাকে আমি কাঁধে নিলুম,—দু-ভায়ে বেরিয়ে পড়লুম। আমার আর সম্বল কিছু ছিল না,—কেবল তিনটি টাকা ছিল। এই টাকা তিনটি বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলুম। তিনি মারা যাবার সময় তাঁর অনেক-দিনের জমানো ছ'টি টাকা আমাদের দুই ভাইকে ভাগ করে দিয়ে যান। পথে যেতে যেতে দাদা বল্লে—দেখ দুঃখী, তুই ছেলেমানুষ, পথে চোরডাকাতের ভয়, তোর টাকা আমার কাছে দে, আমি রেখে দি। আমি বল্লুম তা 'বই কি! এ টাকা আমি কাউকে ছুঁতে দেব না। দাদা রেগে বল্লে—তবে মরগে যা! আমি তোর কিছু জানি না। বলে দাদা মুখ ভার করে চলতে লাগল, আমিও আপনার মনে চলতে লাগলুম। সমস্ত দিন পথ চলেচি—সঙ্গে যা মুড়িমুড়কি ছিল তা প্রায় ফুরিয়ে গেছে—কেবল আমার কাপড়ের খুঁটে তখনও চারটি বাঁধা আছে;—ছেলেটা ক্ষিধের চেঁচাবে বলে তার জন্যে সেই ক'টি রেখে দিয়েছিলুম। খানিকদূর গিয়ে দাদা বল্লে দুঃখী তোর কাপড়ে মুড়ি আছে বার কর্। আমি বল্লুম—এ মুড়ি কেউ পাবে না, এ আমার খোকা খাবে। দাদা চটে উঠে বল্লে—যা তোর খোকাকে নিয়ে তুই মরগে যা! আমি এইখানে বসলুম। বলে দাদা একটা গাছতলায় বসে পড়ল। আমি আর দাদার দিকে না চেয়ে রেগে হন্‌হন্ করে চলে গেলুম। খানিকদূর গিয়ে রাগটা যখন পড়ে এল তখন দাদার জন্যে মনটা কেমন করতে লাগল। ভাবলুম দাদা রাগী মানুষ—যাই ঘাট মেনে তাকে নিয়ে আসিগে। এই ভেবে আবার ফিরলুম। ফিরে দেখিনা দাদা গাছতলায় বসে এক লুকোনো পুঁটুলি থেকে মুড়ি বার করে দিব্যি চিবুচ্চে। দাদা প্রথমে আমায় দেখতে পায়নি;—দেখেই চমকে উঠল। আমি বল্লুম—দাদা, এই যে বল্লি মুড়ি নেই, এখন মুড়ি কোথায় পেলি! দাদা বল্লে—যেখান থেকে পাই না তোর তাতে কি! আমি বল্লুম—দে আমায় মুড়ি, আমার ক্ষিধে পেয়েছে। দাদা বল্লে—দিলুম আর কি! তুই আমায় দিয়েছিলি? আমি বল্লুম—দিই নি তো কি? সমস্ত পথ তো আমার মুড়িতে ভাগ বসিয়ে এসেছিস। দাদা বল্লে—আমার খুসি আমি দেব না। আমি বল্লুম—চাইনে তোর মুড়ি, যা। বলে আমি ছেলেটাকে নামিয়ে সেইখানে বসে পড়লুম। বল্লুম—নে তোর ছেলে! তোর ছেলের বোঝা আমি বইতে পারব না। দাদা বল্লে—দে আমার ছেলে! বলে ছেলেটার নড়া ধরে হিড়হিড় করে টানতে লাগল। ছেলেটা ককিয়ে কেঁদে উঠল। তার কান্না আর থামে না। আমার দিকে চেয়ে চেয়ে সে কেবলই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠতে লাগল। আমি আর পারলুম না;—জোর করে দাদার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বসলুম।

"সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, রাতের অন্ধকারে আর পথ চলা যাবে না, ছেলেটাও ঘুমে

একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল। আমি তাকে সেইখানে শুইয়ে দিয়ে নিজে পাহারা দিতে লাগলুম। তারপর বসে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি—কিছু জানি না। যখন চোখ চাইলুম তখন অনেকখানি বেলা হয়েছে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম। এ পাশে দেখি, ও পাশে দেখি,—দাদাও নেই, ছেলেও নেই, কোমরে হাত দিয়ে দেখলুম টাকার গেঁজেও নেই। দাদাটা কী শয়তান! মায়ের পেটের ভাই হয়ে চুরি করলে গো!

"টাকার জন্যে দুঃখ হল না—টাকা ঢের রোজগার হবে—কিন্তু ছেলেটা যে গেল; তাকে তো আর পাব না—তার জন্যে প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠতে লাগল। নিজের হাতে মানুষ করলুম!—আমার বুক থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল গা!

"ছেলেটার জন্য কাপড়ে মুড়ি বেঁধে রেখেছিলুম—সে মু'ড় আর ছুঁতে পারলুম না—সেইখানেই ছড়িয়ে ফেলে দিলুম। তার দোলাইখানা আমার কোমরে জড়ানো ছিল, সেখানা দেখি আর চোখে জল আসে। সেখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি ছুটে পালিয়ে গেলুম। তারপর কত খোঁজ করেচি দাদাকেও পাইনি, ছেলেকেও পাইনি। আজ সেই হারানো ধন ফিরে পেলুম গো। কেবল দাদাটার সঙ্গে দেখা হল না।"

বলিয়া দুঃখী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

দুঃখী কথা শেষ করিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দুঃখী, আজ কি মনে করে আমার কাছে এসেচিস বলত?"

দুঃখী বলিল—"কিছু মনে করে আসিনি বাবু! আমার ছেলেটাকে তোমায় শুধু দেখাতে আনলুম।"

আমি একটা সিকি বাহির করিয়া বলিলাম—"এই নে দুঃখী, তোর ছেলেকে খাবার কিনে দিস্।"

দুঃখী আমার মুখের দিকে একবার চাহিল, একটু ইতস্তত করিল, তার পর আস্তে আস্তে হাত পাতিয়া সিকিটা গ্রহণ করিল।

(৩)

ইহার দুই-এক দিন পরেই এক বৈকালে ছেলেটাকে বুকে লইয়া দুঃখী আসিয়া হাজির। মুখখানা তার শুষ্ক মলিন।

আমি বলিলাম—"কি হয়েছে রে দুঃখী!"

দুঃখী বলিল—"বাবু, ভাই-ব্রাদারিরা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।"

আমি বলিলাম—"কেন?"

সে বলিল—"তারা বলে আমি মেয়েমানুষেরও অধম! আমি তাদের আড্ডায় থাকবার যোগ্য নই! ছেলে বুকে করে দিন-রাত থাকি—রোজগারে বেরুতে পারিনে! আমার দিন চলে কেমন করে?"

আমি বলিলাম—"তুই রোজগারে বেরুস্ না কেন?"

দুঃখী বলিল—"বাবু! ছেলেটা বুঝি যাদু জানে গো! ওর মুখের দিকে চাই আর আমার বুকের রক্ত যেন জল হয়ে আসে। বুকে বল পাইনা, সাহস পাইনা, তা রোজগার করতে বেরুব কি? জেলের ভয় তো এদ্দিন আমার ছিল না বাবু! এখন যে ভয়ে ভয়ে মারা

হয়ে গেলুম। জেলে গেলে ছেলেটাকে যে ছেড়ে যেতে হবে।—সে তো আমি পারবনা বাবু! ওকে ছেড়ে যে আমি কোথাও থাকতে পারিনা!" বলিয়া দুঃখী অতি করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

আমি বলিলাম—"তবে এক কাজ কর—"

দুঃখী আমার প্রস্তাব শুনিবার ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না। সে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল—"বাবু, আজকের মতো তুমি আমায় রক্ষে কর। ছেলেটার মুখে আজ সমস্ত দিন কিছু দিতে পারিনি—বাছা আমার ক্ষিধেয় সারা হয়ে গেল!"

বলিতে বলিতে দুঃখী থামিয়া পড়িল। খানিকক্ষণ ইতস্তত করিল; তারপর মাথা নীচু করিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—"বাবু, আজ কিছু ভিক্ষে দাও।"

আমি দুঃখীর হাতে একটি টাকা দিলাম।

দুঃখী সেটি অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিল। মনে হইল, সেই টাকাটার স্পর্শে তার সেই উদ্ধত হৃদয়টি যেন সঙ্কোচে নুইয়া পড়িল; সে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ছেলেটা আমায় ভিখিরী করলে গো!"

ছেলেটা তখন দুঃখীর বুকের উপর তার অবসন্ন মাথাটি রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দুঃখী তার মুখের দিকে একবার চাহিল; তারপর সেই ঘুমন্ত শিশুটিকে তার সমস্ত বুকখানা দিয়া বহন করিয়া বাহিরের কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গেল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

স্রোতের ফুল

(১৩)

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নবকিশোরকে রাজ-বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় উৎসুক ভাবে তাঁহার বাড়ীর বাহিরে একটি ছোট বাগানের সম্মুখে একখানি লাল বনাত গায়ে জড়াইয়া মহিম্ন-স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে পায়চারি করিতেছিলেন। স্তোত্রের তালে তালে তাঁহার পায়ের খড়ম চট্‌চট্ শব্দ করিতেছিল। রাজবাড়ীতে আরতি করিতে যাইবার সময় হইয়াছে, কিন্তু নবকিশোরের নিকট সমস্ত না শুনিয়া যাইতে পারিতেছিলেন না। তিনি অধৈর্য্যের সহিত ঘন ঘন পথপানে তাকাইতে-ছিলেন। ক্রমে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলিল। গোয়ালঘর হইতে সাঁজালের ধোঁয়া সন্ধ্যার কুয়াসায় মিশিয়া হিমঘন বাতাসকে ধূসর করিয়া তুলিল। এমন সময় নবকিশোর বাড়ী ফিরিল।

ভট্টাচার্য্য ডাকিলেন—বাবা কিশোর।

—আজ্ঞে।—ব'লয়া নবকিশোর পিতার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—মালতী কেন ডেকেছিল?

—সে এখান থেকে চলে যেতে চায়

তার ওপর অত্যন্ত অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে। সে জামা পরে বলে কেউ তাকে ছোঁয় না, কাছে বসতে দেয় না, কোনো কাজ করতে দেয় না। তা ছাড়া সকলে তাকে নানা রকম অকথা কুকথা বলে' অপমান করছে।

—ছোট বৌ কি করছেন, নিজের বোনঝিকে তিনি সামলাতে পারেন না?

—খুড়িমাও দেখলাম সকলের ওপর রাগ করে' মালতীকেই নির্যাতন করছেন।

—তুমি মালতীকে কি বলে এলে? নিয়ে যেতে স্বীকৃত হয়েছ?

—না বাবা, তাকে কোথায় নিয়ে যাব? সেখানে তাকে কে দেখবে? আমি বললাম, বিপিন আসা পর্য্যন্ত সহ্য করে থাকুক, সে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কেমন করে?

—বিপিন সর্ব্বদা বাড়ীর মধ্যেই থাকবে, তখন তার ভয়ে মালতীর ওপর কেউ কিছু উৎপাত করতে সাহস করবে না। আর মালতীও বিপিনের সঙ্গ পেয়ে নিতান্ত একলা বোধ করবে না।

—কিন্তু এটা ত রোগ প্রতিরোধ হল, রোগের প্রতিকার ত হল না। বিপিন একদিন বাড়ী থেকে অন্যত্র সরে গেলেই সকলের রুদ্ধ আক্রোশ যে একদিনেই সমস্ত শোধটা তুলে নেবার জন্যে প্রচণ্ড হয়ে উঠবে; যদিই বা না ওঠে, তবু মালতী ত কারো কাছে একটু স্নেহ যত্ন সহানুভূতি পাবে না। সকলের বিরাগভাজন হয়ে থাকা কি সহজ? এর প্রতিকারের কি উপায় ঠাওরেছ?

—এর প্রতিকার ত সহজ নয়। স্ত্রীশিক্ষা যতদিন না স্ত্রীলোকের চিন্তাকে প্রসারিত করে তাদের সামনে মহৎ আদর্শের পথ খুলে দিচ্ছে ততদিন ত তারা ক্ষুদ্রতা নীচতা ত্যাগ করে' ভিন্ন মতের লোককে ক্ষমার উদার চক্ষে দেখতে পারবে না।

—তবে সেই স্ত্রীশিক্ষারই ব্যবস্থা করতে হবে। তোমরা যদি রোগ বুঝেও প্রতিকারের চেষ্টা না কর তাহলে তোমাদের শিক্ষা'যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

—কিন্তু এই অসাধ্যসাধন কি আমার একলাকে দিয়ে হবে? আমি ত ঠিক করেছি গ্রামে গ্রামে টোল করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিয়ে বেড়াব। তারপর আমার ছাত্রেরা আলাদা টোল করে শিক্ষা দেবে। কিন্তু জমিদারের বাড়ীর বিলাস-দম্ভে-পুষ্টা লেখা-পড়ার বিরুদ্ধবাদিনী বয়স্কা মেয়েদের শিক্ষা দেবার ভার কে নেবে?

—বিপিনের নিজের বাড়ীর ভার বিপিনকে নিতে হবে। ভগবান সে পক্ষে অনেকটা সুবিধেও করে এনেছেন—সুশিক্ষিতা মালতীকে তিনি যখন এই ক্ষেত্রে এনে ফেলেছেন তখন তাঁর কল্যাণ হস্তের মঙ্গল সঙ্কেত ত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

—কিন্তু মালতী বিপিনের সঙ্গে কাজ করবার অবসর পাবে কি? পুরস্ত্রীরা শিক্ষিতা হয়ে তার কদর বোঝবার আগেই হয়ত মালতীর ভিতরকার সমস্ত কল্যাণভাব তারা অত্যাচার করে' নষ্ট করে' ফেলবে।

ভট্টাচার্য্য নীরবে দুবার পায়চারি করিয়া বলিলেন—আচ্ছা বলত, তুমি যতখানি দেখেছ শুনেছ তাতে মালতীর স্বভাব চরিত্র কেমন বোধ হয়?

নবকিশোর উৎসাহিত হইয়া বলিল—খুব

আলো।' মালতী বড় চমৎকার লক্ষ্মী মেয়ে। বিনয় আর তেজ, বশ্যতা আর স্বাতন্ত্র্য তার স্বভাবে চমৎকার মিশ খেয়েছে। গৃহকর্ম্মেও খুব পটু। একখানি নিখুঁত কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর প্রতিমা!

ভট্টাচার্য্য আবার নীরবে দুবার পায়চারি করিয়া বলিলেন—মালতীকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায় আমার মনে হয় মালতীর বিবাহ। তুমি কি মনে কর?

—আমিও এই কথা অনেক দিন ভেবেছি। কিন্তু বিধবার বিবাহের কথা সাহস করে তুলতে পারিনি।

—কেন বাবা, বিধবার বিয়ে ত অশাস্ত্রীয় নয়; দেশাচারে দিনকতক বন্ধ হয়ে গেছে। যা যুক্তি আর শুভবুদ্ধির প্রতিকূল নয় সে কথা স্বীকার করতে বা প্রকাশ করতে ভয় করলে চলবে কেন?

—কিন্তু মালতীর উপযুক্ত পাত্র কৈ?

ভট্টাচার্য্য নবকিশোরের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—আমি ঠিক করেছি মালতীকে আমারই পুত্রবধূ করব।

নবকিশোর কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল—না বাবা, আমি যে ব্রত গ্রহণ করেছি তাতে আমার বিয়ে করা সুবিধে হবে না।

—তুমি কি মালতীকে বিবাহ করতে আপত্তি করছ?

—না, তা নয়। যদি আমি বিয়ে করি তবে মালতীকে আমার সহধর্ম্মিণীরূপে পেলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব। কিন্তু আমার আপত্তি বিবাহের সম্বন্ধেই। আমার যুক্ত শক্তি আর বিপিনের অর্থ দেশে শিক্ষা প্রচারের জন্যে নিযুক্ত করতে হবে। বিপিন যে রকম পরনির্ভর দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক, তারই সহধর্ম্মিণীর উপযুক্ত পাত্রী মালতী।

—কিন্তু তোমার বাপ মা স্বেচ্ছায় বিধবাকে বধূরূপে বরণ করতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু বিপিনের বেলা যে মহা বিরোধ উপস্থিত হবে?

—সেই জন্যেই ত তার সফলতার মূল্যও বেশি হবে।......বিপিনের পরীক্ষা শিগ্‌গির শেষ হয়ে যাবে। আমি একবার কলকেতা গিয়ে তাকে সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করবার মতন করে তৈরি করে আনব।

—কিন্তু এখন তাকে মালতীর সঙ্গে বিবাহের কথা কিছু বোলো না। তাদের উভয়ের দেখাসাক্ষাতের পর উভয়ের মনের ভাব বুঝে তবে যা হয় করতে হবে। হঠাৎ কিছু করলে তা শুভ হবে না।......আচ্ছা, তুমি বাড়ী যাও, আমি আরতি করে আসি, তারপর এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা যাবে।......ওরে মুরলী, আমার একটা লণ্ঠন আর লাঠি গাছটা এনে দে ত।

নবকিশোর মালতীর বিবাহের কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল মালতীর রূপ, মালতীর শিক্ষা, মালতীর গুণপণা, মালতীর তেজস্বী মধুর প্রকৃতি—যাহা কিছু পুরুষ কামনা করিতে পারে মালতীতে সে সব প্রচুর মাত্রায় আছে। একটি ছোট্ট "হাঁ" বলিলেই এমন মালতী তাহার হইতে পারে; মালতীও দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আনন্দে তাহাকে বরণ করিতে স্বীকার করিবে। সুখের পথ তাহার সম্মুখে এমন প্রমুক্ত,

এমন সরল; সুখ তাহাকে সাধিয়া ফিরিতেছে সে হাত বাড়াইয়া শুধু তুলিয়া লইলেই হয়। কিন্তু না। বড় প্রলোভন মনে হইতেছিল বলিয়াই নবকিশোর জোর করিয়া মালতীর দিক হইতে মন ফিরাইয়া লইয়া ভাবিল কোনো প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সঙ্কল্প পণ্ড করিবার মতন দুর্ব্বল প্রকৃতি তাহার নহে; যেমন করিয়াই হোক বিপিনের সহিতই মালতীর বিবাহ ঘটাইয়া তুলিতে হইবে, তাহা হইলে মালতী স্নেহশীল উপযুক্ত স্বামীর আশ্রয়ও পাইবে এবং বিপিনের মতন একজন জমিদারকে সংস্কারের কাজে চিরদিনের জন্য পাওয়া যাইবে—যৌবনের আবেগ হ্রাস হইলে পুরাতন গণ্ডির মধ্যে ফিরিয়া গিয়া নিশ্চিন্ত হইবার পথ তাহার একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। মালতীকে দিয়াই বিপিনের দ্বিধার পথ রুদ্ধ করিতে হইবে।......কিন্তু মালতী বড় সুন্দর! বারবার করিয়া কেন মনে হইতেছে মালতী বড় সুন্দর! রূপে গুণে সুন্দর! অনির্ব্বচনীয় সুন্দর! অপরূপ সুন্দর! বড় লোভনীয়!.........হোক সুন্দর! হোক লোভনীয়! কল্যাণের সঙ্গেই এই সুন্দরকে যুক্ত করিতে হইবে, নিজের লালসার সঙ্গে নহে! নিজের চিরপোষিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহাকে এই ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে।......মালতী তাহার হইলে হইতে পারিত কিন্তু তাহাকে সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতেছে এই আনন্দবোধের দ্বারা নবকিশোর মালতীর চিন্তা চাপা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বায়ুহিল্লোলে সলিল-নিমজ্জিত পদ্মের মতো মালতীর মুখচ্ছবি নবকিশোরের আলোড়িত মনে থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, কিছুতেই তাহাকে একেবারে ডুবাইয়া রাখা যাইতেছিল না।

(১৪)

বিপিনের শেষ পরীক্ষার দিন দ্বিপ্রহরকালে নবকিশোর কলিকাতার বাসায় গিয়া পৌঁছিল। পঞ্চা খানসামার যত্নে তাহার স্নানাহারের কোনো অসুবিধা ঘটিতে পারিল না।

আহারান্তে মসলা চিবাইতে চিবাইতে নবকিশোর বৃদ্ধ খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিল—পঞ্চাদা, বিপিন বাড়ী যাবে কবে কিছু শুনেছ?'

—এঁজ্ঞে, তা ত আমি কিছু জানিনা ভাই। দাদাবাবু ত পড়া নিয়েই ব্যস্ত, ঘাড়ীঘরের কথা একবার না ভাবে, না চিন্তয়, তুমি ত এখন এসেছেন, এখন ওকে বলে কয়ে একবার দেশঘরে নিয়ে চল। সারা জীবনটাই যদি পড়বে তবে সুখ ভোগ করবে কবে?

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—সুখ না থাকলে কি কেউ কোন কাজ করে পঞ্চাদা? পড়াতেই আমরা সব চেয়ে বেশি সুখ পাই।

পঞ্চা একটু চটা মেজাজে রুক্ষ স্বরে বলিল—তুমিই ত নাটের গুরু, তুমিই ত বিপিনের স্বভাব চরিত্তির সব বিগড়ে দিলে। ও জমিদার! রাজার ছেলে! ও যে এই আহার নিদ্রে ছেড়ে সুখ সোয়াস্তি ভুলে ভূতের বেগার খেটে মরছে, সে কিসের জন্যে? ওর কি চাকরি করে খেতে হবে, না তোমার মতন টোল করে পোড়ো

পড়াতে হবে? লেখাপড়া করা ওর ত শুধু ভোগান্তি!

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—বিপিনের ভোগান্তি আর একটু বড়াবার চেষ্টা করছি পঞ্চাদা।

পঞ্চা তাহার গোল গোল, গাঁজার ধুমে লোহিতায়মান চোখ দুটো পাকাইয়া বলিল—সে কি কথা?

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—তোমার দাদাবাবুর বিয়ের চেষ্টা দেখছি।

এই শুভ সংবাদে পঞ্চা পরম সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—বিয়ের কি ঠিক হয়ে গেছে দাদাঠাকুর? কবে দিন ঠিক হল? কনেটি কোথাকার, কেমনতর, কত বড়টি?

পঞ্চা নবকিশোরের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল—মহারাজের বিয়ে হয়েছিল যখন বারো বচ্ছর বয়েস আর বড় রাণীমার বয়েস তখন পাঁচ বচ্ছর। বড় রাণীমা আমাদের সোণার লক্ষ্মী ছিলেন; বিপিন হল আর তিনি স্বর্গে চলে গেল।

পঞ্চা কাঁধের গামোছায় চোখ মুছিয়া বলিতে লাগিল—সেই বছর আমার কেষ্ট বলে ছেলেটাও মারা যায়; সে বচ্ছর দেশে খুব বান হয়েছিল; সে হল গিয়ে এককুড়ি তিন বচ্ছরের কথা। আমিই ত বিপিনকে হাতে করে মানুষ করে এত বড়টি, করেছি, আমার কাছে ত আর ওর কোনো কথা ছাপা নেই, এখন পঞ্চাদাদা বুড়ো হয়েছে বলে তার কথা শোনা হয় না। বিয়ে-থার কথা বল্লে বলে কিনা—হবে হবে পঞ্চাদা, বিয়ের বয়েস ত পালায়নি!.........শোন দেখি একবার কথা! আমি বলি বিয়ের বয়েস পালাচ্ছে না ত কি দাঁড়িয়ে আছে?......তা শুনে শুধু হাসে। ছোট রাণীমা, সৎমা এমন হবে না, অনেক পুণ্যি করে বিপিন এমন সৎমা পেয়েছিল, তিনি কত রাগ করে, মহারাজ রাগ করে! তা দাদাবাবু ত কারু কথা শোনে না। এক শোনে শুধু তোমার কথা। তা তোমরা ত চোরে চোরে মাসতুত ভাই! তুমি ত তাকে কিছু বলবে না।...এবার দেখছি তোমার কি সুমতি হয়েছে যে দাদাবাবুর বিয়ের কথা বলছ। কনে ঠিক হয়েছে? দেখেছ? কত বড়টি?

নবকিশোর বৃদ্ধ ভৃত্যের এই তিরস্কার-মিশ্র স্নেহের অনুযোগ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—হ্যাঁ পঞ্চাদা, বিয়ে ত একরকম ঠিক। কনে যেন পরী। বয়েস এই আঠারো উনিশ।

পঞ্চা দাঁত বাহির করিয়া বলিল—হেঁ হেঁ হেঁ তুমি আমার সঙ্গে পরিহাস করছ।

নবকিশোর গম্ভীর হইয়া বলিল—পরিহাস নয় পঞ্চাদা। তোমার দাদাবাবুর বয়েস হয়েছে, এখন ন বছরের একটি খুকির সঙ্গে দিয়ে দেওয়া কি মানায়? তাই ন দুগুণে আঠারো বছরের কনে ঠিক করা যাচ্ছে।

পঞ্চা বিস্মিত হইয়া বলিল—তা বলে' কি একটা ধেড়ে মাগীর সঙ্গে বিয়ে হওয়া মানাবে? এত বড় মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া ত শাস্তরে দোষ লিখছে—এতে চোদ্দপুরুষ নরকস্থ হয়।

—পুরোণো শাস্তরের পুরোণো বিধান আমরা সব বদলে দিয়ে এখন নতুন শাস্তর চালাব—ছোট মেয়ের বিয়ে দিলেই চোদ্দপুরুষ কেন ছাপ্পান্ন পুরুষ নরকস্থ হবে, আমাদের নতুন শাস্তরের এই বিধান!

—ছিছি! এমন খিষ্টানি কথা বোলো না ভাই! তোমরা হলে বামুনপণ্ডিত মানুষ, তোমার এমন কথাটা বলা উচিত হয় না।

—আমরাই ত বলব পঞ্চাদা। শাস্তর তৈরি করে ছিল যারা তারাও ত আমাদেরই মতন বামুনপণ্ডিত ছিল। তারা যেখানে যেখানে ভুল করে' গেছে, কিংবা সেকালের বিধান একালে ঠিক সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না, সেসব বিধান ত আমরাই শুধরে তুলব।

পঞ্চা জিভ কাটিয়া বলিল—ছিছি! অমন কথা বলতে নেই! তোমরা ছেলে মানুষ, রক্ত গরম বলে কাউকে ত মানো না! ওতে যে পাপ হয়! দেবতায় শাস্তর করেছে, সেই দেবতার অপমান হয়!

—দেবতারা কালিকলম নিয়ে মানুষের জন্যে শাস্তর লেখেনি। দেবতার যে শাস্তর সে সত্যিকারের শাস্তর, সব মানুষের মনের মধ্যে জ্ঞানের অক্ষরে বুদ্ধির ওপর সে শাস্তর লেখা। সেই শাস্তর যাঁরা ভালো করে পড়তে পারেন তাঁদেরকে আমাদের দেশে মুনিঋষি বলে। তাঁরাও এই আমাদের মতনই মানুষ। তাঁদের ভুল হবে না? জাননা, কথায় বলে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম।" ঘরের বেরাল বনে গেলেই বনবেরাল হয় পঞ্চাদা। আমরাও যদি হাজার বছর আগে জন্মাতাম তবে আমরাও তোমাদের কাছে একটা কেষ্টবেষ্ট কিছু হতাম। চাই কি তোমরা মন্দিরে মন্দিরে আমাদের প্রতিমা গড়ে' সিঁদুর চন্দন লেপতে।

—রামঃ রামঃ! তোমাদের সঙ্গে কে পারবে ভাই? ভটচায্যির ছেলে যখন ইংরিজি পড়েছ তখন আর জাতধর্ম্ম কি থাকল? গোরুখোরের বাক্যি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে কি আর ধর্ম্মে মতি থাকে?

নবকিশোর ঘর ভরিয়া হোহো করিয়া হাসিয়া বলিল—তুমিও ত গোরুখোরের বাক্যি উচ্চারণ কর পঞ্চাদা! রেলগাড়ী, ইষ্টিসান, ইষ্টিমার, গেলাস, চেয়ার, টেবিল, টেলিগ্রাফ কত কি কথা বল। তার ওপরে আবার মোছলমানের তৈরি বরফ সোডার জল খাও। তোমার ঠিক জাত গেছে। এবার বাড়ী গিয়ে তোমার জাতেদের বলে দেবো, তিন চার কুড়ি টাকা খরচ হয়ে যাবে তোমার জাতে উঠতে।

গতিক ভালো নয় দেখিয়া পঞ্চা বলিল—যা ভালো বুঝিস কর্ ভাই, আমরা হলাম মুরুখ্খু সুরুখখু মানুষ, তাতে আবার বুড়ো হাবড়া হয়েছি, আমাদের এখন মলেই হয়।

পঞ্চা আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল। নবকিশোর স্মিতমুখে শয্যায় শয়ন করিয়া প্রাচীন ও নবীন সংস্কারের সমন্বয়সমস্যা চিন্তা করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিপিন তারককে সঙ্গে করিয়া বাসায় আসিয়া নবকিশোরকে দেখিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—বাহব্বা!

কিশোর যে! একেবারে surprise visit! কখন এলে? খবর সব ভালো ত?

তারক তাহার শীর্ণ মুখের মধ্য হইতে বড় বড় শাদা শাদা দাঁত সবগুলি বাহির করিয়া বলিল—কিহে ভটচায্ ভালো ত?

নবকিশোর স্মিতমুখে বলিব—সব ভালো!...

তারপর বিপিন, কেমন এগজামিন দিলে?

—মন্দ নয়। পাশ হব। তবে ফার্ষ্ট ক্লাশ হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছিনে। এংলো স্যাক্সন ফাইললজির পেপারটা একটু খারাপ হয়ে গেছে; আর প্রোজ পেপারটাও তেমন মনের মতন হয় নি।

—অন্য পেপারগুলো সব ভালো হয়েছে ত? তবে ভয় নেই, ফার্ষ্ট ক্লাশ হয়ে যাবে।... তারপর বাড়ী যাচ্ছ কবে?

—এই ত তুমি এসেছ, যেদিন বলবে।

—যাবার আগে অনেক কাজের পরামর্শ করে' মতলব এঁটে বাড়ী যেতে হবে।

—কি পরামর্শ?

সে অনেক কথা। এখন তাড়াতাড়ি হবে না। হাত মুখ ধোওগে। সন্ধ্যার পর পরামর্শ হবে এখন। তুমি যাও, আমি ততক্ষণ তাড়কার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ জুড়ে দি।

তারক দাঁত বাহির করিয়া, গলার শিরা ফুলাইয়া বলিল—বেশ! এহেহি যুদ্ধং দেহি!......কোন্ বিষয়ে যুদ্ধ হবে? বিধবা-বিবাহ, না জাতিভেদ, না সমুদ্রযাত্রা, না কি?

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—আরে ছ্যাঃ! ঐ একঘেয়ে বকেয়া বকুনি কি আর ভালো লাগে। ঐ সব পুরোণো মতের আলোচনার চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তোমরা নব্য হিন্দুর দল, নতুন রকম একটা সমস্যা খাড়া কর তবে ত!

তারক গম্ভীর হইয়া বলিল—যথা?

নবকিশোরও খুব গম্ভীর হইয়া বলিল—এই মনে কর, তোমরা বিধান দেবে যে মেয়েদের দ্রৌপদীর মতন একেবারে পঞ্চস্বামী হবে, তা হলে তারা সতীকে সতী থাকবে অথচ পঞ্চ আপৎস্থ পাঁচমোহাড়া আগলানো থাকাতে বিধবাবিবাহের পাপের আশঙ্কা থাকবে না; কিংবা ধর, মেয়ে জন্মাবামাত্র তাদের চক্ষু উৎপাটন আর জিহ্বা ছেদনের ব্যবস্থা দেবে, তা হলে আর স্ত্রীশিক্ষার কথা কেউ তুলবেও না। কিংবা এই বিধান দেবে যে সকলকেই স্বপাক খেতে হবে, নইলে জাত যাবে, অধর্ম্ম হবে, সাড়ে সাতান্ন পুরুষ রৌরব নরকে বায়ান্ন লক্ষ বৎসর ডুবে থাকবে;—কারণ, জোর করে ত বলা যায় না যে স্ত্রী-কন্যারাও ঠিক আমাদের স্বজাত!...এগুলো নমুনা মাত্র। এই রকম ধরণের বিশেষ গবেষণাত্মক নতুন নতুন ব্যবস্থা দাও। তখন তার বিরুদ্ধে বা স্বপক্ষে যে আলোচনা চলবে তা মৌলিক এবং নতুন রকমের হবে বটে। মনুর আমলের মতগুলো যেমন পুরোণো, তার আলোচনাও তেমনি পুরোণো হয়ে গেছে। বুদ্ধিমান লোকের এখন ওসব বিষয়ে আলোচনা না করলেই বুদ্ধির মর্য্যাদা রক্ষা হয়।

তারক নবকিশোরের কথা শুনিয়া বুঝিল যে নবকিশোরের এখন তর্ক করিবার ইচ্ছা নাই, সে তাহাকে লইয়া বিদ্রূপ করিতেছে। তারকের বেশ জানা ছিল যে নবকিশোরের

বিদ্রূপের ঝাল কি রকম উগ্র। সুতরাং সে আত্মরক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া বলিল—ওহো! একটা বিশেষ কাজ মনে পড়ে গেল, আমি চট করে' ঘুরে আসছি।

নবকিশোর বলিল—তবে এখন ঝগড়া ধামা চাপা থাক। অন্য দিন মীমাংসা হবে। কিন্তু কাজটা কি জরুরি?

—উঃ বড্ড।

—কিন্তু অভয় যদি দি যে তর্ক দ্বন্দ্ব এখন সন্ধিতে বন্ধ থাকবে, তা হলে?

—কেন, আমি কি তর্ককে ডরাই নাকি। আচ্ছা, আমি ঝাঁ করে ফিরে আসছি।

তারক ধাঁ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণেক পরে বিপিন আসিয়া নবকিশোরকে জিজ্ঞাসা করিল—তাড়কা গেল কোথায়?

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—আমার নতুন শাস্ত্রবিধানের আভাস পেয়ে ভেগেছে। ফিরে আসবে বলে গেছে বটে, কিন্তু আজ আর সে ফিরছে না।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—চল আমরা বারান্দায় গিয়ে বসিগে।

দুই বন্ধু রাস্তার ধারে বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া মোটা মলিদার চাদর গায়ে জড়াইয়া বসিল। কলিকাতার ধোঁয়া ও ধূলার চাদর গায়ে জড়াইয়া শীতকালের ভারি বাতাস আড়ষ্ট হইয়া আছে। ধূলিধূমের কুজ্‌ঝটিকা ভেদ করিয়া পথপ্রান্তের গ্যাসের আলো ঝাপসা হইয়া মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল—যেন দূর আকাশের অস্পষ্ট নীহারিকা। তাহার ধূসর আলোকে সমস্ত কলিকাতা কেমন যেন তন্দ্রাতুরের মতন দেখাইতেছে। মধ্যে মধ্যে বাড়ী কাঁপাইয়া, সহিসের চীৎকারে গলি ভরিয়া, মাতালের চোখের মতন ঘোলা আলো চমকাইয়া ঘোড়ার গাড়ী ছুটিয়া যাইতেছিল। দুই বন্ধু রাজপথের বিচিত্র জনপ্রবাহ দেখিতে দেখিতে গল্প করিতেছিল। নবকিশোর বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা বিপিন, তোমার চোদ্দপুরুষে ত লেখা পড়া কেউ করেন নি। তুমি এই অনভ্যস্ত বিদ্যার-বোঝা নিয়ে কি করবে? জমিদারীর জমাখরচের খাতার মধ্যেই কি এর হিসেব তোলা থাকবে?

বিপিন হাসিয়া বলিল—"ঘরের কোণে বুড়ো থাকুন।

পয়সা কড়ি করুন জমা,
দেখুন বসে বিষয়পত্র
করুন মামলা মোকদ্দমা।"

আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কাব্য আলোচনা করব। কাব্য আলোচনার সুখ এমনি মিঠে যেন প্রেমসীর প্রথম চুম্বন—তেমনি এক অবুঝ আনন্দভরা, আধো গুপ্ত আধো ব্যক্ত ভাবের, কী চমৎকার! সে সুখ ছেড়ে জমাওয়াশীল বাকী, আর কোর্ফা মোকররবি? রামঃ!

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—কবি, তোমার প্রেয়সীর প্রথম চুম্বন আর বেশি দিন কেবলমাত্র কল্পনার সামগ্রী হয়ে থাকছে না; শীঘ্রই সে সুখের অভিজ্ঞতা লাভ হবে। তখন যেন সেই শরীরিণী কবিতা পুঁথিগত সরস্বতীকে বিদূরিত না করে।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—না হে না, সে শুভদিন যদি আসে তবে তখনই

ত আরো বেশি করে' বাণীর দরকার হবে নিজের অব্যক্ত ভাবকে আকার দেবার জন্যে। "লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে, কবি লুকাইয়া কবে তাহারে।"

এমন সময় তারক আসিয়া সেইখানে উপবেশন করিল। বিপিন বলিল—শুনছ তাড়কা, কিশোর আমার প্রেয়সী-সম্মিলনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন; কিন্তু আমি এমন স্বার্থপর কেমন করে' হই বল ত? একযাত্রায় দুইবন্ধুর পৃথক ফল ত হতে পারে না। কিশোর, তোমাকেই ভাই বিশেষ করে' দেখবার শোনবার একটি অভিভাবকের দরকার। তুমি ত রাতদিন পরের ভাবনা ভাবতেই এত ব্যস্ত যে তোমার নিজের ভাবনা ভাববার অবসরই হয় না তোমার। তা ছাড়া তুমি দার্শনিক লোক; দর্শন নিয়েই মেতে থাক, নিজের দিকে ত দর্শন করবার অবসর থাকে না। তুমি যখন তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল বিচার করতে বসে যাবে, তখন কড়ির তেলটুকু যাতে তৈলাধার পাত্রেই থাকে, তোমার বুদ্ধির সঙ্গে মাটিতে ঢেউ খেলিয়ে না বয়ে যায়, তা দেখবার জন্যে একজন পোক্ত অভিভাবকের বিশেষ দরকার। সেটিকে কবে বরণ করে ঘরে তুলছ বল দেখি।

নবকিশোর হাসিতে হাসিতে বলিল—তোমরা বড়লোক তোমাদের সময় বাজে খরচ করাটা মানায়; আমরা গরীব মানুষ সময়টাকে কাজে না খাটালে চলে না। সেই জন্যে কবিত্বের সমস্ত আনুষঙ্গিক উপসর্গ বহন করবার ভার তোমারই থাক; আমরা কড়া ধাতের লোক কঠিন কর্ম্মেই আমাদের আনন্দ। তোমাকেও তা বলে' একেবারে ছাড়ব না; তোমাকেও প্রেয়সীর আঁচল থেকে টেনে টেনে মাঝে মাঝে বা'র করব—এতখানি মূলধন সুদে না খাটিয়ে অমনি পড়ে থাকতে দেবো তা মনেও কোরো না।

তারক গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি চিরকুমার হয়ে কি সংসার ত্যাগ করবে?

নবকিশোর বলিল—কেন কি দুঃখে সংসার ত্যাগ করব?

—সংসারে থাকবে অথচ বিয়ে করবে না, সে কি রকম? না সন্ন্যাসী না গৃহী!

—কেন, সন্ন্যাসী হলেই কি সংসার ত্যাগ করতে হবে এমন কোনো কথা আছে নাকি? তারাই ত প্রকৃত সন্ন্যাসী যারা সংসারে থেকে দেশের দশের হিত করে। নিজের যতটুকু জ্ঞানের পুঁজি তাই সকলের মধ্যে বেঁটে দিয়ে ধন্য হওয়াই ত সন্ন্যাসী আর ব্রাহ্মণের কাজ। লেখাপড়া শিখে শিক্ষার আনন্দ নিজে স্বার্থপর হয়ে ভোগ করা ব্রাহ্মণের ত কাজ নয়। মা সরস্বতীর বীণার তারে যে কি অপূর্ব্ব আনন্দরাগিনী বাজে তা যতটুকু তুমি শুনতে পেয়েছ সেই টুকুরই সংবাদ পাঁচজনকে দিলে তবে তোমার কর্ত্তব্য পালন করা হবে। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণরা ত এই জন্যেই পূজ্য, গুরুর সম্মান পেয়ে আসছেন। এখন প্রত্যেক শিক্ষিত লোক যিনি শিক্ষা প্রচার না করছেন তিনিই এই মহৎ কর্ত্তব্য অবহেলা করে ব্রাহ্মণের সম্মান খর্ব্ব করে তুলছেন। সুতরাং শিক্ষিত লোকের সমাজে একটা গুরু

দারিত্ব আছে—শিক্ষিত ধনীর দায়িত্ব আরো বেশি।

বিপিন নবকিশোরের কথার গূঢ় অর্থ বুঝিয়া বলিল—আমার যথাসাধ্য আমি করব। কিন্তু জান ত আমি কি রকম অলসপ্রকৃতির লোক, নিজে উদ্যোগী হয়ে কিছু করে তুলতে পারি নে। তুমি একটা জোগাড়যন্ত্র খাড়া করে আমায় একটা কাজে লাগিয়ে দিয়ো। আমাকে খাটিয়ে নেবার ভার তোমাকেই নিতে হবে।

নবকিশোর বলিল—আমি একটা মতলব ঠাওরেছি।—প্রথমত পাশাপাশি কতকগুলি গ্রাম ঠিক করে এক একটি মণ্ডল নির্দ্দিষ্ট করতে হবে; প্রত্যেক মণ্ডলে এক একটি পাঠশালা হবে; সেখানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা একত্র পড়বে। পাঠ্যরূপে পুস্তক নির্দ্দিষ্ট থাকবে না বল্লেই হয়—শিক্ষক মুখে মুখে ছবি, ম্যাপ প্রভৃতি দেখিয়ে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করবেন; স্কুলের বেতনও হবে নামমাত্র; এতে গরিব লোকেও ছেলে-মেয়ে স্কুলে পাঠাতে অসুবিধা বোধ করবে না। স্কুলে যেমন আয় থাকবে না তেমনি ব্যয়ও করা চলবে না—স্কুল-ঘর, চেয়ার, টেবিল কিছুরই হাঙ্গাম থাকবে না। কোনো শুকনো উঁচু ডাঙায় গাছের ছায়ায় স্কুল বসবে—সেকালের মতন মেঘ ডাকলেই অনধ্যায়। শিক্ষকের বাসাতেই একটু স্থান করে স্কুলের বই ম্যাপ প্রভৃতি সরঞ্জাম রাখতে হবে। শিক্ষকও আমাদেরই তৈরি করে নিতে হবে। তুমি মথুরাপুরে বসে রশদ জোগাবে, আর আমি মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরে সমস্ত ব্যবস্থা পরিদর্শন করে বেড়াব। একটু শিক্ষার প্রসার হলে তখন গাঁয়ে গাঁয়ে ছোট ছোট লাইব্রেরী স্থাপন করতে হবে এবং মথুরাপুরে একটি বৃহৎ কেন্দ্র লাইব্রেরী করে তার বাছা বাছা বই এক একবার সকল লাইব্রেরীকে ধার দিয়ে দিয়ে ঘুরিয়ে আনতে হবে। দেশের যেখানে যেখানে মাইনর কি ছাত্রবৃত্তি স্কুল আছে সেই গুলিকে পুষ্ট করবে আমাদের প্রাথমিক পাঠশালাগুলি। ছেলেদের মতন মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্যে স্থানে স্থানে পৃথক ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর মেয়ে স্কুলও স্থাপন করতে হবে। লোকে শিক্ষার মর্য্যাদা একটু বুঝলে তখন সমবেত চেষ্টায় চাইকি স্থানে স্থানে এণ্ট্রান্স স্কুলের সমকক্ষ পাঠশালা আমরা স্থাপন করতে পারব। এই কাজটাকে গ'ড়ে তুলতে পারলে তোমার অর্থ ও শিক্ষা ধন্য হবে।

তারক দাঁত বাহির করিয়া বলিল, থিওরি আর প্র্যাকৃটিসে যথেষ্ট প্রভেদ আছে হে ভায়া! কবিত্বের স্বপ্ন দেখা সোজা, কিন্তু কাজের ল্যাঠা বড় ভারি বোঝা!

নবকিশোর বলিল—নিশ্চয়ই; সেই জন্যেই ত কাজের মূল্য বেশি।

বিপিন তারকের কথা লক্ষ্য না করিয়াই নবকিশোরকে জিজ্ঞাসা করিল—এখন আমরা কাজটা সুরু করে দেবার মতো টাকা কোথায় পাব? বাবা ত এসবের উপকারিতা বুঝবেন না।

নবকিশোর বলিল—তুমি তিনবার পাশ করে' তিনটে তালুক যৌতুক পেয়েছ; এবারে একটা পাবে। এইগুলির স্বত্ব তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

বিপিন বলিল—কিন্তু গভমেণ্ট কি

তাঁদের-সম্পর্কশূন্য এই শিক্ষাবিস্তার নেক নজরে দেখবেন? আর সরকারী-সম্পর্কের হ্যাঁপা সামলাবার মতন সামর্থ্য ত আমাদের নেই।

নবকিশোর বলিল—না, বড়লোকের ল্যাঠাও বড়, তাদের সম্পর্কে থাকা আমাদের পোষাবে আমাদের স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবেই কাজ করতে হবে। গভমেণ্ট জ্ঞান আর শিক্ষা বিস্তারকে একটু ভয়ের চক্ষে দেখে থাকেন। কারণ তাঁরা খৃষ্টান, খৃষ্টানরা জ্ঞানবৃক্ষের ফলকে আদিম মানব আদমের আমল থেকে ভয় করে' আসছেন। তাঁরা কিছুতেই বুঝতে চান না যে অজ্ঞানের অন্ধকারেই সয়তান লুকিয়ে থাকে! জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষকে সমান করে' তোলে বটে, কিন্তু শত্রু করে না। এই ধর তোমার নিজের বাড়ীতেই অজ্ঞান কি অকল্যাণটাকেই না পোষণ করছে। মালতী জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফলের যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদ করে সে বাড়ীতে ঢুকেছে বলে একেবারে হুলুস্থুল বেধে গেছে।

বিপিন উৎসুক হইয়া বলিল—কেন কি হয়েছে?

নবকিশোর বলিতে লাগিল—প্রথম কারণ, মালতী বিধবা হয়েও একগাছি চুড়ি আর নরুণ পেড়ে কাপড় পড়ে গিছল। সে কিন্তু গিয়েই সে সব ছেড়েছে—এ ত্যাগ তার সেই অচেনা স্বামীর স্মৃতির সম্মানে নয়, নিজের মনের বৈরাগ্য হতেও নয়, এ ত্যাগ সমাজের জবরদস্তি জুলুমের জন্যে।

তারক আস্ফালন করিয়া বলিয়া উঠিল—যে লোক সমাজে থেকে সমাজের আদর্শ অবহেলা করবে তার ওপর জুলুম করবার অধিকার সমাজের একশ বার আছে...

নবকিশোর তারকের আস্ফালন লক্ষ্য না করিয়াই বলিয়া যাইতে লাগিল—দ্বিতীয় কারণ, মালতী শেমিজ পরে; সেটা সে কিছুতেই ছাড়তে পারেনি। তৃতীয় কারণ, সে স্বীকার করেছে যে সে লেখাপড়া জানে। চতুর্থ কারণ, সে তুচ্ছ বিষয়ের আলাপে যোগ দিতে পারে না। পঞ্চম কারণ, সে পুরুষকে দেখে ব্যাঘ্রঝম্পে পলায়ন করাটাকেই অধিক লজ্জার কারণ মনে করে। এইসব তুচ্ছ কারণে সবাই মিলে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে; নির্য্যাতনের অবধি নেই—কেউ তাকে একটি ভালো কথা বলে না; কোনো কাজ ছুঁতে দেয় না; সে অত লোকের মধ্যে একলা পড়ে কারাযন্ত্রণা ভোগ করছে। বাড়ী গিয়ে তোমার প্রথম কাজ হবে মালতীকে রক্ষা করা। তার পর পরিবারগত কুসংস্কার দূর করে' পুরস্ত্রীদের শিক্ষায় আদর্শে উন্নত করে তোলা। মালতীকে তুমি দোসর করে নিতে পারলে তোমার শ্রম অনেক লাঘব হয়ে যাবে।

তারক বলিয়া উঠিল—খবরদার অমন কর্ম্ম কখনো কোরো না, কোরো না, তোমাদের খৃষ্টানি আদর্শ আমাদের শান্ত অন্তঃপুরে খাড়া করে' আগুন জ্বালিয়ে তুলো না বলছি। তোমরা যা করছ পুরুষেরাই তাতে জ্বলুক, আমাদের কুললক্ষ্মীদের শান্তি নষ্ট করলে তোমাদেরও কল্যাণ হবে না।

বিপিন অসহায়া মালতীর প্রতি নিজের

পরিবারগত অত্যাচার নিজকৃত অপরাধ মনে করিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিল,--অকল্যাণের আবর্জ্জনা দূর করতে আগুন যদি জ্বালতে হয় ত জ্বালব। আর অন্যায়ের প্রতিকার যদি না করতে পারি তবে সে আগুনে নিজেরাই পুড়ে মরব--পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছাড়ব।

ভাবপ্রবণ বিপিনকে উত্তেজিত দেখিয়া নবকিশোর সন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—সম্পর্ক ছাড়লে চলবে কেন? মা বোন ত ছাড়বার নয়; তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই পরিবারের মধ্যে নূতন উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেত হবে।

বিপিন অল্পক্ষণই চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—আচ্ছা কিশোর, মালতীর বিয়ে দিলে হয় না?

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—পাত্র?

বিপিন হাসিয়া বলিল—তুমি।

নবকিশোর হাসিতে হাসিতে বলিল—আগে মালতীকে একবার দেখ, তারপর পার যদি পরের নাম কোরো।

বিপিন হাসিতে লাগিল। তারক চোখমুখ লাল করিয়া বলিয়া উঠিল—এঁ্যা! তোমরা কি এমনই অধঃপা[illegible] ছ যে ব্রহ্মচারিণী বিধবাকে নিয়ে র[illegible]! 'জেনো তোমরা—হিন্দুসমাজ এখনো মরে নি।' সেই বিপুল প্রকাণ্ড শক্তিকে তোমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে' তুলো না. [illegible]তে কল্যাণ হবে না, হবে না, হবে না, এ[illegible] বলে রাখছি।

তারক আবেগের তাড়নায় বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। নবকিশোর ও বিপিনের উচ্চ হাস্য তাহার পশ্চাতে তাড়া করিয়া ছুটিতে লাগিল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইউরোপের সমর-অভিনেতৃগণ
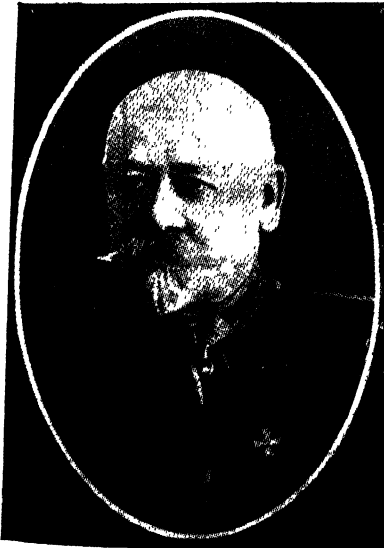
রাসিয়ার প্রধান সমর-সচিব
(General Soukhomlinoff)

রাসিয়ার ফরেণ মিনিষ্টার
(M. Sazonoff)
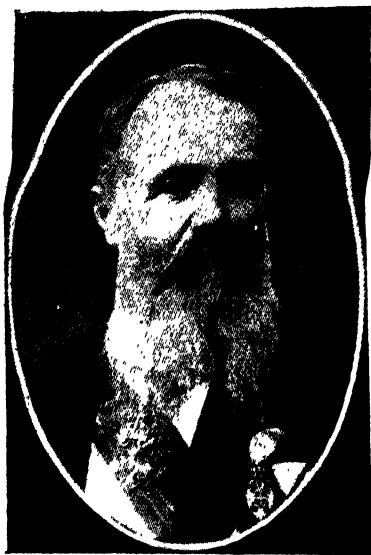
সার্ভিয়ার প্রধান-মন্ত্রী
(M. Pashitch)
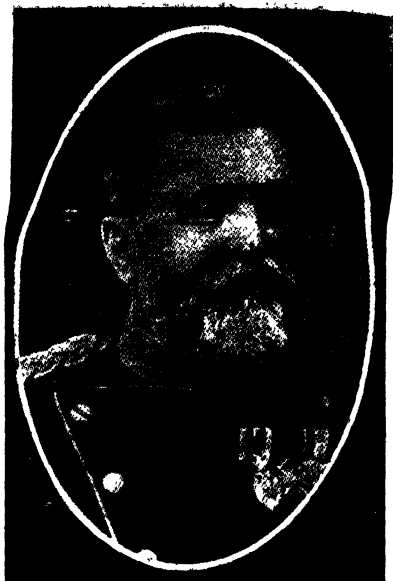
সার্ভিয়ার প্রধান সমর-সচিব
(General Putnik)
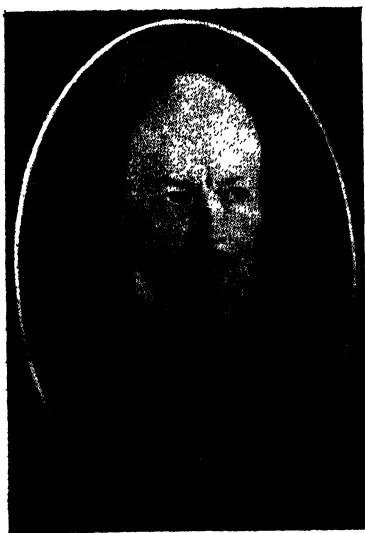
অষ্ট্রীয়ার প্রধান-মন্ত্রী
(Count Berchtold)

অষ্ট্রীয়ার সমর-সচিব
(General Hotzendorf)

রবার্ট ব্রাউনিং

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের একজন ব্যাঙ্ক-কেরাণীর গৃহে রবার্ট ব্রাউনিং জন্ম গ্রহণ করেন। এই ছেলেটি ভবিষ্যতে কিরূপ বিখ্যাত ও বিশ্ববিদিত হইবে তাহা গোড়া হইতে কেহ বলিতে না পারিলেও, ইঁহার শৈশবের কার্য্যপ্রণালী দর্শনে ইনি যে ঠিক সাধারণ ছেলে নহেন তাহা বেশ বোঝা গিয়াছিল।

ব্রাউনিংয়ের মাতা ছেলেকে বিছানায় শোয়াইয়া গীতবাদ্যে নিযুক্ত হইলে ইনি ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া "আবো গাও, আবো গাও!" শব্দে মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। ইঁহার যে শিক্ষালাভ তাহা তাঁহার পিতামাতার নিকট হইতেই হইয়াছিল। পারিবারিক গণ্ডীর মধ্য হইতেই তাঁহার হৃদয় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক বলা যায় না, কিন্তু মনে হয় যে, স্কুলের বাঁধা-ধরা নিয়ম অপেক্ষা ব্রাউনিংয়ের পক্ষে গৃহশিক্ষাই বেশী উপযোগী হইয়াছিল। ব্রাউনিং তাঁহার পিতামাতার নিকট হইতে কেবল যে উপদেশ ও শিক্ষা পাইতেন তাহা নহে, তিনি অত্যন্ত আদরও পাইতেন। তিনি পিতামাতার বড় আদরের ছেলে ছিলেন। কিন্তু সে আদবে ব্রাউনিংয়ের কোন ক্ষতি করা দূরে থাকুক, তাহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রাউনিং জননীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি তাঁহার মাতাকে "স্বর্গরাজ্যের রমণী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাউনিংয়ের মাতা যখন বাগানে যাইতেন তখন প্রজাপতিগুলি উড়িয়া আসিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বসিত; বাড়ীর পোষা পাখী এবং অন্যান্য প্রাণীরা তাঁহাকে তাদের মায়ের মতনই ভালবাসিত। তিনি তাঁহার বাগানের বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, কীটপতঙ্গ ও পশুপক্ষীগুলিকে জননী-স্নেহে প্রতিপালন করিতেন। যখন ফ্লোরেন্সে ব্রাউনিংয়ের নিকট তাঁহার মাতার মৃত্যুসংবাদ যায়—তখন মাতার যত্নপালিত এই উদ্যানের স্মৃতিই ব্রাউনিংয়ের মনকে বিশেষভাবে কাতর করিয়া তুলিয়াছিল;—এই বাগানে তাঁহার মায়ের সমগ্র স্নেহটুকু যেন জড়ানো ছিল। তাঁহার অভাবে সে বাগানের এখন কি দশা! ব্রাউনিংয়ের পত্নী তাঁহার কোন বন্ধুর কাছে লিখিয়াছিলেন,—"তিনি মাকে যেমন ভালবাসিতেন, তেমন ভালবাসা আমি কোথাও দেখি নাই। মাতার মৃত্যুতে শোকে তিনি শিশুর ন্যায় অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। এখনও কোন সময়ে অল্পক্ষণের জন্য আমি বাহিরে গেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখি তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। আমি প্রায়ই তাঁহাকে স্থানপরিবর্ত্তনের জন্য বলি—কিন্তু তিনি বলেন কোথায় যাই? ইংলণ্ড এখন তাঁহার নিকট দুঃসহ বোধ হয়। তিনি বলেন, ইংলণ্ডে গেলে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইবে, তাঁহার মাতার উদ্যানের সেই সুন্দর গোলাপ ফুলগুলি তিনি চক্ষে দেখিতে পারিবেন না।"

এলিজাবেথ ব্যারেট এবং রবার্ট ব্রাউনিং-

এর প্রেমকাহিনী অনেকেই জানেন। তাঁহাদের প্রথম পরিচয় কাব্যে;—দু'জনেই দুজনের লেখা পড়িয়া মোহিত হন। পরে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। এলিজাবেথ ব্যারেট তখন রোগে শয্যাগত—শরীর ক্ষীণ দুর্ব্বল, বিবাহের চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় কোনই সম্ভাবনা ছিল না কিন্তু ব্রাউনিং তাঁহাকে দেখিয়াই মনে মনে ভবিষ্যৎ পত্নীরূপে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলেন। এবং যে পর্য্যন্ত না তাঁহার হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন সে পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হন নাই।

এলিজাবেথ ব্যারেট তাঁহার সুন্দর কবিতায় "Sonnets from the Portuguese"—এই প্রেমিকের স্তুতি এবং তাঁহার বশ্যতা স্বীকারের কাহিনী সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

একখানা চিঠিতে ব্রাউনিং লিখিয়াছেন—"তোমাকে পেয়ে আমার জীবনের সব আশা পূর্ণ হয়েছে! ভগবান করুন—জীবনে যেন তোমার সঙ্গেই থাকতে পাই—মরণে যেন দুজনে এক সঙ্গেই যাই।"

ব্যারেটের পিতা যদিও তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন তথাপি তিনি এটা ইচ্ছা করিতেন না যে তাঁর সন্তানদের মধ্যে কেহ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া বিবাহ করে। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল ব্রাউনিংএর প্রতি তাঁহার কন্যার এই প্রেম একটা খেয়াল মাত্র;—কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া যে প্রেম তাহা স্থায়ী হইবে না। সেই জন্য তিনি এই বিবাহে ঘোর আপত্তি করিলেন। কন্যা পিতাকে বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন; শেষে গত্যন্তর নাই দেখিয়া—পিতার বিনা অনুমতিতেই বিবাহ স্থির করিলেন। তাঁহার পিতার একটা ভুল ধারণার জন্য চিরজীবন দুঃখ ভোগ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। ১৮৪৬ খৃঃ ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহাদের বিবাহ হয়।

বিবাহের কিছুদিন পরে ব্যারেট তাঁহার বন্ধু মিস্ মিটফোর্ডের কাছে এইভাবে এক পত্র লিখিয়াছিলেন—"তিনি আমার জন্য সমস্তই করেছেন। আমায় তিনি এত ভালবাসেন কেন এর কারণ আমি নিজেই খুঁজে পাই না। তিনি তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এমন করে আমায় ঘিরে আছেন যে মনে হয় আমার জীবন তাঁরই জীবন;—আমি স্তব্ধ হয়ে থাকি। তাঁর অপরাপর গুণের তুলনায়—প্রতিভা, বুদ্ধি নাই বলিলেই হয়—অথচ বিশ্বের লোক তাঁকে ওর জন্যই এত আদর করে। সখি, ভেবে দেখ আমি কত সুখী! এত সুখ যে, মনে হয় এ বুঝি সত্য নয়।—সময় সময় আমি চোখ বুজে ভাবি এ সবই স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন।"

বিবাহের পরে ব্রাউনিং-পত্নীর স্বাস্থ্য দিন দিন আশাতীত উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। একখানা চিঠিতে তাঁহাদের তখনকার ভ্রমণবৃত্তান্ত এইরূপঃ—"এমন চমৎকার দৃশ্য, এমন সুন্দর পাহাড়, এমন সুন্দর বন—অনৈসর্গিক নিস্তব্ধতা! দূরে মসীবর্ণের ভূমি। এখানে ঈগল পাখী আছে। রাস্তা নাই বলিলেই চলে। রবার্ট ঘোড়ায় চড়িয়া যাইত—আমি ও আমার ঝি শাদা বলদের গাড়িতে চড়িয়া যাইতাম। একটু ভয় ভয় করিত অথচ মনে কি এক অপার আনন্দ!"

ব্রাউনিং-পত্নী বলিতেছেন "যদি আমার স্বামীর কোন বিষয়ে দুর্ব্বলতা থাকে তো সে আমার সম্বন্ধে কথায়; আমার কথা উঠিলেই তিনি উৎসাহের সহিত অমনি বলিতে থাকেন আমি তাঁর সঙ্গে কোন্ কোন্ জায়গায় গিয়াছি, কতটুকু রাস্তা হাঁটিয়াছি ইত্যাদি ইত্যাদি—যেন আমার পায়ে হাঁটিয়া চলাটা জগতের এক মহা আশ্চর্য্য ব্যাপার।"

ব্রাউনিংয়ের মন সব সময়ই তাঁর পত্নীর জন্য চিন্তিত থাকিত;—তিনি মনে করিতেন হঠাৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। সামান্য একটু অসুখ হইলেই তাঁহার ভাবনা হইত এই বুঝি তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল। যে ১৫ বৎসর তাঁহারা একত্রে কাটাইয়াছেন সে সময় ব্রাউনিং-পত্নী সর্ব্বদাই অধ্যয়ন, খেলা, ভ্রমণ, সন্তান-রক্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, এবং ইটালীর স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা গভীর মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ১৮৬১ খৃঃ ৬ই জুন ইটালীর প্রধান মন্ত্রী ক্যাভাত্তর (Cavour) মৃত্যুমুখে পতিত হন। ব্রাউনিংপত্নী তাঁহার শেষ চিঠিতে লেখেন—"ইটালীর স্রষ্টা মহাপুরুষ স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। যদি অশ্রু ও শোণিত তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিত তবে তিনি আমাদেরই থাকিতেন।"

ইহার কিছু দিন পরেই তিনি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার স্বামী তাঁহার শেষমুহূর্ত্তের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বড় মর্ম্মস্পর্শী! "সমস্ত রাত্রি সে এপাশ ওপাশ করিল, তারপর উঠিয়া ঔষধ খাইল—আমার নিকট কত কথা বলিল, তার পর ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি চারি ঘটিকার সময় অবস্থা বড় খারাপ বোধ হইলে আমি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলাম। তার পরের কথা বলিতে আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়, বালিকার ন্যায় সরল মুখে হাসিতে হাসিতে তার মাথা আমার মুখের উপর রাখিয়া সে সুখে ঘুমাইয়া পড়িল।—কোনো কষ্ট, কোনো যন্ত্রণা—কিছু সে পায় নাই। যেমন ছোট্ট শিশুটিকে আঁধার হইতে কোলে তুলিয়া লইয়া যায়—তেমনি ভাবে ভগবান তাহাকে তুলিয়া লইয়া গেলেন—ধন্য ভগবান।"

কবির বিবাহিত জীবন ১৫ বৎসর মাত্র; কিন্তু এই অল্প সময় মধ্যে আমরা কবির সমস্ত জীবনকাব্য দেখিতে পাই। মিস্ ব্যারেটকে না দেখা পর্য্যন্ত অন্যান্য বহু আনন্দের মধ্যে কবি প্রেমকেই উচ্চ স্থান দিয়া আসিয়াছেন। তার পর পত্নী পাইয়া প্রেমই তাঁহাদের একমাত্র উপাস্য হইয়া ওঠে। এই কবি দম্পতীর কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহারা কর্ম্ম ও প্রেমকে যেন প্রণয়-শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছিলেন;—কর্ম্ম প্রেমকে মধুর করে, উজ্জ্বল করে, প্রেমের মহিমায় কর্ম্ম মহিমান্বিত, এবং কর্ম্ম না থাকিলে প্রেমও নির্জীব, তাহার প্রাণও নাই মাধুর্য্যও নাই।

মিসেস্ ব্রাউনিং তাঁহার "Aurora Leigh" নামক কবিতায় লিখিয়াছেন!—

"Beloved, let us love so well.
Our work shall still be better for
our love,
And still our love be sweeter for
our work."

"Oh! world as God has made it
all is beauty,
And knowing this is love, and
love is duty—
What further may be sought for or
declared!"

পত্নীবিয়োগে ব্রাউনিং দারুণ শোক পাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই শোককে তিনি জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেম দৃঢ়বিশ্বাসে এমনি সবল ছিল যে মৃত্যুও তাঁহার প্রেমকে বিচ্ছেদ-রেখায় খণ্ডিত করিতে পারে নাই। একথা কবির নানা কবিতার মধ্যে নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা একটি কবিতার অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম:—

মরণে কি ভয়?

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ যবে, নয়নেতে নামে ছায়া
কুহেলিকাময়,
"পরপার সন্নিকট," জানায় তুষাররাশি
ঘোর ঝঞ্ঝাচয়,
যামিনী ভীষণা, বহে তুমুল ঝটিকা, দূরে
মূর্ত্ত সয়তান
যদিও সম্মুখে রহে, ডরে কি তাহারে বীর?
হয় আগুয়ান।

পথ হয়ে আসে শেষ, বাধা বিঘ্ন চূর্ণ হয়;
আগে রণজয়,
পরিশেষে পুরস্কার, বীরের সকল শ্রম
সফলতাময়।
চিরদিন যুঝিয়াছি, সংসারের ঘোর রণে,
আর একবার
রণমাঝে পশি আজ, সর্ব্বশেষ এই রণ—
শ্রেষ্ঠ সবাকার।
পশিব না লুকাইয়া ভয়ে দৃষ্টি রুদ্ধ করি
মৃত্যুর মন্দিরে,
মহান্ বীরের মত ভেটিব যাতনারাশি
সম্মুখ সমরে।
ঘোর রণসন্ধি ক্লেশ সহিয়া, ঢালিয়া দিব
জীবন-সঞ্চয়—
যাতনা আঁধার-রাশি হতাশ, উপেক্ষা শত
হয়ে যাবে ক্ষয়।
বীরের সম্মুখে আসি থমকি, অশুভ যত
হইবে মঙ্গল,
ফুরাইবে অমানিশা, থেমে যাবে প্রকৃতির
তরঙ্গ চঞ্চল।
উন্মত্ত পিশাচবাণী হয়ে ক্ষীণ ক্ষীণতর
মিশাইবে ধীরে,
আসিবে যাতনা মাঝে শান্তি, আলোকের রাশি
ফুটিবে তিমিরে।
তারপর? তারপর আবার প্রেয়সি, হৃদে
ধরিব তোমায়।
জীবনের অবসানে পরমেশ-পদে শান্তি
লভিব অক্ষয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

মহাত্মা তারকনাথ পালিত

স্বর্গারোহণ

১

আজি রোগ যাতনার ভয় ভাবনার শেষ,
তাই সম্মুখে তব নব-জীবনের দেশ।
নরলোকে যবে সাঙ্গ কার্য্য
পরলোকে ডাকে তোমা,
কর্ম্মবীরের ক্লান্তি হরিতে
রস আনন্দ ভূমা!

তব বিপুল বিত্তে চিত্তটি অমলিন
ছিল দুখীদের তাহে অধিকার চিরদিন;
সম্মানে হ'য়ে অদ্বিতীয়
ছিলনা দম্ভ তবু,—
তুমি যে রসিক জ্ঞানী পণ্ডিত
করনি প্রচার কভু!

ওগো সখ্যে আছিলে সরল অকৈতব,
চির বিপন্ন পাশে সার্থক নাম তব;
স্নেহ দয়া প্রেমে মহা মহীয়ান্
ওগো ও গোপন দাতা—
তোমার বিয়োগ-দুঃখে এ তাই
মুগ্ধ কবির গাথা!

তুমি বাণী-মন্দিরে স্থাপিলে যে, দানরথ,
এই বিজ্ঞান তৃষা-সলিলের সদাব্রত
পিয়ে তা' গাহিবে হাজার ছাত্র
তব জয় যুগে যুগে,—
রচি' তব তরে অমর স্বর্গ
মনে প্রাণে বুকে বুকে!

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২

হে বরেণ্য, পুণ্যকাম, মহাচিন্তবান্,
ব্রহ্মা পাঠাইলা তোমা, সাধিতে কল্যাণ।
স্বর্গভ্রষ্ট কর্ণ পুনঃ জনমিলে তুমি,
কৃতার্থ ভারতকুল, শুদ্ধ মাতৃভূমি।
তেজস্বী, গুণজ্ঞ, গুণী, ন্যায় অবতার,
যুঝিলে অন্যায় সাথে, অশ্রান্ত অবার।
প্রীতি-প্রদীপিত মূর্ত্তি, প্রফুল্ল প্রসন্ন,
যে লভেছে তব সখ্য ধন্য মহাধন্য।
দেশসেবা-মহাব্রত করিয়া গ্রহণ,
সর্ব্ব উপচারে তাহা করি উদ্‌যাপন;
"বাড়ী যাব" বলি যবে হইলে কাতর,
লক্ষ্মী তুলিলেন কোলে প্রসারিয়া কর।
পূর্ণ চন্দ্র ঢালে রশ্মি আনন্দে বিহ্বল—
চলিলে বৈকুণ্ঠে; মর্ত্ত্যে জ্বলে শোকানল।

শ্রী—

মহাত্মা তারকনাথ পালিত তাঁহার পার্থিব জীবনের উদ্দেশ্য সমাপন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ক্রমাগত হৃদয়বিদারক আকুলতার সহিত বলিতেন "বাড়ী যাব,—আমি যে বাড়ী হতে এসেছি সেই বাড়ী যাব। এ আমার বাড়ী নয়। বাড়ী যাব—বাড়ী যাব, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল।" যে তাঁহার এই নিরতিশয় আকুল প্রার্থনা শুনিত তাহার পক্ষে অশ্রুজল সম্বরণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত।

আশ্চর্য্য এই, অন্য অনেক বিষয়ে তাঁহার
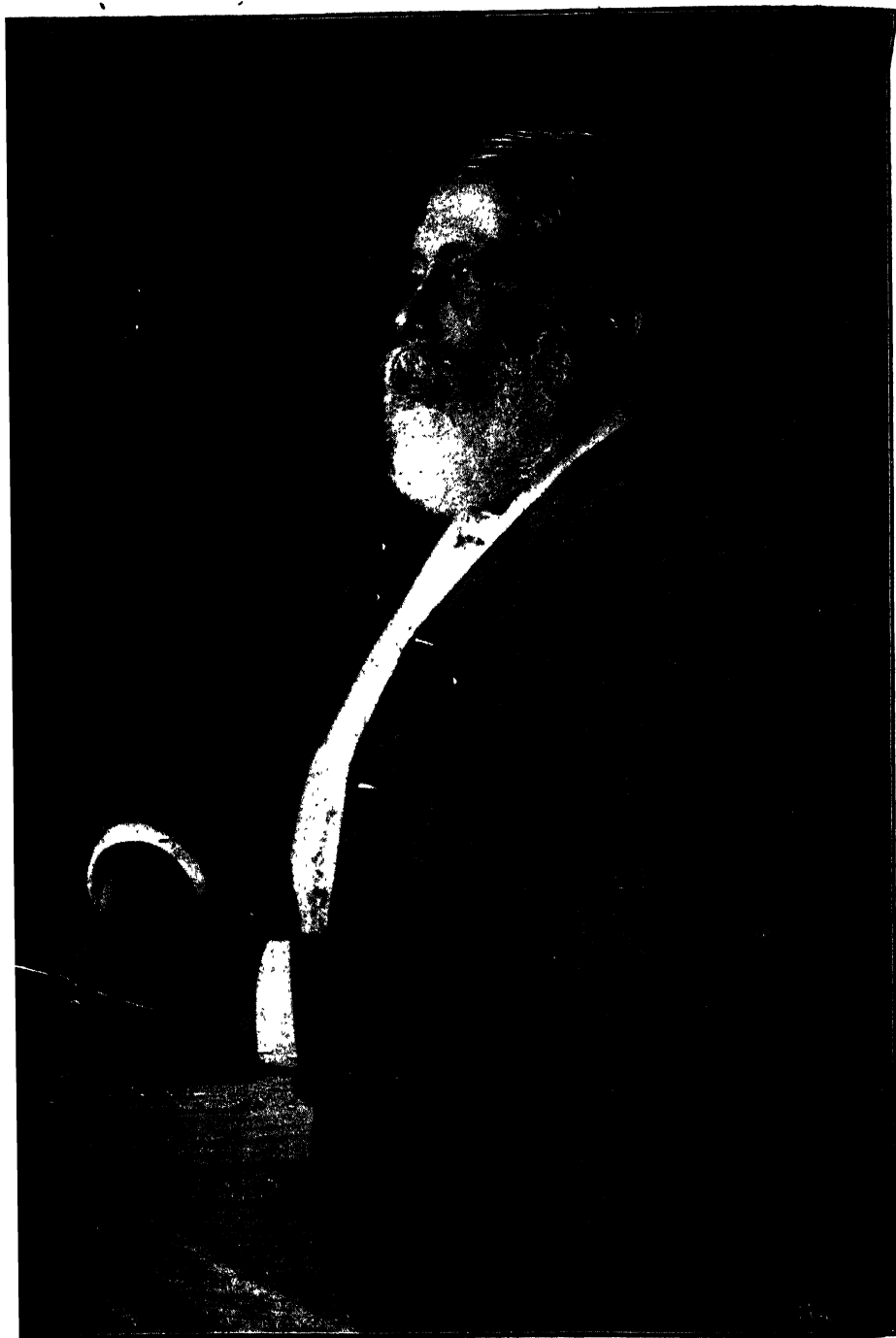
মহাত্মা তারকনাথ পালিত

জ্ঞান ছিল, প্রায় শেষ পর্য্যন্ত তিনি একেবারে সংজ্ঞাহীন হন নাই।

প্রায় দেখা যায়, বড় লোকের মৃত্যুও যে-সে ক্ষণে হয় না। মৃত্যুদেব যেন ইঁহাকে লইবার জন্য একটি শুভক্ষণের অপেক্ষা করিতেছিলেন। যিনি শিক্ষার উন্নতির জন্য বঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন-- তিনি লক্ষ্মীর বরপুত্র,—তাই বিগত পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজার দিন স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহাকে ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করিলেন।

২৫ অক্টোবরে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, ৩রা অক্টোবরে দেহ ত্যাগ করিলেন। আর ২২ দিন থাকিলে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৩ পূর্ণ হইত।

শ্রী—

সমালোচনা

রবিন্ হুড্। শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ রায় প্রণীত। কলিকাতা, সিটিবুক সোসাইটি, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা মাত্র। ইংরাজীতে বীর রবিন্ হুডের কাহিনী অবলম্বনে যে গ্রন্থ আছে, এখানি তাহারই বঙ্গানুবাদ। অনুবাদের ভাষা বেশ সহজ ও সরল; সরসতাটুকুও দক্ষতার সহিত সংরক্ষিত হইয়াছে। একবার বহিখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না, গ্রন্থখানি এমনই কৌতুহলোদ্দীপক। কাহিনীটি যে শিশুহৃদয়ে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করিবে, সে বিষয়ে এতটুকু সংশয় নাই। গ্রন্থে কয়েকখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে; চিত্রগুলি সুন্দর। ছাপা কাগজও চমৎকার।

ভারতীয় সাধক। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস। এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। এই গ্রন্থে বুদ্ধ, রামানন্দ, কবীর, নানক, রামমোহন প্রভৃতি সাধকবর্গের কর্ম্মজীবনী, উপদেশ-বাণীসমূহ, এবং ধর্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা বেশ স্বচ্ছ সরল, আলোচনার পদ্ধতিও যুক্তির সমাবেশে সুনিপুণ। আলোচনায় কোথায়ও একটু গোঁড়ামি নাই,—ইহাই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব। এই গ্রন্থে বুদ্ধ, নানক, কবীর ও রামমোহনের চিত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছে। ছাপা কাগজ ভালো।

রামায়ণ। (গদ্য-পদ্য) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। কলিকাতা, ৮৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে সেন ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য আট আনা মাত্র। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন, "বঙ্গের অমর কবি কৃত্তিবাস বিরচিত সুললিত রামায়ণ গ্রন্থ অবলম্বনে সুকুমারমতি বিদ্যার্থী বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগী করিয়া এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করা হইয়াছে। কবির রচিত রামায়ণের শ্রেষ্ঠাংশ রাখিয়া ও উহার সহিত সংলগ্ন করতঃ অবশিষ্টভাগ গদ্যে প্রকাশিত হইল।" মূল রামায়ণের সহিত মিল করিয়াই এই গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হইয়াছে,—শিশুদিগের জন্য রচিত বলিয়া লেখক নেহাৎ অসার ও আজগুবি গল্প ইহার মধ্যে পুরিয়া দিয়া ফাঁকি চালান নাই, ইহাই এই শিশুপাঠ্য গ্রন্থখানির বিশেষত্ব। গদ্যাংশের ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ; তাহার সহিত কৃত্তিবাসের পদ্যাংশ সংযোজিত করায় শিশুদিগের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হইবে বলিয়াই মনে হয়। গ্রন্থের শেষে একটি 'পরিশিষ্ট' প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে পৌরাণিক ও ভৌগোলিক

নামাদির বর্ণানুক্রমিক পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে কয়েকখানি ছবিও আছে। ছাপা কাগজ ভাল।

মায়ার শৃঙ্খল। শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত। ৬, ধর্ম্মতলা লেন, শিবপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, অবসর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। এখানি উপন্যাস। বাঙ্গালীর সমাজে কন্যাদায়ের ভিত্তির উপরই উপন্যাসখানি প্রতিষ্ঠিত। উপাখ্যানে আড়ম্বর নাই, জটিলতা নাই—ঘটনাটি খুবই সাধারণ, তবে বহিখানিতে লেখকের বিকাশোন্মুখ বিশ্লেষণ শক্তির যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহা মোটের উপর উপভোগ্য। ত্রুটিও আছে—নায়ক মহিমের চরিত্রটুকু ছাড়া অপর চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নাই। প্রিয়বালার চরিত্র কতকটা হেঁয়ালির মত রহিয়া গিয়াছে; মায়ালতার চরিত্রে গোড়ার দিকে বেশ খানিকটা দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ফুটিয়া উঠিতেছিল কিন্তু পরিণাম চরিত্রানুরূপ হয় নাই। ভাষায় গ্রাম্যতা দোষ আছে। তদ্ভিন্ন অনেক স্থলে টানিয়া-বুনিয়া শ্লেষ ও করুণ রস প্রভৃতির অবতারণা করিতে গিয়া রসভঙ্গ ঘটিয়াছে। এ সকল ত্রুটিসত্ত্বেও বহিখানি আমরা একাসনে বসিয়া পড়িয়া ফেলিয়াছি। ইহাতে শুধু ঘটনার কাঠামো বা মুরুব্বিয়ানার নীরস বুলি নাই—লেখক ইহার মধ্যে গোড়া হইতেই বেশ একটু প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর হৃদয়ের পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। লেখকের বর্ণনাভঙ্গী আশাপ্রদ; অনাবশ্যক বক্তৃতা বা বাহুল্য দোষ হইতে তাহা মুক্ত। চর্চ্চা রাখিলে লেখকের পাকা-হাতের লেখা উপন্যাস সুন্দর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এবং সেই আশা করা যায় বলিয়াই কয়েকটি অপ্রিয় কথাও এ গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিতে বাধ্য হইলাম। ছাপা কাগজ মন্দ নহে।

আগুনের ফুল্‌কি। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। এখানি উপন্যাস; প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক প্রস্প্যার মেরিমে প্রণীত 'কলোবাঁ' নামক উপন্যাসের মূল ফরাসী হইতে অনূদিত। গত বর্ষের 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে এ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে বাহির হইল। 'কলোবাঁ' উপন্যাসখানি ফরাসী সাহিত্যে সমধিক প্রতিষ্ঠাপন্ন। চারুবাবু তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলার কলাসাহিত্য বিভাগটিকেই শুধু উজ্জ্বল করিলেন না, বাঙ্গলা উপন্যাসের রাজ্যে অভিনব বৈচিত্র্যেরও সৃষ্টি করিলেন। বহিখানি আগাগোড়া কৌতূহলোদ্দীপক। মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ বিশ্লেষণে, উপাখ্যানের অভিনয়ত্বে, বর্ণনার মাধুর্য্যে ও অনুবাদের কৃতিত্বে 'আগুনের ফুল্‌কি' এমনই উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, বিদেশীয় পাত্রপাত্রী বলিয়া আমাদের চিত্তে কোথাও একটা বাধা লাগে না—দেশকালপাত্র নির্ব্বিশেষে মানবচিত্ত সর্ব্বত্রই এক ও অভিন্ন, উপন্যাসখানি পাঠ করিতে বসিয়া এই সরল সত্য সম্যক ভাবে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। এ গ্রন্থপাঠ করিয়া উপন্যাস কি, উপন্যাসের বিশেষত্ব কোথায় তাহা যদি বাঙ্গালী পাঠক বুঝিতে পারেন, তবেই বুঝিব চারুবাবুর এ অনুবাদ-পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। বহিখানির ছাপা কাগজ চমৎকার—আকারও দীর্ঘ—সে হিসাবে মূল্য সামান্যই হইয়াছে।

অকল্পিতা। শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। অনেকগুলি খণ্ড কবিতা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে,—সেগুলি ভাবে পবিত্র, ভাষায় উজ্জ্বল, আন্তরিক সৌন্দর্য্যে ঝলমল। কবিতাগুলি আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও তাহাতে পাণ্ডিত্যের হুঙ্কার নাই—সেগুলি বেশ স্বচ্ছ সরল।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।
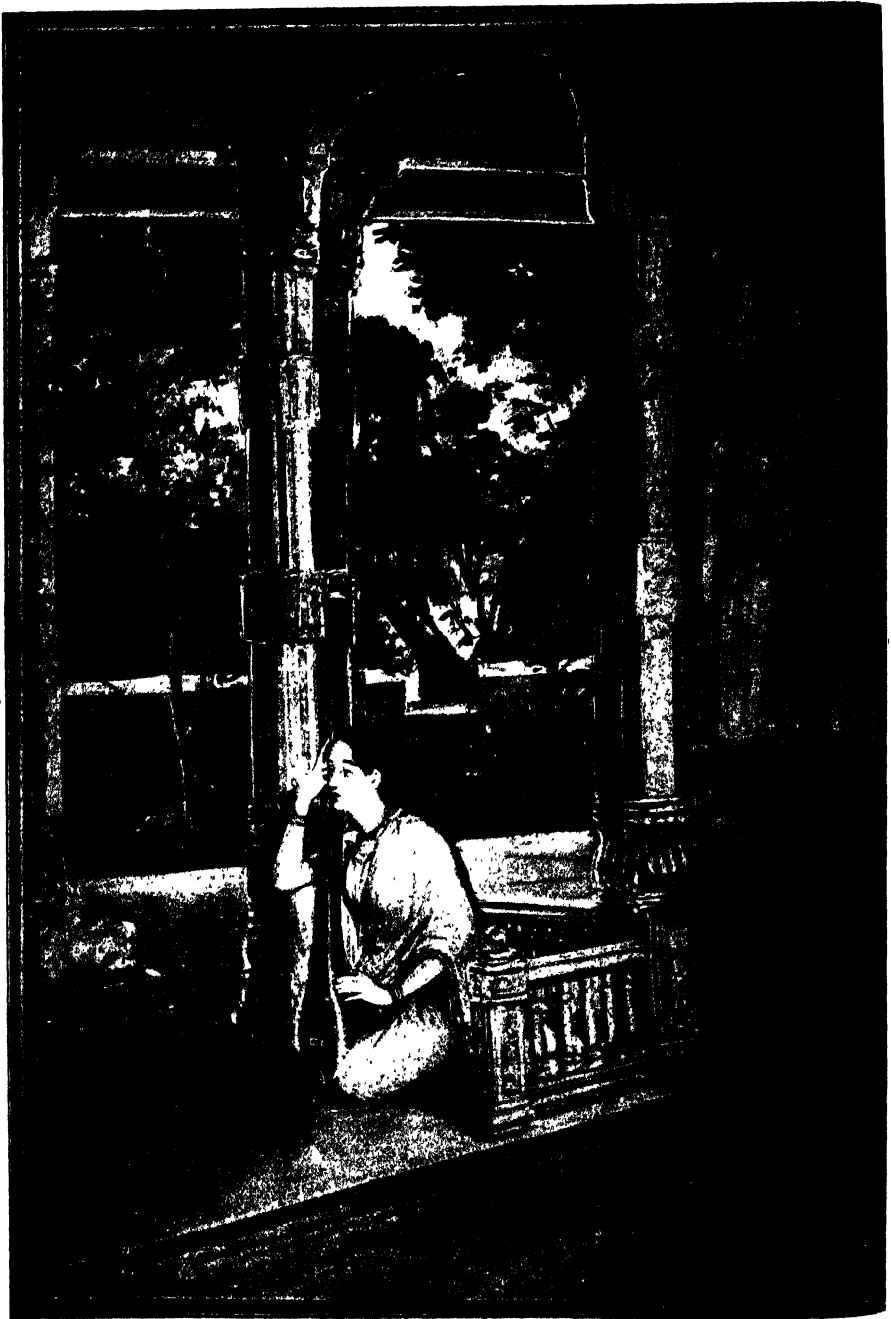
Manoranjan Press, Bombay. মহাশ্বেতা

৩৮শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩২১ [৮ম সংখ্যা

লাইকা

(২১)

যখন বর্ষণক্লান্ত উষার মৃদু আলোক দ্বার ভেদ করিয়া গৃহপ্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল সেই সময় বারির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—সাবিত্রী তখনও অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল!—পাশের বটগাছে কোন কোন নীড়ে পাখীরা তখন জাগরিত হইয়াছে,—ময়না শিশু কিচিমিচি বাধাইবার উপক্রম করিতেছে,—কাকের বাসার আলস্যক্ষীণ কাকা শব্দও শোনা যায়। অনতিদূরে গ্রাম্যপথে দুই একটি পথিকের যাত্রাজনিত ব্যগ্রকণ্ঠ ও পদধ্বনি শুনিয়া বারি উঠিবার চেষ্টা করিল, নদীতীর জনপূর্ণ হইতে না হইতেই তাহাদিগের স্নানাদি অভ্যাস ছিল।

সে মৃদু মৃদু ডাকিতেছিল,—"দুর্গা দুর্গা! মাগো, দুর্গতিহারিণি!"—এমন সময় দ্বারে আঘাত পড়িল!—সাবিত্রি!—সাবিত্রি! এখনও ঘুমাইতেছ?"

একি! এ যে সন্ন্যাসিনীর স্বর! সাবিত্রীকে ঠেলিয়া দিয়া বারি উঠিয়া পড়িল। সানন্দে দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"একি মা!—এত শীঘ্র?—"এত শীঘ্র তুমি ফিরিলে?"--

তিনি একটু হাসিলেন,—"হাঁ মা প্রয়োজন আছে! সাবিত্রী কৈ?"—

"এই যে।" বলিয়া সাবিত্রী আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সন্ন্যাসিনী বলিলেন—

"যাও শীঘ্র প্রাতঃকৃত্য শেষ কর—আহারাদি করিয়াই তোমাদিগকে অন্যত্র যাইতে হইবে।" সাবিত্রী প্রশ্ন করিল,—"কোথায়? বারাণসী?"—

উত্তর হইল,—"না, পরে জানাইতেছি! এখন সত্বর রন্ধনাদির ব্যবস্থা কর!"

তাহাদের সহসা প্রস্থানের কথায় রাণী ঠাকুরাণী দুঃখিত হইলেন,—আর মীরা ললিতা দয়া লক্ষ্মী প্রভৃতি যুবতীরা মহা হুলুস্থুল বাধাইল! এত শীঘ্র লইয়া যাইবার যদি ইচ্ছা ছিল তবে কেন তিনি তাহাদিগকে এখানে আনিয়াছিলেন!—আবার ক'দিনে ফিরিবেন,—ফিরিবার সময় তাহাদের বাটীতে ক'দিন থাকিবেন ইত্যাদি প্রশ্নে সন্ন্যাসিনীকে বিব্রত করিয়া তুলিল। সাবিত্রী বারিও যেন ম্লান হইয়া পড়িল।

দুই দিন পথে কাটিল। প্রথম প্রথম সাবিত্রী একটু উৎসুক ছিল তাহার পর আর গন্তব্য স্থানের সম্বন্ধে সে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিল না। তাহারা ত চিরদিনই এমনি পথে পথে ঘুরিয়াই বেড়ায় —তাহাদের আবার স্থান অস্থান নাম ধামের প্রয়োজন কি?

তৃতীয় দীন সন্ধ্যায় এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে তাহারা বসিয়াছিল। সন্ন্যাসিনী ঈষৎ চিন্তাক্লিষ্ট হাসির সহিত বলিলেন—"সাবিত্রী। আমরা কোথায় আসিলাম জান?"

হাসিয়া সাবিত্রী বলিল • "না মা! এগ্রামের নাম ত আমি জানি. না! দূরে যে ঐ বড় বড় বাড়ী দেখা যায়—উহা কি কোন নগর?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"হাঁ ওখানে একজন ধনবান সদাগর বাস করেন! আর ওই নগরেই এখন লাইকাও আছে! আমি তাহাকে দেখিয়াই তোমাদের আনিতে গিয়াছিলাম!"

সাবিত্রী চমকিত উচ্চস্বরে বলিল— "লাইকা?—মা! সত্যই. লাইকা!"

সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ,"—

বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিল,—"আছেন ত এখনও?"

"হাঁ আছে। থাকিবে বলিয়াই ত দৌড়িয়া গিয়াছিলাম, নতুবা অন্য উপায় করিতাম। কিন্তু তোমরা ব্যস্ত হইও না, এইখানে কোথাও থাক, আমি দেখিয়া আসি সে আছে কিনা!"

ব্যস্ত হইয়া সাবিত্রী বলিল, "তবে যে বলিলে নিশ্চয় আছে!"

"আছে বৈকি। তবু একবার দেখিয়া আসিব। তোমরা সাবধানে থাকিও।"

তিনি চলিয়া গেলে সাবিত্রী ডাকিল,—"বারি!"

বারি বৃক্ষকাণ্ডে হেলান দিয়া অন্যদিকে চাহিয়া ছিল। তাহার উত্তর না পাইয়া সাবিত্রী নিকটে আসিল। আবার ডাকিল "বারি-বহিন্?"—

সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না, উত্তর না পাইয়া ভীত ভাবে সাবিত্রী তাহার হাত ধরিল,—হাত অবশ শীতল! মাথায় কপালে দারুণ উত্তাপের সহিত দরদর ঘর্ম্ম ঝরিতেছে! একটু নাড়া পাইয়াই অবসন্ন ভাবে সে শুইয়া পড়িল!

একি হইল? কাতর কণ্ঠে সাবিত্রী বলিল, "ও বারি! বারি!—একি করিলি দিদি? তুই এমন হইলি কেন?" পরে দেখিয়া দেখিয়া সে বুঝিল বারি মূর্চ্ছিত— তখন তাহার লুণ্ঠিত মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

(২২)

সন্ন্যাসিনীর ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইল না,—ততক্ষণে বারিরও চৈতন্য হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই সকাতরে সাবিত্রী বলিল, "ও মা! তুমি ত চলিয়া গেলে,—কিন্তু আমি যে তোমার বারিকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলাম!—"

বলিয়া বারির কথা সমস্ত বলিতে লাগিল। শুনিয়া সন্ন্যাসিনীর মুখও বিষন্ন হইল,— ক্লান্তদেহা শায়িতা বারির মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন,—"কেন মা! আজ এমন কাতর হইলে কেন? তোমাকে ত আমি

চিরদিনই বলিষ্ঠা সহিষ্ণু স্ত্রীলোক বলিয়াই জানি!"

ধীরে ধীরে বারি বলিল, "জানি না ত মা! কেন এমন হইল তাহা আমিও বুঝিতে পারিলাম না? বোধ হয় খুব বেশি চলিয়াছি —কিম্বা কি যে হইল!"—

কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই বারি নীরব হইল,—তখন সাবিত্রী আপন মনে বলিতে লাগিল,—"হইবে না কেন? শরীরের অপরাধ কি? সে কি কখন এত কষ্ট সহিয়াছিল? এমন খাইবার ক্লেশ শুইবার ক্লেশ—এত পথশ্রম সহ্য করা কি এই দুর্ব্বল শরীরের কায?"

ঈষৎ অন্যমনস্ক ভাবে সন্ন্যাসিনী বলিলেন, —"ভয় নাই, চিন্তিত হইও না; কিন্তু বারি! কাল কি তুমি লাইকার কাছে যাইতে পারিবে?"

বারি কিছু বলিল না,—তখন সন্ন্যাসিনী বলিতে লাগিলেন,—তাহাকেও অসুস্থই দেখিলাম,—এত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে যে আর সে লাইকা বলিয়া চিনিতে পারা যায় না! এদিকে বারির এই অবস্থা,—কি করিয়া যে দুজনকে একা রাখিয়া যাইব তাহাই ভাবিতেছি!"

বারির নিশ্বাসের শব্দ যেন থামিয়া গেল! সাবিত্রী বলিল, "লাইকার আবার কি অসুখ হইয়াছে?

সন্ন্যাসিনী বলিলেন "তাহা এমন বিশেষ কিছু নয়; বারি, তুমি ভাবিও না। যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে তাঁহার মানসিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। শরীরও সেই জন্য ভাঙ্গিয়াছে। খুব সম্ভব এতদিনে স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারের জন্য কিছু ব্যথা পাইতেছে, আমি ত তোমাদিগকে জানাইয়াছিলাম যে সে কাহাকেও কষ্ট দিতে পারে না! সম্ভবত এ দেশের এত নিকটে যখন আছে—তখন বারির মৃত্যুর অনরবটাও শুনিতে পারে!"

সাবিত্রী এইবার হাসিল,—বলিল, "তার পর? এখন কি করিতেছেন তিনি?"

"এখন ত তাহাকে সন্ন্যাসীর বেশেই দেখিলাম, কিন্তু আচার ব্যবহার ঠিক্ সন্ন্যাসীর মত নয়,—আহা সাবিত্রি! হাসিস্ না মা! দেখিলাম সেই বালকের মত সরল কোমল স্বভাবই আছে—কিন্তু সে আনন্দ উৎসাহ বা চঞ্চলতা নাই! পরের দুঃখে তেমনি কাতর—কিন্তু সে শক্তি বা সাহস নাই! সেই নব দেবদারুর মত সুন্দর শরীর এই যৌবনেই যেন জরাগ্রস্ত হইয়া হেলিয়া পড়িয়াছে! যে জন্যই হোক, যে অতিবড় পাষাণ,—লাইকাকে দেখিয়া তাহার চক্ষেও জল আসিবে!"

তখন তাড়াতাড়ি সাবিত্রী বলিয়া উঠিল, —"তাহাত হইবে! কিন্তু বারি,—এখন হইতেই তুই চোখে জল আসাটা কিছু সম্বরণ কর দেখি! এই দেখ ত মা! তোমার সহিষ্ণু বারি কাঁদিয়া আমার কাপড় ভিজাইয়া দিল।"

সন্ন্যাসিনী সস্নেহে বারির হাত ধরিয়া বলিলেন,—"কাঁদিও না মা! তোমার কোন ভয় নাই, কোন আশঙ্কা নাই! তোমার এই কঠোর তপস্যার পুণ্যেই তোমার সকল অমঙ্গল দূর হইবে! কিন্তু এইবার আবার তোমার শক্তির সাহসের পরিচয় দিবার দিন আসিয়াছে,—যে সাহসে একদিন তুমি

রাজপুরী ছাড়িয়া স্বামী অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলে আজ আবার সেই বলে আমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কাতর স্বামীর অনুগামী হইতে হইবে!”

বারির নয়নের জল শুখাইয়াছিল।—তাহার চুলে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে সাবিত্রী বলিল, “আমিত সেই ভাবিয়া মরিতেছি যে তুমি কি বলিয়া বারিকে লাইকার নিকট লইয়া যাইবে ও কি বলিবে গিয়া—যে “ওগো! এই লও তোমার স্ত্রী লও!”

সন্ন্যাসিনী হাসিলেন, বলিলেন, “পাগল! তাও কি হয়? সে সকল কথা পরে হইবে, এখন তুমি বারিকে কিছু খাওয়াইবার উপায় দেখ দেখি!

সাবিত্রী বলিল,—“ঠিক্ বলিয়াছ! খানিকক্ষণ আগে একজন গোয়ালিনী আমাকে দুধ দিয়া গেল,—তুমি বুঝি পাঠাইয়াছিলে?”

“হাঁ, আমি বুঝিয়াছিলাম যে বারি যেমন ক্লান্ত ও কাতর হইয়াছে, তাহাকে কিছু বলকারক খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন, তুমি উঠ সাবিত্রী শীঘ্র সেই দুধ আনিয়া বারিকে দাও।”

সাবিত্রী উঠিয়া গেলে ধীরে ধীরে বারি বলিল, “তাঁহার কি কোন বেশি অসুখ দেখিলে মা?”

প্রসন্ন চাঞ্চল্যে সন্ন্যাসিনী বলিলেন—“না না,—অসুখ ত কিছুই দেখিলাম না! কেন তুমি উদ্বিগ্ন হও? পীড়া দেখিলাম না কিছু শরীর ভগ্ন, সে দিব্য হাসিতেছে, কথা কহিতেছে—তবে বিশেষ লক্ষ্য করিলে বোঝা যায় যে সে হাসিতে প্রাণ নাই, কথায় উদ্দীপনা নাই। তাহাতেই ভাবিলাম ইহা কোন গুপ্ত মানসিক ব্যথা!”

বারি আর কিছু বলিল না। সাবিত্রীর দত্ত দুগ্ধ পান করিয়া নীরবে শয়ন করিল। সাবিত্রী হাসিয়া বলিল—“হইয়াছে ভাল! তুই লাইকার সেবা করিবি না। সে-ই তোর জ্বালায় মরিবে! মা! তুমি কেমন করিয়া বল যে কালই বারিকে লইয়া যাইবে—এখন একলা পড়িলে কি এ বাঁচিবে?”

সন্ন্যাসিনী হাসিলেন। তাহার পর সকলে সেই বৃক্ষতলেই শয়ন করিলেন।

অতি প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গিতেই সাবিত্রী দেখিল সন্ন্যাসিনী তখনও ঘুমাইতেছেন কিন্তু বারি উঠিয়া বসিয়া আছে। মুখখানিতে যথেষ্ট উদ্বেগের চিহ্ন, বৃক্ষকাণ্ডে ভর দিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। সাবিত্রী যে চাহিল তাহা তাহার চক্ষে পড়িল না, দৃশ্যমান আকাশ বা বৃক্ষশিরেও যে তাহার হৃদয় যুক্ত এমনও বোধ হয় না!

তাহার চিন্তার গাঢ়তা ও বিষাদপূর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া সাবিত্রী অন্তরে অন্তরে ব্যথা অনুভব করিল। আহা, কি আশা নিরাশায় তাহার হৃদয় এখন উদ্বেলিত! কতখানি লজ্জা ও অনুরাগ এখন যুগপৎ তাহাকে পীড়িত করিতেছে? চোখের কোলে কালি, মুখে স্পষ্ট বেদনার ক্লান্তি, তথাপি একটা উৎকণ্ঠার, অধৈর্য্যের চাঞ্চল্যে তাহার সর্ব্ব শরীর যেন অধীর হইয়া আছে! একবার চকিতে সাবিত্রী ইহাও ভাবিল যে—“যদি লাইকা ইহাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়! সঙ্গে রাখিতে বিরক্ত হয়—তখন বারির চিত্ত—”

কিন্তু এ কথাটাকে সে মনে স্থান দিতে পারিল না ;—মনের ব্যথা চাপিয়া কৌতুক হাস্যে বলিল,—"ভাল ভাল! রাত্রিতে ঘুম হইয়াছিল? আর একটু পরেই ত সব মায়া কাটাইয়া বরের কাছে যাইবি,—এখন না হয় একবার এদিকে ফিরিয়াই ছাথ না ভাই!"

লজ্জিত ভাবে ফিরিয়া বারি বলিল,—"তাই বুঝি! আমি ঘুম ভাঙ্গিয়া তোমায় নাড়িলাম তুমি উঠিলে না,—তখন আমি আর কি করিব? জানত আমি থামোখা শুইয়া থাকিবে পারি না! উঠিলে কতক্ষণ?"

"অনেকক্ষণ! যখন তুই 'লাইকা লাইকা' করিয়া নাম জপ করিতেছিলি!"

তাহার অঙ্গ পীড়ন করিয়া বারি বলিল,—"কি মিথ্যাকথাই বলিতে পার তুমি! নাম আবার জপ করিলাম কখন?"—

"জপিস্ নাই? সেই যে—"

আর বলা হইল না সন্ন্যাসিনীও জাগরিতা হইলেন। দুর্গা স্মরণ করিয়া বলিলেন,—"বারি কেমন আছ বল দেখি? শরীরে এখন কোন গ্লানি আছে কি?"

মুখ নীচু করিয়া বারি বলিল, "বুঝিতে ত পারি না মা!"

অতি মৃদুকণ্ঠে সাবিত্রী বলিল,—"তা কেন বুঝিতে পারিবে?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "শীঘ্র স্নানে যাও, আমি আজ আর একবার লাইকাকে দেখিয়া আসিয়া তাহার পর তোমার ব্যবস্থা করিব।"

সাবিত্রী পূর্ব্বের ন্যায়ই বলিল,—"কেন আবার মুখ শুখাইল কেন? একটু বিলম্বও কি সহ্য হয় না?" সন্ন্যাসিনী উঠিয়া দূরে বসিয়া ঝোলার ভিতর হইতে বস্ত্রাদি বাহির করিতেছিলেন,—তখন অতি মৃদু তর্জ্জন ভাবে বারি বলিল, "তোর কি সব সময়ই পরিহাস দিদি।"—অশ্রুর অশ্রুব্যস্বরে সাবিত্রী বলল—"সময়? সময় আর কৈ ভাই? কতটুকু আর তুই আমার কাছে আছিস? আর সত্য কথা বলি, পরিহাসেরই বা এমন দিন কটা মেলে বল্?"

বারি সাবিত্রীর পরিহাস এবং কথার ভিতরের গুপ্ত শিশিরকণার আভাষ বুঝিল। সাবিত্রীর প্রতি চাহিতেই তাহার চক্ষুও বাষ্পপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু আর কোন কথা হইল না, সন্ন্যাসিনীর দ্বিতীয় আদেশে দুইজনই নিকটের নির্ঝরজলে স্নান করিতে চলিয়া গেল।

(২৩)

"শোন বারি!"

উহারা রাজপথের অনতিদূরে শ্যামল পত্র বহুল একটী গুল্মান্তরালে বসিয়াছিল, সন্ন্যাসিনীর আহ্বানে দুইজনেই তাঁহার নিকটে আসিল। সাবিত্রী প্রশ্ন করিল, কি দেখিলে মা?"

হাসিয়া তিনি বলিলেন, "ভালই দেখিলাম! কিন্তু মা বারি! এইবার তোমায় কিছুদিন পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইবে বোধ হয়!"

"ছদ্মবেশ?" বারির চমকিত প্রশ্নের সহিত সাবিত্রীও বলিয়া উঠিল—"পুরুষের ছদ্মবেশ?"—

"হাঁ পুরুষের ছদ্মবেশ! আমি সাহস করিতে পারিলাম না লাইকার নিকট তোমার সমুদয় বৃত্তান্ত বলিতে, মাত্র এইকথা

বলিয়াছি যে একটি নিরাশ্রয় বালক আমার কাছে উপস্থিত কিন্তু আমি রাখিতে পারিব না, আর ঠিক্ তোমার ন্যায় প্রকৃতি বলিয়া সে তোমারই সেবা করিতে চায়—অতএব তুমি তাহাকে সঙ্গে লও! এ কথাতেও সে ইতস্তত করিয়াছিল তাহার পর,—আমাকে ভার মুক্ত করিবার জন্যই হৌক্ অথবা যে কোন কারণে সে এখন সম্মত হইয়াছে!"

বারি বলিল, "আমার প্রকৃত পরিচয় দিতে সাহস কেন করিলেন না মা?"—

সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—"সাহস করিলাম না কেন? তবে শোন বারি! লাইকাকে আমি বুঝিতে পারিলাম না এবার! সম্প্রতি তাহার হৃদয় যে কোন পথে চলিয়াছে তাহা আচরণে কিছুই বোঝা যায় না, যদি স্ত্রীলোক সঙ্গে লইতে অসম্মত হয়—কিম্বা—"

সন্ন্যাসিনী নীরব হইলেন। বারি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তবে তাঁহার অপ্রীতিজনক কাজ করিতে আমি যাইব কি—মা?"

চিন্তাপূর্ণ চক্ষুদ্বয় তাহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"আমিও ও কথা ভাবিয়াছি মা! যদিই বা অপ্রিয় হয়—কিন্তু স্ত্রী পরিত্যাগের তাহার কি অধিকার আছে? সে সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী নয়,—কোন ব্রতধারীও নয়,—তবে পরিব্রতা পত্নীকে চিরজন্ম শোক সাগরে ভাসাইবার প্রয়োজন কি তার? শুধু কোন মিথ্যা আশঙ্কায় সে রাজভবনে প্রবেশ করে না,—নতুবা তুমিত বলিয়াছিলে যে,—সে তোমাকে আনিতে গিয়াছিল! কিন্তু আমি যে এখন সহসা তোমাকে স্বমূর্ত্তিতে লইয়া যাইতে পারিতেছিনা তাহার কারণ এই যে যদি প্রথম হইতেই সে তোমার প্রতি বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হয়,—সেই জন্য! এখন তুমি এইভাবে তাহার কাছে থাক গিয়া, পরে তাহার স্বভাব আচরণ ও মনোভাব বুঝিয়া আত্মপ্রকাশ করিও!—"

বারি ভাবিতেছিল—"সত্য! তাঁহার বাধাস্বরূপ বা কষ্টকর হইলেও হইতে পারি বটে। তাহাই সম্ভব! যদি তাই হয়?" তখন তাহার অন্তরের দ্বার সহজে মুক্ত করিয়া কে বলিল যেন—"যদি তাই হয়! তাহা হইলেই বা এত ভয় কি! এমন ঘৃণিত অভিশপ্ত জীবন যে বহিয়া চলিতে হইবেই এমন প্রতিজ্ঞাও ত নাই! ছিছি! এখনও ভবিষ্যৎ চিন্তা?"

কিন্তু সন্ন্যাসিনীর বাক্যাবসানে সাবিত্রী বলিল, "আর যদি দেখে লাইকা যথার্থই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট তবে?"

তখন সবেগে বারি বলিল,—"তখনকার কথা তখন দিদি! এখন মা যাহা বলিলেন তাহাই ভাল!"

তাহার কথায় সন্ন্যাসিনী যেন বিস্মিত হইলেন, বলিলেন "না মা! তাহা নহে,—এবিষয়ে তুমি এখনও ভাবিতে পার,—বিবেচনা করিয়া যদি—"

বাধা দিয়া বারি বলিল, "বিবেচনা আর কি করিব মা? আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই ভাল!"

সন্ন্যাসিনী বারির শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন—"ইহা তোমার মনোমত হইয়াছে

ত? ভাল, তোমরা ঐ ঝোপের কাছে থাক গিয়া, আমি তোমার ছদ্মবেশের সমস্ত আয়োজন লইয়া যাইতেছি।"

পথ পার্শ্ব বহিয়া নামিয়া তাহারা সেই সমনিম্ন ভূমিখণ্ডে আসিয়া বসিল। অন্য পার্শ্ব দিয়া একটি ক্ষুদ্রকায়া নির্ঝর জলধারা গড়াইয়া আসিয়া সেইস্থানের মৃত্তিকা উর্ব্বরা করিয়া রাখিয়াছে; অন্যত্র অপেক্ষা সেইগুলি যেন অধিক তৃণ সমাচ্ছন্ন—লতাগুল্মবহুল। বর্ষাপুষ্ট ঘনশ্যামকান্তি একটি প্রকাণ্ড জামগাছ স্থানটি ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই তলে দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডে তাহারা আসিয়া বসিল।

বসিয়াই সাবিত্রী বলিল,—"তাহার পর বারি। এইত সাক্ষাতের শেষ! একটি কথা বলিব কি?"

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল বটে কিন্তু বারির মুখ ক্রমে অন্ধকারাবৃত হইতেছিল। সে অস্পষ্ট ভাবে বলিল,—"কেন বলিবে না ভাই? তুমি—"

বারির স্বর রুদ্ধ প্রায়! তখন সাবিত্রী বলিল, "পরে—পরে একটুখানি পরে রে বারি! আমার কাঁদিবার যথেষ্ট সময় আছে—প্রাণ ভরিয়া কাঁদিব! কিন্তু একটি কথার উত্তর তুই সত্য বল দেখি,—তুই এখন কি ভাবিতেছিস্? বল বারি! তোর মনে এখন কি হইতেছে?"

বারি স্থির ভাবে দূরের তৃণশিরে বায়ুর খেলা দেখিতে দেখিতে বলিল,—"বলিব দিদি! সংসারে একা তোকেই সে কথা বলিতে ইচ্ছা করে,—জিজ্ঞাসা করিলি বলিয়া নয়—আমারই ইচ্ছা হইতেছিল যে যাইবার সময় একবার তোকে সব—আমার সব কথাগুলি বলিয়া যাই। কিন্তু বড় বেশিকথা যে ভাই! তোকে অনেক বলিয়াছি তবু দেখিতেছি আজ—যেন সব কথাই বাকী আছে বলিতে! কতটুকু বলিব আর! দিদি! ভাই! তবু যা বলিব আর যা না বলিব সবটুকু তুই বুঝিয়া নিস্ আজ!"

বারি উঠিয়া সাবিত্রীর আসন প্রস্তরে আসিয়া বসিল,—ক্ষুদ্র উপলখণ্ডে দুইজনের স্থান হয় না,—পরস্পরে জড়াইয়া যেন এক হইয়া বসিল!

তাহাদের মাথার উপর দিয়া জলপূর্ণ মেঘ খণ্ডে খণ্ডে ভাসিয়া যাইতেছিল,—বাতাসে সিক্ত বন-ভেষজের আরণ্য পুষ্পের-মিশ্র সুগন্ধ! কচিৎ বহুজলভারাবনত মেঘস্তূপ বাত্যাহত হইয়া স্তম্ভিত কাতর হৃদয়ের দুই একবিন্দু জল তাহাদের মাথায় বর্ষণ করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু এসকলে তাহাদের দৃষ্টি ছিল না,—নদীতলশায়ী শিলাখণ্ডের ন্যায় আবেগদৃঢ়তায় সাবিত্রী পাষাণের মত স্থির হইয়া বসিয়া থাকিল—আর সহসা বেগমুক্ত তুষারখণ্ডমিশ্র নির্ঝর ধারার ন্যায় বারির হৃদয়াবেগময় কণ্ঠস্বর-যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আহত করিয়া—চলিতে লাগিল!

বারি বলিতেছিল,—"আর একবার প্রশ্ন কর দিদি! আমার মনে এখন কি হইতেছে একথা আর একবার বল! জানি না আজ কেন আমার কথা বলিতে এত সাধ হইতেছে! আজ আমায় জিজ্ঞাসা কর একবার—; কেন আমি পিতামাতার স্নেহ—রাজসংসারের সুখ-নিশ্চিন্ত নির্ভরতা—বিশ্বস্ত আশ্বাস—সকলি ত্যাগ

করিয়া নারীজন্মের বিভীষিকার পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম? আবার তোর এই মর্ম্মান্তিক স্নেহ—ইহাই ত্যাগ করিয়া এখন যে আমি কোথায় যাইতেছি তাহারই স্থির কি? জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হইতে কেবল ইহা ভাবিতেছি যে আমার অদৃষ্ট এমন কেন? মন আপনার বশে চলেনা কেন! সুখ যদি হারাইয়াই থাকি তাহার জন্য এত হায় হায় ই বা কেন করি?"

এই খানে বারি একটু থামিল,—কিন্তু সাবিত্রী কথা বলিল না। তখন আবার সে বলিতে লাগিল। "প্রাণ যেন অসহ্য হইয়াছিল দিদি! পৃথিবীতে কোথাও তাহার কোন অভাব দেখিতে না পাইয়া এই পৃথিবীই আমার পক্ষে কণ্টকসম হইয়া গিয়াছিল! তাই বড় কষ্টে,-ও দিদি, তোরা কেউ একটু বুঝিস্ কত কষ্টে আমি আসিয়াছিলাম! মরিতেই যখন হইবে তখন একবার শেষ চেষ্টা আত্মহত্যা-পাপের হাত হইতে বাঁচিবার—জন্য শেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম!

এইবার সাবিত্রী অতি অস্পষ্টভাবে বলিল,—"চুপ"!

বারী বলিল,—"না—শোন! আজ আমার বোধ হইতেছে যেন আমার সব ফুরাইয়াছে!—আমার সব কায শেষ হইয়া গিয়াছে,—বুঝি জীবনের শেষও দেখিতে পাইলাম দিদি!—আর এ পথের মাঝে তোদের কাছে দাঁড়াইব না ভাই?—আমার স্রোতের মুখে আর তুই ভাসিয়া উঠিস্ না স্নেহময়ী!—আমাকে লুকাইতে দে একেবারে চির অন্ধকারে আমি মুখ ঢাকিয়া ফেলি!—তার পূর্ব্বে দুটি কথা—তোকে, দিদি—কেবল তোকে—"

বারি আর বলিতে পারিল না,—সাবিত্রীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া ঘন ঘন শ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন সাবিত্রী বুঝিল কার্য্য ভাল হয় নাই!—চোখের জল চোখে রাখিয়া ঈষৎ তর্জ্জন স্বরে বলিল—"ওকি রে বারি! কি বলিতেছিস্ তুই?—পাগল হইবি নাকি? তুই কি ভাবিতেছিস লাইকা তোকে গ্রহণ করিবে না? কেন অত কথা বলিতেছিস্ বল দেখি? আঃ বহিন আমার! তোর কষ্ট, এত কষ্ট! এ যদি বিফলে যায় তবে ভগবান—"

"হাঁ সর্ব্বাগ্রে এই কথাই স্মরণ করিও তোমরা যে, ভগবান দয়াময়! নিজের কষ্ট বড় অধিক বলিয়া বোধ হইলে জগতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিও যে তোমার অপেক্ষাও দুঃখী লোক কত বেশি! তাহাদের তুলনায় নিজের সুখ স্মরণ করিয়া ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিও তাহা হইলে সংসারে আর কোন দুঃখ পাইবে না।"

সাবিত্রী ও বারি চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসিনীরও চোখে জল—তিনি কি তাহাদের সব কথা শুনিয়াছেন?

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

বৈজ্ঞানিক জীবনী

ডারুইন

ক্রমবিবর্ত্তন ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন।

১৮৫৯ সালে ২৪এ নভেম্বর তারিখে বিশ্ববিশ্রুত "উপগণের উৎপত্তি" (origin of species) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এবং সেই দিনই যত কপি পুস্তক ছাপা হইয়াছিল (১২৫০ কপি) সমস্তই বিক্রীত হইয়া যায়। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর ক্রমবিবর্ত্তন-বাদ ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ (natural selection) এত উদাহরণ ও পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণিত করিয়াছিলেন যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

তাঁহার পূর্ব্বে ল্যামার্ক জীবজন্তুদিগের গঠনপ্রণালীর সাদৃশ্য দেখিয়া স্থির করিয়া ছিলেন যে সমস্ত জীবজন্তু কয়েকটি আদি জীবজন্তু হইতে সৃষ্ট। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না কেহ দেখাইতে পারেন যে কেমন করিয়া একই গণ হইতে উৎপন্ন জীবজন্তু পৃথক পৃথক হইয়াছে ততদিন ল্যামার্কের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে নাই। ল্যামার্কের বিশ বৎসর পরে ডারুইন এবং ওয়ালেস এই বিষয়ের সদুত্তর প্রদান করেন। তাঁহারা দেখাইলেন যে "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে" বৃক্ষাদি ও জন্তুগণের মধ্যে পৃথক পৃথক উপগণের উৎপত্তি হইয়াছে।* পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল যে প্রত্যেক প্রকারের বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে আলাহিদা করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদেরই বংশধর আধুনিক কালের বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু। ডারুইন ও ওয়ালেস বলিলেন যে তাহা হইতে পারে না। যাবতীয় বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু কয়েকটি বড় বড় গণে বিভক্ত এবং প্রকৃতির নির্ব্বাচনের ফলে সেই সকল গণ হইতে বিভিন্ন উপগণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দুইটি মূলসূত্রে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(ক) প্রত্যেক বৃক্ষলতা বা জীবজন্তু বংশরক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট, কিন্তু যদি সকল বীজই রক্ষিত হয় তাহা হইলে উৎপন্ন সকল বৃক্ষলতা ও জীবজন্তুকে স্থান বা আহার দান করা পৃথিবীর পক্ষে অসম্ভব। সেইজন্য যাহারা জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষা করিতে সর্ব্বাপেক্ষা সমর্থ তাহারাই জীবিত থাকিবে (survival of the fittest) বাকি সব মরিয়া যাইবে। ওয়ালেস

---

* ডারুইন তাঁহার "উপগণের উৎপত্তি" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার পূর্ব্বে আরও ৩৪ জন বৈজ্ঞানিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যাঁহারা অসম্পূর্ণরূপে এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ডারুইন এবং ওয়ালেস উহার পরিসমাপ্তি করেন।

গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে একজোড়া পক্ষীর যদি বৎসরে চারিটি করিয়া সন্তান হয় এবং তাহাদেরও আবার সন্তানাদি হইতে থাকে ও সকলগুলি জীবিত থাকে তাহা হইলে পনের বৎসরে একজোড়া পক্ষীর বিশ কোটি বংশধর হইবে। হাক্‌সলে সেইরূপ গণনার দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে একটি উদ্ভিদ হইতে বৎসরে মাত্র পঞ্চাশটি বীজ উৎপন্ন হইলে নয় বৎসরে তাহার বংশধরেরা—সমস্ত পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিবে এবং পৃথিবীতে আর অন্য কোন বৃক্ষলতার জন্য স্থান থাকিবে না। এই অসংখ্য বংশধরের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহারাই জীবিত থাকিবে। বলিষ্ঠ পিতার বংশরক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সম্ভবপর। নানা প্রাকৃতিক কারণে অধিকাংশ বৃক্ষ ও জন্তুর সন্তানগুলি মারা যায়। জলবায়ু, কীটপতঙ্গ, সংক্রামক রোগ প্রভৃতি ইহাদের মৃত্যুর প্রধান প্রাকৃতিক কারণ। একটা দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাইতে পারে। এক একটা তেঁতুল গাছের বৎসরে সহস্র সহস্র বীজ হয় সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু অধিকাংশ বীজই গাছের নীচে পড়ে বলিয়া, আওতায় অধিকাংশ বীজের অঙ্কুরই হয় না, যেগুলি হয় তাহাও অনেক মারা যায়। একস্থানে অনেক বীজ পড়িলে তাহারা আহার না পাইয়া অধিকাংশ মরিয়া যায়। উচ্চ পর্ব্বতে, বরফের দ্বারা আবৃত আর্টিক মহাদেশে বা মরুভূমিতে অনুপযোগী জলবায়ুর জন্য বৃক্ষলতা জন্মে না, জীবজন্তুর সংখ্যাও খুব কম। মানুষের সন্তান জননের ক্ষমতা কম, কিন্তু পঁচিশ বৎসরে মানবের সংখ্যাও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়।

(খ) সন্তানগণ পিতামাতার দৈহিক গঠন উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বীজের তারতম্যে কোনও দুইটি সন্তান একরূপ হয় না। নানা প্রাকৃতিক কারণে এক একটি বৃক্ষলতা বা জীবজন্তুর কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়চয় সামান্য পরিবর্ত্তিত হয় এবং তাহা ক্রমশঃ বংশধরদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইতে থাকে।

নানা প্রাকৃতিক কারণে এইরূপে একই গণ হইতে বিবিধ উপগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ উপগণের উৎপত্তি যে সম্ভব তাহা আমরা পশুপক্ষী পালনে মানব কর্ত্তৃক নির্ব্বাচনে (selection by man) স্পষ্ট দেখিতে পাই। যাঁহারা পায়রা পোষেন তাঁহারা জানেন যে বিবিধ জাতীয় পায়রাকে একত্র রাখিয়া কত বিচিত্র রকমের পায়রার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকল পায়রার কোন জাতির ঝুঁটি খুব বড় ও চিকণ, কাহারও পাখা খুব বিস্তৃত, কাহারও ঠোঁট বড় বা ছোট, কেহ বা দূরে উড়িয়া যাইতে পারে, কেহ পারে না। এই সকল বিবিধ জাতির পায়রা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাদের দেহের হাড়ের ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অনেক তারতম্য হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাচনের দ্বারা গৃহপালিত কুকুরের মধ্যে নিউফাউন্ল্যাণ্ড জাতীয় সুবৃহৎ কুকুর হইতে গ্রাম্য ক্ষুদ্র খেঁকিকুকুর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ এইরূপ নির্ব্বাচন করিয়া অশ্ব, গো, মহিষ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জন্তুর মধ্যে বিবিধ উপগণের উৎপাদন

করিতে সমর্থ হন। ঘোড়া ও গাধার সহবাসে খচ্চর নামক উপগণের উৎপত্তির কথা সকলেই জানেন।

যখন দেখিতে পাইতেছি যে মানুষ অল্পসময়ের মধ্যে নির্ব্বাচনের দ্বারা বিবিধ উপগণের সৃষ্টি করিতেছেন, তখন প্রকৃতি যে যুগযুগান্তর হইতে গণ হইতে উপগণ, উপগণ হইতে উপগণের সৃষ্টি করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? মানব অল্পসময়ের মধ্যে উপগণে যখন এত পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম, তখন প্রকৃতি নির্ব্বাচনের দ্বারা ক্রমশঃ উপগণের মধ্যে কত বৃহৎ পরিবর্ত্তন করিতে পারে তাহা অনায়াসে বুঝা যায়—এত পরিবর্ত্তন সম্ভবপর যে ক্রমশঃ উপগণগুলি একেবারে স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ নির্ব্বাচন ও ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা পৃথিবীর অসংখ্য প্রকারের জীবজন্তু ও বৃক্ষ লতার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে।

নানা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উপায়ে প্রকৃতি নির্ব্বাচনের দ্বারা উপগণের সৃষ্টি করিতেছেন। এইরূপ কয়েকটি উপায় এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা।
(Natural sorroundings)

মনে করুন একস্থানে ব্যাঘ্রের দল আছে এবং তাহাদের প্রধান আহার হরিণ। এস্থলে এই সকল ব্যাঘ্রের মধ্যে যাহারা খুব দ্রুতগামী তাহারাই হরিণ বধ করিয়া সেই আহারের দ্বারা বাঁচিয়া থাকিবে। এইরূপ দেশে দ্রুতগামী দীর্ঘাকৃতি ক্ষীণতনু ব্যাঘ্রই প্রকৃতির নির্ব্বাচনফলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, অন্য জাতীয় ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যাইবে না। শীতদেশের জীবজন্তু বা বৃক্ষলতা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আনীত হইলে, যেগুলি বাঁচিবে, তাহাদের অনেকগুলি নূতন স্থানের ও জলবায়ুর উপযোগী হইতে চেষ্টা করিবে। তাহারা কোন কোনও স্থলে নূতন উপগণে পরিণত হইবে। অনেকে পাহাড়ে বেলগাছ দেখিয়া থাকিবেন—দেখিতে ছোট, শক্ত ও সাধারণ বেলগাছ হইতে কতকপরিমাণে ভিন্নাকৃতি। সমতল ক্ষেত্রজাত বেলের বীচিই পাহাড়ের উপর পক্ষীর দ্বারা নীত হওয়াতেই এই গাছের উৎপত্তি, কিন্তু পাহাড়ে যেরূপ খাদ্য মিলে সেই খাদ্যের এবং তথাকার জলবায়ুর উপযোগী হইবার চেষ্টায় বৃক্ষটি কিয়ৎ পরিমাণে ভিন্নাকৃতি হইয়াছে। এইরূপ স্থান বা জলবায়ুর দরুণ এক একস্থানের বিশেষতঃ সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপের বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন যে কত জটিল তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। বিলাতে হার্টইস্ ও ডাচ ক্লভার নামক দুইটি উদ্ভিদ আছে। মক্ষিকা বা কীটপতঙ্গের দ্বারা উদ্ভিদের পুং-ফুলের রেণু স্ত্রী ফুলে আনীত হইলে সেই সঙ্গমে বীজ উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত দুইটি ফুলে অম্বল-বী নামক মক্ষিকাই সঞ্চরণ করে। কিন্তু ইঁদুরে এই মক্ষিকার বাসা ভাঙ্গিয়া ফেলে অপরদিকে বিড়ালে ইঁদুর ধরিয়া খায়। যে প্রদেশে বিড়াল বেশী, সেখানে ইঁদুরের সংখ্যা কম, মক্ষিকার সংখ্যা বেশী এবং সেইজন্য ফুলও সেখানে বেশী ফুটিবে।

গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে একজোড়া পক্ষীর যদি বৎসরে চারিটি করিয়া সন্তান হয় এবং তাহাদেরও আবার সন্তানাদি হইতে থাকে ও সকলগুলি জীবিত থাকে তাহা হইলে পনের বৎসরে একজোড়া পক্ষীর বিশ কোটি বংশধর হইবে। হাক্‌সলে সেইরূপ গণনার দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে একটি উদ্ভিদ হইতে বৎসরে মাত্র পঞ্চাশটি বীজ উৎপন্ন হইলে নয় বৎসরে তাহার বংশধরেরা—সমস্ত পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিবে এবং পৃথিবীতে আর অন্য কোন বৃক্ষলতার জন্য স্থান থাকিবে না। এই অসংখ্য বংশধরের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহারাই জীবিত থাকিবে। বলিষ্ঠ পিতার বংশরক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সম্ভবপর। নানা প্রাকৃতিক কারণে অধিকাংশ বৃক্ষ ও জন্তুর সন্তানগুলি মারা যায়। জলবায়ু, কীটপতঙ্গ, সংক্রামক রোগ প্রভৃতি ইহাদের মৃত্যুর প্রধান প্রাকৃতিক কারণ। একটা দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাইতে পারে। এক একটা তেঁতুল গাছের বৎসরে সহস্র সহস্র বীজ হয় সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু অধিকাংশ বীজই গাছের নীচে পড়ে বলিয়া, আওতায় অধিকাংশ বীজের অঙ্কুরই হয় না, যেগুলি হয় তাহাও অনেক মারা যায়। একস্থানে অনেক বীজ পড়িলে তাহারা আহার না পাইয়া অধিকাংশ মরিয়া যায়। উচ্চ পর্ব্বতে, বরফের দ্বারা আবৃত আর্টিক মহাদেশে বা মরুভূমিতে অনুপযোগী জলবায়ুর জন্য বৃক্ষলতা জন্মে না, জীবজন্তুর সংখ্যাও খুব কম। মানুষের সন্তান জননের ক্ষমতা কম, কিন্তু পঁচিশ বৎসরে মানবের সংখ্যাও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়।

(খ) সন্তানগণ পিতামাতার দৈহিক গঠন উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বীজের তারতম্যে কোনও দুইটি সন্তান একরূপ হয় না। নানা প্রাকৃতিক কারণে এক একটি বৃক্ষলতা বা জীবজন্তুর কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়চয় সামান্য পরিবর্ত্তিত হয় এবং তাহা ক্রমশঃ বংশধরদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইতে থাকে।

নানা প্রাকৃতিক কারণে এইরূপে একই গণ হইতে বিবিধ উপগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ উপগণের উৎপত্তি যে সম্ভব তাহা আমরা পশুপক্ষী পালনে মানব কর্ত্তৃক নির্ব্বাচনে (selection by man) স্পষ্ট দেখিতে পাই। যাঁহারা পায়রা পোষেন তাঁহারা জানেন যে বিবিধ জাতীয় পায়রাকে একত্র রাখিয়া কত বিচিত্র রকমের পায়রার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকল পায়রার কোন জাতির ঝুঁটি খুব বড় ও চিকণ, কাহারও পাখা খুব বিস্তৃত, কাহারও ঠোঁট বড় বা ছোট, কেহ বা দূরে উড়িয়া যাইতে পারে, কেহ পারে না। এই সকল বিবিধ জাতির পায়রা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহাদের দেহের হাড়ের ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অনেক তারতম্য হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাচনের দ্বারা গৃহপালিত কুকুরের মধ্যে নিউফাউন্ল্যাণ্ড জাতীয় সুবৃহৎ কুকুর হইতে গ্রাম্য ক্ষুদ্র খেঁকিকুকুর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ এইরূপ নির্ব্বাচন করিয়া অশ্ব, গো, মহিষ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জন্তুর মধ্যে বিবিধ উপগণের উৎপাদন

করিতে সমর্থ হন। ঘোড়া ও গাধার সহবাসে খচ্চর নামক উপগণের উৎপত্তির কথা সকলেই জানেন।

যখন দেখিতে পাইতেছি যে মানুষ অল্পসময়ের মধ্যে নির্ব্বাচনের দ্বারা বিবিধ উপগণের সৃষ্টি করিতেছেন, তখন প্রকৃতি যে যুগযুগান্তর হইতে গণ হইতে উপগণ, উপগণ হইতে উপগণের সৃষ্টি করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? মানব অল্পসময়ের মধ্যে উপগণে যখন এত পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম, তখন প্রকৃতি নির্ব্বাচনের দ্বারা ক্রমশঃ উপগণের মধ্যে কত বৃহৎ পরিবর্ত্তন করিতে পারে তাহা অনায়াসে বুঝা যায়—এত পরিবর্ত্তন সম্ভবপর যে ক্রমশঃ উপগণগুলি একেবারে স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ নির্ব্বাচন ও ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা পৃথিবীর অসংখ্য প্রকারের জীবজন্তু ও বৃক্ষ লতার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে।

নানা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উপায়ে প্রকৃতি নির্ব্বাচনের দ্বারা উপগণের সৃষ্টি করিতেছেন। এইরূপ কয়েকটি উপায় এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

(Natural sorroundings)

মনে করুন একস্থানে ব্যাঘ্রের দল আছে এবং তাহাদের প্রধান আহার হরিণ। এস্থলে এই সকল ব্যাঘ্রের মধ্যে যাহারা খুব দ্রুতগামী তাহারাই হরিণ বধ করিয়া সেই আহারের দ্বারা বাঁচিয়া থাকিবে। এইরূপ দেশে দ্রুতগামী লম্বাকৃতি ক্ষীণতনু ব্যাঘ্রই প্রকৃতির নির্ব্বাচনফলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, অন্য জাতীয় ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যাইবে না। শীতদেশের জীবজন্তু বা বৃক্ষলতা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আনীত হইলে, যেগুলি বাঁচিবে, তাহাদের অনেকগুলি নূতন স্থানের ও জলবায়ুর উপযোগী হইতে চেষ্টা করিবে। তাহারা কোন কোনও স্থলে নূতন উপগণে পরিণত হইবে। অনেকে পাহাড়ে বেলগাছ দেখিয়া থাকিবেন—দেখিতে ছোট, শক্ত ও সাধারণ বেলগাছ হইতে কতকপরিমাণে ভিন্নাকৃতি। সমতল ক্ষেত্রজাত বেলের বীচিই পাহাড়ের উপর পক্ষীর দ্বারা নীত হওয়াতেই এই গাছের উৎপত্তি, কিন্তু পাহাড়ে যেরূপ খাদ্য মিলে সেই খাদ্যের এবং তথাকার জলবায়ুর উপযোগী হইবার চেষ্টায় বৃক্ষটি কিয়ৎ পরিমাণে ভিন্নাকৃতি হইয়াছে। এইরূপ স্থান বা জলবায়ুর দরুণ এক একস্থানের বিশেষতঃ সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপের বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন যে কত জটিল তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। বিলাতে হার্টইস্ ও ডাচ ক্লভার নামক দুইটি উদ্ভিদ আছে। মক্ষিকা বা কীটপতঙ্গের দ্বারা উদ্ভিদের পুং-ফুলের রেণু স্ত্রী ফুলে আনীত হইলে সেই সঙ্গমে বীজ উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত দুইটি ফুলে অম্বল-বী নামক মক্ষিকাই সঞ্চরণ করে। কিন্তু ইঁদুরে এই মক্ষিকার বাসা ভাঙ্গিয়া ফেলে অপরদিকে বিড়ালে ইঁদুর ধরিয়া খায়। যে প্রদেশে বিড়াল বেশী, সেখানে ইঁদুরের সংখ্যা কম, মক্ষিকার সংখ্যা বেশী এবং সেইজন্য ফুলও সেখানে বেশী ফুটিবে।

আবার বিড়ালের সংখ্যা যেখানে কম, সেখানে ইঁদুর বেশী, সেইজন্য মক্ষিকা কম, ফুলও কম ফুটিবে। অতএব কোনও প্রদেশে উপরোক্ত দুই জাতীয় ফুলের সংখ্যা সেইস্থানের বিড়ালের সংখ্যার উপর নির্ভর করিতেছে।

ইন্দ্রিয়বিশেষের ব্যবহার ও অব্যবহার (use and disuse of parts)। অনেক ইন্দ্রিয় অব্যবহারে ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায় ও ব্যবহারে পরিবর্ত্তিত হয়। যে ইন্দ্রিয় কার্য্যোপযোগী (useful) তাহাই স্থায়ী হয়। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত আমরা গৃহপালিত পশুপক্ষীতে পাই। একই জন্তু বন্য অবস্থায় ও গৃহপালিত অবস্থায় পৃথক হয় এবং তাহাদের বংশধরগণও আরও পৃথক হইয়া পড়ে। বন্য কুক্কুট, পাতিহাঁস, রাজহাঁস প্রভৃতি পক্ষী বেশ উড়িতে পারে, গৃহপালিত অবস্থায় তাহাদের উড়িবার প্রয়োজন হয় না—সেইজন্য ক্রমশঃ তাহাদের পাখার হাড়গুলি এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে তাহাদের বেশীদূর উড়িয়া যাইবার ক্ষমতা চলিয়া যায় এবং তাহাদের সন্তানগণও আর উড়িতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পক্ষীদিগকে প্রাণভয়ে উড়িতে হয় না বলিয়া, পাখাবিহীন বা অল্প পাখাবিশিষ্ট পক্ষীও দৃষ্ট হয়। গৃহপালিত অনেক পশুর কানগুলি নিম্নদিকে বাঁকান, কিন্তু বন্য অবস্থায় তাহাদের কান সোজা দেখা যায়। গৃহপালিত অবস্থায় তাহারা তেমন ভয় আদৌ পায় না এবং সেইজন্য কান খাড়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করাতে তাহাদের কাণের হাড়গুলি এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে কানগুলি দোমড়ান অবস্থাতেই স্বভাবতঃ থাকে। তাহাদের সন্তানগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে এইরূপ দোমড়ান কান বিশিষ্ট হইয়া থাকে। গুবুরে পোকার (beetles) চরিবার সময় পাগুলি প্রায়ই ভাঙ্গিয়া যায়, সেইজন্য তাহাদের সন্তানগুলিতে ক্রমশঃ পা লোপ পাইয়া যায়। ওয়ালষ্টন নামক একজন সাহেব একস্থানে দেখিয়াছিলেন যে ৫৫০ প্রকার গুবুরে পোকার মধ্যে ২০০ পোকার ডানা এত ছোট হইয়া গিয়াছে যে তাহারা উড়িতেই পারে না। এইরূপ অনাবশ্যক ইন্দ্রিয়ের অব্যবহার ও আবশ্যক ইন্দ্রিয়ের বহুল ব্যবহার বিবিধ উপগণ উৎপাদনের সহায়তা করে।

সুন্দর সুন্দর ফুলের যে বিচিত্র রং দেখিতে পাই, তাহা কেবল মানবের চক্ষুর আনন্দোৎপাদন করিবে বলিয়া সৃজিত হয় নাই, সেই বিচিত্র রং উদ্ভিদের জীবন ও বংশরক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। ফার, ওক, অ্যাশ, ঘাস প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিদের বীজ বায়ুর সাহায্যে উৎপন্ন হয় তাহাদের ফুল রঙ্গিন হয় না। কিন্তু যে সকল উদ্ভিদের ফুলের রেণুবহনের জন্য মক্ষিকা বা কীটপতঙ্গের সাহায্য প্রয়োজন, উহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য সেই সকল ফুলের রং বিচিত্রবর্ণের হইয়া থাকে। আম, আপেল, পেঁপে প্রভৃতি বিবিধ পক্ক ফলের বিভিন্ন রংও সেই সকল বৃক্ষলতার বংশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। পক্ষী ও জন্তুগণ তাহাদের

ফলের রঙের দ্বারা প্রথমে আকৃষ্ট হইবে বলিয়া তাহাদের অত রং। এইরূপ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে অনেক জন্তুর পুরুষজাতির বিচিত্র বর্ণের পাখা আছে, পুরুষ সিংহের কেশর আছে, ময়ূরের প্যাখম আছে, মোরগের ঝুঁটি আছে, কিন্তু এই সকল জন্তুর স্ত্রীজাতির এরূপ নাই। পুরুষ জন্তুদের এই সৌন্দর্য্য তাহাদের বংশরক্ষার কল্পে প্রয়োজনীয়। রূপ দেখাইয়া পুরুষ জন্তু স্ত্রীজন্তুর মন ভুলাইয়া তাহাদিগের সহিত সখ্য স্থাপন করে। আবার অনেক পক্ষীর স্ত্রী ও পুরুষজাতি—দুইয়েরই পক্ষের সৌন্দর্য্য আছে। সে সৌন্দর্য্য স্ত্রীপক্ষিরা পুরুষের নিকট যৌননির্ব্বাচনের (sexual selection) দ্বারা উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায় যে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। যে ইন্দ্রিয় জীবনযাত্রার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় তাহা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে এবং নূতন উপগণের সৃষ্টি হইবে।

জারজনন (intercrossing)—। বিবিধ প্রকারের বৃক্ষলতা, পশুপক্ষীর মধ্যে জারজননেও উপগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অবশ্য সকল প্রকার বৃক্ষলতা বা পশুপক্ষীর মধ্যে জারজনন আদৌ সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বে অনেক বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস ছিল যে জারজননের দ্বারা উৎপন্ন সন্তানগণের আর সন্তান হয় না। ডারুইন দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে এই সিদ্ধান্ত অনেকস্থলে সত্য নহে। উপরন্তু অনেক স্থলে জারজননের দ্বারা সন্তান আরও বেশী সবল ও সতেজ হয়। বৃক্ষলতাদের মধ্যে এই জারজনন কীটপতঙ্গ কর্ত্তৃক রেণু বহনের দ্বারা সঞ্চারিত হয়। ডারুইন দেখিয়াছেন যে বিভিন্ন প্রকারের কপি, মূলা, পেঁয়াজ ও অন্যান্য সবজী একসঙ্গে পুঁতিয়া তাহাদের প্রত্যেকের বীজ সংগ্রহ করিয়া সেই বীজ হইতে সবজী উৎপন্ন করিলে তাহাদের অনেকগুলি পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি এইরূপে ২৩৩টি কপির চারা রোপণ করিয়া দেখিলেন যে মাত্র ৭২টি চারা ঠিক আছে, বাকি চারাগুলি হইতে উৎপন্ন ফুল কতক পরিমাণে পৃথক হইয়া গিয়াছে। শশক ও খরগোসের সংযোগে যে জার উৎপন্ন হয় তাহা বন্ধ্য (sterile) নহে, শশক বা খরগোসের সংযোগে তাহার বহু সন্তান হইয়া থাকে। সাধারণ রাজহাঁস ও চীন দেশীয় রাজহাঁসকে প্রাণীবিদ্যাবিশারদেরা বিভিন্ন গণে ফেলিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গমে যে জার উৎপন্ন হয় তাহারও সন্তান উৎপাদনের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। গৃহপালিত বিবিধ প্রকারের পায়রা, কুকুর, গরু, মহিষের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের সংসর্গে যে সন্তান হয় তাহাও আদৌ বন্ধ্য নহে। এইরূপ জারজননের দ্বারাও বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষীদের মধ্যে অনেক প্রকারের উপগণের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে।

এইরূপ নানা জাত ও অজ্ঞাত কারণে প্রকৃতি নির্ব্বাচন করিয়া একই গণ হইতে উপগণের সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ল্যামার্ক স্বীকার করিয়াছেন যে পশুপক্ষীগণ কয়েকটি আদি

জন্তু হইতে উৎপন্ন। কিন্তু তাহার মত গ্রাহ্য হয় নাই, তাহার কারণ, তিনি দেখাইতে পারেন নাই কেমন করিয়া একই গণ হইতে বিবিধ পশুপক্ষীর উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে। ডারুইন এই প্রশ্নের সমাধান করিলেন—প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা ক্রমশঃ জীবজন্তু ও বৃক্ষলতার মধ্যে এত পার্থক্য সম্ভবপর হইয়াছে। তিনি দেখাইলেন, যে উপগণের আর পরিবর্ত্তন হয় না, তাহারা চিরস্থায়ী (immutable) —এই মত ভ্রান্ত। আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র উপগণের যাহা গণ, তাহাই. আবার বৃহত্তর গণের উপগণ। এইরূপে ডারুইন সিদ্ধান্ত করিলেন যে পশুপক্ষী এই ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে চারি পাঁচটি বৃহৎগণ হইতে উৎপন্ন এবং বৃক্ষলতাও তদ্রূপ-ভাবেই সৃষ্ট।

ডারুইনের এই মত প্রথমতঃ কেহই গ্রাহ্য করিলেন না। যিনি একটা বড় রকমের নূতন কথা প্রথম বলেন তিনি পাগলইত বটে। ডারুইনও প্রথম প্রথম অনেক গালি খাইলেন। ক্রমশঃ লায়েল প্রমুখ বিখ্যাত ভূবিদ্যাবিৎ, হাক্সলে প্রমুখ প্রাণিবিদ্যাবিৎ, হুকারের মত উদ্ভিদবিদ্যা-বিদেরা তাঁহার মত গ্রহণ করিলেন। আধুনিক কালে ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মত অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা বৃক্ষলতা ও জীব সৃষ্টির যে মত প্রচার করিয়াছেন তাহা অটুট আছে। তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রত্যেক বিজ্ঞানকে অনু-প্রাণিত করিয়াছে। সেই সিদ্ধান্তের সত্যতা নিরূপণ করিবার জন্য কত বৈজ্ঞানিক কত নূতন পরীক্ষা করিয়াছেন এবং সেই সকল পরীক্ষার দ্বারা ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা বহুলপরিমাণে উন্নত হইয়াছে।

মানবের উৎপত্তি (Descent of man)।

ডারুইন বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষীদের জন্ম বৃত্তান্ত তাহার "উপগণের উৎপত্তি" নামক গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। মানব শ্রেষ্ঠ জীব, তাহার উৎপত্তির বিষয় একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে মানব জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও মানব অন্যান্য জীব হইতে একেবারে স্বতন্ত্র নহে।

প্রথমতঃ—মানবের দৈহিক গঠন অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর জীবের দৈহিকগঠন হইতে একেবারে পৃথক নহে। মানবশরীরের হাড়, পেশী, স্নায়ু, রক্তস্থলী প্রভৃতি বানর, বাদুড় বা সিল মৎস্যের ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত তুলনীয়। হাক্সলে প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছেন যে জীবের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মস্তিষ্কের গঠন প্রণালীর সহিত বানরজাতীয় জীবগণের মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালীর অনেক সাদৃশ্য আছে, তবে ঐ সাদৃশ্য একেবারে সম্পূর্ণ নহে, তাহা হইলে বানর ও মানবের বুদ্ধি বৃত্তি সমান হইত। দৈহিক গঠনে সাধারণ বানর, সিম্পাঞ্জি, ওরাং প্রভৃতি বানর জাতীয় জীবের সহিত মানবের দৈহিক গঠনের সাদৃশ্য সব চেয়ে বেশী।

অপুষ্ট ভ্রূণাবস্থায় মানবভ্রূণ কুকুর প্রভৃতি মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবগণের ভ্রূণ হইতে সহজে মানবভ্রূণের পার্থক্য অনুমিত হয় না।

ক্রমশঃ একই প্রকার ইন্দ্রিয় হইতে পক্ষীর ডানা ও পা এবং মানুষেরো হাত ও পা বাহির হয়। ভ্রূণের পরিণতির সময়ই এই সকল জীবের পার্থক্য অনুভূত হয়। যদি এইরূপ কথা অনেকের নিকট আশ্চর্য্য ঠেকিবে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ পরীক্ষা-মূলক সত্য।

বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবিধ মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা মানব অবশ্য অন্যান্য জীব হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ কিন্তু অন্যান্য জীবের যে বুদ্ধিবৃত্তি নাই বা তাহারা ভালবাসিতে, রাগিতে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে, অনুকরণ করিতে, প্রতিশোধ লইতে বা ভাবিতে একেবারেই জানে না এমন নহে। দুই একটি উদাহরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। কুকুরের প্রভুভক্তি সর্ব্বজন বিদিত। চক্রবাক চাক্রবাকীর দাম্পত্য প্রেম কবি-কল্পনা নহে, সম্পূর্ণ সত্য। জননীর সন্তানের উপর স্নেহ যেমন মানব সমাজে দেখা যায়, জীবজগতেও ঠিক সেইরূপই দৃষ্ট হয়। বৎসহারা গাভীর করুণ রোদন যিনি শুনিয়াছেন তিনি একথা অস্বীকার করিবেন না। অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা অনেক পশুতে দৃষ্ট হয়। ময়না বা কাকাতুয়া "রাধাকৃষ্ণ" পড়ে, বানরে সাষ্টাঙ্গে সেলাম করে, বিবিধ জন্তুতে বিবিধ মানবোচিত ক্রীড়া প্রদর্শন করে। পশুদের যে চিন্তা করিবার ক্ষমতা আছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। চিড়িয়াখানায় হাতীর নিকট কোনও জিনিস ফেলিয়া দিলে উহা শুঁড়ের দ্বারা না পাইলে জিনিসের অপর পারে বায়ুনিঃসরণ করিতে থাকে যাহাতে বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া জিনিসটা তাহার আয়ত্তে আসে। একজন সাহেব ভারেনা সহরে দেখিয়াছিলেন যে একটি ভল্লুক নিকটবর্ত্তী জলে একটুকরা রুটি ভাসিতে দেখিয়া তাহা পাইবার জন্য থাবা দিয়া একটি ছোট নালা কাটিয়া জল ও তাহার সঙ্গে রুটির টুকরাও নিকট আনয়ন করিয়াছিল।

ডারুইন জীবজন্তুদিগের এইরূপ বুদ্ধি বৃত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিস্তর উদাহরণ দিয়াছেন। বানর জাতির বুদ্ধিবৃত্তি মানবের অতি নিকট। অনেকে মনে করেন মানুষই কেবল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে। কিন্তু ঠিক তাহা নহে। বন্য সিম্পাঞ্জি পাথরের দ্বারা ফল ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরের শাঁস খায়। রেংগার নামক এক সাহেব একটি বানরকে এইরূপ শক্ত কাঁচা তাল ভাঙ্গিয়া তাহার রস খাইতে শিখাইয়াছিলেন। হাতীরা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া মাছি তাড়াইতে থাকে। একবার এবিসিনিয়া দেশে একটি পার্ব্বত্য পথে কোবার্গ গোথার ডিউকের সহচরেরা পর্ব্বতের উপরিস্থিত একদল বানরের প্রতি গুলি করিতেছিলেন। বানরেরা তখন একজোটে মানুষের মাথার উপর বড় বড় প্রস্তর খণ্ড ফেলিয়া তাহাদিগকে পলায়নে বাধ্য করিল। স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি উচ্চ মানসিক বৃত্তিও কতক কতক পরিমাণে জন্তুদের মধ্যে আছে। ডারুইনের একটি পোষা কুকুর ছিল। তিনি ইচ্ছা করিয়া উহাকে পাঁচবৎসর বাঁধিয়া রাখিবার পর একদিন তাহার নিকট প্রত্যাগমন করিলে প্রথম

কুকুরটা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না; তাহার পর হঠাৎ তাহার স্মরণ হওয়াতে ডারুইনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্বেকার মত আসিতে লাগিল। অবশ্য ভাষা মানবকে উচ্চতম জীব করিয়া রাখিয়াছে। তবে জন্তুদিগের মধ্যে ভাষার যে প্রচলন একেবারে নাই তাহা নহে। বিবিধ প্রকারের শব্দের দ্বারা তাহারা মনোভাব প্রকাশ করে। তাহাদের ক্রন্দনের ভাষা ও রাগের ভাষা যে স্বতন্ত্র তাহা বেশ বুঝা যায়। অবশ্য মানব যেরূপ তাহার সকল ভাবই ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে জন্তুরা তাহা পারে না। মানবের লিখিবার শক্তি চর্চ্চা ও আলোচনার ফলে তাহারা পশু হইতে বহু উচ্চে; কিন্তু অসভ্য জাতিদের লিখিত ভাষা নাই।

সৌন্দর্য্য জ্ঞান যে মানব সমাজেই নিবদ্ধ তাহা নহে। অন্যান্য অনেক জন্তুতে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। ময়ূরের সুন্দর পাখনা ময়ূরীর পছন্দের জন্য, মানবের চক্ষু-রিন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য নহে। অনেক পুংপক্ষী স্ত্রী-পক্ষীর মনোরঞ্জনার্থ বিবিধ প্রকারের গান করিয়া থাকে। মানবের মধ্যে এই সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও সঙ্গীতপ্রিয়তা যে সমান নহে, তাহার প্রমাণ অসভ্যজাতির বিচিত্র পরিচ্ছদ ও বেশভূষা সভ্যজাতির নিকট আদৌ প্রিয় নহে। সকল জাতির সঙ্গীত প্রণালী আদৌ এক নহে।

ভগবানে বিশ্বাস অনেকে মানবজাতির নিজস্ব পার্থক্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই বিশ্বাস যে মানবের অনিবার্য্য প্রবৃত্তি-মূলক তাহা নহে, কারণ ডারুইন ভ্রমণ-কারীদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে দেখাইয়াছেন যে অনেক অসভ্য জাতিদের মধ্যে ভগবানে বিশ্বাস নাই। ভগবানে বিশ্বাস ও ধর্ম্ম মানবজাতির উন্নতি ও শিক্ষার সহিত ক্রমশঃ মানব সমাজে স্থান পাইয়াছে।

পশুপক্ষীদিগের মধ্যেও সামাজিক বন্ধন কতক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা শিকার করেন তাঁহারা জানেন যে বৃহৎ নদীর চড়ে একসঙ্গে হাজার হাজার রাজহাঁস, পাতিহাঁস, পায়রা, চক্রবাক বাস করে। বানরেরা যখন বাগান লুট করিতে যায় তখন তাহারা সাধারণতঃ একজন দলপতির আদেশে কার্য্য করিয়া থাকে। একই পালে গরু, ভেড়া, ছাগল চরিতে অনেকেই দেখিয়াছেন।

এইরূপে ডারুইন দেখাইয়াছেন যে শরীরের গঠন প্রণালী, বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক ক্রিয়াতে মানব অন্যান্য জন্তু হইতে একেবারে স্বতন্ত্র নহে। উচ্চ মানসিক বৃত্তি মানব সমাজে শিক্ষা ও সভ্যতার দরুণ খুব বেশী পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়াতে মানবকে এত উচ্চ জীব বলিয়া প্রতীয়মান হয়; নহিলে আফ্রিকার অনেক অসভ্য মানব জাতি ও উচ্চশ্রেণীর বানরজাতিতে বিশেষ তফাৎ বড় একটা নাই বলিলেও চলে। সেইজন্য ডারুইন বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে মানবই প্রথম জীবরূপে জন্মগ্রহণ করে নাই। নিম্নশ্রেণীর জীব প্রথমে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা ক্রমশঃ উচ্চতর জীবে পরিণত হইয়াছে। মানবের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষ উচ্চ বানর জাতি। এই বানরজাতির পূর্ব্বপুরুষ কোনও চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী জন্তু (mammal) এবং

স্তন্যপায়ী জন্তুরা প্রাচীন কোন দ্বিগর্ভ পশু (marsupial) হইতে উদ্ভূত। তাহারা আবার নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া কোনও উভচর (জলচর ও স্থলচর) জন্তু হইতে উদ্ভূত এবং এই উভচর জন্তুগণ মৎস্যাকৃতি জন্তু হইতে উৎপন্ন। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ এমন একপ্রকার জলজন্তু ছিল, যাহাদের শরীরে স্ত্রী এবং পুং চিহ্ন উভয়ই বিদ্যমান এবং শরীরের কার্য্যোপযোগী প্রত্যেক ইন্দ্রিয় অসম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। †

এই ক্রমিক সৃষ্টি প্রকরণে অনেক বিষয়ের সমাধান হয়। প্রথমতঃ ভূবিদ্যাবিদেরা সর্ব্বপ্রাচীন যুগের পর্ব্বতে কেবল মৎস্যাকৃতি জীবের, তাহার পরবর্ত্তী যুগের পর্ব্বতে ক্রমান্বয় উভচর জন্তু, পক্ষী, পশু, বানর ও মনুষ্য কঙ্কাল কেন পান তাহার মীমাংসা হয়। প্রাকৃতির নির্ব্বাচনের ফলে ক্রমশঃ উন্নততর জীব জন্তুর উদ্ভব হইয়াছে। যেমন সভ্যতার বৃদ্ধির দরুণ আধুনিক সমাজে কারিগর, ছুতার, দোকানদার, স্বর্ণকার প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর ব্যক্তি রহিয়াছেন, সেইরূপ ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর জীব জন্মগ্রহণ করাতে তাহাদের ইন্দ্রিয়নিচয় বিবিধ কর্ম্মোপযোগী হইয়া ক্রমশঃ সৃষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এই ক্রমিক সৃষ্টি প্রকরণ বুঝাইয়া দিতেছে—কেন মানবের হাত আর মাছের পাখনা, একজাতীয় সৃষ্ট পদার্থ। উত্তরাধিকারীসূত্রে শরীরের স্থূল স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি সকল জীব জন্তুই পাইয়াছে। সব জীবজন্তু এক ছাঁদে প্রস্তুত এরূপ মীমাংসা বিজ্ঞান সম্মত নহে।

ডারুইনের "ডিসেণ্ট অব ম্যান" নামক গ্রন্থ ১৮৭১ সালে বাহির হয়। তাঁহার প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মত ইতিপূর্ব্বে অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থে মানব-উৎপত্তির

† ডারুইন তাঁহার "Origin of the species" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "I believe that animals are descended from at most only four or five progeniters, and plants from an equal or lesser number. Analogy would lead me one step farther, namely, to the belief that all animals and plants are descended from one prototype. But analogy may be a deceitful guide (P. 424." কিন্তু পরে তাঁহার "Descent of man"এ তিনি ক্রমবিবর্ত্তনের চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন "We thus learn that man is descended from a hairy tailed quadruped, properly arboreal in its habits, and an inhabitant of the old world. This creature, if its whole structure had been examined by a naturalist, would have been classed amongst the Quadrumana, as surely as the still more ancient progeniters of the Old and New world monkeys. The Quadrumana and all the higher mammals are probably derived from an ancient marsupial animal, and this through a long live of divesified forms, from some amphibian like creature and this again from some fish like animal. In the dim obscutity of the past we can see that the early progeniter of all the Vertebreta must have been an aquatic animal provided with branchiœ with;the two sexes united in the same individual and with the most important organs of the body (such as the brain and heart) imperfectly or not at all developed. This animal seems have been more like the larve of the existing marine Ascidians than any other known form." (P. 609)

বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা বাইবেলের উপদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং অনেকে তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মদ্বেষী অধার্ম্মিক বলিয়া গালি দিলেন। কিন্তু ডারুইনের শিষ্যও অনেক হইল। তিন বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

এই দুই গ্রন্থে বৃক্ষলতা, জীবজন্তুর সৃষ্টিতত্ত্ব ডারুইন যেরূপ ভাবে উদ্ঘাটন করিয়াছেন তাহাতে ভূবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান নূতন আলোকে আলোকিত হইল। এখন হইতে দেখা গেল প্রত্যেক জন্তু বা বৃক্ষলতা পৃথক পদার্থ নহে, বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, বিশ্বের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির একটা নিগূঢ় ঐক্য আছে, তাহা সকলে বুঝিল। ভূবিদ্যাবিদ এখন হইতে গতযুগের জীবাবশেষ খুঁজিতে থাকিলেন, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদেরা প্রত্যেক বৃক্ষলতা, জীবজন্তুর শারীরিক ঐক্য ও পার্থক্য এবং তাহাদের কার্য্যাবলী মানবজীবনের কার্য্যাবলীর ন্যায় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ডারুইনের এই ক্রমবিবর্ত্তনবাদ এখন হইতে প্রত্যেক বিজ্ঞান অনুপ্রাণিত করিয়াছে। নিউটনের আবিষ্কার যেমন জড়জগতে সেইরূপ ডারুইনের আবিষ্কার জীবজগতে বিপ্লব উপস্থিত করিল।

কেঁচোর (earth worm) কার্য্য।

ডারুইন আরও অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছিলেন—যাহার দ্বারা অন্য কোনও বৈজ্ঞানিক ক্রমবিবর্ত্তনবাদ প্রতিষ্ঠিত না করিয়াও বিখ্যাত হইতে পারিতেন। এইরূপ কয়েকটি বিষয়ের পরিচয় এখানে প্রদত্ত হইল। ১৮৩৮ সালে তিনি কেঁচোর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা পরিবর্ত্তিত আকারে ১৮৮১ সালে পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি দেখান যে কেঁচো পৃথিবীর অনেক উপকার সাধন করিতেছে। পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল যে ঘাসের নিম্নেকার মাটি সমান ভাবেই থাকে। ডারুইন দেখাইলেন যে এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কেঁচো ঘাসের নিম্নস্তর হইতে ক্রমাগত মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া মাটি বদলাইয়া দিতেছে। এই উত্থিত মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে বায়ু বা বৃষ্টির দ্বারা নিম্নস্তরে নীত হইতেছে। এইরূপে মৃত্তিকাস্তর ক্রমাগত নূতন হইতেছে।

কীটভোজী উদ্ভিদ

(insectivorous plant)

১৮৮৫ সালে "কীটভোজী উদ্ভিদ" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থে তিনি ঐ প্রকার উদ্ভিদের কার্য্যবলীর বর্ণনা করেন। এই উদ্ভিদগুলির কার্য্য অতি অদ্ভুত—অনেকটা জীবজন্তুর মত। কীট পতঙ্গ তাহার পাতায় বসিলে পাতাগুলি গুটাইয়া যায়। তাহার পর পাতা হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়। এই রসের সাহায্যে উদ্ভিদ পতঙ্গগুলিকে হজম করিয়া ফেলে। ডারুইন ১৮৬০ সালে সাসেক্স প্রদেশে বেড়াইতে গিয়া এইরূপ উদ্ভিদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরে ঐ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন।

তাহা ছাড়া তিনি একখানি গ্রন্থে সমুদ্র মধ্যস্থ "প্রবাল দ্বীপপুঞ্জে"র (ceval reef)

উৎপত্তি সম্বন্ধে নূতন মত প্রকাশ করেন। অন্য একখানি গ্রন্থে জড়ান লতার (climbing plants) কার্য্যাবলী সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা প্রকাশ করেন। কিরূপে অরকিড (orchid) জাতীয় গাছ কীটপতঙ্গের দ্বারা বীজাক্ত (fertilised) হয় তাহা নির্ণয় করিয়া একখানি পুস্তক লেখেন। বৃক্ষলতার মধ্যে জারজনন (cross) ও বীজ জনন সম্বন্ধে আর একখানি পুস্তক লেখেন। তাহা ছাড়া আরও কয়েকখানি ভূবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থ তাঁহার অসীম কর্ম্মপটুতা, অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এইরূপ অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর অনেক দিন হইতেই ভাঙ্গিতেছিল। প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তিনি পেটের পীড়া ও বাতে কষ্ট পাইতেছিলেন। যখন শরীর অত্যন্ত খারাপ হইত, তখন মাঝে মাঝে কাজ হইতে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য বেড়াইতে যাইতেন। বাটীতে তিনি খুব নিয়মিতাচারী ছিলেন। দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে লেখা পড়া করিতেন, মাঝে মাঝে বেড়াইয়া আসিতেন। বস্তুতঃ তিনি সারাজীবন দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া বাঁচিয়াছিলেন। অত অধিক পরিমাণে মানসিক শ্রম না করিলে হয়ত তাঁহার শরীর ভাল থাকিত, কিন্তু তিনি লেখা পড়া না করিয়া থাকিতেই পারিতেন না। তাঁহার ব্যবহার খুব শিষ্ট ছিল এবং চরিত্রও মধুর ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তিনি ডাউন নামক পল্লীগ্রামেই আজীবন বাস করিয়াছিলেন। সেইখানেই তিনি ১৮৮২ সালে ১৯এ এপ্রিল তারিখে ৭৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচটি পুত্র ও দুইটি কন্যা রাখিয়া যান।

এই মহাপুরুষকে জীবদ্দশায় শুনিতে হইয়াছিল যে তাঁহার গবেষণার দ্বারা তিনি খৃষ্টধর্ম্মদ্বেষী ও অধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। সুখের বিষয় যে উনবিংশ শতাব্দীতে মানবমন অনেকটা উচ্চ হইয়াছিল, নতুবা তাহার পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিলে হয়ত তাঁহাকেও গ্যালিলিওর মত কারাবাস ও ব্রুনোর মত জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইত। মৃত্যুকালে ইংরাজ জাতি তাঁহার দেহ সুপ্রসিদ্ধ ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবীতে কবর দিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি উচিত সম্মানই দেখাইয়াছিলেন।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

যমালয় ও নরক সম্বন্ধে ভৌগোলিকতত্ত্ব

(কুমেরু আবিষ্কারের প্রমাণ।)

যমালয় ও নরকের ভীষণ চিত্র আমাদের মনে এরূপ দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যে যমালয় ও নরকের নাম শুনিয়া শিহরিয়া না উঠেন এরূপ লোক অতি অল্পই আছেন। সুতরাং এস্থলে যমালয় ও নরকের ভীষণতার বর্ণনা প্রদান করিয়া সেই ভীতির ভাবটীকে বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করি না। আমার একান্ত ভরসা যে

ইহার আলোচনদ্বারা সেই ভীতির ভাবের স্থলে বরঞ্চ কৌতূহলের ভাবই উদ্রিক্ত হইবে।

নরকের মূলসম্বন্ধে বেদে আমরা যে সন্ধান প্রাপ্ত হই তাহাতে ইহাকে প্রথম গর্ত্তরূপেই বর্ণিত দেখিতে পাই যথা—

"অভ্রাতরো ন যোষণো ব্যংতঃ পতিরিপো ন জনয়ো দুরেবাঃ।
পাপাসঃ সন্তো অনৃতা অসত্যা ইদং পদমজনতা গভীরম্॥" ৫
ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৫ম সূক্ত।

"যে সমস্ত লোক পাপী হওয়াতে অনৃতবাদী ও অসৎ হইয়া ভ্রাতৃবিহীনা পতিবিদ্বেষিণী দুশ্চারিণী স্ত্রীর ন্যায় যথেচ্ছ ভ্রমণ করে তাহাদের জন্যই এই গভীর স্থান (গর্ত্ত) উৎপাদিত হইয়াছে।

এখানে নরক যে একটী গভীর স্থান রূপে বর্ণিত হইয়াছে অন্য একটী বর্ণনা হইতে সেই গভীর স্থানটী কিরূপ তাহা আমরা বুঝিতে পারি :—

"অবাসাং মঘবঞ্জহি শর্দ্ধো যাতুমতীনাম্।
বৈলস্থানকে অর্ম্মকে মহাবৈলস্থে অকর্ম্মকে॥" ৩
ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৩৩ সূক্ত।

"হে মঘবন্। এই হিংসাবতী (সেনার) বল চূর্ণ কর, এবং কুৎসিৎ বিলে বা মহাবিলে (ইহাদিগকে) নিক্ষেপ কর।"

এখানে শত্রু-সৈন্যদিগকে নিহত করিয়া নরকে নিক্ষেপ করার জন্যই প্রার্থনা করা হইতেছে। বিল শব্দের অর্থ গুহা। সুতরাং 'বৈলস্থান' গুহাকে ও 'মহাবৈল' গভীর গুহাকে বুঝাইতেছে। ইহা হইতে পর্ব্বত গহ্বরই যে প্রথম নরকরূপে কল্পিত হইয়াছিল তাহাই অনুমান করা যাইতে পারে।

মহাভারতে উত্তরকুরুবাসিদিগের মৃতদেহ পর্ব্বতগুহাতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—

"তাঁহারা কলেবর পরিত্যাগ করিলে তীক্ষ্ণতুণ্ডসম্পন্ন অতি ভয়ঙ্কর ভারুণ্ড নামক পক্ষীসকল তাঁহাদিগকে হরণ করিয়া গিরিদরীতে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।" (৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব ৭ম অধ্যায়।)

মৃতদেহ গুহাতে নিক্ষিপ্ত হইত বলিয়া নরকস্থান যে গর্ত্তরূপে কল্পিত হইবে তাহা বিশেষরূপেই সম্ভবপর। নরকের গুহা বা গর্ত্তরূপে কল্পনা হইতেই 'নরক কুণ্ডের' ধারণা উৎপন্ন হইয়াছে। নরককুণ্ডের বর্ণনা হইতেই পূর্ব্বোক্ত কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যায়।—

"নরকাণাঞ্চ কুণ্ডানি সন্তি নানা বিধানিচ।
বিস্তৃতানি গভীরাণি ক্লেশদানি চ জীবিনাম্।
ভয়ঙ্করাণি ঘোরাণি হে বৎসে কুৎসিতানি চ॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত।

পূর্ব্বোক্তরূপে নরক কল্পনার সূচনা বেদে দেখিতে পাওয়া গেলেও নরক নাম বেদে পাওয়া যায় না। আর্য্যগণ ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হইয়া ভারত হইতে বহুদূর অগ্রসর হইলেই প্রথম 'নরক' নামের প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ উপরে যে আমরা নরককুণ্ডের উল্লেখ পাইয়াছি এই সমস্ত নরককুণ্ড দক্ষিণের সংযমন পুরীতে অবস্থিত বলিয়াই উল্লেখ দেখা যায় :—

"ষড়শীতিশ্চ কুণ্ডানি সংযমন্যাঞ্চ সন্তিচ।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।) "ষড়শীতি নরককুণ্ড সংযমনেই অবস্থিত।"

সংযমন যমপুরীর একনাম (১) জ্যোতিষে আমরা 'যমকোটি' নামক একটী স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ দেখিতে পাই যথা—

(১) "পুরী সংযমনীতস্য চিত্রগুপ্তস্তু লেখকঃ।" ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত জটাধরঃ।"

"লঙ্কাকুমধ্যে যমকোটিরস্যাঃ প্রাক্ পশ্চিমে
রোমকপত্তনঞ্চ।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ সৌম্যেহথ যাম্যে
বড়বানলশ্চ॥
কুবৃত্তান্তরিতানি তানি স্থানানি ষড়্গোলবিদোবদন্তি।"
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি।'

"লঙ্কা পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত, 'যমকোটি' ইহার পূর্ব্বে, 'রোমক নগর' ইহার পশ্চিমে, ইহার নিম্নে (পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে ?) 'সিদ্ধপুর,' 'সুমেরু' উত্তরে, দক্ষিণে 'বড়বানল'। এই ছয়টী স্থান ভূগোলবিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া কহিয়া থাকেন।"

উপরি উল্লিখিত 'যমকোটিই' পুরাণের "সংযমনপুর" বলিয়া আমরা মনে করি। 'রোমনগর' যখন হিন্দুদিগের নিকট বিদিত হইয়াছিল তখনও যে যমকোটি বা যমপুরী বর্ত্তমান ছিল পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে আমরা তাহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হই। লঙ্কার পূর্ব্বে যমকোটির অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় ইহাকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী স্থান বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। যমালয়ের স্থান দক্ষিণে বলিয়া যে সংস্কার প্রচলিত আছে তাহা যমপুরীর এই ভৌগোলিক অবস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। দক্ষিণ দিকের সহিত যমের যোগ হইতেই ইহার নাম 'যম্যা' 'যাম্যী' হইয়াছে। দক্ষিণ দিকে যমের পুরী বলিয়াই যে কেবল দক্ষিণ দিকের সহিত যমের যোগ হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু যম দক্ষিণদিকের অধিপতি বলিয়াও ইহার সহিত যমের যোগ হইয়াছে।

দিক্‌পতি বা দিক্‌পাল বলিয়াই যমের খ্যাতি নহে; বিশেষরূপে স্থায়বান্ বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের বর্ণনায় জানিতে পারা যায় যে মনু ও যম উভয়ই সূর্য্যের পুত্র। যমকে শত্রু ও মিত্রে সবিশেষ নিরপেক্ষ ও ধর্ম্মপ্রাণ দেখিতে পাইয়া সূর্য্যদেব তাঁহাকে দক্ষিণদিকের পালনকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত করেন :-

"ততঃ সূর্য্যসুতো যোহস্যাঃ সোহভূদ্বৈবস্বতোমনুঃ।
দ্বিতীয়স্তুযমঃ শাপাদ্ধর্ম্ম দৃষ্টিরভূৎসুতঃ॥
ধর্ম্মদৃষ্টির্যতশ্চাশু সমোমিত্রে তথাহিতে।
ততো নিয়োগং তং যাম্যে চকার তিমিরাপহঃ॥"
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত।

এস্থলে যমের যে শাপগ্রস্ত হওয়ার কথা পাওয়া যায়—এই শাপ ইহার বিমাতা ছায়া কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। এই শাপের জন্যই যমকে দক্ষিণদিকের রাজ্য গ্রহণ করিতে হয়। যম যেমন দক্ষিণদিকের রাজত্ব লাভ করেন—মনু তদ্রূপ উত্তরদিকের রাজত্ব লাভ করেন।

যমের এই দক্ষিণদিকের রাজ্য প্রাপ্তিতে আমরা অতি গভীর ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হই। উত্তরে আর্য্যদেশে মনু রাজা হইয়াছিলেন। দক্ষিণে আর্য্যাধিকার স্থাপিত হইলে তাহাতে যমই প্রথম রাজা হইয়াছিলেন। এইরূপে যম বৈদেশিক আর্য্যাধিকারের রাজা ছিলেন এবং মনু স্বদেশীয় আর্য্যাধিকারের রাজা ছিলেন। যমের স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে অনার্য্যদিগের মধ্যে রাজত্ব করিতে যাওয়া ইহাই তাহার শাপরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে যমের রাজত্বই আর্য্যদিগের প্রথম বৈদেশিক রাজত্ব বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি। যম এই শাসনকার্য্যে এরূপ লোকোত্তর

ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্ম্মপরায়ণতাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, তিনি অনন্যসাধারণ ধর্ম্মরাজ খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং তাঁহার শাসনও যমব্রত সংজ্ঞায় রাজধর্ম্মের আদর্শরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। যমব্রত বা যমের ন্যায় শাসন সম্বন্ধে পুরাণের বর্ণনা এইরূপ—

"সন্তু পক্ষপাতং বিনা পাপিনাং শাসনরূপঃ।"

শব্দকল্পদ্রুম।

পক্ষপাত না করিয়া পাপীদিগের শাসনই যমব্রতরূপ রাজধর্ম্ম।

যমের প্রকৃত স্বরূপ আমরা আবেস্তার যিমের বর্ণনা হইতে বিশেষরূপে জানিতে পারি। যিম যে যমেরই রূপান্তর তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। রমেশবাবু তদীয় ঋগ্বেদানুবাদে 'যিম' সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন।

"ইরাণীয় ধর্ম্মপুস্তকে তাঁহার নাম যিম, তিনি প্রথম রাজা ও সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত এবং পুণ্যবান্ মনুষ্যগণ তাঁহার সাক্ষাৎ পায়।"

পরে অহুরের আদেশানুসারে 'যিম' একটী 'বর' নামক নূতন জগৎ সৃষ্ট করেন, তথায় কেবল পুণ্যাত্মা লোক ও উৎকৃষ্ট পশু বৃক্ষাদি থাকে।"

ঋগ্বেদানুবাদ ৮৭ পৃঃ

যিম যে মনুষ্যমাত্র এবং প্রথম রাজা ও সত্যযুগের প্রবর্ত্তক নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ—

"Vivanhat is a mere mortal man, a saintly priest, the first who offered a Haoma sacrifice, while his son Yama is also a mortal, the first king, the ruler of a golden age" Vedic India by Z. A. Ragozin p 181.

উপরে আমরা যিমকে যেরূপ, রাজা ও নূতন জগতের প্রতিষ্ঠাতারূপে উল্লিখিত দেখিয়াছি বেদেও আমরা তদ্রূপ যমকে নূতন জগতের অধিষ্ঠাতা ও রাজারূপে উল্লিখিত দেখিতে পাই যথাঃ—

"ত্রিকদ্রুকেভিঃ পততি ষলুর্ব্বীরেকমিদ্ বৃহৎ।" ১৬

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১৪ সূক্ত।

"যম ত্রিকদ্রুক নামক যজ্ঞ পাইয়া থাকেন; তিনি ছয় স্থানে এবং এক বৃহৎ জগতে গতিবিধি করেন।"

"উভা রাজানা স্বধয়া মদংতা যমং পশ্যাসি বরুণংচ দেবম্।" ৭

"সেই যে দুই রাজা যম আর বরুণ, যাহারা স্বধা প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যাইয়া দর্শন কর।"

এখানে যম ও বরুণের একত্রাবস্থানের বর্ণনা হইতে যমের বৃহৎ জগৎ যে সমুদ্র মধ্যে অবস্থিত ছিল তাহাই অনুমিত হয়।

আবেস্তায় যিমের নূতন জগৎ সৃষ্ট হওয়ার যে উল্লেখ আমরা পাইয়াছি তাহাতে বেদের উল্লিখিত যমের বৃহৎ জগৎ যে তৎকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত নূতন দেশ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যমের সহিত বরুণের একত্র বাসের উল্লেখদ্বারা যমের আবিষ্কৃত সেই নূতন দেশ যে সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী দেশ তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। ইহা হইতে আর্য্যদিগের মধ্যে যমই যে সমুদ্রমধ্যে প্রথম নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তাহাতে নূতন আর্য্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

যম অনার্য্যস্থানে রাজ্যস্থাপন করিলেও সৌন্দর্য্যে এই স্থানটি আর্য্যস্থানেরই সমকক্ষ ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিত রেগোজিন্ যমরাজ্য

স্বর্গরাজ্যের সহিত তুলনীয় বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন যথা :—

"But if the father has lost ground in India, the son, Yama, fills one of the most picturesque positions in the Vedic pantheon, as King of the dead, the mild ruler of an Elysium like abode." Vedic India P 181.

বরাহপুরাণে নচিকেতাকর্ত্তৃক যমালয়ের যে বর্ণনা আছে বিশ্বকোষকার তাহা উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

"যমপুরের এইরূপ বর্ণনায় অমরাবতীর চারুচিত্রও হীনপ্রভ হইয়া যায়।"

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে যম একটী বিশেষ সমৃদ্ধ রাজ্যই সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই সমৃদ্ধি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পরবর্ত্তীকালে বহু আর্য্যপুরুষই যমের রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। পিতৃদেশ হইতে আগত ও পিতৃ জাতি অর্থাৎ আর্য্য জাতির লোক বলিয়াই ইহারা যমরাজ্যে পিতৃপুরুষ বা পিতৃ-গণ আখ্যা-প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে উপনিবিষ্ট পূর্ব্বপুরুষীয় আর্য্যগণ যেমন যমের প্রজা হন তদ্রূপ স্থানীয় আদিমবাসী অনার্য্যগণও যমের প্রজা হয়। আর্য্য অনার্য্য উভয় প্রকারের প্রজার শাসনভার আপনার হস্তে ন্যস্ত হইলেও যমরাজ আত্মপরনির্ব্বিশেষে এইরূপ নিরপেক্ষ ভাবে তাহাদের উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করেন যে তাঁহার এবম্প্রকারের ন্যায়শাসন, শাসনের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তিনি 'ধর্ম্মরাজ' এই অনন্যসাধারণ নামে চিরযশস্বী হইয়া রহিয়াছেন। মর্ত্ত্যলোকে তিনি এরূপই আদর্শ সুবিচার করিতেন যে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচারও এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না। তাহাতেই ইহকালের আদর্শ বিচারকর্ত্তা হইতেই তিনি পরকালেরও আদর্শ বিচারকর্ত্তারূপে কল্পিত হইয়াছেন।

পাশ্চাত্যদিগের বর্ত্তমান বৈদেশিক শাসনের ন্যায় আর্য্যদিগের বৈদেশিক শাসনে কোন বর্ণ-বিদ্বেষের (race-prejudice) অস্তিত্ব ছিল না। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেরই দোষগুণের যথার্থ বিচার হইত। ইহাতেই যমের বিচার দৈববিচারের গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছে। যমের বিচার একদিকে যেমন সম্পূর্ণরূপে ন্যায়দণ্ডে তুলিত হইত তেমনই অপরদিকে ইহার দণ্ড কঠোরভাবে বিহিত ও প্রতিপালিত হইত। দণ্ডভোগের জন্য অপরাধীসকল যে সমস্ত স্থানে প্রেরিত হইত, তৎসমস্তই নরকনামে অভিহিত হইয়াছে। এই নরক স্থানসকল, এক প্রকার penal settlement ছিল বলা যাইতে পারে। যমপুরীর দক্ষিণদ্বার দিয়া অপরাধী-দিগকে নরকে প্রেরণ করা হইত। সুতরাং যমালয়ের দক্ষিণ হইতেই প্রকৃত নরক আরম্ভ বলা যায়। 'যমের দক্ষিণদ্বার' এই সাধারণ প্রবাদেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অপরাধীদিগকে একটী নদী পার করিয়া নরক স্থানে পৌছাইয়া দেওয়া হইত। এই নদীই বৈতরণী নামে প্রসিদ্ধ। বেদে দৈবী নৌকাদ্বারা এই বৈতরিণী নদী পারের কথা পাওয়া যায়। (২)

(২) বিশ্বকোষ 'যম' দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনার পর বর্ত্তমান মান-চিত্রের 'অষ্ট্রেলিয়াতে' আমরা যমালয়ের স্থান ও তদ্দক্ষিণে নরকের স্থান নির্দ্দেশ করিতে চাই।

ঋগ্বেদের 'যমসূক্তের' প্রথম ঋকেই যমকে সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী একটী বিশাল দ্বীপে উপস্থিত দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"ওচিৎ সখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরুচিদর্ণবং জগম্বান্॥" ৬

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১০ম সূক্ত।

(যমভগিনী, যমকে কহিতেছেন): "বিস্তীর্ণ সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী এই দ্বীপে আসিয়া এই নির্জ্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী, কারণ গর্ভাবস্থা অবধি তুমি আমার সহচর।"

দক্ষিণসমুদ্রে অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় আর অন্য কোন বৃহৎ দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়া যেরূপ উৎকৃষ্ট উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বেও যে ইহা তদ্রূপ উৎকৃষ্ট উপনিবেশে পরিণত হইতে পারিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। কর্কট ক্রান্তি-বৃত্ত ইহার মধ্য দিয়া যাওয়ায় ইহা অংশতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলে ও অংশতঃ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে পড়িয়াছে, তাহাতে ইহা যেরূপ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যযুক্ত হইয়াছে—অন্য স্থানই সেরূপ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে ইহা যে স্বর্গসদৃশ স্থান বলিয়া বর্ণিত হইবে তাহা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না। ইহার দক্ষিণ হইতেই মেরুদেশ আরম্ভ হইয়াছে। এই অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-সীমান্ত নদী বাহিয়া সমুদ্রে পড়িলেই দক্ষিণমেরু দেশে যাওয়া যায়। আমরা দক্ষিণমেরু দেশকেই নরকস্থান বলিয়া মনে করি। অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণসীমান্তবর্ত্তী নদীই আমাদের নিকট বৈতরণী নদী বলিয়া মনে হয়। অপরাধীদিগকে নৌকায় করিয়া এই নদী দিয়া নরকস্থান বা দক্ষিণমেরু দেশে লইয়া যাওয়া হইত। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী-দিগকে যেমন দ্বীপান্তরে প্রেরণ করা হয় পূর্ব্বে সম্ভবতঃ তৎপ্রকারের অপরাধী-দিগকেই নরকস্থানে প্রেরণ করা হইত। এই স্থান হইতে প্রায় কেহই প্রত্যাবর্ত্তন করিত না। তাহাতেই নরকস্থান মৃত ব্যক্তিদিগের স্থান বলিয়াই কল্পিত হইয়াছে। দক্ষিণ মেরুদেশ যে বর্ত্তমানেও মনুষ্যের বাসের পক্ষে কিরূপ সাংঘাতিক আধুনিক মেরু অবিষ্কারকারী স্কটের সদলবলে বিনাশ হইতেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

দক্ষিণমেরু দেশকে যে আমরা নরকস্থান বলিয়া অনুমান করিয়াছি বর্ত্তমান ভূগোলে তাহার কোন প্রমাণ আবিষ্কার করা যায় কিনা এক্ষণে আমরা তাহাই বিচার করিয়া দেখিব। অমরকোষ অভিধানে আমরা ভিন্ন ভিন্ন নরকের এই সকল নাম প্রাপ্ত হই:—

"তপ্তেদাস্তপনাবীচি মহারৌরব রৌরবাঃ।
সংহারঃ কালসূত্রঞ্চেত্যাদ্যাঃ॥"

"তপন, অবীচি, মহারৌরব, রৌরব, সংহার, কালসূত্র ইত্যাদি।"

অষ্ট্রেলিয়াকেই আমরা যমপুরী বলিয়া অনুমান করিয়াছি। কর্কট ক্রান্তিবৃত্ত ইহার মধ্যচ্ছেদ করিয়া গিয়াছে। কর্কট ক্রান্তি-বৃত্তই দক্ষিণে সূর্য্যগতির শেষ সীমা। সুতরাং এই বৃত্ত ও এতৎসন্নিহিত স্থানই উষ্ণ—

তদ্দক্ষিণেই শীতের বিশেষ প্রাদুর্ভাব আরম্ভ। অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী উক্ত উষ্ণস্থানই ‘তপন’ নামক নরকস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণসীমান্তবর্ত্তী নদীকে যে বৈতরণী নদী বলিয়াছি তাহা উপরিউক্ত উষ্ণস্থান প্রবাহিত বলিয়া অপরাধীরা দক্ষিণে যে শীতপ্রধান স্থানে নীত হইত তাহার সহিত তুলনায় যে ‘তপ্ত’ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ‘যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী” বলিয়া ইহার যে বর্ণনা পাওয়া যায়—তাহাতেও ইহাকে যমপুরীর সীমান্তবর্ত্তী নদী বলিয়াই জানা যায়।

‘তপনের’ পরই ‘অবীচি’ নামক নরকস্থান। বর্ত্তমান ভূগোলে আমরা কর্কট কান্তবৃত্ত মণ্ডলে “নির্ব্বাত মেখলা” (Calm belt or belt of calm) নামক স্থানের উল্লেখ প্রাপ্ত হই। ‘অবীচি’ যে ইহারই একার্থক তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বায়ুর দ্বারাই তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে, সুতরাং যেখানে বায়ু প্রবহমান না হয় সেখানে তরঙ্গ উত্থিত হইবে না। অতএব ‘নির্ব্বাত’ স্থান ও ‘অবীচি’ স্থান একই হইতেছে। ভূগোলে Calmbelt বা নির্ব্বাত মেখলা স্থানের ৪০″ হইতে ৫০″ ডিগ্রি পর্য্যন্ত আমরা ‘মহারবকারী চত্বারিংশৎ’ (Roaring forties) বৃত্তমণ্ডলের উল্লেখ প্রাপ্ত হই। ইহাতে আমরা ‘মহারৌরব’ ও ‘রৌরব’ নামক নরকের স্থানই দেখিতে পাইতেছি। ‘মহারৌরব’ ও ‘রৌরব’ Roaring নামের স্পষ্ট অনুবাদ বলিয়াই মনে হয়। কারণ এক ‘রু’ ধাতুই রৌরব ও Roar উভয়েরই মূল। এই সকল স্থানে প্রবল বাতাস প্রবাহিত হওয়াতেই Roaring নাম হইয়াছে। রৌরব এই প্রবল বাতাসের ভীষণ শব্দের অর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে বলিয়া বোধ হয়।

রৌরবের পর ‘সংহার’ ও ‘কালসূত্র’ নামক নরক। ‘সংহার’ নামের দ্বারা দক্ষিণ মেরুমণ্ডলের প্রচণ্ড শীতবাতে যে স্থান মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ মারাত্মক তাহাই বুঝায় বলিয়া আমরা মনে করি। ‘কালসূত্র’ নামের ব্যাখ্যা অমরকোষের প্রসিদ্ধ টীকাকার ভানুজিদীক্ষিত এইরূপ করিয়াছেন—“কালাস্থায়োময়ানি সূত্রাণ্যত্র” —কাল অর্থাৎ লৌহময় সূত্র ইহাতে বিদ্যমান আছে বলিয়াই কালসূত্র নাম হইয়াছে। লৌহসূত্র বিদ্যমান থাকার অর্থ পরিষ্কার বুঝা যায় না। আমাদের নিকট বোধ হয় লৌহখনি তথায় বর্ত্তমান থাকাতেই এই নাম হইয়াছে। উত্তরমেরুকেন্দ্র চুম্বকলৌহপ্রচুর বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উত্তর মেরুর ন্যায় দক্ষিণমেরু কেন্দ্রও লৌহপ্রচুর হওয়া অসম্ভব নহে। খনিতে প্রথম উৎপন্ন ধাতুই ‘সূত্র’ নামে অভিহিত হইতে পারে।

‘কালসূত্রের পর যে ‘আদ্যশব্দের’ প্রয়োগ অমরকোষে আছে ভানুজিদীক্ষিত তাহার উপর এইরূপ টীকা করিয়াছেন “আদ্য শব্দেন তামিস্রান্ধতামিস্রাসি পত্রবনাদয়ঃ” অর্থাৎ ‘আদ্য শব্দের দ্বারা তামিস্র’ ‘অন্ধতামিস্র’ ও ‘অসিপত্রবন’ প্রভৃতি নরক বুঝায়। এস্থলে ‘তামিস্র’ ‘অন্ধতামিস্র’ প্রভৃতি নাম সূর্য্যাস্তের ছয় মাসের সময়

দক্ষিণ মেরুমণ্ডলের যে সকল স্থান গভীর তমসাচ্ছন্ন থাকে এবং অপর সময়ে ঐ স্থানের সলিলপ্রাচুর্য্যবশতঃ যে সকল স্থল নিবিড় কুজ্ঝটিকাবৃত থাকে তৎসমস্তেরই চিত্র যেন আমাদের নিকট উপস্থিত করে।

দক্ষিণ মেরুর হিমবাতের প্রখরতা হইতে ইহা অসির সহিত তুলিত হওয়া অসম্ভব নয়। অসিপত্রবন সেই প্রচণ্ড শীতবাত প্রবাহিত স্থানকেই বুঝায় বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক সমুদ্রযাত্রিকদিগের দ্বারা দক্ষিণমেরুর যে অবস্থা প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে তাহাতে আমাদের কথারই সমর্থন পাওয়া যায়:—

"Frequent mists and snow squalls have been reported by all voyagers in the Atlantic seas even in the height of summer." Encyclopaedia Britanica Supplementary Volumes.

"দক্ষিণ মহাসাগরের সমুদ্রযাত্রিক সকলেই তথায় এমন কি প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়ও সচরাচর কুজ্ঝটিকা ও তুষার ঝঞ্ঝাবাতের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।"

হেমচন্দ্রের অভিধানে ভিন্ন ভিন্ন নরক ভূমির যে সমস্ত নাম পাওয়া যায় তৎসমস্তের সহিতও, দক্ষিণমেরুর পূর্ব্বোল্লিখিত স্থান সকলের সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় হেমচন্দ্রের উল্লিখিত নরক ভূমি সকলের নাম এইরূপ:—

"ঘনোদধি ঘনবাত তনুবাত নভঃস্থিতাঃ।
রত্ন শর্করা বালুকা পঙ্ক ধূমতমঃ প্রভাঃ॥
মহাতমঃ প্রভা বেত্যোহধো নরক ভূময়ঃ॥"

প্রথম নরকভূমির "ঘনোদধি" নাম হইতে বরফাবৃত সমুদ্রই যে নরক নামে অভিহিত তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে দক্ষিণ সমুদ্র নরকরূপে কল্পিত হওয়ার প্রমাণই আমরা পাইতেছি। দ্বিতীয় নরকভূমির 'ঘনবাত' নামের দ্বারা দক্ষিণ মেরুর চিরনীহারাচ্ছন্ন বায়ুই বুঝাইতেছে। 'তনুবাত' নামের দ্বারা আমরা মৃদুবায়ুর স্থান অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত Calm belt বা নির্ব্বাত মেখলা স্থানেরই উল্লেখ পাইতেছি। 'পঙ্ক ধূমতমঃ প্রভা' ও 'মহাতমঃপ্রভা' প্রভৃতি নামে কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন কর্দ্দমময় মেরুস্থানেরই আভাস পাওয়া যাইতেছে। 'নভঃস্থিত' নামের দ্বারা পর্ব্বতময় উচ্চস্থানেরই আভাস পাওয়া যায়।

নরকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে বা তপ্ত কটাহে পাপীদিগের দগ্ধ হওয়ার বর্ণনা বিশেষ ভাবেই পাওয়া যায়। দক্ষিণমেরুর হিমময় মণ্ডলে অগ্নির কি সম্ভাবনা হইতে পারে এই প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদিত হওয়া সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। আমরা দেখিতে পাইব যে দক্ষিণমেরুর বর্ত্তমান ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যেই ইহার সুন্দর সমাধান পাওয়া যায়। দক্ষিণ মেরুর বর্ণনায় গ্রাহামল্যাণ্ড্ ও ভিক্টোরিয়াল্যাণ্ড্ নামক স্থানদ্বয়ের সীমা মধ্যে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি দৃষ্টিগোচর হওয়ারই বিবরণ পাওয়া যায়:—

"Active volcanoes have been seen both in the Graham Land and Victoria Land areas." Encyclopaedia Britanica Supplementary Volume.

উল্লিখিত আগ্নেয় গিরি ও ইহাদের শিখর সকল অগ্নিকুণ্ড ও তপ্তকটাহ রূপে কল্পিত হওয়া অসঙ্গত নয়।

প্রথমেই আমরা সিদ্ধান্ত শিরোমণি হইতে পৃথিবীর জ্যোতিষিক চতুর্ভাগের যে

বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছি—তাহাতে দক্ষিণ দিগ্‌ভাগের (যাম্য) নাম আমরা 'বড়বানল' প্রাপ্ত হই। এই বড়বানল আগ্নেয় গিরি বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। দক্ষিণ মহাসমুদ্রে আগ্নেয় গিরির প্রাচুর্য্য হইতেই দক্ষিণদিকের দক্ষিণ ভাগ 'বড়বানল' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। দক্ষিণদিক্ যমের দিক্ বলিয়া যেমন 'যাম্য' নামে অভিহিত হয়, 'বড়বানল' স্থানও তেমনই যমের অধীন অগ্নিময় নরক স্থান বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

'নরক' নামের অর্থ পর্য্যালোচনার দ্বারা আমরা দক্ষিণ মেরুকেই ইহার স্থান বলিয়া বুঝিতে পারি। নরকপর্য্যায়ের মধ্যে আমরা এই সমস্ত শব্দ দেখিতে পাই :—

"স্যান্নারকস্তু নরকো নিরয়োদুর্গতিঃ স্ত্রিয়াম্॥"

"নারক, নরক, নিরয়, দুর্গতি।"

ইহাদের মধ্যে 'নিরয়' শব্দের বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে 'নির' ও 'অয়' এই দুই শব্দ যোগে গঠিত দেখা যায়। ইহাতে 'নির্ নাই' (নাই) অয়ঃ গতিঃ (গমন) 'যত্র' অর্থাৎ যাহাতে যাওয়া যায় না ইহার এই অর্থই লব্ধ হয়। দক্ষিণ মেরুতে যাওয়া অসম্ভব বা বিশেষ কষ্টকর বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 'নারক'ও 'নরক' শব্দ হইতেও পূর্ব্বোক্তার্থ পাওয়া যায় বলিয়াই আমরা মনে করি। 'নারক' শব্দ 'নঞ্' পূর্ব্বক 'ঋ' ধাতুর যোগে সাধিত হইতে পারে। ঋ ধাতুর অর্থ গমন। সুতরাং 'নারক' শব্দ যাহাতে গমন অসাধ্য এরূপ স্থানকেই বুঝাইতে পারে। 'নরক' শব্দ 'নারক' শব্দেরই ভিন্নরূপ মাত্র বলিয়া ইহার অর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে।

নরকের যে 'দুর্গতি' নাম পাওয়া যায় ইহাতেও দুঃখে বা কষ্টে গমনের অর্থ প্রকাশ করে বলিয়া নরক যে দুর্গম স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত তাহাই বুঝিতে পারা যায়। এই 'দুর্গতি' নামের সহিত 'স্বর্গনামের' তুলনা করিলে স্বর্গস্থান যে সুখে গমনের স্থান তাহাই স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। সুমেরুই স্বর্গস্থানরূপে কল্পিত হইয়াছে—"মেরুঃ সুমেরুর্হেমাদ্রী রত্নসানুঃ সুরালয়ঃ॥" সুতরাং ইহার বিপরীত দক্ষিণমেরু যে স্বর্গের বিপরীত নরক বা দুর্গতির স্থানরূপে কল্পিত হইবে তাহা সহজ বোধ্য। অর্থাৎ উত্তর মেরু সুগমন স্থান বলিয়াই স্বর্গ হইয়াছে এবং দক্ষিণমেরু দুর্গম স্থান বলিয়াই 'দুর্গতির' স্থান হইয়াছে।

উত্তরমেরু সুখের স্থান বলিয়া তাহা সুমেরু নামে অভিহিত হয় এবং দক্ষিণমেরু কষ্ট বা দুর্গতির স্থান বলিয়াই তাহা কুমেরু নামে অভিহিত হয়। যম যে দুর্গতির স্থান বা নরকের রাজা হইয়াছেন এবং তাহারই নামে যে দক্ষিণদিকের 'যাম্য' ও 'যাম্যা' নাম হইয়াছে—তাহাতে আর্য্যদিগের মধ্যে যমকেই আমরা প্রথম দক্ষিণমেরুর আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

এক ঢিলে দুই পাখী

(ইংরাজি হইতে)

মিঃ স্পেনীং সেদিন দুপুরবেলা ইউষ্টন ষ্টেশনে একটি প্রথম-শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিলেন। তিনি ধূমপায়ী, অতএব দেখিয়া শুনিয়া যে কামরায় ধূমপানের বাধা নাই সেইখানে উঠিলেন। বেশ আরাম করিয়া গদির উপর বসিলেন। তিনি একটি বড় দোকানের বিজ্ঞাপনবিভাগে কাজ করেন। সেই দোকানের স্বত্বাধিকারী সম্প্রতি একটি নূতন পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ডেরিংহামে যাইয়া এই ঔষধের প্রচারকল্পে চেষ্টা করাই মিঃ স্পেনীং-এর এই রেলযাত্রার উদ্দেশ্য। সে দেশের লোকেরা তখনও এই ঔষধ সম্বন্ধে কিছুই শুনে নাই।

মিঃ স্পেনীং একজন পরিশ্রমশীল বুদ্ধিমান লোক। তাঁহার মাসিক মাহিয়ানাও খুব মোটা। সেইজন্যই জীবনের ছোট খাট সুখস্বচ্ছন্দগুলি উপভোগ করা তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল। ট্রেনে তিনি সর্ব্বদাই প্রথম-শ্রেণীতে যাতায়াত করিতেন, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হোটেলে আহার করিতেন। এবং বর্ত্তমান 'ফ্যাসান' অনুযায়ী বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদে নিখুঁতভাবে সজ্জিত থাকিতেন।

মিঃ স্পেনীং যখন গাড়ীতে ঢুকিলেন, তখন সেখানে আর কেহ ছিল না। কিন্তু ট্রেন ছাড়িবার অল্প পূর্ব্বে আর একজন ভদ্রলোক সেই কামরায় প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোকটি মিঃ স্পেনীং-এরই সমবয়স্ক; দুজনের আকৃতি ও গঠনে অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। একটি চাকর সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বেঞ্চির উপর একটি ছোট ব্যাগ রাখিয়া গেল। তার পর সে দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

নূতন আরোহী বলিলেন,—"জনসন, যদি পারি ত দশটার গাড়ীতেই ফেরবার চেষ্টা করব! যদি আমার দেরী হয়ে যায় লেডী কার্লটনকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে বারণ করো।" চাকর উত্তর করিল,—"যে আজ্ঞে।" এবং যাইবার সময় প্রভুকে বিশেষ আদব-কায়দার সহিত সেলাম করিয়া গেল। মিঃ স্পেনীং বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সহযাত্রী একজন "লর্ড" উপাধিধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

গার্ডসাহেব টিকিট দেখিতে আসিল। সে দুজনেরই টিকিট দেখিয়া গম্ভীরভাবে বলিয়া গেল,—"ব্লেচলি ষ্টেসনে আপনাদের গাড়ী বদলাতে হবে।" মিঃ স্পেনীং বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের দুইজনেরই গন্তব্যস্থান এক।

মিঃ স্পেনীং চুরুট ধরাইয়া একমনে নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সহযাত্রীও একটি সুন্দর রৌপ্যনির্ম্মিত কেস হইতে

একটি 'হাবানা' বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। ধূমপান করিতে করিতে দুজনেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

মিঃ স্পেনীং পূর্ব্বে কখন ডেরিংহামে যান নাই। তাঁহার সহযাত্রী কি কার্য্যে সেখানে যাইতেছেন, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল, কিন্তু ভদ্রলোককে তো সেকথা জিজ্ঞাসা করা যায় না, কাজেই তিনি মনের কৌতূহল মনে চাপিয়া সংবাদপত্রপাঠে মনোনিবেশ করিলেন। দেখিতে পাইলেন যে, কাগজের একস্থলে লেখা রহিয়াছে, "অদ্য অপরাহ্নে ডেরিংহামের দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে। লর্ড কার্ল‌টন তাহার ভিত্তি স্থাপন করিবেন।"

ইহা পড়িয়াই মিঃ স্পেনীংএর কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। তিনি তাঁহার সহযাত্রীর সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ মিষ্ট স্বরে বলিলেন,—"ডেরিংহাম বোধ হয় একটি ছোট গ্রাম।" লর্ড উত্তর করিলেন,—"আমারও সেইরকম বোধ হয়! আমি পূর্ব্বে কখনও সেখানে যাইনি। এই প্রথম যাচ্ছি।"

মিঃ স্পেনীং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি সেখানে নূতন হাঁসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করতে যাচ্ছেন বুঝি?"

লর্ড উত্তর করিলেন,—"হাঁ আপনার অনুমান ঠিক। কিন্তু আপনি জানলেন কেমন করে? বোধ হয় আপনি সেখানকার লোক।"

মিঃ স্পেনীং বলিলেন, "না। আমি এ সংবাদ এইমাত্র কাগজে পড়লুম। মহাশয়ের নামই বোধ হয় লর্ড কার্লটন।"

লর্ড উত্তর করিলেন,—"হাঁ, আমারই নাম। এই গ্রামের নামও আমি পূর্ব্বে জানতাম না; কিন্তু এই প্রকার দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আমার বিশেষ সহানুভূতি আছে শুনে সেখানকার লোকেরা আমাকে ভারি পীড়াপীড়ি করে ধরেছে। আমি তাদের অনুরোধ এড়াতে পারিনি। অনেক অসুবিধা সত্বেও আমাকে একাজ করতে হচ্ছে, যদিও হাতে অনেক দরকারী কাজ আছে। তাছাড়া আমার শরীরটাও আজ তেমন ভাল নেই। খালি ঘুম পাচ্ছে!"

মিঃ স্পেনীং বলিলেন,—"আপনার শরীর অসুস্থ শুনে বড়ই দুঃখিত হলাম। বোধ হয় অতিরিক্ত পরিশ্রমে এরকম হয়েছে।"

ট্রেনের কামরায়

মিঃ স্পেনীং—"একটা বড়ি নিলে বাধিত হব।"

লর্ড উত্তর করিলেন,—"না, তা নয়; আমার লিভারের দোষ ঘটেছে বলে মনে হয়। এরকম প্রায়ই আমাকে ভুগতে হয়।"

মিঃ স্পেনীং উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"এর জন্যে এতো কষ্ট! এত সহজেই সেরে যায়। আপনি "সরলভেদী বটিকা" সেবন করুন। দুচার দিনের মধ্যে একেবারেই নীরোগ হয়ে যাবেন। লিভারের পক্ষে অমোঘ ঔষধ! আমার কাছে এক বাক্স আছে; আপনি দয়া করে একটা বড়ি নিলে বিশেষ বাধিত হব।"

লর্ড ধীরে ধীরে বলিলেন,—"না মাপ করবেন। আমি পেটেণ্ট ওষুধের উপরে একেবারে চটা। ওসবে আমার একটুও বিশ্বাস নেই।" কিন্তু মিঃ স্পেনীং নাছোড়-বান্দা, তিনি জিদ করিতে লাগিলেন,—"কিন্তু মহাশয়, এ বড়িগুলির গুণ অসাধারণ। এ যেমন-তেমন পেটেণ্ট ওষুধ নয়। এর বিস্তর কাটতি—একবার পরীক্ষা করে দেখুন।"

লর্ড বলিলেন,—"কই পূর্ব্বে ত এ ওষুধের নাম কখনো শুনিনি। আজ এই প্রথম আপনার নিকট শুনলুম।"

মিঃ স্পেনীং যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"এঁ্যা, বলেন কি মহাশয়! এর নাম শোনেন নি? এর বিজ্ঞাপন ত সর্ব্বত্রই দেওয়া হয়েছে।"

লর্ড একটা তচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"ওঃ বিজ্ঞাপন! সে তো আমি পড়িই না;—বিশেষতঃ ওষুধের বিজ্ঞাপন। ঐসব হাতুড়ে ডাক্তারের তৈরি ওষুধের নাম শুনলেই ভয় হয়।"

এই উত্তর শুনিয়া মিঃ স্পেনীং হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিলেন। লর্ডও চটিয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর লইয়া একজন অপরিচিত লোক এমন করিয়া অনধিকার চর্চ্চা করিতেছে ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা দুইজনে গুম খাইয়া গেলেন।

মিঃ স্পেনীংএর সহিত আর কথা বলিবার ইচ্ছা না থাকায় বা পেটের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাওয়ায়, যে কারণেই হউক লর্ডের তন্দ্রা আসিল। তিনি গাড়ীর কোণে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ট্রেণ যথাকালে ব্লেচলি ষ্টেসনে আসিয়া থামিল। লর্ড কার্লটন তখনও ঘুমে অচৈতন্য।

মিঃ স্পেনীং গাড়ি থামিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ঘুমন্ত লর্ডের দিকে একবার চাহিলেন, তাঁহার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। পেটেণ্ট ঔষধের উপর লর্ড যে ঘৃণাবাচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন একথা তিনি ভুলিতে পারিতেছিলেন না। তিনি পেটেণ্ট ঔষধের এজেণ্ট—সেই পেটেণ্ট ঔষধকে তাচ্ছিল্য করাটা তাঁহাকেই তাচ্ছিল্য করা—এই কথাই তাঁহার বারবার মনে হইতেছিল। তিনি ইহার জন্য নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিতেছিলেন। তাঁহার চিত্ত এই অপমানের প্রতিশোধের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আর বিলম্ব করিলেন না; তিনি লর্ডকে ঘুম হইতে না উঠাইয়া ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া নিজে বাহির হইয়া আসিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আবার ৭০ মাইল পরে গাড়ী থামিবে। লর্ডের অবস্থা ভাবিয়া স্পেনীং উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

মিঃ স্পেনীং অন্য গাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী ডেরিংহাম ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিল। তিনি দেখিলেন ষ্টেসনটি সুন্দর পতাকা ও লতাপাতায় সাজানো হইয়াছে; নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ প্লাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

প্লাটফর্ম্মে
—"আপনার নামই বোধ হয় লর্ড কার্লটন?"

মিঃ স্পেনীং খানিকক্ষণ অব্যবস্থিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এখানে তিনি এই প্রথম আসিয়াছেন, কোনদিকে যাইবেন কিছু ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বোধ হয় নগরাধ্যক্ষ (মেয়র) ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার নামই বোধ হয় লর্ড কার্লটন।"

হঠাৎ একটা ফন্দী মিঃ স্পেনীর মাথার ভিতর খেলিয়া গেল। তিনি এক দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে স্থির করিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিলেন না বটে কিন্তু এমন ভাব দেখাইলেন যেন তিনিই লর্ড কার্লটন।

সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সভামণ্ডপে লইয়া গেল। ভিত্তি স্থাপনার কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, তিনি সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও সংবাদদাতাগণের সম্মুখে এক সুন্দর বক্তৃতা করিলেন। শ্রোতৃবর্গ ঘন ঘন করতালি দিতে লাগিল। বক্তৃতার শেষ অংশ সকলের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সেটুকু আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"সমবেত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ! এইরূপ দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠার এখনও দরকার আছে বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আর দুদিন বাদে ইহাদের কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না! তখন ইহা অতীতের স্মৃতিস্বরূপ আমাদের মানসপটে অঙ্কিত থাকিবে। সেদিন আসিবার আর বেশী বিলম্ব নাই! মানুষের ক্ষমতা ও বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ বিকাশের ফলস্বরূপ পারকিনের সরলভেদী বটিকার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই কথা আমি বলিতেছি, তাহা আপনারা বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। এই ঔষধের নাম আপনারা অবশ্যই শুনিয়া থাকিবেন। এই অদ্ভুত আবিষ্কার সকলেই শতমুখে প্রশংসা করিতেছে। ইহা চিকিৎসা জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। ইহার শেষ ফল যে কি হইবে, তাহা কেহই বলিতে

পারেন না। এই বড়ী সেবনে প্লীহা, যকৃৎ, জ্বর, পেটব্যথা, অম্বল, অগ্নিমান্দ্য, মাথাধরা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, সর্দ্দি, কাশী, প্রভৃতি সকল প্রকার অসুখই আরোগ্য হয়। এক কথায়, ইহা মানুষকে নবজীবন দান করিবে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের যাবতীয় রোগে ইহা অদ্বিতীয়। ইহার অসম্ভব কাট্‌তি। লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্র। মোটের উপর সকলে যখন ইহা সেবন করিতে আরম্ভ করিবে, তখন পৃথিবীতে আর কাহারও অসুখ থাকিবে না। ধরাতল তখন সুখ ও শান্তির আগার হইবে। সকলেই চিরযৌবন ভোগ করিবে। তখন আর এরূপ দাতব্য চিকিৎসালয়ের কোন আবশ্যকতা থাকিবে না। কিন্তু আমাদের সেজন্য দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই।

কারণ এই সকল হাঁসপাতাল-বাড়ী তখন বাড়ী লাইব্রেরী, যাদুঘর ও পাঠাগারে পরিণত হইয়া দেশবাসীকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিবে। মানুষের তিমিরাচ্ছন্ন কুসংস্কার-পূর্ণ মনকে সত্য ও জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিবে। নরনারীর স্বাস্থ্যের সহিত তাহাদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা আপনাদের ন্যায় শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট বলাই বাহুল্য। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে সে শুভদিন আসিবার বেশি বিলম্ব নাই। এই "সরলভেদী বটিকা" অল্পদিনের মধ্যেই এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিবে।"

মিঃ স্পিনীং আসন পরিগ্রহণ করিলেন। ঘন ঘন করতালিতে সভামণ্ডপ কাঁপিয়া উঠিল। তারপর নগরাধ্যক্ষ "লর্ড কার্লটনকে" সমস্ত দেশবাসীর পক্ষ হইতে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তখন একজন পিওন একখানি টেলিগ্রাম লইয়া মিঃ স্পেনীং এর দিকে অগ্রসর হইল। তিনি তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিলেন,—"আমার টেলিগ্রাফ বোধ হয়, দেখি।" পিওন স্বহস্তে তাঁহার হাতে টেলিগ্রামখানি দিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিল।

সভাস্থলে

—"সরলভেদী বটিকা অসম্ভবকে সম্ভব করিবে।"

টেলিগ্রামখানি নগরাধ্যক্ষের নামে সম্বোধন করা হইয়াছিল। লেখা ছিল,—"বড়ই দুঃখের কথা যে ট্রেণে দুর্ঘটনা ঘটায় যথাসময়ে পৌছিতে পারিলাম না।

আজ আর পৌঁছিতে পারিব বলিয়া বোধ হয় না। সবিশেষ সংবাদ পত্রযোগে লিখিতেছি, আমার ত্রুটি আপনারা মার্জ্জনা করিবেন—ইতি লর্ড কার্লটন।"

মিঃ স্পেনীং টেলিগ্রাম পড়িয়া নগরাধ্যক্ষকে বলিলেন,—"বড়ই দুঃখের বিষয় যে লেডী কার্লটনের নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম যে হঠাৎ তিনি বড়ই পীড়িত হইয়াছেন। আমাকে এখনই যাইতে হইবে। আপনারা কিছু মনে করিবেন না।"

পথে যাইতে যাইতে মিঃ স্পেনীংএর মনে হইতেছিল আজ আমার কি সুদিন! আশ্চর্য্য প্রদীপের গল্পের মতো একদিনের জন্য লর্ড হইয়া কতই না আদর-অভ্যর্থনা উপভোগ করিলাম। এবং আমার যে কাজ বিজ্ঞাপন প্রচার করা তাহাও চূড়ান্তভাবে হইল;—এক ঢিলে দুই পাখী যে মারিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে লর্ডের পত্র নগরাধ্যক্ষের হস্তগত হইল। তাহা পড়িয়া সকলে খুব হাসিল। তারপর যত দিন যাইতে লাগিল ক্রমেই এই মজার কথা সকলে ভুলিতে লাগিল বটে, কিন্তু সেই সরলভেদী বটিকার কথা কেহ ভুলিতে পারিল না—বিশেষ লর্ড কার্লটন! যে জিনিস লইয়া তাঁহার উপর দিয়া এত বড় একটা পরিহাস হইয়া গেল তাহা কি ইহজীবনে ভোলা যায়!

লর্ড কার্লটন নিশ্চয় মিঃ স্পিনীংকে ইহার জন্য ক্ষমা করিতে পারেন নাই। কিন্তু সে সব কথায় আমাদের দরকার নাই,—সে অন্য গল্প!

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অভিসারে

লজ্জা করে গো সজ্জা করিয়া
যাইতে তুঁহার পাশ,
পারিনেক তাই মালা ও তিলক
পরিতে গৈরি বাস।

হাসি আসে মনে বসিতে ধেয়ানে
নয়ন মুদি গো যদি,
অন্তরে বাহিরে বহে তো সদাই
রূপের ফল্গু নদী।

গোপনে ভেটি গো গুপ্ত বঁধুয়া
হৃদি-মন্দির মাঝে,
নাম ধরে তুঁহা পারিনে ডাকিতে
মরমে সরম বাজে।

গুপ্ত তুঁহার পীরিতি মধুর
ভালবাস লুকোচুরি,
চুপে চুপে তাই যাই তুয়া পাশে
দেখায়ে কিছু না পারি।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

(৮)

এই সময়ে জ্যোতিবাবুর উদ্যোগে আর একটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল। এই সভার নাম ছিল "সঞ্জীবনী সভা"। ছেলেবেলাকার সেই Masonic সভার ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ! ঠন্‌ঠনের একটা পোড়ো বাড়ীতে এই সভা বসিত। এ বাড়ীতে পূর্ব্বে না কি একটা স্কুল ছিল জ্যোতিবাবুরা শুনিয়াছিলেন; কিন্তু এ বাড়ীর যে কে মালিক তাহা তাঁহারা তখন ত' জানিতেনই না, আজ পর্য্যন্ত জানেন না। সভার অধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। বালক রবীন্দ্রনাথও এ সভার সভ্য ছিলেন। পরে নবগোপাল বাবুকেও সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। সভার আস্‌বাবপত্রের মধ্যে ছিল, একখানা ছোট ভাঙ্গা টেবিল, কয়েকখানি ভাঙ্গা চেয়ার ও ছোট টানা পাখা—তারও আবার একদিক ঝুলিয়া পড়িয়াছিল।

জাতীয় সমস্ত হিতকর ও উন্নতিকর কার্য্য এ সভায় অনুষ্ঠিত হইবে ইহাই সভার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যেদিন নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন সেইদিন, অধ্যক্ষ মহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল মন্ত্রগুপ্তি। এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা করা হইবে, তাহা কাহারও প্রকাশ করিবার অধিকার ছিল না।

আদিব্রাহ্মসমাজ-পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ান' বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এ সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষু:কোটরে দুইটি মোমবাতি বসান' ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে মৃত ভারতের প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাঁহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল-কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—"সংগচ্ছধ্বম্, সংবদধ্বম্"। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর তবে সভার কার্য্য (অর্থাৎ গল্প-গুজব) আরম্ভ হইত। কার্য্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্‌ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লিখিত হইত। এই গুপ্ত ভাষায় "সঞ্জীবনী সভা"কে "হাঞ্চূপামু হাফ'" বলা হইত। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এই সাঙ্কেতিক ভাষার পাঠোদ্ধার করিতে যত্নবান্ হউন!

ইহার দীক্ষা-অনুষ্ঠানে একটা ভীষণ-গাম্ভীর্য্য ছিল। দীক্ষাকালে, নবদীক্ষার্থীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিত।

প্রথম প্রথম সভার কায পুরা দমেই চলিতে লাগিল। নিত্য নূতন প্রস্তাব গৃহীত হইত, কিন্তু কাযে পরিণত করা পর্য্যন্ত ধৈর্য্য অনেক বিষয়ে থাকিত না। যাহার যেরূপ কল্পনা খেলিত সে সেইরূপই প্রস্তাব করিত। এইরূপ কাল্পনিক সুখে বেশ দিন কাটিয়া যাইত। একদিন সভায় জ্যোতিবাবু স্থির

করিলেন যে ভারতবর্ষে সার্ব্বজাতিক ঐক্য সাধন করিতে গেলে একটা সার্ব্বজনিক পোষাক হওয়া আবশ্যক। জ্যোতিবাবু তৎক্ষণাৎ তাহার নানাবিধ কল্পনা করিতে লাগিলেন। শেষে স্থির হইল যে মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিলে যেমন হয় ঐরূপ একটা পোষাক ও মাথায় যাহাতে রৌদ্র বৃষ্টি না লাগে এরূপ একটা শোলার টুপির উপর পাগড়ী বসাইয়া একটা শিরস্ত্রাণ বেশ সার্ব্বজনীন্ পরিচ্ছদরূপে গৃহীত হইতে পারে। তৎক্ষণাৎ দর্জ্জির দোকানে গিয়া মালকোঁচা-মারা কাপড় সেলাই ও পূর্ব্বোক্ত রূপ শিরস্ত্রাণ প্রস্তুত করিতে হুকুম দেওয়া হইল। পোষাক হইল, কিন্তু এ অভিনব পোষাক পরিয়া প্রথমে পথে বাহির হইবে কে? জ্যোতিবাবু বাহির হইলেন। মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে জ্যোতিবাবু এই হাস্যকর পোষাক পরিয়া কলিকাতা সহর ঘুরিয়া আসিলেন। লোকের পরিহাসবিদ্রূপে তিনি লক্ষ্যও করিলেন না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে "দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীর পুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সার্ব্বজনীন পোষাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।"

সভ্যগণ যখন দেখিলেন যে আন্তর্জাতিক পোষাক দেশের কেহই গ্রহণ করিল না তখন অগত্যা এ কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া ইহারা দেশে শিল্পবাণিজ্যের কল প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইলেন। সর্ব্বপ্রথম দেশালাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক আয়াসে কয়েক বাক্স দেশলাই প্রস্তুত হইল বটে কিন্তু এ পদার্থ সাধারণের পক্ষে ক্রয়সাধ্য বা ব্যবহার উপযোগী হইল না। একেত খরচ খুব বেশীই হইয়াছিল, ইহা ছাড়া দেশে কাঠির অভাব, সেজন্য যে-সে কাঠের কাঠি ব্যবহৃত হওয়াতে দেশলাই শীঘ্র জ্বলিতও না। যখন পদে পদে এইরূপ অসুবিধা হইতে লাগিল, তখন সভ্যগণ দেখিলেন যে এ অসাধ্য ব্যাপার সাধনে সময় নষ্ট করা অপেক্ষা, দেশের অন্য কোনও মঙ্গলকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

এই সুযুক্তির ফলে, সভায় এক নূতন কাপড়ের কল প্রস্তুত হইল। আবার নানাবিধ জল্পনা কল্পনা সুরু হইল। সভ্যদের উদ্যম আবার দ্বিগুণ হইল। সভায় ইহাও স্থির হইল যে ভবিষ্যতে আরও কয়েকখানি তাঁত বসাইতে হইবে, এবং এজন্য একখানি বাড়ী তৈরি করিতে হইবে। সভ্যেরা চাঁদা দিতেন, তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ। এইরূপে যে সামান্য কিছু টাকা জমিয়াছিল তাহাতেই এইরূপ এক বিরাট কল্পনা করা হইল। দেখিতে দেখিতে নব প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের কলে একখানি গামছা প্রস্তুত হইল। ব্রজবাবু সেই গামছা মাথায় বাঁধিয়া তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিলেন। সভার সে এক স্মরণীয় দিন! একে একে প্রায় সকল সভ্যই তাঁহার সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিলেন। তারপর কল উঠিয়া গেল, আর অন্য কিছুই সে কলে বাহির হয় নাই।

এই সঞ্জীবনী সভার সভ্যগণের মধ্যে জাতিবর্ণ নির্ব্বিচারে আহারের একটি বিধি ছিল। তাঁহাদের মধ্যে নানা জাতিবর্ণের

লোক ছিল। কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে শুঁড়ী পর্য্যন্ত। কোন এক ব্রাহ্মণ জমিদার-সভ্যের গঙ্গার ধারের একটি বাগান বাড়ীতে ইঁহাদের একদিন প্রীতি-ভোজ হয়। জমিদার সভ্যটি একটু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইলেও তিনি সভার সভ্যদিগের সঙ্গে একত্র আহারাদি করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি বোধ হয় সভার গণ্ডীকে জগন্নাথ-ক্ষেত্রের সামিল মনে করিতেন। খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে খুব একটা ঝড় উঠিল! রাজনারায়ণ বাবু সেই সময় গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া "আজি উন্মদ পবনে—" বলিয়া রবীন্দ্রনাথের রচিত একটি গান আরম্ভ করিয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল সভ্যই তাঁহার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী সহকারে দারুণ উৎসাহ-ভরে গানে যোগ দিলেন। জগ্‌ঝড়ের মাতামাতির চেয়ে ইঁহাদের মাতামাতিই তখন বেশী!
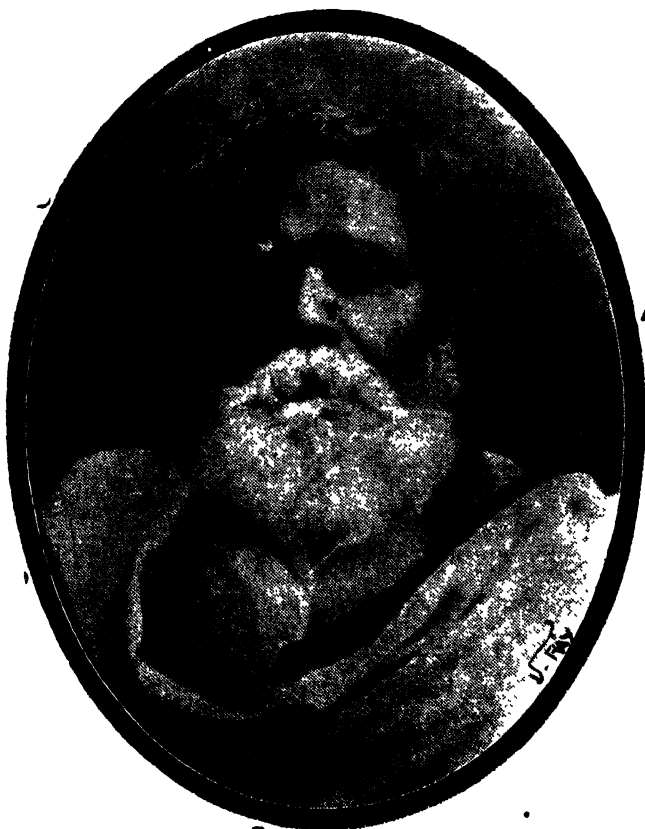
রাজনারায়ণ বসু

জ্যোতিবাবু বলিলেন "রাজনারায়ণ বাবু আমাদের চেয়ে বয়সেও যেমন অনেক বড়, জ্ঞানেও তেমনি অনেক বড়; কিন্তু তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়, গর্ব্বশূন্য প্রাণ এবং স্বদেশের জন্য ঐকান্তিকতা তাঁহাকে একেবারে শিশুর মত ক'রিয়া রাখিয়াছিল। বয়সের আধিক্য ও প্রচুর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাঁহার বিন্দুমাত্র অভিমান ছিল না। রাজনারায়ণবাবু আমার পিতৃদেবের নিকট গিয়া যেমন গভীর গবেষণাপূর্ণ তত্ত্বের আলোচনা করিতেন, আমাদের সঙ্গেও তেমনি সর্ব্বদা হাসিমুখে ছেলেমানুষিও করিতে পারিতেন। তাঁহার অনেক হাসির গল্প পুঁজী ছিল—তিনি ঐরূপ একটি গল্প বলিয়া, মুদ্রিত নেত্রে মজাটি নিজেই উপভোগ করিয়া—দুই এক সেকেণ্ড স্তম্ভিত থাকিয়া, তাহার পরেই উচ্চরবে হাসিয়া উঠিতেন। সেই খোলা হাসির মধ্যে একটি মধুর সরলতা ছিল।"

"তাঁহার রচিত "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" তখনও প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের পূজার দালানে, এখন যেখানে উপাসনা হয়, একবার একটি সভা আহূত হয়। আমার পিতা ছিলেন সভাপতি; রাজনারায়ণ বাবু "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। রেভারেণ্ড কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য লোক সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর প্রবন্ধ পঠিত হইলে, রেভারেণ্ড কালিচরণ তাহার খুব তীব্র প্রতিবাদ করেন। পিতাঠাকুর মহাশয় তাহাতে এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তিনি আসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিলেন,—তখন তাঁহাকে আবার বলিয়া-কহিয়া বসাইয়া রাখা হয়।

"রাজনারায়ণ বাবু যখন 'হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' পুস্তক প্রণয়ন করেন তখন আমি ফরাসী গ্রন্থ হইতে তাঁহার মতের পোষক অনেক লেখা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। পরিশিষ্টে যে সমস্ত ফরাসী লেখা উদ্ধৃত আছে, সেগুলি আমারই সঙ্কলিত।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীর সম্পাদকতা ছাড়িয়া দিবার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ছেলে-দের জন্য "বালক" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত করেন। ইহাতে তখন জ্যোতিবাবু physiognomy (মুখসামুদ্রিক) ও phrenology (শিরসামুদ্রিক) বিষয়ে অনেক প্রবন্ধাদি লিখিতেন। "বালকে" স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যা-সাগর মহাশয়, রাজনারায়ণবাবু প্রভৃতির প্রতিকৃতি সহ শির সামুদ্রিক অনুসারে চরিত্র সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু ও রাজনারায়ণ বাবুর ছবি জ্যোতিবাবুর স্বহস্ত-অঙ্কিত পেন্সিল স্কেচ্ হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল।

এই সময়ে জ্যোতিবাবু একবার গাজীপুরে গিয়াছিলেন। সেখানে জেলের ডাক্তার Robertson সাহেবের সঙ্গে তাঁর খুব আলাপ হইয়াছিল। এই রবার্টসন্ সাহেব পরে গিল্‌গিট্ দেশে গিয়া রাষ্ট্রনৈতিক কৃতিত্ব দেখাইয়া নাইট্ (knight) উপাধি প্রাপ্ত হন। জ্যোতিবাবু তাঁহার মাথা দেখিয়া চরিত্র বর্ণনা করিয়া একখানি কাগজে তাঁহার চরিত্র বিবরণ লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি জ্যোতিবাবুর উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এইখানে জ্যোতিবাবু সাহেবের অনুমতি অনুসারে জেলের সব পায়ে-বেড়ী-পরা দাগী বদ্‌মাইস্ কয়েদীদের ছবি আঁকিয়া মাথা পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

জ্যোতিবাবুর অনেক বন্ধুবান্ধবও তাঁহাকে মাথা দেখাইতেন। ইহাতে মাথা টিপাইবার কাযও অনেকটা হইত। স্তার তারকনাথ পালিত মহাশয় কখনও কখনও বলিতেন "ভাই জ্যোতি আমার মাথাটা একবার দেখ ত?" এইরূপে তিনি মাথা টিপাইবার আরাম উপভোগ করিতেন।

জ্যোতিবাবু পণ্ডিত, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একবার মাথা দেখিয়াছিলেন—পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, তাঁহার স্বভাবের সহিত এই বর্ণনা অনেকটা মেলে বটে। শেষে তিনি জ্যোতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, ফ্রেনলজিতে তোমার কি খুববিশ্বাস? —ফ্রেনলজির সব কথাই কি ঠিক্?"—জ্যোতিবাবু বলিলেন, আমি ফ্রেনলজিষ্টদের সব কথা বিশ্বাস করিনে,—মোটামুটি কতকটা মেলে— এই মাত্র।"—

"তুমি যে ফ্রেনলজির গোঁড়া ভক্ত নও, এ কথা শুনে ভারী খুসী হলেম।" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে সাধুবাদ করিয়াছিলেন।

জ্যোতিবাবু একবার "ইণ্ডিয়ান মিরারের" সম্পাদক ৺ নরেন্দ্রনাথ সেনের মাথা দেখিয়া তাঁহার চরিত্র-বিবরণ লিখিয়া দিয়াছিলেন। জ্যোতিবাবু বলিয়াছিলেন, "তাঁর ক্রোধ হইলে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন।" এই কথায় সেন মহাশয় বলেন, "আপনি বোধ হয় একথা কারও কাছে শুনিয়াছেন?"—কিন্তু যখন শুনিলেন যে জ্যোতিবাবুর নিকট এ সংবাদ একেবারেই অবিদিত, তাঁহার মাতার লক্ষণ দেখিয়াই তিনি একথা বলিতেছেন তখন নরেন্দ্রবাবু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

"বালক" এক বৎসর মাত্র চলিয়াছিল, তাহার পর "ভারতী"র সঙ্গে মিলিয়া যায়।

আবার জ্যোতিবাবু এক সভা স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। এবার আর দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য নহে, এবার বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির জন্য। সভার নাম হইল "কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন।" সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। প্রথম, বঙ্গভাষার অভাব মোচন; দ্বিতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি সাধন ও উৎসাহ বর্দ্ধন; এবং তৃতীয়, বঙ্গসাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন। তাঁহার রচিত অনুষ্ঠানপত্র ও নিয়মাবলীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"বিদ্বজ্জনগণের একত্র সম্মিলনের অনেকগুলি শুভফল আছে:—

(১) সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর দেখাশুনা হয় ও সৌহার্দ্দ জন্মে।

(২) পরস্পরের মধ্যে ভাবের ও মতের আদান প্রদান হওয়ায়, একদেশদর্শিতা ঘুচিয়া যায় ও উদারতার বৃদ্ধি হয়।

(৩) এই বিদ্বজ্জন সম্মিলনের উপলক্ষ্যে আমাদের বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে বহুবিধ শুভ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যথা—

(ক) বহু ভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শনের অনুশীলন করিতে হইলে যে সকল নূতন কথা সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তাহা

আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হইতে পারে ও তৎসঙ্গে বঙ্গভাষায় সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ একখানি অভিধান সঙ্কলিত হইতে পারে।

(খ) বিদেশীয় ভাষার শব্দ সমূহ বাঙ্গলা অক্ষরে প্রকাশ করিতে হইলে নূতন যে সকল অক্ষরের আবশ্যক হয় তাহা সৃষ্টি করিয়া প্রচলিত করা যাইতে পারে।

(গ) বাঙ্গলা গ্রন্থের নিরপেক্ষ ও যথাযোগ্য সমালোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধন হইতে পারে।

(ঘ) সুলেখকদিগকে সভা হইতে যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া যাইতে পারে।

(২) প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করিয়া অথবা সংবাদপত্র বা সন্দর্ভ পত্রের সম্পাদকতা করিয়া যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন।

(৩) বাঙ্গলায় গ্রন্থাদি না লিখিলেও যাঁহাকে সভ্যগণ সারস্বত সভার যোগ্য বিবেচনা করিবেন, অর্থাৎ যাঁহাদ্বারা সভার উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য হইতে পারিবে, তাঁহাকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারিবে।

(৬) সভায় বাঙ্গলা গ্রন্থসমূহ বঙ্গভাষায় সমালোচিত হইবে, অথবা ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন বিষয়ক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ অন্য ভাষায় রচিত হইলে সভায় তাহারও সমালোচনা হইতে পারিবে।

(৯) যে সকল সমালোচ্য গ্রন্থ সভায় উপস্থিত হইবে, সম্পাদক তাহা সভা-সমক্ষে উপস্থিত করিলে, সভাপতি তাহার সমালোচক স্থির করিয়া দিবেন।

(১২) যে অধিবেশনে পুস্তকের সমালোচনা পাঠ হইবে —তাহার পরের অধিবেশনে সমালোচনালিখিত তর্কবিতর্কের সারাংশ ও সমালোচ্য গ্রন্থখানি সম্বন্ধে সভাপতি তাঁহার নিজমত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবেন।

(১৩) সভার অন্যান্য কার্য্য-বিবরণের সহিত লিখিত সমালোচনার সংক্ষিপ্ত সার ও তর্কবিতর্কের সারাংশ এবং তৎসম্বন্ধে সভাপতির অভিপ্রায়
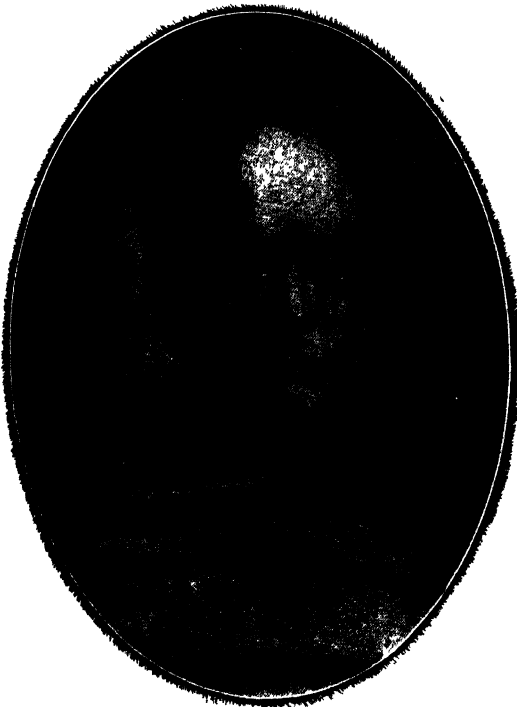
বিদ্যাসাগর

সাধারণের অবগতির জন্য কোন প্রসিদ্ধ সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইবে। সভায় যে-কোনও মত ব্যক্ত হইবে, তাহা সভার মত বলিয়া গৃহীত না হইয়া ব্যক্তিগত মত স্বরূপে গৃহীত হইবে।

(১০) সমালোচনা প্রভৃতি কার্য্য না থাকিলে অথবা কার্য্য শেষ হইয়াও যথেষ্ট অবসর থাকিলে সভ্যদিগের মধ্যে কেহ সভার নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয় সম্বন্ধে পাঠ অথবা মৌখিক বক্তৃতা বা পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারিবেন, ও তাহা লইয়া বাদানুবাদ চলিতে পারিবে। সমালোচনা, প্রবন্ধপাঠ, ও

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

বক্তৃতাদির কায না থাকিলে সঙ্গীতাদি হইতে পারিবে।"

যেমন এই কল্পনা জ্যোতিবাবুর মাথায় উদয় অমনি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া তিনি স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পরামর্শ লইতে গেলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"তোমরা বড় মানুষের ছেলে, কোনও বদ্‌খেয়ালি না করিয়া এই সব লইয়া যদি সময় কাটাও ত' সে ভালই। কিন্তু বাবা একটা কথা আমি তোমাদের বলিয়া দিতেছি। বড় বড় হোম্‌রা চোম্‌রা লোকদের এর মধ্যে লইও না—তাহা হইলেই সব মাটি হবে।" আমরা কিন্তু হোম্‌রা চোম্‌রা লোক লইয়াই কায আরম্ভ করিলাম। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় আমাদের প্রথম সভাপতি হইলেন। ভূগোলের ইংরাজী শব্দের পরিভাষা তিনি নিজেই লিখিতে সুরু করিয়া দিলেন। দুই তিন অধিবেশনে বেশ কায চলিয়াছিল—কিন্তু তার পরেই নানা কারণে সভা বন্ধ হইয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা ফলিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সকল প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণই এ সভার সভ্য ছিলেন। বঙ্কিমবাবু এ সভার নাম ইংরাজীতে "Accademy of Bengali Literature" রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক ভারত ও য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২

ইহাই য়ুরোপীয় সভ্যতা। এখন দেখা যাউক, এসিয়ায় ইহার বিস্তার পক্ষে কি-বাধা হইয়াছিল।

এই বাধা দুই প্রকার। কতকগুলি বাধা এসিয়ার লোকদিগের অন্তঃপ্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন, আর কতকগুলি বাধা, তাহারা য়ুরোপীয় সভ্যতাকে যে চক্ষে দেখিত তাহা হইতে উৎপন্ন।

***

যে-বিভিন্ন জাতি হইতে এসিয়িক সভ্যতা উৎপন্ন সেই জাতিদিগের পরস্পর মধ্যে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্নতাই এই এসিয়িক সভ্যতার একটি বিশেষ লক্ষণ।

অবশ্য, এই সকল জাতিদিগের ভেদ নির্ণয় করা আবশ্যক—তাহাদের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ নির্ণয় করা আবশ্যক। আর্কেমেনিদিগের শাসনাধীনে, কালিফ্‌দিগের শাসনাধীনে, পূর্ব্বতন এসিয়িক রাষ্ট্রসকল, এক রাজার রাজ্যের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল; ইরাণের সহিত ভারতের সম্বন্ধ বরাবরই সমান চলিয়া আসিয়াছিল। অটোমান সাম্রাজ্য ও আফগানিস্থান-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতেই পারস্য, সভ্যজগৎ হইতে

বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পারস্য, গ্রীস ও আরবদিগের প্রভাবাধীনে অবস্থিত ভারত, হিন্দো-চীনে ও (Sond) সন্দ-দ্বীপপুঞ্জে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল।

তুর্ক ও মোগলগণের সাহায্যে চীন, পুরোবর্ত্তী এসিয়ার সহিত বহুবার সম্মিলিত হইয়া—হিন্দো-চীনকে, কোরিয়াকে, ও জাপানকে সভ্য করিয়া তুলে। অবশেষে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ইস্লাম ধর্ম্ম,—স্বকীয় মত-বিশ্বাস ও শিল্পকলার আদর্শ সমস্ত এসিয়ার মধ্যে বিস্তার করে। তথাপি পারস্য, ভারত, ও চীনকে একে একে সভ্যতার সমস্ত ধাপ পার হইতে হইয়াছিল। গ্রীস, রোম, গল ও জর্ম্মাণি যেরূপ অন্য জাতি হইতে উন্নত সভ্যতা লাভ করিয়াছিল, উহারা সেরূপ অন্য জাতি হইতে সভ্যতা লাভ করে নাই। কিন্তু জাপান সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। জাপান আধুনিককালে অন্যান্য এসিয়িক জাতি হইতে সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। তাই জাপান আজ এত উদ্যমশীল।

প্রাচ্য জাতিদিগের মধ্যে এই আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতা হইতে কতকগুলি ফল উৎপন্ন হইয়াছে যাহা প্রণিধান-যোগ্য।

বহুশতাব্দী হইতে সভ্যতা চলিয়া আসায় এসিয়ার এই সভ্যতার মধ্যে একটা গভীরতা ও ব্যাপকতা আসিয়াছিল। টন্‌কিনে, অ্যানামে, চীনে, জাপানে, দেখা যায়, ইতরসাধারণ লোকেরা কতকটা শিক্ষা পাইয়াছে—এমন কি, চিত্তোৎকর্ষবিধায়িনী সুশিক্ষা পাইয়াছে। ঐ সব দেশে এই ব্যাপারটা য়ুরোপী দিগের খুব নজরে পড়ে।

এক শতাব্দীকালের মধ্যে একটা সমস্ত জাতি উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারে; কিন্তু ঐ জাতিকে গড়িয়া তুলিতে বহুশতাব্দী আবশ্যক। ইংরাজেরা, জর্ম্মাণেরা, ইটালীয়দিগের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান্, অধিক ধনশালী, অধিক গর্ব্বিত, অধিক আত্মসংযমী; বিদ্যালয় তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের মনোগতি আধুনিক ধরণের; কিন্তু তথাপি ইংলণ্ড ও জর্ম্মণির ইতরসাধারণের সহিত তুলনা করিলে,—ইতালীর ইতরসাধারণ বহু প্রাচীনকাল হইতে সভ্য, আরও সম্পূর্ণভাবে সভ্য,—এইরূপ ধারণা হয়। আনাম-দেশের ও জাপানের জনসাধারণ সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। একথা সত্য, জাপানী চাষা বা চীনীয় চাষার সহিত ভারতীয় রায়তের পার্থক্য আছে। আগন্তুক তামুলদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিলেও, ব্রহ্মী ও সিংহলীরা তামুলদিগের অপেক্ষা অধিক সভ্য। হিন্দুদের যে এই নিকৃষ্টতা তাহার কারণ তাহাদের বর্ণ-ভেদ প্রথা। তথাপি একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না যে তাহাদের মধ্যে অনেকেই সভ্য এবং সকলেরই চরিত্রে একটা মাধুর্য্য আছে। চরমপ্রান্তবর্ত্তী এসিয়ার লোকেরা খুব সভ্য, কিন্তু সেই প্রত্যেক জাতিরই একএকটা নিজস্ব সভ্যতা আছে। জটিলতাই য়ুরোপীয় সভ্যতার একটা মুখ্য লক্ষণ। Calabra বা Sicile-র রূঢ়প্রকৃতি চাষারা, হিব্রুদিগের নিকট হইতে, ইজিপসীয়দের নিকট হইতে, ফিনিসীয়দিগের নিকট হইতে, রোমকদিগের নিকট হইতে, গ্রীকদিগের নিকট হইতে, সারাসেনদিগের নিকট হইতে, জর্ম্মণ, নরমান, স্পেনিয়ার্ড অথবা বিজয়ী জর্ম্মণ বা

ফরাসীদিগের নিকট হইতে তাহাদের মত বিশ্বাস ও প্রথাসকল ধার করিয়াছিল। এপ্রকার এসিয়ায় দৃষ্ট হয় না। বৈদেশিকের নিকট নানাবিবিষয়ে ঋণী হইলেও, হিন্দুসমাজ মোটের উপর একটা হিন্দুপ্রকৃতি বজায় রাখিয়াছে; জর্ম্মাণসমাজ তাহা বজায় রাখিতে পারে নাই। ইতালীয় রীতিনীতি ততটা ইতালীর রীতিনীতি নহে—কিন্তু চীনের রীতিনীতি সম্পূর্ণরূপে চীনেরই রীতি-নীতি। পর-সংস্রব-বর্জ্জিত হইয়া নিজ গণ্ডীর মধ্যেই বদ্ধ থাকিবার ফলে প্রাচ্যজাতিদিগের সভ্যতা ঐতিহ্য-ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত য়ুরোপীয় জাতিরাও একসময়ে ঐতিহ্য-ভক্ত ছিল। কিন্তু তাহাদের মতবিশ্বাসের জটিলতাই এই ঐতিহ্য-ভক্তিকে উচ্ছেদ করিয়াছে।

আধুনিক ফরাসীদিগের নৈতিক পূর্ব্বপুরুষ কাহারা? যে সেল্‌ট জাতিকর্ত্তৃক ফরাসী দেশ অধ্যুষিত, এবং অনেক ফরাসী যাহাদের বংশধর—সেই সেল্ট্‌ জাতিই কি ফরাসীদিগের নৈতিক পূর্ব্বপুরুষ? যে ইহুদি জাতি হইতে তাহারা ধর্ম্মলাভ করিয়াছে, যে গ্রীক ও রোমকেরা "গল্"কে সভ্য করিয়াছে, যে জর্ম্মাণজাতি, তাহাদিগকে নারীসম্মান ও "স্বাধীন মনুষ্যের সমান স্বত্বাধিকার" সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছে,—ইহাদের মধ্যে কাহারা তাহাদের নৈতিক পূর্ব্বপুরুষ? অ-খৃষ্টান Vercengetorixকে খৃষ্টানেরা কখনই সেই ধর্ম্ম দিতে পারে না, যে ধর্ম্ম তাহারা খৃষ্টান Vercengetorixকে দিবে। যে ফরাসী জাতিকে রোমীয় জ্ঞানবিজ্ঞান গড়িয়া তুলিয়াছে সেই ফরাসীজাতি Vercengetorix অপেক্ষা Cesar-এর নিকটেই বেশী ঋণী বলিয়া নিশ্চয়ই স্বীকার করিবে। পক্ষান্তরে, চীনীয়েরা, চীনবাসী কংফুচুর উপদেশই অনুসরণ করিয়া থাকে; জাপানীরা যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করে, সেই শিন্তোধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে জাপানেরই ধর্ম্ম; এবং ভারতবাসীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ,—ভারতেরই ধর্ম্মশাস্ত্র। তাই চীনীয়, জাপানী ও হিন্দুরা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে; কিন্তু আমরা তাহা পারি না।

এই ঐতিহ্য-ভক্তি হইতে অনেকগুলি ফল প্রসূত হইয়াছে। যেহেতু পিতৃপুরুষেরা সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন অতএব বিশ্বমানবের আর উন্নতি হইতে পারে না, প্রত্যুত বিশ্বমানবের অবনতি হইতেছে। ইহা হইতেই অধঃপতনের ধারণা। যেহেতু পিতৃপুরুষেরা সমস্ত বিজ্ঞানই অবগত ছিলেন, অতএব নূতন বিজ্ঞানগুলি অলীক বিজ্ঞান অথবা অনিষ্টজনক বিজ্ঞান। তাই, অনুমান-সিদ্ধান্ত বা ব্যাপ্তিগ্রহ (induction) তাহাদের নিকট একটা বিভীষিকা;—পিতৃপুরুষদের মতবিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করিয়া একটা নিজের মতবিশ্বাস স্থাপন করা—এযেন শিশুর দুঃসাহসিকতা, শিশুর অনধিকার চর্চ্চা; তাই, বিশ্লেষণ-পদ্ধতির কথা শুনিলে তাহাদের যেন একটা আতঙ্ক হয়; পূর্ব্বপুরুষদিগের মতবিশ্বাসের যৌক্তিকতা তলাইয়া দেখা—ইহা ত কম ধৃষ্টতা নহে। তাই, সমস্ত ভৌতিক উন্নতিসম্বন্ধে তাহাদের একটা বিষম শঙ্কা; কেননা এই সকল উন্নতি হইতে,—রীতি-নীতি, প্রথা, লৌকিক বাস্তু-শিল্প প্রভৃতি সমস্তই অবহিত হইয়া যায়। এই ঐতিহ্য-ভক্তির পরিণাম-ফলে সেই একই

রীতিনীতির ধারাবাহিকতা, একই হৃদয়-ভাবের প্রবাহ, প্রণালীবদ্ধ কপটতা, ক্রিয়াকাণ্ডের গতানুগত্য, বৈদেশিকের প্রতি বিদ্বেষ, বাঁধা-নিয়মের অনুসরণ, চরিত্রের নির্ব্বীর্য্যতা, কোন একটা বৃহৎ উদ্যমের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার অসামার্থ্য। ইহারই পরিণাম-ফলে মনের সঙ্কীর্ণতা, কৌতুহলের অভাব, সমস্ত নূতন চিন্তাকল্পনার প্রতি দোষারোপ, কেবল একমাত্র স্মৃতি-শক্তির অনুশীলন। সমস্ত প্রাচীন শিক্ষা একমাত্র এই স্মৃতিশক্তির সাহায্যেই হইয়া থাকে। স্মৃতিচর্চ্চার সঙ্গেসঙ্গে—অনুকরণ, আবৃত্তি, প্রাচ্যপ্রতিভা-প্রসূত রচনাবলীর যাহা বিশেষ লক্ষণ সেই অকাল-উৎপন্ন ক্লান্তি—এই সমস্ত আসিয়া পড়ে। তাই, সমস্ত এসিয়িক জাতির প্রথা ও রচনাবলী আমাদের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দেয় যে, তাহাদের নিঃসঙ্গ উদ্যম চেষ্টা তাহাদিগকে পরিক্লান্ত ও অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের অতি প্রাচীন সভ্যতা জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলেও যথেষ্টরূপে পরিপুষ্ট হয় নাই।

এবং রাজ্যশাসন, সামাজিক গঠন, ও আর্থিক ব্যবস্থা প্রণালীর উপরেও ঐতিহ্য-ভক্তির প্রভূত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজ্যশাসনে রাজার স্বেচ্ছাচারিতা। ফলতঃ এইরূপই ঐতিহ্য;—যেমন অন্যান্য বিষয়ে, সেইরূপ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও নূতন কিছু প্রবর্ত্তিত করিবার কাহারও অধিকার নাই। তাছাড়া, ঐতিহ্য,—রাজপদের সহিত ধর্ম্মের ভাব ও পিতৃশাসনতন্ত্রের ভাব জুড়িয়া দিয়াছে। মিকাডো—দেবতাদিগের বংশধর; চীনের সম্রাট—ঈশ্বরের পুত্র ও চীন-বাসী লোকপুঞ্জের পিতা; অনেকগুলি হিন্দু রাজার পূর্ব্বপুরুষ—রাম অথবা কৃষ্ণ;—উভয়েই ভগবানের অবতার বলিয়া পরিগণিত।

এসিয়িক লোকেরা যেরূপ মৃত পিতৃপুরুষদিগকে পূজা করে সেইরূপ জীবিত পিতৃপুরুষদিগকেও ভক্তি করে; প্রাচ্যখণ্ডের সমস্ত জাতি এখনও পিতৃ-শাসন তন্ত্রাধীনে অবস্থিত। কংফুচুধর্ম্ম পিতার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করে; জাপানীদের প্রাচীন নিয়মও এইরূপ ছিল। ভারতে, ১০০।২০০ লোক লইয়া একটি পরিবার গঠিত; আবার এই পরিবারও বর্ণভেদ প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত; তাই ব্যক্তি-বিশেষের,—কি স্থাবর, কি অস্থাবর, কোন স্বত্তাধিকার নাই; সমস্ত ধন ঐশ্বর্য্য সাধারণের; নিজের কোন স্বাধীনতা নাই; যাহার সহিত কখন দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই এইরূপ এক শিশুর সহিত, খুব অল্প-বয়সেই বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া যায়; সে পিতৃগৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারে না। তাহার রীতিনীতি স্বীয় পিতৃপুরুষ-দিগেরই রীতিনীতি, এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের ব্যবসাই তাহার ব্যবসায়। (১)

পিতৃশাসনতন্ত্রের আর্থিক পরিণাম এইরূপঃ—ব্যবসায়ের কোন উন্নতি নাই; যন্ত্রাদি ও যন্ত্রাদি প্রয়োগের প্রণালী—ঐতিহ্যই

(১) ভারতে, এই পারিবারিক প্রণালীর মধ্যে কতকগুলি সীমাবন্ধন আছে, এবং সমস্ত এসিয়ায়, সামাজিক ক্রমবিকাশের ফলে; খুব আস্তে আস্তে, পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উদ্ভব হইয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। সমাজের উপাদান-গঠনে কোন স্থিতিস্থাপকতা নাই; শ্রমশিল্পী ও বণিকের বংশ অতীব সীমাবদ্ধ; তাহারা সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্ন ধাপ অধিকার করিয়া আছে। কোন এক ব্যবসায়ের যতই প্রাধান্য হউক না কেন, সেই ব্যবসায়ী-বংশের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে পারে না। যদি কোন ব্যবসায় নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তখন কেবল দুঃখ-দারিদ্র্য, সেই ব্যবসায়ী-বংশকে অনুসরণ করে। যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন কারিগর ধনশালী হইয়া উঠে, তথাপি তাহার পদের গৌরব কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না, কোন বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার করা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। সে তাহার সন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারিবে না, অথবা অন্য কোনো ব্যবসায়ে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবে না। যে সমাজ এইরূপ অচল, সে সমাজ কিরূপে সমৃদ্ধ হইবে, বা পরিপুষ্ট হইবে? পক্ষান্তরে, তাহাদের উচ্চাভিলাষ মরিয়া গিয়াছে, তাহারা অল্প লভ্যেই সন্তুষ্ট। খুব বুদ্ধিমান, খুব উদ্যমশীল হইলেও, তাহাদিগকে স্বীয় পৈতৃক অবস্থাতেই থাকিতে হইবে। তাহাদিগের আশা করিবার কিছুই নাই, ভয় করিবারই যথেষ্ট কারণ আছে; সমাজের গঠন-বিধান এরূপ দৃঢ়বদ্ধ, বর্ণভেদের বন্ধন, ব্যবসায়-সম্প্রদায়ের বন্ধন, পারিবারিক বন্ধন এরূপ পবিত্র, যে, রোগে বা আপদ-বিপদে সকল ব্যক্তিই নিশ্চয় সাহায্য পাইবে বলিয়া ভরসা রাখে। সুতরাং, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা না থাকায়, জীবনে তাহাদিগের একপ্রকার মাধুর্য্যের বিকাশ হয়। অত্যন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া, বা অত্যন্ত দ্রুতভাবে কাজ করিয়া কেহই শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে না।

***

এক্ষণে, য়ুরোপসম্বন্ধে এসিয়িকদিগের কিরূপ ধারণা, তাহার অনুসন্ধান করা যাক্। অবশ্য তাহাদের ও আমাদের সামাজিক প্রণালীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কিন্তু তাহারা যদি য়ুরোপকে ভাল করিয়া জানিতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা য়ুরোপের শক্তি-সামর্থ্যের প্রশংসা করিত; য়ুরোপীয়দের রীতিনীতির মধ্যে এমন অনেক লক্ষণ দেখিতে পাইত যাহা তাহাদের নিজের রীতিনীতি স্মরণ করাইয়া দেয়। তদ্‌বিপরীতে, যে-সকল য়ুরোপীয় এসিয়ায় আসিয়াছিল, তাহাদের দেখিয়াই য়ুরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে তাহাদের একটা ধারণা হইয়াছিল—এবং সেই সভ্যতা যে অতীব রূঢ়ধরণের ও তাহা এসিয়া-প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

প্রথমতঃ, শুধু লুটপাট করাই, হত্যা করাই ষোড়শ শতাব্দীতে বিজয়ীদিগের একমাত্র অভিলাষ ছিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারকদিগের আবির্ভাবঃ—Francois xavierএর ন্যায় উদারচরিত অনেক ধর্ম্মপ্রচারক ছিল; কিন্তু এমনও কতকগুলি ধর্ম্মপ্রচারক ছিল যাহাদিগকে স্পেনদেশের রাষ্ট্রনৈতিক মোক্তার বলা যাইতে পারে; তাহারা বিদ্রোহ উত্তেজিত করিত, দেশ-

জয়ের জন্য আয়োজন করিত, বিধর্ম্মীদিগের শাসনার্থ ধর্ম্মাধিকরণ সংস্থাপন করিত।

তাহার পর বণিক সম্প্রদায়,—যাহারা দুর্ব্বলের প্রতি কঠোর, ও সবলের নিকট যোড়হস্ত,—তাহারা উপন্যাসসুলভ অপরিসীম লাভের চেষ্টায় থাকিত। ওলন্দাজেরা খৃষ্টধর্ম্মের ক্রুস-চিহ্ন ধারণ করিয়া জাপানে যাত্রা করিয়াছিল; উহারা মালাই দেশের ক্ষুদ্র রাজাদিগের প্রতি রাজসম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। মোগল-রাজদরবারে ও দাক্ষিণাত্যের অধিপতিদিগের দরবারে, য়ুরোপীয় বণিকেরা, এমন কোন নীচতা ছিল না যাহা অবলম্বন করে নাই।

তাহার পর, যখন য়ুরোপীয়েরা ভারত-উপকূলে, হিন্দো-চীনের উপকূলে, Macao দেশে, Sond এর দ্বীপপুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তাহারা প্রজাপীড়ন করিয়া দেশশাসন করিত। অসংখ্য শত্রুর মধ্যে তাহারা মুষ্টিমেয় লোক, সুতরাং তাহারা প্রজাপুঞ্জের ভীতি উৎপাদন করিয়া শাসন করিত। আবহাওয়ার প্রভাবে ভগ্নস্বাস্থ্য, ক্রমাগত বিপদের মুখে অবস্থিত,—তাহারা যেনতেনপ্রকারেণ দ্রুত ধনসঞ্চয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইত; এবং এইরূপে ধনঞ্চয় করিতে পারিলেই তাহাদের সমস্ত কষ্ট সার্থক বলিয়া মনে করিত। এই য়ুরোপীয়েরা, এই খৃষ্টানেরা, এসিয়িকদিগকে পশু জ্ঞান করিত—অতএব তাহাদিগের যন্ত্রণা দিতে বা হত্যা করিতে তাহাদের কিছুমাত্র সংকোচ হইত না। এসিয়ায় এই সমস্ত অত্যাচার—তাহার উপর আবার অ্যামেরিকার অত্যাচার কাহিনী সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মেক্সিকো ও পেরুতে স্পেনবাসীদিগের বিজয়-অভিযানের ব্যাপার অবগত হইয়া Takugavaরা খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকদের ধর্ম্মপ্রচার নিষেধ করিল, এবং সমস্ত য়ুরোপীয়দিগকে দেশ হইতে বিদূরিত করিল।

আরও কিছুকাল পরে, য়ুরোপীয়েরা রীতিমত শাসনপ্রণালী সংস্থাপন করিল। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড—ইহাদেরই হস্তগত ভারত-সাম্রাজ্য; নিষ্ঠুরতা রহিত হইল, ধনগৃধ্নুতা সংযত হইল। কিন্তু যখন এসিয়িকেরা, য়ুরোপীয়দিগকে আর ভাগ্যান্বেষী বলিয়া মনে করিল না, পরন্তু তাহাদিগকে সভ্য বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইল, তখনও য়ুরোপীয় সভ্যতার দুইটি লক্ষণ দেখিয়া তাহাদের মন বিক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। অবিরাম পরিবর্ত্তন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে, ব্যবসায়িক শিল্পকলা, বৈপ্লবিক কল্পনাসমূহ, রীতিনীতি, পরিচ্ছদ, বৎসরে বৎসরে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ক্লাইভ ও ওয়ারেন-হেষ্টিংসের সময়কার যে ইংরেজ, লর্ড-ডালহৌসি-সময়কারও কি সেই একই ইংরেজ? পক্ষান্তরে, বহুল জটিলতা। ইংরেজ, ফরাসী, পোর্ত্তুগীজ, স্পেনবাসী, ওলন্দাজ, জর্ম্মাণ; রোমান-কাথলিক, আংগ্লিকান, প্রেসবিটেরিয়ান, মেথডিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন খৃষ্ট সম্প্রদায় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই সব সংশয়বাদী বণিকগণ যাহারা খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগকে সমুদ্রপথে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিল। মানসিক প্রকৃতিরও বৈচিত্র্য। এবং ফরাসী-বিপ্লবের প্রতিধ্বনি ও নেপোলিয়ানের যুদ্ধবিগ্রহ।

অধুনা, এসিয়িকেরা য়ুরোপীয় সভ্যতার

তিনটি মুখ্য লক্ষণ দেখিতে পায়:—এই সভ্যতা, ধর্ম্মমূলক সভ্যতাও নহে, সামরিক সভ্যতাও নহে, পরন্তু ইহা শ্রমশিল্পমূলক সভ্যতা, বাণিজ্যমূলক সভ্যতা; এই সভ্যতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং উন্নতিতে বিশ্বাস—ইহার নিগূঢ় ভাব। এসিয়িকেরা মনে করে,—য়ুরোপীয়েরা পরলোক বিশ্বাস করেনা, অথবা তাহাদের আচরণ দেখিয়া মনে হয় যেন তাহাদের পরলোকে বিশ্বাস নাই, স্বদেশের প্রতি তাহাদের মমতা নাই; কেননা তাহারা স্বদেশ ছাড়িয়া আইসে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মনে করে, ভারত ছাড়িয়া অন্যত্র যাত্রা করা একটা মহাপাতক, এবং আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ার চীনেরা মনে করে,—যদি তাহাদের মৃতদেহ চীনের মাটীতে কবরস্থ না হয়, তাহা হইলে তাহাদের আত্মা কখনও শান্তিলাভ করিবে না। যাহারা য়ুরোপীয় উন্নতির কথা বলে, পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি তাহাদের ভক্তি নাই, পরিবারের প্রতি তাহাদের আসক্তি নাই, কেননা পরিবারবর্গকে ছাড়িয়া তাহারা দূরদেশে চলিয়া যায়। যদি বা পরিবার তাহাদিগকে অনুসরণ করে, সে পরিবার আশ্রমশূন্য; নিজ নিজ পত্নী লইয়াই তাহারা ব্যাপৃত, স্বার্থ লইয়াই ব্যাপৃত, নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা লইয়াই ব্যাপৃত। কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া, তাহাদের সন্তানসন্ততি গৃহ হইতে বাহির হয়, এবং নিজ ব্যক্তিগত মতানুসারে, নিজের স্বার্থ অনুসারে, স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করিতে চাহে।

অতএব এসিয়িকেরা মনে করে যে, য়ুরোপীয়েরা কেবল নিজের জন্যই জীবন ধারণ করে, এবং অপরিসীম ধনসঞ্চয় করাই তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। স্বার্থ কাহাকে বলে এসিয়িকেরা তাহা জানে না; তাহারা স্বীয় পরিবারের জন্যই পরিশ্রম করে, এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রথা থাকায়, তাহাদের কখনই বংশ লোপ পায় না। য়ুরোপীয়েরা নিজের জন্যই পরিশ্রম করে, সুতরাং মানবজীবনের স্বল্পতাই তাহাদের মনে সর্ব্বদাই জাগরূক থাকে; এই জন্যই য়ুরোপীয়দের এতটা ধনলুব্ধতা, আপনার জন্য ও অন্যের জন্য এতটা কঠোরতা।

আবার, এসিয়িকেরা য়ুরোপীয়দিগকে বিস্ময়স্তম্ভিত দৃষ্টিতে, অথবা ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে দর্শন করে; যে সকল এসিয়িক য়ুরোপের রীতিনীতি ও মতামত দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছে তাহাদেরও মন হইতে এই সকল ভাব অপনীত হয় নাই। একজন সমসাময়িক লেখকের লেখা হইতে একটা অংশ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"হিন্দুদের সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক বলিয়া, এবং আদৌ শ্রমশিল্পমূলক নহে বলিয়া হিন্দুদের ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাবটা ক্রমশই খর্ব্ব হইয়া আসে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার ন্যায় যে-সভ্যতার একমাত্র লক্ষ্য—বৈষয়িক ও শ্রমশিল্পমূলক স্বার্থসাধন, সেই সভ্যতা এই স্বার্থের ভাবটাকে আরও বাড়াইয়া তুলে। ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ খুবই স্বাভাবিক; অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবজন্তুর ন্যায় মানুষও এই স্বার্থবোধের অংশভাগী। কিন্তু এই স্বার্থবুদ্ধিকে উচ্চতর ধর্ম্মবৃত্তির অধীনে আনাই উন্নতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। য়ুরোপীয় সভ্যতা এই লক্ষ্যটিকে হারাইয়াছে। তদ্বিপরীতে য়ুরোপীয়দের মধ্যে তীব্র ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; ইহাই যে তাহাদের পরিচালক প্রবৃত্তি—এ কথা আদৌ অতিরঞ্জিত নহে। হিন্দুদের মধ্যে, ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির বিলক্ষণ দমন হইয়াছে দৃষ্ট হয়; য়ুরোপীয়েরা হয়ত বলিবেন, অতটা স্বার্থদমন

বাঞ্ছনীয় নহে। বৃহৎ পরিবার-মণ্ডলীর কর্ত্তা—হিন্দু আপনার জন্য ততটা জীবনধারণ বা জীবিকানির্ব্বাহ *করে না; য়ুরোপীয়েরা যে সংকীর্ণ অর্থে পরিবার শব্দ* ব্যবহার করে, সেই নিজের পরিবারের জন্যও ততটা জীবনধারণ বা জীবিকানির্ব্বাহ করে না, পরন্তু যাহাদের সহিত তেমন কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই—সেই দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়কুটুম্বের জন্য মুখ্যত জীবনধারণ ও জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে।" (২)

আবার Max Mullerও এইরূপ লিখিয়াছেন—

"আমরা সকলেই যুঝাযুঝি করিয়া জীবন যাপন করি; আমরা জীবনের যে উচ্চতম আদর্শ কল্পনা করিয়া থাকি—তাহা জীবনসংগ্রাম। যে মুহূর্ত্তে *আমরা আর পরিশ্রম করিতে সমর্থ হই না, শুধু সেই* মুহূর্ত্ত হইতেই আমরা পরিশ্রম করিতে বিরত হই। এবং বৃদ্ধ অশ্বের ন্যায় আমরা সাজ-পরা অবস্থাতেই মরিবার গর্ব্ব অনুভব করি...কিন্তু আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির আর একটা দিক্ আছে; হয়ত, ভব-সমুদ্র-পারে যাত্রা করিবার জন্য মানুষের আর-একটা গতি নির্দ্দিষ্ট আছে; সেই গতিটিকে একেবারে আমলে না আনিলে নিতান্তই ভ্রমে পতিত হইতে হইবে।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পিপীলিকাদের যুদ্ধ প্রণালী

পূর্ব্বে পিপীলিকা সম্বন্ধে অন্য কথা বলিয়াছি এবার তাহাদের যুদ্ধ প্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

দাসপ্রিয় পিপীলিকারাই এই যুদ্ধাদি ব্যাপারে লিপ্ত থাকে। দাস বৃদ্ধি করিবার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির সহিত স্বগৃহ, স্বজাতি ও স্বাধীনতা রক্ষার আকাঙ্ক্ষাবশতঃ কঠোর সংগ্রাম সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সকল সংগ্রামের বর্ণনা অতীব কৌতুহলোদ্দীপক।

সমর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া দাসান্বেষী পিপীলিকা বাহিনী বিপক্ষ দুর্গের সন্ধান পাইয়া একযোগে তাহা আক্রমণ করিতে যায়। পথপ্রদর্শক সৈন্যগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া বিপক্ষদুর্গের অবস্থানাদি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক আক্রমণের সুযোগ নির্ণয় করে।

বৈজ্ঞানিক Lespes একবার এই প্রকার কয়েকটী দূতকে অতি সংগোপনে সতর্কতা ও যত্নের সহিত একটী শত্রুদুর্গের পারিপার্শ্বিক অবস্থাদির সন্ধান লইতে দেখিয়াছিলেন।

সাধারণতঃ দুর্গদ্বারগুলি নির্ণয় করিবার প্রতিই ইহাদের বিশেষ মনোযোগ ও আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। পিপীলিকা গৃহের এমনি নির্ম্মাণকৌশল যে ইহার দ্বার নির্ণয় করা বড় সহজসাধ্য নহে। শুধু দুর্গদ্বার নির্ণয়ে অসমর্থ হওয়াতেই অনেক সময় আক্রমণকারীদের অতি বড় বড় সুপরিচালিত অভিযানও ব্যর্থ হইয়া যায়।

লুণ্ঠন ও আক্রমণ উপযোগী শত্রুগৃহের সন্ধান করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরিত হইয়া থাকে; এবং তাহারা শত্রুগৃহের সন্ধান লইয়া এবং সে গৃহ আক্রমণ সহজসাধ্য কি না পরীক্ষা দ্বারা তাহা জানিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সেখানে পিপীলিকাসেনাপতিগণ পরস্পরে

(২) Bose, Hindu Civilization during British Rule. I. p. LXV.

পরামর্শ করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে সমর সজ্জার আদেশ ঘোষণা করে। শীঘ্রই সারি সারি *অগণিত পিপীলিকা সৈন্য দুর্গ হইতে বহির্গত* হইয়া শ্রেণিবদ্ধভাবে দ্রুতগতিতে বিপক্ষ দুর্গের অভিমুখে ধাবিত হয়।

আমরা এস্থানে কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের পিপীলিকাদিগের যুদ্ধবিবরণের ভাবানুবাদ করিয়া দিতেছি।

বৈজ্ঞানিক বুক্‌নারের বর্ণনা,—

পশ্চাৎবর্ত্তিদিগকে দলে আসিয়া মিশিবার সময় দেওয়ার জন্য স্থানে স্থানে পিপীলিকা বাহিনী অভিযান বন্ধ করিয়া দাঁড়ায়। সময় সময় বিপক্ষদুর্গের অবস্থান সম্বন্ধে মত পার্থক্য বশতঃ অথবা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত প্রদেশে আগমন-জনিত দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াও এরূপ করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক ফোরেল কয়েকবারই পিপীলিকা বাহিনীকে এইরূপ পথ হারাইয়া বসিতে দেখিয়াছেন। হুবার কিন্তু এরূপ ঘটনা মাত্র একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই বাহিনীতে ১০০ হইতে আরম্ভ করিয়া আড়াই হাজারেরও উপর পর্য্যন্ত পিপীলিকা সৈন্য অবস্থান করিয়া থাকে। সাধারণতঃ মিনিটে এক মিটার পরিমিত স্থান পিপীলিকা সৈন্যেরা অতিক্রম করে। তবে ঘটনা-বৈচিত্র্যে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটে। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বহন করিয়া ফিরিবার সময় সাধারণতঃ ইহারা অল্প পথ অগ্রসর হইয়া থাকে। অত্যধিক দূরবর্ত্তী স্থানে শত্রুদুর্গ অবস্থিত থাকিলে পথশ্রমে কাতর হইয়া মধ্যপথেই আক্রমণের কল্পনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদয় পিপীলিকাবাহিনী নিজদুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করে। ফোরেল একবার একটি *পিপীলিকাবাহিনীকে উক্ত কারণে ২৪০ গজ* পরিমাণ স্থান অগ্রসর হইয়া পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়াছেন। কখনও কখনও বিপক্ষ দুর্গের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াও ইহাদের হৃদয়ে এমন নিরুৎসাহ ও ভয়ের প্রাদুর্ভাব হইতে দেখা গিয়াছে যে তাহারা আক্রমণে নিরস্ত হইয়া নিজ গৃহাভিমুখে দ্রুত প্রত্যাগমন করিয়াছে।

বিপক্ষদুর্গ যেস্থানে অবস্থিত সেস্থানে উপস্থিত হইয়াও যদি দুর্গ দৃষ্টিপথবর্ত্তী না হয় তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকদল পিপীলিকাকে চতুর্দ্দিকে দুর্গ নির্ণয়ের জন্য পাঠাইয়া অন্য সমস্ত পিপীলিকা সৈন্য একস্থানে দাঁড়ায়। অগ্রবর্ত্তীগণ তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিক খুঁজিয়া ক্রমে ক্রমে পুনরায় আসিয়া প্রধান পিপীলিকা বাহিনীর সহিত মিলিত হইয়া থাকে। ফোরেল এইরূপ এক সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ একদিন এইভাবে শত্রুগৃহের সন্ধানে ব্যাপৃত দেখিয়াছিলেন। পরদিন ইহারা শত্রু-দুর্গের সন্ধান পাইয়া পথে একটু বিলম্ব না করিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। মাত্র একটি পিপীলিকা শত্রুগৃহের অবস্থান জ্ঞাত থাকিলেই সমুদয় বাহিনীকে সে পরিচালিত করিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। এই কার্য্যে যথেষ্ট সংখ্যক পথপ্রদর্শকের আবশ্যক হয়। প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ই পথ ভ্রান্তি অধিক ঘটিতে দেখা যায়। সমস্ত পিপীলিকাই লুণ্ঠিত দ্রব্যের প্রচুর ভার বহন করিয়া চলে এই নিমিত্ত পথ-প্রদর্শকের প্রতি দৃষ্টি রাখাও তাহাদের পক্ষে কঠিন হয়। কিন্তু বেশী ভ্রান্তি

ঘটে অন্য কারণে। দেখা গিয়াছে, আক্রমণ-কারীরা যে পথে বিপক্ষ দুর্গে প্রবেশ করে, লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়া ফিরিবার সময় প্রায়ই তাহারা সে পথে না ফিরিয়া ভিন্ন পথে দুর্গনিক্রান্ত হইয়া থাকে। এবং ইহাতেই অনেক সময় গন্তব্যপথ হারাইয়া বসে। নিষ্ক্রমণ পথের বিভিন্নতা লক্ষ্য না করিয়া ইহারা ভিন্ন পথবর্ত্তী হইয়া বহুদূরবর্ত্তী অজ্ঞাত প্রদেশে আসিয়া পড়ে। তখন দলে দলে পিপীলিকা চতুর্দ্দিকে পথসন্ধানে ধাবিত হয় এবং জ্ঞাত প্রদেশে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় পিপীলিকা বাহিনী একস্থানে প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

একদিন ফোরেল দেখিলেন কতকগুলি Amazon জাতীয় পিপীলিকা F. Fusca জাতীয় শক্রদুর্গের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রবেশ পথের সন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিছুক্ষণ সন্ধানের পর ইহারা অতিক্ষুদ্র একটি প্রবেশপথ বাহির করিল এবং এক এক জন পিপীলিকা সৈন্য সে পথে শক্রদুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রবেশপথটি সংকীর্ণ বলিয়া অতি ধীরে ধীরে কষ্টে সৃষ্টে সৈন্য চালনা করিতে হইতেছিল। এদিকে কতকগুলি পিপীলিকা অন্য প্রশস্ত দ্বারের সন্ধানেও নিযুক্ত ছিল। কিছুক্ষণ পরে বৃহত্তর একটি প্রবেশ দ্বারের সন্ধান হওয়ায় অবশিষ্ট সৈন্য অল্প আয়াসে অত্যল্পকালমধ্যে বিপক্ষ দুর্গের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হইল; এবং সময়ান্তরে শক্রপক্ষকে পরাজিত করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বহন পূর্ব্বক বিজয়ী পিপীলিকা বাহিনী সগর্ব্বে শক্রগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত *হইয়া আসিল। তাহারা উভয় পথেই* বহির্গত হইয়াছিল এবং প্রত্যেকের মুখেই লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ছিল। বাহিরে আসিয়া সকলে পুনর্ব্বার একস্থানে মিলিত হইয়া বিজয়গর্ব্বে নিজ দুর্গাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

আর একবার ঐকদল Amazon, F. Rufileaıbis জাতীয় পিপীলিকারা দুর্গ আক্রমণ করিতে চলিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে অগ্রবর্ত্তী পিপীলিকারা দেখিতে পাইল তাহাদের অবধারিত সময়ের পূর্ব্বেই তাহারা বিপক্ষ দুর্গের প্রান্ত দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাই তাহারা হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইল এবং কয়েকটি দূত সংবাদ লইয়া গিয়া পশ্চাৎবর্ত্তিদিগকে অতি দ্রুতগতিতে সেস্থানে আনিয়া উপস্থিত করিল। ৩০ সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে সমস্ত সৈন্য একস্থানে আসিয়া মিলিত হইল এবং একযোগে বিপক্ষ দুর্গের উপর পতিত হইল। এদিকে যে অত্যল্পকাল অগ্রবর্ত্তীরা দুর্গের সম্মুখে পশ্চাতের সৈন্যদের আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল সেই সুযোগে শক্রগণ বিপক্ষের আগমন জানিতে পারিয়া অসংখ্য রক্ষী-সাহায্যে দুর্গের বাহির সুরক্ষিত করিয়াছিল। গোপনে আক্রমণ অসম্ভব হওয়ায় আক্রমণ-কারীরা সকলে মিলিয়া একযোগে শক্রদের উপর পতিত হইল।

শীঘ্রই তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল কিন্তু সংখ্যায় অধিক বলিয়া Amazonরাই জয়লাভ করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। বিপক্ষ পিপীলিকারা হাজারে হাজারে দলবদ্ধ হইয়া গুটী ও কীট (larva

and pupa) মুখে করিয়া নিষ্ক্রমণ পথে বহির্গত হইয়া পলায়নপর হইল। কাজেই সে দুর্গে লুণ্ঠন করিবার আর কিছুই রহিল না দেখিয়া, আক্রমণকারীরা যে সামান্য পরিমাণ দ্রব্য লুণ্ঠন করিতে পারিয়াছিল তাহাই মুখে করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। কিন্তু বিপক্ষেরা এতক্ষণে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে তাহারাও পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তনকারী শত্রুদিগের পা টানিয়া লুণ্ঠিত গুটীগুলি কাড়িয়া লইতে চেষ্টান্বিত হইল। পশ্চাৎদিকে আক্রান্ত হওয়ায় Amazonদের বাধ্য হইয়া গুটী ছাড়িয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতে হইল এবং এই সুযোগে আক্রমণকারী গুটী লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। F. Rufilearbis দিগের সৈন্য এত বেশী ছিল যে পশ্চাৎদিক হইতে আক্রান্ত Amazonদিগকে বাধ্য হইয়াই লুণ্ঠিত সামগ্রী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এমনকি কতকগুলি Amazon সৈন্য হতাহতও হইয়াছিল। অবশ্য Rufilearbes দিগের অসংখ্য সৈনিক প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল। প্রত্যাবর্ত্তনের দশ মিনিট পরে বিপক্ষ দুর্গের নিকট আর একটি Amazonও রহিল না। দ্রুতগতিতে পলায়নপর এই সকল পিপীলিকাকে অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া অন্যপক্ষ নিরস্ত হইল। ৩০ সেকেণ্ড বিলম্বের জন্য Amazonদের আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল।

অন্য একবার ফোরেল কতকগুলি গর্ভবতী Amazonকেও সংগ্রামে লিপ্ত হইতে দেখিয়াছিলেন। ইহারাও অসংখ্য শত্রু নিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শত্রুদুর্গ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত এবং লুণ্ঠিত হইয়াছিল! এবং ফিরিবার সময় এবারও ইহারা অধিক সংখ্যক বিজিত জাতির আক্রমণে বিশেষ বিপদাপন্ন হইয়াছিল। উভয় পথেই অসংখ্য সৈন্য হতাহত হইয়াছিল।

আর একবার একদল সৈন্য প্রায় দশগজ স্থান অগ্রসর হইয়াই দুইদলে বিভক্ত হইল। একদল গৃহাভিমুখে ফিরিয়া আসিল এবং অন্য দল অগ্রসর হইয়া চলিল। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই ইহারাও গৃহাভিমুখী হইল। গৃহে আসিয়া দেখিল পূর্ব্বে যে দল ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহারা নূতন পথে অন্য দিকে অভিযান করিয়া চলিয়াছে। ইহারাও তাহাদের অনুসরণ করিল। এবং পুনর্ম্মিলিত সৈন্যবাহিনী ঘুরিয়া ফিরিয়া, স্থানে স্থানে জমিয়া পুনরায় বহুদূর ঘুরিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল। সুতরাং ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে সম্ভবত বিভিন্ন দল বিভিন্ন দুর্গ আক্রমণের পক্ষপাতী ছিল কিম্বা কেহ কেহ আক্রমণের একেবারেই পক্ষপাতী ছিল না। তাই নানা বাদপ্রতিবাদের পর আক্রমণের কল্পনা একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। অথবা শুধু ব্যায়াম গ্রহণের উদ্দেশ্যেও এরূপ যাত্রা করিয়া থাকিতে পারে !

Amazonরা একবার অভিযান আরম্ভ করিলে আর কোনরূপ বাহ্যিক বাধাবিঘ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। ফোরেল ইহাদিগকে পথে জলের উপর দিয়া অভিযান করিতে দেখিয়াছেন। যদিও সেই জলে অনেকেই ডুবিয়া মরিতেছিল। আবার বালুকাময় উচ্চভূমি দিয়াও অভিযান করিতে

দেখিয়াছেন—যদিও প্রবল বাতাসে শত শত সৈনিককে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সহ ফিরিবার সময় প্রচণ্ড বাতাস কিম্বা জলস্রোত কিম্বা বালুরাশি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেও তাহারা তাহাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য ফেলিয়া দেয় না। প্রাণরক্ষা করিতে পারিলে লুণ্ঠন সামগ্রীও সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা পায়।

বৈজ্ঞানিক Lespes বলিতেছেন,—

এই সকল যুদ্ধ কেবল গ্রীষ্মের শেষ ভাগে এবং শরৎকালে সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সময়ে দাস জাতির (F. fusea এবং F. cunicularea) পক্ষোদ্গত পিপীলিকারা প্রভুগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। Amazonদিগের মধ্যেও এই অকর্ম্মণ্য দাসদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া বসাইয়া খাওয়াইবার আগ্রহ মোটেই দেখা যায় না। আকাশ যেদিন বেশ পরিষ্কার থাকে সেদিন amazon দস্যুরা অপরাহ্ণ ৪টা ৫টার সময় নিজেদের দুর্গ হইতে বহির্গত হইতে আরম্ভ করে। প্রথম প্রথম ইহাদের গতি কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়মে পরিচালিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু সকলে একত্রিত হইলে— তাহারা সারি বাঁধিয়া দ্রুতগতিতে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এক একদিন তাহারা এক এক দিকে অভিযান করে। পরস্পর খুব ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থায় অবস্থিত থাকে এবং সম্মুখবর্ত্তীরা সর্ব্বদাই কিছু অনুসন্ধান করিতে করিতে চলিয়াছে এইরূপ মনে হয়। মুহূর্ত্তে এই অগ্রবর্ত্তীদের স্থান নূতন পিপীলিকা আসিয়া অধিকার করে, এবং এইরূপে ক্রমাগত ইহাদের দলপতি পরিবর্ত্তিত হইয়া চলে। দাসজাতীয় পিপীলিকার কোনপ্রকার সংবাদ ও সন্ধান পাইবার উদ্দেশ্যেই ইহারা এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে—ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ ঘ্রাণ দ্বারাই ইহারা এইরূপ অজানা শত্রুদুর্গে গমন করে। শিকারী কুকুরের বন্যজন্তু সন্ধানের ন্যায় ইহারাও পথ ঘ্রাণ করিতে করিতেই সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়—এবং একবার শত্রুর চলাফেরার সন্ধান পাইলেই অতি দ্রুতগতিতে শত্রু দুর্গাভিমুখে ধাবিত হয়। ক্ষুদ্রতম সৈন্যদলেও কয়েকশত পিপীলিকাসৈন্য অবস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। তাহাছাড়া ইহার চতুর্গুণ—পঞ্চগুণ বৃহৎ সৈন্যবাহিনীও নয়নগোচর হইয়াছে। শত্রুদুর্গের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া ইহারা যেরূপ ভাবে ব্যূহ রচনা করিয়া দাঁড়ায় তাহা সাধারণতঃ লম্বায় ৫ মিটার ও প্রশস্তে ৫০ সেণ্টমিটার পরিমিত। * * দাস জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী F. Cuniculariaরা অসম সাহসের সহিত আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করিয়া থাকে। কিন্তু Amazonদের দুর্দ্ধর্ষতার বিরুদ্ধে কিছুক্ষণ সংগ্রাম করিয়াই ইহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। Amazonরা তখন জয়গর্ব্বে শত্রুদুর্গের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া লুণ্ঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করে—এবং কিছুক্ষণ মধ্যে ঈপ্সিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া গৃহের বহির্ভাগে আগমন করে। Amazonরা বৃক্ষারোহণ করিতে জানে না—একথা অবগত থাকায়—বিজিত সৈন্যেরা দলে দলে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উহাদের নিকট হইতে যথাসাধ্য গুটী

ও কীট গুলিকে ছিনাইয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী বৃক্ষলতাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। Amazonরা কিন্তু ইহাদের প্রতি ফিরিয়াও চায় না। তাহারা লুণ্ঠন দ্রব্য সহ যত শীঘ্র সম্ভব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকে। গৃহে আসিয়াই ইহারা গুটী কীট গুলিকে দাসদাসীদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। তখন আর সেগুলির ভরণপোষণ রক্ষণাবেক্ষণের কথা ভুলিয়াও মনে করে না।

Bchner অন্যত্র বলিতেছেন,—Amazon দিগের সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক শত্রু, Sanguinea জাতীয় পিপীলিকা। ইহারাও দাসদাসী প্রতিপালন করিয়া থাকে—এবং এই সূত্রে প্রায়ই Amazonদের সঙ্গে ইহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যুদ্ধকৌশলে কিম্বা শারীরিক বলে ইহারা Amazonদের সমকক্ষ নয়—কিন্তু ইহাদের বুদ্ধিবল অসাধারণ। ফোরেল বলেন—'পিপীলিকা জাতির মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান।'

একবার F. Fuscaদের গৃহ লুণ্ঠন উদ্দেশ্যে একদল Amazen অভিযান করিয়া চলিয়াছিল;—শত্রুদুর্গে পৌছিবার পূর্ব্বেই ফোরেল তাহাদের সম্মুখে এক ছালা Sanguinea জাতীয় পিপীলিকা ঢালিয়া ফেলিলেন। ফল এইরূপ দাঁড়াইল:—

Sanguineরা অমিত তেজে শত্রু দুর্গ আক্রমণ করায় fuseaরা আত্মরক্ষার জন্য দলে দলে দুর্গ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে অগ্রবর্ত্তী Amazonরাও আসিয়া উপস্থিত হইল। Sanguinineaদের দেখিয়া ইহারা পশ্চাৎ ফিরিয়া সমগ্র বাহিনীর আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল। পশ্চাৎবর্ত্তীরা এই সংবাদে বিশেষ বিচলিত হইয়াছে—এইরূপ বোধ হইল। যাহা হউক ইহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া শত্রুর প্রতি ধাবমান হইল। Sanguinineরাও একত্র হইয়া প্রথম আক্রমণ প্রতিরোধ করিল। Amazonরা সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া পুনরায় আক্রমণ করিল এবং একেবারে শত্রু সৈন্যের ভিতর যাইয়া উপস্থিত হইল।

ফোরেল কতকগুলি F. Pratansis জাতীয় পিপীলিকাকেও সংগ্রামে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ Amazonদের আক্রমণে সকলকেই পরাজিত হইতে হইল। বিজয়ীরা কিছুক্ষণ যুদ্ধস্থলে অপেক্ষা করিয়াই দুর্গাভ্যন্তরে লুণ্ঠনের অনুসন্ধানে প্রবিষ্ট হইল। কয়েকটী Amazon সৈন্য এতদূর উত্তেজিত ও ক্রোধান্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে উহারা দুর্গাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না হইয়া পলায়নতৎপর বিজিত fusea, pratensis এবং Sanguinea এই তিন জাতীয় পিপীলিকাদের যাহাকে সম্মুখে পাইল বধ করিতে লাগিল।

আক্রান্ত পরাজিত ও লুণ্ঠিত rufilearbes জাতীয় পিপীলিকারা এত মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহারা লুণ্ঠনকারীদিগকে তাহাদের গৃহ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিল; এবং Amazonদিগকেও ইহাদিগের আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত বিব্রত হইতে হইয়াছিল। শতে শতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও rufilearbesরা নিরস্ত হয় নাই—মনে হয় ইহারা মৃত্যুকে বরণ করিয়াই যেন

সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল। শত্রুর আক্রমণে কতকগুলি Amazonও মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এইযুদ্ধে Amazonদের দুর্গস্থিত rufilearbes জাতীয় দাস পিপীলিকারাও লিপ্ত হইয়াছিল এবং প্রভুদের গৃহ ও প্রাণ রক্ষা কল্পে স্বজাতীয় পিপীলিকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

প্রাচীন ভারতে ক্রমবিবর্ত্তন বাদ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়, কার্ত্তিক মাসের ভারতীতে "বৈজ্ঞানিক জীবনী" নামক প্রবন্ধে, "প্রাচীন ভারতে ক্রম বিবর্ত্তনবাদ" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "ডারুইনের থিওরির ন্যায় বানর হইতে মানুষ হওয়া পুরাণেরও মত।" তিনি বিষ্ণু পুরাণের উল্লেখে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ শ্লোক বিষ্ণু পুরাণে পাইলাম না। অন্যত্র এই শ্লোকটী অন্য আকারে আছে। তাহাতে "চতুর্লক্ষং য বানরাঃ" নাই। নিবন্ধ ধৃত বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণে আছে, "চতুর্লক্ষং য মানুষাঃ", এবং কর্ম্মবিপাকে আছে, "চতুর্লক্ষং য মানবাঃ।" অতএব "বানরাঃ" পাঠ ঠিক নহে, "মানুষাঃ" বা "মানবাঃ" পাঠ হইবে। এ পাঠে ডারুইনের মতের সহিত পুরাণের পাঠের ঐক্য হয় না।

ডারুইন বলিয়াছেন, "বানর" হইতে "মানুষ" হইয়াছে, কিন্তু পুরাণমতে বানর পৃথক এবং মানুষ পৃথক বংশ সম্ভূত"। পৃথিবীর পুরাতত্ব, "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্বে" একথা আমি উত্তমরূপে প্রমাণ করিয়াছি। তাহা পাঠ করিলে ডারুইনের মতসমর্থনকারী লোকের মত পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। প্রবন্ধ বিস্তৃতি ভয়ে এখানে সবিস্তার লিখিলাম না। আমি প্রমাণ করিয়াছি, সৃষ্টির প্রথম হইতেই দুই শ্রেণীর প্রাণী আছে—একের পরিণতি মানুষ, অপরের পরিণতি বানর বা বনমানুষ!

(১) ক। আবরণ শূন্য কীট।
খ। কঠিন আবরণ যুক্ত শম্বুকাদি।
(২) ক। আঁইস শূন্য মৎস্য।
খ। আঁইস যুক্ত মৎস্য।
(৩) ক। শল্ক শূন্য সরীসৃপ।
খ। শল্ক যুক্ত সরীসৃপ।
(৪) ক। পালক শূন্য পাখী। যথা—বাদুড়।
খ। পালক যুক্ত পাখী।
(৫) ক। বিরল লোমা স্তন্যপায়ী।
খ। লোমশ স্তন্যপায়ী।
(৬) ক। বিরল লোমা নরসিংহ।
খ। লোমশ বানর।
(৭) ক। নরসিংহের উচ্চ সংস্করণ মানুষ।
খ। বানরের উচ্চ সংস্করণ বনমানুষ। *

শ্রীবিনোদ বিহারী রায়

* পৃথিবীর পুরাতত্ত্বে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্ত্ব ৮৮ পৃষ্ঠা।

(১৫)

বহুকাল পরে সব কয়টা পাশের এগজামিন দিয়া বিপিন বাড়ী আসিতেছে। বাড়ীর সকলেই উৎসুক চিত্তে বিপিনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। গিন্নির মন আজ মাতৃগর্ব্বে প্রসন্ন ভরপূর। তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন এই ফাল্গুন মাসের মধ্যেই প্রচুর উৎসবের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে তাঁহার বধূ-সহিত পুত্রকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিবেন, আজিকার এ উৎসব তাহারই পূর্ব্ব-সূচনা। গিন্নির আনন্দে আজ সবাই আনন্দিত। রোহিণী আজ অকারণে চেঁচাইয়া হাট বাধাইতেছিল। বাড়ীর বৌ-ঝিরাও অতিরিক্ত ঔৎসুক্যে আপনাদের আগ্রহ দমন করিতে পারিতেছিল না।

এই আনন্দ উল্লাসের মধ্যে দুটি লোকের মন দ্বিধান্বিত হইয়া ছিল—সে খুড়িমার ও মালতীর! বিপিনের আগমনের আনন্দে তাঁহারা সকলের সহিত এক হইয়া যোগ দিবেন, কি একান্তে থাকিবেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলেন না। সকলের আনন্দে যোগ দিতে গেলেই লোকের বিরক্তি উৎপাদন করিবেন, না, একান্তে থাকিলেই লোকের অন্যায় বোধ হইবে, ইহা তাঁহারা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। খুড়িমা বিপিনকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। তাহার আগমনে খুড়িমার হৃদয় আপনা হইতেই চাহিতেছিল তাহাকে সকলের আগে আশীর্ব্বাদ করিবে—বিপিন তাঁহার অদিনে যে উপকার করিয়াছে তাহা ত ভুলিবার নহে। কিন্তু তাঁহার সহজ আচরণের পথে অন্তরায় জুটিয়াছিল মালতী। তাহাকে লইয়া পাছে আবার নূতন গণ্ডগোল হয় এই ভয়ে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে-ছিলেন। মালতীকে লইয়া তিনি সকলের আনন্দে যোগ দিতে পারেন না, আবার মালতীকে সঙ্গে না লইয়া একাকী যাওয়াও ভালো দেখায় না—খুড়িমার পক্ষে ইহাই মহা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছিল।

মালতীর অন্তরে সুখ ও সঙ্কোচের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। নবকিশোর বলিয়াছিল বিপিন আসিলেই তাহার সকল দুঃখ যন্ত্রণা ঘুচিবে। সেই তাহার সুহৃঃসহ-দুঃখ-ত্রাতা বন্ধু আজ আসিতেছে। তাহাকে দেখিবার দারুণ কৌতূহল মালতীকে পীড়া দিতেছিল। সে যে মনে মনে একটি কল্পিত মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিয়াছে তাহার সহিত বাস্তবকে মিলাইয়া দেখিতে সাধ হইতেছিল। কিন্তু তাহার ভয় হইতেছিল পাছে লোকে আবার কিছু বলে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে খুড়িমা স্থির করিলেন মালতীকে সঙ্গে লইয়াই সকলের সহিত কিন্তু সকলের পশ্চাতে থাকিয়া বিপিনের অভ্যর্থনায় যোগ দিবেন এবং বিপিন বাড়ীতে প্রবেশ করিলে গোলমালের মধ্যে মালতীকে লইয়া তিনি সরিয়া আসিবেন।

খুড়িমা মালতীকে বলিলেন—ওলো শুনচিস, চ নীচে যাই, বিপিন আসচে আজ

শুনেছিস্? সকলে যেখানে বিপিনের জন্তে অপেক্ষা করে রয়েছে সেখেনে আমাদের না গেলে ভালো দেখাবে না। কিন্তু শুনচিস, তুই সকলের পেছনে থাকবি, বুঝলি? অমন প্যাট প্যাট করে তাকাচ্ছিস কেন? তখন যেন অমনি হাঁ করে তাকিয়ে থাকিস নে। আর আমি যেই ডাকব অমনি চলে আসবি, বুঝলি?......আ মর পোড়ারমুখী, বাক্যি একেবারে হরে গেছে নাকি, যে, মুখে একটা হাঁ না জবাব নেই। যাও, এখন মুখের ওপর ঘোমটাটা একটু টেনে দাও......নাঃ বাপু তোকে নিয়ে আমি পারব না। একটা কথা কি তোর শুনতে নেই ছাই!

মালতী বলিল—আমি এক গলা ঘোমটা দিতে পারব না, সে আমার ভারি লজ্জা করে।

—আ মরি! ঘোমটা দিতে লজ্জা করে, আর মুখ দেখাতে লজ্জা করে না—কি যে কথার ছিরি! যা খুসি করগে যা, মরগে যা।—বলিয়া খুড়িমা বেগে প্রস্থান করিলেন। মালতী ধীরমন্থর গমনে তাঁহার পশ্চাতে চলিয়া গেল।

তখন গিন্নি খুড়িমা ও মালতীর কথাই জয়াকে বলিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন—দেখেছ জয়াঠাকুরঝি ছোট বৌটার একবার আক্কেল। আজকে আমার বিপিন বাড়ী ফিরে আসছে, আজকেও কিনা বোনঝিকে নিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকা হয়েছে।

জয়া বড় চালাক মেয়ে সে খোসামোদ দিয়া গিন্নির দুর্ব্বল প্রকৃতিকে আপনার শত অনাচার অত্যার একেবারে ভুলাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু গিন্নির কথা শুনিয়া এখন সে ঠিক ধরিতে পারিল না গিন্নির মনের বাতাস কোনমুখো বহিতেছে এবং কোন্ মুখো দাঁড়াইয়া সে কটুকাটব্যের ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিবে। আন্দাজ একটু ভুল হইলে নিজের হাতের ত্যক্ত ধূলি নিজের চোখেই পড়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে এবং তাহার পরিণাম যে চোখের জল সেটা জয়ার বিলক্ষণ জানা ছিল। তাই সে আমতা-আমতা করিয়া বলিল—তাই ত তাই ত ছোটবৌকে দেখছিনে বটে!

এমন সময় খুড়িমা আসিয়া দূরে দাঁড়াইলেন। গিন্নি তাঁহাকে দেখিয়া চুপি চুপি জয়াকে বলিলেন—দেখছিস্ জয়া ঠাকুরঝি, বিপিন আসছে উদ্দেশেই কোটর ছেড়ে বেরিয়েছেন। কিন্তু বিপিনকে পেলেন কোথা থেকে? সে এই আমা হতেই ত?

জয়া গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তা ত বটেই! তুমি আগে না বিপিন আগে। তুমিই ত হলে সকলকার গোড়া। আহা, বাবা আমার মাথার চুলের মতন পেরমাই পাক।· দেখেছ দিদি, মালতী মেমও বেরিয়েছেন। মুখের ওপর একরত্তি ঘোমটা নেই। ইচ্ছেটা রূপ দেখিয়ে বিপিনকে বশ করবেন।

গিন্নি মালতীর দিকে ফিরিয়া দেখিলেন সেই বিষণ্ণ মুখশ্রীর মধ্যে কোথাও চঞ্চলতা চটুলতা নাই; সংযমের একটি ব্রীড়া মুখমণ্ডলে মাখানো রহিয়াছে; চোখদুটি যেন লজ্জার ভারে ভাঙিয়া পড়িতেছে। গিন্নির তখন মনে হইল এর চেয়ে বড় ঘোমটা বুঝি আর নাই। তখন তিনি জয়াকে

একটু খোঁচা দিয়া বলিলেন—বিপিন আমার তেমন ছেলে নয়; সে তার বাপের ধারা একটুও পায়নি।

জয়া এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে লজ্জিত হইয়া এই গ্লানি চাপা দিবার জন্য যখন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন তাহাকে অব্যাহতি দিয়া বাহিরে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে বন্দুক ও বোম আওয়াজ হইল এবং রোহিণী হাততালি দিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল—দাদা বাবু এসতেছে! দাদাবাবু এসতেছে!

গিন্নি অমনি চীৎকার করিতে লাগিলেন—ওরে ওখানে শূন্যকলসী রাখলে কে? সরা সরা…না না, ভরে দে, ভরে দে। …আ মর, সব ন্যাকা যেন, সবাই মিলে তাল পাকিয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল…শীগগির কর না, বিপিন এসে পড়বে যে।

পাঁচ-সাতজন চাকরদাসী শূন্য কলসী ভরিতে ছুটিল। অন্যান্য সকলে বিপিনের আগমন-প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া স্থানে স্থানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিপিন স্মিতমুখে উঠানে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই বিনি দৌড়িয়া গিয়া বিপিনের হাঁটু দুটি জড়াইয়া ধরিল; বিনোদও দুই লাফে অগ্রসর হইয়া দাদার হাতখানিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিল—'ওরে দাদা এসেছে রে! দাদা এসেছে রে!' বিনিও দাদার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে লাগিল—ওলে দাদা এচেচে লে! দাদা এচেচে লে!

বিপিন স্মিতমুখে বিনি ও বিনোদের মুখ-চুম্বন করিয়া বিনিকে বুকে তুলিয়া লইল এবং বিনোদের হাত ধরিয়া মাকে প্রণাম করিতে গেল। গিন্নি ব্যস্তভাবে তাহার প্রণামে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—আরে বোকা ছেলে, রোস্ রোস্! আগে পূর্ণঘটকে পেন্নাম করে ঠাকুরকে পেন্নাম কর, তবে ত আমার পেন্নাম করবি।

বিপিন হাসিয়া বলিল—তোমার চেয়ে আমার বড় ঠাকুর আর কেউ নেই মা। ঠাকুর আমার মাথায় থাকুন, তোমার ত আগে প্রণাম করি।

গিন্নি প্রসন্ন হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তোরা সব এখন ইংরিজি পড়ে খ্রিষ্টান হয়ে গেছিস। তবু আমরা যে-কদিন আছি আমাদের মতেই একটু চলিস।

বিপিন হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, কি করতে হবে চটপট বল সেরে নি, তুমি আমার প্রণামটাকে মুলতুবি রেখে একেবারে জুড়িয়ে দিচ্ছ। কি করতে হবে বল।

গিন্নি ঘট দেখাইয়া বলিলেন—এই পূর্ণ ঘটকে পেন্নাম কর, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

বিপিন বলিল—না মা, ঐ সব যা-তাকে প্রণাম করা আমার দিয়ে হবে না। আমি ও ঘট ফটকে প্রণাম করব না। আমি তোমাকেই প্রণাম করি।

বিপিন মাতার পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া মাতার পায়ের ধুলা মাথায় লইল। গিন্নি স্মিতমুখে স্নেহের অনুযোগ করিয়া বলিলেন—তুই কি মা ছাড়া আর কিছু জানবি নে?—এবং তারপর বিপিনের দাড়িতে হাত দিয়া নিজের হস্ত চুম্বন করিয়া বলিলেন—বৌ ঘরে এলে দেখব, কেমন তখন মাকে মনে থাকে।

বিপিন হাসিয়া বলিল—সে রকম আশঙ্কা আছে বলেই ত বৌকে ঘরে আমল দিই নি।

বিবাহের কথা উঠিতেই বিপিনের মালতীকে মনে পড়িল। বিপিন চারিদিকে একবার চোখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, খুড়িমা কৈ?

গিন্নিও চারিদিকে চাহিয়া খুড়িমাকে না দেখিয়া বলিলেন—এই ত ছিল। কোথায় গেল আবার? বোনঝিকে নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে বুঝি! যা ত রোহিণী, ডেকে আনগে ত।

বিপিন বাধা দিয়া বলিল—না রোহিণী, ডাকতে হবে না, আমিই যাচ্ছি।

গিন্নি বারণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু খুড়িমার প্রতি বিপিনের টান দেখিয়া তাঁহার মন একটু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

জয়া মনে করিয়াছিল বিপিন তাহাকে একটা প্রণাম করিবে, কিন্তু তাহার কোনো সম্ভাবনা না দেখিয়া খুড়িমার সৌভাগ্যে সেও ঈর্ষাক্ষুণ্ণ হইল।

বিপিন খুড়িমার উদ্দেশে প্রস্থান করিলে ছেলে মেয়ে বৌ ঝি সকলেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। আজ বিপিনকে সবিস্ময় আনন্দে দেখিয়া দেখিয়া কাহারো তৃপ্তি হইতেছিল না। আজ যেন সে নূতন হইয়া সকলের নিকট ফিরিয়াছে।

বিপিন খুড়িমার ঘরের নিকটে গিয়াই ডাকিল—খুড়িমা!

খুড়িমা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—এস বাবা এস!

বিপিন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া খুড়িমার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। খুড়িমা উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ অতিকষ্টে অবরুদ্ধ করিয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—প্রাতঃবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও বাবা।

মালতীকে দেখিবার জন্ত বিপিনের কৌতূহল তাহাকে তাগিদ ও পীড়া দিতেছিল। তাই সে হাসিয়া বলিল,—খুড়িমা ঘরে চল, দরজা থেকেই বিদায় করবে নাকি?

খুড়িমা অপ্রস্তুত ও বিব্রত হইয়া বলিলেন—এস বাবা এস। কিন্তু তুমি এখানে দেরি করলে দিদি যে রাগ করবেন।

—তা হয় ত একটু করবেন। মায়ের রাগ ভুলিয়ে দিতে কতক্ষণ?—বলিয়াই বিপিন ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরে প্রবেশ করিতেই বিপিন দেখিল একটি অপরূপ রূপসী নিরাভরণা তরুণী একপাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিপিনকে দেখিবামাত্রই তাহার দৃষ্টি লজ্জা কৌতূহলে চঞ্চল উজ্জ্বল হইয়া তাহার সৌন্দর্য্যের মোমবাতিতে যেন শিখা জ্বালিয়া তুলিল।

বিপিন মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল—এই মালতী! এত সুন্দর! এমন রূপ ত সে কল্পনাতেও গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। তাহার চোখ দুটি যেন শরতের আকাশ-কাটা টুকরা, তাহার গালদুটি যেন গোলাপের পাপড়ি, মুখটি যেন ডালিমের ফুল, বর্ণে যেন শুক্তির লাবণ্য! সে যেন মূর্ত্তিমতী উষা! সাক্ষাৎ বসন্তশ্রী!

বিপিন ও মালতীর চার চোখ এক হইল। বিপিনের স্বচ্ছ উদার দৃষ্টি সবিস্ময় প্রশংসায় ভরিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া মালতীর নরম-কোমল দৃষ্টি নত হইয়া পড়িল। তাহার

মুখের উপর স্মিতরেখা ফুটিয়া উঠিল। বিপিন দেখিল সেই নিখুঁত মুখখানিতে সেই হাসিটি বিশ্বশিল্পীর চরমনিপুণতার তুলিকাপাত।

বিপিনকে দেখিয়া মালতীরও মন প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সে দেখিল বিপিন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মাঝারি আকারের মানুষটি; মুখশ্রী তাহার অতি কোমল, প্রিয়দর্শন প্রশান্ত হাস্যময়; চোখদুটি করুণা সরলতায় সর্ব্বদাই টলটল ছলছল করিতেছে; তাহার স্বচ্ছ দৃষ্টির ভিতর দিয়া তাহার কোমল প্রকৃতি উঁকি মারিয়া যাইতেছে; তাহার উন্নত নাসিকা যেন অল্পেই অভিমানে স্ফুরিত হইয়া উঠে; ললাট তাহার জ্ঞানের দীপ্তিতে উজ্জ্বল; সে বেশভূষাতে ফিটফাট, পায়ের নখটি হইতে কুঞ্চিত কেশের বিন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত পরিপাটী। বিপিনের বাহিরটি যেন তাহার অন্তরেরই দর্পণ। বিপিনকে পরমাত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিতে মালতীর চোখের দেখা ছাড়া দ্বিতীয় প্রমাণের আর অপেক্ষা রহিল না। দুটি তরুণ হৃদয় প্রথম সাক্ষাতের আনন্দেই পরস্পরের অভিমুখ হইয়া উঠিল।

বিপিন ও মালতীর এই দৃষ্টি বিনিময় খুড়িমার দৃষ্টি এড়াইল না। খুড়িমা ইহাতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। মালতী বিপিনকে দেখিবার জন্য যেই দ্বিতীয় বার মাথা তুলিয়াছে অমনি খুড়িমার রূঢ় দৃষ্টি তাহাকে সচেতন করিয়া দিল। এই তিরস্কার বিপিনেরও অগোচর রহিল না।

মালতী ঘর হইতে প্রস্থান কবিবার জন্য দ্বারের দিকে গমন করিল। বিপিন অমনি 'এখন মার কাছে যাই' বলিয়া হঠাৎ অপর দিকের দ্বারের দিকে চলিয়া গেল।

প্রকাণ্ড ঘরের দুই প্রান্তের দুই দ্বারের কাছে আসিয়া মালতী ও বিপিন উভয়েই একবার ফিরিয়া চাহিল। আবার তাহাদের দৃষ্টি-বিনিময় হইল। মালতী তাহার ডাগর চোখের দীর্ঘবক্র পক্ষ্মজালের মধ্য দিয়া বিপিনের দিকে স্নিগ্ধ করুণ সরমনম্র দৃষ্টিতে এমন ভাবে চাহিল যেন আজ সে বিপিনের মধ্যে নিজের আশ্রয়, নিজের সান্ত্বনা, নিজের বন্ধুকে দেখিতে পাইয়াছে। তারপর মালতী দ্বারের বাহিরে দণ্ডায়মানা পুরনারীদের ভিড়ের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

এই একটি চকিত দৃষ্টি দিয়া বিপিনও দেখিয়া লইল মালতীর দৃষ্টি যেন একটি তীক্ষ্ণ আত্মীয়তার পরিচয় জানাইয়া গেল। মালতীর সর্ব্ব-অবয়বে যৌবনের উচ্ছ্বসিত আনন্দ দীপ্যমান; জলস্রোতে জ্যোৎস্নাপাতের মতো একটি সম্ভ্রমসংযত সজীবতা তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে। তাহার লজ্জা দিয়া এই ঢলঢল লাবণ্যরাশি ঢাকিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া কাচের আবরণে তড়িৎশিখার মতো তাহা ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টিতে হাসিতে তনুলতার হিল্লোলে চকিত হইয়া উঠিতেছিল।

বিপিন মুগ্ধ হইয়া ফিরিল। আতপক্লান্ত দৃষ্টির সম্মুখে যেমন শত সূর্য্যের ছবি নাচিতে থাকে, বিশ্বচরাচর কম্পিত হইতে থাকে, তেমনি বিপিনের অন্তরে বাহিরে মালতীর রূপচ্ছবি ভরিয়া উঠিল। বিপিন যাইতে যাইতে আবার মুখ ফিরাইল, কিন্তু আর মালতীকে দেখিতে পাইল না।

বিপিনের এই এতক্ষণের প্রসন্ন মুখ সহসা এক মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া উঠিল। মালতীর সঙ্গে কেমন করিয়া পরিচয় করা

বার এই চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসিল। বিপিনের মনে হইল এই তরুণী বিপিনেরই পরিজন দ্বারা অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত, সে এই এতবড় পরিবারের সহিত সম্পর্কশূন্য একাকী। সমবেদনায় বিপিনের চিত্ত ভরিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল এই-সব সেকেলে ধরণের লোকেদের সঙ্গে তাহারও ত বনিবে না, নিজের পরিবারে সেও ত নিঃসঙ্গ একাকী। যদি সে কোনো প্রকারে মালতীর সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ করিয়া লইতে পারে তাহা হইলে মালতীও সঙ্গ পায়, সেও সঙ্গ পাইয়া বাঁচে। এই পরিচয়ের মধ্যে উভয়েরই স্বার্থ আছে—এ বাড়ীতে টিকিয়া থাকিতে হইলে তাহাদের উভয়ের পরিচয় হওয়াই আবশ্যক।

বিপিন মালতীর সহিত আলাপ পাতাইবার শতেক উপায় উদ্ভাবন করিল কিন্তু কোনোটাই মনঃপূত হইল না। কেবলি মনে হইতে লাগিল সব চেয়ে যেটি ভালো অথচ সহজ উপায় সেটি নবকিশোর ফাঁকি দিয়া প্রথমেই আত্মসাৎ করিয়া খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। হায় হায়! সেদিন যদি বিপিন নবকিশোরের সঙ্গে মালতীর বাড়ীতে যাইত তাহা হইলে মালতীর সহিত পরিচয় ত তাহার হইয়াই থাকিত, আজ আর আলাপের উপায় খুঁজিতে এমন করিয়া মাথা ঘামাইতে হইত না। কেন তাহার অমন কুবুদ্ধি ঘটিয়াছিল! ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে হইতে লাগিল নবকিশোর যেন ঠকাইয়া তাহার আগে মালতীর সহিত পরিচয় করিয়া লইয়াছে। বিপিন নিজের কাছে স্বীকার না করিলেও নবকিশোরের সৌভাগ্যে তাহার মন ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ভাবপ্রবণ বিপিন ভাবের ঝোঁকে এমনি করিয়াই নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। ভাবজাল বিস্তার করিয়া মালতীকে ধরিবার জন্য যতই সে ফন্দি আঁটিতেছিল নিজেই তত জড়াইয়া গিয়া নির্গমনের পন্থা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। মালতীর সহিত আলাপ করিবার জন্য যতই বেশি ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছিল ততই তাহার নিকট সকল উপায়ই অতিমাত্র বিসদৃশ ও লজ্জাজনক বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার মন্ত্রী নবকিশোরের শরণ লইলে সকল সমস্যার হয়ত সহজেই সমাধান হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু নবকিশোরের অনায়াস-সফলতা তাহার এই দুষ্কর প্রয়াসকে উপহাস করিবে মনে করিয়া লজ্জায় বিপিন কিছুতেই নবকিশোরের পরামর্শ লইতে মনকে স্বীকার করাইতে পারিল না।

বিপিন যখন খুড়িমার ঘর হইতে ফিরিয়া আসিল তখন এ বিপিন যেন আর সে বিপিন নহে; যে হাসিমুখে গিয়াছিল, সে আঁধার মুখে ফিরিয়া আসিল দেখিয়া নানা জনে নানা রূপ জল্পনা করিতে লাগিল। গিন্নি মনে করিলেন নিশ্চয় ছোটবৌ তাঁহার নামে তাঁহার ছেলের কাছে একখানা কথা সাতখানা করিয়া লাগাইয়া ছেলের মন ভারী করিয়া দিয়াছে। অপর সকলে ভাবিল নিশ্চয় ঐ ডাইনি ছুঁড়ি গুণ করিয়াছে।

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গিন্নি খুড়িমাকে বেশ দশকথা ঝালঝাল শুনাইয়া দিলেন। বিপিন যে একবাড়ী লোকের সাক্ষাতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া গেছে খুড়িমার অশ্রুজলসিক্ত ঐ কৈফিয়ৎ গিন্নিকে কিছুতেই নিঃসন্দেহ করিতে পারিল না। পুরস্ত্রীরা মিলিয়া মালতীকে উঠিতে বসিতে কটু কথায় ত্যক্ত করিয়া তুলিল। মালতী কিন্তু নীরবেই সকল অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া যাইতে লাগিল।

তিন চারিদিন বিপিন বাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু সেই প্রথম দর্শনের পর মালতীকে দেখিতে পাওয়ার সৌভাগ্য তাহার আর হয় নাই। তাহার মন বিরস হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম সাক্ষাতের পরই সে ভাবিয়াছিল যাদুকরের মায়াতরুর মতো তাহাদের প্রণয়বীজ এক মুহূর্ত্তেই অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিবে এবং সেই পুষ্প লইয়া একটি চিরকিশোর দেবতা যে শর তৈরি করিবে তাহার আঘাত সে একাই সহ্য করিবে না, তাহার আঘাতে ব্যস্ত হইয়া মালতীও এখন হইতে কোনো-না-কোনো ছুতায় ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাকে দেখা দিবে। বিপিন দেখিল যে, সে ভুল বুঝিয়াছিল—মালতী বিপিনের ত্রিসীমানা মাড়ায় না, বিপিনের অনাবশ্যক যাতায়াতের পথেও দৈবাৎ একবার দেখা দেয় না। ঘন ঘন খুড়িমার ঘরের দিকে যাইতে বিপিন নিজের কাছেই লজ্জা অনুভব করে বলিয়াই তাহার মনে হয় অপরেও বুঝি তাহার ছল বুঝিতে পারিতেছে। তাহার আর যাওয়া হয় না। যদি বা কখনো বিশেষ চেষ্টার পর সে খুড়িমার ঘরে যায় তথাপি সেখানে মালতীকে সে দেখিতে পায় না, মালতী তাহার সাড়া পাইলেই সেখান হইতে সরিয়া যায়। যে খুড়িমার ঘর আগে তাহার সমস্ত দিনের আশ্রয় ছিল, সেই খুড়িমার ঘরেও অধিকক্ষণ বিলম্ব করার তাহার আর জো নাই—সে খুড়িমার ঘরে গেলেই খুড়িমা কেমন বিষণ্ণ সন্ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাহাকে গম্ভীর ভাবে বলেন—আমার ঘরে তুমি ঘন ঘন এস না বাবা, দিদি রাগ করে' আমার আবার খোয়ার করবেন।—ইহার পর তাঁহার ঘরে বিলম্ব করা বিপিনের পক্ষে সম্ভব হইত না। তাহার স্নেহময়ী খুড়িমার এই নিষ্ঠুর পরিবর্ত্তনের কারণ অনুমান করিতে পারিলেও সে বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিত।

(১৬)

মিলনের পথে বাধা পাইয়া পাইয়া একগুঁয়ে ভাবপ্রবণ বিপিন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু তাহাকে দমন করিয়া রাখিয়াছিল মালতীর অতিসাবধান ব্যবহার। মালতী যে সাধ্যপক্ষে বিপিনের সম্মুখে দেখা দিতেছিল না, এবং হঠাৎ সামনে পড়িয়া গেলেও খুব কুণ্ঠিত সম্ভ্রমে সরিয়া যাইত, তাহাতে বিপিন একটু নিরুৎসাহিতই হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহার চৈতন্য হইতে লাগিল যে, মালতী বিধবা; বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বিপিনের নিজের মত যাহাই হোক না কেন, একজন বিধবার মতামত না জানিয়া তাহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করা, তাহাকে অপমান করারই নামান্তর। তাহা ছাড়া মালতী তাহাদেরই আশ্রিত; এমন অবস্থায় বিপিনের দিক হইতে কিছুমাত্র অসংযত

ব্যবহার বা প্রগল্‌ভতা অবস্থার সুবিধা পাইয়া মালতীকে জালে জড়াইবার চেষ্টা বলিয়া মালতীর মনে হইতে পারে; মালতী স্বাধীন স্বতন্ত্র হইলে বিপিন যতখানি অসঙ্কোচে তাহার কাছে আপনার অভিলাষ প্রকাশ করিতে পারিত, মালতী তাহার নিতান্ত হাতের মুঠার ভিতর আটক আছে বলিয়া সেরূপ করিবার উপায় বিপিনের মোটেই নাই। অধিকন্তু বিপিনের পরিজনেরা মালতীর প্রতি যেরূপ প্রতিকূল হইয়া আছে, তাহাতে এক্ষণে একটুমাত্রও ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটিলে মালতীর উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করারই কারণ হইবে। তখন বিপিন সবলে আপনাকে দমন করিতে লাগিল। আপনার উদ্দাম আবেগ দমন করিবার জন্য বল-প্রয়োগ করিতে করিতে বিপিন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। সে আপনাকে নিরাশ্রয় দুর্ব্বল মনে করিতে লাগিল। এগজামিন দেওয়ার বিষম ব্যস্ততার পরে একেবারে নিকর্ম্মা হইয়া একেই বিপিনের ফাঁকা ফাঁকা লাগিতেছিল, তাহার উপর এই দুর্বিপাক উপস্থিত। এখন সে নিজেকে কোনো একটা কাজে লিপ্ত করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

তখন বিপিনের মনে পড়িল কলিকাতা হইতে আসিবার সময় নবকিশোরের সঙ্গে পরামর্শ স্থির করিয়া আসিয়াছে যে তাহার পরিবারস্থ সকল স্ত্রীলোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য একটি পাঠসভা করিতে হইবে। একদিন বিপিন তাহার মাতার নিকটে বাড়ীর প্রায় সকল মেয়েদের সমবেত হইয়া অকাজে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রস্তাব করিল—দেখ মা, আমি মনে করছি, রোজ দুপুর বেলা তোমাদের ভালো ভালো বই পড়ে' পড়ে' শোনাব। দুপুর বেলা তোমাদের কারো ত কোনো কাজ থাকে না, তাস খেলে কড়ি খেলে সময় নষ্ট কর বই ত নয়। তার চেয়ে বই থেকে দুটো ভালো কথা শোনা কি ভালো নয়? কি বল তোমরা?

এই প্রস্তাবে কাহারো তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। গিন্নি ছেলের মনরাখা রকমে বলিলেন—তা বেশ ত। কাল থেকে ঐ দালানে সবাই বসে শুনবে, তুই পড়িস।

জয়া বিপিনের প্রসন্নতা লাভের জন্য বলিল—তা আমরা শুনব। তবে ইংরিজি টিংরিজি পোড়ো না বাবা; ইংরিজিতে শোনবার মতন কিচ্ছু নেই, ঐ ত পাঁচু পড়ে শুনেছি—শুধু ঘোড়া গাধা গোরু আর ঘাস কাটার গল্প।

এই বলিয়া জয়া পাঁচুর মার দিকে চাহিয়া হাসিল। পাঁচুর মা দুই আঙুলে ঘোমটা ফাঁক করিয়া চোখ মটকাইয়া জয়ার হাসিতে হাসিয়া সায় দিল—ভাবটা, বড় মিথ্যে বলনি জয়া পিসি!

ক্ষমা বলিল—না, ইংরিজি টিংরিজির গল্প আমাদের ভালো লাগবে না। বেহুলা লখিন্দর, কমলে কামিনী, গোলে বকাওলি—এইসব গল্প বেশ!

মোক্ষদা বিজ্ঞভাবে বলিল—ওসব ত মহাভারতের গল্প।

গিন্নি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ বিপিন তুই মহাভারত পড়িস। সময়ও কাটবে, ধর্ম্মও হবে।

বিপিন হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তাই হবে। কাল থেকে আমি মহাভারত পড়ব। তোমাদের কিন্তু সবাইকে বসে' শুনতে হবে।

জয়া বলিল—তা শুনব বৈ কি বাবা।

বিপিন চলিয়া গেলে একে একে সকল মেয়েই গিন্নির নিকট হইতে উঠিয়া অন্য ঘরে গিয়া জড়ো হইল। পাঁচুর মা বলিয়া উঠিল - এই এক ফ্যাসাদ জুটল দেখছি!

ক্ষমা বলিল—সত্যি ভাই, দুপুর বেলাটা একটু শুতে গড়াতে পাব না, দুটো কথা কইতে পাব না, একটু খেলতে পাব না, চুপ করে মুখ বুজে বসে থাকতে হবে। আমার ত ভাই ঢুলুনি আসবে। বিপিন দাদা এ এক বিপদ করলে!

জয়া বলিল—আরে অত ভাবছিস কেন? বিপিন ছটফটে মানুষ। দুদিনের বেশি একজায়গায় ও স্থির হয়ে থাকতে পারবে ভেবেছিস?

পরদিন দ্বিপ্রহরে বড় দালানে ফরাশ বিছাইয়া পাঠসভা বসিল এবং বিপিনের জন্য একখানি আসন পৃথক পাতা হইল। বিপিন কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্য মহাভারত বগলে করিয়া পাঠসভায় আসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—সকলেই দালানের ফরাশে বসিয়া আছে, কেবল খুড়িমা ঘর হইতে দালানে আসিবার দরজার কাছে মাটিতে বসিয়া আছেন, এবং তাঁহার পশ্চাতে দরজার আড়ালে লুকাইয়া অপর একজন কেহ আছে।

বিপিন একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পড়িতে বসিল। পড়িতে পড়িতে তাহার মন উৎসাহিত হইয়া উঠিল, সে মহাভারতের মধ্যেকার ভৌগোলিক সংস্থান, ইতিহাসের ইঙ্গিত, সমাজতত্ত্ব, চরিত্রের বিশেষত্ব বুঝাইয়া বুঝাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সে মহাভারতের ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে লাগিল প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ ছিল না, ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় ছিল না, বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারিত, বাল্যবিবাহ লোকের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। এইসব প্রথা পরে কেমন করিয়া নিষিদ্ধ বা প্রচলিত হইয়াছে এবং তাহাতে সমাজের কি কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝাইবার সময় মুখচোরা বিপিনের বাগ্মিতা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইতে লাগিল। বিপিন পাঠ করিতে করিতে এক একবার যখন মাথা তুলিতেছিল, তখনই দেখিতে পাইতেছিল দুটি ডাগর চোখের ব্যগ্র দৃষ্টি কপাটের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া মারিয়া যেন তাহার কথা পান করিতেছে; তাহার চোখে চোখে মিলিত হইবামাত্রই সেই কালো চোখ দুটির উৎসুক দৃষ্টি নত হইয়া সরিয়া যাইতেছিল। সমস্ত শ্রোত্রীরা পুত্তলিকার মতো ভাবশূন্য দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া বসিয়া আছে; কেহ হাই তুলিতেছে, কেহ ঢুলিতেছে, কেহ ফিসফিস করিয়া অবিরাম কথা কহিতেছে; কিন্তু দ্বারের অন্তরালবর্ত্তিনী শ্রোত্রীটির যে ঔৎসুক্য ও আগ্রহের অভাব নাই তাহা তাহার দৃষ্টি দেখিয়া বিপিন বুঝিতে পারিতেছিল।

বিপিন হঠাৎ পাঠ বন্ধ করিয়া "আজ এইখানেই থাক" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং কাহারও কোনো উত্তরের প্রতীক্ষা-

মাত্র না করিয়া বই বগলে তুলিয়া হনহন করিয়া দালান হইতে ঘরের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় আর-একবার অন্তরাল-বর্ত্তিনী শ্রোত্রীটির সলজ্জ কুণ্ঠিত দৃষ্টির সঙ্গে বিপিনের সপ্রশংস দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল।

জয়া তুড়ি দিতে দিতে সশব্দে হাই তুলিল। ক্ষমা মোক্ষদাকে ঠেলা দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—'এই মুক্ষী, ঢুলে পড়ে যাবি যে।' পাঁচুর মা ঘোমটা খুলিয়া হাঁপ ছাড়িল। গিন্নি বলিলেন—এস জয়া ঠাকুরঝি, একটু তাস খেলা যাক! রোহিণী তাসজোড়া আনগে ত।

খুড়িমা আস্তে আস্তে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। মালতীর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, সে আগেই কখন উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘুমের পরী

ঘুম-পাড়ানি, ঘুমের পরী,
ঘুমের দেশের মেয়ে,
আর কতকাল রৈব জেগে
পথের পানে চেয়ে!
নিদ্রাবিহীন গভীর দুখে,
গর্জ্জে ওঠে বেদনা বুকে,
নিমেষ তরে হাস্তমুখে,
আয় গো ঘুমের বাণী,
ক্লান্ত চোখে যায়ে দিয়ে
ঘুমের কাজল টানি!

সারানিশি একলা জেগে
অবশ দেহ মন,
নিঃস্ব বসে ঘরের কোণে
নেইক আপনজন!
সাঁচ্চা দিয়ে শরীর মুড়ে,
আকাশ-পাতাল সকল জুড়ে,
স্বপ্ন পরী আর ওড়েনা
মেলে রঙিন ডানা,
মসীর মতন তিমির ঘেরা
আমার জগৎ-খানা!

জাগরণের যতেক দুঃখ
ঘুমিয়ে সব ভুলি,
কে সে শাসায়, দেখ্‌ব নাকো
অলস নয়ন তুলি!
জগৎ জুড়ে কিসের তরে,
তর্ক ওঠে ঘরে ঘরে,
দেওয়া-নেওয়ার হিসাবটাতে
কিসের টানাটানি,
চাইনে কিছু, চাই গো তোরে
ঘুমের দেশের রাণী!

বুলিয়ে দে রে পদ্মহস্ত
আমার ক্লান্ত শিরে!
ছুঁইয়ে দেরে রূপার কাটি
ঘুমিয়ে পড়ি ধীরে!
সোনার কাটির পরশ পেয়ে,
আবার নূতন জনম নিয়ে,
নূতন দেশে, শুন্‌ব জেগে
নূতন আশার বাণী!
আজ্‌কে ঘুমের পরশ দেরে
তারেই ধন্য মানি!

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বন্ মামান্।

সপ্তাহে তিন দিন করিয়া সন্ধ্যাবেলায় গেরি জুজের গৃহে হিসাব শিখিবার জন্য আসিত। বাহিরের ছোট ঘরখানিতে বসিয়া জুজ্ কাগজের উপর জমা-খরচের আঁক পাড়িয়া তরুণ শিষ্যটিকে হিসাবের কাজে সুদক্ষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা পাইত। গেরি যথেষ্ট অভিনিবেশের সহিত পাঠ শিখিতে বসিলেও, মন তাহার মাঝে মাঝে পাশের ঘর হইতে ললিত কণ্ঠের যে হর্ষ-কাকলী উত্থিত হইত, তাহারই মধ্যে ছুটিয়া যাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিত। মেয়েদের প্রসঙ্গ জুজ গেরির সম্মুখে একদিনের জন্যও উত্থাপন করে নাই। পরী কাহিনীর সেই শক্তিশালী দৈত্য যেমন দুর্গবাসিনী রাজকন্যাকে সতর্কভাবে লোকচক্ষু হইতে রক্ষা করিত, বৃদ্ধ জুজও তেমনই পারির তরুণ সমাজের দৃষ্টি হইতে কন্যাগুলিকে সযত্নে লুকাইয়া রাখিতে চাহিত। কিন্তু সেই প্রথম দিন বিদ্যুৎ-চমকের মত ললিত কণ্ঠের যে কলোচ্ছাস গেরির বুকের মধ্যে এক বিচিত্র তালে দোল্ দিয়া গিয়াছিল, তাহার কথা গেরি এক দিনের জন্যও ভুলিয়া যায় নাই। সপ্তাহের এই তিনটি সন্ধ্যায় প্রতি মুহূর্ত্তেই সে উদ্‌গ্রীব থাকিত, ঐ বুঝি পর্দাখানা সরাইয়া দ্বারের পাশে সুন্দর একখানা সস্মিত মুখ পাতার আড়ালে ফুলের মতই ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু আশা কোন দিনই পূর্ণ হইত না। এই মধুর সঙ্গ-লোভে নিরাশ হইয়া ক্ষুণ্ণ চিত্তেই সে গৃহে ফিরিত।

যাহা হৌক, এ-সকল সত্ত্বেও হিসাবের কাজ ক্রমশঃই তাহার অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। জুজের শিখাইবার পদ্ধতিও যেমন সুশৃঙ্খল, শিখাইতে যত্নও তাহার তেমনই।

একদিন—রাত্রি তখন নয়টা বাজিয়াছে—পাঠ শেষ হইলে গৃহে ফিরিবার জন্য গেরি গাত্রোত্থান করিলে জুজ তাহাকে সে রাত্রির ভোজে নিমন্ত্রণ করিল। গেরি অবাক হইয়া গেল। সে জুজের মুখের পানে সপ্রতিভ দৃষ্টিতে চাহিতে জুজ উত্তর দিল, "এই তারিখে আমার স্ত্রী মারা যান্। তাই তাঁরই সম্মানের জন্য 'বন্ মামান্' বলছিল, দু-এক একজনকে নিমন্ত্রণ করতে।"

"বন্ মামান্।"

"হাঁ। আমার বড় মেয়ে। ঐ নামেই ছেলেবেলা থেকে তাকে আমরা ডাকি। ছেলেবেলা থেকেই ও ভারী গোছানো—সংসারের সব দিকে নজর। মার কাছে আমার কিছুই এড়ায় না। লোককে যত্ন করা—আত্তি করা—এই ত আমার স্ত্রী আজ ক'বছর মারা গেছে—তা সংসারটি ঐ-ই ত মাথায় করে রেখেছে।"

গেরিকে লইয়া জুজ ভোজের টেবিলে

গিয়া বসিল। মেজ মেয়ে বলিল, "বাবা তোমরা খেতে বসো। এঁকে ত আবার অনেক দূর যেতে হবে। বেশী রাত হলে এঁর অসুবিধা হতে পারে।" গেরির মনে হইল, সে বলে, না, না, কিসের অসুবিধা! কিন্তু লজ্জায় তাহার কথা ফুটিল না। কুণ্ঠিত চিত্তে সে ভাবিল, কি সে দুর্ভাগ্য! এতদিন ধরিয়া সে এই ক্ষণটুকুরই প্রতীক্ষা করিতেছিল—এই ক্ষণ, এই কিশোরীদের সহিত পরিচয় করিবার এই মধুর অবসরটুকু! আজ যদি সহসা সে শুভ ক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইল, ত, তাহাকে এত খাটো করিয়া দেওয়া কেন? কিন্তু কি করিয়া সে মুখ ফুটিয়া বলিবে, না, না, কোন অসুবিধা হইবে না। হোক দীর্ঘ, কোন ক্ষতি নাই! এ মধুর সঙ্গ—

জুজ কহিল, "তুমি তা হলে—"

গেরি কোনমতে সঙ্কোচ কাটাইয়া কহিল, "এত ব্যস্ত হচ্ছেন, কেন? এঁদের তাড়া দেবার কোন দরকার নেই।"

মেয়েরা কৌতুহলী দৃষ্টিতে তরুণ অতিথির পানে চাহিয়া দেখিল। লজ্জায় গেরির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সহসা দ্বারের সম্মুখে এক আগন্তুককে দেখিয়া জুজ কহিল, "এই যে আঁদ্রে। এসো। তোমারই জন্য শুধু দেরী! এলিস্, এবার তোমরা খাবারের উদ্যোগ কর। তারপর আঁদ্রে, এত দেরী হল কেন, বল।" আগন্তুক টেবিলের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া কহিল, "আমার নাটকখানা এইমাত্র শেষ করলুম। পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যটা এই লিখে আসছি।" আনন্দের উত্তেজনায় আঁদ্রের মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সহসা গেরিকে দেখিয়া সে একটু কুণ্ঠিত হইল। জুজ সে ভাব লক্ষ্য করিয়া উভয়ের আলাপ করাইয়া দিল। "ইনি পল্যে গেরি—আর ইনি হচ্ছেন আঁদ্রে মার্ঁান্।" তাহার পর আঁদ্রের দিকে চাহিয়া জুজ কহিল, "নাটকখানা তাহলে শেষ করেছ!"

"হাঁ, একদিন এইবার সকলের সুবিধামত এসে সেটা পড়িয়ে শোনাব।"

মেয়েরা সমস্বরে কহিয়া উঠিল, "আমরাও শুনবো।"

সকলেই জানিত, আঁদ্রে নাটক লিখিতেছে। একই গৃহে সকলের বাস, আলাপপরিচয়ও বেশ আছে। কাহারও মনে সন্দেহ ছিল না যে আঁদ্রের এ নাটক লেখা শেষ হইলে মন্দ দাঁড়াইবে না। ফটোগ্রাফির ব্যবসায়ে আঁদ্রের তেমন লাভ হইতেছিল না। খরিদদারের সংখ্যা অল্পই; পথের লোক ষ্টুডিওর পাশ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহার পানে মুহূর্ত্তের জন্যও চাহিয়া যায় না। তথাপি কাজটায় অভ্যাস রাখিবার জন্য আঁদ্রে এখন প্রতি রবিবার বন্ধুবান্ধবের গৃহে ঘুরিয়া সকলের ছবি তুলিয়া বেড়াইতেছে। খরিদদার জুটে না বলিয়া মনে তাহার কোন দিন অসন্তোষের চিহ্নও ফুটিয়া উঠে নাই। কেহ ব্যবসারের কথা তুলিলে আঁদ্রে হাসিয়া কহিত, "দিনকাল যেরকম মন্দা পড়েছে, লোকে খেতেই পায় না, তা সখ করে ছবি তোলাবে কি!" ইহার অধিক একটি কথাও তাহার মুখে শুনা যাইত না। তবে তাহার মনে আশ্বাস এইটুকু ছিল যে, কোনমতে এই 'বিদ্রোহ' খানা যদি শেষ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে

তাহার আর কোন দুঃখ থাকিবে না। নূতন নাটকের নাম, 'বিদ্রোহ'।

তাহার পর সে রাত্রের মত সকলে টেবিলে বসিয়া পান-ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। গেরি এক নূতন আনন্দের স্বাদ পাইয়া আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিল। নবাবের গৃহে বিলাস—ঐশর্য্যের প্রাচুর্য্য! প্রাণটা কেমন তাহার মধ্যে হাঁপাইয়া উঠে! এই বিলাসবর্জ্জিত সারল্যের মধ্যে প্রাণ তাহার এক অপূর্ব্ব শান্তি—সুধার স্বাদ পাইয়া বর্ত্তাইয়া গেল।

* * *

গেরির প্রাণে পারির একটি নারী, সুগভীর রেখাপাত করিয়াছিল। সে নারী ফেলিসিয়া। ফেলিসিয়া যে গেরিকে একটু সহানুভূতির চক্ষে দেখিত, গেরির তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না। গেরি প্রাণ দিয়া ফেলিসিয়াকে ভাল বাসিত। ফেলিসিয়াও এ ভালবাসা বুঝিত। সে গেরির নাম দিয়াছিল, "মিনার্ভা"। তাহাকে দেখিতে পাইলেই ফেলিসিয়া কহিত, "এই যে মিনার্ভা! এস মিনার্ভা, তোমার সঙ্গে দুটো কথা কওয়া যাক্।" এই পরিচিত মিষ্ট সুর একটা স্নেহের আভাস দিত। গেরি বুঝিল, ফেলিসিয়া তাহাকে যে ভাবে ভালবাসে, তাহা ছোট ভাইয়ের প্রতি বড় বোনের ভালবাসার মত। সে মনকে দৃঢ় করিল, না, অন্য ভাবের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না—আর অগ্রসর হওয়া নয়!

ফেলিসিয়া! বেচারী ফেলিসিয়া! জীবনের উপর তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল। চারিদিকে ভাণ ও কপটতা! চারিদিকে স্বার্থের ফাঁদ পাতা! মানুষের দুর্ব্বল চিত্ত! পদে পদে সেই ফাঁদে আপনাকে ধরা দিয়া মৃত্যুর ফাঁদে সে জড়াইয়া পড়িতেছে। প্রাণটা তাহার অশ্রুতে ভিজিয়া থাকিত। মরুভূমির মত যে চিত্তটা দিন-রাত্রি খাঁ খাঁ করিত—এই অশ্রুতে ভিজাইয়াই কোনমতে তাহাকে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

তাই আজ জুজের কন্যাদের সহিত মিশিতে পাইয়া গেরি এতখানি শান্তি অনুভব করিল। কি সুখে, কি পুলকে এই ক্ষুদ্র পরিবারটি উচ্ছ্বসিত রহিয়াছে।

এই ভোজের নিমন্ত্রণ হইতে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানটাও কাটিয়া গেল। গেরি আসিয়া মেয়েদের গৃহস্থালীর কথা লইয়া আলাপ সুরু করিয়া দিত, মেয়েরাও এই তরুণ শান্ত অতিথিটিকে ক্রমে একান্তই বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা পল যেমন জুজের গৃহ ত্যাগ করিবে, সম্মুখেই সে দেখে, আঁদ্রে।

আঁদ্রে কহিল, "গেরি, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। আমার ঘরে একবার আসবে?"

গেরি আঁদ্রের সহিত তাহার ঘরে গেল। দ্বারটা ভেজাইয়া দিয়া আঁদ্রে কহিল, "শোন, আমাদের মধ্যে কিছু গোপনতা রাখবার দরকার নেই। স্পষ্টাস্পষ্টি সব কথা বলাই ভাল। তুমি লোক ভাল, তোমার টাকাকড়িও আছে। আমি গরিব--লিখে, পাগলামি করে দিন-গুজরান করি। দুজনের মধ্যে তোমাকেই লোকে আগে পছন্দ করবে,

এ তুমিও জানো, আমিও জানি। কিন্তু তবুও আমি বলি, আমার গরিবের একটি মাত্র যে সুখ আছে, সে সুখ দস্যুর মত তুমি লুটে নিও না। না, তা যদি কর ত, আমি পাগল হয়ে যাব, পাগলের মত তোমার সঙ্গে তাহলে লড়াই করব। সে সুখ তোমায় আমি নিতে দেব না। কদিন ধরে এই কথাটা যতই আমি ভাবচি, ততই যেন মাথা আমার খারাপ হয়ে উঠছে। আমার পথে এমন করে তুমি পাঁচিল তুলে দাঁড়িও না। ভাল হবে না।"

গেরি স্তম্ভিত হইয়া গেল। হতাশোদ্‌ভ্রান্তের মত এ কি চেহারা আঁদ্রের! সেই সহাস সস্মিত মুখে এ কি কালির রেখা! সে কহিল, "হেঁয়ালি ছেড়ে পষ্ট করে সব খুলে বল তুমি। কোন দ্বিধা করো না। আমাকে বন্ধু বলেই জেনো।"

"বন্ধু! তবে শোন, তুমি জুজের বাড়ী হামেসা এখন আসা-যাওয়া করেছ কেন? বল—না, বলতেই হবে।"

গেরি কহিল, বলছি—জুজের মেয়েকে আমি ভালবাসি।"

"ভালবাস! কাকে? বন্‌ মামান্‌কে? না, না, তা হবে না। তা আমি হতে দেব না। তুমি জানো, আমার জীবনের একমাত্র সুখ, একমাত্র সাধ, বন্‌ মামান্‌কে পাওয়া! তাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তাকে ভালবেসেই আমি এ দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে সমান যুদ্ধ করে চলেছি—"

বন্‌ মামান্‌! আলিন্‌! তাহাকে ভালো বাসিবার কল্পনা গেরির মনে মুহূর্ত্তের জন্যও উদয় হয় নাই। সম্মুখে যখন অপূর্ব্ব-সুন্দরী কিশোরী এলিস্‌ তাহার দীপ্ত লাবণ্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তখন তাহার দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া অপর কাহারও পানে চাহিয়া দেখিবার গেরির অবসর ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। সে ত আলিনকে ভালবাসে না, সে ভালবাসে এলিসকে; জুজের মেজ মেয়েকে।

গেরি বলিল, "আমি এলিসকে ভালবাসি বন্‌ মামান্‌কে নয়।"

আঁদ্রে কহিল, "তুমি তবে এলিসের জন্য আস? বন্‌ মামানের জন্য নয়?"

"না।"

"গেরি, বন্ধু, আমায় মাপ করো। আমি তোমায় ভুল বুঝে ছিলুম। শোন, বন্‌ মামানের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা সব ঠিক হয়ে গেছে। আমার এ নাটকখানা কোন থিয়েটারে নিলেই আমাদের বিয়ের কথা জুজের কাছে তুলবো। তখন তার আর কোন দ্বিধা থাকবে না। একজন উদীয়মান নাট্যকারের হাতে মেয়ে দিতে কোন বাধা থাকতে পারবে না।"

গেরি চলিয়া যাইবার জন্য উঠিতেই সম্মুখে প্রকাণ্ড একখানা ছবির পানে তাহার নজর পড়িল। এ মুখ কোথায় যেন সে দেখিয়াছে—হাঁ, এ যে বড় পরিচিত মুখ। সে স্থিরভাবে ছবির পানে চাহিয়া রহিল।

আঁদ্রে কহিল, "এঁকে তুমি চেনো?"

"চিনি বই কি। মাদাম জেকিল, মা! ডাক্তারের স্ত্রী।"

"আমার মার ছবি—আমার মা।"

"মা!"

"হাঁ, আমার মা।" পরে আঁদ্রে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, "তুমি অবাক হচ্ছ, গেরি। ইনিই আমার মা, মাদাম মারান্—ডাক্তার জেঙ্কিন্সকে এখন বিয়ে করেছেন। তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ—যে, আমার মা অমন সুখে, অত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আছেন, আর আমার এই দুর্দ্দশা! তার কারণ, ডাক্তারের সঙ্গে আমার মোটেই বনিবনাও নেই! সে বলে, আমাকে ডাক্তারি শিখতে, কিন্তু আমি চাই লিখতে! সাহিত্য-চর্চ্চা করতে! নিত্যই তর্ক হত! শেষে সে তর্ক সহ্য করতে না পেরে আমি চলে এসেছি। জানি, মার মনে চোট্ লেগেছে—কিন্তু কি করব? নিরুপায় আমি। এমন দুর্দ্দিন আমার গেছে, গেরি, যে হাতে একটি পয়সা নেই—দু'দিন ঠায় উপোষ করে কেটেছে—কি করব, টাকা ত আমার আর নয়, টাকা জেঙ্কিন্সের। কোন মতে কায় ক্লেশে এখন দিন কাটাচ্ছি—লেখা-পড়া কিছু শেখা গেছে, কাজেই মনের বিরুদ্ধে যা তা ত করতে পারি না। তাই এই নাটক লিখতে সুরু করেছি। যদি বরাত তেমন হয় ত এতে অবস্থা ফিরতে পারে। হাতে যা-কিছু জমেছিল, তাই দিয়ে ক্যামেরা ট্যামেরাগুলো কিনে ছিলুম, কিন্তু সে ব্যবসা দাঁড়াল না। কি করব! বরাত!"

আঁদ্রের কথা শুনিবার সময় গেরির মনে একটা দৃশ্য বড় উজ্জল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই পুরাতন দৃশ্য—ফেলসিয়া জেঙ্কিন্সকে তিরস্কার করিতেছে,—তোমার ছেলে মন্দ, না, মন্দ তোমরা—যারা এই সমাজটাকে নিজেদের খেলবার জায়গা মনে ভেবে যা-তা করে বেড়ায়! আঁদ্রের প্রতি সমবেদনায় প্রাণ তাহার ভরিয়া উঠিল। আহা, বেচারা, বেচারা আঁদ্রে! কি কষ্টেই সে দিনপাত করিতেছে! তাহার সুখ এখন নির্ভর করিতেছে, ঐ নাটকখানির উপর! ঐ নাটকের অভিনয় হইলে তবেই সে সুখী হইবে। বন্ মামানকে পাইবে! ইহাই তাহার সাধ, ইহাই তাহার আশা! ভগবান, বেচারার এ আশা পূর্ণ কর, এ সাধ মিটাইয়া দাও! (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গে অকাল বার্দ্ধক্য।

আগামী ২২শে আগষ্ট তারিখে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পঞ্চাশত্তম বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন এবং সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। রামেন্দ্র বাবুর বয়স মাত্র পঞ্চাশ বৎসর জানিতে পারিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। দেখিতে রামেন্দ্র বাবুকে জরাজীর্ণ বলিয়াই মনে হয়। কলিকাতার গত সাহিত্য সম্মিলনে তাঁহার মস্তকে অনবরত গোলাপ জল ও ইউ-ডি-কলোন দিয়া কোনক্রমে টাউন হলের উপরতলায় লইয়া গিয়া ১০ মিনিটের জন্য বিজ্ঞানবিভাগের সভাপতিত্বের আসনে তাঁহাকে উপবিষ্ট করান

হইয়াছিল। হা ভগবান! অথচ ইঁহার বয়স মাত্র পঞ্চাশৎ বৎসর।

বাঙ্গালায় এরূপ "বার্দ্ধক্যং জরসা বিনা" অনেককেই প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। রামেন্দ্র বাবু এম, এ পাশ করিয়াছেন, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কয়েক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, এতদিন কলেজের শিক্ষকতা করিয়াছেন—তাঁহার পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে যে "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।" তথাপি তাঁহার বয়স মাত্র পঞ্চাশৎ বৎসর! প্রার্থনা করি অনেক দিন এখনও তিনি জীবিত থাকিবেন। কিন্তু পঞ্চাশের মধ্যে বা কিছু পরে বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র, মাইকেল, নবীনচন্দ্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বঙ্গের অনেক মহাপুরুষ স্বর্গলাভ করিয়াছেন—কে বলিতে পারে কেশব বাবু বা বিবেকানন্দ আশি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে ভারতের নর-নারীর আরও কত উপকার করিতে পারিতেন। আমাদের শাস্ত্রে লেখে "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ", কিন্তু আমাদের দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে যাঁহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে চিন্তা গবেষণা করেন তাঁহারা অনেকে পঞ্চাশ পার হইলেই বনে না গিয়া একেবারে স্বর্গেই যাইয়া থাকেন। বন অপেক্ষা স্বর্গ অবশ্য খুব ভাল জায়গা, কিন্তু আমাদের কাতর প্রার্থনা এই যে তাঁহারা কোথাও না গিয়া "শতং জীবতু" হইয়া দেশের ও দশের কার্য্য করিতে থাকুন। দেশের এই সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে বাঁচাইয়া রাখা একটা জাতীয় সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

বিলাতে দেখিতে পাই যে পঞ্চাশ বৎসরে সেখানকার মনীষীগণ যুবক থাকেন, আর আমাদের দেশে হয় তাঁহারা বৃদ্ধ না হয় গতাসু। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক স্যার এলেকজেণ্ডার পেড্‌লার সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এখনও সুস্থ শরীরে বিলাতে বাস করিতেছেন। লর্ড কেল্‌ভিন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ছিলেন—তিনি প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মৃত্যুর শেষ মাস পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। স্যার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্‌, সার হেনরি রস্‌কো, সার জেমস্‌ ডেয়োয়ার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এখনও খুব প্রাচীন বয়সে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত আছেন। গ্ল্যাডষ্টোন. ডিস্‌রেলি, লর্ড মর্লি, লর্ড রিপন, লর্ড রবার্টস প্রভৃতি রাজনৈতিকগণ কত বৃদ্ধ বয়সে এই জগৎব্যাপী ব্রিটিস সাম্রাজ্য পরিচালনা করিয়াছেন। বিলাতে এইরূপ কত শত লেখক, বীরপুরুষ, অধ্যাপক রাজনীতিজ্ঞ, ধর্ম্মপ্রচারক, সমাজসেবক সত্তর, আশি, নব্বই বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া দেশের নানাবিধ মঙ্গলকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। আর আমাদের দেশে সে দিন স্বর্গীয় ডি, এল, রায় মহাশয় সরকারি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে না করিতেই অকালে মৃত্যুলাভ করিলেন। শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের বোধ হয় চল্লিশও পার হয় নাই। কবি রজনীকান্ত ও হেমচন্দ্র

জজ রমেশচন্দ্র মিত্র পঞ্চাশের আগেই বা একটু পরে গিয়াছেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বোধ হয় ষাট পার হইতে পারিয়াছিলেন। সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এইরূপ অকাল বার্দ্ধক্য ও অকাল মৃত্যুতে দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে; বাস্তবিক পঞ্চাশ বৎসর এক প্রকার শিক্ষারও সাধনার আয়োজনের কাল মাত্র। পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা, সাধনা, শিক্ষা পরবর্ত্তীকালে বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্মে যোজনা করিতে পারিলে তবে দেশে বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে। বিলাতের কর্ম্মীদের অধিকাংশ বৃহৎ কর্ম্মই পঞ্চাশের পরেই সাধিত হইয়া থাকে, পঞ্চাশের পূর্ব্বে তাহার আরম্ভ মাত্র হয়। এই দেখুন না কেন ভারতশাসন কার্য্যে যাঁহারা গভর্ণর, লেপ্টনাণ্ট গভর্ণর, গভর্ণর জেনারেল, সেনানায়ক প্রভৃতি বিলাত হইতে নিযুক্ত হন তাঁহাদের বয়স অধিকাংশই পঞ্চাশের এমনকি ষাটেরও উপর হইবে। পঞ্চাশের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বড়ই অমূল্য পদার্থ। আমাদের দেশে যাঁহারা মস্তিষ্ক চালনা করিয়া থাকেন, সেই সকল চিন্তাশীল কর্ম্মীদিগকে পঞ্চাশের উপর সুস্থ রাখিবার কি কোনও উপায় নাই?

আমার মনে হয়, আছে। এটা যেন বেশ বুঝা যায় যে, দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অকাল বার্দ্ধক্য ও ততোধিক ভয়ানক অকাল মৃত্যুর দুইটি প্রধান কারণ বিদ্যমান—বাল্য বিবাহ ও অপরিমিত মস্তিষ্ক চালনা।

ইহার মধ্যে বাল্যবিবাহ কেবল চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের আয়ুক্ষয় করিতেছে এমন নহে, ইহা একটা জাতীয় অভিসম্পাতরূপে পরিণত হইয়াছে। অপরিণত বয়স্ক পিতা-মাতার সন্তান কখনও সবল ও দীর্ঘায়ু হইতে পারে না—এ কথা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজে পুত্রকন্যার বিবাহের বয়স কেন আশানুরূপ উন্নত হইতেছে না তাহার কারণত দেখা যায় না। সকলেই বাল্যবিবাহের কুফল বোঝেন, সমাজে বাল্যবিবাহ রহিতের বিশেষ কিছু প্রতিবন্ধকও নাই—অথচ মেয়েদের বিবাহ ১১ বৎসরের মধ্যে দেওয়া চাইই। অনেক যুবক পঠদ্দশায় বিবাহ করিতে একেবারে অনিচ্ছুক, কিন্তু পিতামাতার আগ্রহাতিশয্যে তাহারা নিরুপায়। আমরা সকলে নিজে নিজে যদি স্থির করি যে ভ্রাতা বা পুত্রের বিবাহ বাইশ বৎসরের বা কন্যা ও ভগিনীর বিবাহ ষোলোর কমে দিব না—তাহা হইলে সমাজ কি বলিবে? বড় জোর বাড়ীর মেয়েরা পাল্কীভাঙ্গা ক'নে" দেখিয়া একটু ঠাট্টাতামাসা করিবে। বিলাত যাইলে এখনও জাতি যায়, বিধবা বিবাহ দিলে জাতি যায়; কিন্তু ষোল বা স'তের বৎসরে কন্যার বিবাহ দিয়া কাহাকেও জাতিচ্যুত হইতে দেখি নাই। পূর্ব্ববঙ্গে কায়স্থ ও বৈদ্য সমাজে এইরূপ অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। একটু মানসিক বল সংগ্রহ করিতে পারিলে অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজ হইলে এই কুপ্রথা অচিরেই উঠিয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বাল্যবিবাহ ছাড়া চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের জীবনীশক্তি

হ্রাসের আর একটি কারণ—অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের অভাব। রামেন্দ্রবাবু শরীরের উপর নিশ্চয়ই অবিচার করিয়াছিলেন, মস্তিষ্কের উপর কঠোর অত্যাচার করিয়াছেন—নহিলে আজ তিনি মাত্র পঞ্চাশ বৎসর বয়সে বার্দ্ধক্যের অভিনন্দন লাভ করিতে পারিতেন না, তাঁহার স্নায়ুগুলিও এত শিথিল হইত না,—যাহাতে ইউ—ডি—কলোন মাথায় দিয়াও দশ মিনিটের বেশী বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতিত্বের কাজ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। স্বর্গীয় ডি, এল, রায় মহাশয় যদি অপরিমিত মস্তিষ্ক চালনা না করিতেন তাহা হইলে তিনি মস্তিষ্ক-রোগে অকালে প্রাণ হারাইতেন না—আরও বিশ ত্রিশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করিয়া তিনি নিজে ধন্য হইতে পারিতেন এবং বাঙ্গালা দেশকেও ধন্য করিতে পারিতেন। আমি অবশ্য একথা বলিতেছি না যে এই সকল ব্যক্তি কেবল বাঁচিবার জন্যই মস্তিষ্ক পরিচালনা বন্ধ করিয়া আহারবিহারেই জীবনপাত করুন। সেরূপে বাঁচিবার লোকের অভাব আদৌ নাই। আমার বক্তব্য এই যে পরিমিত মস্তিষ্ক চালনা এক কথা আর অপরিমিত মস্তিষ্ক পরিচালনা আর এক কথা। শরীরকে বাঁচাইয়া মস্তিষ্ক পরিচালনা করিলে যে প্রভূত কার্য্য করা যায় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘজীবিও হওয়া যায় তাহা যেন আমরা বিলাতের কর্ম্মবীর চিন্তাশীল মনীষীগণের দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা করি। আমাদের দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই যেন শয়ন গৃহে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনং" এবং প্রাতে উঠিবার সময় ও রাত্রে শুইতে যাইবার সময় যেন ঐ মন্ত্রটি স্মরণ করেন। *

এইরূপে শরীরকে বাঁচাইয়া মস্তিষ্ক পরিচালনা করিবার আমার নিজের কয়েকটি মুষ্টিযোগ আছে। তাহার বর্ণনায় অপরের উপকার হইবে কিনা জানি না কিন্তু ইহাতে আমি নিজে বড়ই উপকার লাভ করিয়া থাকি। যখন অধ্যাপকের কার্য্য আমার পেশা তখন অল্পাধিক মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে আমি বাধ্য। আমি যুবক সুস্থ না থাকাই আমার পক্ষে অন্যায়। কিন্তু আমার সমবয়সী ও সমকর্ম্মী বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, অনিদ্রারোগ, মাথাধরা প্রভৃতি অভিযোগের অভাব দেখি না বলিয়াই মনে হয় আমার মুষ্টিযোগ গুলি নিতান্ত অকেজো নহে। বলাবাহুল্য বাঁধাবাঁধি বিধির উপর জীবন চালনা করিতে হইলে যৌবন কাল হইতেই নিয়ম-পালনে অভ্যস্ত হইতে হইবে, বৃদ্ধবয়সে সেরূপ অভ্যাস হওয়া অসম্ভব।

আমার মুষ্টিযোগের সংখ্যা অল্প, চারিটি মাত্র। তাহাদের উদ্দেশ্য শরীর ও

---

* আমাদের দেশে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সেও যে চিন্তাশীল ব্যক্তি দেশের কাজে যোগ দিতে পারেন—তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মস্তিষ্ককে বাঁচাইয়া মস্তিষ্ক পরিচালনা করা। প্রথম নম্বর মুষ্টিযোগ হইতেছে—সপ্তাহের মধ্যে ছয় দিন মানসিক শ্রম করার পর একদিন সম্পূর্ণরূপে মস্তিষ্ককে বিশ্রাম প্রদান করা। ছয় দিন খুব লেখাপড়া করুন কিন্তু ভক্ত খৃষ্টানগণের মত রবিবার দিনটা একেবারে স্যাব্যাথ ডে (Sabbath day) রূপে গণ্য করিতে হইবে; নহিলে ভাড়াটিয়া গাড়ীর ঘোড়ার মত দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধরিয়া অবিরামভাবে লেখাপড়ার কার্য্য করিলে অবিলম্বে শরীর নষ্ট হইয়া যাইবে, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। অনেকে ইহার ঠিক বিপরীতাচরণ করেন। তাঁহারা সপ্তাহের ছয় দিন স্কুল, কলেজ, কাছারি, আফিস করেন, পরে রবিবার দিন যতরাজ্যের জড় করা চিঠির উত্তর লেখেন, প্রবন্ধ লেখেন, কবিতা রচনা করেন—এমন কি মনে করেন রবিবার দিনটাই প্রকৃত কাজের দিন। ফলে হয় এই যে, মস্তিষ্ক বেচারা মাসের মধ্যে একদিনও ছুটি পায় না। মিলের কুলিরাও যখন সপ্তাহের মধ্যে একদিন করিয়া তাহাদের হাড়ভাঙ্গা কাজ হইতে ছুটি পায়, তখন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে মস্তিষ্ক জিনিষটা কুলিরও অধম নহে। ছয়দিন যত পারেন লেখাপড়া করুন, বৈজ্ঞানিকগণ ল্যাবরেটারীতে কাজ করুন, কবি কবিতা লিখুন, আর রবিবার দিন বাজার হাট করুন। অনেকে ভুল বুঝিয়া বাজার করাটা হীন কাজ মনে করেন, কিন্তু আমি দেখিতে পাই রবিবারে বাজারে যাইলে অন্ততঃ সে দিনটার খাওয়া দাওয়াটা খুবই ভাল হয়। বন্ধুবান্ধবদের বাটিতে গিয়া দেখা শুনা করুন, অল্প অল্প দূরবর্ত্তী স্থানে বেড়াইতে যান কিন্তু লেখাপড়ার ধার দিয়াও যেন না যান। বেশ দেখা যায় এইরূপে সপ্তাহের মধ্যে একদিন লেখাপড়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখিলে পরবর্ত্তী ছয় দিনে বেশ পুরাদমে কাজ করা যায়।

আমার দ্বিতীয় মুষ্টিযোগ হইতেছে—বৈকালে ৫টা বা ৫॥০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কোনও মস্তিষ্কোপজীবী ব্যক্তিকে বাটীতে বসিয়া থাকিতে দেওয়া হইবে না। পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার পর সকলে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়ুন—রাস্তায়, বাগানে বাহির হউন, মাঠে যান, জঙ্গলে যান, ময়দানে যান, নদীর ধারে বেড়ান, গড়ের মাঠে বেড়ান। মোট কথা বৈকালে ও সন্ধ্যাবেলায় খানিকটা শারীরিক পরিশ্রম ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন একান্ত প্রয়োজন। সাহেবেরা বৈকালে ফুটবল, টেনিস, হকি, রগেবি খেলে, সন্ধ্যাবেলায় ক্ল্যাবে যায়, বিলিয়ার্ড খেলে। শুনিয়াছি মহামতি গ্ল্যাডষ্টোন সাহেব শারীরিক পরিশ্রম করিবার জন্য কাঠ ফাড়িতেন, কেহ কেহ মাটি কোপান, স্যাণ্ডোর ডম্বেল ভাঁজেন ইত্যাদি। আমাদের দেশে সকলেই অকাল বিজ্ঞ। আমরা ফুটবল প্রভৃতি খেলা ছেলেদেরই উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকি। খেলা আমাদের দ্বারা হইবে না, বেড়ান ত হইবে? তবে দিনের মধ্যে দুই তিন ঘণ্টা বেড়াই না কেন? সমস্ত

দিনের বিষম মানসিক পরিশ্রমের পর শরীরকে একটু তাজা করা ত চাই। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বেশী মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের শারীরিক শ্রম একেবারেই নাই—ফলে ডায়েবেটিস, অজীর্ণ, অনিদ্রা প্রভৃতি রোগ সহজেই তাঁহাদের জীবনসঙ্গী হইয়া উঠে। যদি লাট সাহেবের কাউন্সিলের সব সরকারী সভ্যেরা একটা আইন পাশ করাইয়া লইতে পারেন যে ৫৷৷৹ টার পর স্কুলমাষ্টার, প্রফেসার, জজ, হাকিম, উকিল, বারিষ্টার, কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, প্রভৃতি যে কেহ বাটীতে বসিয়া থাকিবেন তাহার জেল হইবে, তাহা হইলে বাস্তবিকই এই সকল ব্যক্তিকে পঞ্চাশের উপরেও করিয়া রাখা যাইতে পারে, নচেৎ বড়ই বিপদ।

যাঁহারা সারাদিন মানসিক পরিশ্রম করেন, রাত্রে তাঁহাদের লেখাপড়া না করাই ভাল। কারণ এরূপ অনেকস্থলে দেখা যায় যে রাত্রে লেখাপড়া করিলে সমস্ত রাত্রি আর ভাল ঘুম হয় না। তবে যাঁহাদের উদরান্নের জন্য দিনের বেলায় স্কুল, কলেজ, কাছারি বা আফিসে যাইতে হয় না, তাঁহারা সকাল সন্ধ্যায় অনায়াসে পড়াশুনা করিতে পারেন। মোটের উপর দিবসের মধ্যে আট নয় ঘণ্টার বেশী মানসিক শ্রম একেবারেই অনুচিত।

আমার তৃতীয় মুষ্টিযোগ হইতেছে—বড় বড় ছুটিতে স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যাওয়া। দেখুন না কেন, বিলাতে যাই পার্লিয়ামেণ্ট বন্ধ হইল বা কোন একটা ছোট বড় ছুটি মিলিল অমনি রাজমন্ত্রী রাজকার্য্য ফেলিয়া, বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটারী ফেলিয়া, ধনী ব্যবসাবাণিজ্য ফেলিয়া, কেহ সমুদ্র স্নান করিতে যান, কেহ আল্‌পস্‌ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে যান,—লণ্ডনের ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য—সকলেই যেন বাহির হইয়া যাইতে পারিলেই বাঁচেন! এটা একটা ফ্যাশান নহে, এ ব্যবস্থা অনেকটা মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করে—ইহাতে মনের অবসাদ ঘুচে, মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ হইবার অবকাশ পায়, শরীরের পরিশ্রম খানিকটা বাড়ে, স্বাস্থ্যও ভাল হয়, মানুষ অনেক সময়ে নূতন হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসে। আমাদের দেশে বড় ছুটির মধ্যে পূজার ও বড় দিনের বন্ধই সকলে পান, তাহা ভিন্ন হাইকোর্টের তিন মাস ব্যাপী ছুটি আছে আর স্কুল কলেজের শিক্ষকগণ গরমের লম্বা ছুটি পাইয়া থাকেন। এইসব ছুটিতে বৎসরে পনের দিন, এক মাস বা দুই মাস যদি সকলে দার্জ্জিলিং, খরসান পুরী, মধুপুর, দেওঘর প্রভৃতি স্থানে "বায়ুভক্ষণে" কাটাইয়া আসিতে পারেন, শরীরের মঙ্গল ত হয়ই, মানসিক মঙ্গল তদপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে। যাঁহাদের সামর্থ্য আছে সমুদ্রযাত্রা করিয়া দেখিয়া আসুন—অন্য দেশগুলা আমাদের দেশের মত মাটির না সোণার। শুনিয়াছি স্বর্গীয় ডব্‌লু, সি ব্যানার্জ্জি মহাশয় বলিতেন যে একবার সমুদ্রযাত্রা করিলে চারি বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। অবশ্য এরূপ স্থান

পরিবর্ত্তন অর্থব্যয় সাপেক্ষ। যাঁহার অর্থ কম আছে তিনি ধার করুন। শাস্ত্রে লেখা আছে "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" বিংশ শতাব্দীতে আর বিশুদ্ধ ঘৃত মিলে না, তাই কলিকালে এখন "ঋণং কৃত্বা বায়ুং পিবেৎ" এই মন্ত্র বলিবে। এইরূপে মানসিক বল সংগ্রহ করিতে হইবে। আগে বল সংগৃহীত না হইলে খরচ করিবে কি ?

আমার চতুর্থ ও শেষ মুষ্টিযোগ সকল মুষ্টিযোগ অপেক্ষা উপাদেয়—প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা। মনে করিবেন না আমি এখানে হাইজিনের তর্ক উপস্থিত করিতেছি। সকলেই বুঝিতে পারি এক দেশের বা জাতির পক্ষে যে খাদ্য পুষ্টিকর অপর দেশের বা জাতির পক্ষে তাহা নহে। মদ্য মাংস বিলাতের শীতবায়ুর উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য হইতে পারে, বাঙ্গালার জলহাওয়ায় উহা উপযোগী নহে। বাঙ্গালীর পুষ্টিকর খাদ্য ডাল, মাছ, ঘি, দুধ। কিন্তু কথা হইতেছে বিশুদ্ধ ঘি, দুধ পাই কোথা ? মাছও ত প্রায় দুর্লভ জিনিস হইয়া দাঁড়াইতেছে। পুষ্টিকর আহারের যদি এইরূপ অপ্রাপ্তি ঘটিতে থাকে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনীশক্তিরও হ্রাস হইতে থাকিবে তাহাতে বিচিত্র কি ? মেচনিকফ সাহেব বলেন ঘোল খাও—বুড়া হইবে না। কথাটা ঠিক, পল্লীগ্রামের লোকেরা মেলেরিয়ায় ভুগিয়াও দুধ, দই, ঘোল খাইয়া অনেক দিন বাঁচিত, এখন ত সেই পল্লীগ্রামেই টাকায় ছয় সের দরেও নির্জ্জলা দুধ মিলে না। বাটীতে চারপাঁচটি শিশু থাকিলে বাড়ীর কর্ত্তা—অর্থাৎ যিনি মস্তিষ্ক চালনা করিয়া সংসার চালাইতেছেন—দুধ, ঘির মুখও দেখিতে পান না। মাছের ঝোলের বাটীর ভিতর একটুকরা মাছ আছে কি না অনেক সময় দূরবীক্ষণ যন্ত্র না হইলে দেখা অসম্ভব। বাস্তবিক. এই মাছ ও দুধের অভাব একটা জাতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার আছে—দ্বিতীয় প্রতিকার নাই। শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলেরা যদি মাছের চাষ ও ব্যবসা করেন আর ডায়েরী ফারম খোলেন তাহা হইলেই দেশে দুধ, ঘির অভাব ঘুচিবে, মাছ মিলিবে। যে দেশের লোকেরা গাভীকে ভগবতী বলিয়া পূজা করে সেই দেশে বিলাতী টিনের মিল্ক খাইয়া শতকরা পঞ্চাশ বা ততোধিক শিশু মানুষ হইতেছে ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে ? শিশুকে বাঁচাইতে হইবে, যুবকের মস্তিষ্ক সবল এবং বৃদ্ধের জীবনী শক্তি অটুট রাখিতে হইবে—এ হেন সমস্যার সমাধান কল্পে যেন আমরা সকলেই চিন্তা করি। এটা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না—বয়লারে জল না থাকিলে কল চলিবে না, সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর আহারের সাহায্য না পাইলে মস্তিষ্কই বা ক্রিয়াশীল থাকে কিরূপে ?

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমাদের দেশ অস্বাস্থ্যকর বলিয়া হাহুতাশ করিয়া কোনও লাভ নাই ; জীবন সংগ্রামে আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, জয়ী হইতে হইবে। দেশের চিন্তাশীল মস্তিষ্কোপ-জীবী মানুষ গুলিকে বাঁচাইতে হইবে, কারণ

তাঁহাদের মধ্য হইতেই দেশনায়ক, সমাজ নায়ক, সাহিত্যাচার্য্য মিলিবে। আমার মুষ্টিযোগগুলি কাহারও কাজে লাগিবে কি না বলিতে পারি না। এগুলি হাতুড়েরই মুষ্টিযোগ। ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া তবেই ব্যবহার করিবেন, তবে ভরসা এই যে অনেক সময় হাতুড়ের ঔষধও ধরে।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

তাতলৈ

তাতলৈ সাঁওতাল পরগণার একটি প্রসিদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণ। ডুম্‌কা হইতে অসমতল গিরিপথ বহিয়া ১০ মাইল যাইলে এইস্থানে পহুঁছান যায়। ভরা আশ্বিনের এক মধুর অপরাহ্নে আমি এই স্থানে উপস্থিত হই। ইহার নাম "তাতলৈ" হইবার তাৎপর্য্য কি তাহা কোনও ইতিহাসে লেখেনা। তবে আমার অনুমান হয় যে তাতল লহর হইতেই ইহার বর্ত্তমান নামকরণ। 'ভুরভুরি' নদীর পর পারে এক অনুন্নত গিরিশ্রেণীর ক্রোড়ে এই নৈসর্গিক আকরটি স্থাপিত। উপলবিক্ষিপ্তা স্বল্প বারিবিশিষ্টা, খরস্রোতা নদী অতিক্রম করিয়া আমি এক উচ্চ ভূমিতে উঠিলাম। পথপ্রদর্শক দূর হইতে অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমাকে দেখাইয়া দিল। দেখিলাম একটি জলস্রোত দূর হইতে বহিয়া আসিয়া এই নদীতে মিশিয়াছে। এবং ঐ জলস্রোত হইতে রাশি রাশি বাষ্প ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছে। আমি কৌতূহলান্বিত হইয়া দ্রুতপদে সেই দিকে চলিলাম। কিছু দূর যাইয়া দেখি একটি প্রকাণ্ড ইষ্টক নির্ম্মিত কুণ্ড রহিয়াছে। কুণ্ডটি প্রায় ৪॥০ ফুট গভীর। অতি সাবধানে আমি কুণ্ডের মধ্যে অবতরণ করিলাম। ইহার অভ্যন্তরে জল অতি সামান্যই এবং ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত প্রস্তরাদিও রহিয়াছে। ভিতরে বেশ গরম বোধ হইল। স্থানে স্থানে অনর্গল জল উত্থিত হইতেছে এবং ছিদ্রপথ দিয়া উহা বাহির হইয়া নদীতে গিয়া মিশিতেছে। স্পর্শ করিয়া দেখিলাম যে জলের উষ্ণতা (Temperature) বিভিন্ন প্রকারের। কোথাও কোথাও এত গরম যে হস্তদ্বারা অনুভব করা দুঃসাধ্য! আমার বিশ্বাস যে চাউল প্রভৃতি এখানে অনায়াসেই সিদ্ধ হইতে পারে।

এই কুণ্ডের জল আবদ্ধ করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট ইহার উপরিভাগে একটি জলনিষ্কাষণের পথ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শুনা যায় যে এই প্রচণ্ড উষ্ণ জলস্রোত ইষ্টক প্রাচীর ভাঙ্গিয়া আপনার পথ প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। যখন শ্রাবণের বিপুল জলধারা ভীষণ তরঙ্গভঙ্গে নিম্ন-প্রবাহিনী তরঙ্গিনীকে আক্রমণ করে এবং প্রচণ্ড বন্যা এই প্রস্রবণের উপর দিয়া বহিতে থাকে তখনও সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীগণ আশ্চর্য্য হইয়া দেখে যে বন্যার হিমস্রোতের নিম্নে উষ্ণ স্রোত সেইরূপ ভাবেই প্রবাহমান।

মাঘ মাসের প্রথম দিবস হইতে একপক্ষ কাল যাবৎ এখানে একটি মেলা বসে। তখন এখানে বহু দূর হইতে বহু প্রকার লোকের সমাগম হইয়া থাকে। চর্ম্মরোগবিশিষ্ট লোকেরা ব্যাধি-মুক্তির আশায় ভক্তিভরে এইস্থানে স্নান করে এবং অবগাহনান্তে প্রস্তর খণ্ডে সিন্দুর লেপন করিয়া যুক্ত করে প্রার্থনা করে। যাহারা সন্তানের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছে এরূপ বহু বন্ধ্যা নর নারী—অঞ্জলিপূর্ণ বারি পান করে—তাহাতে তাহারা সফলকাম হয় কি না ভগবানই জানেন।

উষ্ণ জলস্রোতের তীরে একটি হতভাগ্য 'কুরুম্' বৃক্ষ আছে যাহার জন্ম কেবল এই কুসংস্কারাছন্ন হতভাগ্যদিগের পরিত্যক্ত, জীর্ণ, ছিন্ন চীর বহন করিবার জন্য। বায়ুভরে যখন এই মলিন বস্ত্রখণ্ডগুলি শূন্যে উড়িতে থাকে তখন মনে হয় যেন অন্ধ বিশ্বাসীর জয়ধ্বজা উড়িতেছে।

যথাসম্ভব দেখিয়া শুনিয়া আমি প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করিলাম। চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মধুর, বড়ই শান্ত। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। মুহূর্ত্তে সমস্ত বনমালা, তরঙ্গারিত গিরিশ্রেণী, শ্যামল শস্যক্ষেত্র, ছায়াবহুল পার্ব্বত্য পল্লী শারদসন্ধ্যার স্নিগ্ধক্রোড়ে আত্ম সমর্পণ করিল। ঊর্দ্ধে, নির্ম্মল সুনীল গগনে দ্বাদশীর চন্দ্র জ্বলিয়া উঠিল। সেই সময় 'বারা' নামক একটি সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রতিমা বিসর্জ্জন হইতেছিল। বিসর্জ্জনের করুণ রাগিনী, চির প্রফুল্ল সাঁওতাল স্ত্রীপুরুষদিগের উচ্চ হাস্য-ধ্বনি, তাহাদের বিচিত্র বাঁশীর সুরলহরী এবং নৈশ হিল্লোলভরা জ্যোৎস্নাময়ী নিস্তব্ধ রাত্রি আমার প্রত্যাগমনের পথ-শ্রমকে আনন্দিত করিয়া তুলিতেছিল।

অমল চন্দ্র দত্ত।

সমালোচনা

তুলির লিখন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত ও ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য একটাকা।

তুলির লিখন—কবির মৌলিক রচনা; অনেকগুলি একাত্মিকাপদ বা একোক্তি গাথা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এই গাথাগুলিতে কবির কোনো ব্যক্তিগত ভূমিকা নাই;—ইহা অনেকটা "মনোলগ"এর মত। বিষয়গুলি সুনির্ব্বাচিত; মানব-চিত্তের সহানুভূতির তন্ত্রীতে সেগুলি সহজেই ঝঙ্কার তোলে।

দেশের ইতিহাস, ইতিকথা প্রভৃতির মধ্যে অনেক সৌন্দর্য্য রূপকথার ঘুমন্ত রাজপুরীর রাজকন্যার মত অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, কবি তাঁহার সোনার কাটির পরশ দিয়া সেগুলিকে জাগাইয়া তোলেন, তখন তাহা নূতন জীবন লাভ করিয়া নূতন আনন্দের সৃষ্টি করে। বর্ত্তমান গ্রন্থের অনেক কবিতা এই ধরণের। এই গ্রন্থে প্রাচীন কাহিনী,—অনেক দিনের শোনা কথা--কবি-চিত্তের নবীনতার ভিতর দিয়া আমাদের কাছে নূতন রূপ ধরিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এই ধরণের রচনায় একট

কাঠামো পাওয়া যায় বলিয়া, ইহা একদিকে যেমন সহজ, অপরদিকে তেমনি শক্ত—কারণ ইহাতে নবীনতার অরুণ আভা না পড়িলে ইহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়—এবং সেই আভাটুকু দেওয়া তেমন সহজ নহে। বর্ত্তমান গ্রন্থে কবি একার্য্যে সফল হইয়াছেন—ইহাই এই গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসার কথা।

এই কাব্যের প্রথম গাথা—বিদ্যুৎপর্ণা। বিদ্যুৎপর্ণা একটী অপ্সরা; কবি "হদিস" দিয়াছেন, মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য এই ঐতিহাসিক গন্ধ কাব্যটিকে বিশেষ কোনো মূল্য দান করে নাই। ইহাই যথেষ্ট সে স্বর্গের অপ্সরা! ইন্দ্রের সভায়, তাহার কনক নূপুর সিঞ্জিত হয়;—মন্দাকিনীর কূলে, পারিজাতের উপবনে লীলা-অলস পরিক্রমণে তাহার চরণ অনভ্যস্ত নয়। বাকীটুকু কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—কল্পনা ও হৃদয় দিয়া।

অনন্ত সৌন্দর্য্য. ভোগ ও স্বপ্নের রাজ্য স্বর্গ। কামচারী, মুক্তবন্ধন তাহার অধিবাসী। তাহার প্রাণের নিভৃততম কোণে সখেদ ক্রন্দন গুমরিয়া উঠে কেন? —কেন সে প্রাণ মর্ত্ত্যের ধূলার পানে সতৃষ্ণদৃষ্টি জাগাইয়া রাখে?—কবি তাহাই বুঝাইয়াছেন এই গাথায়।

সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনা কেমন পক্ষীরাজের পৃষ্ঠে আসন লইয়া উধাও হইয়াছে তাহার আভাষ দিতেছি;—নিম্নোদ্ধৃত চিত্রটি কবি শেলীর তুলির অমর্য্যাদা করিত না:—

শুক্ল শারদ রাতে জোছনার সিন্ধু,
মেঘের পদ্মপাতে মোরা মণিবিন্দু!
মেঘের ওপিঠে শুয়ে
ধরণীরে দেখি নুয়ে
আঁখিজল পড়ে ভুঁয়ে
দেখে চেয়ে ইন্দু!

এই চিত্রে, শুধু নিসর্গের সৌন্দর্য্য নয়, ইহাকে মনোরম করিয়াছে অন্তর্প্রকৃতির দ্যোতনা। সৌন্দর্য্যের মর্ম্মতলে যে গূঢ় নীরব ক্রন্দন তাহার সন্ধানই কাব্য। তাই কবি গাহিয়াছেন সৌন্দর্য্যের এই যে ক্রন্দন ইহাতে সহানুভূতি করে আর . একজন;—সে সুধাকর ইন্দু! এই গাথাটিতে এরূপ অনেক মুক্তা ছড়ান আছে!

আর একটি গাথা—সূর্য্যসারথী; পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে। অরুণের জন্মকথা। মহাভারতের বিপুল আশ্রয়ে, সাধারণের অলক্ষ্যে, যে রত্নশিলা বিস্মৃতির ধূলা-মাটিতে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল—কবি অবলীল কৌতুহলে তাহাকে কাটিয়া, মাজিয়া,-ঘষিয়া শিল্পীর আনন্দে ভাস্বর করিয়াছেন। মহাভারতে ছিল উপাখ্যান; যাহার মূল সূত্রটি খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট, যাহা নিতান্ত দুর্ব্বোধ ও আকর্ষণহীন। কবি দিয়াছেন কাব্য; যাহা সৃষ্টির মাধুরীতে রমণীয় এবং মানবচিত্তের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে ব্যগ্র। মহাভারতের উপাখ্যানরহস্য—কি সুন্দর অর্থের মধ্যে প্রস্ফুট হইয়াছে। বিনতার উপাখ্যান এখানে না বলিলেও চলে—কিন্তু এইটুকু বুঝাইলে আলোচ্য গাথাটির মূল্য বুঝা যাইবে। মহাভারতে আছে বিনতা ইচ্ছাপুর্ব্বক অধৈর্য্য হইয়া ডিম্বের আবরণ ভেদ করিয়াছিলেন। কিন্তু কবি বুঝাইয়াছেন যে এরূপ বলিলে বিনতার ঋষিস্বামীর অমর্য্যাদা করা হয়। তাই কবি বলিলেন:—

"সতীনীর ছেলে ক্রূর সর্পেরা
দ্যায় তোরে লাঞ্ছনা!"

সেই লাঞ্ছনার পুঞ্জীভূত বেদনার কাতরতার মাঝে, বিরুবা নারী সংযমের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছেন একমাত্র দুঃখের দোসর পুত্রের মুখদর্শনের আশায়।

"অথবা জাগালে, দুখের দোসর
বড়ই একাকী জেনে"!

মানবপ্রকৃতির নিয়মের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া কবিতাটি গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে।

এই গ্রন্থে অনেকগুলি গাথা স্থান পাইয়াছে—প্রত্যেকটিতে বিশেষত্ব আছে। "শোভিকায়" রূপজীবিনীর ব্যাকুল প্রেমপিপাসা; "অনার্য্যা"তে নারীর মাতৃত্ব-মহিমা; "পরিব্রাজকে"—ধর্ম্মপিপাসুর চিত্তের দুর্ব্বলতা; "রাজনন্দিনী"তে রাজকুলজাতা নারীর আত্মমর্য্যাদা; "বশমন্ত্রে"—চিত্রকরের নিষ্কাম সৌন্দর্য্য-সাধনা; "শবাসীনে" বহির্নিষ্ঠ সাধন-চেষ্টার উপর

সনাতন মানবপ্রকৃতির জয়; "পরেয়ায়"—মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদ রচনা; "সতীতে" দৃঢ়চরিত্রা নারীর আত্মলোপী নিষ্ঠা। "দেবদাসীতে" কাল্পনিক ও বাস্তবের রূঢ় সংঘাত—এইরূপ বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় "তুলির লিখন" অপূর্ব্ব সুন্দর হইয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যে এরূপ রসে পরিপূর্ণ কাব্য বিরল। কাব্যামোদীর নিকট এ অমূল্য রত্ন যে যথোচিত সমাদৃত হইবে—একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।

সমসাময়িক ভারত—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, প্রণীত। এই পর্য্যায়ভুক্ত গ্রন্থাবলী বঙ্গীয় পাঠকের যথেষ্ট প্রীতি আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছে। সম্প্রতি ইহার অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে ফাহিয়ান প্রভৃতি কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজকের বর্ণনা টীকাসহযোগে প্রকাশিত হইয়াছে।

চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণনা না থাকিলে প্রাচীন ভারতের, বিশেষতঃ বৌদ্ধযুগের ভারতের, অনেক স্থানের পরিচয় বা নিদর্শন আমরা কিছুই জানিতে পারিতাম না। আজ যে তক্ষশীলা বা পাটলিপুত্রের খননে বৌদ্ধযুগের সহস্র সহস্র কীর্ত্তিস্তম্ভ লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইতেছে, ইহার একমাত্র কারণ চৈনিক পর্য্যটকগণের বৃত্তান্ত। এই সকল বৃত্তান্ত বহু মূল্যবান; এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানিতে হইলে এই সকল পাঠ করা অত্যাবশ্যক। বিলাতের কয়েকটি ভাষায় এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ গুলি আমাদের দেশের জিনিস হইলেও এযাবৎ আমাদের দেশীয় ভাষায় ইহার রূপান্তর হয় নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে ইহা বঙ্গভাষায় প্রকাশিত করিয়া মাতৃভাষার পরিপুষ্টি ও বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

আমরা সংক্ষেপে গ্রন্থের কয়েকটি বিশেষত্ব উল্লেখ করিতেছি। সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে ইহার ছবি। অধিকাংশ ছবি এ পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। কতকগুলি গবর্ণমেণ্টের কোনো কোনো পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বহু মূল্যবান গ্রন্থ ক্রয় করিয়া এই সকল ছবি দেখা সাধারণ পাঠকের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। এই সকল ছবির জন্য গ্রন্থকারকে বিলাতের সেক্রেটারী-অব-ষ্টেট ও এখানকার ভারত ও বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হইয়াছে। গ্রন্থকারের সৌভাগ্যবশতঃ প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের মিঃ স্পুনার ও পাটনা-কলেজের অধ্যাপক মিঃ জ্যাকসন এই গ্রন্থের জন্য বিশেষভাবে কতকগুলি ফটোগ্রাফ দিয়া গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।

দ্বিতীয় কথা, এই গ্রন্থে যে পাদটীকা দেওয়া হইয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক প্রস্তুত। এ গুলি যে কিরূপ মূল্যবান তাহা বিশেষজ্ঞ পাঠকগণ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

তৃতীয়, রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় লিখিত ভূমিকা। কি প্রকারে ভারতীয় শ্রমণগণ চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন এই ভূমিকায় তাহা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত একটি সুন্দর নির্ঘণ্ট পত্রও প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সুন্দর। একখানি দ্বিবর্ণে রঞ্জিত মানচিত্র, তিনখানি বহুবর্ণে চিত্রিত ও ১৬ খানি একবর্ণে চিত্রিত ছবি আছে।

আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। এই শ্রেণীর গ্রন্থ যদি আমাদের দেশের পাঠক-সমাজে আদৃত না হয় তাহা হইলে আমাদের ইতিহাস-সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিবে;—ভবিষ্যতে কোনো গ্রন্থকার এমন কাজে হাত দিতে হয়ত আর উৎসাহ বোধ করিবেন না।

প্রতারণা

হাসিখেলার অভিনয়ে অশ্রুজলে ঢাকি,
ভেবেছিলাম এম্‌নি করে তোমায় দেব ফাঁকি ;
—বুকে আমার যে সুর বাজে, গুঞ্জরে যা মর্ম্মমাঝে,
ভেবেছিলাম সুখের সাজে রাখ্‌ব তারে ঢাকি,
হাসিখেলার মিথ্যা ছলে তোমায় দিয়ে ফাঁকি।
প্রভাত যখন দ্বিপ্রহরে হ'ল পরিণত,
তপ্ত বায়ু ঠেকল পায়ে অগ্নিকণার মত,
শরীর যখন ক্লান্তিভরে লুটিয়ে পড়ে মাটির পরে
তোমার ছবি হৃদয় সরে গোপন করি তত,
তখন আমায় টান্‌লে কোলে, কোলের ছেলের মত।
দাঁড়িয়ে খোলা মাঠের পরে, অভিমানে নয়ন ঝরে
বলিনি ত আমার তরে রাখনিক স্থান,
নয়ন-জলে চরণ-তলে ডাকাইনি ত বান।
তবুও তুমি কেমন করে জেনে নিলে আজ
যে কথাটি গোপন ছিল আমার হৃদয় মাঝ ;
কেমন করে ধর্‌লে তুমি আমার প্রতারণা,
সেই কথাটি তোমার কাছে হয়নি কেবল শোনা।
ভিজিয়ে নিয়ে অশ্রুজলে শিশির ধোয়া দূর্ব্বাদলে
অভয় দিলে চরণতলে ঘুচিয়ে আনা-গোনা
কেমন করে ধর্‌লে তুমি আমার প্রতারণা ॥

শ্রীইন্দিরা দেবী।

বীর বন্দনা

হে সৈনিক, মহাবীর, স্বদেশী আমার,
তোমার বীরত্বে মুগ্ধ দ্যুলোক ভূলোক ;
ক্ষুদ্র আমি মহা গণি ভাই ব'লে ডাকি,
ভুলেছি গৌরবে তব, অধীনতা শোক।

মিলায় অসীম শূন্যে নক্ষত্র যেমতি
প্রদীপ্ত মহিমা শুধু করি বিকিরণ, ;
কেহ নাহি জানে প্রতি অণু মাঝে তার
কত জ্বালা জ্বলে মহা তীব্র সুভীষণ !

তোমার এ আত্মদান আরও সমুজ্জ্বল !
এ মৃত্যু বরণ নহে আপনার লাগি,
নহে স্বদেশেরো তরে ,—স্বার্থ মাত্র হীন !
এ শুধু কর্ত্তব্য ব্রত, ওহে পুণ্যভাগী !

যতদিন বিশ্ব নহে প্রলয় মগন,
সূর্য্য চন্দ্র কক্ষপথে রবে ধাবমান,
তব কথা নামাবলী ধরি অঙ্গ পটে
বসুন্ধরা গাবে গর্ব্বে এই যশোগান।

কেমনে প্রশংসি তোমা ?—নাহি কোনো ভাষা,
এ মহাসমরে আশা, দেবতার তুমি,
জানিনা কি অর্ঘ্যে বীর বন্দিব তোমারে,
তব নামে দেশ ধন্য, ধন্য পরভূমি।
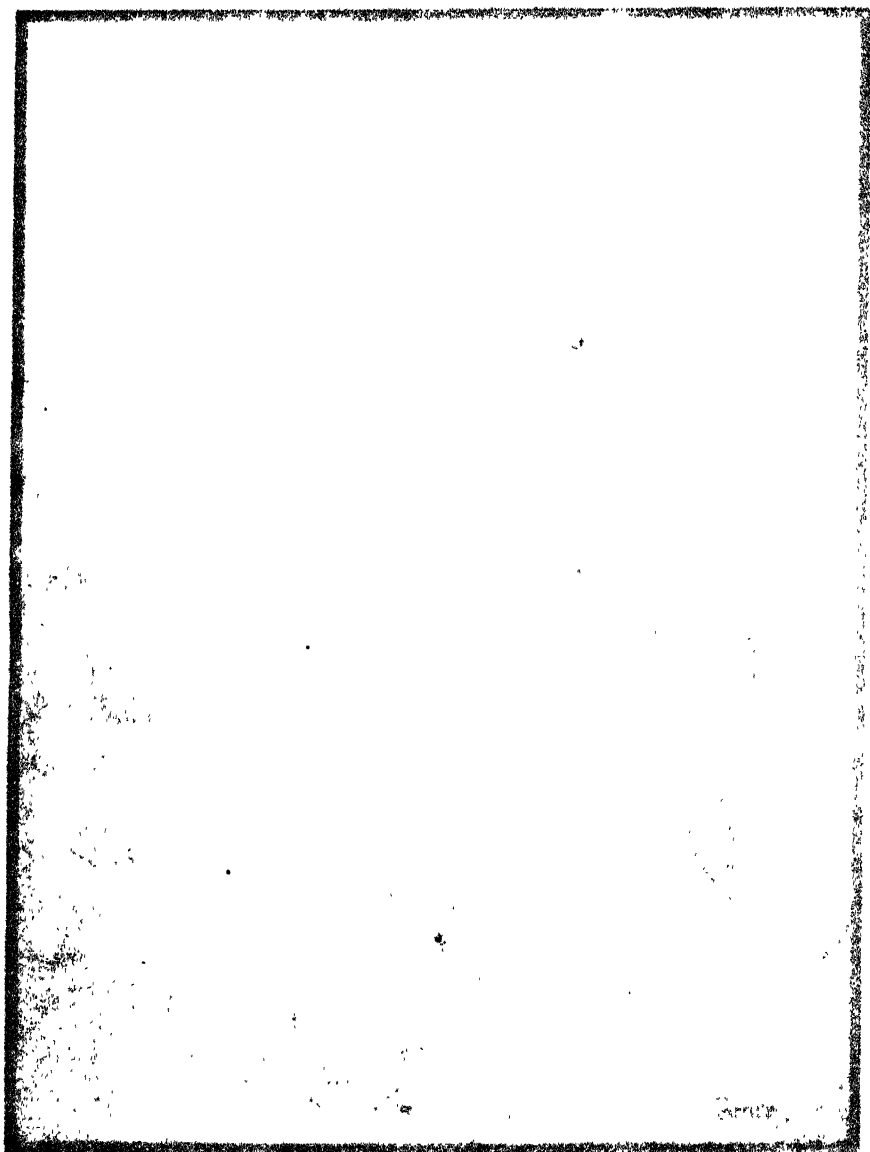
কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

৩৮শ বর্ষ] পৌষ, ১৩২১ [৯ম সংখ্যা

লাইকা

(২৪)

সন্ন্যাসিনী স্বহস্তে বারিকে ছদ্মবেশে সাজাইয়া দিলেন।—প্রথমত চুল কাটিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে সাবিত্রী মহা গোল বাধাইল! রাগিয়া কাঁদিয়া অনর্থ করিল—, অবশেষে তিনি অতি যত্নে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া দিয়া চুপি চুপি বারিকে বলিলেন,—"আজ এই থাক্, যদি প্রয়োজন বোধকর—তোমার বস্ত্রের মধ্যে ছুরি দিয়াছি, —কাটিয়া ফেলিও!—"

তাহার পর তিনজনে পথে বাহির হইলেন। বারির মুখ বর্ষাপ্রভাতের ঘোর নীলিমাচ্ছন্ন, সন্ন্যাসিনী চিন্তাকুলা,—কিন্তু সাবিত্রী প্রসন্ন কটাক্ষে বারির প্রতি চাহিতে চাহিতে চলিতেছিল! অন্যান্য দিনের ন্যায় বারি তাহার পার্শ্বে আপনাকে ঢাকিয়া চলিতেছিল—গ্রাম সম্মুখীন্ দেখিয়া সাবিত্রী বলিল—"একটু সাবধান হ বারি। আজ যে তুই পুরুষ?"—

বারির মুখে একটু হাসির আভাব দেখা গেল—সাবিত্রী একবার অলক্ষ্যে তাহার হাত ধরিয়া টিপিল!—গ্রাম পথে নূতন দৃশ্য—দুইধারে পথিপার্শ্বে প্রভাতের হাট বসিয়াছে। তখন অধিক জনতা নাই, একে একে লোক জমিতেছে, দূর গ্রামের ফল মূল বিক্রেত্রীরা বড় বড় ডালা মাথায় করিয়া আসিয়া সহযোগী বা সহযোগিনীর সহিত স্থান লইয়া কলহ করিতেছে—কেহবা চট পাতিয়া শাক সব্জি সাজাইয়া বসিয়া আছে!—পথ দিয়া রাখাল বালকেরা গরু লইয়া যাইতেছে তাহাদের মুখে কজরী গীত!—ক্রমে হাটের পথ দিয়া বড় বাজারের ভিতর দিয়া তাহারা গ্রামে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসিনী দেখিয়া অনেকেই তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল! ক্রীড়ানিরত বালক বালিকারা দূরে সরিয়া গেল।

গ্রাম শেষ; দূরে দূরে দুই একখানি গৃহস্থের আবাস গৃহ। প্রায় প্রত্যেক গৃহের পার্শ্বেই কঞ্চির বেড়া বাঁধা ভিটায় জনরার ক্ষেত,—সদ্যোজাত শষ্য রক্ষার জন্য স্থানে

স্থানে উঁচু মাচা বাঁধিয়া এক একটি বালক বসিয়া আছে।—

গ্রাম ছাড়াইয়া পার্ব্বত্য নদীর পার্শ্ববর্ত্তী বক্রপথ বহিয়া তাহারা এক প্রাচীর বেষ্টিত প্রকাণ্ড দেবালয়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বারী সন্ন্যাসিনী গণকে প্রণাম করিয়া বলিল—আপনারা কি প্রবেশ করিবেন?

প্রধান মন্দিরের আশে পাশে অনেক ছোট ছোট মন্দির—দুই ধারে বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যান। সবেমাত্র প্রভাতী পূজার শেষে এখনও ঘোর রোলে ঘণ্টা বাজিতেছে।—তাহারা প্রথমত গিয়া মহাদেবকে প্রণাম করিল। দ্রুত চক্ষে সন্ন্যাসিনী একবার চারিদিকে চাহিলেন—লাইকা তথন নাই! তথন বিরলে একজনকে প্রশ্ন করিলেন,—ভৈরোজির ঘরে যে সাধু থাকেন তিনি কোথায়?"

সে বলিল,—"কে, লাইকাজীর কথা বলিতেছেন?"

হাসিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন "হাঁ"—

"তিনি ত এইমাত্র এখানে ছিলেন,—এখনি উঠিয়া গেলেন, বোধহয় মাঠ কি বাগানে কিম্বা কোথায় তাহা ঠিক বলিতে পারিনা।" বলিয়া সে চলিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, সাবিত্রী তুমি এইখানে দাঁড়াও আমি তাহাকে দেখিয়া আসি,—"

তিনি যাইতে উদ্যত এমন সময় মঠের একজন কর্ম্মচারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহারা অদ্য এইখানেই প্রসাদ পাইবেন না অন্যত্র যাইবেন?" তিনি সম্মতি জানাইয়া বলিলেন "হাঁ প্রসাদই পাইতে ইচ্ছা করি,—কিন্তু মহাশয়! লাইকা এখন কোথায় আছেন দেখিয়াছেন কি?"

"হাঁ দেখিয়াছি বৈ কি! তিনি ভৈরো মন্দিরের দুয়ারে আছেন তাঁর শরীর কাল হইতে কিছু অসুস্থ তাই শুইয়া আছেন এখন।"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "তাহা আমি কালই শুনিয়াছি; তাহা হউক এস—সাবিত্রী তোমরাও এস!" বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। লোকটি বলিলেন—"মাতার সহিত কি তাহার পরিচয় আছে?"—

"হাঁ"। সাবিত্রী একবার বারির প্রতি চাহিল, কোন ভাবান্তর দেখা যায় না। লোকটি বলিলেন,"—আপনারা কি স্থানও চান? তাহা হইলে চেষ্টা দেখি।—" সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"না আমরা আজই যাইব।—"

তখন তাঁহাদিকে প্রণাম জানাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসিনী ফিরিয়া দেখিলেন সাবিত্রী ও বারি তাঁহার অনেক পশ্চাতে!—বলিলেন,—শীঘ্র চলিয়া এস তোমরা!" "যাই মা" বলিয়া সাবিত্রী বলিল, "ভৈরোজির মন্দির কোনটা?"

বলিতে চলিতে সন্ন্যাসিনী বলিলেন "এই সে সম্মুখেই! আর ওই যে পার্শ্বের দেয়ালে ভর দিয়া বসিয়া আছে—দেখিতেছ কি! ওই লাইকা!"

হর্ষোৎফুল্ল বিস্ময়ে সাবিত্রী বলিল—"কৈ! কৈ মা লাইকাকে দেখিতে আমার ভারি ইচ্ছা করে! ঐ যে থামে মাথা দিয়া বসিয়া আছেন উনিই কি?—"

হাসিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"হ্যাঁ, কিন্তু

সাবিত্রী অত ব্যস্ত হইতেছ কেন? এ ব্যগ্রতা বা অধৈর্য্যের সময় নয়—তোমরা খুব সাবধানে থাকিবে নতুবা লোকে বা লাইকা সন্দেহ করিতে পারে!"

সাবিত্রী বুঝি সেকথা ভাল করিয়া শুনিল না, মুখ ফিরাইয়া কম্পিত বিগলিত স্বরে ডাকিল—"বারি!" বারি অধোমুখী, মাথার পাগড়ীতে ক্ষুদ্র মুখখানি যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ব্যস্ত ভাবে সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"ওকি সাবিত্রী! কি বল? সাবধান হও, চাঞ্চল্যের সময় নয় বুঝিতেছ না!"—তখন বারি অতি মৃদু স্বরে বলিল "আমি এইখানেই থাকি না মা?"

"না—না, সে কি হয়? এস শীঘ্র চলিয়া এস।"

লাইকা তখন আকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কি ভাবিতেছিল,—তাহার চক্ষু প্রসন্ন কিন্তু যেন উদ্দেশ্যবিহীন। তাহার সমস্ত আকৃতি হইতে এমন একটা অকাতর অনভিলাষের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল যাহাতে অতি সাধারণ চক্ষুও বিস্মিত ও ব্যথিত হয়!—

সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া সে প্রথমত চমকিত পরে মৃদু হাসিতে হাসিতে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—এই কি আপনার সেই শরণ?" বলিয়া বারির অতি নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিতে উদ্যত হইল। সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ এই সেই চির দুঃখী বালক! কেন সরিয়া যাস্ বাছা! প্রণাম কর, ইনিই লাইকা!" বলিতে বলিতে সন্ন্যাসিনীর স্বর যেন আর্দ্র হইয়া গেল,—পাছে বারি বা সাবিত্রী কোন অধীরতা প্রকাশ করে এই আশঙ্কায় তিনি স্তব্ধ হইলেন।

সত্যই বারি তখন সাবিত্রীকে এড়াইয়া অন্য একটি স্তম্ভের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখের লজ্জা-বিবর্ণতা শরীরের ভীতিচাঞ্চল্য লাইকাও দেখিয়াছিল—সে বিশেষ করিয়া তাহাকেই দেখিতেছিল,—সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "আমার এই বালকটি বড় ভীরু, লাইকা তুমি"—

বাধা দিয়া স্নিগ্ধ হাসিমুখে লাইকা বলিল,—"তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু জননি! আমি যে আজ বড় আশ্চর্য্য হইলাম! অমন কোমল সুন্দর মুখ আমি জীবনে দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না। এস শরণ! আমার কাছে ভয় পাইবার কি আছে ভাই?"

বলিয়া সে বারির নিকটে আসিয়া তাহার স্কন্ধে হাত রাখিল! তখন অতি সন্তর্পণে তাহার স্পর্শ ছাড়াইয়া বারি তাহাকে প্রণাম করিয়া সরিয়া গেল। লাইকা হাসিল।

সাবিত্রী প্রফুল্ল বদনে বারির এই বিপদ দেখিতেছিল—তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই, লাইকা বলিল, "আর ইনি কে মা—বালিকা সন্ন্যাসিনী?—

হাসিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "ইহাকে আমার কন্যা বলিয়াই জানিবে, আমার ভগ্নীর মাতৃহীন কন্যা, বাল্যকাল হইতে আমার নিকটেই আছে!"—

"উত্তম! কৌমার ব্রহ্মচারিণী?"—

একবার সাবিত্রীর প্রতি চাহিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"কতকটা তাই বটে,—বালবিধবা!—সাবিত্রী মৃদু হাসিল!—কিন্তু মুখ তুলিবা

মাত্র যখন দেখিল লাইকার বিস্মিত করুণ চক্ষু তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রসর্পিত হইতেছে—তখন তাহার হাসি যেন ম্লান হইয়া গেল, —লজ্জিত হইয়া—দূরে বারির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।—হাসিয়া লাইকা বলিল, "সন্তানকেও লজ্জা করিতেছ মা!"—

(২৫)

বিদায় কালে সন্ন্যাসিনী বারি ও সাবিত্রীকে একটু নির্জ্জন আলাপের অবসর দিলেন। উদ্যানের এক নিভৃত অংশে মাধবীলতার ঘন বেষ্টনের অন্তরালে আসিয়া বারি সাবিত্রীকে জড়াইয়া ধরিল!—"থাক দিদি—একটু চুপ করিয়া থাক্! আজ সমস্ত দিন আমি তোকে পাই নাই।" বলিয়া সে সবলে তাহাকে বুকে চাপিতে লাগিল।

সাবিত্রীরও বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতেছিল না কতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল,—"না —আর আমার কোন আশঙ্কা নাই ভাই!—আজ আমার মনে হইতেছে যে তোর সকল বিপদ—আজকার এই মেঘমুক্ত আকাশের মত পরিষ্কার হইয়া গেছে!—কোন ভয় করিস্ না,—তোর কিছু ভয় নাই আর এ তুই স্থির জানিস্ বারি!—লাইকা এমন? এমন সূর্য্যের মত উজ্জ্বল—চন্দ্রের মত শীতল তাহাত জানিতাম না! আমি আজ সকালেও আশঙ্কা করিয়াছি যে না জানি তোর অদৃষ্টে কি আছে আরো—কিন্তু আর ত আমার সংশয় নাই ভগিনি!—"

বারি কোনও উত্তর দিল না,—

সাবিত্রী আবার বলিল,—"সমস্ত দিনমানে তুই একবারো স্বামীর প্রতি চাহিস্ নাই! কেন এতটা সহ্য করিতেছিস্? একবার দেখিস্ বারি! তোর এত কষ্টের এত বেদনার কেমন সফলতা—তাহা আমার সম্মুখেই একবার অনুভব কর ভাই!—"

বারির বক্ষের আন্দোলন ঘন হইতেছে—তাহা সাবিত্রী বুঝিল, তাহাকে তৃণের উপর বসাইয়া বলিল,—"সর্ব্বদা এমন মন খারাপ করিয়া অধৈর্য্য হইলে চলিবে কেন বারি?—তুই—ত এমন ছিলি না—কি হইয়াছে কয় দিন তোর? কেন এমন করিস?" তাহার বক্ষের উপর সম্পূর্ণ ভাবে দেহভার রাখিয়া বারি বসিয়াছিল,—কথা শেষ হইলে মৃদু হাসিয়া বলিল,—"কি হইয়াছিল আমার? সে কথাটুকুই শোন্ দিদি?—আর আমি এমন অধীর হইব না—কখনো হই নাই সে কথাও সত্য, কিন্তু এখন কেন হইতাম তাহা আজ বুঝিয়াছি,—তোর বুকের ভিতর হইতে যখন আমার বুকের রক্তেরই ঠিক শব্দ টুকুর—অবিকল ব্যথা টুকুর ধ্বনি শুনিতাম তখনই না আমার প্রাণের সব স্পন্দন ঐখানে কান দিত?

দিদি আর তা কোথায় পাব? আর কেন তা হবে?"

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"এই কথা? বটে! তোর ব্যথায় কেবল তোর এই কুড়ানো দিদির প্রাণেই বাজিত এ ভুল বিশ্বাস টুকু—"

"না না, ভুল বলিও না? আমাকে

ভালবাসিবার অনেক লোক আছে বটে—কিন্তু আমার সব সুখ সব দুঃখ ঠিক আমারই মত ভাবে অনুভব করে এমন ত কেউ ছিল না ভাই?—আজ যখন তুমি আমাব নিকট হইতে দূরে চলিয়াছ তখন আর একবার আমাব অন্তরকে ছুঁইয়া যাও দিদি—বুঝিয়া যাও তুমি আমার কি ছিলে?"

খানিকক্ষণ দুইজনেই নীরব থাকিল। বাহিরে বাদ্যমঞ্চ হইতে ইমনের প্রচণ্ড মধুর ধ্বনি চারিদিক ভরিয়া তুলিয়াছিল, বাতাসে, বকুলের রজনীগন্ধের সুমিষ্ট গন্ধ!—

বারির শ্রান্ত অবসন্ন দেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে সাবিত্রী বলিল,—"আমারও একটু শেষ কথা ছিল বারি! যদি তাহা বলিতে পারিতাম তবে বোধ হয় তোর কথার অপেক্ষা বড় বেশী অকরুণ হইত না! আমার জীবন—তার পর তুই; কিন্তু—কিন্তু ও বারি! আজ যে কিছুতেই আমার দুঃখ হয় না ভাই!

তোর লাইকার কথা শুনিয়া আমার আর কোন ক্ষোভ নাই—কোন ব্যথা নাই!—বেশ! এমন কি, তোকে ছাড়িতে হইতেছে—এত বড় একটা ব্যথা, যাহা ভাবিয়া কাল রাত্রি পর্য্যন্ত আমি লাইকার উপর দ্বেষ করিয়াছি—আজ তাহাও আমার মনে নাই! তুই সুখী হইবি—নিশ্চয় সুখী হইবি এই বিশ্বাসে আজ আমার মনে কোন আঁধারই দাঁড়াইতে পাইতেছে না! তোর ঐ শেষ আদরটুকু পাইয়া আমার কতখানি সুখ হইল কেবল, সেই টুকুই তুই বুঝিস বারি—আমি আজ বড় সুখ লইয়া এখান হইতে চলিলাম—আবার শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে এ বিশ্বাসও রাখি—আজ—বারি! আমার এ জন্মের সার্থকতা! তুই—"

বলিতে বলিতে সাবিত্রীর স্বর গদ্‌গদ হইল—সে সাদরে বারির ললাটে চুম্বন করিল। বারির চোখের জলে তাহার বুকের কাপড় ভিজিতেছিল—মুছাইয়া দিয়া সে বলিল,—না কান্না নয় আজ আর এ নয়!"—

বারি বলিল—"একটা কথা দিদি!"

"বল, কিন্তু কাঁদিতে পাইবি না!"

বারি বলিল—একটা প্রণাম লও,—কখনো ত লও নাই!"—

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল। বলিল—"বটে, এই কথা? তা দে না ভাই?"—বলিয়া স্কন্ধ দেশে চাপ দিয়া তাহার মাথা আনিয়া আপনার পায়ের নিকট সজোরে ঠুকিয়া দিল। বারি শশব্যস্তে ঘাড় তুলিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—গেলাম যে—করিস্ কি দিদি! এমনি করিয়া বুঝি কেউ প্রণাম করে?"

"করে, ঠিক এমনি করিয়াই প্রণাম করিতে হয়, কোথাও একটু ব্যথাই যদি না থাকিল তবে আর প্রণাম কি? কিন্তু সে সব ত হইল এখন দেখিয়াছিস কি? ঐ দেখ মা আর লাইকা আসিতেছেন!"

"কোথায়?" বারি চমকিয়া উঠিল।—সাবিত্রীর হাত টানিয়া বলিল—"সত্যই ত। দিদি চল ভাই! চল এখান হইতে। শীঘ্র চলিয়া আয়!"

"কেন রে ভয় কি?" সাবিত্রী এই কথা বলিল বটে কিন্তু নিজেই পলাইবার উদ্যোগেই ব্যস্ত ছিল—বারি বলিল, "তুই না হয় থাক্—আমি"

বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিল,—"সেকি হয়? তুই যে ভাই পুরুষ সাজিয়া বাঁচিয়া গিয়াছিস্—আমি পলাই, নতুবা—"

বারি বলিল—"না না, আমিও যাইব ভাই, তুই একটু থাম না দিদি!"—তখনই দুইজনেই মাধবীলতার অন্তরাল দিয়া পলাইল।—

(২৬)

বারি অতিকষ্টে লাইকার সহিত দুটি একটি কথা বলিতেছিল।—লাইকা সর্ব্বদাই তাহার যত্ন লইত নানা প্রশ্নে তাহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিত এবং যথোচিত উত্তর না পাইয়া—"শরণ! তোমার ভাবটী যেন ঠিক স্ত্রীলোকের মত!" বলিয়া উপহাস করিত, কিন্তু তখন শিহরিত দেহে বারি পালাইবার চেষ্টা করিলেও তাহা পারিত না—একা সেই জনতায় বা নির্জ্জন উদ্যানে সে থাকিতে পারিত না, সে এই ক'দিনে বেশ বুঝিয়াছিল যে স্ত্রীলোকের প্রাণে পুরুষের জনতা কেমন ভীতিপ্রদ! স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিত স্থানের নির্জ্জনতা কত আশঙ্কাময়!—আপনাকে লুকাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা সত্বেও সে সর্ব্বদা লাইকার সঙ্গেই ফিরিত। লাইকা যখন মন্দিরে—সে তখন দুয়ারে—লাইকা যখন অলিন্দে সে তখন স্তম্ভান্তরালে,—আবার স্বামী যখন বৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তানিরত, তখন অতি গোপনে নীরব চরণক্ষেপে সে আসিয়া বৃক্ষান্তরের পল্লবাবরণে লুকাইয়া থাকিত!—

সে ভাবিত লাইকা তাহা দেখে নাই—কিন্তু তাহা নহে, সে বারির এই সঙ্কোচ অথচ একান্ত নির্ভর ভাব বিশেষ করিয়াই দেখিয়াছিল,—দেখিয়া আশ্চর্য্য, চিন্তিত এবং ব্যথিতও হইয়াছিল। সে ভাবিয়া পাইত না যে এ কোন প্রকৃতির বালক,—তাহার নৈরাশ্যপ্রকাশক ম্লান চক্ষু, রক্তহীন শুষ্ক ওষ্ঠাধর, মৃদুগতি চরণক্ষেপ,—লাইকাকে কাতর করিয়া তুলিত।—হায় দুঃখী—হায় অনাথ! তুই লাইকার—এ দগ্ধ বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলি কেন? সে ভাবিত কিছুদিনে ইহার মনোভাব বুঝিয়া কোন ধনবান বন্ধুর আশ্রয়ে রাখিয়া আসিব অথবা বারাণসীতে গিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিব!—

আরও তিন চারিদিন অতীত হইল। লাইকা উত্তরোত্তর আশ্চর্য্য হইতেছিল। এ কি সেবাপরায়ণতা?—এ কি কোমলশীলতা? এ কি গোপন প্রকৃতি?—কখন কোথায় নীরবে সে কেবল তাহারই তৃপ্তির শান্তির আয়োজন করিয়া রাখিতেছে তাহা লাইকা জানিত না পরে সহসা তৃপ্তির সহিত যখন সে সেবা উপভোগ করিত তখন একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িত!—বালক ফুল তুলিতেছে দেখিয়া সে ভাবিত দেবতার জন্য। কিন্তু প্রভাতে উঠিয়া যখন নিজের উত্তরীয়, খানিকেই সেই পুষ্পবাসিত দেখিত তখন বুঝিত যে তাহার পুষ্প সংগ্রহ কেন?—লাইকা শিবপূজা করিতে ভালবাসে,—কিন্তু বালক আসিবার পর আর তাহাকে

পূজার আয়োজনের জন্য ভাবিতে হয় না, সাজিতে বিল্বদলের রক্তোৎপলের অপূর্ব্ব মাল্য দেখিয়া সে চমৎকৃত হইত! এমন দিব্য কারু বালক কোথায় শিখিল?—ক্রমে আহারে শয্যায় স্নানে উপবেশনে সর্ব্বত্রব্যাপী স্নেহ হস্তের আবেগ বিস্তারে লাইকা যেন সচকিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু কিছু বলিল না, পাছে বালক ব্যথা পায়, লজ্জা পায় এই ভয়ে সে বিনা প্রশ্নে বিনা বাধায় তাহার সমস্ত সেবা সাদরে গ্রহণ করিল। অধিক আদরেও সে ম্লান হয় দেখিয়া লাইকা তাহাকে নিজের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিল,—সে যাহাতে সুখী হয় হোক্!

লাইকা মনে মনে হাসিত। ঠিক্ কামিনী ফুলটির মত স্পর্শ অসহিষ্ণু কামিনী প্রকৃতি বালকটি এ কে? ক্রমে বিস্ময় তাহার ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া তাহাকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিত। ইহার পরিচয় কি? এতদিন কোথায় ছিল? কি ভাবে তাহার জীবন চলিতেছিল?—কিন্তু পরম ধৈর্য্যের সহিত সে নীরবে থাকিল—বালককে কোন প্রশ্ন করিল না।

সেদিন সন্ধ্যায় মেঘের বিস্তৃত আয়োজন দেখিয়া পূজারীরা শীঘ্র শীঘ্র আরতি শেষ করিয়া গিয়াছে,—প্রধান মন্দিরে দুই চারিটি লোক থাকিলেও আর কোথাও কেহ নাই; অতি দূরে ভোগমন্দিরের পার্শ্বে ধুনী জ্বালাইয়া দুইটি সন্ন্যাসী পরস্পরে বিষম তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত! এমন সময় লাইকা দেখিল অতি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কুপের তলা দিয়া মেদী ঝোপের পাশ হইয়া বারি মন্দিরের একপার্শ্বে বসিল। পরিধেয় বসন সর্ব্বাঙ্গে এমন ভাবে জড়ান যে কেবল মুখখানি ও পাদুটি ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। এই বালকের বস্ত্র পরিধান প্রণালীও তাহাকে অনেকখানি আশ্চর্য্য করিত! সে ডাকিল, "কোথায় ছিলে শরণ?"

বারি নিকটে আসিল—বলিল, বাগানে ছিলাম।"

"বস।"—একটু দূরে কপাটের নিকট বারি বসিল। তাহার অঙ্গসঙ্কোচ ও মুখ লুকাইবার ভাব দেখিয়া লাইকা মনে মনে হাসিতে ছিল, তাহার সেই কৌতুক-পূর্ণ মুখ ও স্থির দৃষ্টি বারি কখনো দেখে নাই—দেখিলে কি করিত বলা যায় না। অনেকক্ষণ দেখিয়া লাইকা তাহার হৃদয়ের কিছু আভাষ পাইল না,—যেন একটি মৌন বিষাদ—একটি অবিচল ধৈর্য্য!—সে মুগ্ধ হইল। ডাকিল,—

"নিকটে এস—শরণ শুনিতেছ?"

বারি আর একটু সরিয়া বসিল। লাইকা বলিল—"ওই বুঝি নিকট? এই-খানে এস।"

বারি সরিল না,—নত মুখখানি অন্ধকারে অস্পষ্ট হইলেও লাইকা একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাসের শব্দ শুনিল। সে স্তব্ধ হইল,—"না এই বালক তাহাকে পরাস্ত করিয়াছে! কিসের এ বেদনা কিসের এ নীরবতা—শিশু বয়সে কেন এমন মৌন প্রকৃতি? আর এত চেষ্টা করিয়াও লাইকা তাহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না? সে বুঝিল, হাসিতে বা

সুখে এ দুঃখী চঞ্চল হইবে না, গভীর হৃদয়ের অগাধ বিষাদমাত্রই তাহাকে সচেতন করিতে পারে। ভাবিতে ভাবিতে লাইকা যেন কাঁপিয়া উঠিল!—তাহার দুঃখ—তাহার নিজের হৃদয়ের বিষম ক্ষত যেন আহত হইল,—ওহো! সে যে অবাচ্য অশ্রাব্য, অন্যের সহানুভূতির অতীত বেদনা!

দন্তে অধর দংশন করিয়া সে মুখ ফিরাইল;—সম্মুখে ঘন পুঞ্জ মেঘরাশির স্বচ্ছ অবসর মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের ম্লান জ্যোৎস্না মাঝে মাঝে সেইখানে আসিয়া পড়িতেছিল,—অনেকক্ষণ কোন কথা না শুনিয়া বারি একবার লাইকার প্রতি চাহিল। কিন্তু একি? আজ এ কয়েকদিনের মধ্যে সে প্রথম দেখিল স্বামীর প্রশান্ত আকৃতি বিহ্বল, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্ল মুখ যেন মেঘে ঢাকিয়াছে! কি হইল? তিনি কি বারির প্রতি বিরক্ত হইলেন? অবাধ্যতায় ক্রুদ্ধ হইলেন?—সত্যই বিরক্ত হইবার কথা ত! সে যে প্রতিবারই তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে!—আত্মবিস্মৃত হইয়া বারি তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল—কিন্তু লাইকা ত আর কোন দিকে মুখ ফিরাইল না? সুদূর আকাশপ্রান্তে ধূমপুঞ্জবৎ মেঘশ্রেণী যেখানে বিদ্যুতের লোল অগ্নিজিহ্বা মেলিয়া শশিসনাথ নীলাকাশকে গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিতেছিল সেইখানে তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ।

বারি কিছুই বুঝিল না, তাহার স্থির বিশ্বাস হইল—যে স্বামী আজ তাহার প্রতি বিরক্ত। তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল—সে মনে মনে কি প্রতিজ্ঞা করিতেছিল।

বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, সমস্ত আকাশ সজল মেঘে পূর্ণ, চাঁদ একেবারে ঢাকিয়া গেল। স্বল্পবর্ষিত জলধারা চারিদিকে ছুটিতেছিল লাইকা সরিয়া আসিয়া শয়ন করিল। সেই ঘনান্ধকারের মধ্যে নিবিড় নীরবতা!—সেই কলনাদী বিহঙ্গকে নীরব দেখিয়া বারি অন্তরে অন্তরে তীক্ষ্ণশূলাঘাত বোধ করিতেছিল!

কতক্ষণ এইভাবে কাটিল;—বাতাসে মেঘ উড়াইয়া ফেলিয়াছে—নীলাকাশে আবার চাঁদে মেঘে লুকাচুরী খেলা সুরু হইয়াছে দূরে কদম্বের ডালে সহসা পাপিয়া ডাকিল "হো পিয়া! হো পিয়া"

বারি চমকিত হইল,—একি লাইকা হাসিল কেন? আবার পাখী ডাকিল—পিয়া পিয়া পিয়া হো!"—লাইকা তখন মৃদু মৃদু গীত আরম্ভ করিয়াছে,—

"সো নহি জানত নহি সমঝে—কেতে কাতরী হাম কেতে কাতরী!"

এতক্ষণ দ্বারে মাথা দিয়া সে শুইয়াছিল এবার বারি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় উঠিয়া বসিল—এ কি সঙ্গীত! এই কি লাইকার সেই মোহিনী কণ্ঠধ্বনি? তাহার স্মরণ ছিল না—এত মধুর তাহার স্মরণ ছিল না!—এ কয়দিন তাহার ইচ্ছা হইত স্বামীর গীত শুনিতে—কিন্তু শুনিতে পায় নাই—আজ সহসা মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় উৎকর্ণ হইয়া সে শুনিতে লাগিল।—

"আঁধিয়ারা রাত্রি পবন বহে মাতি,—
ঘন ঘন গরজত মেঘ,
বিয়াকুল চিত বচন নহি মানত—
বাঢ়ত হৃদয় আবেগ ;—

বারি দুইহাতে আপনার মুখ ঢাকিল। লুকাইতে হইবে—এ ব্যাকুলতাও লুকাইতে হইবে। এতদিন যখন বচন মানিয়াছিস, ওরে হৃদয়! আজকার দিনও মান্! এত বড় কাতরতা দিয়া সে স্বামীকে আহত করিবে না! একি গান! কি গান। কেন লাইকা গাহিল? শরবিদ্ধা পক্ষিণীর ন্যায় লুটাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়… পলাইবার জন্য বারি উঠিল।

পরিপূর্ণজ্যোৎস্না চাঁদের দিকে মুখ অথচ অন্তর্নিবদ্ধদৃষ্টি লাইকার বদন চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে! চলিতে চলিতে আর বারির চরণ সরিল না,—এ কি? যেন কোন গূঢ় বেদনায় লাইকার অধর স্ফুরিত, দেহ এলায়িত–বুকের উপর দুটি করজোড় করিয়া সে গাহিতেছে—

আজু ভয়কাতর ধরণী থর থর—
আঁখিজলে মেঘ ভাসিয়ে,—
এ ডর সাগরতর পিয়াবৈমুখ জন
দুখ ভয় কোন পতিয়ায়?
অব তুম একা মোরসাথী!
হে চির শরণ? আও আও মরণ!
পোহারহ এ দুঃখ রাতি!

বারি চাহিয়া চাহিয়া দেখিল ইহা শুধু গীত নহে,—মর্ম্মের গভীরতল হইতে এ মরণ কামনা উথলিয়া উঠিতেছে। এ অশ্রু কেবল আবেগের নয়, অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিবর্ণ মুখে তাহা যেন হৃদয়ভেদী রক্তবিন্দুর অংশ লইয়া ঝরিতেছে। আর তাহার চলা হইল না, এ কিসের রোদন? বারির অবাধ্যতায় ত নহে। তবে কি ভগবানকে স্মরণ করিয়া? এত সকাতরে? তাই সম্ভব! কিন্তু এত সকাতরে? এত কাতরে? প্রভু দীনবন্ধু! তাহার স্বামীর সকল মনোব্যথা দূর কর! দুঃখিনীর একটী প্রার্থনা রাখ দয়াময়! ভাবিতে ভাবিতে সে স্তম্ভের অপর পার্শ্বে বসিল। লাইকা তখন গীত ছাড়িয়া অতি মৃদুভাবে সুর আলাপ করিতেছিল।

তখন ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না নামিয়া প্রাঙ্গণে চলিয়া গিয়াছে,—প্রবল ঝড়ের অবসানে চারিদিক নিস্তব্ধ—বিষম গ্রীষ্ম! কিন্তু বৃহৎ মন্দিরচূড়ায় আবৃতপ্রায় পূর্ব্বাকাশ হইতে গুরু গুরু মেঘগর্জ্জন শোনা যাইতেছিল।—লাইকা বলিল,—

আবার জল আসিবে! এই দুর্য্যোগে কোথায় গেলে?"

লজ্জিত শঙ্কায় বারি এতটুকু হইয়া গেল,—বলিল, "কোথাও ত যাই নাই!"—

"আঃ শরণ, তুমি ওখানে?—আমি ভাবিয়াছিলাম বুঝি বাগানে গিয়াছ?—তা ওখানে কেন? রাত্রি হইয়াছে—শয়ন করিবে না?—এদিকে এস!—"

(২৭)

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া লাইকা বারিকে দেখিতে পাইল না। সে অতি প্রভাতেই শয্যাত্যাগ করে বটে কিন্তু এখনও যে ভাল করিয়া আলোক উদয় হয় নাই—মেঘের ছায়ায় উষার আলোক

বড় ম্লান,—গত রাত্রির প্রচুর বৃষ্টিপাতের আশঙ্কায় উষাচর পক্ষীরাও কুলায় লুকাইয়া আছে। এ বৃষ্টিকর্দ্দমের মধ্যে সে কোথায় গেল!

লাইকা যেন বিস্মিত ও কিছু বিরক্ত-হইল। কি অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ সে! অথবা কি গোপন রহস্য লইয়া সে এমন ভাবে জীবন সাগরে ভাসিয়া চলিয়াছে! আর সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময় ভগবান তাহাকে এই দীন দুর্ব্বল লাইকার নিকট কেন আনিয়া দিলেন? হয়ত কোন কথায় বা ব্যবহারে সে তাহাকে ব্যথিতই বা করে। এত দুঃখের উপর আবার ব্যথা। হায়!—

ভাবিতে ভাবিতে আপনার অজ্ঞাত-সারে লাইকা উদ্যানে চলিতেছিল। কতদূর আসিয়া দেখিল দূরে সরোবর সোপানে বারি দাঁড়াইয়া আছে—হাতে কতকগুলি সনাল পদ্ম। তাহাকে দেখিবা-মাত্র লাইকা অনুশোচনা করিল! আহা! সে তাহারই জন্য ফুল তুলিতে আসিয়াছে আর সে তাহার প্রতি অবিচার করিতে-ছিল!—কিন্তু আসিতেছে না কেন—ওখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছে?—ধীর গতিতে লাইকা সরোবরের নিকটস্থ হইল, একটি বৃহৎ স্থলপদ্ম বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল সে কি করিতেছে।—

সে দাঁড়াইয়া আছে। দুই হস্তের বদ্ধমুষ্টিধৃত নয়নরঞ্জন ফুলগুলির প্রতি বিবশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! কিন্তু কি দেখিতেছে? পুষ্প সৌন্দর্য্য দেখিয়া মানুষের বদনে যে প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠে তাহাত ইহার মুখে একটুও নাই!—কম্পমান ওষ্ঠাধর ও স্ফীত-নয়ন দেখিয়া রোদনেরই পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়! এ অবস্থায় সে ফুলে কি দেখিতেছে?—

কিন্তু এ সকল ঘটনা বুঝিতে লাইকার বিলম্ব হইল না। নিজের হৃদয়ের সৌন্দর্য্যরাশি কোন কিছুতে আহত নষ্ট বা পরিত্যক্ত হইলে ধরণীর রূপ গন্ধ বর্ণের প্রতি এমনি গভীর আসক্তিই জন্মে বটে! প্রতি সৌন্দর্য্য দেখিয়া আপনার প্রাণের বিনষ্ট বা ব্যথিত বস্তুর কথা এমনি করিয়া হৃদয়ে অবসন্নতা আনিয়া দেয়।—

লাইকার চক্ষুও জলে ভরিয়া গেল। হতভাগ্য বালক। এই তুচ্ছ লাইকা কি তোর কোন উপকার করিতে পারে! যদি পারে--আঃ বালক এমন স্বল্পভাষী কেন? তাহার মনোব্যথা কাহাকেও খুলিয়া বলে না কেন?—অথবা এই তরুণ বয়সে তাহার এমন কি গুপ্ত বেদনা থাকিতে পারে যাহা কাহাকেও বলা যায় না?—তখন লাইকা অতি সন্তর্পণে সেখান হইতে সরিয়া অতিদূরে এক প্রস্তরগ্রথিত বটবৃক্ষ তলে আসিয়া বসিল।

কতক্ষণ পরে বারি উঠিয়া আসিল, সরোবর তীরের পুষ্পবনে ফুল তুলিল,—তাহার পর তেমনি চোখ নীচু করিয়া মৃদুচরণক্ষেপে চলিয়া গেল! লাইকা একদৃষ্টে সকলি দেখিতেছিল;—সব নূতন। এই প্রভিনব প্রকৃতির মানবটির প্রত্যেক কার্য্য অসাধারণ, তাহার আকৃতি—সর্ব্বাগ্রে এইখানেই অসাধারণত্বের চরম ঔৎকর্ষ

প্রকটিত হইয়াছে!—হতবুদ্ধি লাইকা বারবার দেখিতেছিল, এই মেঘাবৃত করুণচ্ছটার আলোক মাখিয়া বর্ষাবারি-সিঞ্চিত বিকশিত পুষ্পরাশির মধ্যদিয়া যে বিনয়নম্র মুখখানি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল—তাহা পুষ্পসৌন্দর্য্য হইতে কোন অংশে অসুন্দর নয়! এতখানি রূপ যে এমন পথে লুটায়,—এত বড় আশ্চর্য্য কি সম্ভব ছিল? অন্তত লাইকা ত তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই! তাহার পর সেই বালকের দৃষ্টিগতি কার্য্য বাক্য সকলই সাধারণ মানব রীতির বিপরীত—অথচ নির্দ্দোষ! এমন কি তাহার বস্ত্রপরিধান ভঙ্গীটিও সম্পূর্ণ নূতন! তাহার এই সদ্যোস্নাত আর্দ্র বস্ত্র বেষ্টিত মূর্ত্তি দেখিলে,—ভাবিতেই লাইকা শিহরিয়া উঠিল!—অসম্ভব! তাহা অসম্ভব! ছিঃ কেন এ জঘন্য চিন্তাকে সে মনে স্থান দেয়? সংসারত্যাগী দুঃখী বালক না জানি কত স্থানে আশ্রয় হারাইয়া তাহার নিকট দয়ার আশায় আসিয়াছে, আর সে নানা কল্পনায় তাহার চিন্তাকে বিকৃত করিয়া তুলিতেছে!—

নিজের চিন্তাকে ধিক্কার দিয়া লাইকা স্নান করিতে গেল। শুনিল একজন সন্ন্যাসী বলিতেছে—লাইকাজির চাকরের জন্য আর জল পদ্ম পাইবার উপায় নাই, কখন ভোরে উঠিয়া সব তুলিয়া লইয়াছে!"—

তখন আর একজন বলিল,—"কেন লইবে না? তুমি অমনি রাত্রি থাকিতে উঠিয়া জলে ভিজিয়া তুলিতে পার ত তুমিও পাইবে!"

লাইকা মনে মনে হাসিল,—"তাহার আবার চাকর?"

ফিরিয়া আসিয়া লাইকা বারিকে বলিল,—"শরণ! আজ প্রভাতে তুমি ভিজিয়াছিলে কেন? অসুখ হইতে পারে না কি ইহাতে?"—

স্বরে তিরস্কারের কোন অভাব নাই তবু বারি যেন চমকিত হইল,—ভীতিপূর্ণ চক্ষু যেন লাইকার মুখে তুলিতে গেল—কিন্তু উঠিল না!—একটু থামিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—আমি ইচ্ছা করিয়া যাই নাই! দুইদিন হইতে স্নান করি নাই—সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল,—তাই স্নান করিতে গিয়াছিলাম; পথে জল আসিল!"

তাহার অর্দ্ধসমাপ্ত দৃষ্টি লাইকার চক্ষু এড়ায় নাই! তাহার ভয়ে লাইকা ব্যথা পাইল। অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিল,—জল আসিল ত তুমি মন্দিরে আসিলে না কেন?

"স্নানে বড় বেলা হইত—আমি,—

লাইকা হাসিল! "এও কি একটা কথা শরণ? বেলা হইত ত কি? তাই বলিয়া—" তাহার মুখের কথা মুখেই থাকিল—দেখিল অনতিদূরে মন্দির দ্বারে এই দেবালয়ের কর্ত্তা—গোবিন্দনাথ আসিয়াছেন, তাহাকে দেখিয়া দূর হইতে হাত তুলিয়া বলিলেন—"প্রাতঃপ্রণাম লাইকাজি!"

"প্রণাম! আপনার সমস্তই কুশল ত!"

"আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্তই মঙ্গল—এখন—" ইত্যাদি।

অতঃপর প্রভাতটুকু তাঁহার সঙ্গে শেষ

করিয়া একটু অধিক বেলায় লাইকা যখন শিবপূজায় বসিল, তখন কিছু বিস্মিত হইল! অন্য দিনের ন্যায় আজ ফুলে বা মাল্যে সে নিপুণ হস্তের পারিপাট্য নাই। সমস্ততেই যেন অন্যমনস্কের চিহ্ন বর্ত্তমান!

বালক কি বিরক্ত হইয়াছে? আহা না! বিরক্ত নয়—লাইকার কথায় সে ব্যথা পাইয়াছে। অথবা কল্য হইতে তাহাকে যেমন অশান্তিপূর্ণ দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে সে তাহার সেবা করিয়া যেটুকু তৃপ্তি বা শান্তি পাইতেছিল—আর তাহা পাইতেছে না। লাইকা ক্ষোভ লইয়াই পূজা শেষ করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

লিসু

তিব্বতের দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্তে—"সাল-উইন, মেকং ও ভাঙ্‌স্তি নদীর তীরবর্ত্তী প্রশস্ত প্রদেশে লিসুগণ বসবাস করিতেছে—ইহাদের অপর নাম "যুন্নান্"। তিব্বত সীমান্তে—পর্ব্বত গাত্রে ও নিম্নে সমতল ভূমিতে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁশের গৃহ দেখা যায়—ইহাই লিসুবসতি বা লিসুবস্তি। ইহাদের গৃহগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র,—একটী মাত্র দরজা ব্যতীত জানালার নাম গন্ধও নাই; খড় ও ঘাসের প্রাচুর্য্যে চালা খানি নিতান্ত ভারাক্রান্ত—আবার দুরন্ত শীতের প্রচণ্ড প্রভাবে অষ্ট প্রহর কুটীরগুলির মধ্য হইতে বিদ্‌ঘুটে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া মহা আরতির আয়োজন করিতেছে।

লিসুগণ বন্য হিংস্র জন্তু ও বহির্শত্রুর আক্রমণ ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত; লিসু বস্তিতে কোন অপরিচিত মনুষ্যের সমাগম হইলে সকলেই নবাগতটীকে অতি সতর্ক ভাবে সন্দেহের চক্ষে দেখে। কিন্তু তাহার মধ্যে শত্রু পক্ষের কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইলে তখন অতিথি সেবার ধুম পড়িয়া যায়। দলের একজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক অতিথিকে অতি আদরের সহিত আহ্বান করিয়া সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দেয় এবং অগ্নি কুণ্ডের নিকটে একখানি বড় পাথরের উপরে তাহাকে বসাইয়া সকলে তাহার চারিদিকে ঘেরিয়া বসে, ও গৃহ নির্ম্মিত প্রচুর মদ্যে নবাগতটীকে এক প্রকার স্নান করাইয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করে। ইহারা মনে করে যে অতিথি সেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণই মদ্য। ইহারা অতিথির সহিত একবার পরিচিত হইলে আর তাহাকে শীঘ্র ছাড়িয়া দিতে চাহে না।—অতিথি যাইতে চাহিলে বলে যে—কেন যাইতেছেন—আমাদের মদের ভাণ্ডার ত এখনও শূন্য হয় নাই—এখনও যে যথেষ্ট মদ রহিয়াছে।

গৃহ আসবাবের মধ্যে কেবল মাত্র

দুই চারিটী বাঁশের ঝাঁপি ও ইহাদের ব্যবহারোপযোগী শন বা পাটের মোটা বস্ত্র বুনিবার দুই একখানি তাঁত ব্যতীত বিশেষ কিছুই দেখা যায় না; তবে প্রতি ঘরেই তীরধনুক ও দা সুপ্রচুর।

শস্যোৎপাদনের দিকে ইহাদের তেমন স্পৃহা নাই, শীকার করিতেই ইহারা খুব মজবুত। বিশেষত কঙ্করময় প্রদেশে শস্যাদি আশানুরূপ উৎপন্ন হয় না বলিয়া লিস্থগণ—ভালুক, চিতাবাঘ হরিণ প্রভৃতি শীকারে যে পরিমাণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া থাকে, শস্যোৎপাদনের নিমিত্ত তাহার শতাংশের একাংশও করে না। কবে কাহার ভাই, বাবা, পিতামহ—বিশহাত লম্বা বাঘ কিম্বা পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড ভালুক মারিয়াছিল সেই সকল আজগুবি গল্প করিয়া অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকটী ইহারা বেশ সরগরম করিয়া তুলে, এবং পরদিন কি প্রকারে কোথায় শীকারে যাইবে তাহাও এই সান্ধ্য বৈঠকে ঠিক হইয়া যায়। শীকারের অস্ত্রশস্ত্রাদির মধ্যে তীর-ধনুক, দা এবং দুইটী হাতল বিশিষ্ট তরবারিই ইহাদের প্রধান সম্বল। বালকগণের দিগম্বর বেশ ঘুচিতে না ঘুচিতেই তাহারা শীকারে বেশ পাকা হইয়া উঠে।

পোষাক পরিচ্ছদ।

পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ইহারা তেমন উদাসিন নহে। পুরুষগণ লম্বা কোট, খাট পাজামা, চওড়া টুপি ও একরকম বিশ্রী জুতা মোজা পরে; আবার গহনারও আদর পুরুষ গণের নিকটে নিতান্ত কম নহে! অন্তত পক্ষে সাদা কড়ি বা ঘাসের এক এক গাছা মালা বা বালা প্রত্যেক পুরুষেরই চাই। লিস্থ রমণীগণ ছোট কোট, সাড়ী, এবং মাথায় একখানি ছোট ওড়না পরিধান করে, তবে পুরুষগণের অপেক্ষা রমণীদিগের পোষাক অনেকটা রঙবেরঙের। সাড়ী ও ওড়না নীল, ধূসর হলদে, প্রভৃতি নানা রঙে রঞ্জিত থাকে এবং রৌপ্যের প্রকাণ্ড কর্ণাভরণে ইহাদের কান দুটী সর্ব্বদাই ভারাক্রান্ত। স্ফটিক ও কড়ির মালা রমণীগণ অতি আদরের সহিত পরে। এইরূপ অপূর্ব্ব বেশে সজ্জিত হইয়া একখানি রৌপ্যের অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি চটাল পাত গলায় ঠিক নিম্নে কোর্ত্তার উপর পরিতে পারিলেই ইহাদের বেশভূষা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

লিস্থ জাতির উৎপত্তির বিবরণ বড়ই কৌতূহলপ্রদ। ইহারা বলে যে:—

সর্ব্বপ্রথম ভগবান যখন তাঁহার রাজ্যে মানুষ সৃষ্টি করিলেন—তখন মানুষ গুলি ভারী উচ্ছৃঙ্খল ছিল। তাহাদের কার্য্য কলাপ দেখিয়া ভগবান তাহাদের উপর অত্যন্ত চটিয়া গেলেন, কিন্তু চটিলে আর কি হইবে—তিনিই ত সৃষ্টি করিয়াছেন! তাই অনেক খোঁজ করিয়া অবশেষে পরমেশ্বর একজন লোককে বাছিয়া লইলেন;—লোকটীর ব্যবসা নাকি ছিল—"কদু" অর্থাৎ "লাউ" ফলান এবং বাজারে সেই কদু বিক্রী করা। ভগবান তাহাকে ডাকিয়া কয়েকটী কদুর বীজ দিয়া বলিলেন—"ধর, এই নাও—এই বীজগুলি লইয়া বেশ ভাল জমীতে পুঁতিয়া দাও, যতদিন ফল না হয় ততদিন খুব ভাল করিয়া গাছ গুলিকে রক্ষা করিও কারণ পরে আর তোমার অদৃষ্টে কদু ফলিবে না।

ভগবানের আদেশমত লোকটী সেই বীজগুলিকে যত্ন পূর্ব্বক মাটীতে পুঁতিয়া দিল। কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই অতি চমৎকার গাছ বাহির হইল, এমন সুন্দর সতেজ গাছ আর কখনো সে দেখে নাই। কিছুদিন পরে গাছে ফলও ধরিল—কিন্তু একটী ফলের বেশী ধরিল না; তবে সেটী সাধারণ কদুর মত হইল না, এমন প্রকাণ্ড হইল যে কেহ কখনও তত বড় কদু দেখে নাই, ক্রমে ফলটীতে রঙ ধরিল।

একদিন বড় দুর্য্যোগের লক্ষণ দেখা গেল; কাল মেঘে আকাশ ঘিরিয়া ফেলিল, ঘন ঘন বজ্রের শব্দে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল; পৃথিবী যায় যায়। সকলেই প্রাণ ভয়ে ভীত হইল, এক মনে এক প্রাণে ভগবানকে ডাকিত লাগিল, কিন্তু দায়ে পড়িয়া ভগবানের নাম লইলে কি হইবে— সুতরাং ভগবানের রাগ পড়িল না—তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। দেখিতে দেখিতে জলের স্রোত বহিল, বান ডাকিল, পৃথিবী জলমগ্ন হইল, লাউব্যবসায়ী তাহার ভগ্নীকে ডাকিয়া বলিল—আয় বোন; আমরা এই লাউটিতে একটা ছিদ্র করিয়া ইহার মধ্যে ঢুকিয়া যাই—নইলে বানের জলে—প্রাণ যাইবে। বোনটী দেখিলেন যুক্তি ভালই— সুতরাং আর বিলম্বে প্রয়োজন কি! তৎক্ষণাৎ সেই প্রকাণ্ড লাউয়ের গাত্রে একটী ছিদ্র করিয়া ভাই বোন দুটীতে ঢুকিয়া গেল —লাউ জলের ঢেউয়ে নাচিতে লাগিল।

এইরূপে অনেক দিন যায় জল আর থামে না, স্রোতও থামেনা। ভাইটী ছিদ্র দিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিলেন দূরে এক প্রকাণ্ড পাহাড় দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া ভাই বলিলেন—বোন! ঐ দেখ দূরে একটা উঁচু পাহাড়, যদি কপাল গুণে এই লাউয়ের ভেলা পাহাড়ে গিয়া ঠেকে তবেই রক্ষা, নইলে আর জমী পাইবার আশা নাই। তাহারা ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে লাউয়ের ভেলা পাহাড়ের গায়ে আসিয়া লাগিল।

পাহাড়ের গায়ে লাগিবামাত্র ভাই বোন দুটীতে ভেলা হইতে বাহির হইয়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া দেখিল যে আর জন মানবের চিহ্নমাত্র নাই—কেবল জল—কেবল জল। কেবল তাহারা দুটীতেই বাঁচিয়া আছে।

দিন কাটিয়া গেল—ভাইটিকে বোন বিবাহ করিতে চাহিল।

ভাই বলিল "তাও কি হয়! তুমি যে আমার বোন! তোমাকে কি বিয়ে কর্‌তে আছে?"

তখন অনেকক্ষণ বসিয়া তাহারা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল যে বিষয়টা ভগবানের নিকট জানান যাক্, কিন্তু ভগবানকে আর কোথায় পাওয়া যায়? সুতরাং ভাই বলিলেন "বোন! আয় আমরা একটা পরীক্ষা করি। এই লাউটা আমাদিগকে ভগবানই ত দিয়াছেন, তাই আমরা বাঁচিয়া আছি; নইলে নিশ্চয়ই মারা যাইতাম।" ইহা বলিয়া তাহারা দুই খানি ডালভাঙ্গা যাঁতা লইয়া একটা পাহাড়ের মাথায় উঠিল। দুইখানি যাঁতার মাঝখানে দুইটী ছিদ্র ছিল, একখানিতে একটা মোটা কাঠের শাল বিঁধাইয়া ভাই বলিলেন "বোন! এখন এই দুইখানা যাঁতা এখান হইতে

ছাড়িয়া দেওয়া যাউক—যদি এই শাল কাঠি অপর যাঁতাটার গর্ত্তে ঢুকিয়া আঁটিয়া যায় তবেই জানিব যে আমাদের মধ্যে বিবাহ হওয়াই ভগবানের ইচ্ছা।”

পাহাড়ের উপর হইতে যাঁতা ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে এক যাঁতার খিল্‌টা অপর যাঁতাটার গর্ত্তে এম্‌নি ভাবে আঁটকাইয়া গেল যে খুলিল না এবং সেইরূপ ভাবেই নীচে গড়াইয়া পড়িল, সুতরাং তাহাদের মধ্যে বিবাহ হওয়াই ভগবানের অভিপ্রায় ইহা তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল।

তাহার পর ভাল দিন দেখিয়া ভাই ভগ্নীকে একটা কুল গাছের নীচে বিবাহ করিলেন। ক্রমে তাহাদের নয়টী ছেলে হইল,—ছেলেরা বড় হইলে পর যে যাহার ইচ্ছামত নানা দেশে গিয়া বাস করিতে লাগিল এবং এইরূপে নানা জাতির সৃষ্টি হইল! কিন্তু তন্মধ্যে যে ২টী ভাইয়ের প্রাণে প্রাণে মিল ছিল,—তাহাদের আর ছাড়াছাড়ি হইল না; তাহারা পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুড়িয়া বেড়াইয়া শীকার করিতে লাগিল, তাহাদের মত শীকারী নাকি কেহই ছিল না। একদিন একটা বানর দেখিয়া ছোট ভাইটী তীর দ্বারা বিদ্ধ করিল, তাহাতে বড় ভাইটী বলিল—ভাই! তুমি সর্ব্বনাশ করিলে, এই বানরীটীকে আমি যে বিবাহ করিয়াছি।” বড় ভাইটীর কথা শুনিয়া ছোট ভাইটী বড়ই দুঃখিত হইল, এবং অপর একটী বানরী ধরিয়া তাহার দাদাকে বিবাহ করিতে দিল, কিন্তু কিছুদিন পরে ছোট ভাইটী আবার ভুল করিয়া সেই বানরীটীকেও মারিয়া ফেলিল। ইহাতে বড় ভাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ছোট ভাইটীকে ঘরের বাহির করিয়া দিল। এদিকে পাহাড়ের দেবতা এই ব্যাপার দেখিয়া তাহাদিগের বিবাহের জন্য দুইটী কুমারী পাঠাইয়া দিলেন, তন্মধ্যে একটী পরম রূপবতী—অপরটী কুৎসিত। ছোট ভাইটী সেই সুন্দরী মেয়েটীর মুখে কাদা আর রঙ্‌ মাখাইয়া দুইটী মেয়েকেই দাদার নিকট হাজির করাইয়া তন্মধ্যে যেইটী ইচ্ছা দাদাকে নিতে বলিল।

বড় ভাইটী সেই কুৎসিৎ মেয়েটীকেই গ্রহণ করিল। তখন ছোট ভাই সেই রঙ্‌ মাখান মেয়ের মুখটী ধুইয়া দিবামাত্র বড় ভাই রাগে অস্থির হইয়া ছোট ভাইকে একটা পাহাড়ের গহ্বরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সুন্দরী মেয়েটীকে অধিকার করিয়া লইল।

অন্ধকার গহ্বরে বেড়াইতে বেড়াইতে ছোট ভাইটী পাতালের রাস্তা দেখিতে পাইল। পাতালের রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর যাইয়া দেখিল যে আর অন্ধকার নাই, ঠিক উপরের মত চন্দ্র, সূর্য্য গাছ পাতা, ফল ফুল রহিয়াছে, তবে বাঘের উপদ্রবটা বড়ই বেশী; চারদিক হইতে প্রকাণ্ডকায় ব্যাঘ্র গুলি তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল, কিন্তু সঙ্গে তীর ধনু না থাকায় কয়েকটী গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া তাহার আঘাতেই বাঘ গুলিকে সে মারিয়া ফেলিল। বাঘ গুলিকে মারিয়া ফেলিবামাত্র কতক গুলি কাঠবিড়াল আসিয়া তাহাকে বলিল—“আপনি বাঘ

মারিয়াছেন—সুতরাং আপনি দেবতা, কিন্তু আপনার মুখখানি মলিন কেন, মনে এত দুঃখ কেন?”

ছোট ভাইটী বলিল—“আমি পাতালে আসিয়াছি, ইহা আমার দেশ নহে, আমি মর্ত্ত্যে থাকি।”

কাঠবিড়ালগুলি বলিল “আচ্ছা! আমরা আমাদের রাজাকে ডাকিয়া আনি, তিনি নিশ্চয় আপনাকে উপরে রাখিয়া আসিতে পারিবেন! আমরা সকলেই বেশ উড়িতে পারি দেখিতেছেন—সুতরাং আপনাকে উপরে রাখিয়া আসিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হইবে না।

কিছুক্ষণ পরেই কাঠবিড়ালদের রাজা আসিল। রাজাটীর নয়টী লেজ, দেখিতে ভয়ানক শক্তিশালী। রাজা বলিলেন—“হাঁ আমি তোমাকে উপরে রাখিয়া আসিতে পারি বটে, কিন্তু আমাকে দেখিয়া ঠাট্টা করিতে পারিবে না, করিলে তোমার অমঙ্গল হইবে।”

বিড়াল রাজার কথা শুনিয়া ছোট ভাইটী বলিলেন--“তাওকি হয়! আপনাকে কি আমি ঠাট্টা করিতে পারি! আপনি হলেন পাতালের কর্ত্তা! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে কিছুতেই হাসিব না।”

তখন যাত্রার আয়োজন হইল। বিড়াল-রাজার পিঠে বসিয়া ছোট ভাইটী সেই নয়টি লেজের মধ্যে একটীকে খুব চাপিয়া ধরিয়া বসিলেন। বিড়ালরাজ বাতাসের মত ছুট্ দিলেন। খানিক দূরে যাইয়া যেই সে মানবপুত্র একটু হাসিয়াছে, আর অমনি খুট্ করিয়া তাহার হস্তধৃত লেজটী খসিয়া গেল—আর একটী লেজ ধরিয়া তখন সে রক্ষা পাইয়া ভাবিল—আর হাসিবে না,—কিন্তু আবার কিছুদূর যাইতেই হাসি বাহির হইল এবং কাটবিড়ালের আর একটী লেজও এইরূপে খসিয়া পড়িল। এই প্রকারে বিড়াল রাজার আটটী লেজ ক্রমে ক্রমে খসিয়া গেল, বাকী রহিল মাত্র একটী। সেইটী গেলেই আর তাহার মর্ত্ত্যে যাওয়া হইবে না, সুতরাং ছোট ভাইটী প্রাণপণে সেই একমাত্র লেজটীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিল, ভয়ে তাহার রক্ত জল হইয়া গেল। কিন্তু এবার নির্ব্বাধে সে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া পৌঁছিল!

মর্ত্ত্যে আসিয়া ছোট ভাইটী দেখিল যে তাহার দাদার মৃত্যু হইয়াছে, তখন আপন পত্নীকে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। লিসুগণ ইহারই বংশধর।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

চন্দন-মধু

(১)
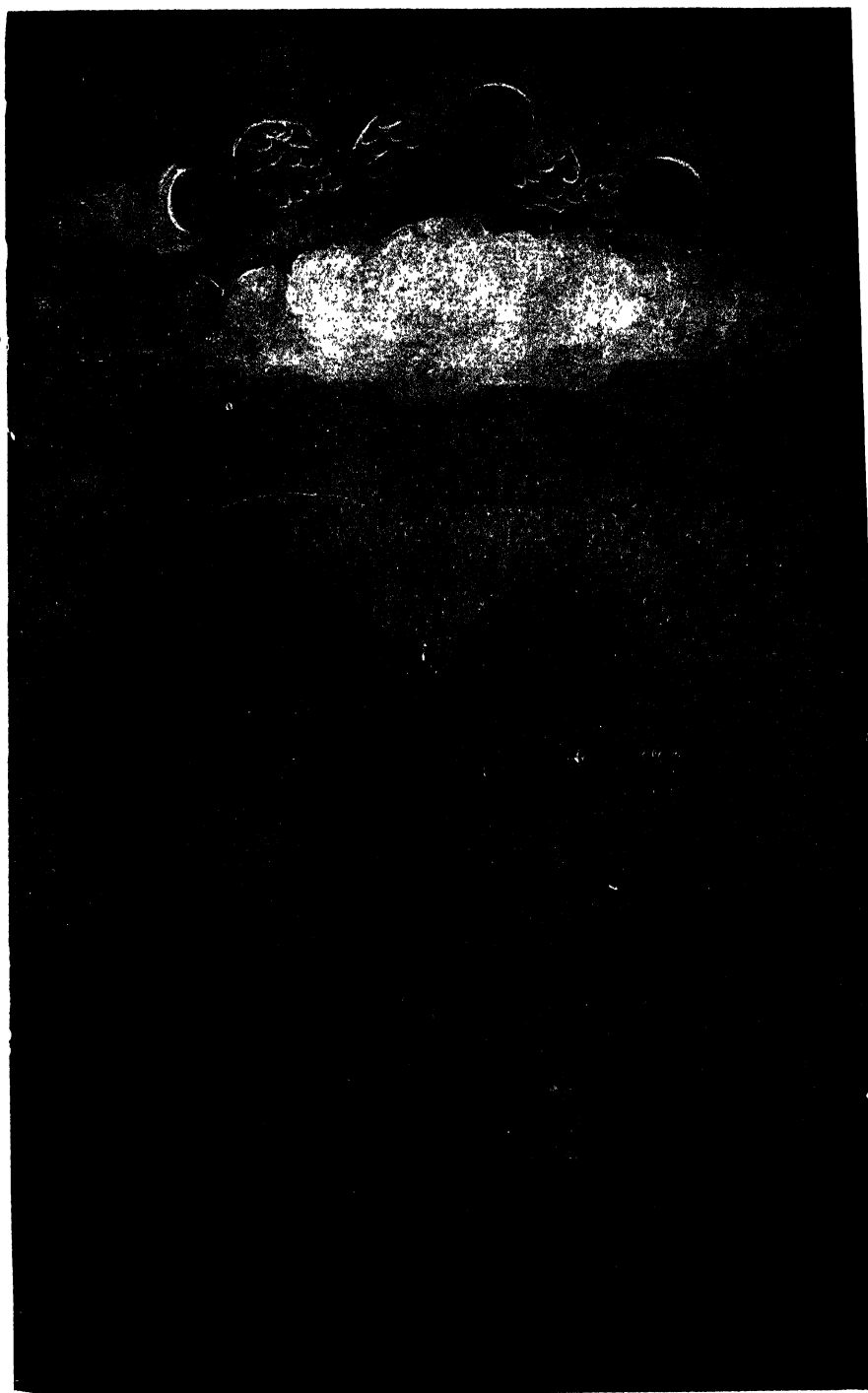
"সন্ধ্যা যে যায় যায়, এখনও ফিরিল না মিম্মা!"

ব্যাকুল বুড়া রুগ্ন দেহে, দুর্ব্বল কম্পিত পা দুইখানির উপর আস্তে আস্তে ভর রাখিয়া, দুয়ারের ঝাঁপখানা সরাইয়া দেখিল,—মস্ত একখানা কালো মেঘ আকাশের পূর্ব্বদিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। ঐ সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস! বৃষ্টিও বুঝি আসে!

ঝাঁপ বন্ধ করিয়া আবার সে জীর্ণ কম্বলখানা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। ভাবনার কি কূল-কিনারা আছে—? কিন্তু, কাণ তার তবু খাড়াই রহিল। কি জানি, কখন আসিয়া সে ঝাঁপ ঠেলা দেয়!

মিম্মা বুড়ার একমাত্র পুত্র;—তা'র আর কেহ নাই।

মাটির বেদীতে তক্তা-পাতা বিছানা; মাটির রঙেই কাঠে তৈরী তক্তার বেড়া। আলো নাই, ঘর আঁধার।

লতায় ঢাকা, গাছের শুক্‌নো ডাল চাপা খড়ের চাল কাঁপাইয়া এমন সময় ধীরে ধীরে হাওয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু বৃষ্টি।

কি করিবে—বুড়া! আশঙ্কায় সে ব্যাকুল;—মাথায় চুল ছিঁড়িয়া বৃষ্টিকে থামিতে বলে;—কাঁদিয়া কাঁদিয়া দেবতাকে ডাকে, হাওয়া বন্ধ করিবার জন্য।

হাওয়া থামিল না; বৃষ্টির বেগও বাড়িয়া চলিল।

মাম্পোর এই ছেলেটুকুই একটুক্‌রা নড়ির মতো;—তা'র কবরের পাশে দৈব পতাকা উড়াইতে শুদ্ধমাত্র সেই না থাকিলেই যে চলিবে না!—নতুবা, পরলোকে উপায় কি, ত্রাণ কিসে?

মিম্মার বাবা এমন অথর্ব্ব ছিল না। রোগে রোগেই বেচারাকে একেবারে কাবু করিয়া ফেলিয়াছে।

বস্তীর শেষে জঙ্গলে ঢাকা, শীর্ণ একটি ঝরণার পাশে তাদের ছোটখাটো ঘরটুকু। পতিত ভিটা! মাম্পোর আশা আছে, মিম্মা মানুষ হইলেই তাহাতে ঘর উঠিবে। এই বয়সে তার আর সাধ্য নাই যে, নূতন করিয়া অত বড় একটা ঘর উঠায়। ভরা সংসারের সবই গিয়াছে যদি, ঘর দিয়া আবার কি হইবে,—কা'র জন্য ঘর? মিম্মা? মানুষ হইবে, তবে তো?—সে ঢের দেরী।

বৃদ্ধের জ্বালা অনেক। বাঁচিতে তা'র আর সত্যই সাধ নাই। মরিলেই বাঁচে। কিন্তু মিম্মা একটু মানুষ হউক, নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখুক, তা' হইলেই সে নিশ্চিন্ত।

কাঠে-পিতলে তৈয়ারী মণিপদ্মা ঘুরাইয়া বৃষ্টি-ঝড়েও বুড়ার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায় কে ও! মুখে তার গান!

কোথা হইতে পথিক গান ধরিয়াছে—কবেই বা থামিবে।

কে যেন পূর্ব্বেই দুয়ারের দিকে আসিতেছিল, আগন্তুককে দেখিয়া ফিরিয়া পালাইল।

সংযত সাধক লামা স্ফুরিত নেত্রে চাহিল। অন্ধকার। ঐ কমলালেবু গাছ-গুলার ধার দিয়া, পেয়ারাগাছের পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়—ঐ, এক তরুণী!—যুবা লামা ঈষৎ অস্পষ্ট চেহারাখানি তাহার লক্ষ্য করিল মাত্র।

গানের শব্দে বৃদ্ধ বুঝিল, দুয়ারে লামা। তাহার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। অতিথিপূজা, মহাব্রত। আজীবনের পালিত সাধনা এই, আজ বুঝি তাহার বিনষ্ট হইয়া যায়। দুর্ব্বলতায় সে নিজে সম্পূর্ণ অক্ষম;—দেবতার অংশ এই লামা, বহু ভাগ্য-গুণে তাহার বাড়ীতে পৌঁছিয়াছে—অনাদরে ফিরিয়া যাইবে?—হায়, এও হইবে?

ভিতর হইতে ক্ষীণ আকুল স্বরে সে বলিল, "হায়, এও হইল? বিপন্ন অতিথি ফিরিতেছে? আমিও বাঁচিয়া আছি, মিম্মাও মরে নাই!"

লামা আশ্বাস দিয়া দৈববাণীর মতো উচ্চ স্বরে কহিল, "লামার ভিতর বাহির সমান। গৃহস্থ, স্থির হও। আমি আছি। বারান্দা ছোট চালার নীচেই আমি আসন লইলাম।"

পূর্ব্ববৎ স্বরে মাম্পো বলিতে লাগিল, "কত পাপ আমার! বাবা সন্ন্যাসী, তোমরা ত সব পারো—মিম্মা কোথায়, তাকে আনিয়া দাও! রাত হইয়া গেল, সে আসিল না যে—!"

"কে সে?"

"চোখের মণি, বাবা—সে আমার ছেলে। তারও আর কেউ নাই, আমারও আর কেউ নাই। আমরা দু'টিতেই সারা পৃথিবীতে একেলা।"

ছলছল চক্ষু লামার;—সে আপন মনে কহিল, "আমরা কেমন খেলি, বাঃ! কেউ কাঁদি, কেউ কাঁদাই।"

স্মিত ওষ্ঠে অস্ফুট উচ্চারণে লামা শ্বাস ত্যাগ করিল। মণিপদ্মা ঘুরিল। লামা গান ধরিল।

(২)

দুপুর রাত। আধা চাঁদের সাদা হাসি, পাৎলা কুয়াসায় মাখামাখি হইয়া সমস্ত বস্তীর গায়ে মস্‌লিনের ওড়নাখানির মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ধূমল মেঘের মিহিন কোমল চাদর খানি বৃষ্টির চিকন চিকন ধারাগুলির ঝালর দুলাইয়া হাওয়ার কোলে কোলে কোন্ পাহাড়ে চলিয়া গেল। আঁধার ত পেঁচা, পাহাড়ের ফাটলেই তার ঘর; ডানা মেলিয়া উড়িয়া গিয়া সেইখানে সে ঘুমাইল।

মিম্মা আসিয়াছে। ঐ ঝাউ গাছগুলার সম্মুখে সে দাঁড়াইয়া;—জোয়ান্ চেহারা। প্রত্যাখ্যান, আশঙ্কা, লজ্জা,—মিম্মার আজিকে ত্র্যহস্পর্শের রাত্রি।

ঢেধ্বা বস্তীর চেংটী ভুটিয়ানী ভারী বড় লোক। সহরে সহরে তার কারবারী গদী; পাহাড়ে-পাহাড়ে তা'র জমিদারী। নেপাল ভুটান তাতার তিব্বতে তার লোক ঘাটে; মালের রপ্তানী-আমদানীতে মেয়েটী অসাধারণ মাথা খেলাইতে পারে। তরী-

তরকারী হইতে আরম্ভ করিয়া ভুট্টা ধান প্রভৃতির চাষ কিছুই সে ঘৃণা করে না; সামান্যতেও উপেক্ষা নাই, অসামান্যের সঙ্গে বীরের মতো টক্কর লড়ে।

ভারতবর্ষেও সে সওদা পাঠাইত।

তার খাস জমিদারীর মস্ত একটা বাগান মিস্মার জিম্মায় ছিল।

বিধবা প্রৌঢ়া—এই চেংটী। যুবতী ভগ্নী তার—ন্নীল্লি; সেও বিধবা। উভয়ে দেখিতে সুন্দরী। তবে পার্থক্য যা-কিছু বয়সের। বৃহৎ সংসার—অযাচিত আত্মীয় ও করুণা-পালিত জন-কোলাহলে মুখরিত।

মিস্মার চাকরী আজ তিন বছরের।

চেংটী যেদিন তার ভরা বাগানের কমলা লেবুগুলি কাঁচায়-পাকায় হাজারে হাজারে টুকরী বোঝাই দিয়া সহরের বাজারে পাইকারী দরে ছাড়িতে গেল,—দ্বিতীয় বছরের সেই পয়লা রঙিন সন্ধ্যায় ন্নীল্লির সঙ্গে মিস্মার সাক্ষাৎ।

এর পর প্রায় প্রতি বৈকাল বেলায় তাহাকে ন্নীল্লির কাছে হিসাব নিকাশ পরামর্শ করিতে যাইতে হইত। ন্নীল্লি গম্ভীরভাবে হিসাব দেখিত, মিস্মা হাঁ করিয়া তার পানে কৌতূহল দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিত;—খাতার হিসাব তার ঠিক ছিল কিন্তু মনের হিসাবে গোল বাধিত।

মিস্মা ছিল পিতৃ-প্রেমিক। শৈশব হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সে, পিতার বুকেই আনন্দে কাটাইয়াছে আজ সে তা'র পিতার জন্য পৃথিবীতে কি না করিতে পারিত? সুস্থ পিতামাতার অদ্বিতীয় সুস্থ সন্তান এই মিস্মা—সখ করিয়াই ঘোড়ার লাগামটাতে একটু ঢিলা দিয়াছে কি অমনি সে তাহাকে কোথায় লইয়া ফেলিল! পিতা হইতে কত দূরে!

পিতার কাছে পুত্র বংশের ইতিহাস শুনিয়াছে। এমন দারিদ্র্য চিরদিনই তাদের ছিল না। বংশও নাকি সম্ভ্রান্ত, উচ্চই ছিল! তবে কেন ন্নীল্লির হৃদয়ের দিকে নিজ হৃদয়ের এই প্রেম পুষ্পের অভিনন্দন সে পাঠাইবে না? কী ভয়!

মাত্র প্রত্যাখ্যান? বংশ-গৌরব নত হইবে যে! করা যায়—কি? বছরের চাকা ঘুরিয়া গেল।

চেংটি বাড়ী নাই। ন্নীল্লি আসিয়াছিল, বৈকালে বাগান দেখিতে;—অর্থাৎ?

মিস্মা মজুরদের কোলাহলের পানাহার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মদ্য, ও ঝালের আচারের সঙ্গে কড়া চায়ের বন্দোবস্ত।

বঁড়শী-বিদ্ধ রক্তাক্ত মূক মাছটির মতো, সে যে আপনারই ভিতর আপনি ছটফট্ করিয়াও ধৈর্য্য ধরিয়া আছে, যুবতী ইহা লক্ষ্য করিল। কিছুদূর নামিয়া গিয়া সে কহিল, "আখের ক্ষেত অপরিষ্কার রহিয়াছে।"

তাহার চোখের দিকে চাহিতে মিস্মার সাহস কম। নত নেত্রে সে উত্তর দিল, "আখের ক্ষেতের উপরই শুধু আপনার দৃষ্টি পড়ে। ওদিকে যে—"

সুন্দরী শুনিল; বুঝিল। চাপিয়া গিয়া নিষ্ঠুর প্রেমমাখা দৃষ্টিখানি তুলিয়া সে বলিল, "হাঁ, সেদিকের সে বেড়াটাও একটু ভাঙ্গো-ভাঙ্গো।"

ঈষৎ রুষ্ট করুণ কণ্ঠে ভিক্ষুকের স্বরে মিস্মাকে জবাব করিতে হইল," ভাঙ্গিবে না? কাঠেরই বেড়া ও; কত দিন টিঁকিবে, ম্লীল্লি ঠাকুরঝী!"

প্রথম আলাপ এই ভাবে।

* * *

আগামী আবাদ সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার সময়, বস্তীর একটা বিবাহের বাজনা শুনিয়া মিস্মা একদা কহিল, "ওটা বিবাহের বাজনা, না ম্লীল্লি ঠাকুরুণ?"

কথাটা ঠোঁটের আগায় আসিয়াছিল। সহসা ম্লীল্লি জবাব দিয়া ফেলিল, "হাঁ; আমারও বাজিত, আপনারও বাজিবে একদিন।"

মেয়েটির বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছিল। এক বছর পরে বিবাহের নিয়ম; পূর্ব্বেই বরের মৃত্যু হয়। তারপর সে স্বেচ্ছায় অবিবাহিতা রহিয়াছে। মিস্মা এ সব জানিত। সে বলিল—

"বাজিবে?"

"সে কথা আমি কেমন করিয়া জানিব? আমি ত আপনার অভিভাবিকা নহি।"

"কে—তবে?"

"এখানকার কাজ হইয়া থাকে, অন্য কাজে যান। ভুলিয়া বাজে সময় নষ্ট করিতেছেন।"

মিস্মা থতমত খাইয়া বাহিরে আসিয়াই দেখে, বাগানের দরজায় দাঁড়াইয়া চেংটি।

সে সহর হইতে ফিরিয়াছে; ঘরে যাইতেছিল, উভয়ের কথোপকথন শুনিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যুবককে দেখিয়া চে'টি ধীর গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "টুংশী সহরে তরকারীর চালান রওনা করিয়াছ?"

অভিবাদন করিয়া মিস্মা শুষ্ক মুখে উত্তর করিল, "না; কাল যাইবে।"

উত্তেজিত কণ্ঠে চেংটি কহিল, "কাল যাইবে! তিন দিন পূর্ব্বে যাওয়া উচিত ছিল।"

নিম্নস্বরে যুবা বলিল, "ছিল। অবসর পাই নাই।"

পরুষ ভাবে প্রৌঢ়া উচ্চারণ করিল, "অবসর পাও না! আকাশে ইমারত তৈরীর প্রচুর অবসর তোমার। মনে রেখো, তুমি চাকর। ম্লীল্লি—আমার ভগ্নী, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া; আর প্রেমালাপের জন্য তোমায় মাহিনা দিই না—যাও।"

বিকৃত মস্তিষ্কে মিস্মা কি প্রত্যুত্তর করিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া ক্ষিপ্ত চীৎকারে চেংটি তাহাকে বলিল "তুমি চাকর।"

সে কি ইহা জানিত না? কিন্তু আজ সে বিশেষ করিয়া শুনিল, মনে মনে পুড়িয়া পুড়িয়া বুঝিল যে, সে-চাকর। চীৎকার করিয়া কহিয়া লইল, "ওঃ, কী ভুলই করিয়াছি।"

ইহার পর কতবার চেংটি সহরে গিয়া কত দিন থাকিয়া আসিয়াছে, কতবার মিস্মা কার্য্যোপলক্ষে ম্লীল্লির কাছে গিয়াছে, ম্লিল্লীকেও কত দিন উদ্যান পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছে, হাব ভাবে আর কোন দিন কোন রকম দুর্ব্বলতা সে প্রকাশ পাইতে দেয় নাই।

তারিখের পর তারিখ কাটিয়া গেল।

চেংটী—সহরে।

বৈকালে মীল্লি আজ খাবার খাইয়া হাত-পা ধুইতেছিল ;—অবশিষ্ট টাকার থলি হাতে মিম্মাকে তার সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সে ঈষৎ শিহরিয়া উঠিল। কে জানে কেন, মিম্মাও চমকিয়াছে। কোথায় পাইল, মীল্লি আজিকার এই অপূর্ব্ব-সুন্দর যৌবনশ্রী —রূপে রঙে তরুণ লাবণ্যে ঝলমল; কম্পিত তনুখানি! মিম্মাও কি নূতন যৌবনের অমৃত হিল্লোলে এইমাত্র স্নান করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে? উভয়েই তো আজিকে বড় মোহন! বড় মনোমদ! মনুষ্য-জীবনে এমন রঙিল সৌন্দর্য্য—সত্য কি এ? রুদ্ধ স্রোত বুঝি থাকে না, বাঁধ বুঝি ভাঙ্গেই!

লীলাবতী মীল্লী—চতুরা। ত্বরিতে সে আত্ম-সম্বরণ করিল। সেইটুকুতে কিন্তু মিম্মার বুকে প্রলয় বহিয়া গেল।

সে হিসাব নিকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। যুবতী প্রতি ভুলে তাহাকে সাবধান করিয়া দিতে লাগিল।

ভুল করিতেছে কি সে সাধে? আজ মীল্লিকে সে যাহা দেখিতেছে, তাহা যে ভুবন-ভুলানো মূর্ত্তি!

ভুলের পর ভুল—সে কি! মিম্মার অবস্থা দেখিয়া সুন্দরী আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে পুরুষ না! গৃহান্তরে চলিয়া যাইবার সময় রোষ-কটাক্ষে চাহিয়া মীল্লি বলিল, "ছিঃ, এমন অপদার্থ আপনি!"

মিম্মা এতক্ষণ অসীম ধৈর্য্যের সহিত হিসাবে মনোনিবেশের চেষ্টা করিতেছিল। অভাবনীয় বাক্যাঘাতে আচম্বিতে সে চমকিয়া উঠিল। ঘৃণা! সে পাইল শুধু ঘৃণা! এতদিনের সাধনার পর আজিকে তাহার উপর এই মন্তব্য!

ধীরে ধীরে উঠিয়া সে বাগিচায় গিয়া উপস্থিত হইল। খেয়াল নাই, বৃষ্টি পড়িতেছে। ক্ষেত্র-মধ্যে পাগলের মতো ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না; পথ-রেখাগুলি হারাইয়া গিয়াছে।

পশলা পশলা দম্‌কা হাওয়া ও বৃষ্টি ধারাকে পরিপাক করিতে করিতে রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। অকস্মাৎ মিম্মার মনে পড়িল, কালকেও এই সময়কার কথা। সে কাল আহারান্তে এতক্ষণ তার পিতার বুকের কাছে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। রোগতপ্ত পিতার শিথিল হাত দুখানিকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া নিজের মুখখানিকে তার বুকের কাছাকাছি রাখিয়া উভয়ের সেই পরম নির্ভরের মতো সুমধুর নিদ্রা—যুবকের মনে পড়িল।

দিগ্বিদিক-বিচার-বিহীন হইয়া সে গৃহের পানে চলিল।

(৩)

অনেক রাত পর্য্যন্ত মাম্পো ঘুমাইতে পারে নাই। একে রোগের জ্বালা,—তার উপর মিম্মার চিন্তা ঘুমের আর দোষ কি? মিম্মার আজ এ কী ঘটিল? এমন কোন দিনই তো হয় নাই! বুড়া অস্থির। এদিকে অতিথি দুয়ারে পড়িয়া রহিল;— সর্ব্বনাশ! আজীবনের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আজ বুঝি সব যায়। অশক্ত বৃদ্ধ, নিরুপায়; শুধু চিন্তা করিয়া মরিতে লাগিল। ইহাতে কি আর ঘুম হয়!

পরে লামা যখন গান ধরিলেন, আকুলি বিকুলি করিয়া সে নিবিষ্ট মনে তাহাই শুনিবার চেষ্টা করিল। শুনিতে শুনিতে ঈষৎ তন্দ্রাবেশে অনুভব করিল, যেন কার স্নিগ্ধ কোমল হাতদুইখানিতে করুণ শুশ্রূষায় তাহার ভাবনা যন্ত্রণা অপসারিত হইয়া গেল। সে এবার নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

* * *

মাম্পোর বাড়ী হইতে রশিটাক দূরে, কিছু উঁচুতে ঝাউয়ের শ্রেণী। মিম্মা তাহার কাছে পৌঁছিয়া বাড়ী দেখিতে পাইল। আর ত পা চলে না! কি জানি, তার পিতার কি হইয়াছে, কি-বা গিয়া সে দেখিবে, কি বলিয়া কি করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইবে—এই সকল দুশ্চিন্তাই তাহার প্রবল হইল।

চঞ্চলা চপলা কলিকাটির মতো, কুয়াশার পাতলা ওড়নার ঘোমটাখানি একটু সরিয়া গেলে, পরিষ্কার চাঁদের আলোতে সে দেখিল, তাহাদের ঘরের বারান্দায় কে ব্রহ্মচারী বসিয়া মণি-পদ্মা হাতে মন্ত্রগীতি আবৃত্তি করিতেছে। সজাগ অবিকল উদাসীন সেই ঠাকুর মহাশয়। লক্ষ্যহীন অনন্ত শূন্যে তাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি স্থির,—তাহারি ভিতর দিয়া সে কাহাকে তাহার হৃদয়ের আনন্দ জানাইতেছে! মিম্মা অনিমেষ নেত্রে লামাকে দেখিল। ভাব-বিহ্বলতায় অভিভূত হইয়াই সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তিটিকে সে দেখিতে লাগিল; এবং বুঝিতে চেষ্টা করিল—কোন্ জ্যোৎস্নার চুম্বন পাইয়া, কোন্ জ্যোতির আলোকোদ্ভাসিত প্রেমে এই চির-পথিকটি তৃপ্ত।

বিরত-সঙ্গীত ভিক্ষু তাহার পদ্মাসন ভাঙ্গিয়া ঘূর্ণায়মান পদ্মা হাতে আঙ্গিনাতে দাঁড়াইল। রুদ্ধ বক্ষের ভিতর হইতে তাহার নীরব গান যেন সবেগে বাহিরে আসিতে চায়। বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সে তাহা বক্ষের উপর ধরিল এবং ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিক দিয়া আরম্ভ করিয়া তদবস্থায় গৃহখানি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। আবার থামিয়া আবার প্রদক্ষিণ। কয়েকবার এইরূপ করিবার পর, ফকির সন্তর্পণে অনুতপ্তের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

দূর হইতে সে প্রশ্ন করিল, "কোন্ কর্ত্তব্যে এখানে আসিয়াছ?"

"এই-ই আমার বাড়ী।"

"সেবা-ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়াও, সাহসী প্রাণী, বলিতেছ ঐ তোমার বাড়ী। কেমন গৃহস্থ তুমি! ঐ শয্যাশায়ী বৃদ্ধ কি তোমার উপেক্ষা করিবার!"

"আমি—হাঁ, অপরাধী। কিন্তু আমার পিতাকে তুমি জান না সন্ন্যাসী। দেখিবে, সে কেমন ক্ষমা করে। এ নির্ভরতা না থাকিলে কি ফিরিতে পারিতাম, ভাবো?"

সার্থক—সন্ন্যাস তাহার। পিতা-পুত্রের এই অলোক-সামান্য, স্নেহ-ধৌত, ক্ষমাময় সম্বন্ধের সৌরভটুকু স্মরণ করিতেই লামার লাল চক্ষু দুইটি শিশির-সিক্ত পদ্মদলের মতো অশ্রুকণিকায় ভরিয়া উঠিল।

(৪)

শেষ রাত্রি। অন্ধকার যায় যায়।

মাম্পো জাগিল। অনাহারে সে দুর্ব্বল

বটে, সুনিদ্রায় কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা এখন অনেক কম। সদ্য জাগরিত, তৎক্ষণাৎ কিছু ঠাহর পায় নাই। পুত্র এতক্ষণ উঠিয়া চা তৈরী করে, তাই সে অভ্যস্তভাবেই কহিল,—"মিম্মারে, বাবা আমার,—চিয়া কি বানানো হল! দে তো একটুখানি বাপ!"

কুটিরের বেড়ার দিকে মুখ রাখিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে বৃদ্ধ, না দেখিতে পাউক, অনুভবে বুঝিল—চা তৈয়ারি হইতেছে। ছেলে যে ঘরে নাই, সহসা সে ধারণাই তাহার হইল না।

তৈয়ারী চা-পাত্র গ্রহণ করিবে মাম্পো ঠিক এমন সময় দুয়ার ঠেলিয়া মিম্মা ও লামা ভিতরে প্রবেশ করিল। অবাক্ বুড়া চাহিয়া দেখে—এ কি! তাহার বুকের মধ্যে ধ্বক করিয়া উঠিল।

উল্লাস চমকে তাড়াতাড়ি হাত হইতে পাথরের খোরা ভুমিতে রাখিয়া বৃদ্ধ পুত্রকে বুকের কাছে লইয়া কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিল। কি বিপদে পড়িয়াছিল সে,—কি করিয়া উদ্ধার পাইল,—লামা গোঁসাইজীই তা'কে রক্ষা করিয়াছে। নতুবা বিপদের মুখে সেই বা আসিয়া পড়িবে কেন—প্রভৃতি কথাবার্ত্তার উত্তরে মিম্মার কোনো আবেগ পরিলক্ষিত হইল না। কোনটার সে উত্তর দিল, কোনটার দিল না। ছেলের গাম্ভীর্য্যে পিতা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। তাহার নিকট কথায় বার্ত্তায় চিরশিশু মিম্মা, হঠাৎ আজ এত গম্ভীর! সমাচার! সে দিতেছে, কিছু পাইতেছে না! এ একটা বেদনার মতো মাম্পোর মর্ম্মে বাজিল। তৎপরেই সে যখন তাহার জাগরণ-ক্লিষ্ট রক্তিম চক্ষু দুইটি লক্ষ্য করিল, তখন অনুমান করিয়া সান্ত্বনা পাইল—এ রাত্রি জাগিয়াই; অথবা এই অনুপস্থিতির অপ্রকাশ্য কৈফিয়তের লজ্জাতেই এ গাম্ভীর্য্য।

এদিকে আবার এ কি! মিম্মা নহে, একটি অপরিচিতা যুবতী মেয়ে তাহাকে চা দিতেছে! চিন্তানুমান-বিস্মিত বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "সারা রাত্রি মার মতো স্নেহ-হস্তে পরিচর্য্যা করিয়াছ, কে তুমি মা?"

মিম্মাই অগ্রসর হইয়া এ কথার উত্তর দিল, "এ নীলি। ইনি আমার মুনিবের ভগ্নী। নীলি ঠাকুরঝী, আপনি এখানে!"

উজ্জ্বল চক্ষে মিম্মার দিকে কিয়ৎকাল চাহিয়া নীলি জবাব দিল, "একটা নর-পশুর গার্হস্থ্য ইতিহাস পাঠ করিতে আসিয়াছিলাম। হাঁ, আমি এখানে।"

বুড়া কিছুই জানে না, আরো আশ্চর্য্য হইতে লাগিল; একটু শঙ্কাও মনে জাগিল।

মিম্মা একদৃষ্টে নীলির দিকে চাহিয়াছিল, প্রসন্ন শান্ত স্বরে একবার সে বলিল" বেশ, আজিকার এই সুপ্রভাতে আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন; কিন্তু এখানে আপনার কর্ত্তব্য বোধ হয় শেষ হইয়াছে।"

মাতালের মতো ছলছল সরল চক্ষুতে মাদকতা জড়িত চাহনি নীলির। যুবকের দিকে তাকাইয়া ছিল, নত মুখে সে উত্তর দিল,"শেষ হইয়াছে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না।"

মিন্মা আপন স্বরে কহিতে লাগিল, "যান, এখনও বস্তীবাসী নরনারী শয্যা ত্যাগ করে নাই, আলোক সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠে নাই! সম্ভ্রান্ত-বংশজাতা, আমার নমস্যা ম্লীল্লি ঠাকুরঝী সকলের অজ্ঞাতসারে আপনি স্বগৃহাভিমুখে অগ্রসর হউন।"

নত মস্তকেও যুবতী যুবককে দেখিতেছিল, শুনিতেছিল; এবং তাহার স্বরকে বাক্যের ধারাকে অবিশ্বাস করিতেছিল;—এই কি সেই মিন্মা! কে দিল, এ পরিবর্ত্তন? সে প্রত্যাখান করিতেছে। এইবার তাহার নারী হৃদয়খানি কাঁপিল। একটি অস্ফুট সুচিক্কন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সুন্দরী মাটি ধরিয়া একেবারে বসিয়া পড়িল। করুণ নেত্রে কতক্ষণ মিন্মার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া সে স্পষ্টই বলিল, "চেংটি ভুটিয়ানীর ভগ্নী ভিক্ষায় বাহির হয় না;—দোহাই তোমার, স্বগৃহে পাইয়া তাহার অপমান করিও না।"

ম্লীল্লি উঠিল। এবারকার চেহারাখানি তাহার নিস্তরঙ্গ শান্ত সাগরের মতো, নির্ব্বাপিত-ঝটিকায় প্রকৃতি দেবীর মতো। যেন চিরকালের মতো বিশ্রাম, যেন সমস্ত দিবা-রাত্রির জন্য সে ছুটি পাইয়াছে। লঘু হৃদয়ে বিনা বাক্য-ব্যয়ে রূপসী গৃহ হইতে বাহিরে চলিল।

বাহিরে গিয়া সুন্দরী আর নড়িতেই পারিল না।

মিন্মা আঙ্গিনার মাঝে আসিয়া ম্লীল্লির হাত দুইখানি ধরিয়া ভরা চোখে বলিল, আমি দুর্ব্বল। "দুর্ব্বলকে চিকিৎসা করো, তাহাকে পথ্য দিয়া বল দাও।"

বিমুখ হইয়াছিল ম্লীল্লি; ফিরিয়া মিন্মার দিকে উৎফুল্ল নেত্রে চাহিয়া বলিল,—

"এ হাত ছাড়িও না মিন্মা, ইহা বেশ করিয়া বাঁধিয়া ফেলো। অপরাধ আমার। আমি সোনা লইয়া ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা খেলিতাম। কিন্তু সোনা—নরমই।"

পরে, কি ভাবিয়া সে আবার কহিল, "দিদিকে চেনো?"

মিন্মা কথা কহিল না।

ঈষৎ চিন্তার পর পুনরায় বলিল, "হউক। দিদিকে আমার সম্পত্তির অংশ ছাড়িয়া দিয়া তোমার প্রতি অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত আমি করিলাম।"

স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বৃদ্ধ পিতা কহিল, "বিষয়-বুদ্ধিকে অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছায় দুর্দ্দশা খরিদ করিলে, মনে রাখিও। আর, এ ছেলেমানুষি।"

ম্লীল্লি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দিল, "দুর্দ্দশার অবসানে ঐ শুভ প্রভাতের তরুণ সূর্য্য উঠিয়া পড়িয়াছে। এ—ত্যাগ নহে বাবা,—ক্ষুদ্রের প্রায়শ্চিত্ত। আমি অবিশ্বাসিনী নহি।"

মিন্মা ও ম্লীল্লির দিকে চাহিয়া শ্রমণ যুবক সগদ্‌গদ প্রফুল্লতার সুরে গান করিতে লাগিলেন, "দুর্গতির মধ্যেই চন্দন জীবনের সার্থকতা। নহিলে সুগন্ধের মধু তার পাইতাম কোথা হইতে? দুঃখের আসল প্রতিকৃতি নানারঙের বটে, কিন্তু তারই মর্ম্মস্থলে—অমৃত এবং সত্য।"

(৫)

দরিদ্রোচিত আয়োজন—সম্ভারে মিন্মা ও ম্লীল্লির বিবাহের উদ্যোগ চলিতেছে।

পুরোহিত আসিয়া সেদিন তারিখের বন্দোবস্ত করিয়া গেল। আগামী হপ্তায় তেস্‌রা রোজ—রবিবার, খুব ভাল দিন। যাবতীয় পাহাড়ের জন্ম ঐ দিবসেই।

* * *

বিবাহের দিন ভোরে, চেংটী ঘরে পৌঁছিয়া দেখিল,—নীল্লি বাড়ী নাই; মিম্মা গরহাজির। ব্যাপার? প্রথমে সে বুঝিতে পারিল না। নীল্লির প্রকৃতি—তত নীচ নহে! সে বিদুষী। মিম্মা দরিদ্র। না, না, না—নহে।

মাম্পোর শুশ্রূষা-পরায়ণা নীল্লিকে যাহারা দেখিয়া আসিয়াছে, তাদের কাছে সংবাদ পাওয়া গেল।

শয়তানীর মত সে চীৎকার করিয়া উঠিল, এ কি সত্য!

সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বস্থ তিব্বতী কুকুরটিকে সজোরে পদাঘাত করিয়া সে নীচে ফেলিয়া দিল।

দুই হাত সবলে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া যতক্ষণ পারিল এই অপমান-বজ্রের সংঘাতটাকে দূরে রাখিবার সে চেষ্টা করিল।

"চেংটির ক্রোধ তাহারা জানে না—!"

"নীল্লি! নীল্লি!—"বলিয়া সে কেমন এক উচ্চ, উৎকট, উন্মাদ, দানবী গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘনগুচ্ছ চুলগুলি তাহার অবিকল ধূর্জ্জটির মাথার জটা জড়িত সর্পরাশির মতো ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া আরো—আরো ভয়ঙ্কর ভীষণ কালো হইয়া, মুখখানি সন্ধ্যা-সূর্য্যের আগুনের মতো লাল হইয়া, ঘামিয়া, ঐ দেবীযুদ্ধের চামুণ্ডা চণ্ডীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

মজুরদিগকে বক্‌শীস্ দিবার নিমিত্ত তাতার-জাত, ভয়ানক উগ্র কয়েক বোতল রক্সীপূর্ণ এক বাক্স মজুত ছিল। চেংটি একটা সাবল দ্বারা সেই বৃহৎ বাক্সের আবরণকাষ্ঠ চচ্চড়্ করিয়া ভাঙ্গিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া ছিপি খুলিয়া অবিকৃতমুখে সম্পূর্ণ একটি বোতল শেষ করিয়া ফেলিল। দৃঢ় হস্তে অন্যটির গলা ধরিয়া শয্যার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

চীনা পেয়ালায় থরে থরে সাজানো ঝালমাখা, অর্দ্ধসিক্ত, লবণাক্ত মাংসখণ্ড গুলি কেবলমাত্র পরিচারকে রাখিয়া যাইতে ছিল, পাগলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি জানিস্ নীল্লির তুই, নফর!"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া কম্পিত পদাঘাতে তাহাকে সে দূর করিয়া দিল।

এবার চুমুকে চুমুকে সুরাপান, খণ্ডে খণ্ডে মাংস চর্ব্বণ—মত্ততায় প্রলয় ঝটিকার পূর্ব্বক্ষণের মতো রৌদ্রভীমা এই ভুটিয়া রমণী বড়ই ভীষণ হইয়া উঠিল।

টলিতে টলিতে, হেলিতে দুলিতে রমণী দাঁড়াইল;—ঠিক।

এখন সে স্থির। চক্ষু রক্ত জবা। ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত মুখখানিতে তার, সিন্দুর আভাটি ফুটিয়া উঠায়, এক ভয়ানক সৌন্দর্য্যে তাহাকে রাক্ষস-সুন্দরীর মতো মায়াময়ী করিয়া তুলিয়াছে।

* * *

কোন্ সোণার কাঠিটির স্পর্শে, কি

মন্ত্রের প্রভাবে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, চিররুগ্নকে সুস্থ করে?

মাম্পো আজ সম্পূর্ণ রোগ-বিমুক্ত। উৎসাহের আর তার সীমা নাই; যথাশক্তি আয়োজনের সে ত্রুটি করিতেছে না।

বৈকালেই বিবাহ-উৎসব। বৃদ্ধ পাড়া-পড়সী-নিমন্ত্রণে ব্যস্ত; মিম্মা পুরোহিত আনিতে গিয়াছে।

নীল্লি ইত্যবসরে সেই ঝাউঝাড়ের নিম্নস্থিত প্রস্তর-খণ্ডের উপর গিয়া উপবেশন করিল। এক রাশ কুয়াশায় স্থানটি আবৃত। পার্ব্বতী সুন্দরীকে এক-খানি মেঘের রাণীর মতো দেখাইতেছে।

পরিণয়-উপলক্ষে এ কয়দিন ভিতরে ভিতরে সে আনন্দে মাতোয়ারা ছিল! আজ কিন্তু তাহার হৃদয় স্বভাবতঃই দমিয়া যাইতেছে। সে আজিকে কোথায় দাঁড়াইবে? দিদি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। অথচ সে—অচ্ছেদ্য রক্তের সম্বন্ধ। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া।

ভাব-গোপনের যথেষ্ট প্রয়াস-সত্বেও সে ধরা পড়িয়া গেল। দূর হইতে মাম্পো তাহাকে দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিয়া কহিল, "আমি তাঁহাকে আবার পিতৃ-বক্ষে টানিয়া লইতেছি, মা! এখনও সময় আছে!"

বড় সামলাইয়া নীল্লি প্রত্যুত্তর করিল, "ডোর ছিঁড়িবার সময়কার একটু আঘাত, এতটুকু বেদনা-বোধও কি বিচিত্র, বাবা?

মাম্পো কহিল, "ঠিক; কিন্তু কোন ছবিখানি সম্পূর্ণ নিখুঁত ভালো বল দেখি মা!"

একটা গর্জ্জন-শব্দে উভয়ে চাহিয়া দেখিল, দূরে চেংটি—বিপরীত দিক হইতে মিম্মাকে উঠিতে আসিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়াছে, "মিম্মা!—গোলাম—"

নীল্লি এত বিস্মিত যে সে শিহরিলও না।

মিম্মা অমৃতপায়ী। আজ নীল্লির উপযুক্ত সে, কাঁপে নাই।

কাঁপিল—মাম্পো। সে স্নেহাকুল, বৃদ্ধ, ভীত। জীবনের অন্তিম যুগে, শান্তির পরিবর্ত্তে এসব কেন? সমস্ত হারাইয়া দিয়া শান্তিও তাহার পাওনা হয় নাই!

চেংটিকে অভিবাদন করিয়া মিম্মা বলিল, "আমার সৌভাগ্য।"

চেংটি কহিল, "তোমার সাহসের পুরস্কার আবিষ্কার করিয়াছি!"

বক্ষঃসংলগ্ন বস্ত্রাবরণ হইতে বাম হস্তে চক্‌চকে একখানা কুক্‌রী ও ডান হাতে ভরা একটি পিস্তল টানিয়া বাহির করিয়া সে কহিল, "আফ্‌গান দেশের খাঁটি ইস্পাতে তৈয়ারী এই কুক্‌রী। আর নীল্লি! মিম্মার গর-হাজিরি জবাব-দিহি—তোমার।"

নীল্লি শান্ত রমণীর মতোই উত্তর দিল, "সুরায় তুমি মস্তিষ্ক খোয়াইয়াছ, দিদি।"

মত্তাবস্থাতেও দিদি সরল বন্য দৃষ্টিতে কনিষ্ঠাকে দেখিতেছে। সে সহোদরা। শৈশব হইতে নিজেই সে তাহাকে লালন-পালন করিয়াছে। নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী—স্নেহ, বিশ্বাস, ভরসা রাখিবার, কর্ম্ম-ক্লান্তি, চিন্তা ও শ্রান্তি আরোগ্য করিবার একটি মাত্র সন্ততি ঐ নীল্লিই তাহার—না, হউক তাহা!

"বংশ-গৌরবের এ অবনতি অসহ্য!"

বিকৃত মুখে ইহা কহিতে কহিতেই 'গ্রুম' করিয়া চেংটি নীল্লির দিকে পিস্তল ছুঁড়িল। মিম্মা নক্ষত্রবেগে গিয়া তাহাকে ধাক্কা দিল। তাই রক্ষা। লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। তন্মুহূর্ত্তেই যদি উপস্থিত বুদ্ধি-প্রণোদিত মাম্পো পুত্রকে আকর্ষণ করিয়া নীচে না ফেলিয়া দিত, তাহা হইলে ভুটিয়ানীর হস্ত-চালিত কুকরী তাহার মুণ্ডটিকে উড়াইয়া দিতই।

পুনঃ-পুনঃ লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় কুপিতা কামিনীর চিন্তা-শিথিল হস্ত হইতে, কুকরী খানা স্খলিত হইয়া ভূপতিত হইল।

"সংহারের শত গবাক্ষ দিয়া রূপ যে ফুটিয়া বাহির হয়!—রূপ কত রে!"

রাসের পুতুলটির মতো সেই লামা আসিয়া পশ্চাৎ দিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, খুনাখুনি ব্যাপারের গোলমালে কেহ তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর পায় নাই।

"প্রবল-প্রতাপান্বিত, মহামহিম, দেশ-ধর্ম্ম-রক্ষক, রাজ-অধিরাজ, শ্রীশ্রীশ্রী-শ্রীলশ্রীযুক্ত ভোটান রাজ্যেশ্বরের গৌরবময় সিংহাসনের পার্শ্বস্থ প্রতিনিধি, জটিল রাজনীতি-কোবিদ, শ্রীমান মন্ত্রীবর কর্ত্তৃক আদিষ্ট আমি, দেশের কল্যাণকামী বিপদাপন্ন রণসমূহে প্রাণ-দান-প্রতিজ্ঞ, প্রজা-সঙ্ঘে রাজপ্রসাদগ্রাহী সেনাপতি, ঢেধ্বা বস্তীর জমিদারনী চেংটি ভুটিয়ানী তুমি, তোমাকে, হত্যা-প্রয়াস-অভিযোগে অভিযুক্ত, গ্রেপ্তার ও বন্দী করিতেছি;—তোমার বিচার হইবে।"

লামা ও সেনাপতির এই সুস্পষ্ট উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সকলে চাহিয়া দেখিল, বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী ও সেনাপতি সেই শিব-পন্থী বৈরাগী যুবার পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! সমবেত সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ, দাঁড়াইয়া—স্থির রহিয়াছে। জনতা দেশ-ধর্ম্ম-রক্ষকের সমুচ্চ জয় ঘোষণা করিল।

ভ্রূকুটি-কুটিল চেংটি ঈষৎ বক্রগ্রীবায় সেনাপতি ও মন্ত্রীর পানে চাহিয়া দেখিল, চিনিল। বাক্য ব্যয় না করিয়া সে বস্ত্র মধ্য হইতে বোতল-গ্রহণান্তর ঢক্ ঢক্ করিয়া তাহা শেষ করিয়া ফেলিল। এবং ঘৃণা-ব্যঞ্জক বিকৃত মুখে শুধু আপন মনে অস্ফুট স্বরে কহিল, "প্রথম পরাজয়। তাও চেংটির প্রাণান্তক দুঃসহ।"

শিঙাধ্বনিতে সেনাপতির ইঙ্গিত পাইয়া সৈন্যার্দ্ধ তৎক্ষণাৎ চেংটিকে পরি-বেষ্টন করিয়া ধরিল।

মিম্মা ও নীল্লিকে দুই ক্রোড়ে আলিঙ্গন করিয়া মুদিত নেত্রে মাম্পো পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়া রহিয়াছে।

লামার কটাক্ষ-সঙ্কেতে মন্ত্রী তখন মহামূল্য মণিরত্ন-খচিত শিরস্ত্রাণ লইয়া মাম্পোর সম্মুখস্থ ভূমিতলে রাখিয়া সেনাপতি-সহ সশস্ত্র তৎপ্রতি শিরোনমন করিলেন। "কর্ত্তব্য-অনুদিষ্ট, দেশ-অনুগ্রহপুষ্ট, কুশলজীবি মন্ত্রী আমি—বীরাগ্রগণ্য, মহা-তেজস্বী সেনাপতি, আপনাকে দেশ-ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত, অনুজ্ঞা করিতেছি—মৃত্তিকাপবিত্র ঐ শিরস্ত্রাণ উত্তোলনপূর্ব্বক সশস্ত্র রাজ পরিচ্ছদ সহকারে ইহাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করুন।"

তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রীর এই

ভাষা, কণ্ঠ ও বাক্য শ্রবণে তৎপ্রতি দৃষ্টি দান পূর্ব্বক নম্র ও ব্যগ্রভাবে মাম্পো কহিল, "না, না, আমার নমস্ত বৃদ্ধ, দরিদ্র কৃষককে প্রলোভিত করিবেন না। যাহার ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছি, সেই প্রাণ টুকুর উপর অত্যাচার করিবেন না।

সম্মানপূর্ণ স্নেহ-কঠিন বাক্যে অতি বৃদ্ধ মংথো মন্ত্রী শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন, "রাজবংশ সুখ-ভোগের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করে না।"

এবং তাহার ঈঙ্গিত-ক্রমে অবাঙ্মুখ ইতিহাস-গায়ক কবি সুললিত পদ-বিন্যাসে ভুটানের পূর্ব্ব বংশ-গৌরব হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ রাজপুত্রের উদাসীনতা পর্য্যন্ত সমুদয় ঘটনা সুর-সংযোগে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শুনিয়া লোকে মোহিত হইল, বিস্মিত হইল, শোকাকুল হইল—নানাভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বৃদ্ধ মংথোর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি পদাস্ফালনপূর্ব্বক লম্ফে লম্ফে ইতঃস্তত পাদচরণ করিতেছেন; সংকীর্ত্তনে তিনি মত্ত—মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারি বংশের মস্তিষ্ক পরিচালিত সুশৃঙ্খলাময় রাজ্য, প্রজাপালক রাজা, প্রত্যেক-অভিষেক প্রত্যেক-বিজয়।—বার্দ্ধক্য তাহার আবেগে অধীর হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে তিনি কহিতে লাগিলেন, "ভোটান-নরপতি আলস্যে, বিলাস-সম্ভোগে অভ্যস্ত নহেন। স্বার্থ-শিথিল সেই রাজকীয় দক্ষিণ হস্ত দুইখানি প্রজার হিতে চির-জাগরূক।"

সঙ্গীতের বিদ্যুত্তরঙ্গে মাম্পোর অবশ ইন্দ্রিয়রাজি প্রোজ্জীবিত, সুশীতল রক্ত-কণিকাবলী তাপোৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে। সে বলিল, "রাজ্য আমারি। হাঁ, তাহার অরাজকতা দূর করা আমারি কর্ত্তব্য, হেমশ্রী,—প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াও।"

তৎক্ষণাৎ সেনাপতি মাম্পোকে রাজবেশে সুসজ্জিত করিয়া দিল। পীতাশ্মগর্ভ-খচিত, শিরস্ত্র-শোভিত মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক তিনি যখন যুবকের মতো দাঁড়াইলেন, মণ্ডলীবদ্ধ জনসাধারণ সবিস্ময়ে তাঁহার পানে চাহিয়া দেখিল,—ইহা তো অবিশ্বাস করিবারই নহে, রাজা ইনিই।

সমবেত প্রজা-কণ্ঠ ঐক্যতানে জয়ধ্বনি করিলে মন্ত্রী, সেনাপতি, মিম্মা, সৈন্যবৃন্দ একে একে রাজাকে নমস্কার জানাইলেন। ন্নীল্লিকেও তৎসঙ্গে নমস্কারে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া সৈন্য-বৃত্ত-পরিবেষ্টিতা চেংটি চীৎকার করিয়া কহিল, "ন্নীল্লি-ন্নীল্লি! তোমার আভিজাত্য স্মরণ করো। চেংটি ন্নীল্লি পৃথিবীতে সাধারণের সঙ্গে মিশিতে আসে নাই, ইহা মনে করো।"

সেনাপতি তাহাকে রাজ-সন্নিধানে অভিযুক্ত করিল।

মাম্পো। চেংটি, তোমার বিচার হউক।

চেংটি। এবার এস, ন্নীল্লি! আমরা ভোটান রাজ-সম্মানের নিকট ঈষৎ অবনত হই।

দূরে দূরে উভয়ের মস্তক নিম্নপানে লঘুভাবে দুলিল। ভূমিষ্ঠজানু হইয়া মিম্মা এই আনন্দ-দিনে চেংটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

"চেংটির কারব্যয়—অঙ্গরূপ। ক্ষমার

দেনা-পাওনায় নয়। যুবক ন্নীল্লির সৌভাগ্যে সুখী হইলাম; এইমাত্র। আমাদের স্বোপার্জ্জিত বিপুল সম্পত্তির সম্পূর্ণ স্বত্ব ন্নীল্লিকে উৎসর্গ করিয়া, চির-অপরাজিতা চেংটি, তার প্রথম পরাজয়ের এইরূপ প্রতিশোধ তুলিয়া লইল।"

জমিদারণী আপনার ইহ-জীবনের সকল বাক্যের এই শেষ পূর্ণচ্ছেদ দান করিয়া ঘুমাইয়া ফুরাইয়া গেল।

মাতৃহারা বালকের মতো—সদ্য-মাতৃহারা অনাথের মতো ন্নীল্লি পাগলিনী ছুটিয়া গিয়া দিদির বুকের উপর পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। একটা কর্ম্মময় জীবন, সে যে নিজে বাঁচিয়াও রক্ষা করিতে পারিল না,—আর তাহাকে সে যে মাতৃ-হৃদয় ঢালিয়া দিয়া ভালবাসিত, ইহাই সর্পাঘাতের মতো তাহার বক্ষকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। তাহার উপর, যে কয়টি লহমা সে বাঁচিয়া ছিল, ন্নীল্লিকে বাহুবেষ্টনে বুকে ধরিয়া যেন কত কথা কহিয়া গেল। ন্নীল্লি যন্ত্রণা-পেষিত ক্রন্দনে হৃদয়-জ্বালা নিবারণের চেষ্টা পাইল। কিন্তু সান্ত্বনা কি আছে? নাই। তাহার সান্ত্বনা নাই রে!

অশ্রুপাত করিতে করিতে মিম্মা ন্নীল্লিকে তুলিয়া কহিল, "আমাকে তুমি এই রাজ-দরবারে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করো,—ন্নীল্লি!"

রাজা। সূচনায় এই রক্তপাত! মন্ত্রী, সাক্ষী থাকো।

মন্ত্রী। ঊষা ও সন্ধ্যা রক্তিমই হয় তো, দিন তবু চলিয়া যায়।

মন্ত্রী মংথোর দিকে চাহিয়া কহিল, "তাঁর চন্দন। তিনি ঘর্ষণ করিতেছেন, সুরভি মধুতে আমোদিত হইবার জন্য;—আমরা যেন তাহাতে ব্যর্থ বাধা প্রদান না করি।"

সকল প্রজাবৃন্দ যখন জানিল, ভোটান নৃপতি পিতৃব্যকে রাজ্যদান করিয়া জন্মশোধ চলিয়া যাইতেছেন, উচ্চৈঃস্বরে তাহারা প্রতিবাদ করিল;—বৃথা। অশ্রুপাতে দৃঢ়তা এতটুকুও বিচলিত হইল না।

রাজা বেদনা-ক্লিষ্ট হৃদয়ে ডাকিলেন, "সন্ন্যাসী—প্রিয় বৎস, বংশমণি—স্নেহের দুলাল!"

রাজা আর বলিতে পারিলেন না।

মংথো, মিম্মা, সেনাপতি, সৈন্যশ্রেণী, প্রজা সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ন্নীল্লি সেখানে মিম্মার পাশে বসিয়া মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। পাহাড় চাপা দিয়াও বিদীর্ণ হৃদয়ের আবেগোচ্ছলিত রক্তোৎসকে কিছুতেই সে দমন করিতে পারিতেছিল না। সারা কালের জন্য এ ক্ষতি কি তাহার সামান্য? পরমায়ুর প্রতি পর্দ্দায়, ভোগের প্রতি পরমাণুতে, মিলনের স্পন্দিত কিরণরঞ্জিত সেতুর উপর যখন চেংটির স্নেহ-স্নিগ্ধ-স্মৃতি-মাখা একখানি কালো ছায়া আসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিবেই, —সেই দুঃসহ পরমায়ুর অতৃপ্তি-উদ্দীপক ভোগে মিলনের শান্তিটুকু ছিপি-খোলা শিশির কর্পূরের মতো উবিয়া যাইবে; ভালোবাসার পরিণামে, চিরস্নেহের প্রতিদানে কী তীব্র অভিশাপ দিয়া গেল, তা'র উন্মাদিনী দিদি!

ছোট্ট মেঘখানির মতো লামা চলিল

পাহাড় হইতে পাহাড়ান্তরে,—বুঝি, তাঁর করুণা-বর্ষণের জন্যই,—রস-পানের নিমিত্তই।

তন্দ্রাহীন মণিপদ্মা মূক নিয়তির মতো ঘুরিতেছেই, জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্রাগ্রগুলি উড়িতেছেই। নিজে খুঁজিয়া পথ বাহির করিয়াছে, আনন্দ কীর্ত্তনে দিগন্ত মুখরিত করিয়া সেই পথে সে চলিল।

এক পাহাড় লোক পলক-হীন দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল,—ঐসঞ্চালনে...ঐ স্পন্দনের প্রতি ধমনীতে গাঢ় সান্ত্বনা, বিমল প্রেমের পরিণতি, মিলন-মঙ্গলের উদ্ভাসিত দীপালোক পরিস্ফুট—গতির আবরণে স্থিতিকে সে রক্ষা করে, ভূতকাল হইতে ভাবীকে লীলায়িত করিয়া তুলে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়।

আর্য্যভট্ট

অঙ্কশাস্ত্রে প্রাচীন ভারত যে অনেক পরিমাণে জগতের শিক্ষাগুরু ছিল—এ কথা এখন অবিসম্বাদীরূপে গৃহীত হইয়াছে। দশমিক ভগ্নাংশের (Decimal system) আবিষ্কার সর্ব্বসম্মতি অনুসারে ভারিতে হইয়াছিল। সংখ্যালিখনের (system of numeration) পদ্ধতিও ভারতীয় আবিষ্কার। এই ১, ২, ৩, প্রভৃতি সংখ্যাগুলি আরবীয়গণ গ্রহণ করিলে পর তাহা ক্রমশঃ ইউরোপে গৃহীত হয়। প্রাচীন গ্রীসদেশের সহিত প্রাচীন ভারত জ্যোতিষশাস্ত্রের শিক্ষাগুরু বলিয়া গৌরব করিতে পারে। আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্যের অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে গবেষণা শুধু ভারতের কেন, জগতের গৌরবের সামগ্রী। এই কয়জন মহাপুরুষের অগ্রণী আর্য্যভট্টের বিষয় এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

আর্য্যভট্ট বা আর্য্যভটের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে খুব কমই জানা গিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে তিনি ৩৫৭৭ কল্যব্দে বা ৩৯৮ শকে (৪৭৬ খৃঃ অঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আর্য্যভটীয়" বা "আর্য্যভট্টতন্ত্র" রচনা করেন। তিনি গ্রীকদিগের নিকট অন্দুবেরিয়স বা অদ্রুবেরিয়স এবং আরবীয়গণের নিকট অর্জভর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কুসুমপুর বা পাটলীপুত্র (আধুনিক পাটনা) তাঁহার বাসস্থান ছিল এবং এই স্থানেই তিনি "আর্য্যভটীয়" গ্রন্থ রচনা করেন।

"আর্য্যভটিয়" গ্রন্থ।

"আর্য্যভটিয়" গ্রন্থের পূর্ব্বেকার জ্যোতিষ শাস্ত্র বড়ই অনিশ্চিত, সেইজন্য আর্য্যভট্টকে এক হিসাবে আধুনিক ভারতীয় জ্যোতিষের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। তাঁহার পূর্ব্বে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ব্যাসসিদ্ধান্ত প্রভৃতি অনেকগুলি সিদ্ধান্ত ছিল বলিয়া পরবর্ত্তী জ্যোতিষ গ্রন্থ-সমূহে দেখা যায়, কিন্তু

তাহাদের অনেকগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন সিদ্ধান্ত পরবর্ত্তীকালে পরিবর্ত্তিত হইয়া এখনও বিদ্যমান আছে। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত সর্ব্বপ্রাচীন এবং আর্য্যভট্ট লিখিয়াছেন যে তিনি এই স্বায়ম্ভুব বা ব্রহ্মসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহাতে বেশ জানা যাইতেছে যে তিনি প্রাচীন গ্রীকগণের গ্রন্থ হইতে কোনও বিষয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অভিমতগুলি ভারতীয় এবং গ্রীক-সংশ্রবশূন্য। এই গ্রন্থখানি চারিভাগে বিভক্ত যথা,—গীতিকাপাদ, গণিতপাদ, কাল-ক্রিয়াপাদ এবং গোলপাদ। গণিতপাদে পাটীগণিত এবং বাকি তিন ভাগে জ্যোতিষ ও গোলগণিত আলোচিত হইয়াছে। (১)

পৃথিবী গোলাকার ও শূন্যে অবস্থিত।

পৃথিবীর আকারের স্বরূপ নির্ণয় করিবার আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই মানব মনকে উৎসাহিত করে। সাধারণের চক্ষে পৃথিবী সমতলক্ষেত্র কিন্তু প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ পৃথিবীকে গোলাকার বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। ঋগ্বেদে কোনও কোনও সূক্তে পৃথিবীর গোলত্বের আভাস পাওয়া যায়, এমন কি পৃথিবী যে অবলম্বন শূন্য হইয়া শূন্যে অবস্থিতি করিতেছে তাহার সূচনাও ঋগ্বেদে মিলে। আর্য্যভট্ট অবশ্য পৃথিবীর গোলত্ব (Sphere) ও অবলম্বন শূন্য হইয়া আকাশে অবস্থিতি—এই দুইই স্বীকার করিয়াছেন। পৃথিবীর শূন্যে অবস্থিতি স্বীকার করিলে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, যদি বাস্তবিকই পৃথিবী নিরাবলম্বন, তবে বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, পাহাড় পর্ব্বত পৃথিবীর উপর দাঁড়াইয়া আছে কিরূপে। তাহার উত্তরে আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন যে, গোল কদম্ব পুষ্পের উপরের গ্রন্থিগুলি যেমন পুষ্পের উপর আটকাইয়া আছে, সেইরূপ গোল পৃথিবীর উপর জলজ স্থলজ পদার্থ অবস্থান করিতেছে।(২) বরাহ, ভাস্কর প্রভৃতি পরবর্ত্তী সকল জ্যোতিষীই পৃথিবীর গোলত্ব ও শূন্যে অবস্থিতি স্বীকার করিয়াছেন। একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে—পৃথিবী যদি শূন্যে অবস্থিত, তবে পড়িয়া যায় না কেন? তাঁহার সুন্দর উত্তর ভাস্কর দিয়াছেন "পৃথিবীর চারিদিকেই সমান আকাশ, উহা পড়িবে কোথায়?"

পৃথিবীর আবর্ত্তন আবিষ্কার।

ভারতে আর্য্যভট্ট ভূভ্রমণের আবিষ্কারক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন যে বেদেও ভূভ্রমণ সূচিত হইয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্যরূপে আর্য্যভট্টই উহার আবিষ্কারক বলিয়াই স্বীকৃত হন। আর্য্যভট্টের পরবর্ত্তী জ্যোতিষীগণ কেহই ভূভ্রমণ স্বীকার

(১) খৃষ্টপূর্ব্ব দুই তিন সহস্র বৎসরের ভারতীয় জ্যোতিষিক জ্ঞান সম্বন্ধে Brennand's Hindu Astronomy দেখুন।

(২) যদ্বৎ কদম্বপুষ্পগ্রন্থিঃ প্রচিতঃ সমন্ততঃ কুসুমৈঃ।
তদ্বদ্ধি সর্ব্বসত্ত্বজলজৈঃ স্থলজৈশ্চ ভূগোলঃ॥

করেন নাই! অতএব এরূপ মনে হয় যে ভারতবর্ষে আর্য্যভট্ট একমাত্র ভূভ্রমণ আবিষ্কর্ত্তা ও পরিপোষক। গ্রীসদেশে ভূভ্রমণবাদ অতি প্রাচীনকালে একবার আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহা স্বীকার না করাতে উহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পিথাগোরাস (৩) (খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী) সর্ব্বপ্রথম স্বীকার করেন যে, পৃথিবী অচলা নহে সচলা। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে উহা সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাঁহার পর এরিষ্টারকস (খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী) আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী এক বৎসরে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে এবং স্বীয় অক্ষের উপরেও ঘুরিতেছে বলিয়া দিবারাত্রি হইয়া থাকে। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সকলেই অগ্রাহ্য করেন এবং এরিষ্টারকসের জন্মের প্রায় আঠার সাত বৎসর পরে সুবিখ্যাত জ্যোতিষী কোপার্ণিকাস পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগণের সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণের কাহিনী পুনরায় প্রচার করেন। আর্য্যভট্টের সময় গ্রীসদেশে ভূভ্রমণবাদ একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্য আর্য্যভট্টকে আমরা ভূভ্রমণবাদের একজন মৌলিক আবিষ্কারক বলিয়া অনায়াসে স্বীকার করিতে পারি। আর্য্যভট্ট বলিতেছেন, "চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি" অর্থাৎ পৃথিবী স্থির বোধ হইলেও বস্তুতঃ উহা সচলা। তিনি আরও বলিতেছেন, "এক চতুর্যুগে (৪৩২০০০০ সৌরবর্ষে) পৃথিবীর পূর্ব্বদিকে গতিসম্ভূত ভগণ (rotation) ১৫৮২২৩৭৫০০ বার অর্থাৎ পৃথিবী ১৫৮৭২৩১৫০০ বার ঘুরিয়া আসিলে (অথবা অত দিনে) এক চতুর্যুগ বা ৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ হয়। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আর্য্যভট্ট জানিতেন যে পৃথিবী একবার স্বীয় অক্ষের উপর ঘুরিলে এক দিনমান হয় এবং এক চতুর্যুগে পৃথিবী অতবার স্বীয় অক্ষের উপর ঘোরে। উপরোক্ত গণনায় পৃথিবী যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে তাহা অনুমিত হয় না। উপরন্তু লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি পরবর্ত্তী জ্যোতিষীরা আর্য্যভট্টের মত খণ্ডনকালে স্বীয় অক্ষের উপর পৃথিবীর আবর্ত্তনেরই উল্লেখ করিয়াছেন, সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর ভ্রমণের উল্লেখ করেন

(৩) "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে" একজন লেখক লিখিয়াছেন (১৩১৮, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, পৃঃ ২৬০) —"গ্রীসদেশবাসী পিথাগোরস প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত আর্য্যভট্টের মত ভারত হইতে নিয়া স্বদেশে প্রচার করেন।" বলা বাহুল্য পিথাগোরস আর্য্যভট্টের প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "আর্য্যসিদ্ধান্তকারগণের মধ্যে আর্য্যভট্টই প্রথমে দিবারাত্র ভেদের কারণ স্বরূপ পৃথিবীর আবর্ত্তন স্বীকার করিয়াছিলেন। ইউরোপে শকের পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোপর্ণিকস ভূভ্রমণবাদ যথোচিত প্রকাশ করেন। তাঁহার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট সেই মত আবিষ্কার করিয়াছিলেন।" বলা বাহুল্য কোপার্নিকাসের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পিথাগোরাস পৃথিবীর আবর্ত্তন আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এরিষ্টারকস পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন ও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণের কথা জানিতেন। কোপার্নিকাসের সহিত আর্য্যভট্টের তুলনা চলে না। কোপার্নিকস শুধু পৃথিবী কেন, সমস্ত গ্রহগণের সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ বৃত্তান্ত আবিষ্কার করিয়া আধুনিক জ্যোতিষের জন্ম দিয়া গিয়াছেন। আর্য্যভট্টের তুলনা পিথাগোরাসের সহিত চলে।

নাই। ইহাতে জানা যাইতেছে যে পিথাগোরাসের মত আর্য্যভট্ট অক্ষের উপর পৃথিবীর আবর্ত্তনের কথা জানিতেন, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী ভ্রমণের কথা জ্ঞাত ছিলেন না।

আর এক স্থলে আর্য্যভট্ট এই পৃথিবীর পরিভ্রমণের কথা বেশ সুন্দর উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যেমন গতিশীল নৌকার আরোহী তীরস্থিত অচল বৃক্ষাদিকে উল্টাদিকে যাইতে দেখে, সেইরূপ (পৃথিবীর গতির জন্য) স্থির নক্ষত্রদিগকে সমবেগে পশ্চিমদিকে যাইতে দেখা যায়।" (৪) নক্ষত্রবর্গের পশ্চিমদিকে গতি স্ফুটগতি (apparent motion), বস্তুতঃ পৃথিবীই পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছে এবং সেই পরিভ্রমণের দরুণ নক্ষত্রবর্গকে পশ্চিমদিকে যাইতে দেখা যায়।

আরও কয়েকটি শ্লোকে আর্যাভট্ট পৃথিবীর পরিভ্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল। পরবর্ত্তী কালে লল্ল, শ্রীপতি, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহ প্রভৃতি জ্যোতিষীগণ তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়া তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লল্ল আর্য্যভট্টের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু শিষ্য গুরুর সিদ্ধান্ত মানেন নাই। তিনি পৃথিবীর পরিভ্রমণের বিরুদ্ধে অনেকগুলি আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য নিম্নে কতকগুলির নমুনা প্রদত্ত হইল :—

(ক) যদি পৃথিবীই ঘোরে তবে পক্ষীরা উড়িয়া গিয়া আবার নিজেদের বাসায় ফিরিয়া যাইবে কি প্রকারে?

(খ) পৃথিবী ঘুরিলে বাণ উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলে উহা স্বস্থানে ফিরিয়া আসিত না, কারণ বাণের পতনকালের মধ্যে পৃথিবী অনেকটা পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাইবে।

(গ) পৃথিবী ঘুরিলে আমরা মেঘকে কখনও পূর্ব্বদিকে যাইতে দেখিতাম না।

(ঘ) যদি স্বীকার করি পৃথিবী আস্তে আস্তে চলিতেছে, তাহা হইলে আর্য্যভট্টের মতে উহা একদিনে একবার কিরূপে ঘুরিয়া আসে?

শ্রীপতি, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহ প্রভৃতি সকলেই এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিয়া পৃথিবীর আবর্ত্তনবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইউরোপে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে যখন কোর্পনিকাস ভূভ্রমণবাদ পুনঃপ্রচারিত করেন তখনও এইরূপ যুক্তির দ্বারা তাঁহার মতও প্রথমে অগ্রাহ্য হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী টাইকোব্রাহি লল্লের ন্যায় বুঝিতে পারেন নাই কেন উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত গোলাকে পশ্চিমদিকে পড়িতে দেখা যায় না। পাঠক দেখিতে পাইতেছেন এক কথায় এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। আশ্চর্য্য এই, পৃথিবীর সহিত বায়ুমণ্ডলও ঘুরিতেছে—এই একটা বিষয় কাহারও মাথায় প্রবেশ করে নাই; করিলে এই সকল আপত্তি আদৌ উত্থাপিত হইতে পারিত না।

এই ভূভ্রমণবাদ ভিন্ন আর্য্যভট্ট আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষিক বিষয়ে মত

---

(৪) অনুলোমগতি নৌর্স্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥

প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নক্ষত্রগণের দীপ্তির বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে, গোলাকার পৃথিবী, গ্রহ ও নক্ষত্রবর্গ সূর্য্যের দ্বারা আলোকিত হয়; তাহাদের যে অর্দ্ধাংশ সূর্য্যের দিকে থাকে সেই অংশ দীপ্তি পায়, বাকি অর্দ্ধাংশ নিজের ছায়ায় অন্ধকারাবৃত। বৈদিক ঋষিগণও জানিতেন যে সূর্য্যতেজে চন্দ্র দীপ্তিশালী।

গ্রহগণের কক্ষ (orbit) সম্বন্ধে আর্য্যভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে শনি (saturn), বৃহস্পতি (jupiter), মঙ্গল (mars) সূর্য্য, শুক্র (venus), বুধ (mercury) ও চন্দ্রের কক্ষা পর পর অবস্থিত ও সকলের অধোভাগে পৃথিবীর কক্ষা। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, আর্য্যভট্ট জানিতেন না যে, সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহগণ ঘুরিতেছে।

আর্য্যভট্ট গ্রহণের (eclipse) প্রকৃত কারণ জানিতেন বলিয়া মনে হয়। বরাহ আর্য্যভট্টের কিছু পরে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি গ্রহণের প্রকৃত আধুনিক কারণ সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং গ্রহণ সম্বন্ধে পৌরাণিক কল্পনাকে খণ্ডন করিয়াছেন।

আর্য্যভট্ট কেবল জ্যোতিষীই ছিলেন না, তিনি একজন প্রগাঢ় অঙ্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতও ছিলেন। তিনি পাটীগণিত, বীজগণিত (Algebra) ও ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন।

সংখ্যানির্দ্দেশ (Notation)

আর্য্যভট্টের সময়ে ভারতে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণ আবিষ্কৃত হয় নাই। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে এই সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা প্রচলিত হয়। সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব্বেও কয়েকটি সংখ্যাবাচক বর্ণ ভারতে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন আরবীয় ব্যবসায়ীরা অষ্টম শতাব্দীতে এই ভারতীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আর্য্যভট্টের সময় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা আবিষ্কৃত হয় নাই, তিনি ক, খ, গ প্রভৃতি বর্ণমালা সংখ্যানির্দ্দেশকল্পে ব্যবহার করিতেন। এই বর্ণমালা ব্যবহার করিয়াও তিনি সহজে বড় বড় সংখ্যা প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আরবীয় অঙ্কশাস্ত্রবিৎগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ বেন মুসা (৯০০ খৃঃ অঃ) সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা ব্যবহার করেন এবং ক্রমশঃ অপর অপর আরবীয় বৈজ্ঞানিকেরাও তাহা গ্রহণ করেন। প্রাচীন ইউরোপে I II III প্রভৃতি রোমীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা প্রথমে ব্যবহৃত হইত কিন্তু ১০০০ খৃষ্টাব্দে রিমস্ প্রদেশের আর্কবিশপ সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ধর্ম্মযাজক পারবার্ট এবং তাঁহার পরে রোমের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টার আরবীয়গণের নিকট হইতে হিন্দুদের সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা গ্রহণ করিয়া ইউরোপে প্রচলিত করেন। ১২০২ খৃষ্টাব্দে পিসার সুপ্রসিদ্ধ লিওনার্ডো তাঁহার গ্রন্থে প্রথম এই সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা ব্যবহার করেন। এখনও এই বর্ণমালাই জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত; পূর্ব্বেকার রোমীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা

ক্বচিৎ বিশেষ কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোমীয় বর্ণমালায় হিসাব রাখা বা অঙ্ক কসা অপেক্ষা ভারতীয় বর্ণমালায় অঙ্ককসা সহজ বলিয়া উহা সর্ব্বত্রই গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে ভারতীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা হইতে কিরূপে সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাচীন আরবীয় ও মধ্যযুগের ইউরোপীয় সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালা গঠিত হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইল।(৫)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

বীজগণিত (Algebra)

আর্য্যভট্ট প্রাচীন ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক বীজগণিতপ্রণেতা। তিনি অনেকগুলি বীজগণিত সম্বন্ধীয় নূতন আবিষ্কার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ইউরোপে ডাইওফেন্টস বীজগণিতের প্রাচীন রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার আবির্ভাব-কাল ঠিক জানা নাই—সম্ভবতঃ চতুর্থ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি এলেকজেন্দ্রিয়াবাসী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ গ্রীক ছিলেন না। তাঁহার গ্রন্থ অনেকদিন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল এবং প্রায় ৯৮০ খৃষ্টাব্দে ডাইওফেন্টাসের বীজগণিত আরবী-ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। ডাইওফেন্টাসের গ্রন্থ আর্য্যভট্টের সময় বা তাঁহার অনেক পর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিল এবং আর্য্যভট্টকে আমরা বীজগণিতের একজন মৌলিক আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। কোলব্রুকপ্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আরবীয় ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বোগদাদের আল মামুন, হারুণ আল রসিদ, আল মামুদ, এবং আল মতাদেদ এই চারিজন বাদসাহের আমলে প্রায় ১৫০ বৎসর ধরিয়া (৭৫৪ হইতে ৯০৪ খৃষ্টাব্দ) প্রাচীন নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। এই সময়ে আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি ভারতীয় জ্যোতিষীগণের গ্রন্থও আরবী-ভাষায় অনূদিত এবং পঠিত হয়। ৭৭১ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ আল মানসুরের সময় ভারতীয় জ্যোতিষীগণ বাদসাহের দরবারে আহূত হইয়াছিলেন। এইরূপে আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি ভারতীয় জ্যোতিষীগণের বীজগণিত সম্বন্ধে জ্ঞানও আরবীয়গণের নিকট পঁহুছে। সেই জন্য আরবীয় বীজগণিত ভারতীয় বীজগণিতের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। ৯০০ খৃষ্টাব্দে বেন মুসা আরবীয়গণের মধ্যে প্রথম বীজগণিত রচনা করেন। এই আরবীয় বীজগণিতবেত্তাগণের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া পিসার লিওনার্ডো ১২০২ খৃষ্টাব্দে

(৫) এই তালিকাটি Ball's History of Mathematics গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

বীজগণিতের বীজ ইউরোপে প্রেরিত করেন; সেই বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ ক্রমশঃ ফলে ফুলে পরিণত হয়। যেমন সংখ্যানির্দ্দেশক বর্ণমালার জন্য পৃথিবী ভারতের নিকট ঋণী, সেইরূপ বীজগণিত সম্বন্ধেও ইউরোপ প্রাচীন আরবীয় বীজ-গণিতবেত্তাগণের মধ্য দিয়া ভারতের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি ভারতীয় বীজগণিতবেত্তাগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন। তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে কুট্টকবিধির (Algebraic analysis) আবিষ্কর্ত্তা। তিনি বর্গাত্মক সমীকরণ quadratic equation) জানিতেন এবং—

$$১+২+৩+৪+\ldots\ldots$$

$$১^২+২^২+৩^২+৪^২+\ldots\ldots$$

$$১^৩+২^৩+৩^৩+৪^৩+\ldots\ldots$$

এই তিন শ্রেণীর যোগফল কসিয়াছেন। তাহা ভিন্ন তিনি বীজগণিতের আরও অনেকগুলি সমীকরণের অঙ্কফল দিয়াছেন।

ত্রিকোণমিতি (Trigonometry)

ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধেও আর্য্যভট্ট প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষীগণের অগ্রণী এবং প্রাচীন ইউরোপীয় ও আরবীয়গণের মধ্যে একজন প্রাচীন গ্রন্থকার। ত্রিকোণমিতিতে তিনি অনেকগুলি কোণের (angle) জ্যায় (sine) একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দ্বিগুণিত কোণের অর্দ্ধ পূর্ণজ্যাকে (semichord of double the angle) জ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমে বৃত্তপাদের (first quadrant of a circle) ৩ৼ ডিগ্রি বা তাহার গুণিত কোণের জ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি এই তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনি ৯০ ডিগ্রির জ্যা ৩৪৩৮ বলিয়া স্থির করেন। এই গণনায় তিনি $\frac{\text{পরিধি}}{\text{ব্যাস}}$এর সংখ্যা নিশ্চয়ই ৩.১৪১৬ ধরিয়াছিলেন, নহিলে এই অঙ্ক ঠিক হয় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এই সংখ্যা ৩.১৪১৫৯ বলিয়া নির্ণয় করেন। তিনি পরিশ্রম-লাঘবমানসে ভূপরিধি গণনাকালে এই সংখ্যাকে √১০ বা ৩.১৬২৩ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, কিন্তু ঠিক সংখ্যা যে ৩.১৪১৬ তাহাও যে তিনি জানিতেন তাহা উপরোক্ত অঙ্ক হইতে জানা যায়। ইহা ভিন্ন ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে আরও অনেকগুলি অঙ্ক তিনি কসিয়াছিলেন। জ্যামিতি (Geometry) সম্বন্ধে তাঁহার অনেকগুলি প্রমাণে ভুল আছে। বস্তুতঃ জ্যামিতির জ্ঞান প্রাচীন গ্রীসদেশে যেমন উন্নত ছিল, ভারতে সেরূপ ছিল না।

ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষী ও অঙ্কশাস্ত্রবিদেরা আর্য্যভট্টের পরবর্ত্তী। তাঁহাদের কর্ম্মময় জীবনের পরিচয় দিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধে তাঁহাদের অগ্রণীর আবিষ্কার কাহিনীর কতক আলোচনা করিবার সুযোগ পাওয়াতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

মুসলমান-প্রভাব-শূন্য হিন্দু মন্দির—এলাহাবাদ
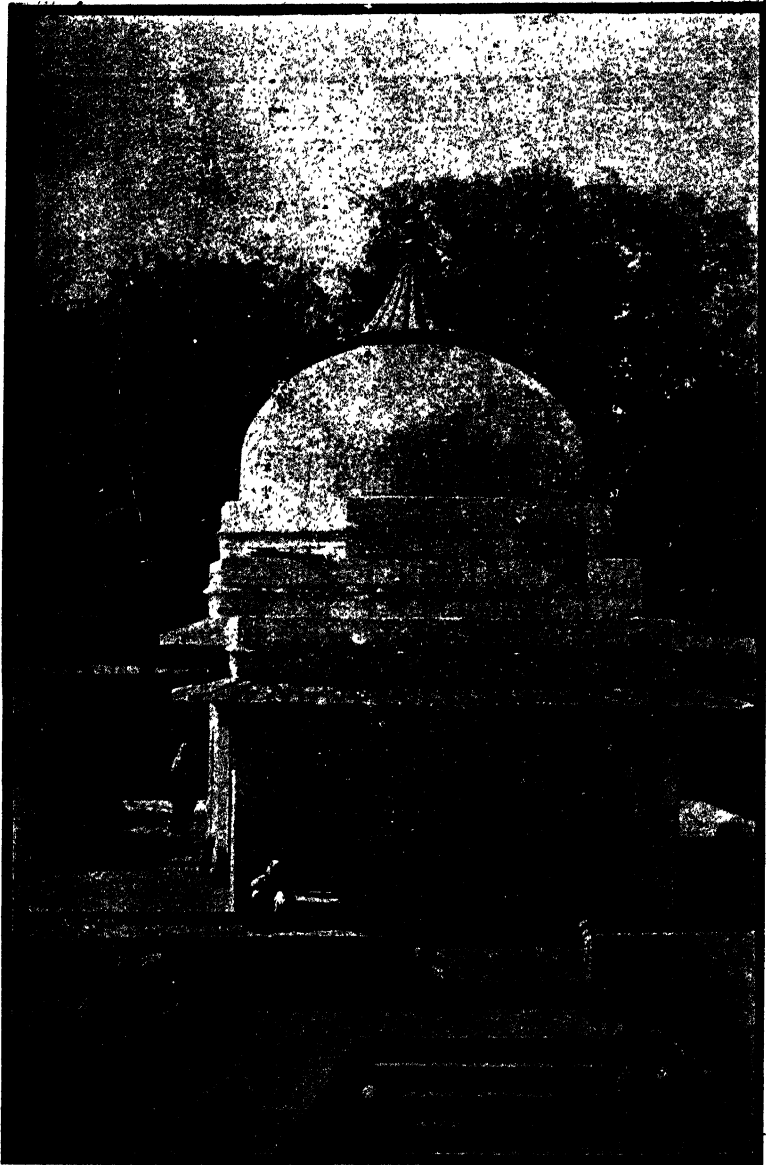
সোমেশ্বর মন্দির—আরাইল

(এলাহাবাদের নিকটস্থ)
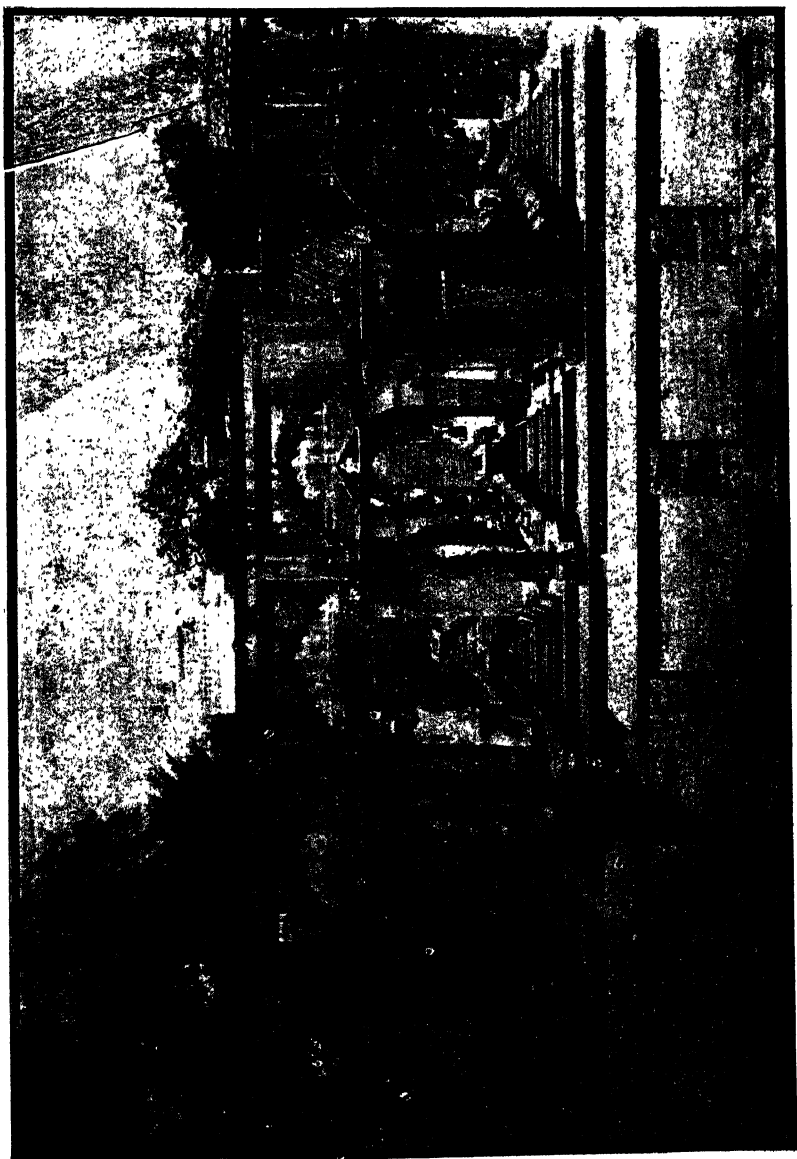
সা আজমলের নিবাসস্থান—এলাহাবাদ

আরাইল মন্দির হইতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের দৃশ্য

(১৭)

বিপিন যখন মহিলাদের পাঠসভা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, নবকিশোরও তখন নিশ্চিন্ত ছিল না। সে মথুরাপুরে পিতার টোলটিকে কেন্দ্র করিয়া মণ্ডলে মণ্ডলে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিতেছিল।

তাহার পিতার টোলের পুরাতন ছাত্র ছাড়াও তাহার বিদ্যার খ্যাতি শুনিয়া অনেক নূতন ছাত্র ভর্ত্তি হইতে লাগিল। তাহাদের কেহ ব্যাকরণ, কেহ স্মৃতি, কেহ বা বেদান্ত, এমনি এক-একটি মাত্র বিষয় পড়িবার সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছে। নবকিশোর তাহাদিগকে বলিল—দেখ, আমার টোলে কেবলমাত্র একটি বিষয় কেউ শিখবে না। মানুষের জ্ঞান বহুমুখ না হলে তার চিন্তাশক্তি সজীব হয় না, সমস্ত জগৎব্যাপারের সঙ্গে তার যোগ হয় না। আমার টোলে প্রথমে নিজের মাতৃভাষা বাংলা খুব ভালো করে শিখে তার প্রধান প্রধান বইগুলি পড়ে ফেলতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে বাংলাতেই অল্প গণিত, ভূগোল, জগতের এবং বিশেষ করে' ভারতের মোটামুটি ইতিহাস, স্থূল স্থূল বিজ্ঞানতত্ত্ব, এবং ইংরেজি ভাষাটাও শিখতে হবে। তার সঙ্গে প্রধান ভাবে শিখতে হবে সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণ। এই-সকল বিষয় মোটামুটি শেখা হলে ছাত্রের ইচ্ছামত সে ইংরেজিতে বা সংস্কৃতে বিশেষ বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করতে পারবে। যে সংস্কৃত জ্যোতিষ পড়তে চাইবে, তাকে সেই সঙ্গে ইংরেজি এষ্ট্রনমিও পড়তে হবে; ভারতীয় ষড়দর্শনের সঙ্গে য়ুরোপীয় দর্শনও আয়ত্ত করতে হবে; সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় একাধিক ভাষারও সাহিত্যের পরিচয় লাভ করতে হবে। এ যে না করবে সে আমার টোল থেকে উপাধি পাবে না।

অভিরাম নামক একজন ছাত্র বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া টিকি নাড়িয়া বলিল—আজ্ঞে, তা হলে এ যে একেবারে স্কুল হবে। ম্লেচ্ছ রকমেই যদি শিখব তবে টোলে এলেম কেন?

নবকিশোর গম্ভীর ভাবে বলিল—আমার টোল এই রকম ম্লেচ্ছ ধরণেরই হবে। যে-সব ছাত্র শিক্ষার জ্ঞানের জাতিবিচার করে তাদের জন্যে আমার এ টোল নয়। তারা স্বচ্ছন্দে বিদায় নিয়ে নিবারণ মুখুয্যের টোলে যেতে পারে।

ইহা শুনিয়া সকল ছাত্রই নীরব হইয়া রহিল। নবকিশোর বলিতে লাগিল—শিক্ষা শেষ করে প্রত্যেক ছাত্রকে আমায় গুরু-দক্ষিণা দিতে হবে, এবং সেজন্যে ভর্ত্তি হবার সময়েই একটা অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করে দিতে হবে।

অভিরাম ভয়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নবকিশোরের দিকে চাহিয়া বলিল—আজ্ঞে, এ ত বড় কঠিন কথা! আপনার দাবি যদি

আমাদের সাধ্যাতীত হয় তবে ত প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গজনিত পাপে নিরয়গামী হবই, অধিকন্তু চাইকি আপনি চুক্তিভঙ্গের নালিশ করে জেল খাটিয়েও ছাড়তে পারেন।

নবকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—ভয় নেই অভিরাম, আমি বেদ ঋষির মতন শুভশুক্লা রাণীর কানের কুণ্ডল চাইব না, আর তার জন্যে উতঙ্কের মতন তোমাদের নাগ-লোকে ছুটোছুটি করতেও হবে না; কিংবা বরতন্তুশিষ্য কৌৎস্যের মতো রঘুরাজারও শরণাপন্ন হতে হবে না। আমার প্রার্থনা যৎসামান্য। যাঁরা আমার টোল থেকে উপাধি নিয়ে বেরুবেন তাঁরা অন্তত তিন বৎসর আমার গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা দিয়ে যাবেন; সেই কয় বৎসরও তাঁরা ছাত্রাবস্থার মতন কেবলমাত্র খোরপোষ পাবেন। আর এক কথা বলে রাখি, আমার টোলে আমি বিবাহিত ছাত্র নেবো না; টোলে থাকতে থাকতে কেউ বিবাহ করতে পাবে না; কারণ শিক্ষা সমাপ্ত করে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করাই আমাদের দেশের সনাতন নিয়ম।

এমন সময় নবাব্দি মণ্ডল ও তাহার পুত্র আসমৎ আলি নবকিশোরের টোলের রকের নীচে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। নবাব্দি হরিবিহারী বাবুর একজন সম্ভ্রান্ত প্রজা।

নবকিশোর তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল—নবাব্দি কাকা যে, এস এস। সঙ্গে আসমৎ বুঝি? ওকে ছোটবেলায় দেখেছি, এখন বড় হয়ে, চেনবার জো নেই। এস এস তোমরা ওপরে উঠে এস।

অভিরাম আপত্তির স্বরে বলিয়া উঠিল—এঁ! ওপরে আসবে কি?

নবকিশোর তাহার দিকে ফিরিয়া ভ্রুকুটি করিয়া বলিল—কেন? আপত্তি কি?

অভিরাম টিকি আস্ফালন করিয়া বলিল—যবন নেড়ে টোলে উঠলে টোল অপবিত্র হবে না!

নবকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—তা বটে। নবাব্দি কাকারও আপত্তি হতে পারে তোমাদের মতন কাফেরের সঙ্গে এক জায়গায় বসতে। তোমাদেরই শাস্ত্রে না বলে যে "রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিল-নানা-পথজুষাং নৃণাম্ একো গম্যস্ত্বমসি পয়সাম্ অর্ণব ইব!" তোমাদেরই শাস্ত্রের না উপদেশ "সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ! সর্ব্বত্রাভ্যাগতঃ গুরুঃ!" তোমরা শাস্ত্রের নির্দ্দেশ সুবিধামত কতক মানো কতক মানো না—অর্থাৎ কিনা নিজেরই প্রবৃত্তির বশেই চল, শাস্ত্র শুধু একটা আবরণ মাত্র। যদি তোমাদের শাস্ত্রের এ কথায় আস্থা না থাকে, তোমরা উঠে চলে যেতে পার।......এস নবাব্দি কাকা, নীচে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

নবাব্দি কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—থাক্ বাবা, আমি এখানেই বেশ আছি......

নবকিশোর নীচে নামিয়া গিয়া দুই হাতে দুইজনের দুই হাত ধরিয়া উপরে তুলিয়া লইয়া আসিল এবং এক রকম গায়ের জোরেই তাহাদিগকে ফরাশের উপর বসাইল।

অভিরাম প্রভৃতি বিরক্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া বসিল, কিন্তু কেহ উঠিয়া গেল না।

নবকিশোর তাহাদিগকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিল—তারপর নবাব্দি কাকা, তোমাদের সব ভালো ত? কি মনে করে আসা হয়েছে?

—আল্লার দোয়াতে সব খয়ের বাবা। আসছে এৎবারে আসমতের আর আমার নিকাহা বেটা রহমতের সাদি হবে। তাই হুজুরে এত্তেলা করতে এসেছিলাম।

নবকিশোর জিজ্ঞাসা করিল—কাকা বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—মুলাকাৎ হয়েছে, হুজুরের হুকুমনামা পেয়েছি। ছোটবাবু কলকাত্তা থেকে এসেছেন দেখলাম, তিনি আমার গরিব-খানায় পায়ের ধূলো দেবেন কবুল করেছেন; তুমিও যদি মেহেরবানি করে একবার পায়ের ধূলো দাও ত বড় খুসি হব বাবা। রাত্রে নাচগান হবে, মুর্শিদাবাদ থেকে ভালো বাইজি আসবে।

নবকিশোর বলিল—মাপ কোরো নবাব্দি কাকা। আমি ঠিক যেতাম, কিন্তু বাই-খেমটার নাচগান যেখানে হবে সেখানে ত আমি যাব না, বিপিনকেও যেতে দেবো না।

নবাব্দি বিস্মিত হইয়া বলিল—কেন, তাতে কি কিছু দোষ আছে?

নবকিশোর বলিয়া উঠিল—দোষ আবার নেই! ঢের দোষ! ওরা দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোক, তাদের সঙ্গে কোনো ভদ্রলোকের সম্পর্ক রাখা উচিত নয়।

আসমত বিনীত দৃষ্টিতে নবকিশোরের দিকে চাহিয়া বলিল—আমি একটা কথা বলব?

নবকিশোর বলিল—বল।

আসমত মাথা নীচু করিয়া ধীর স্বরে বলিল—আপনার বাড়ীতে একটা আলমারী টেবিল করবার দরকার হলে আপনি এমন মিস্ত্রী ডাকেন যে বেশ কাজ করতে পারে, তার চরিত্র কেমন সে খোঁজ করা দরকার মনে করেন না। সে রকম খোঁজ করে কাজ নিতে গেলে চলে না—যে তাঁতি আমাদের কাপড় বুনেছে, যে মুচি আমাদের জুতো বানিয়েছে, তাদের চরিত্র কেমন তাই কি আমরা দেখি, না তারা কেমন জিনিস বানিয়েছে তাই দেখি। যে বাইজি, সে কেমন নাচতে পারে গাইতে পারে তাই দেখা উচিত—সতী সাধ্বী যদি গাইতে নাচতে না জানে তবে এই হিসেবে তার ত কোনো মূল্য নেই। রবিবাবুর একটা প্রবন্ধে পড়েছিলাম, তিনি ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করেছেন, মাতাল ইঞ্জিনিয়ারে হাবড়ার পুল বানিয়েছিল বলে কি আমরা হাবড়ার পুল দিয়ে হাঁটব না?

নবকিশোরের মুখ সন্তোষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সপ্রশংস দৃষ্টিতে আসমতের মুখের দিকে ক্ষণেক তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—তুমি ঠিক বলেছ, এ কথাটা আমি এমন করে ভেবে দেখিনি। কিন্তু আর একটা দিক দিয়ে তুমি বিচার করে দেখ। ঐ সব লোক ত সৃষ্টিছাড়া নয়, ওরা তোমার আমার পরিবারেরই মুখ হেঁট করে তবে না এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছে। তাদের নাচ গানের পিছনে কত পরিবারের লজ্জা আর চোখের জলের ইতিহাস জমে রয়েছে। সেই তাদের নিয়ে আমোদ করা আমি নিষ্ঠুর বর্ব্বরতা মনে করি।

আসমত আবার একবার মাথা তুলিয়া নবকিশোরের দিকে চাহিয়া বিনীত ভাবে বলিল—নাচ গান মেয়েদেরই কাজ; আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার দোষে গৃহস্থ মেয়েরা ঐ আনন্দ দিতে পারে না; যারা সমাজেরই আনন্দের জন্যে ঐ ব্যবসা ধরে তাদের সমাজ নিন্দা করে, নিজেও লজ্জা আর দুঃখ পায়।

নবকিশোর আনন্দে উৎসাহিত হইয়া বলিল—ঠিক বলেছ তুমি। সেই সমাজের ভুল ব্যবস্থা বদল করবার জন্যেও আমাদের ঐ রকম আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। ধরে নাও এটা আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিবাদ; তা হলেও ত এ ব্যাপারে যোগ দেওয়া উচিত নয়।

আসমত চুপ করিয়া রহিল। নবাব্দি বলিল—আচ্ছা বাবা, তোমরা সন্ধ্যার সময় গিয়ে চলে এস। একবার গেলেও আমার দিলটা খুসি হবে।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তাই যাব।

নবাব্দি পুত্রকে বলিল—দে দে, বাপজীকে একখান খত দে।

আসমত একখানি গোলাপী রঙের কাগজে সোনালি ছাপা নিমন্ত্রণপত্র দিল। নবকিশোর পড়িতে লাগিল—

শ্রীশ্রীহকনামজী ভরসা

করিম রহিম আল্লা খালেক গফ্‌ফার
দোন্‌ জাহানের বিচে মালেক সবার।
পহেলা তাঁহান নাম করিয়া ছজুদ,
দুএমেতে নবি-পরে ভেজিব দরুদ।
মহম্মদ মুস্তাফা যিনি হবিব আল্লার,
তাঁহার উপরে ভেজি দরুদ হাজার।
ছিএমেতে চার ইয়ারে কুর্নিস হাজার,
চাহারমে আমি বান্দা বড় গুনাহ্‌গার।
পরেতে আরজ এই সবার জোনাবে—
দুইটি কেবলার মেরা শুভ সাদি হবে।
২৫শে অগ্রাণ, সন হাল, এৎওারে
নওসা দোন আসিবেন সাদি করি ফিরে।
সেই অছিলায় থোড়া তাআম গরিবানা
তৈয়ার করিব আমি ভাবিয়া রব্বানা।
এ খাতেরে আরজ ও উম্মেদ আমার
তারিখ মজকুর, ওয়খৎ শাম, এৎওার
মায় খেশ বেরাদর হামশবায় লইয়া
গরিবখানায় সবে পৌঁছিবেন আসিয়া।
মেহের নজরে তাআম তানাওল করে
সরফরাজ করাইবেন এই অধীনেরে।
কদমের ধূল যেন পাই সবাকার,
খিদমতে হইব রুজু খাহেশ আমার।
মজলিশ রওশন মেরা করিবেন আসিয়া
হসরৎ মিটিয়া যাবে দিদার দেখিয়া।
হীন শ্রীশেখ নবাব্দি মণ্ডল অধীনের নাম,
মৌজা শীতলপুরে জানিবেন মেরা বাসধাম।
পত্রের দ্বারায় সকলেরে করিলাম এতাদা,
আসিতে গরীব বলে না হবে রঞ্জিদা।
এই তক্‌ হইল ইতি সকলে জানিবে।
আমি অধীনের কেহ খতা না ধরিবে।
আপনকার জানিবেন এই শুভ কাম,
দাওতের পত্র ইতি, বান্দারও সেলাম।

পত্র পড়িয়া নবকিশোর খুব হাসিতে হাসিতে বলিল—নবাব্দি কাকা, এ করেছ কি? এ না হয়েছে বাংলা, আর না হয়েছে উর্দ্দু! বাঙালীতে বাঙালীদেরই নেমন্তন্ন করছ, তখন এমন ভাষার বিশ্রী খিচুড়ি বানিয়েছ কেন?

নবাব্দি অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—আমাদের এই রকম রেওয়াজ বাবা। ফার্সী লব্‌জ না থাকলে ভারি নিন্দে হয়।

নবকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—অদ্ভুত রীতি ত! বুঝতে পারি আর না পারি ফার্সী চাই! এ রকম রোগ শুধু তোমাদের নয়, আমাদেরও আছে—আমরাও সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে নেমন্তন্ন করি।.........আচ্ছা আমরা সন্ধ্যে বেলা যাব।

নবান্দি উঠিতে উঠিতে বলিল—বাবা, শুনলাম, তুমি সব কি পাঠশালা করছ। যদি আসমৎকে একটা কাজ দাও.........

নবকিশোর বলিল—তা বেশ ত। তোমাদের শীতলপুরে, নবিনগরে পাঠশালা হবে; সেখানে বাড়ীতে থেকেই আসমৎ কাজ করতে পারবে। আসমত, তুমি কতদূর পড়েছিলে......ফাষ্ট আর্টস পর্য্যন্ত পড়েছিলে না?

—আজ্ঞে! এগজামিনের আগে অসুখ হল বলে এগজামিন দেওয়া হয়নি।

—তুমি সংস্কৃত না ফার্সী পড়েছিলে!

—সংস্কৃত। বাড়ীতে ফার্সীও অল্প পড়েছি।

—তা বেশ। তুমি যদি কাজ নিতে রাজি থাক, তা হলে মাস তিনেক আমার কাছে এসে কি করে পাঠশালা চালাতে হবে সেটা শিখে নিতে হবে।

নবান্দি বলিল–সাদি হয়ে গেলেই ওকে পাঠিয়ে দেবো বাবা। তুমি কোথাও ওর থাকবার একটা বন্দোবস্ত করে দিয়ো। ও নিজেই রেঁধে খেতে পারে।

নবকিশোর বলিল—কেন, আমাদের এই বাড়ীতেই থাকবে। আমাদের রান্না কি তোমরা খাও না?

—ভাত খাওয়াটা রেওয়াজ নেই......

নবকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া নিজের ছাত্রদের দিকে ফিরিয়া বলিল—শুনছ হে অভিরাম, তোমরা যেমন ম্লেচ্ছ বলে ঘৃণা করে ওঁদের ছোঁয়া খাও না, ওঁরাও তেমনি ঘৃণা করে কাফেরের ছোঁয়া খান না। তোমরাই যে নাক সিঁটকে উঁচুতে বসে সকলকে দূর করে রেখেছ তা মনে কোরো না; তোমাদেরও ঘৃণা করে' দূরে ঠেলে রেখেছে দেশের বিদেশের সকলেই।......আচ্ছা, আসমত একবেলা ভাত রেঁধে খাবে; একবেলা আমরা রুটি লুচি করে খাওয়াব। তাহলে হবে ত। কিন্তু এখানে মাংস টাংস খাওয়ার সুবিধা হবে না।

আসমত বলিল—আমি কখনো মাংস খাইনে।

নবকিশোর বলিল--তবে ত কোনো ল্যাঠাই নেই। আমি সব ঠিক করে দেবো।

নবান্দি বলিল—বহুত মেহেরবানি বাবা, তোমার বহুত মেহেরবানি। এখন তবে আসি বাবা।

—না, একটু বস কাকা, একটু জল খেয়ে যাও!—বলিয়া নবকিশোর বাড়ীর মধ্যে গিয়া মাকে বলিল—মা, নবান্দি মণ্ডল আর তার ছেলে আসমত এসেছে, কিছু জলখাবার দাও ত।

নবকিশোরের মা দুখানি পাতার টুক-রায় জলখাবার সাজাইতে লাগিলেন।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—মা, গোবরা মুখুয্যে এলে কিসে করে' জলখাবার দিতে?

গোবর্দ্ধন মুখুয্যে নিবারণের পুত্র; প্রসিদ্ধ দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্ম্মী।

নবকিশোরের মা পুত্রের কথার ইঙ্গিত বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন—হাজার হোক তবু সে বামুনের ছেলে, আর এরা মোছলমান।

—মা, নিবারণ যদি বামুন হয় ত এরাই বা বামুন নয় কেন?

—এরা সব যা-তা খায়......

—লোকে ত বলে শুনেছ, নিবারণ গোরাদের এঁটো খানা খেত। আর এরা মাংস খায় না। কে ভালো বামুন বল ত মা! একজন ভদ্রলোক তোমার বাড়ীতে এসেছেন, অতিথি, তুমি জাত বিচার করে তাঁকে যদি পাতা পেড়ে খেতে দাও ত তাঁকে অপমান করা হয় না?

নবকিশোরের পিতা সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—না বাবা, আমাদের দেশে রাজাকে পর্য্যন্ত পাতা পেড়ে খাবার স্থায়; কম্বলের আসন পেতে রাজা ফকির দুজনকেই বসতে স্থায়।

নবকিশোর বলিল—তা ঠিক, কিন্তু সে দশের সঙ্গে হলে। একলা এঁদের যদি এ রকম করে দি, এঁরা কি মনে করবেন না আমরা এঁদের একটু হীন মনে করছি?

নবকিশোরের মা হাসিয়া বলিলেন—নে থাম, তোর তর্ক রাখ। তোরা এখন আমাদের সেকেলে মতে ত চলবিনে। রেকাবি করেই খাবার দিচ্ছি। ওগুলো আলাদা থাকবে, তোর অতিথি সেবার জন্যে

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—আচ্ছা এখন তাই হোক। পরে ক্রমে ক্রমে এ বাসনগুলো সব বাসনের সঙ্গে মিলে যাবে দেখতে পাবে।

নবকিশোর খাবার লইয়া অতিথির অভ্যর্থনা করিতে গেল।

নবকিশোর মুসলমানকে আসন পাতিয়া থালা গেলাসে করিয়া জলখাবার খাইতে দিল, দেখিয়া টোলের ছাত্রদের ত চক্ষু স্থির। মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে করিতে আস্তে আস্তে উঠিয়া উঠিয়া একে একে সকলেই প্রস্থান করিল।

নবাদ্দি ও আসমতকে জল খাওয়াইতে খাওয়াইতে নবকিশোর বলিল—আসমত, তোমরা ত বাঙালী।

—আজ্ঞে বাঙালী বৈ কি।

—তবে অমন ইজের চাপকান পরে' মাথায় টুপি দিয়ে অবাঙালী হয়ে থাক কেন? ও পোষাকে সমস্ত মুসলমান-সমাজের সঙ্গে যোগ হতে পারে, কিন্তু নিজের দেশবাসীর সঙ্গে ভেদ ঘটে। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চিহ্ন দিয়ে নেশনকে কেন দ্বিখণ্ডিত কর?

—আপনাদের হিন্দুরাও ত কম পার্থক্যের চিহ্ন ধারণ করেন না—শাক্তরা যে নামাবলী ব্যবহার করেন, বৈষ্ণবে তা করেন না; শাক্তের ফোঁটা, বৈষ্ণবের তিলক; শাক্তের রুদ্রাক্ষের মালা, বৈষ্ণবের তুলসীর মালা। এগুলো যদি নেশন গড়বার পক্ষে বাধা না হয়, আমাদের পোষাকটাই কি যত বৈষম্যের কারণ হবে?

—শুধু তোমাদের পোষাকে ত বৈষম্য নয়, তোমাদের চালচলন, আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, সমস্তুতে তোমরা দেশ থেকে

স্বতন্ত্র। এ রকম হবে কেন? এমন কি তোমাদের নাম পর্য্যন্ত বাংলা নয়।

—তা বটে। কিন্তু আপনারা যেমন ঠাকুর-দেবতার নামে নাম রাখতে ভাল-বাসেন, আমরাও তেমনি ভালবাসি। আপনারা রাখেন হরিচরণ, কালীমোহন, রামলোচন, আর আমরা রাখি গোলাম-মহম্মদ, আবদুল-রসুল, আব্‌দর্‌-রহমান্‌। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র আরবীতে লেখা, আরবী কথা ব্যবহার না করে' আমাদের উপায় কি?

নবকিশোর সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—বেশ বেশ। তুমি আমার মনের মতন শিক্ষক হতে পারবে। তোমার সঙ্গে আমার খুব বোনে যাবে।

আসমত সেলাম করিয়া বলিল--আপনার অনুগ্রহ।

উহারা চলিয়া গেলে নবকিশোর ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল—মুরলী, এই থালা গেলাসগুলো নিয়ে যা।

মুরলী বলিল—এজ্ঞে আমি মোছল-মানের এঁটো ছোঁব না। আমার জাত যাবে।

নবকিশোর হাসিয়া নিজে সেই থালা গেলাস মাজিতে লইয়া গেল।

(১৮)

অভিরাম প্রভৃতি টোলের ছাত্রেরা মর্ম্মাহত হইয়া গিয়া নিবারণ মুখুয্যের শরণাপন্ন হইল। নিবারণ তাহাদের মুখে নবকিশোরের অনাচারের সংবাদ শুনিয়া কড়া তামাকে জোরে দম দিয়া কাশিতে কাশিতে মাথা নাড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কাশি সামলাইয়া করঞ্জার মতন চোখ দুটিতে ক্রূর হাসি জ্বালিয়া, একসঙ্গেই গলা হইতে সরু ও মোটা দুরকম স্বর বাহির করিয়া বলিতে লাগিল—ও আমি জানতামই কিশরে ছোঁড়া এমনি বাড়াবাড়ি একদিন করবেই। তোমরা কি হরিবিহারীকে এ খবর জানিয়েছ?

—আজ্ঞে না। প্রথমে আপনার পরামর্শ না নিয়ে ত আমরা কিছু করতে পারিনে, তাই ছুটে আগে আপনার কাছেই এসেছি।

নিবারণ পরম সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—ঠিক করেছ ভায়ারা, ঠিক করেছ। চুল পাকালাম তবু একটি দিনের তরে শাস্তর লঙ্ঘন করিনি। আমি যেমন নিজে শাস্তর মানি, তেমনি লোককেও মানাতে চাই বলে লোকে রাগ্ করে' আমার নামে কি না রটায়। তা থাকগে মরুকগে। এখন একবার হরি-বিহারীর কাছে চল—আমি যা করব তাই হবে, তবু সে গ্রামের জমিদার তাকে জানিয়ে কাজ করা ভালো।

অভিরাম জিজ্ঞাসা করিল—কি ব্যবস্থা করবেন দাদামশায়?

—কিশরে ছোঁড়ার মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করাব, নয় ওদের জাতে ঠেলব। এর কি আর তৃতীয় পন্থা আছে হে ভাই! শাস্তর যে সব পথ মেরে রেখে দিয়েছে!...

নিবারণ একখানা ময়লা পুরাতন র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া খড়ম ছাড়িয়া একজোড়া চটি জুতা পায়ে দিল; চটি জোড়া শুকাইয়া ফাটিয়া গিয়াছে, তাহার সম্মুখার্দ্ধ বাঁকিয়া ডিগবাজি খাইবার উপক্রমে

ছিল বলিয়া নিবারণের পায়ের আধখানা চটির বাহিরেই ঝুলিয়া রহিল। অগ্রে অগ্রে নিবারণ ও তাহার পশ্চাতে ছাত্রেরা হরি-বিহারীর বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইল।

হরিবিহারী তাকিয়ায় ঠেস দিয়া অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্রে আলবোলার নল মুখে দিয়া ফুড়ুক ফুড়ুক করিয়া তামাক খাইতেছিলেন; বৃদ্ধ দেওয়ান পাশে বসিয়া জমিদারী খাতাপত্র দলিলদস্তাবেজ লইয়া হরিবিহারীকে শুনাইতেছিলেন, দস্তখত করাইতেছিলেন। নিবারণের চটির শব্দ পাইয়া চোখ একটু বিস্ফারিত করিয়া হরিবিহারী বলিলেন—এই যে খুড়ো, এস। এত চেলা চামুণ্ড নিয়ে কি মনে করে?

নিবারণ পরম হতাশভাবে ফরাশে বসিয়া পড়িয়া কাতর স্বরে বলিল—আরে বাপু, তোমরা ত দেখবে শুনবে না, কিন্তু তোমরা না রক্ষা করলে জাতধর্ম্ম ত আর থাকে না।

হরিবিহারী উৎসুক হইয়া বলিলেন—কেন, ব্যাপার কি?

—এইসব ভদ্রলোকের ছেলেরা গাঁ-অন্তর থেকে এসেছে, মনে করেছে কিশরে ছোঁড়া বুঝি দিগ্‌গজ পণ্ডিত। এখন এরা তার কাণ্ডকারখানা দেখে কেঁদে এসে পড়েছে, তোমাকে ছাড়া আর কাকে বলতে যাবে?

—কিশোর? সে করেছে কি?

—বল্লে না পেত্যয় যাবে বাবাজী, সে টোলঘরে মোছলমানকে বাসনে করে খাইয়ে এদের দেখিয়ে দেখিয়ে তাদের এঁটো খেয়েছে...

অভিরাম বাধা দিয়া বলিতে গেল—না এঁটো...

নিবারণ চোখ পাকাইয়া বলিল—আরে তুমি থাম না হে ছোকরা। তুমি কি সব গুছিয়ে বলতে পারবে, আমাকেই বলতে দাও...

হরিবিহারী আলবোলার নল ফেলিয়া বসিয়া বলিলেন—কি বলছিলে তুমি?

অভিরাম বলিল—এঁটো খেতে আমরা দেখিনি, তবে তিনি মোছলমানদের টোলের বিছানায় বসিয়ে তাদের বাসনে করে খেতে দিলেন দেখে আমরা চলে এসেছি...

নিবারণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—আরে নাও, তাই না হয় হল, ওকেই বলে এঁটো খাওয়া—ঐ থালা গেলাস ত আর ফেলে দেবে না, নিজেরা আবার ঐ বাসনে খাবে ত? চাই কি ঠাকুর দেবতা, গো ব্রাহ্মণ সবাইকে খাওয়াবে। রামঃ! রামঃ!

হরিবিহারী বলিলেন—কিশোরের এসব ত ভারি অন্যায়! তা আচ্ছা, আমি কিশোরকে ডেকে ধমকে দেবো 'খন, থালা গেলাসগুলো ফেলে দিলেই হবে।

নিবারণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না বাপু, এ কি একটা কথা হল? এমন অনাচার যে করেছে তাকে উচিতমত শাস্তি দিতে হবে।

—কি করতে বল তুমি?

—ওদের একঘরে করতে হবে। তা যদি না কর, তবে এ গাঁ থেকে আমাদের বাস তুলতে হবে, ম্লেচ্ছসংস্পর্শে শেষে কি নরকে পচে মরব? চোদ্দ পুরুষের বাস্তুভিটে ছেড়ে যাব, তবু ধর্ম্ম ছাড়তে পারব না!

নিবারণকে চরম নিষ্পত্তি করিতে শুনিয়া ঝঞ্ঝাটভীরু হরিবিহারী হতাশভাবে তাকিয়ায় ঢলিয়া পড়িয়া বলিলেন—তবে যা ভালো বোঝো কর।

হরিবিহারীকে সহজে হাল ছাড়িয়া দিতে দেখিয়া নিবারণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু দেওয়ান বলিলেন—একবার স্মৃতিরত্ন-মশায়কে ডেকে এ কথা বলা উচিত। যদি কিশোর প্রায়শ্চিত্ত করে তা হলে ত আর কোনো গোল থাকবে না।

নিবারণ ভীত হইয়া সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল—হাঁঃ! রেখে দিন আপনার প্রায়শ্চিত্ত। যে জেনে বুঝে ইচ্ছে করে' পাপ করে, তার আবার প্রায়শ্চিত্ত কি?

অভিরাম বলিল—আর তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতেও স্বীকার করবেন না। তিনি বলেন, প্রায়শ্চিত্ত মনের মধ্যে হয়, বাইরের অনুষ্ঠানে নয়। এসব অনাচার তিনি অন্যায় বলেই স্বীকার করেন না! এসম্বন্ধে আমরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করে এলে দিয়েছি...

দেওয়ান বলিলেন—কিশোর প্রায়শ্চিত্ত না করে যদি, স্মৃতিরত্ন মশায় পুত্রকে ত্যাগ করবেন। দোষ করেছে কিশোর, স্মৃতিরত্ন মশায়কে তবে একঘরে করা যাবে কি অপরাধে?

হরিবিহারী আশ্বস্ত হইয়া আবার উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—ঠিক বলেছেন দেওয়ানজী। তোমরা একজন কেউ গিয়ে স্মৃতিরত্ন মশায়কে ডেকে আনগে।

নিবারণের মন একেবারে দমিয়া গেল! স্মৃতিরত্ন ও নবকিশোরের উপর তাহার বিলক্ষণ ক্রোধ ছিল। ইহাঁরা নিবারণ-পুত্র গোবর্দ্ধনকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন না, ব্রাহ্মণ-ভোজনে তাহাকে নিমন্ত্রণ করেন না এবং নিজেরাও গোবর্দ্ধন যে-বাড়ীতে আছে সে-বাড়ীতে পদার্পণ পর্য্যন্ত করেন না। প্রকারান্তরে তাঁহারা নিবারণদের জাতে ঠেলিয়া একঘরে করিবার চেষ্টায় আছেন, ইহাই নিবারণের ধারণা। এখন তাহাদিগের শত্রুতার শোধ দিবার সুযোগ উপস্থিত, তাহাদিগকে একঘরে করিতে পারিলে তবে নিবারণের মনের খেদ যায়। কোথা হইতে বুড়া দেওয়ানটা জুটিয়া তাহার এমন পাকা চালের গুটি কাঁচাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া নিবারণ অত্যন্ত বিরক্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া হরিবিহারীকে বলিল—তা বাপু, ভটচায্যিকে ডাকতে হয় ডাক, কিন্তু ওদের সহজে ছেড়ে দিলে চলবে না। অন্য লোক এমন অনাছিষ্টি অনাচার করলে আমি কিছুতেই একঘরে না করে ছাড়তাম না; কিন্তু তোমার পুরুত বলে যা রেয়াত করছি। তোমার পুরুত বলেই না ওদের এত বাড় বেড়েছে, এমন অহঙ্কার হয়েছে যে আমাদের মানুষ বলেই মনে করে না। মোছলমানের সঙ্গে খেতে পারেন অথচ বামুনের বাড়ী খেলে ওঁদের জাত যায়! ওরে আমার নিষ্ঠে রে! ওরা বাপ বেটায় ঘাট মানিয়ে আমার বাড়ীতে খাবে তবে আমি ছাড়ব, এ আমি তোমায় বলে রাখছি বাপু।

হরিবিহারীর মন বিষাক্ত করিবার জন্য নিবারণ অনর্গল গরল উদ্গিরণ করিয়া যাইতেছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘরে প্রবেশ

করিয়া তাহার কথা বন্ধ করিয়া বলিলেন —হরি, আমায় ডেকেছ কেন ভাই?

—আজ্ঞে বসুন, বলছি।

ভট্টাচার্য্য বসিলে হরিবিহারী অপ্রতিভ ভাবে মাথা নত করিয়া বলিলেন—এঁরা বলছেন কিশোর নাকি মোছলমানকে টোলে তুলে—

—হ্যাঁ, এঁরা যা বলছেন তা সত্যি।

—এখন কর্ত্তব্য?

—এর আবার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কি?

—মোছলমানের সঙ্গে খেলে……

—মোছলমানের সঙ্গে খায়নি। আর যদি খেয়েই থাকে তাতেই বা কি?

—ম্লেচ্ছসংস্পর্শে ধর্ম্মহানি হল না?

—ম্লেচ্ছ তারা যারা অপরিষ্কার নোংরা, কুৎসিত-চরিত্র, কুৎসিত কর্ম্মে লিপ্ত—তা তারা যে ধর্ম্মই স্বীকার করুক আর যে আচারই পালন করুক বা যে কুলেই জন্মাক। কোনো বাস্তবিক ভদ্রলোক ম্লেচ্ছ হতে পারে না……

নিবারণ বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল—তা বলে যবন গোরুখোরের ছোঁয়া খেতে হবে?

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—মুসলমানের ছোঁয়া খাননি কে? হরিবিহারী সোডা লেমনেড বরফ খান। মুখুয্যে মশায়ও অস্বীকার করতে পারবেন না বোধহয়।

নিবারণ বলিল—সোডা লেমনেড বোতলের মধ্যে থাকে, সেটা পরোক্ষ ছোঁয়া, বরফ ত জলবিকার। প্রত্যক্ষ ছোঁয়ায় দোষ —গোরুখোরের সদ্য ছোঁয়া!

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা গোরু খেতেন তার প্রমাণ আছে; আজকাল আধ-জানা আধ-লুকানো রকমে হোটেলে খান এমন লোকের সঙ্গে আপনাদের আহার ব্যবহার চলে। আপনারা নিজেরা পাঁঠা ভেড়া হরিণ খান। শিং-ওলা এক রকম চতুষ্পদ যদি খেতে পারি ত অপর রকম খেতে পারব না কেন তার কারণ ত যুক্তিতে খুঁজে পাইনে। এ-সমস্ত শুধু সংস্কার আর রুচির কথা; আমার খেতে প্রবৃত্তি হয় না, অপরের হয়, তার জন্যে অপরকে ঘৃণা করব?

নিবারণ বলিয়া উঠিল—শাস্ত্রের শাসন!

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—শাস্ত্রের সমস্ত বিধি কি আপনারা মেনে চলেন? শাস্ত্রে ত বিধি আছে শজারু, বনবরা, গোসাপ খাবে। খেতে পারেন? আপনারা স্বচ্ছন্দে মাছ খান, মনে কোনো দ্বিধা বোধ করেন না; এজন্যে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণেরা বাঙালীদের মাছ-খাউয়া বলিয়া ঘৃণা করে। আপনারা যেমন একজনের একটা অভ্যাস দেখে ঘৃণা করেন, অপরে আপনাদের একটা অভ্যাস দেখে ঘৃণা করে। এ-সমস্ত পরস্পরের সংস্কারের কথা। সংস্কার প্রায়ই যুক্তি-বহির্ভূত অভ্যাস মাত্র।

নিবারণ মাথা নাড়িয়া বলিল—সে যাই বলুন, আমাদের সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করে কিশোর ভয়ানক অন্যায় করেছে।

—তা করেছে স্বীকার করি। সে জন্যে আপনারা কি ব্যবস্থা করতে চান।

—কিশোরকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

—কিন্তু কিশোরকে প্রায়শ্চিত্ত করাবার আগে যাঁরা ব্যবস্থা দেবেন তাঁরা প্রায়শ্চিত্ত

করে শুচি হলে তবে কিশোর প্রায়শ্চিত্ত করবে।

নিবারণ এ কথা কানে না তুলিয়া বলিল—যদি কিশোর প্রায়শ্চিত্ত না করে তবে আপনাকে ত্যাগ করতে হবে তাকে।

—আমার কাছে ত সে কোনো অপরাধ করেনি। তবে আমি তাকে ত্যাগ করব কেন?

—তবে বাধ্য হয়ে আমরা আপনাদের ত্যাগ করব।

—ইচ্ছে হয় করতে পারেন।—বলিয়া ভট্টাচার্য্য উঠিলেন। দ্বারের কাছে গিয়া বলিলেন—হরি, তাহলে আজকের লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের আরতির জন্যে অন্য কিছু ব্যবস্থা কোরো।

হরিবিহারী বিষণ্ন মুখে বলিলেন—ভটচায্যি দা, এ কথাটা কি ভালো হল। একটু ভেবে দেখ।

—কি করব ভাই। আধাআধি রফা করা ত আমাদের কুষ্ঠিতে লেখেনি।

অভিরাম প্রভৃতি ছাত্রগণ বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। তাহারা নবকিশোরের দোষের মাত্রা জোরালো প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিল—অধ্যাপক মশায় নিজে জাত মানেন না, আমরা মানি বলে তিরস্কার করেন, মূর্খ চিন্তাশক্তিহীন বলে গালাগালি দেন।

ভট্টাচার্য্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—যার যা বিশ্বাস সে চায় তার ছাত্রদেরও সেইরূপ বিশ্বাস হোক। তোমাদের আপত্তি থাকে ওর মত গ্রহণ কোরো না, পার ওর মত খণ্ডন কোরো, ইচ্ছে হয় টোল ছেড়ে চলে যেতেও ত পার......শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও যারা শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, বেদাঙ্গ তাদের কি বলেছেন জান?—স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদ্ অধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্—যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে অথচ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে না সে কাঠের কুঁদো বা ভারবাহী গর্দ্দভের সমান......এত শাস্ত্র পড়েও তোমরা যে এমন মূর্খ আছ তা আমি জানতাম না।...

নিবারণ পরম বিজ্ঞের মতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তা যাই বলুন, আপনার কথা আমাদের মনে নিচ্ছে না। আপনারা শাস্ত্র পড়েছেন, দুটো বচন আওড়ে যা-তা একটা বুঝিয়ে দিলেই যে আমরা বুঝব তা আপনি মনে করবেন না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—না, এতখানি বুদ্ধিমান বলে আমি আপনাদের কখনো মনে করি না। আপনি হলেন সাক্ষাৎ নিবারণ—যা সত্য, যা মঙ্গল, তা আপনি নিবারণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই থাকেন জানি। কেবল নিজের গোবরাটির বেলায় আপনি আর নিবারণ থাকেন না, তখন হন নিপাতন—নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে তখন আর বাধে না।

এই কথা শুনিয়া টোলের ছাত্রেরা আর হাসি রাখিতে পারিল না।

তাহাদিগকে হাসিতে দেখিয়া নিবারণ ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—তা হলে আপনাদের একঘরে করলাম।

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—যারা নিজেরাই একঘরে হয়ে আছে তাদের

আবার নতুন করে' একঘরে করে কার সাধ্য! আপনি আমাদের একঘরে করে' খুব একটা অপমান কি অপদস্থ করলেন মনে করে অহঙ্কার বোধ করবেন না। আজকাল দেখছি একঘরে তাঁরাই যাঁরা ধর্ম্ম বা সমাজের ভালোর জন্যে নূতন কিছু সংস্কার করতে চান; যাঁরা জগতের গড্ডলিকা প্রবাহের মধ্যে অগ্রগামী নেতা; যাঁরা জাতীয় জড়তার মধ্যে জীবনের স্পন্দন। অনেক সময় একঘরে হওয়ার মানে মূর্খতা বা অধর্ম্ম নয়; তার অর্থ সাহস, উৎসাহ, স্বার্থত্যাগ। ইচ্ছে হলে আপনারা স্বচ্ছন্দে আমাদের একঘরে করতে পারেন।

এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় দৃপ্তপদক্ষেপে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। ঘরের সকলে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে হরিবিহারী চিন্তিত ভাবে বলিলেন—তাইত! এখন লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের পুজো করাই কাকে দিয়ে?

নিবারণ উৎসাহিত হইয়া বলিল—ভাবনা কি বাপু! আমি রয়েছি! গোবর্দ্ধন আছে! যে হয় একজন এসে পুজো করে দেবো।

নিবারণ ও ছাত্রগণ যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিল। হরিবিহারী ঠাকুরের যা-হোক-একটা কিনারা করিয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

তন্দ্রা-তীরে

নগরের কোলাহল ক্ষীণ হয়ে আসে ধীরে
থেমে যায় কূল উতরোল,
নিখিল চেতনাখানি তন্দ্রা-সাগরের তীরে,
অচেতন ধরণীর কোল।
সমুখে অপার সিন্ধু নিবিড় তিমির ঢাকা
অনাহত, মরণ-অলস,
ভেসে আসে থেকে থেকে সৈকতে অমিয়মাখা
সমীরণ শীতল পরশ।
হে চির রহস্য সিন্ধু! হে অনাদি রত্নাকর!
কবে সেই খেলিবার ছলে
আমারে ফেলিয়া গেলে চেতনা সৈকত পর
রেখে গেলে আলোকের তলে।
সেই হতে চিরদিন তোমার নিভৃত নীরে
লুকাইতে যাই সুখ দুঃখ,
কখন্ রাখিয়া যাও তুলি' জাগরণ তীরে
বুঝিতে পারি না একটুক্।
আরো কতকাল তব সুশীতল ছায়াতলে
করিব নীরব আনাগোনা,
বুকে কি লবে না টেনে পুনঃ খেলিবার ছলে,
হবে না কি চির জানাশোনা?

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

এসিয়িক ও য়ুরোপীয় সভ্যতা

এইরূপ মনে হইতে পারে, এসিয়িক ও য়ুরোপীয় সমাজের মধ্যে যখন এতটা বৈসাদৃশ্য, তখন উহাদের পার্থক্য আরও বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র এসিয়া, য়ুরোপের প্রভাবে রূপান্তরিত হইল।

কিরূপে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, তাহা অনুসন্ধান করা যাউক।

কুলপরম্পরাগত শ্রেণীবিভাগ, ঐতিহ্যের প্রতি অতিমাত্র ভক্তি, স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনতন্ত্র—এই সকল জরাজীর্ণ উপাদান এসিয়িক সভ্যতার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু কোন সভ্যতার চরম-গতি এবং সেই সভ্যতার অধিকারী লোকদিগের দশা ঠিক্ এক নহে। কোন এক সভ্যতা—একটি সমষ্টিবিশেষ; জীবন্ত ব্যক্তিদিগের সহিত, পুরাকালীন লোকদিগের রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠান, ও সমস্ত কীর্ত্তিকলাপ, জীবজন্তু, দেশ, আব্-হাওয়া—সমস্তই ঐ সভ্যতার অন্তর্ভূত। সভ্যতাপ্রবর্ত্তক কোন জাতির অবনতি সত্ত্বেও, সেই জাতির প্রবর্ত্তিত সভ্যতা টিঁকিয়া আছে ও সতেজে বর্দ্ধিত হইতেছে অনেক সময় দেখা যায়। অন্য জাতি আসিয়া সেই অবনতিগ্রস্ত জাতিদিগের স্থান অধিকার করে। এই প্রকারে, আধুনিক য়ুরোপের নব্য জাতিরা, প্রাচীন কালের জাতিদিগের স্থান অধিকার করিয়াছে। আবার অনেক সময় এমনও দেখা যায়, কোন সভ্যতা কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে, অথচ যে জাতির দ্বারা ঐ সভ্যতা গঠিত হইয়াছিল, সেই জাতির তরুণ-ভাব বিনষ্ট হয় নাই। সেই জাতি জীবন-উদ্যমে পূর্ণ রহিয়াছে। এই সকল জাতি নূতন রীতিনীতি ও মতবিশ্বাস অসঙ্কোচে গ্রহণ করে; তাহার দৃষ্টান্ত:—সীজারের শাসনাধীনে গলেরা, অষ্টাদশ শতাব্দীর রুষেরা, ১৮৬৯ হইতে জাপানীরা; এবং এই জাপানীদের দৃষ্টান্তে অন্যান্য এসিয়িক জাতিও, অনিষ্টজনক প্রাচীন প্রথা সকল পরিত্যাগ করিয়া নবজীবন লাভ করিবে।

উক্ত জরাজীর্ণ উপাদানগুলির সঙ্গে, এসিয়িক সভ্যতার মধ্যে কতকগুলি ফল-প্রসূ উপাদানও আছে। কিন্তু উহাদিগকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কতকগুলি নূতন অবস্থা ও ঘটনার সংযোগ আবশ্যক।

প্রকৃত এসিয়িক-য়ুরোপীয় সভ্যতার আবির্ভাব ব্যতীত, ভারতের, জাপানের ও চীনের কতকগুলি প্রতিষ্ঠান কখনই পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবে না। ইংলণ্ডের অনুকরণ সত্ত্বেও, জাপানের নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী, স্বকীয় প্রাচীন প্রতিষ্ঠানাদিরই কার্য্যকারণঘটিত পরিণতি। আমাদেরও শাসনতন্ত্র, ইংলণ্ডীয় পার্লামেণ্টের অনুকরণ হইলেও আমাদের "Etats Generaux" "এটা জেনেরো"ই রহিয়া গিয়াছে।

সুগভীর প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও, ষোড়শ শতাব্দীতে, এসিয়িক ও য়ুরোপীয় সমাজের ক্রমবিকাশ সমান্তরালরেখা ধরিয়া চলিয়াছিল; ঐ সময় হইতে, অতীব দুর্ব্বলভাবে গঠিত এসিয়িক সভ্যতা, সমাজ-দেহের বিকাশ যে নিয়মে সচরাচর সংসাধিত হইয়া থাকে, সে নিয়মের অনুসরণ করিতে পারে নাই। তাই, য়ুরোপের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়াছিল। ফলতঃ য়ুরোপীয় সভ্যতা, এসিয়িক সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক নহে, কেবল ঐ সভ্যতার অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা এইমাত্র। য়ুরোপের যতটা উন্নতি হইয়াছে, সেই পরিমাণ উন্নতি সাধন করিবার জন্য এসিয়িক সভ্যতার ক্রমবিকাশে যে সকল বাধা আছে, কেবল সেই সকল বাধা অপসারিত করাই আবশ্যক। এই সকল বাধা ঘটিবার একটিমাত্র কারণ—এসিয়িক জাতিদিগের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। পাশ্চাত্য জাতিদিগের অপেক্ষা এই সকল জাতি যে বিলম্বে অগ্রসর হইতেছে, পরস্পরের সাহায্যের অভাবই তাহার হেতু। এতদিন ধরিয়া যে সাহায্য পায় নাই, সেই সাহায্য উনবিংশতি শতাব্দীতে তাহারা প্রচুররূপে প্রাপ্ত হইল। যে য়ুরোপ, সভ্যতার প্রাথমিক মূলসূত্রগুলির জন্য এসিয়ার নিকট ঋণী, সেই য়ুরোপ আবার একটি পরিপুষ্ট সভ্যতা এসিয়ার হস্তে আনিয়া দিল। এই আদান প্রদান হইতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ যেমন এক, মানব-সভ্যতা বস্তুটিও সেইরূপ এক।

ইতিপূর্ব্বে দীর্ঘকাল হইতে এসিয়া য়ুরোপের প্রভাবাধীন ছিল। এসিয়ার প্রভু ছিল মুসলমান, কিন্তু ভ্রমণকারী ও ঔপনিবেশিক ছিল য়ুরোপীয়। সেই য়ুরোপীয়দিগের প্রদত্ত শিক্ষা তাহারা ভাল ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল;—এই শিক্ষার দরুণ তাহাদের প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে নাই। ভারতে, হিন্দচীনে, চীনে, জাপানে কতকগুলি খৃষ্টান-মণ্ডলী ছিল। বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য চীনীয়েরা ফরাসী জেসুইট্‌দিগের বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। জাপানীরাও ওলন্দাজ প্রটেষ্টান্‌টদিগের বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য আসিয়াছিল। ভারতীয় প্রকৃতির ক্রমবিকাশ সাহিত্যের মধ্যে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। যদিও গীতগোবিন্দের গ্রন্থকার য়ুরোপ সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন, এমন কি, য়ুরোপের নাম পর্য্যন্ত জানিতেন না, কিন্তু মুসলমান কবি, মুসলমান লেখকগণ যে ভাষায় কথা কহিতেন, সে ভাষা আমাদের পরিচিত বলিয়া মনে হয়:—খৃষ্টের নাম, হিব্রু প্রফেটদিগের নাম, প্লেটো আরিষ্টটল, আলেকজান্দর ও সীজারের নাম তাঁহাদের লেখনীমুখে পুনঃপুনঃ বাহির হইয়া থাকে। তাঁহাদের বিজ্ঞানই আমাদের বিজ্ঞান, তাঁহাদের দর্শনই আমাদের দর্শন। কেবল ইস্‌লামই ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে মিলন ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছে। এই কার্য্য সাধন করিতে ৮ শতাব্দী লাগিয়াছিল। রামানুজ, কবীর ও নানকের আবির্ভাব না হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর বড় একজন ধর্ম্মসংস্কারক

স্বামীনারায়ণ তাঁহার উপদেশগুলি ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। তিনি ইস্লামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং খৃষ্ট-ধর্ম্মের কাছাকাছি গিয়াছিলেন। আবার স্বামীনারাণয়ের আবির্ভাব না হইলে, রামমোহন রায়, মুসলমানদিগের একেশ্বর বাদের উপর, খৃষ্টধর্ম্মের ধর্ম্মনীতির উপর, য়ুরোপীয় দর্শনাদির মূলতত্ত্বের উপর স্বকীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না। পরন্তু রামানুজ হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায় পর্য্যন্ত যে ক্রমবিকাশ হইয়াছিল তাহা এত স্বাভাবিক যে য়ুরোপীয় দিগ্‌বিজয় না হইলেও, রামমোহন রায়ের মতবাদটি অনিবার্য্যরূপে আবির্ভূত হইত। সেই চিন্তার উন্নতি এরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত যে, ভারতবর্ষীয়দিগের চিত্তক্ষেত্রে যে তত্ত্ববীজ প্রথম অর্পিত হইয়াছিল, মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের বিনা সাহায্যেও তাহা হইতে সমস্ত ফল উৎপন্ন হইত।

য়ুরোপের প্রভাব যে ধীরে ধীরে এসিয়ার শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার কারণ, এসিয়ার অবনতি সত্ত্বেও এসিয়ার ক্রমবিকাশ, য়ুরোপীয় ক্রমবিকাশের সহিত সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে, য়ুরোপীয় চিন্তার গতি রূপান্তরিত হইল। পদ্যের স্থান অধিকার করিল—গদ্য, অগ্নিময় ভাবোচ্ছ্বাসের স্থান অধিকার করিল,—সুব্যবস্থিত ক্লাসিক রচনা সকল, কল্পনা ও ভাবোন্মত্ততার স্থান অধিকার করিল যুক্তিপ্রধান দর্শন। এইরূপ এসিয়িক চিন্তার গতিও রূপান্তরিত হইল। চীনদেশে, y'angদিগের যুগে পদ্য, পরে Sung দিগের শাসনকালে, শব্দাড়ম্বরযুক্ত ও সুরঞ্জিত গদ্য, মোগলদিগের আমলে আবেগময় নাটক, Mings'দিগের শাসনকালে বণিকপ্রভৃতি সাধারণ লোকদিগের সম্বন্ধে আখ্যায়িকা এবং বিশ্বকোষ-ধরণের বৃহৎকায় গ্রন্থ সকল উৎপন্ন হইল। আবার জাপানে, Ashikaga দিগের আমলের গীতিনাট্য ও অষ্টাদশ শতাব্দীর উপদেশগ্রন্থাদির মধ্যে এই বৈসাদৃশ্য আরও বেশী লক্ষিত হয়। চীন ও জাপান উভয় দেশেই নাস্তিকদর্শনের প্রাদুর্ভাব। ভারতেও এইরূপ একটা আন্দোলন লক্ষিত হয়,—তবে প্রভেদ এই, ভারতবাসীদিগের কেজো বুদ্ধি নাই, নিশ্চয়াত্মক প্রত্যক্ষ দৃষ্টি নাই এবং ouralo-altaic জাতি-সুলভ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ঔদাসীন্য নাই। স্বকীয় প্রাচীন পৌত্তলিকতা মূলক বিশ্বব্রহ্মবাদের স্থানে ভারত একেশ্বর-বাদ স্থাপন করিল। অবিরাম সংঘটিত অলৌকিক কাণ্ডের ধারণাটা অপসারিত করিয়া, সৃষ্টি হইতে স্রষ্টাকে স্পষ্টরূপে পৃথক করিয়া, একেশ্বরবাদ,—প্রাকৃতিক ব্যাপারের অনুশীলন সম্বন্ধে, নির্দ্দিষ্ট সাধারণ জাগতিক নিয়মের সম্বন্ধে, মানব-চেষ্টার ক্রমোন্নতির সম্বন্ধে, অনুকূল মত পোষণ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, শিক্ষিত লোক-দিগের সন্দেহবাদ হইতে সপ্রমাণ হয় যে, ভারতবাসীরা নিজেই একেশ্বরবাদের অবনতি ও নিস্ফলতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। সমস্ত এসিয়ায়, এই যুক্তিবাদঘটিত আন্দোলনের অনুরূপ একটা গণতন্ত্রঘটিত আন্দোলনও উপস্থিত হইয়াছিল। এই

আন্দোলন, জাপানে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিপ্লবে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এরূপ সম্পূর্ণ বিপ্লব জাপানের ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। চীনদেশে, প্রবল গুপ্তসভাসমূহ গঠিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহ সেই সকল গুপ্তসভা কর্ত্তৃক উদ্দীপিত হয়। ভারতে, বৈষ্ণব ধর্ম্মসংস্কারকেরা বর্ণভেদ প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে মত প্রচার করিল। অধিবাসী লোকের পঞ্চাংশ ছিল সাম্যবাদী মুসলমান। রাষ্ট্র-নৈতিক মিলনসঙ্ঘসমূহের (confederacy) মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী শিখ ও মারাঠাদিগের যে মিলনসঙ্ঘ তাহা গণতন্ত্রিক মিলনসঙ্ঘ।

পরিশেষে বক্তব্য, সমস্ত এসিয়ার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিকে প্রবণতা প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

তত্ত্বতঃ—চীনে ও জাপানে Wang shao Jenএর দর্শনপদ্ধতি, ভারতে যোগবাদী-দিগের মতবাদ।

কার্য্যতঃ—শিথিল রীতিনীতি, ছেলেদের মধ্যে স্বাধীনতার ভাব, সন্তানের প্রতি পিতাদিগের প্রশ্রয়দান—যাহা উহাদের নাটক ও আখ্যায়িকাদিতে প্রায়ই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ, আরও কিছুকাল পরে, সামুরাই জাপানী-দিগের মধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব সাধনের দিকে প্রবণতা। ভারতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতার সুযোগে,—ভাগ্যান্বেষণকারী-দিগের ধৃষ্টতা ও সফলতা।

তাই বলিতেছি, বাহ্যতঃ বিপরীত বলিয়া মনে হইলেও, য়ুরোপীয় সভ্যতার নিকটবর্ত্তী হইবার দিকে এসিয়িক সভ্যতার প্রবণতা লক্ষিত হয়। কিন্তু অন্যথা য়ুরোপের উদ্যম চেষ্টা খুব বেশী ছিল। ভারতে, হিন্দো-চীনে, চীনে ও জাপানে, য়ুরোপ,—বাণিজ্যের কুঠী ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, অতীব দরিদ্র, অতীব লোকাকীর্ণ, অতীব বিভক্ত এসিয়া ও য়ুরোপ, তাহাদের নিজ নিজ প্রভাব-পরিসর বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে, এসিয়া ও য়ুরোপ উভয়ই যুগপৎ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে সমান, ঐ দুই সভ্যতা আসলে অসমানরূপে সমুন্নত হইয়া-ছিল। জীবন-সংগ্রামের নূতন অবস্থা ক্ষেত্রে বহুদিন ধরিয়া শিক্ষানবীশী করিয়া য়ুরোপ ধনঐশ্বর্য্যে ও শক্তিসামর্থ্যে দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করিল। পক্ষান্তরে এসিয়া তেমন প্রস্তুত না থাকায়, দুর্ব্বল হইয়া পড়িল; এবং এই দুর্ব্বলতাবশতঃ আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ এসিয়া, য়ুরোপের উদ্যম চেষ্টার প্রবল স্রোতের মুখে নিক্ষিপ্ত হইল। ইহা হইতেই য়ুরোপের অবিরাম উন্নতি ও সুনিশ্চিন্ত বিজয়লাভ।

উপনিবেশের বিস্তার হওয়ায়, এসিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে, অসংখ্য য়ুরোপীয় আসিয়া আড্ডা গাড়িল। তাহাদের সভ্যতার জটিলতাই তাহাদের স্বভাবকে সুনম্য করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারা সহজেই সেই সব দেশের প্রকৃতির সহিত আপনাদিগকে বনি-বনাও করিয়া লইল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই

এসিয়িকদিগের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া মেলা-মেশার চেষ্টা করিতে লাগিল—এমন কি তাহাদের নকল পর্য্যন্ত করিতে লাগিল। ম্যাকাও দেশে, সিংহলে, গোয়ায়, পোর্টুগিজেরা দেশীয় লোকদের সহিত মিশিয়া গেল, এবং তাই তাহাদের বংশধর-দিগের মধ্যে একটা বিশেষ ছাঁচ পরিলক্ষিত হয়; জাভার জর্ম্মান ও ওলন্দাজেরাও এইরূপ।

ভ্রমণকারীরা প্রাচ্য দেশসমূহের যেরূপ কল্পনা-রঞ্জিত বর্ণনা করিতে লাগিল, তাহাতে য়ুরোপীয়দিগের কৌতূহল ও ভাবোন্মত্ততা জাগিয়া উঠিল। এসিয়িক জাতিদিগের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ হইল। ভল্‌টেয়ার ও সেটাস্‌টাস্ উভয়ই "চীনের অনাথ" রচনা করিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চীনের মৃৎ-পাত্রসকল ও উনবিংশ শতাব্দীতে "টুকি-টাকি" দ্রব্য সকল সংগৃহীত হইল। বাস্তুবিদ্যাও কতকগুলি চীনীয় আকার গঠনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইল। তাহার দৃষ্টান্ত,—Pilnitz এর ywenger ও প্রাসাদ। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যও প্রাচ্যখণ্ডের বর্ণনায় প্রীতি লাভ করিতে লাগিল: গভে, বায়রণ, মুর, ভিক্টর, হুগো, লামারটিন্, ফ্লথেরুট, লে-কঁৎ-দে-লিল্, সার এডউইন আর্নল্‌ড্ প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। এসিয়া ও য়ুরোপের মধ্যে নৈকট্য স্থাপন করিবার জন্য বিজ্ঞান আরও বেশী কাজ করিয়াছিল। বৈজ্ঞানিকেরা প্রাচ্য অঞ্চলের ভাষা, সভ্যতা, শিল্পকলা, সাহিত্য ও ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। তখন আবার স্বকীয় যথার্থ ইতিহাস জানিবার জন্য প্রাচ্যেরা য়ুরোপীয়দিগের নিকট আসিতে লাগিল।

এইরূপে এসিয়ার সমস্ত খোঁজখবর লইয়া, য়ুরোপীয়েরা এসিয়া জয় করিবার জন্য এরূপ ফলপ্রদ উপায় সকল অবলম্বন করিল যাহা তখন পর্য্যন্ত অবিজ্ঞাত ছিল।

যুদ্ধ-সজ্জার উন্নতি।

বৈষয়িক সভ্যতা:—বাষ্পীয় পোত, লৌহবর্ত্ম,যাত্রাপথ, ডাক্, বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ, দূর-ভাষণ যন্ত্র (telephone), বন্দর, খাল ইত্যাদি—যাহার দ্বারা শ্রমসাপেক্ষ বৃহৎ কার্য্যসকল সম্পাদিত হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়-শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় এবং য়ুরোপীয়দের প্রভূত মূলধন সঞ্চিত হওয়ায় এই সকল অনুষ্ঠান সম্ভবপর হইয়াছিল:—

যাহার দ্বারা দেশের সীমাপ্রান্তে নিশ্চিন্ত শান্তি স্থাপিত হইতে পারে, এবং অভ্যন্তর প্রদেশে সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এরূপ কাজের বন্দোবস্ত। আইনের বিজ্ঞান, শাসন কার্য্যের বিজ্ঞান, আয়ব্যয়ের বিজ্ঞান, চুক্তির হিসাবে একপ্রকার যুক্তিসঙ্গত ভূস্বত্বাধিকারপ্রণালী, জরিপ চিঠা, জন-সংখ্যাগণনা, দেওয়ানি-বিভাগ, এবং সর্ব্ব-প্রকার বিবরণ-লিপির দলিল-পত্র; নূতন নূতন শ্রমশিল্পের সৃষ্টি ও সমস্ত লোকের প্রতিযোগিতার দ্বারা সমাজের রূপান্তর সাধন।

জাপানের ন্যায় জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন কোন জাতি একটা উন্নত সাধারণ-সভ্যতার মধ্যে থাকিয়া, স্বকীয় পুরাতন গঠন বজায় রাখিতে পারে, কিন্তু যে সকল জাতি সমস্ত

পৃথিবীর আর্থিক জীবনের অংশভাগী হয়, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য ও সমুন্নত জাতির সামাজিক গঠন ক্রমশ গ্রহণ করিয়া থাকে;—তাহা না করিলে তাহাদের অন্তর্হিত হইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা থাকিয়া যায়।

সর্ব্বশেষে ও সর্ব্বোপরি, য়ুরোপীয় সভ্যতার ফলে এই সকল অনুষ্ঠান সম্ভবপর হইয়াছিল—যথা:—বাধ্যতামুলক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া মনের ও চরিত্রের উৎকর্ষসাধন, সুলভ মুল্যে গ্রন্থাদি ও সংবাদ পত্র প্রচার, আলোচনা ও তর্কবিতর্কের অধিকার দান, রাষ্ট্রিক প্রতিনিধিনির্ব্বাচনে সার্ব্বজনিক মত গ্রহণ, মতামতের স্বাধীনতা, য়ুরোপীয় গণতন্ত্রের পোষণকারী কতকগুলি মূলতত্ত্বের জ্ঞান:—উন্নতি সাম্য, স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উল্টাপক্ষ সমবেত স্বার্থের প্রগাঢ় একতা যাহা মানুষকে পূর্ব্বেকার ন্যায় শুধু কৌলিক ও একান্ত সীমাবদ্ধ মিলন ক্ষেত্রে সম্মিলিত করে না—(সেই মিলন ক্ষেত্র যাহার নিয়মাবলী জীবনের সমস্ত কার্য্যকে স্পর্শ করে)—পরন্তু একটা সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, উদার ভাবে গঠিত কোন একটি মিলন-ক্ষেত্রে মনুষ্যগণকে একত্র সম্মিলিত হইতে প্রবৃত্ত করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

তখন জ্যোতিবাবু মধ্যে মধ্যে পাবনা কুষ্টিয়া অঞ্চলের জমিদারি পরিদর্শনের জন্য যাইতেন। সেখানে শিলাইদহের কুঠীতে গিয়া বাস করিতেন। বিষয় কর্ম্মের অবসর সময়ে শিকার করিয়া আত্মবিনোদন করিতেন। প্রায়ই পাখী শিকার করিতেন। তবে, জমিদারীর শিকারীকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাঘ দেখা গেলে তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়। একদিন শিকারী আসিয়া খবর দিল কোন নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে বাঘ আসিয়াছে। তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। জ্যোতিবাবু শিকারীকে সঙ্গে লইয়া, একটা দু-নলী বন্দুক হস্তে পদব্রজে সেই জঙ্গলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রবিবাবুও দাদার পিছনে পিছনে চলিলেন। তাঁর হাতে কোন অস্ত্র ছিলনা। জঙ্গলে পৌঁছিলে, শিকারী বলিল, ঐ বাঁশ-ঝাড়ের উপর উঠিয়া তাক্ করিলে সুবিধা হইবে। জ্যোতিবাবু জুতা খুলিয়া নিঃশব্দে একটা কঞ্চির উপর বন্দুক-হস্তে উঠিয়া বাঁশের গায়ে ঠেশ দিয়া গুলি করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। তাঁর short sight—চস্‌মা নাকে। শিকারী ফিস্ ফিস্ করিয়া যত বলে "ঐ"—উনি ততই বলেন—"কৈ?" অনেকক্ষণ পরে দেখিতে পাইলেন, নীচে ঘাসের ভিতর একটা জানোয়ারের পিঠের রোঁয়া চিক্‌চিক্ করিতেছে। তিনি সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি দুই গুলি ছুঁড়িলেন—গুলি বাঘের পৃষ্ঠদণ্ড ভেদ করিল। বাঘটা একটা বিকট গর্জ্জন

করিয়া সেই স্থানের ঘাস-সমেত কতটা মাটি কামড়াইয়া ধরিল। "তার পর বাঁশে বাঁধিয়া ও ঝুলাইয়া সেই মৃত বাঘটাকে আমাদের লোকজন হাল্লা করিয়া আমাদের কাছারি-গৃহে লইয়া আসিল। তখনও তার মুখে সেই ঘাস-সমেত-মাটি ছিল।"

জ্যোতিবাবু কাছারি বাড়ীর হাতায় পৌঁছিয়া আর এক কাণ্ড দেখিলেন। তাঁহার লোকেরা বন হইতে একটা প্রকাণ্ড অজাগর সর্প ধরিয়া আনিয়াছে। তাহার মাথায় লাঠী মারায় মাথাটা একটু থেঁৎলিয়া গিয়াছিল। সে একটা গোটা শেয়াল গিলিয়াছিল। লাঠীর আঘাতে অজাগর সেই শেয়ালটা উগ্‌রাইয়া ফেলিয়াছে। সেই অর্দ্ধ-পচিত শেয়ালের দুর্গন্ধে সেখানে তিষ্ঠনো ভার। এবার জ্যোতিবাবু কলিকাতায় ফিরিবার সময় সেই চিতাবাঘের স-মুণ্ড চর্ম্ম ও পিঞ্জরাবদ্ধ সেই জীবন্ত অজাগর—এই দুই ভীষণ হিংস্র জীবের হতাবশেষ ও জীবন্ত নমুনা—শিকারের বিজয়নিদর্শনস্বরূপ সঙ্গে লইয়া গেলেন। যোড়াসাঁকো বাটীতে কিছুদিন রাখিয়া অবশেষে অজাগরকে কলিকাতার পশু-উদ্যানে উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। পশু-উদ্যানের কর্ত্তৃপক্ষগণ একটা ক্ষুদ্র মন্দিরাকার লৌহ তারের পিঞ্জরে অজাগরকে সযত্নে রাখিয়া সেই মন্দিরের গায়ে উপহার-দাতার নাম লিখিয়া দিলেন। এই অজাগর অনেকদিন উদ্যানে ছিল। মধ্যে মধ্যে জ্যোতিবাবু তাঁহার অজাগরকে দেখিতে যাইতেন। তার পর, একবার গিয়া দেখেন সেই সুন্দর পিঞ্জরটীও নাই—সেই অজাগরও নাই। শুনিলেন, সে অজাগর মরিয়া গিয়াছে। আর একবার জ্যোতিবাবু হাতীর উপর চড়িয়া বাঘ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। এই তাঁর প্রথম হাতীর উপরে চড়িয়া ব্যাঘ্র-শিকারে যাত্রা। একটা ঘন নিবিষ্ট দুর্ভেদ্য বাঁশ-বনের ভিতর বাঘটা আছে শুনিলেন। হাতী বড় বড় বাঁশঝাড় মড়মড়-শব্দে পদদলিত করিয়া সেই দুর্ভেদ্য বাঁশ-বনের মধ্য দিয়া একটা পথ করিয়া চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে হাতী ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া একটু পিছু হটিল। আর অমনি একটা বাঘ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বাঁশবন অতিক্রম করিয়া মাঠের দিকে দৌড়িয়া পলায়ন করিল। জ্যোতিবাবু হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আর একটা ঘটনার কথা বলিলেন। তাঁহাদের জমিদারীর হাতিটি শিকারী হাতী ছিল না। হাতী চড়িয়া শিকার করিতে হইলে, অন্য জমিদারের নিকট হইতে শিকারী হাতী ধার করিতে হইত। তিনি তাঁহাদের হাতিটীকে শিক্ষা দিয়া শিকারী করিয়া তুলিবেন সঙ্কল্প করিলেন। প্রথমে তার পৃষ্ঠদেশ হইতে বন্দুকের আওয়াজ করিয়া তাহাকে বন্দুকের আওয়াজে অভ্যস্ত করিতে হইবে। এই মনে করিয়া তিনি একদিন হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বন্দুকের আওয়াজ করিলেন। হস্তীর শিকার শিক্ষার এই প্রথম পাঠ। কিন্তু মূর্খ হস্তী তাহার নিজ হিত বুঝিল না—শিক্ষার মাহাত্ম্য বুঝিল না—সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এমন গা-দোলা দিতে লাগিল যে, জ্যোতিবাবুর সমুদ্র পীড়ার মত পীড়া উপস্থিত হইল। কপাল দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। জ্যোতিবাবু বলিলেন :—

"মাহুৎ অঙ্কুশ প্রহার করিয়া "বয়েঠ" "বয়েঠ" করিয়া কত বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, হাতী কিছুতেই বসিবে না। আমার আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল—অপরাহ্ণ হইল—তবু মাহুৎ হাতীকে বসাইতে পারিল না। আমি ত হাতীর উপর আর তিষ্টিয়া থাকিতে পারিতেছি না—মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম—তখন আমি "মরিয়া" হইয়া হাতীর লেজের দিক দিয়া লাফাইয়া পড়িলাম। মূর্খ হস্তীকে শিখাইতে গিয়া আমিও হস্তীমূর্খ বনিয়া গেলাম!"

ইহার পর জ্যোতিবাবু হাটখোলায় এক পাটের আড়ৎ খুলিয়াছিলেন। ইহার অংশীদার ছিলেন জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি স্বর্গীয় জানকী নাথ ঘোষাল মহাশয়। দুইজনে প্রতিদিন সকালে হাটখোলায় গিয়া আফিস্ করিতেন; কিন্তু পাটের বাজার খারাপ হইয়া যাওয়ায় একার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অল্পদিনেই এ ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইয়াছিল। এই টাকা লইয়া এর পর জ্যোতিবাবু শিলাইদহে নীলের চাষ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ইতিপূর্ব্বে এখানে একসময় অনেক নীলকর সাহেব ছিলেন ও তাঁহাদের নীলের চাষও ছিল। এইখানে যে নীলকুঠী ছিল, সেই নীলকুঠীই শেষে ঠাকুর-জমিদারের কাছারী-গৃহে পরিণত হয়। সেই নীলকুঠী সংলগ্ন কয়েকখানি ভাঙ্গাচুরা হাউজ্ (vat) খালি পড়িয়াছিল। জ্যোতিবাবু সেইগুলিকেই মেরামৎ করিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। এই হাউজে জল আনাইতে পদ্মা হইতে একটি খাল কাটান' হইল। জ্যোতিবাবু বলিলেন "তখন বুঝিয়াছিলাম চাষার ভাবনা কত! কখন' জল এবং কখন' রৌদ্রের জন্য যে কি আকুল ভাবে আমি প্রতীক্ষা করিতাম, তাহা বর্ণনাতীত,—কিন্তু এটা কবির-দৃষ্টিতে দেখা নয়। তখন ঈপ্সিত সময়ে মেঘ আসিলে মনে হইত একজন প্রাণের বন্ধু আসিয়াছে; বন্ধুকে দেখার মত আনন্দ পাইতাম। এ আনন্দে কাব্যরসের লেশমাত্র ছিল না। এইরূপে চার পাঁচ বৎসরেই আমার নীলের চাষে খুব উন্নতি হইল। কিন্তু হঠাৎ নীলের বাজার পড়িয়া গেল। শুনা গেল জার্ম্মানরা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এক রকম কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিতেছে, কাযেই নীলের বাজার অনেক খারাপ হইয়া গেল। আমিও কায উঠাইয়া দিলাম। যাহাই হউক নীলে আমি বেশ লাভ করিয়াছিলাম। এখন এই টাকা লইয়া আমি কি করিব?—এই চিন্তা তখন আমার মনে খুব প্রবল হইয়া উঠিল। হঠাৎ এমন সময় Exchange Gazette এ দেখিলাম, একটা জাহাজের খোল নীলামে বিক্রয় হইবে। ভালই হইল, এই খোলটা কিনিয়া একখানা জাহাজ তৈরি করাইয়া জাহাজ চালান যাইবে স্থির করিলাম।

"এই সময়ে, আবার কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত রেল লাইন হইবে, কথা ছিল। তবেই খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত বেশ জাহাজ চালান' যাইতে পারে। খোল কেনার পক্ষে এ একটা বেশ সুযুক্তিও হইল। তৎক্ষণাৎ,—সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য ক্রমে ঠিক বলিতে পারি না—খোল কিনিতে ছুটিলাম।"

সেখানে খুব ভিড়। বিস্তর ক্রেতা। মাল নীলামে উঠিয়াছে. সকলেই ডাকিতেছে, জ্যোতিবাবুও ডাকিতে সুরু করিলেন। দাম হু হু করিয়া বাড়িতে লাগিল। ক্রমে সাত হাজারে নিষ্পত্তি হইল। জ্যোতিবাবুই সর্ব্বোচ্চ ডাকে কিনিলেন। কিনিবার পর অনেকে তাঁহাকে সাতহাজারের উপরও কিছু দিয়া এ খোলটি লইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি পুনর্বিক্রয়ে স্বীকৃত হইলেন না। অস্বীকৃত হওয়ার প্রধান কারণ, বাঙ্গালায় বাঙ্গালী কর্ত্তৃক "জাহাজ চালান" প্রবর্ত্তন, এবং দ্বিতীয়তঃ সকলেই যখন এ খোলটি কিনিতে উদ্‌গ্রীব তখন নিশ্চয়ই এটি সস্তা হইয়াছে, অতএব পুনর্বিক্রয়ে তাঁহার ক্ষতি। কথাটা ঠিক! তখন লোকে যদি বলিত "না এটা ঠকা' হয়েছে" তাহা হইলে তিনি যে কি করিতেন তাহা এখন বলা কঠিন। সকলের লুব্ধ দৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া প্রকাশ্য নীলামে সর্ব্বোচ্চ দরে তিনি যে জাহাজের খোল কিনিলেন, ইহাতে আর কোনও উপকার হউক বা না হউক—এই কেনার উত্তেজনার মুহূর্ত্তে একটা গর্ব্ব! যাহাই হউক তিনি খুব গর্ব্বিত অন্তরে বাটি ফিরিলেন, যেন কি একটা রাজ্যই জয় করিয়া আনিলেন।

বুশ্‌বী (Bushby) গবর্ণমেণ্টের জাহাজ সমূহের একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তাঁহাকে যোলটাকা ফী দিয়া এই খোলটী দেখান হইল, তিনি বলিলেন, "It will make a Splendid Steamer" (ইহাতে অতি সুন্দর একখানি ষ্টিমার তৈয়ারি হইবে)। আরকি! জ্যোতিবাবু অমনি হাওড়ার King প্রভৃতি সমস্ত জাহাজের কারখানায় ঘুরিতে লাগিলেন, কে এই জাহাজখানি প্রস্তুত করিয়া দিবে! কিন্তু তাহাদের হাতে এত বেশী কায ছিল যে বড় বড় কোম্পানির কেহই একায লইতে স্বীকৃত হইল না। শেষে Kelso Stewart নামে এক কোম্পানি এই জাহাজ নির্ম্মাণের ভার লইল।—সেই খোলে যে প্রথম জাহাজ প্রস্তুত হইল তাহার নাম হইল "সরোজিনী।" জাহাজখানি খুব শীঘ্র দিবার কথা ছিল, কিন্তু Kelso কোম্পানি তাহা পারিল না। তদ্ব্যতীত জাহাজ বড় হইল বটে কিন্তু তেমন মজবুত হইল না। সে যেন এক আজন্মরুগ্ন সন্তানের মতই জন্মিল। আজ এঞ্জিন খারাপ, কাল চাকা খারাপ, পরশু বয়লার খারাপ, এই রকম একটা না একটা গোলমাল প্রত্যহই ঘটিতে লাগিল। আর সেই সব মেরামত করাইতে অজস্র অর্থ ব্যয় হয়, কাযও বন্ধ রহিয়া যায়। দেশীয় চালক যাহারা নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা কল-কব্‌জার বিষয়ে ভাল বুঝিত না। সামান্য একটু কিছু হলেই জাহাজ অমনি বন্ধ। তখন জ্যোতিবাবু, জাহাজের কল কব্জা বিষয়ে অভিজ্ঞ সুদক্ষ একজন কর্ম্মচারীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। একজন ফরাসীকে পাওয়া গেল, তাহাকেই নিযুক্ত করিলেন। সেই জাহাজের Commander হইল। তাহার উপরেই জাহাজের সমস্ত ভার অর্পিত হইল। কল খারাপ হইবামাত্র সে আস্তিন্ গুটাইয়া যেরূপ অক্লান্তভাবে কাজ করিত, সেরূপ কাজ ১০জন খালাসীও করিতে পারিত না। কিন্তু তাহার একটি দোষ ছিল। মাসের

মধ্যে একবার করিয়া মাতাল হইত। তখন সে উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া খালাসীদিগকে বকসিশ দিত, খয়রাৎ করিত, জাহাজের সাবানাদি জলে ছুঁড়িয়া ফেলিত। তাহার পর হইতে আবার সে ভালমানুষ—যার পর নাই বাধ্য। যাই হোক্, এই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া জ্যোতিবাবুর যেমন অনেক খরচ বাঁচিয়া গেল, তেমনি অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে কায কর্ম্মও বেশ সুচারুরূপে চলিতে লাগিল।

জ্যোতিবাবু এ লাইনে আসিবার পূর্ব্বেই বিলাত হইতে Flotilla Company নামে এক কোম্পানি আসিয়া কার্য্য সুরু করিয়া দিয়াছিল। জ্যোতিবাবু যখন প্রথমে কার্য্য আরম্ভ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তখন যদি পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার অনেক সুবিধা হইতে পারিত। কিন্তু প্রথম জাহাজ "সরোজিনী" নির্ম্মিত হইতে তাঁহার এত বিলম্ব হইয়া গেল যে তিনি আসিবার পূর্ব্বেই ফ্লোটিলা কোম্পানি কায ফাঁদিয়া বসিয়াছিল। তাঁহার জাহাজ যদি ঠিক সময়ে তৈরি হইত, তাহা হইলে তিনি এর অনেক আগেই কার্য্য চালাইতে পারিতেন; তখন হয়ত এ কোম্পানি এদিকে না আসিতেও পারিত। কিন্তু তাহা হইল না। এখন দুই পক্ষই এই লাইনে ষ্টীমার চালাইতে লাগিলেন। উভয় দলে খুব প্রতিযোগিতাও আরম্ভ হইল। একখানি মাত্র ষ্টীমার লইয়া ইংরাজ কোম্পানির সঙ্গে ঠিক প্রতিযোগিতা হইয়া উঠিতেছিল না বলিয়া তিনি আরও চারখানি জাহাজ ক্রমে ক্রমে ক্রয় করিলেন। এ জাহাজগুলির নাম ছিল "বঙ্গলক্ষ্মী" "স্বদেশী" "ভারত" এবং "লর্ড রিপন"। তখন এই পাঁচখানি জাহাজ খুল্না হইতে বরিশাল যাত্রী লইয়া গমনাগমন করিত। সময় সময় মাল লইয়া কলিকাতাতেও আসিত।

এই সময় জ্যোতিবাবু জাহাজেই থাকিতেন। বাঙ্গালীর জাহাজ চালনায় তখন বরিশালের ছাত্রসমাজে এবং নব্যদলের মধ্যে একটা খুব আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। তৎকালে লিখিত জ্যোতিবাবুর একখানি পত্র হইতে তাহার বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"আমাদের উভয়ের মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফ্লোটিলা কোম্পানির অনেক খরচ পত্র—লোক জনের ব্যয়, কিন্তু তারা প্রায়ই যাত্রী পায় না। অধিকাংশ যাত্রী আমাদের জাহাজে যায়। তাদের বিস্তর ক্ষতি হচ্চে, তবু তারা নিয়মিতভাবে সমান জাহাজ চালাচ্চে, যত্নের একটু ত্রুটি বা শৈথিল্য নাই। আর তারা প্রকাশ্যভাবে বলে—বাঙ্গালীর অধ্যবসায় নাই। তাহারা আমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে' কতদিন জাহাজ চালাতে পারবে। এখানে আমাদের জাহাজ যাতে স্থায়ী হয় তার জন্য এখানকার লোকের—বিশেষতঃ ইস্কুলের ছাত্রদের অপরিসীম উৎসাহ ও যত্ন। এমন উৎসাহ আমি কখনও দেখিনি! তাদের ভাব দেখে চমৎকৃত হতে হয়। প্রত্যহ খুব ভোরে আমাদের জাহাজ এখান থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনায় যায়। ফ্লোটিলা কোম্পানির জাহাজও সেই সময় যায়। পাছে আমাদের জাহাজে লোক না গিয়ে প্রতিপক্ষের জাহাজে যায় এইজন্য কতকগুলি ভদ্রলোক ও স্কুলের

ছাত্র রাত্রি ৪টার সময় উঠে দলবদ্ধ হয়ে উৎসাহের সহিত জাহাজের ঘাটে প্রত্যহ উপস্থিত হন ও যদি কোন' যাত্রী প্রতি-পক্ষের জাহাজে যেতে চায়, তাহাকে অনেক প্রকারে বুঝিয়ে এমনকি পায়ে পর্য্যন্ত ধরে' ফিরিয়ে আনেন। যেখানে জালি বোটে করে প্রতিপক্ষের জাহাজে লোক উঠছে সেখান পর্য্যন্ত গিয়ে তাদের এইরূপ বুঝাতে থাকেন: "আমাদের কথাটি একবার শুনুন্ তারপর যে-জাহাজে ইচ্ছা হয় যাবেন। আপনারা বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর জাহাজ থাক্‌তে কেন আপনারা ইংরাজদিগের জাহাজে যাবেন? দেশের টাকা দেশে থাকে এটা কি প্রার্থনীয় নয়? প্রতি-পক্ষের জাহাজে স্বদেশীয়দিগের প্রতি কুব্যবহার করা হ'ত, অপমান করা হ'ত—আমাদের নিমন্ত্রণেই, আমাদের আহ্বানেই, ঠাকুর বাবুরা এখানে জাহাজ এনেছেন—তখন কি আপনাদের ও জাহাজে যাওয়া উচিত?" "হাঁ বটে, যা বল্লে তার উত্তর নাই, চল ঐ জাহাজে যাওয়া যাক্।" এই বলে যাত্রীরা আবার আমাদের জাহাজে অনেকে ফিরে আসেন। একটি বার-বৎসর বয়স্ক বালক, ঘাটে সেদিন বক্তৃতা দিয়াছিল:—"হে ভাই সকল, তোমরা আপনার জাহাজ থাক্‌তে পরের জাহাজে যাইবা না। উহাদের ঐ যে জাহাজ দেখিতেছ—উহার যেরূপ গঠন তাহাতে একটু বেশী বাতাস উঠিলেই দোদুল্যমান্ হইয়া জল গর্ভে নিমগ্ন হইবে। তাহার সাক্ষী দেখ উহারা এখানে জাহাজ রাখিতে পারে নাই, ওপারে লইয়া গিয়াছে, এবং সে বাতাসে দোদুল্যমান্ হইতেছে। যদি তোমরা প্রাণ বাঁচাইতে চাও ত' ভাই-সকল ঐ জাহাজে যাইবা না।"—এই কথা শুনে নীচশ্রেণী লোকদের ভয় হ'ল—আর প্রতিপক্ষের জাহাজে তারা গেল না। ঝড় হোক—বৃষ্টি হোক্—রৌদ্র হোক্—যে কোন বাধা হোক কিছুই না মেনে তাঁহারা জাহাজের সিটি (বাঁশীর ডাক) শুনবামাত্র দৌড়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন্। তাঁহারা বলেন, আমাদের জাহাজের সিটি তাঁহাদের এমন মিষ্টি লাগে ও তা শুন্‌তে পেলে তাঁদের এমন আহ্লাদ হয় যে তাহা বল্‌বার নয়। বন্ধুদের সুপরিচিত গলার স্বর দূর হতে শুন্‌লে যেমন বুঝা যায় কে-আস্‌চে তেমনি সিটি শুন্‌লেই কোন্ জাহাজ আস্‌চে তাঁরা বুঝতে পারেন। ঐ আজ "ভারত" আসচে, ঐ "লর্ড রিপন" আসচে, ঐ "বঙ্গলক্ষ্মী" আস্‌চে, ঐ "স্বদেশী" আস্‌চে, ঐ "সরোজিনী" আস্‌চে—এই বলে সকলে উৎসাহের সহিত হাস্যমুখে দলবদ্ধ হয়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। সেদিন একজন বল্‌ছিলেন, "যেমন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বংশিধ্বনিতে হৃদয় আকৃষ্ট হত, সেইরূপ তাঁদেরও হৃদয় আকৃষ্ট হয়।" আবার প্রতিপক্ষের জাহাজের নাম পর্য্যন্ত তাঁরা সইতে পারেন না—তার সিটি তাঁহাদের কাণে অত্যন্ত কর্কশ লাগে। প্রতিপক্ষের জাহাজ যদি কোন দিন যাত্রী পায়—সেদিন তাঁদের আর আপসোসের সীমা থাকে না।

"সেদিন আমাকে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য এখানে যে একটি বৃহৎ সভা হয়েছিল, তাতে একটি বক্তা আমার ষ্টীমারের উল্লেখ

করতে করতে হঠাৎ আপনাকে স্মরণ করে বল্লেন—"তাঁর ষ্টীমার ভুলক্রমে বলেছি—ইহা ত' আমাদেরই ষ্টিমার।" একথাটি আমার বড়ই ভাল লেগেছিল। সেদিন সে সভায় অনেক লোক একত্র হয়েছিলেন—একটি প্রকাণ্ড গৃহ লোকে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এখানকার হাকিম, উকীল, জমীদার, দোকান্দার, মহাজন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এখানকার প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। অনেকগুলি সুবক্তা ছিলেন। সেদিন ছাত্রদের আহ্লাদ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। তারা আপনারাই সভার বিজ্ঞাপন ঘরে ঘরে গিয়ে বণ্টন করেছিল, গাছের পাতা দিয়া ঘরটি সুন্দর সাজিয়েছিল। তাদের উৎসাহ দেখ্‌লে নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়, নিরুদ্যম হৃদয়েও উদ্যমের ভাব আসে।

"সেদিন এখানে জাতীয় সংকীর্ত্তন হয়েছিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" অঙ্কিত নিশান হাতে নিয়ে, খোল কর্ত্তাল বাজাতে বাজাতে বাহু তুলে, উৎসাহের সহিত গান করতে করতে সংকীর্ত্তনের দল—বাবুর বাড়ী থেকে বৈকালে বেরুলেন্—যেতে যেতে রাস্তার লোকের ভিড় বাড়তে লাগল—তারপর বাজারে পৌঁছিলে লোকারণ্য হয়ে উঠল। প্রথমে লোকেরা মনে করেছিল, বুঝি কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তন, তাই অ-বাবু একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে এ কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য অল্প কথায় ও সহজ ভাষায় বেশ বুঝিয়ে দিলেন—তাতে লোকেরা বেশ বুঝতে পারলে ও উৎসাহের সঙ্গে সংকীর্ত্তনে সবাই যোগ দিলে।

"নগর-সংকীর্ত্তনে যে কি মাতান' ভাব আমি সেদিন বেশ বুঝতে পারলেম্। এইরূপ জাতীয় সংকীর্ত্তন যদি নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে গাওয়া হয় তা হলে বড়ই উপকার হয়। সাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাব প্রচারের ভাল উপায় এর চেয়ে আর কিছুই নেই। যে গানটা গাওয়া হয়েছিল, সেটা নিয়ে প্রকাশ করা গেল। এই গানটায় লোকেরা যে কিরকম মেতে উঠেছিল, সুর না শুন্‌লে শুধু কথায় বোঝা যাবে না। যাই হোক্ তবু কতকটা ভাব বুঝতে পারবে :—

কে কোথায় আছিস ভাই আয়রে সকলে গাই
প্রাণের সঙ্গীত আজি কাঁপায়ে গগন।
বেঁধে আজি প্রাণে প্রাণে শত কণ্ঠে এক তানে
সবে মিলে গাই গীত মৃত সঞ্জীবন॥

(একতালা।)

(ও ভাই) দেখ, সব ঘুমিয়ে অচেতন হয়ে
দেশের দশা একবার করেনা স্মরণ।
(একবার চায় নারে কেউ নয়ন মিলে)
(একিরে কাল নিদ্রা এল)
(মোরা) সবারে জাগাব, দুর্দ্দশা ঘুচাব
নিদ্রাগত প্রাণে, আনিব চেতন।
(এঘোর দুঃখনিশি অবসানে)
(মহারাণীর সুশাসনে)
(ও ভাই) ভিন্ন ভিন্ন জাতি, মিলে দিবা রাতি
ভাই ভাই হয়ে করিব সাধন,
(মিলে প্রেম সূত্রে প্রাণে প্রাণে)
দেখবে দেশে দেশে, এ ভারতে মিশে,
কত জাতির হল, প্রেমেতে মিলন।
(ওরে এমন শোভা দেখবে কোথা!

(রূপক ।)

আহা, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী
ভাবে মেতে কোটি কণ্ঠে কর উচ্চারণ ।

(মনোহর সই—একতালা ।)

শত্রু মিত্র মিলে ঘরের বিবাদ ভুলে
গলাগলি হ'য়ে গাইরে
(আজি) দেশের কাজে মোরা হয়ে মাতোয়ারা
স্বার্থের কথা ভুলে যাইরে ।
(দেশের প্রেমে মত্ত হ'য়ে)
(মায়ের চরণ সেবায়)
(করি) হয়ে একমন মায়েরই কীর্ত্তন
(মোরা) পঁচিশ কোটী প্রাণী ভাইরে ।
বিংশতি জাতিতে বিংশতি ভাষাতে
মেদিনী কাঁপায়ে গাইরে ।:
(জয় ভারত জননী বলে')
(সমস্বরে সবে)

(রূপক ।)

নব উদ্যম দেখিয়ে সবে চমকিত হয়ে ক'বে
বুঝি ভারত হবে আবার জগত ভূষণ ।

(ঝুলন ।)

(ওরে) চারিদিকে সবাই জেগে, তোরাই রলি'
—শুধু তোরাই ঘুমে রলি' শুধু তোরাই ঘুমে রলি'
নবীন আলোয় ভাস্‌ছে ধরা দেখ্‌রে নয়ন মেলি ।
(চেয়ে দেখ দেখরে ও ভাই)
ছিছি কাযের বেলা ভোরের বেলা ঘুমে বিভোর হলি !
(জেগে আয় আয়রে ভাই)
(ওরে এমন দিন আর পাবিনারে)
হায়রে ঘুমের ঘোরে বুঝলিনারে কি ছিলি কি হলি ।
(একবার ভেবে দেখরে ও ভাই)
ছিছি এতকাল ঘুমিয়ে আছিস্‌ তবুনা জাগিলি।
(একি হলরে ভাই)
হায়রে জেগেও বুঝি জাগ্‌লিনারে কেন এমন হলি ।
(একবার উঠ উঠ সবে)
এস মহানিদ্রা ভেঙ্গে করি কোলাকুলি ।
(জয় ভারত বলরে ভাই)
এস দলাদলির বাঁধন খুলি বাঁধি গলাগলি ।
(ভারত মাতার নিশান তুলি)
(আর দেরি করিস্‌নারে)
(একবার আয় আয়রে সবে)

রূপক ।

সবে এক প্রাণ হয়ে, ভগবানের নামটি লয়ে,
দেশের মঙ্গল সাধনে, কর প্রাণ পণ ।"

এইরূপে জ্যোতিবাবুর কায বেশ দিন দিন লাভজনক হইয়া উন্নতির পথে চলিতেছিল। ইঁহার অবস্থিতির জন্য বরিশাল সহরও বেশ সরগরম ছিল। সভা, সমিতি, কীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতি ব্যাপার লাগিয়াই ছিল। তিনিও বেশ মনের সুখে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু এত সুখ তাঁহার সহিল না।

ইংরাজের ব্যবসায়ে ব্যাঘাত লাগিয়াছে, আর কি তাহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারে? ব্যবসায়ী সাহেবেরা যৎপরোনাস্তি জ্যোতিবাবুর বিপক্ষাচরণ করিতে লাগিল। তাহারা যখন দেখিল যে যাত্রী আর হয় না, তখন তাহারা ভাড়া কমাইতে আরম্ভ করিল, জ্যোতিবাবুও কমাইলেন। এই ক্ষতি স্বীকার করিয়াও জ্যোতিবাবু প্রতি যোগিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। লাভ আগে যেমন হইতেছিল, এখন তেমন আর হয় না—তবুও তিনি দমিলেন না।

এই সময়ে খুল্‌না হইতে মাল বোঝাই লইয়া "স্বদেশী" কলিকাতা আসিতেছিল। সারা পথ বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল—আলোকমালা সমুদ্ভাসিত কলিকাতা বন্দরেও প্রবেশ করিল। কিন্তু শেষে হাওরাপুলের নীচে দিয়া যাইবার

সময় পুলে ধাক্কা লাগিয়া ষ্টিমারখানি গঙ্গা গর্ভে নিমগ্ন হইল। এক জাহাজ মালের এক কণাও উঠিল না।

এতদিনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একবারে নিরুদ্যম ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। এতদিন তবুও একটা আশা ছিল—আবার জোয়ার আসিবে। কিন্তু এইবার সে আশা একবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কায উঠাইয়া দিতেই তিনি কৃতসংকল্প হইয়া উঠিলেন। একেত' প্রতিযোগিতার জন্য তিনি কিছু দিন হইতেই ক্ষতি স্বীকার করিতেছিলেন, যদি কোনও রূপে টিকিয়া যায়; কিন্তু এবার এই দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ ব্যাপারেই তিনি অত্যন্ত জের্‌বার্ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তবুও তিনি নিজ হইতে এ কাজ উঠান্ কিরূপে? কায বন্ধ করিবেন, মনে মনে এই মৎলব ছিল কিন্তু এ ব্যাপার তিনি ঘুণাক্ষরেও কাহার নিকট প্রকাশ করেন নাই। কায যেমন চলিতেছিল, পূর্ব্বের মত তেমনিই চলিতে লাগিল।

এমন সময় ফ্লোটিলা কোম্পানির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (এখন "রাজা") জ্যোতিবাবুর নিকট এক সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আসেন। তিনি বলিলেন "উভয় পক্ষেই আর এরূপ বৃথা অর্থব্যয়ে লাভ কি? আপনি নিজেই একটা মূল্য ধার্য্য করিয়া দিউন্। ফ্লোটিলা কোম্পানি আপনার সমস্ত কারবার কিনিয়া লইতে প্রস্তুত আছে।" জ্যোতিবাবু দেখিলেন যে এ একটা মহা সুযোগ উপস্থিত—এ সুযোগ ছাড়া একেবারেই উচিত নয়। তখন যেরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে কোন দিন আপনাআপনিই কায গুটাইতে হইত, তখন হয়ত আর কিছুই পাওয়া যাইত না। কিন্তু এখন বেশ মানে মানে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি মগ্নাবশিষ্ট চারিখানি জাহাজ ও সমস্ত ফ্লোটিলা কোম্পানিকেই বিক্রয় করিয়া দিলেন।

ফ্লোটিলা কোম্পানীর নিকট হইতে অনেক টাকা পাওয়া গেলেও, তাঁহার সমস্ত দেনা পরিশোধ হইল না। জ্যোতিবাবু বলিলেন, "আমি খুব বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম কিন্তু পালিত মহাশয় (স্যার টি পালিত) সমস্ত পাওনাদের ডাকাইয়া তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া সুজাইয়া দিলেন তাহাতে আমার ঋণের বোঝা অনেক হাল্কা হইয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে তিনি নিজে এ ভার গ্রহণ করিয়া এমন একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন যাহাতে আমি একবারেই ঋণমুক্ত হইয়া গেলাম। তিনি এখন দানবীর স্যর তারকনাথ পালিত, তাঁহার পরিচয় কে না জানে? কিন্তু তিনি যে আবার কেমন বন্ধুবৎসল তাহা তাঁহার এই কাজেই লোকে পরিচয় পাইবে। শুধু আমাকে নয়, এমনি কত লোককে তিনি বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া, তাঁহার "তারক" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন! তাঁহার দুই সময়ের দুইটি ছবি আমার মনে অঙ্কিত হইয়া আছে, সেই দুই ছবি তোমার সম্মুখে ধরিলেই এক মুহূর্ত্তেই তাঁহার প্রকৃত চরিত্র তোমায় হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রথম ছবি:—আমি তখন

হিন্দু স্কুলের খুব নীচের ক্লাসে পড়ি। তিনি একদিন আমাদের ক্লাসের সম্মুখ দিয়া মহেশ বাবুর ফার্ষ্ট ক্লাসে কোন এক উপলক্ষে গিয়াছিলেন। দেখিলাম তাঁহার চক্ষু ব্যাণ্ডেজ কাপড়ে বাঁধা। শুনিলাম, মেডিকাল কলেজের ফিরিঙ্গি ছাত্রদিগের সহিত প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদিগের মারামারি হয়—সেইদিনকার মারামারিতে প্রেসিডেন্সী কালেজের দুই একজন ছাড়া সব ছাত্র পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। যাঁরা পলায়ন করেন নাই তন্মধ্যে পালিত মহাশয় সর্ব্বপ্রধান। তিনি একাকী বহু ফিরিঙ্গীর সঙ্গে লড়াই করিয়া আহত হইয়াছিলেন।

আর এক ছবি, যখন আমি স্কুল কলেজ ছাড়িয়া বিষয় কার্য্যে লিপ্ত। সেই সময়ে একবার আমরা বজরা করিয়া গঙ্গা-বক্ষে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। পালিত মহাশয়ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। ভয়ানক গরম। আমরা কামরার পাটাতনে বিছানা করিয়া পাশাপাশি সবাই রাত্রে নিদ্রা যাইতেছি। গরমে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় দেখি, পালিত মহাশয় উঠিয়া বসিয়া আমাকে তালপাতার পাখার বাতাস করিতেছেন! কি স্নেহশীলতা! তাঁহার স্বভাবে কঠোরতা ও কোমলতার কি অপূর্ব্ব মিশ্রণ! ভবভূতি যথার্থই বলিয়াছেন :—

"বজ্র হতে সুকঠোর
পুষ্প হতে আরো সুকুমার
মহাজনের চিত্ত
আমাদের বুঝে ওঠা ভার ॥"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নবাব

নবম পরিচ্ছেদ

রাজ-অতিথি।

ফ্রান্সের দক্ষিণে সাঁতে রুমা; এক সময়ে বিলাস-কানন ও প্রাসাদমালা-সজ্জিত এই নগরের সমৃদ্ধির কথা দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িলেও এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য সেই সমস্ত প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্ন একখানা ইষ্টকখণ্ডও আজ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। কালের বন্যায় সকলই ভাসিয়া গিয়াছে, আছে শুধু নগরের গা বেড়িয়া দাঁড়াইয়া দীর্ঘ সরীসৃপের ন্যায় পাহাড়ের শ্রেণী। শ্যামল উপত্যকা শষ্পাচ্ছন্ন; ক্লান্ত পথিকের চক্ষে একান্তই তৃপ্তি-দায়ক।

বাগানে ফুল ফুটিলেই মধুকরের ভিড় জমিয়া থাকে, যে বাগানে ফুল ফুটে না, মধুকর ভুলিয়াও সেদিকে পদার্পণ করে না। কাজেই নগরের শোভা-সমৃদ্ধির সহিতই যে সৌখীন নরনারীর দল অন্তর্হিত হইবে, সে কথা বিশেষ করিয়া না বলিয়া দিলেও চলে।

শৈশবে জাঁমুলে একবার মার সহিত এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিল—

তখনই সে এই সবুজ প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ শ্যাম উপত্যকা ও পর্ব্বত-পার্শ্বে প্রকৃতির অবাধ হাস্য-লহরের মতই মুক্ত নির্ঝর দেখিয়া আনন্দমুগ্ধ স্বরে বলিয়াছিল, "মা যখন আমি বড়লোক হব, তখন সাজিয়ে গুজিয়ে এই নগরখানাই তোমাকে আমি দিয়ে দেব। আর ঐ পাহাড়ের কোনে তোমার জন্য মস্ত একখানা বাড়ী করে দেব। সে বাড়ী মার্ব্বেল পাথরে তৈরি হবে, সে যা বাহার খুলবে, তখন তুমি দেখে নিও।"

তাহার পর আরব্য উপন্যাসের অলৌকিক গল্পের মতই জাঁমুলে যখন অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক হইলেন, সকল কামনাই যখন তাঁহার পরিপূর্ণপ্রায় হইয়া উঠিল, তখন জাঁমুলে সর্ব্ব প্রথম শৈশবের এই অভিনব কল্পনা সত্যে পরিণত করিলেন। পাহাড়ের কোণে আলাদিনের প্রাসাদের মতই জাঁমুলের মর্ম্মর প্রাসাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া বিচিত্র রম্য কাননের সৃষ্টি হইল, সেদিন সংবাদপত্রের স্তম্ভে সে সংবাদ পাইয়া সৌখীন নরনারীর দল সঁাতে রুমায় আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহার পর জাঁমুলের অর্থে জীর্ণ ষ্টেশনের সংস্কার ও পথ-ঘাট রচিত হইয়া উঠিল, তখন সহরের দুই-চারি জন ধন-কুবেরও তথায় বিলাস কুঞ্জের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। প্রাসাদ তৈয়ার করাইয়া জাঁমুলে মাকে আনিয়া তথায় বসাইলেন। তাঁহার শৈশবের সঙ্কল্প রক্ষা করিলেন।

তাহার পর দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সঁাতে রুমা আজ জনহীন নহে। জাঁমুলের নিজেরই লোকজন অসংখ্য—তদ্ভিন্ন বাগানে যখন ফুল ফুটিয়াছে, মধুকরের দলও তখন ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিবেই।

জাঁমুলের মা এই প্রাসাদে একাকিনী বাস করিতেন, দাস-দাসী প্রভৃতি সংখ্যায় বিস্তর থাকিলেও নিজে তিনি প্রত্যেক বিষয়টির উপর নিখুঁতভাবে দৃষ্টি রাখিতেন। শাসি-খড়খড়িতে জিনিষ-পত্রে যত্নের গুণে এতটুকু ধূলি পাওয়া যায় না—মেজের কার্পেটটি হইতে কড়িকাঠ অবধি ঝক্ ঝক্ করিতেছে;—যেন সদ্য কে সেগুলির সংস্কার করিয়া গিয়াছে। ভোর ছয়টা বাজিতেই উঠিয়া শয্যা ছাড়িয়া ঘর-দ্বার দেখা—দুপরে বাগান ক্ষেত প্রভৃতি পরিদর্শন এবং সন্ধ্যায় দীন-দরিদ্র প্রতিবেশীব গৃহে গৃহে ঘুরিয়া সকলের খবরাখবর লওয়া, এই প্রাচীনা নারীর নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল—এ নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটিত না। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, দেশের ক্ষুদ্র তৃণকণাটুকু অবধি এই স্নেহশীলা নারীর হস্তদুইটির মধুর স্পর্শলাভে বঞ্চিত হইত না। ছেলে আসিলে মা শুধু হাসিয়া বলিতেন, "এ কি সাদা হাতী আমায় পুষতে দিয়েছিস, বাবা? এ বয়সে কি আমার এত বড় বাড়ী রাখা পোষায়! তোরা কেউ আয়, থাক্ এখানে, সব দেখ্ শোন্।"

জাঁমুলে হাসিয়া বলিতেন, "আমার যে নানান্ কাজ মা—সহর ছেড়ে থাকবার জো নেই যে! নাহলে তোমায় ছেড়ে থাকি!" মা বলিতেন, "তবে চ, বাবা, আমাকেও সেখানে নিয়ে চল।' তোদের না দেখে

আমি একলাটি এখানে হাঁপিয়ে উঠি যে, বাবা।"

জাঁস্লে জবাব দিতেন, "কিন্তু তোমার যে যাবার জো নেই, মা। দাদার শরীর সহরে একেবারে ভালো থাকবে না। এ খোলা ফাঁকা জায়গায় দাদা ভালো থাকে। দাদা ত একলাটি থাকতে পারবে না এই শরীর নিয়ে। তুমি না হলে তাকে দেখবে কে!"

"সে কথা ঠিক" বলিয়া মা অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতে বসিতেন!

এই দাদা জাঁস্লের বড় ভাই, বংশের বড় ছেলে, মা-বাপের আশার দীপ, তাঁহাদের গর্ব্ব, তাঁহাদের গৌরব। কি না ছিল সে! কত আশা বুকে লইয়া এই কিশোর যুবককে তাঁহারা পারির সমাজে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় তাহারই কুশল মাগিয়া পিতামাতা স্বস্তি বোধ করিতেন—প্রাণের সমস্ত আদর সব ভালবাসা দিয়া এই আশার দীপটিকে তাঁহারা সাজাইয়া তুলিতেছিলেন, মনে আশা জাগিত, এই দীপটি যখন পূর্ণ তেজে জ্বলিয়া উঠিবে, তখন—! কিন্তু হায়, দশ বৎসর পরে পারি যখন সেই দীপটিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জীর্ণ দশায় মায়ের হাতে ফিরাইয়া পাঠাইল, তখন তাহার সে দীন মূর্ত্তি দেখিয়া মার প্রাণ,—বাপ নাই মরিয়া বাঁচিয়াছে—শিহরিয়া উঠিল। এ কি সেই ছেলে,—সাজাইয়া গুছাইয়া প্রাণের আশার আবেগে স্নান করাইয়া মানুষ করিবার জন্য যাহাকে তাঁহারা সহরে পাঠাইয়াছিলেন! হা অদৃষ্ট!

কিন্তু জাঁস্লে তখন টিউনিসে যথের টাকা পাইতে বসিয়াছে, সুতরাং সেবা-শুশ্রূষার ঘটায় দীপটিকে খাড়া করা গেল; কিন্তু দীপ একেবারে এমন অকেজো হইয়া গেল যে তাহাকে শুধু আদরের জিনিষ বলিয়া তুলিয়া রাখা চলে, তাহাতে কাজ চলে না। অগত্যা মার কোলেই মন-ভাঙ্গা প্রাণ-ভাঙ্গা ছেলে কোনমতে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। কিছুদিন পরে জাঁস্লে পারিতে ফিরিল। মার বড় সাধ, দুটি ছেলেকেই কোলের কাছে রাখিয়া জীবনের শেষে কয়টা দিন কাটাইয়া দেন! কিন্তু দৈব বিরোধী,—তাঁহার সে সাধ পূরিবে কি করিয়া! প্রথম জীবনটা শুধুই হা অর্থ হা অর্থ করিয়া কাটিয়া গিয়াছে—অর্থ-পিপাসা কোনদিনই তৃপ্ত হইতে পারে নাই—আজ যদি দৈববশে জাঁস্লের চেষ্টায় সে পিপাসা মিটিল ত স্নেহের ক্ষুধা সর্ব্বনাশীরূপে জাগিয়া উঠিয়াছে যে! সে ক্ষুধার নিবৃত্তি করে কে? জাঁস্লে? কিন্তু পারিতে তাহার অনেক কাজ। সে টাকা লইয়া খুসী নহে—সে মান চায়, যশ চায়, দশজনের একজন হইতে চায়—মানুষের মত মানুষ হইতে চায়! আহা, তাই হোক। অন্ধ স্নেহে ছেলের এ সাধে মা হইয়া বাধা দেওয়া উচিত নহে!

একদিন সন্ধ্যায় জাঁস্লে হঠাৎ সাঁতে রুমায় আসিয়া উপস্থিত হইল—সঙ্গে অসংখ্য বন্ধু; কেহ কাউণ্ট, কেহ মার্কুইস, কেহ আর কিছু; সকলেই সম্ভ্রান্ত। দুইখানা ব্রেকে করিয়া মালপত্র আসিয়া ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্ম জুড়িয়া দিল। জাঁস্লের মা এই বন্ধু-সমারোহ দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন।

ব্যাপার এই—টিউনিসের বে'কে সম্প্রতি নবাব নগদ দেড়কোটি মুদ্রা ধার দিয়াছিলেন। হেমারলিঙের উচিত শিক্ষা হইয়াছিল—তাহারাই পিতাপুত্রে মিলিয়া নবাবের নামে বে'র কানে লাগাইয়া লাগাইয়া ইদানীং তাঁহার বিরুদ্ধে বেকে এমনই উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল যে, নবাবের প্রতিপত্তি একেবারে ডুবিতে বসিয়াছিল। নবাব তাই বে'কে এই অজস্র টাকা ধার দিয়া কৃতার্থ বোধ করিলেন। কর্ণেল ব্রেহিমই এই ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বে কৃতজ্ঞ চিত্তে নবাবকে ধন্যবাদ ত দিলেনই, উপরন্তু স্বহস্তে নবাবকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, শীঘ্রই তিনি ফ্রান্সে বেড়াইতে আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন; সেই সময় সাঁতে রুমায় নবাবের প্রসিদ্ধ প্রাসাদে দুই চারিদিন বাস করিয়া নবাবকে সম্মানিত করিবেন। নবাব এ সংবাদে এমন আনন্দোৎফুল্ল হইলেন যে, যে পিয়ন এ সংবাদ আনিয়াছিল তাহাকে মুঠি ভরিয়া অর্থদান করিলেন। ওদিকে হেমারলিঙের দল এ সংবাদে একেবারে মুষড়াইয়া পড়িল। তাহাদের এত চক্রান্ত এমনভাবে নিষ্ফল হইল!

ইহার পর নবাব সংবাদ পাইলেন, বে ফ্রান্সে আসিতেছেন। তিনিও উদ্যোগ আয়োজনের জন্য দ্রুত সাঁতে রুমায় আসিলেন। সম্ভ্রান্ত বন্ধুবর্গকে মার কাছে পরিচিত করিয়া দিয়া নবাব কহিলেন, "মা, বে ত চারদিন এখানে থাকবেন। বাড়ী-ঘরের অবস্থা কেমন?"

মা বলিলেন, "সে আর তোকে কিছু দেখতে হবে না রে—তোর বুড়ো মার দেহে যে ক'দিন হাড় ক'খানা আছে, নিজের চোখে সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারটি অবধি সে ইাটকে দেখে বেড়ায়।"

নবাব কহিলেন, "বেশ! তার পর আমরা কি আয়োজন করছি জানো মা—নাচ গান, থিয়েটার, সার্কাস, ষাঁড়ের লড়াই, বাজী—এ-দেশী মেয়েদের নাচ! ক'দিন আর দেশে আমোদ-আহ্লাদ জুড়োতে দেব না। তার জন্য ব্যবস্থারও চূড়ান্ত করেছি। পারি থেকে বাছা-বাছা অভিনেতা অভিনেত্রী, বাছা-বাছা গাহিয়ে-নাচিয়ে কুস্তিবাজ সব আনাচ্ছি। তার পব ফুলের মালায় লতায় পাতায় সারা গাঁ একেবারে মুড়ে দেব। এমন করব যা কেউ কখনও চক্ষে দেখেনি, একটা কীর্ত্তি রাখব। এতে যত টাকা লাগে—"

বন্ধুগণ সকলেই সোৎসাহে নবাবের কথায় সায় দিয়া গেলেন। মা এই এত মার্কুইস-কাউন্টের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়াই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন পুত্রের মুখে ভাবী উৎসবের আয়োজন-কল্পনার বিবরণ শুনিয়া আনন্দে তাঁহার দুই চক্ষে অশ্রুর বিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

রাত্রে ভোজনাদির পর দে গেরি আসিয়া জাঁসুলের মাতার কাছে গল্প করিতে বসিল। গ্রামের কথা, অতীতের কথা, জাঁসুলের ছেলেগুলির কথা। বিচিত্র কাহিনী-গুলি মায়া-স্বপ্নের মতই উভয়ের চোখের সম্মুখে তরুণ সজীবতায় জাগিয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময়ে বাহিরে ভারী জুতার শব্দ শুনা গেল। জাঁসুলে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গেরি চলিয়া যাইবার জন্য

উঠিয়া দাঁড়াইল। ঝাঁম্‌লে কহিলেন, "না না, পল, বসো। তুমি ঘরের ছেলে, তোমায় উঠে যেতে হবে না।" পরে "মা—"বলিয়া মার কোল ঘেঁষিয়া কার্পেট-পাতা মেঝের উপর তিনি আপনার দীর্ঘ দেহ ছড়াইয়া বসিয়া পড়িলেন। মা বলিলেন, "ও কি! আহা, ভুঁয়ে কেন? উঠে এই চেয়ারটায় বোস্।" ঝাঁম্‌লে কহিলেন, "না, মা, তোমার কোল, তোমার পা যে ও চেয়ারের চেয়েও আমার আরামের জায়গা।"

মা তথাপি সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, "না, না, ছি! এখন কি তুই আর তেমনিটি আছিস্! কত মান,—"

মায়ের কথায় বাধা দিয়া হাসিয়া ঝাঁম্‌লে কহিলেন, "বাইরে যাই হোক্ মা, তোমার কাছে আমি তোমার সেই ঝাঁম্‌লে। তোমার কাছে আমার জমক নেই, মান নেই—সেই ছেলেবেলাকার ছোট্ট ঝাঁম্‌লে আমি। তুমি যদি জানতে মা—বাইরের এই ঝাঁক-জমকে এতটুকু আমি সুখ পাই না, আমার সমস্ত আরাম, সমস্ত সুখ তোমার এই কোলে—"বলিয়া কুকুর যেমন প্রভুর পায়ে আপনার মুখ লুটাইয়া দেয়, তেমনি ভাবে ঝাঁম্‌লে মার দুই পায়ে আপনার মাথা রাখিয়া মুখ ঘষিয়া এক অপূর্ব্ব আরাম অনুভব করিলেন।

ঝাঁম্‌লের দীর্ঘ কেশের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে মা বলিলেন, "হাঁরে, ছেলেদের সঙ্গে আনলি না, কেন? তারাও দেখত শুনত।"

ঝাঁম্‌লে কহিলেন, "তারা যে পড়ছে-শুনছে। স্কুল কামাই করা কি ঠিক হত? তার চেয়ে এই সামনেই তাদের ছুটি আসছে, লম্বা দু মাস ছুটি। সেই সময় তাদের এখানে পাঠিয়ে দেব'খন। দুমাস তোমার কাছে থেকে যাবে। তোমার কাছে গল্প শুনতে শুনতে, তোমার কোলের কাছে মাথা রেখে ঘুমে ঢুলে পড়বে--ভারী আয়েসে থাকবে তারা।"

পরদিন ভোর হইতেই এক বিরাট সমারোহের আভাস পাওয়া গেল। ট্রেনে চড়িয়া সহর হইতে থিয়েটারের দল, বাইয়ের দল, খেলোয়াড়-কুস্তিবাজের দল ভিড় করিয়া সাঁতে রুমায় আসিয়া জমিতে লাগিল। গ্রামের লোক এই সকল বিচিত্র বেশধারী অপরূপ নর-নারীর ঘটা দেখিয়া কাজ-কর্ম্ম ভুলিয়া গেল। এখানে মঞ্চ তৈয়ার হইতেছে, ওখানে কাঠের খুঁটি পুঁতিয়া তাহাতে লাল-নীল রঙের শালু জড়াইয়া অপূর্ব্ব বাহার করা হইতেছে, সেখানে মাটি কুপাইয়া জঙ্গল কাটিয়া ক্রীড়া-ভূমি রচিত হইতেছে! কোথাও বাদ্যকরের দল বাজনার কেরামতি সুরু করিয়াছে, কোথাও নাচের মহলা চলিতেছে, আবার কোথাও বা কুস্তিগীর মুঠি করিয়া প্রকাণ্ড বৃষের শৃঙ্গ ধরিয়া তাল ঠুকিবার উদ্যোগ করিতেছে। চারিদিকেই কলরব, চারি-দিকেই হাঁক-ডাক, চারিদিকেই ব্যস্ত অধীর লোকজন চলা-ফেরা করিতেছে। এমন কাণ্ড, চোখে দেখা দূরের কথা, কস্মিন্ কালে কোন দেশে যে ঘটিতে পারে, গ্রামের লোক স্বপ্নেও তাহা কোনদিন কল্পনা করিবার সুযোগ পায় নাই।

অবশেষে সম্ভাবিত দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত গ্রাম একখানি প্রকাণ্ড উৎসব-ভবনের মতই সজ্জিত সুন্দর রূপে ভরিয়া উঠিল। যেন কোন সুন্দরী নায়িকা অপরূপ বেশে সাজিয়া নায়কের প্রতীক্ষা করিতেছে! পথের মোড়ে মোড়ে বিচিত্র তোরণ। তোরণের সম্মুখে অভিনব পট-মণ্ডপে নানা সুরে বাদ্য বাজিতেছে। পথের দুইধারে রঙিন্ থামে পাতার ঝালর, ফুলের ঝাড়, নিশানের' ঘটা। সালু-মোড়া রাস্তা। দেশের দারিদ্র্য যেন নবাবের ঐশ্বর্য্যে ঢাকা পড়িয়াছে! এ যেন স্বর্গের এক কোণ ছিঁড়িয়া আনিয়া মলিন মর্ত্ত্যে নিপুণভাবে কে আঁটিয়া দিয়াছে! সে কোণটুকু মর্ত্ত্যের গায়ে বেমালুম বসিয়াছে—কোথাও এতটুকু জোড় দেখা যায় না।

অপরাহ্ন তিনটার সময় নবাবের মর্ম্মর প্রাসাদ হইতে আট ঘোড়ার প্রকাণ্ড গাড়ী ষ্টেশনাভিমুখে চলিল, পশ্চাতে অসংখ্য গাড়ীর শ্রেণী—সবগুলিই সুন্দর, ঘোড়াগুলা ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তিমান দম্ভের মতই ছুটিয়া চলিয়াছে! চারিদিকে বাদ্য বাজিল, চারিদিকে জয়োল্লাস উঠিল, "জয় বে'র জয়!"

গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনের ফটকে ঢুকিল। ষ্টেশনটি ছোট—তবু নবাবের ঐশ্বর্য্য তাহাকে রমণীয় বেশে অপূর্ব্ব ছাঁদে সাজাইয়া তুলিয়াছিল। প্ল্যাটফর্ম্মের কঠিন দেহ কার্পেটে মণ্ডিত; দেওয়ালে ফুলের মালা চক্রাকারে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে—বিচিত্র বর্ণের পতাকায় চারিধার ভূষিত। নবাব প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। উত্তেজনায় তাঁহার সারা অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করিতেছিল। ষ্টেশনের ঘরে ইলেকৃট্রিক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। উৎকৃষ্ট বেশে সজ্জিত ষ্টেশন-মাষ্টার আসিয়া বলিলেন, "সিগন্যাল দেওয়া হয়েছে। আর আট মিনিট পরে ট্রেন এসে পৌঁছুবে।" জোয়ারের প্রথম টানে নদীর জলে যেমন একটা স্ফীতির সঞ্চার হয়, উপস্থিত সম্ভ্রান্ত জন-সঙ্ঘে তেমনই একটা চাঞ্চল্য ফুটিল। সকলেই ঝুঁকিয়া লাইনের দক্ষিণে চাহিয়া দেখিল। দীর্ঘ রেলওয়ে লাইন গিয়া দূরে ঐ একটা পাহাড়ের গায়ে মিশিয়াছে, সেখানে বাঁক। দেখিলে মনে হয়, পাহাড়টা যেন রেলওয়ে লাইনকে হাঁ করিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছে। দলের একজন কহিয়া উঠিল, "আর ছ মিনিট—" আবার সকলে সেই পাহাড়ের দিকে চাহিয়া দেখিল—ও কি! পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া গাঢ় কালো কালির মত কি ও আকাশটাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে! কালিটা ক্রমে আকাশের সমস্ত তরল নীল রঙটুকুকেও ঢাকিয়া দিতেছে! ও যে মেঘ! দৈত্যের মত বেগে সে ছুটিয়া চলিয়াছে—এখনই যেন সারা বিশ্বে কি একটা প্রলয় হানিবে! নবাবের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! অধীর আগ্রহে পুনঃপুনঃ তিনি ঐ পাহাড়ের কোলে লাইন গিয়া যেথানে মিশিয়াছে—সেই দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময় দূরে একটা বংশী-ধ্বনি শুনা গেল। সকলে সৌৎসুক্যে সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল—ঐ যে দূরে কৃষ্ণ বিন্দুর

করিয়াই যেন নবাবকে অবজ্ঞা করিতেছে, অপমান করিতেছে! নবাবের ইচ্ছা হইল, নামিয়া গিয়া সকলকে আগাগোড়া চাব্‌কাইয়া দেন—বেয়াদবির চূড়ান্ত শাস্তি হয়!

গৃহে ফিরিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া নবাব আদেশ দিলেন, "এখনই এ সমস্ত সাজসজ্জা ছিঁড়ে ভেঙ্গে নষ্ট করে ফেলো —এখনই—এখনই।"

সকলে অবাক হইয়া নবাবের মুখের পানে চাহিল। নবাব তাহা লক্ষ্য না করিয়া আপনার কক্ষে চলিয়া গেলেন।

* * *

রাত্রি গভীর। দিনের বিরাট উত্তেজনা ও নৈরাশ্যের অবসরে সাঁতে রুমার প্রাসাদে সমস্ত জনপ্রাণী নিদ্রা যাইতেছে। বাহিরে অবিশ্রাম ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। শুধু আলোকোজ্জ্বল শয়ন-কক্ষে নবাব বসিয়া আছেন—মাথায় তাঁহার দুশ্চিন্তার রাশি। এই যে ত্রিশ হাজার লোকের সম্মুখে আজ দারুণ অপমানটা ঘটিয়া গেল—শত্রু হেমারলিঙের ষড়যন্ত্রে বে কথা দিয়াও তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিল না—ভাবনা ইহা লইয়া নহে। এই সকলের পিছনে অন্ধকারময় এক ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াই তিনি আকুল হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি টিউনিসে—বাড়ী, কারবার, জাহাজ—সমস্তই এখন বে'র করুণার আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া আছে—আইন-কানুনহীন, কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত এক দর্পিত বর্ব্বরের কবলে! নবাব তাই ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিতেছিলেন, কোনদিকেই কূল পাইতেছিলেন না।

সহসা দ্বারে কে করাঘাত করিল। নবাব কহিলেন, "কে?"

ভৃত্য নিল্ কহিল, "আমি। একটা টেলিগ্রাম এসেছে।"

"ভিতরে এসো।"

ভৃত্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া নবাবের হাতে একখানা নীল খাম দিল। নবাব কম্পিত হস্তে মোড়ক ছিঁড়িয়া টেলিগ্রাম বাহির করিলেন, আলোর সম্মুখে ধরিলেন, এ কি! মোরা! মোরা টেলিগ্রাম করিয়াছে! ডিউক মোরা! কি—কি—কি খবর!

নবাব স্পষ্ট পড়িলেন, "পোপোলাস্কা মারা গিয়াছে। কর্সিকায় শীঘ্র সদস্য নির্ব্বাচন। অফিস হইতে আপনার নাম গিয়াছে।"

সদস্য! অর্থাৎ কর্সিকার ডেপুটি! তাহার অর্থ—মুক্তি—মুক্তি মুক্তি! ভয় হইতে মুক্তি, নৈরাশ্য হইতে মুক্তি, সমস্ত ষড়যন্ত্র হইতে মুক্তি! ডেপুটি হইলে আর ভয় নাই,—বিষয় রক্ষা পাইবে—সব রক্ষা পাইবে! বে'র সাধ্য নাই, নবাবের সম্পত্তি গ্রাস করে—উড়াইয়া দেয়! লক্ষ হেমার-লিঙ্ বিপক্ষে দাঁড়াইলেও কর্সিকার ডেপুটির সম্পত্তিতে হাত দিবার ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না। "ডিউক—ডিউক—" বলিয়া আনন্দের আতিশয্যে নবাব টেলিগ্রামখানা বুকে চাপিয়া ধরিলেন, পরে কহিলেন, "এ টেলিগ্রাম কে নিয়ে এল? কোথায় সে পিয়ন?"

ভৃত্য কহিল, "ঘরের বাইরেই সে দাঁড়িয়ে আছে—একটা সই দিতে হবে।"

নবাব কহিলেন, "তাকে এখানে আনো—"

পিয়ন আসিলে নবাব কহিলেন, "তুমি এই টেলিগ্রাম এনেছ ?"

পিয়ন অভিবাদন করিয়া কহিল, "হাঁ, হুজুর।"

রসিদ সহি করিয়া পিয়নের হাতে তাহা দিলে সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। নবাব কহিলেন, "দাঁড়াও।" পিয়ন দাঁড়াইল। তারপর নবাব আপনার বড় জামার পকেটে হাত ঢুকাইয়া মুঠি ভরিয়া স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিলেন,—যত ধরে! পরে পিয়নের হাতে তাহা ঢালিয়া দিয়া নবাব কহিলেন, "তোমার বখশিস্—বখশিস্—যাও, নিয়ে যাও—"

পিয়ন নবাবের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। রূপকথার নায়কের মতই সহসা অপ্রত্যাশিত-ভাবে এতটা বিপুল ঐশ্বর্য্য পাইয়া আনন্দের আবেগে সে যেন মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িতেছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আর্য্যদিগের বিচ্ছেদস্থানের নির্দ্দেশ

আর্য্যগণ মধ্য আসিয়াতে আসিয়াই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হন, পুরাতত্ত্বের এই সিদ্ধান্তের সহিত অনেকেই সুপরিচিত। কিন্তু মধ্য আসিয়ার ঠিক্ কোন্ স্থানে সেই বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হয়—তাহা বোধ হয় সকলের নিকট সুবিদিত নহে। আমরা পুরাতত্ত্বের সেই সন্ধান প্রদান করিবার জন্যই উপস্থিত প্রবন্ধের প্রবর্ত্তন করিতেছি।

মধ্য আসিয়াতে পুরাকালে সুগ্‌ডিয়ানা নামক একটী প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা আর্য্যদিগের প্রথম উপনিবেশ ও অগ্ন্যুপাসকদিগের আদিনিবাসরূপে প্রসিদ্ধ। এই সুগ্‌ডিয়ানার আদিরূপ 'সুখ্‌দা'। ইহা 'সুখদ' শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। আর্য্যগণ এস্থানে সুখে বাস করিতেন বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ পারসীকদিগের 'বেণ্ডিডাড্' নামক গ্রন্থে ইহা স্বর্গস্থানরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু স্বর্গস্থান হইলেও এখানে আর্য্যদিগের বহুকাল অবস্থান ঘটে নাই—ঘটনাক্রমে তাঁহাদিগকে এখান হইতেই বিভিন্নদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে হয়। 'ভারতকল্পদ্রুম' (Cyclopedia of India) নামক গ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়ঃ—

"According to Bunsen (III p 584) the separatin of the Aryans was prior to their leaving Sogd. Sogdiana in Samarcand formed the first settlement of the Aryans. Sughda, afterwards spelled Sugdia and commonly Sugdiana is pre-eminently the country, as being the home of the fire-worshippers. It is described in the Vendidad as in 38th. degree of latitude,

where Marakanda (Samarcand) is situated, a paradisiacal land„ fertilized by the Sogd, so that Sodga and Paradise are used synonymonsly by the later writers" Cyclopaedia of India by Balfour.

"বান্‌সেনের মতে সুগড্ পরিত্যাগের পূর্ব্বেই আর্য্যদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হয়। সমরকণ্ডের সুগ ডিয়ানাই আর্য্যদিগের প্রথম অধিষ্ঠানরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। সুখড্ পরে সুগডিয়া রূপে লিখিত এবং সাধারণতঃ সুগ্‌ডিয়ানা রূপে খ্যাত হয়। ইহা বিশেষভাবে অগ্নিপূজকদিগের আদিস্থান। বেণ্ডিডাডে ইহা ৩৮ ডিগ্রি অক্ষাংশে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তথায় মরকণ্ড বা সমরকণ্ড অবস্থিত। সুগড্ দ্বারা ইহার উর্ব্বরতা সম্পাদিত হওয়াতে ইহা স্বর্গীয় স্থান হইয়াছে। তাহাতে পরবর্ত্তী লেখকগণ কর্ত্তৃক সুগ্‌ড ও স্বর্গ একার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।"

উপরে আমরা যে মরকণ্ড বা সমরকণ্ড সুগ্‌ডিয়ানার অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ পাই-য়াছি; তাহাতেই আর্য্যদিগের বিচ্ছেদের ইতিহাস সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই 'সমরকণ্ড' 'সমরখণ্ড' নামেরই স্পষ্ট অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। 'খণ্ড' শব্দ 'ভূখণ্ড' শব্দেরই সঙ্ক্ষেপমাত্র। সুতরাং 'সমরখণ্ড', নাম 'সমরের স্থান' অর্থই প্রকাশ করে। আর্য্যগণের পরস্পরের মধ্যে কলহমূলে এখানে সমর বা যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে অনেকে আহত হইয়া মৃত হয় তাহা হইতেই এই স্থানের নাম সমরখণ্ড হইয়াছে এই নামের মধ্যে এই ইতিহাসই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সুতরাং এই নাম হইতে আর্য্যগণের মধ্যে ঘোর আত্মকলহ উপস্থিত হইয়া তাহা যুদ্ধে পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত হইয়াই যে তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদের সূত্রপাত করে তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

সমরকণ্ড এখনও নিজ নামেই বর্ত্তমান রহিয়াছে সুতরাং ইহার অবস্থান দ্বারাই সুগ্‌ডিয়ানার অবস্থান আমরা অনায়াসেই অনুমান করিয়া লইতে পারি। সমরকণ্ড, হিন্দুকুশের উত্তর ও টায়েন্‌শান পর্ব্বতের পশ্চিম। ইহাতে সুগ্‌ডিয়ানাও, এতন্মধ্যবর্ত্তী প্রদেশই হয়। সুগ্‌ডিয়ানা সুখ বা সুখদ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া আমরা উপরে বলিয়াছি। আমাদের পুরাণেও, আমরা এই নামের সন্ধান প্রাপ্ত হই। মৎস্য পুরাণে যেমন 'সুখোদয়' নামক বর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়—তেমনই 'সুখ' নামক ভূভাগেরও উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—

নারদস্য চ কৌমারং তদেবচ সুখোদয়ম্ ॥ ২২
এতে শান্তভয়াঃ প্রোক্তাঃ প্রমোদা যেচবৈশিবাঃ ॥
আনন্দাশ্চ সুখাশ্চৈব ক্ষেমকাশ্চ নবৈঃ সহ।
বর্ণাশ্রমচারযুতা দেশাস্তে সপ্তবিশ্রুতাঃ ॥"

৩৮—১২২শ অধ্যায়।

"নারদগিরির বর্ষের নাম কৌমার। ইহার অপর নাম সুখোদয়"। ৩১ "শান্তভয়, প্রমোদ, শিব, আনন্দ, সুখ, ক্ষেমক এই সাতটী বর্ণাশ্রমাচার সমন্বিত বিখ্যাত জনপদ তথায় বর্ত্তমান।"

'সুখোদয়' ও 'সুখ' উভয়ই শাকদ্বীপের অন্তর্ভূ‌ক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মধ্য আসিয়া হইতে পশ্চিমে শাকদ্বীপ প্রসারিত ছিল বলিয়া অনুমান করার যথেষ্ট কারণই বিদ্যমান আছে। সুতরাং পুরাণের 'সুখ' ও 'সুখোদয়' যে মধ্য আসিয়ায় সুগ্‌ডিয়ানারই সহিত অভিন্ন হইতে পারে তাহা মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না। পুরাণে 'সুখের' সঙ্গে অপর যে সমস্ত জনপদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে—তৎসমস্তের মধ্যে অপূর্ব্ব

স্বর্গীয়ভাবই প্রকটিত। ‘নব’ নামে যেন নূতনাধিষ্ঠানেরই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই নবাধিষ্ঠানেরই সহিত একত্র উক্ত হওয়ায় ‘সুখ’ও যে নবাধিষ্ঠান তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ইহাতে সুগ্‌ডিয়ানা যে পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের দ্বারা প্রথম আর্য্যাধিষ্ঠান বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে তাহারই সমর্থন পাওয়া যায়। সুগ্‌ডিয়ানার পূর্ব্বাবস্থিত “টিয়েন্‌সান্‌” নামক যে পর্ব্বত আছে ইহার অর্থ স্বর্গীয় পর্ব্বত। ইহাতে সুগ্‌ডিয়ানা যে পারসীকধর্ম্মগ্রন্থে স্বর্গীয় স্থানরূপে কল্পিত হইয়াছে তাহার বিশেষ পোষকতাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রকারে পুরাতত্ত্ব ও পুরাণ উভয় প্রমাণের দ্বারাই আর্য্যদিগের প্রথমোপনিবেশের স্থানরূপে পরম সুখের আধার বলিয়া যে তাহা সুখ, সুখোদয় বা সুগ্‌ডিয়ানা নামে অভিহিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহার রাজধানীর সমরকণ্ড নামে সেই সুখের স্থান সমরক্ষেত্রে পরিণত হইয়াই যে আর্য্যদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে সুখ ও শান্তির অন্বেষণে প্রেরণ করে—তাহারই ইতিহাস যেন লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

“জোন্ অফ্ আর্কের” চরিত্রের একদিক

(ইংরাজী হইতে)

“ঐ যে দেখিলাম, একটি লোক ওখানে হাত পা বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছে ও কে?”—এই কথা জোন্ তাঁহার একজন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

“একজন বন্দী।”

“তাহার অপরাধ?”

“সামরিক বিধি লঙ্ঘন করিয়া সে আমার বিনা অনুমতিতেই সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।”

“এখন ইহাকে কি শাস্তি দিতে চাও?”

“মৃত্যু!”

“আমি উহার সব কথা শুনিতে চাই। ও একজন সুনিপুণ যোদ্ধা সন্দেহ নাই!”

“ও আমার নিকট কয়েক দিনের ছুটি প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু আমি তখন তাহাতে সম্মত হইতে পারি নাই—; এজন্য সে আমার বিনা অনুমতিতেই সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রস্থান করে। ইতিমধ্যে আমরা যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইয়া পড়ি এবং গতকল্য মাত্র সন্ধ্যার সময় সে আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে।”

“সে কি নিজের ইচ্ছায় ফিরিয়া আসিয়াছে।”

“হাঁ।”

“যাও, তাহাকে শীঘ্র আমার সম্মুখে উপস্থিত কর।”

মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁহার কর্ম্মচারী অশ্বারোহণে বন্দীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহার

পদদ্বয়ের দৃঢ় বন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক তাহাকে জোনের সম্মুখে লইয়া আসিলেন।

কি সুগঠিত চেহারা! পূরা সাত ফুট। সৈন্য হইবার উপযুক্ত বটে। সুদৃঢ় মুখাবয়ব। এক গুচ্ছ, ঘন স্বর্ণবর্ণ অমার্জ্জিত, কেশরাশি বিপুল মস্তককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অস্ত্রের মধ্যে এক গাছি বৃহৎ কাটারী তাহার চর্ম্মবন্ধনীতে বিলম্বিত। কিন্তু তাহার শোকাবনত বদন খানি তাহার জীবনের হতাশার ইঙ্গিত করিতেছে। যেন তাহার জীবনের সমস্ত সুখ সাধ, আশা, ভরসা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত। জোন্ তাহাকে ধীর, মৃদুস্বরে —কহিলেন, "তোমার হাত তোল।" এতক্ষণ সে তাহার মুখ নীচু করিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়াছিল; হঠাৎ সে এইরূপ স্নেহপূর্ণ, মধুর, কোমল স্বর শুনিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে হাত দু'খানি উচু করিয়া ধরিল। ধীরে ধীরে জোন্ খাপ হইতে নিজের তরবারী খানি লইয়া তাহার হস্ত বন্ধন স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার পার্শ্বস্থিত সেই কর্ম্মচারী কিছু ব্যগ্র ভাবে বলিয়া উঠিলেন।

"আঃ মহাশয়া!"

"কি, তুমি কি বলিতেছ?"

"ও যে বন্দী।"

গম্ভীর ভাবে জোন্ উত্তর করিলেন

"হাঁ, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি উহার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী—কর্ম্মচারী।" এই বলিয়া তিনি তাহার হস্তের বন্ধন রজ্জু কাটিয়া দিলেন। এবং কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বলিয়া উঠিলেন "ওঃ কি ভীষণ! রক্ত—রক্ত!! অসহ্য অসহ্য! আমি তাহা আর দেখিতে ইচ্ছা করি না।" আবার কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন "আচ্ছা, উহার হাত বাঁধিবার জন্য আমাকে একখণ্ড দড়ি দাও।"

প্রত্যুত্তরে সেই কর্ম্মচারী কহিলেন, "একার্য্য সেনাপতি পদের উপযুক্ত নহে। আমি ইহার জন্য অপর লোককে নিযুক্ত করিতেছি।"

"অপর লোককে? একার্য্য আমার অপেক্ষা সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারে—এমন লোককে অন্বেষণ করিতে তোমার বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে। আর যে ইহাকে বাঁধিয়াছে তাহার অপেক্ষা আমি সহস্র গুণে ভাল বাঁধিতে পারি। আমি যদি বাঁধিতাম তাহা হইলে ইহার হাতের মাংস রজ্জু দ্বারা এরূপ নির্দ্দয় ভাবে কাটিত না।"

যতক্ষণ জোন্ তাহার হাত দু'খানি বাঁধিয়া দিতেছিলেন সে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার মুখের দিকে এক একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল।

জোন্ এই কার্য্য করিতে পারিয়া মনে মনে বিশেষ প্রীতা হইলেন এবং সেই সৈনিকের প্রতি চাহিয়া কহিলেন "এখন যথার্থ বল, সৈনিক, তুমি কি করিয়াছিলে?"

ধীর, নম্রস্বরে সে কহিল "তবে বলি শুনুন, আজ দুই বৎসর গত হইল আমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এই দুই বৎসরের মধ্যে ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া আমার অতি আদরের তিনটি সন্তান তাঁহার অনুগমন করিল। সে দুই বৎসর ভীষণ মন্বন্তর, ভগবানের ইচ্ছা কখনই

অপূর্ণ থাকে না; আমার চক্ষের সমক্ষে তাহারা চিরবিদায় গ্রহণ করিল। আমি নিজ হস্তে তাহাদিগকে সমাধিস্থ করিয়া পিতার শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিলাম। হায় হতভাগ্য আমি তবুও বাঁচিয়া রহিলাম। জগতে আপনার বলিতে কেবল একমাত্র স্নেহময়ী স্ত্রী জীবিত রহিল। অবশেষে নিষ্ঠুর কাল আসিয়া তাহাকেও আক্রমণ করিল। আমি অভাগিনীর মৃত্যু দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া অধ্যক্ষের নিকট কয়েক দিনের বিদায় চাহিলাম, কিন্তু তিনি নির্দ্দয় ভাবে হতভাগ্যের কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিলেন। বলুন তাহার মৃত্যুর সময় তাহাকে না দেখিয়া কি করিয়া থাকিতে পারি? হায়! সে যে আমাকে বড় ভাল বাসিত। আমি বিনা অনুমতিতেই অধ্যক্ষের অজ্ঞাতসারে গৃহপানে ছুটিলাম। তাহার মৃত্যু দেখিব বলিয়াই গিয়াছিলাম; তাহাই হইল। আমি তাহাকে সযত্নে সমাধিস্থ করিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, সৈন্যদল চলিয়া গিয়াছে। আমি প্রাণপণ শক্তিতে হাঁটিয়া গতকল্য রাত্রে এখানে পহুঁছিয়াছি।"

জোন্ মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে অনুচ্চস্বরে কহিলেন "ইহা সত্য বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। যদি সত্য হয় তাহা হইলে ক্ষমা করা যাইতে পারে; যদি মিথ্যা হয়—আর যদি সত্যই হয়।" হঠাৎ তিনি তাহার দিকে ফিরিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন,

"আমার দিকে চাও। আমি তোমার চোখ দেখিতে চাই!"

চারি চক্ষু একসঙ্গে মিলিবামাত্র জোন তাঁহার কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "আমি ইহাকে মুক্তি দিলাম, তুমি এখন নিজের কার্য্যে যাইতে পার।"

তাহার পর তিনি সেই সৈনিক পুরুষের প্রতি চাহিয়া কহিলেন "অধ্যক্ষের বিনা অনুমতিতে সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলে কঠোর সামরিক নিয়মানুসারে তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য তাহা কি তুমি জানিতে?"

"বিলক্ষণ জানিতাম।"

"তবে কেন আসিলে?"

"মরিবার জন্য। আমার জীবনে আর কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও সাধ নাই; আমার যথাসর্ব্বস্ব আমি বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি। তুচ্ছ আমার জীবন।"

এই বলিয়া সে অতি বিমর্ষ ভাবে মাথা নীচু করিয়া রহিল।

"ছিঃ তোমার মাতৃভূমি ফ্রান্স থাকিতে? তোমার প্রিয় জন্মভূমি এখনও শত্রুহস্তে মনে আছে? দীর্ঘজীবি হও। যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন ফ্রান্সের সেবা করিবে।"

"আমি আপনার সেবা করিব।"

"তুমি ফ্রান্সের জন্য যুদ্ধ করিবে।"

"আমি আপনার জন্য যুদ্ধ করিব।"

"তুমি ফ্রান্সের সৈন্য হইবে।"

"আমি আপনার সৈন্য হইব।"

"তুমি তোমার ফ্রান্সকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিবে।"

"আমি আমার মনঃপ্রাণ আপনার নিকট সমর্পণ করিব। আমার হৃদয় অন্তঃকরণ (যদি থাকে) আপনার পদে উৎসর্গ করিব।

আমার বলবিক্রম আপনার মঙ্গলের জন্ত প্রয়োগ করিব। আমার জীবনের কোনও সাধ ছিল না, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে আমার বাঁচিয়া থাকাই প্রয়োজন। আপনিই আমার মাতৃভুমি, আপনিই আমার ফ্রাঁস্—আপনিই আমার যথাসর্ব্বস্ব। আমি আর কাহাকেও চাহি না।"

জোন্ ঈষৎ হাস্ত করিলেন। তাঁহার প্রতি লোকটির এরূপ প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি বিস্মিতা ও অতিমাত্র পুলকিতা হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

"হাঁ, তোমার নামটি কি ?"

ধীর, গম্ভীর ভাবে সে বলিল "আমাকে ইহারা 'বামন' বলিয়া ডাকে; কিন্তু আমার বিশ্বাস ইহা বিদ্রূপবাক্য ভিন্ন আর কিছুই নয়।"

জোন্ আর হাস্ত সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি কি আমার দেহরক্ষক বা পার্শ্বচর হইতে ইচ্ছা কর ?"

"সে সৌভাগ্য কি আর আমার হইবে ?"

"অবশ্যই হইবে। আজ হইতে তুমি আমার দেহরক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলে এবং ইহার উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদাদিও তুমি অচিরে পাইবে।"

তৎপরে জোন্ অদূরে সজ্জিত যুদ্ধাশ্ব সমূহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন "তোমার মনোমত একটি অশ্ব বাছিয়া লইয়া যুদ্ধযাত্রার সময় আমার অনুগমন করিবে।"

শ্রীঅমলচন্দ্র দত্ত।

সমালোচনা

প্রাকৃতিকী। *

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-পাঠকের নিকট সুপরিচিত। নানা মাসিক পত্রিকায় ইঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া বঙ্গ ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। ইনি কতকগুলি প্রকাশিত ও কয়েকটী অপ্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গুচ্ছাকারে "প্রাকৃতিকী" নামে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে বত্রিশটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি খুব সরল ভাষায় লিখিত। বর্ত্তমান যুগে যে সকল জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্য বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াছে, এই পুস্তকে তাহার প্রাঞ্জল বর্ণনা কিয়ৎপরিমাণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

জড় বলিয়া কোন জিনিষই বিশ্বে নাই। জড়ের সূক্ষ্মতম কণা ভাঙ্গিয়া সূক্ষ্মতর অংশে ভাগ করিলে, অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাগুলি ইলেক্ট্রনের মূর্ত্তি গ্রহণ

* প্রাকৃতিকী—শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত; প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ; ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা; মূল্য ২৲ টাকা।

করে। ইলেক্ট্রনগুলি খাঁটি বিদ্যুতের কণিকা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই ব্রহ্মাণ্ড এক বিদ্যুতেরই রূপান্তর। জগতে জড় নাই, এক শক্তিকে লইয়াই বিশ্ব। ক্রুক্‌স্‌ সাহেব গত শতাব্দীর শেষে জড়ের এই যে শক্তি-মূর্ত্তি দেখিয়া ছিলেন; তাহা "বৈজ্ঞানিকের স্বপ্নে" প্রকটিত হইয়াছে।

বিপুল শক্তিরাশি খুব নিবিড়ভাবে রেডিয়মে লুক্কায়িত থাকে এবং রেডিয়ম নিজেকে ক্ষয় করিয়া যখন লঘুতর পদার্থে পরিণত হয়, তখন ঐ শক্তিই তাপের প্রকাশ করে। ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই এই প্রকার বিশাল শক্তি-স্তূপ সঞ্চিত আছে, এবং সেই সযত্ন-রক্ষিত শক্তিভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া প্রকৃতিদেবী জগতে ভাঙা গড়ার ভেল্কি দেখান। রেডিয়মের ন্যায় গুরু ধাতু যখন তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি ত্যাগ করিয়া লঘুতর বস্তুতে পরিণত হইতেছে, তখন লঘু পদার্থের উপর প্রচুর শক্তি প্রয়োগ করিয়া কেন তাহাকে গুরুতর পদার্থে পরিণত করা যাইবে না! এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করিতে পারিলে লৌহকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করা কঠিন হইবে না, ইহা "পরশ-পাথর" প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে।

"রাসায়নী বিদ্যার উন্নতি" "ধাতুর কয়েকটী গুণ;" "বর্ণচ্ছত্র," "নূতন বিশ্লেষণ-প্রথা," "অদৃশ্য—কিরণ," "ডপলার সাহেবের সিদ্ধান্ত," প্রভৃতি প্রবন্ধে পদার্থ বিদ্যা ও রসায়নের কতকগুলি তথ্য সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

"দধি," "চা-পান," "কেরোসিন তৈল" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে অতি সহজে দধি-ভোজন, ও চা-পানের উপকারিতা ও কেরোসিনের উৎপত্তির কথা বুঝানো হইয়াছে।

"মঙ্গলগ্রহ," "পৃথিবীর শৈশব," "নূতন নীহারিকাবাদ" প্রভৃতি প্রবন্ধে কতকগুলি জ্যোতিষের কথা আলোচিত হইয়াছে।

"মনুষ্য-সৃষ্টি," "জীবনটা কি?" প্রভৃতি প্রবন্ধে জীব-বিদ্যার কতক কথা লেখা হইয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের যতই প্রচার হয় ততই সুখের বিষয়। প্রকৃতির সহিত পরিচয় করিতে হইলে প্রকৃতি-দত্ত ভাষা অবলম্বন করা উচিত—মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক সত্য আলোচনা করার প্রয়োজন। মাতৃভাষার সহায়তা ব্যতীত জন-সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চ্চা হইতে পারে না—এবং তাহা না হইলে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কিছুরই উন্নতি সাধিত হয় না।

এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অধিকতর প্রচলিত হইলে, বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালী শুধু বাজে বই পড়িয়া বৃথা সময়-ক্ষেপ করিতেছে না, মস্তিষ্ক চালনা করিতেছে এবং জীবন-সংগ্রামের জন্যও সজ্জিত হইতেছে।

জীবন সংগ্রাম ক্রমশঃ আমাদিগের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই সংগ্রামে প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রকৃতি দেবীর অনন্ত শক্তি আমরা কি প্রকারে। আমাদের কাজে লাগাইতে পারি তাহা না জানিলে, আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আমাদের প্রকৃতির উপাসনা আবশ্যক। এমন এক সময় ছিল যখন এই স্বর্ণ-প্রসূ বাঙ্গলা দেশে জীবনে ঝঞ্ঝাবাত কম ছিল, যখন জীবন একটা সংগ্রাম বলিয়া বোধ হইত না। কিন্তু এখন জীবন একটী কঠোর সংগ্রাম। সেজন্য এক্ষণে আমাদের পক্ষে "গীত-গোবিন্দের" পরিবর্ত্তে "প্রাকৃতিকীর" মত গ্রন্থ পাঠ করা একান্তই প্রয়োজনীয় হইয়াছে। জগদানন্দ বাবু এ বিষয়ে পথ দেখাইয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু।
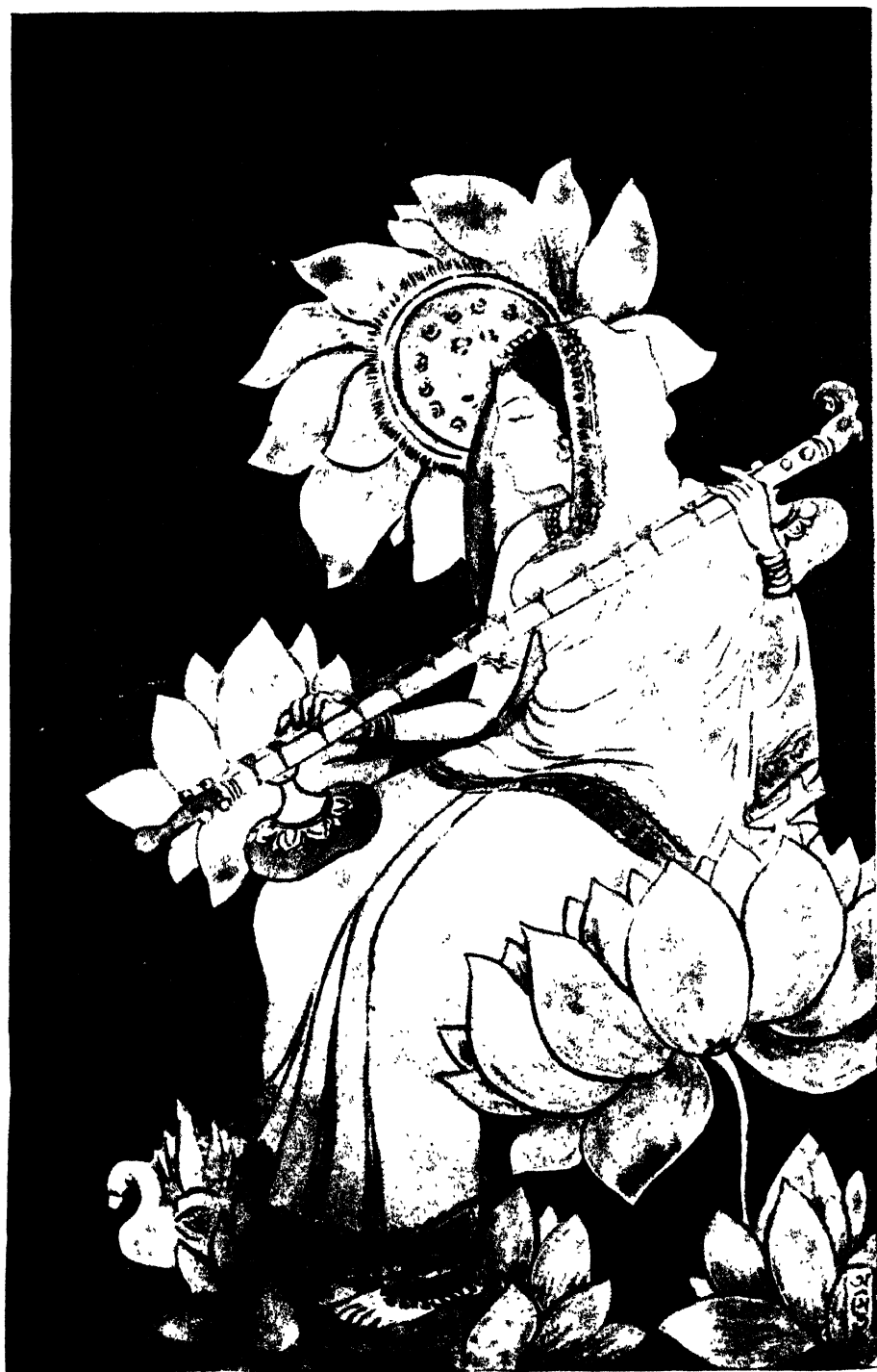
কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

৩৮শ বর্ষ] মাঘ, ১৩২১ [১০ম সংখ্যা

বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমর

বর্ত্তমান যুদ্ধের ব্যাপকতা ও সমস্যাবলী

বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমর আমাদের সকলেরই মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। বৈদেশিক ঘটনাবলীর উপর এতাদৃশ ঐকান্তিক মনোযোগ বোধ হয় আর কখনও লক্ষিত হয় নাই। বস্তুতঃ এই প্রবল চিত্তাকর্ষণ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই যুদ্ধ যেরূপ বৃহৎ ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বের কোনও যুদ্ধেই হয় নাই। প্রথমতঃ একদিকে জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়া অপরদিকে রুষিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, বেলজিয়াম ও সার্ভিয়া এই সাতটী রাজ্য এই সমরে লিপ্ত। আবার জাপানও ইংলণ্ডের মিত্রতাসূত্রে জর্ম্মণির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। সম্প্রতি তুরস্ক জর্ম্মণির স্বপক্ষ হইয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। সুতরাং এখন নয়টী রাজ্য যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও এই ভীষণ যুদ্ধস্রোত আরো কতদূর গড়াইবে কিছুই বলা যায় না। ইটালি আপাততঃ নিরপেক্ষতা (Neutrality) অবলম্বন করিলেও পরে কি করিবেন তাহা অনিশ্চিত। আবার বল্‌কান্ প্রদেশে রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়া কি করিবেন তাহাও এখনও অবধারিত হয় নাই। অপরদিকে আমরা দেখিতে পাই যে এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে এতগুলি রাজনৈতিক সমস্যার অবতারণা হইয়াছে যে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ইতিপূর্ব্বে কখনও একই ঘটনাসূত্রে এতগুলি রাজ্যের ও জাতির ভাগ্য পরীক্ষিত হয় নাই। আমাদের সমকালীন এই বিপুল বিপর্য্যয়ের কারণ অবধারণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

যুদ্ধের ইতিপূর্ব্ব ঘটনা সমূহ।

এই যুদ্ধের ইতিপূর্ব্ব ঘটনাসমূহ সকলেই অবগত আছেন। গত ২৮শে জুন অষ্ট্রীয়ার যুবরাজ ও তদীয় পত্নী বস্‌নীয়া প্রদেশের সেরাজোভো নগরে হত হন। তাঁহাদের হত্যাকারিগণ সার্ভজাতীয় এবং

তাহাদের চক্রান্ত সীমান্তবর্ত্তী স্বাধীন সার্ভিয়া দেশে সংঘটিত হয় বলিয়া সংবাদ আসে। পরে ২৪শে জুলাই অষ্ট্রীয়া সার্ভিয়াকে যে সর্ত্তপালন পত্র (ultimatum) লিখেন হয়। তাহার মর্ম্ম এই যে:,

সার্ভিয়া বহু কালাবধি অষ্ট্রীয়ার অধিকৃত বস্নীয়া ও হার্জগভিনা প্রদেশে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন এবং তজ্জন্য উক্ত দুই প্রদেশে অনেকবার শান্তিভঙ্গ এমন কি নরহত্যা পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়াছে। সম্প্রতি যুবরাজ ও যুবরাজপত্নীর হত্যা সার্ভিয়ারাজের কর্ম্মচারিগণের প্ররোচনায় ও সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এখন অষ্ট্রীয়া এই বিপদের নিরাকরণে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। সার্ভিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরোধী আপন প্রজাগণকে সমুচিত শাসন করিবেন, বিদ্যালয় সমূহে অষ্ট্রীয়ার প্রতি বিদ্বেষোদ্দীপক শিক্ষা নিবারণ করিবেন এবং স্বকীয় রাজ্যের ভিতর অষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীগণের তত্ত্বাবধানতা স্বীকার করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত স্বীয় গেজেটে সার্ভিয়া গবর্ণমেণ্টকে একটী ক্ষমাপত্র প্রকাশ করিতে হইবে। এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই সকল সর্ত্তে সন্তোষজনক উত্তর না আসিলে যুদ্ধারম্ভ হইবে।

ইহার উত্তরে সার্ভিয়া কতকগুলি দাবিতে সম্মত হন। কিন্তু অপরগুলিতে, বিশেষতঃ স্বরাজ্যে পররাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীগণের তত্ত্বাবধানতা, আপন স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তবে সার্ভিয়া অপর কাহারও মধ্যস্থতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু অষ্ট্রীয়া ইহাতে সম্মত না হইয়া সার্ভিয়ার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে রুষিয়া সার্ভিয়ার পক্ষ গ্রহণ করিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এবং জর্ম্মণি অষ্ট্রীয়ার স্বপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া রুষিয়া এবং তদীয় মিলিত রাজ্য ফ্রান্সকে আক্রমণ করিলেন। এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের যোগ দিবার কথা উঠে নাই। কিন্তু ফ্রান্স ইংলণ্ডের মিলিত রাজ্য (allied state) না হইলেও মিত্ররাজ্য (friendly state)। বিশেষতঃ জর্ম্মণি ফ্রান্সকে বিধ্বস্ত করিলে ইংলণ্ডের সমূহ বিপদ। তখন ইংলণ্ডের এ যুদ্ধে যোগদান যেন অবশ্যম্ভাবী হইল। এদিকে ফ্রান্সকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত জার্ম্মণি বেলজিয়াম রাজ্যের নিরপেক্ষতা উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সেনাবাহিনী ঐ পথে চালনা করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের এক সন্ধিসর্ত্তে ইংলণ্ড বেলজিয়ামের রক্ষক হইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সুতরাং জর্ম্মণির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ব্যতীত ইংলণ্ডের গত্যন্তর রহিল না।

এইরূপে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহার কিছুদিন পরেই একদিকে জাপান এবং সম্প্রতি অপরদিকে তুরস্ক যোগ দিয়াছেন।

কতকগুলি প্রশ্ন

স্থূলতঃ ঘটনাবলী এই। এখন সাময়িক ঘটনা হইতে মন অপসৃত করিয়া সেইগুলির নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধানে আমাদিগের যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। চিন্তা করিলেই কতকগুলি প্রশ্ন স্বভাবতঃ মনে উদিত হয়:—

১। বস্নীয়া ও হার্জগভিনার সহিত সার্ভিয়ার কি সম্পর্ক?

২। রুষিয়ার সহিত সার্ভিয়ার কি সম্বন্ধ ?

৩। জর্ম্মণি অষ্ট্রীয়ার সহায় কেন ?

৪। জর্ম্মণি ও রুষিয়ার বিবাদে ফ্রান্স কেন লিপ্ত ?

৫। ইংলণ্ড কেন রুষিয়া ও ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন ?

এখন একে একে এই প্রশ্নগুলির উত্তর আলোচনা করিতে হইবে।

(১)

সার্ভিয়া, বসনীয়া ও হার্জগভিনা

সার্ভিয়া বল্‌কান ভূভাগের একটী স্বাধীন রাজ্য। অষ্ট্রীয়া, মন্টিনিগ্রো, গ্রীস্ এবং বুলগেরিয়া এই চারি রাজ্য ইহার সীমান্তবর্ত্তী। সার্ভিয়ার প্রজাগণ সুবিখ্যাত স্ল্যাভ জাতির বংশধর এবং সার্ভো-ক্রোট্ নামক শাখায় নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু সার্ভিয়ার বর্ত্তমান সীমানার ভিতর সমগ্র সার্ভো-ক্রোট্ জাতির সমাবেশ হয় নাই। সমগ্র সার্ভো-ক্রোট্ জাতি সংখ্যায় ৮০ লক্ষ হইবে। তাহাদের মধ্যে প্রায় ৩৫ লক্ষের স্বাধীন সার্ভিয়ার ভিতর স্থান হইয়াছে। অবশিষ্ট সার্ভো-ক্রোট্ জাতি অষ্ট্রীয়াধিকৃত বসনীয়া, হার্জগভিনা, ড্যালমেটিয়া, ক্রোটিয়া স্লাভেনিয়া এই কয়টী প্রদেশের অধিবাসী। সুতরাং ইহারা অষ্ট্রীয়ার প্রজা। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রবল সমজাতীয়তা ভাবের উন্মেষ হওয়ায় এখন আর ইহারা অষ্ট্রীয়ার প্রজা থাকিয়া সন্তুষ্ট নয়। এ দিকে উহাদিগকে তাহাদিগের স্বজাতীয় স্বাধীন সার্ভিয়াবাসী সর্ব্বদাই উৎসাহিত করিতেছে। ফলে সার্ভো-ক্রোট জাতি এখন আর বিভক্ত থাকায় প্রস্তুত নয়। সমগ্র জাতির সমাবেশ করতঃ এক বৃহৎ সার্ভিয়া (Great Servia) গঠন করাই এখন তাহাদের চরম লক্ষ্য। ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। যে শক্তির প্রবল উদ্বোধনে সার্দ্ধশত বৎসর পূর্ব্বে ইটালি ও জর্ম্মণি আপন আপন একত্ব (Unity) ও স্বাধীন রাষ্ট্রীয়তা (Indepeedence) লাভ করিয়াছিলেন, এখানেও আমরা সেই একীকরণ শক্তির প্রবল স্পন্দন দেখিতে পাই। ইটালির ক্ষেত্রে যেমন পীড্‌মণ্ট্ এবং জর্ম্মণির ক্ষেত্রে যেমন প্রুসিয়া চুম্বকের লৌহাকর্ষণের ন্যায় অপরাপর খণ্ড রাজ্যগুলিকে আকর্ষণ করিয়াছিল, এখানেও তেমনি সার্ভিয়া তাহার সমজাতীয়গণকে আপনার নিকট আকর্ষণ করিতেছে। এ চেষ্টা সফল হইলে জাতীয় একীকরণ শক্তির (principle of Nationality) আরও একটী সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইতিহাসে লিখিত থাকিবে।

অষ্ট্রিয়া, বসনীয়া ও হার্জগভিনা

সার্ভিয়া পক্ষে কথা এই। এখন অষ্ট্রীয়ার স্বত্ব বিচার করা কর্ত্তব্য। সার্ভো-ক্রোটীয়গণের সমরাষ্ট্রীয়তা (unification) ভালই হউক বা মন্দই হউক, তাহাতে যে অষ্ট্রীয়ার সমূহ ক্ষতি তাহা সুনিশ্চিত। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে তুরস্ক শাসনে সার্ভজাতি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। তখন তুরস্কের বিজীগিষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং তাহার রণসামর্থ্যও তদুপযুক্ত ছিল। খৃষ্টান ইউরোপের সেই দুর্দ্দিনে একমাত্র অষ্ট্রীয়ারাজই পর্ব্বতের ন্যায় সেই বন্যাকে প্রতিহত করেন। বহু

যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ড্যালমেটিয়া ক্রোটিয়া, স্ল্যাভোনিয়া প্রভৃতি স্ল্যাভপ্রধান প্রদেশ অষ্ট্রীয়ার করতলগত হয়। বসনীয়া ও হার্জগভিনা সম্বন্ধেও সেই কথা অনেকটা সত্য। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বপর্য্যন্ত এই দুই প্রদেশ তুরস্কের অধিকৃত ছিল। কিন্তু তুরস্কের অত্যাচার ও অশাসন হেতু ঐ সময় স্থানীয় প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। পরে বার্লিন মহাসভায় সমবেত শক্তিমণ্ডল উক্ত দুই প্রদেশের শাসন অষ্ট্রীয়ার উপর ন্যস্ত করেন। এই ব্যবস্থায় তুরস্কের শাসন কেবল নামে মাত্র স্বীকৃত রহিল। কিন্তু প্রজারক্ষণের যাবতীয় কর্ত্তব্য অষ্ট্রীয়াই প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি ১৯০৮ সালে অষ্ট্রীয়া এই দুই প্রদেশকে সম্পূর্ণরূপে আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং অধিকারসূত্রে অষ্ট্রীয়ার স্বত্ব নিরঙ্কুশ রহিয়াছে ইহা সুনিশ্চিত। বস্তুতঃ প্রথম অধিকার ন্যায়তই হউক বা অন্যায়তই হউক, জগতে সকল জাতিই আপনার অধিকৃত কোনও স্থানই স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হয় না।

সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যাচ মেদিনী।
বিনা যুদ্ধং ন দত্থামি পাণ্ডবভ্য পিতামহ।

এই কথায় দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে উত্তর দিয়াছিলেন। তাহা জাগতিক ব্যাপারে চিরদিনই সত্য।

রুষসার্ভ মিত্রতায় অষ্ট্রিয়ার বিপদ

এতদ্ব্যতীত আরও একটি বিষয় উল্লেখ যোগ্য। সার্ভিয়া, মন্টিনিগ্রো প্রভৃতি স্ল্যাভরাজ্যগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। গত বল্‌কান সমরে তুরস্ক বিজিত হইলে পর ম্যাসিডোনিয়া প্রভৃতি প্রদেশ বিজেতাগণের মধ্যে বিভক্ত হয়। তাহার ফলে সার্ভিয়া ও মন্টিনিগ্রো আয়তন ও জনসংখ্যায় প্রায় দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়িয়া দিলেও আরও একটী গুরুতর কথা আছে। বল্‌কান প্রদেশে প্রাধান্য লইয়া অষ্ট্রীয়া ও রুষিয়ার বিবাদ ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। রুষিয়ার সহিত বল্‌কান রাজ্যগুলির কি সম্বন্ধ তাহা পরে আলোচিত হইবে। সম্প্রতি আমরা দেখিতে পাই যে সার্ভিয়া ও মন্টিনিগ্রো রুষিয়ার বলে বলীয়ান হইয়াছে এবং সেই সাহসেই তাহারা অষ্ট্রীয়ার অধিকৃত বসনীয়া ও হার্জগভিনা প্রদেশ আপন রাজ্যান্তর্গত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। সুতরাং সব দিক হইতেই অষ্ট্রীয়াকে সাবধান থাকিতে হয়। তবে বর্ত্তমান ব্যাপারে আমরা যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে বোধ হয় যে বসনীয়া ও হার্জগভিনা প্রদেশে আপন অধিকার শুধু অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই অষ্ট্রীয়া সন্তুষ্ট হন নাই, বরং পূর্ব্বোক্ত খুন ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া সার্ভিয়াকে চিরদিনের মত লুপ্ত করিয়া বল্‌কান প্রদেশে আপন প্রভুত্ব বিস্তারেই গূঢ়ভাবে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সুতরাং সার্ভিয়ার পক্ষে এই যুদ্ধ যে ন্যায় যুদ্ধ, তাহা আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব।

(২)

রুষিয়া এবং বল্‌কান রাজ্যসমূহ

রুষিয়ার সহিত বলকান রাজ্যগুলির সম্বন্ধ মূলতঃ এই। প্রথম কথা,—বলকান

বাসী অধিকাংশ লোকই স্ল্যাভজাতীয়। রুষ সেই স্লাভজাতির সর্ব্বপ্রধান শাখা। দেশ কাল ও দূরত্ব নিবন্ধন বহু পার্থক্য বিদ্যমান থাকিলেও স্ল্যাভজাতীয় জনসাধারণের ভিতর এক প্রবল স্বজাতীয়তা নিরন্তর প্রবাহিত আছে। এই আভ্যন্তরীণ ভাবের বাহ্যিক প্রচেষ্টাকে Pan slav movement বলে। স্ল্যাভজাতীয় সকল লোকের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও একত্ব সম্পাদনই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এখন স্বাধীন স্ল্যাভ রাজ্যগুলির ভিতর রুষিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী। সুতরাং রুষিয়া সহজেই এই স্ল্যাভ আন্দোলনের নেতা হইয়াছেন এবং বলকান প্রদেশস্থ স্ল্যাভবংশীয়গণ এই জন্যই রুষিয়ার মুখাপেক্ষী। সমধর্ম্মও এই সৌহার্দ্দ্য বন্ধনকে অধিকতর সুদৃঢ় করিয়াছে। রুষ ও বলকানবাসীগণ উভয়েই গ্রীকচর্চ্চ নামক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী। এই কারণেও তাহাদের সম্পর্ক এত নিকট।

এস্থলে আরও একটী বিষয় বিচারণীয়। ঊনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে সমস্ত বলকান দেশ তুরস্কের অধিকৃত এবং সমস্ত বলকান জাতি তুরস্কের প্রজা ছিল। রুমানিয়া, সার্ভিয়া, মন্টিনিগ্রো, গ্রীস বা বুলগেরিয়া কাহারও স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল না। তাহাদের স্বাধীনতা লাভ কতক আপন চেষ্টায় এবং কতক রুষের সহায়তায় সাধিত হইয়াছে। গত শতাব্দিতে রুষের সহিত তুরস্কের তিনটী যুদ্ধ হয়। প্রথম যুদ্ধের ফলে গ্রীস ও সার্ভিয়ার স্বাধীনতা তুরস্ক কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের স্বপক্ষ হওয়ায় রুষ পরাজিত হয়। কিন্তু এই পরাজয় সত্ত্বেও দুই বৎসরের মধ্যে মোল্‌ডেভিয়া ও ওয়ালাচিয়া মিলিত হইয়া রুমানিয়া রাজ্যে পরিণত হয়। তাহার পরই ১৮৭৭-৭৮ অব্দে রুষ-তুরস্ক যুদ্ধ। ইহার ফলে সার্ভিয়া ও গ্রীসের রাজ্যবৃদ্ধি এবং বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা লাভ রুষিয়া কর্ত্তৃক সংঘটিত হয়। বিগত বলকান যুদ্ধেও রুষিয়া স্বয়ং যোগদান না দিয়াও স্ল্যাভ-জাতীয় রাজ্যগুলির পরম উপকার সাধন করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহারই জন্য সার্ভিয়া, মন্টিনিগ্রো প্রভৃতির রাজ্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে অষ্ট্রীয়া বিরোধী হইতে পারেন নাই।

পরিশেষে আমরা দেখিতে পাই যে রুষিয়ার সহিত বলকান রাজ্য সমূহের সম্বন্ধ অতি নিকট। তাহারা রুষিয়ার একজাতীয় একধর্ম্মাবলম্বী এবং অনেকেই স্বীয় স্বাধীনতা লাভে রুষিয়ার নিকট চিরঋণী। এ দিকে বহিঃস্থ শত্রুরও অভাব নাই। অষ্ট্রীয়া রুষিয়ার বিরোধী এবং বলকান রাজ্যগুলিরও সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং অষ্ট্রীয়া সার্ভিয়াকে আক্রমণ করিলে ব্যাপার কতদূর গড়াইবে তাহা অনেকে পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ফলতঃ সার্ভিয়া আক্রান্ত হইবামাত্র রুষিয়া সশস্ত্র দণ্ডায়মান হইলেন। মন্টিনগ্রো সমজাতি সার্ভিয়ার সহিত যোগ দিলেন। এমন কি রুমানিয়া ও বুলগেরিয়াও আপন আপন ক্ষুদ্র বিবাদ মিটাইয়া এই স্বজাতিযুদ্ধে যোগ দিবেন বলিয়া বোধ হয়।

(৩)

জর্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া ও রুষিয়া

অতঃপর জর্ম্মণি কেন অষ্ট্রীয়ার সহায়

হইয়াছেন দেখিতে হইবে। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে অষ্ট্রীয়া ও প্রুসিয়া পরম শত্রু ছিলেন। তখন জর্ম্মণি নামে কোনও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল না। তৎকালে জর্ম্মণভাষী জনসমূহ বহুসংখ্যক স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রাধান্যহেতু অষ্ট্রীয়া ও প্রুসিয়ার প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। বিসমার্কের রাজনীতি কৌশলে এবং মণ্ট্‌কির রণদক্ষতায় প্রুসিয়া বিজয় লাভ করিলেন। তখন উত্তর জর্ম্মণির সমুদয় রাজ্যগুলি প্রুসিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিলে North German confederation প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ জর্ম্মণিস্থিত রাজ্যগুলিও এই যুক্তরাজ্যের সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। ফলতঃ জর্ম্মণ দেশে প্রুসিয়া সর্ব্বপ্রধান হইলেন এবং অষ্ট্রীয়া পূর্ব্বাধিকার হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। ইহাতে অষ্ট্রীয়া ও প্রুসিয়ার মধ্যে চিরবিরোধ হইবারই কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না। বিসমার্কের ন্যায় কুশলী রাজনৈতিক জগতে অতি বিরল। তিনি অষ্ট্রীয়াকে মিত্রভাবাপন্ন করিতে সচেষ্ট হইলেন। কালক্রমে তাঁহার সাহায্যে বলকান প্রদেশস্থ বস্‌নীয়া ও হার্জ্জগভিনা অষ্ট্রীয়ার করতলগত হইল। পরিশেষে অষ্ট্রীয়া পূর্ব্ব শত্রুতা বিসর্জ্জন দিয়া জর্ম্মণির পরম মিত্র হইয়া দাঁড়াইলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দির পূর্ব্বার্দ্ধে অষ্ট্রীয়ার সহিত রুষিয়ার সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ক্রীমীয় যুদ্ধের সময় যখন রুষিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও তুরস্ক কর্ত্তৃক এককালে আক্রান্ত হইলেন, তখন মিত্ররাজ অষ্ট্রীয়ার সহায়তা প্রত্যাশা করিয়া আশাহত হন্। ইহাতে রুষের মনে অষ্ট্রীয়ার উপর বিদ্বেষ-সঞ্চার হয়। পরে ১৮৭৮ সালে রুষ তুরস্ক যুদ্ধের অবসানে অষ্ট্রীয়া বস্‌নীয়া ও হার্জ্জগভিনা অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু অশেষ লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় করিয়াও রুষিয়ার তেমন কিছু লাভ হইল না। এই ঘটনা হইতেই রুষ ও অষ্ট্রীয়ার মধ্যে শত্রুতার সূত্রপাত হইল। পরে অষ্ট্রীয়া ও রুষিয়া উভয়েই বল্‌কান দেশীয় রাজ্যগুলির উপর স্বকীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে যত্ন আরম্ভ করিলেন। শীঘ্রই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কিন্তু রুষিয়া অতিশয় প্রবল প্রতাপ। সুতরাং অষ্ট্রীয়া জর্ম্মণির সহায়তা ক্রমশঃ অধিকতর আবশ্যকীয় মনে করিতে লাগিলেন।

অপর দিকে আরও একটী পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে সংঘটিত হইল। প্রুসিয়া প্রথমতঃ অষ্ট্রীয়াকে বহিষ্করণ পূর্ব্বক উত্তর জর্ম্মণীর রাষ্ট্রসমূহের একীকরণ করিলেন (১৮৬৬)। তাহার চারি বৎসর পরেই ফ্রান্সের বিজয় সাধন হইলে উত্তর ও দক্ষিণ জর্ম্মণিস্থিত সমুদয় রাষ্ট্রের একীকরণ সংঘটিত হইল। তখন জর্ম্মণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইউরোপের স্থলভাগে অদ্বিতীয়তা লাভ করিল। রুষিয়ার তৎকালীন সম্রাট্ দ্বিতীয় আলেক্‌জান্দার জর্ম্মণ সম্রাটের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি বিপক্ষ হইলে জর্ম্মণ সাম্রাজ্য কখনই প্রতিষ্ঠিত হইত না। কিন্তু কিছুকাল গত হইলে রুষিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন যে ইউরোপে জর্ম্মণির সার্ব্বভৌমত্ব বাঞ্ছনীয় নহে। পরে বলকান ব্যাপারে জর্ম্মণি রুষিয়ার বিপক্ষে অষ্ট্রীয়াকে সাহায্য

দিতে লাগিলেন। ফলে রুষিয়া ও জর্ম্মণির মিত্রতা ভাঙ্গিয়া গিয়া শীঘ্রই শত্রুতায় এবং অষ্ট্রীয়া ও জর্ম্মণির শত্রুতা মিত্রতায় পরিণত হইল। সুতরাং বর্ত্তমান ব্যাপারে রুষিয়ার নিকট বিপদাপন্ন হওয়া মাত্র জর্ম্মণির সহায়তা লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

(৪)

ফ্রান্স ও জর্ম্মণি

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রুসিয়া এবং তদনুচারী জর্ম্মণ রাজ্যগুলি কর্ত্তৃক ফ্রান্স পরাজিত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে আল্‌সাস্‌ ও লোরেন্‌ নামক দুইটী প্রদেশ তাহার অধিকারচ্যুত হয়। ঐ দুই প্রদেশের প্রজা ফরাসিভাষী হইলেও বিদেশী জর্ম্মণের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। তখন ফ্রান্সের দুরবস্থা ও অপমানের সীমা রহিল না। এদিকে সমস্ত জর্ম্মণ রাজ্যসমূহ প্রুসিয়ার প্রাধান্যে এক বিশাল যুক্ত-রাজ্যে পরিণত হইল। সেই দুর্দ্দিনে ফ্রান্সের মিত্ররাজ্য ইউরোপে কেহই ছিল না। কিন্তু কালক্রমে রুষিয়ার সহিত জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়ার সৌহৃদ্য ঘুচিয়া গেল। তখন ফ্রান্স ও রুষিয়া জর্ম্মণিকে উভয়েরই শত্রু বোধ করিয়া পরস্পর মিলিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে আত্মরক্ষামূলক একটি সন্ধি (defensive alliance) সংস্থাপিত হইল। এই সন্ধির উদ্দেশ্য ফ্রান্স আর কোন শক্তিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে রুষিয়া সাহায্য করিবেন এবং রুষিয়া আক্রান্ত হইলে ফ্রান্সও তথাবিধ সাহায্য করিবেন। ইহাকেই Dual Alliance কহে। রুষিয়ার সহিত এই Dual Alliance আছে বলিয়াই জর্ম্মণি ও রুষিয়ার যুদ্ধ সম্ভাবনা হইবা মাত্র ফ্রান্সও সমরে লিপ্ত হইলেন।

(৫)

ইংলণ্ডের কথা

গত শতাব্দির শেষ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় ব্যাপারে ইংলণ্ডকে সচরাচর নির্লিপ্তই দেখা যায়। ইহাকেই policy of non intervention কহে। সার্দ্ধশত বৎসরের মধ্যে ইউরোপ ভূখণ্ডে সর্ব্বসমেত ৫টী মহারণ সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের কোনটীতেও ইংলণ্ড প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন নাই। তাহার কারণ এই যে এই ঘটনাবলির কোনটীতে ইংলণ্ডের স্বার্থ (interests) বা সম্মান (prestige) প্রতিহত হয় নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন জর্ম্মণি ইউরোপ ভূভাগে আপন প্রাধান্য স্থাপন করিলেন তখন ইংলণ্ড কোন বিপরীত চেষ্টা করা সঙ্গত মনে করেন নাই। ক্রমশঃ ইউরোপে দুইটী দল গঠিত হইল। একদিকে জর্ম্মণি অষ্ট্রীয়া ও ইটালি (Triple Alliance) এবং অপরদিকে ফ্রান্স ও রুষিয়া (Dual Alliance)। ইংলণ্ড নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইলেও জর্ম্মণি অষ্ট্রীয়া ইটালিরই কিছু পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ তৎকালে ফ্রান্স ও রুষিয়ার সহিতই তাঁহার ক্রমাগত সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। ফ্রান্সের সহিত সংঘর্ষের প্রধান কারণ মিসর দেশে ইংলণ্ডের অধিকার। রুষিয়ার সহিতও সেইরূপ আফগানিস্থান, চীন ও প্রশান্ত মহাসাগর সংক্রান্ত নানাবিধ বিবাদ উপস্থিত

হয়। ১৪।১৫ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে ফ্রান্স ও রুষিয়ার সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ সম্ভাবনাই সকলের বিচারণীয় ছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই রাজনৈতিক জগতে এক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। জর্ম্মণি ইংলণ্ডের সহিত এক প্রবল ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিলেন। জর্ম্মণির আপন উপনিবেশ সংস্থাপনের ইচ্ছা হইল। কিন্তু তদুপযোগী নাতিশীতোষ্ণ স্থানগুলি পূর্ব্বেই ইংলণ্ডের অধিকৃত হওয়ায় জর্ম্মণির মনোরথ অসিদ্ধ রহিল। কালক্রমে জর্ম্মণি বুঝিলেন যে স্থলভাগে তাঁহার শক্তি অব্যাহত হইলেও জলে তাঁহার তদুপযোগী শক্তির অভাব হইয়াছে। তখন জার্ম্মণি রণপোত-নির্ম্মাণে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইংলণ্ডকেও সতর্ক হইতে হইল। জর্ম্মণির শত্রুতার সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণ ফরাসী ও রুষের সহিত বিবাদ মিটাইতে সচেষ্ট হইলেন। এদিকে রুষিয়া সেই সময় জাপানের নিকট পরাজিত হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। ইউরোপে তাঁহার প্রতাপ ও প্রতিপত্তি কমিয়া গেল। ফলে ফ্রান্স ও রুষিয়ার মিলিতশক্তি জর্ম্মণি-অষ্ট্রীয়া-ইটালি হইতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সুতরাং উভয়েই ইংলণ্ডের মিত্রতা বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন। ইংলণ্ডও তাহাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। ১৯০৪ সালে ইংরাজের সহিত ফরাসীর এবং ১৯০৭ সালে ইংরাজের সহিত রুষের যাবতীয় বিবাদ মিটান হইল। অতঃপর এই তিন রাজ্যের মিত্রতা বর্দ্ধনশীল হইলে জর্ম্মণি ঐ সূত্র ছিন্ন করিবার জন্য অবিরত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৯০৬ সালে মরোক্কো, ১৯০৮ সালে বসনিয়া হার্জগভিনা এবং ১৯১১ সালে পুনরায় মরোক্কো লইয়া শক্তিসমূহের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ইংরাজ ফরাসী ও রুষের সখ্যতা ছিন্ন করিতে জর্ম্মণি অসমর্থ হন। আজ সেই মিত্রতাসূত্রে এবং আপন্ন বেলজিয়ামের রক্ষার নিমিত্তই ইংলণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

যোগীত্রয়

(কাউণ্ট টলষ্টয় লিখিত গল্পের অনুবাদ)

আরচেন্‌জেল হইতে একজন ধর্ম্মপ্রচারক জাহাজে করিয়া সোলোভেট্‌স্কের মঠে যাইতে ছিলেন। সেই জাহাজে আরও কয়েকজন তীর্থযাত্রীও যাইতেছিল। সমুদ্র পথে জাহাজখানি বেশ নির্ব্বিবাদেই অগ্রসর হইতেছিল। বাতাস অনুকূল এবং প্রকৃতি শান্ত থাকায় জাহাজের গতির কোন বিঘ্ন হয় নাই। তীর্থযাত্রীরা ডেকের উপর বসিয়া কেহবা ভোজন করিতেছিল কেহবা পাঁচজন লোক লইয়া একটা গল্প ফাঁদিয়া

বসিয়াছিল। ধর্ম্মযাজক মহাশয়ও ডেকের উপর বেড়াইতেছিলেন। পদচারণা করিতে করিতে পুরোহিত মহাশয় দেখিলেন কতক গুলা লোক একটা জেলেকে ঘিরিয়া বসিয়া কি শুনিতেছে এবং জেলেটা মধ্যে মধ্যে সাগরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কি দেখাইতেছে। পুরোহিত মহাশয় দাঁড়াইয়া জেলের নির্দ্দিষ্ট সমুদ্রের দিকে দেখিলেন, —কিন্তু বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সৌরকরস্নাত উর্ম্মিমালা প্রেমভরে একের উপর অন্যে আসিয়া পড়িতেছে এইমাত্র দেখিলেন। তিনি জেলের কথা শুনিবার জন্য তাহার নিকট আর একটু সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু লোকটা তাঁহাকে দেখিবামাত্র টুপী খুলিয়া নীরব হইল। তাহার দেখাদেখি সমবেত অন্য সকলেও টুপী খুলিয়া পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম করিল।

পুরোহিত মহাশয় তাহাদের নীরব হইতে দেখিয়া বলিলেন,—"না না আমি তোমাদের বিরক্ত করতে আসিনি তোমরা কি বলছিলে তাই শুনতে এসেচি।"

সমবেত লোকগুলির মধ্যে একজন বণিক সাহস করিয়া বলিল,—"জেলে আমাদের যোগীর গল্প ব'লছিল।"

পুরোহিত মহাশয় রেলিংএর কাছে একটা বাক্স দখল করিয়া প্রশ্ন করিলেন,— "কোন যোগী? বল না কি ব'লছিলে, আমার যে ভারি শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। আচ্ছা, তুমি দেখাচ্ছিলে কি?

আজ্ঞে, ঐ যে দ্বীপ খানা"—এই বলিয়া জেলে সম্মুখে ঈষৎ দক্ষিণ পার্শ্বে একটা কৃষ্ণ বর্ণ দাগের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।—"ঐ—ঐ দ্বীপে তিনজন যোগী আত্মার নির্ব্বাণ কল্পে তপস্যা করে।"

পুরোহিত তাহার নির্দ্দেশ মত চাহিয়াও কিছু দেখিতে পাইলেন না; বলিলেন,— "কই হে দ্বীপ কোথা? আমিত কিছু দেখতে পাচ্ছি না!"

"আমার কাছে দাঁড়িয়ে সোজা দেখলে দেখতে পাবেন,—ঐ—ঐ দূরে! আচ্ছা একটা মেঘের মত কিছু দেখতে পাচ্ছেন? ঠিক ওর নীচেই, একটু বাঁদিকে, দ্বীপের একটা অস্পষ্ট রেখা দেখা যাচ্ছে।—ঐ—ঐ খানটায় দ্বীপ!"

ধর্ম্মযাজক মহাশয় বহুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন কিন্তু তাঁহার অনভ্যস্ত চক্ষুদ্বয় সূর্য্যকরোজ্জ্বল সমুদ্রোর্ম্মি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

"কই না বাপু আমি কিছুই দেখতে পেলুম না। যাক, আচ্ছা এ যোগীরা কে?"

"ভারি পুণ্যাত্মা লোক ঠাকুর! অনেক দিন লোকের মুখে তাঁদের কথা শুনেছি কিন্তু দেখা আর ঘটে ওঠেনি; এই গেল বছর তাঁদের স্বচক্ষে দেখে এসেছি।"

এই বলিয়া জেলে গল্প আরম্ভ করিল, —"একদিন মাছ ধরতে ধরতে রাত হ'য়ে গেল, আমি ত বেগতিক দেখে ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠলুম; যোগীদের আস্তানা কোথায় তা আমি কিচ্ছু জানতুম না। কোথায় যে উঠেছি তাও ঠাওর পেলুম না। সকাল বেলা জায়গা দেখবো ব'লে বেরুলুম; ঘুরতে ঘুরতে একটা মাটির কুঁড়ের কাছে এসে দেখি একজন যোগী দাঁড়িয়ে আছেন;

একটু পরেই আর দু'জন বেরিয়ে এলেন। সবাই মিলে আমায় খাইয়ে দাইয়ে নৌকায় তুলে দিয়ে গেলেন।"

"আচ্ছা তাঁদের দেখতে কেমন?"

"একজন বেঁটে খাটো মানুষটী, পিঠ নুয়ে প'ড়েছে, পরণে তাঁর একটা পুরুতের পোষাক, বয়স বোধ হয় পাঁচকুড়ি পেরিয়ে গেছে; দাড়ীগুলি ধবধবে সাদা আর মুখে সর্ব্বদাই হাসি লেগে আছে। দেবদূতের মতই দীপ্তিময় সে মুখ। দ্বিতীয়টী একটু ঢেঙ্গা, তিনি খুব বুড়ো; একটা ছেঁড়া কৃষেণের পরিচ্ছদ গায়ে; দাড়িগুলি খুব চওড়া ধূসর-হরিৎ রঙের। দেখলে বেশ শক্তি-সামর্থ্য আছে ব'লে মনে হয়। আমার নৌকাখানা বালিতে পুঁতে গেছল, সেটা তিনি একহাতে মোচার খোলার মতই অনায়াসে জলে ঠেলে ভাসিয়ে দিলেন, আমি হাত দেবার সময়ও পেলুম না। তাঁরও মুখখানি হাসি হাসি, ভারী দয়ার শরীর। তৃতীয়টী সকলের চেয়ে ঢেঙা, সাদা ধবধবে তাঁর দাড়িগুলা, হাঁটুতে এসে ঠেকেছে। দেখলেই যেন কঠোর প্রকৃতির লোক ব'লে মনে হয়; ভ্রূ ঝুলে প'ড়েছে। তিনি এক রকম ন্যাংটাই থাকেন; কোমরে কেবল একটা ছেঁড়া মাদুর জড়ান আছে।"

"তোমার সঙ্গে কথা কইলে কেউ?"

"বেশীর ভাগই চুপ ক'রে কাজ ক'রে যাচ্ছিলেন; নিজেদের মধ্যেও খুব কম কথা কচ্ছিলেন। একজন অপরের দিকে চাইতেই অন্যে তাঁর মনের ভাব বুঝে নিচ্ছেলেন। সব চেয়ে ঢেঙা লোকটীকে আমি জিজ্ঞেস করলুম কত দিন তাঁরা সেখানে আছেন, লোকটী রাগের লক্ষণ প্রকাশ করলেন; তখন সবচেয়ে বুড়ো যোগী তাঁর হাত ধরে হাসলেন,—তবে তিনি শান্ত হন। তারপর বুড়োযোগী আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লেন,—"আমাদের দয়া কর।" বস, আর কিছু না।"

জেলে যখন এই সকল বলিতেছিল তখন জাহাজটা ক্রমেই দ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল।

"ঐ—ঐ দেখুন, এইবার বেশ স্পষ্ট দেখতে পাবেন।" এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বণিক দ্বীপের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

ধর্ম্মযাজক চাহিয়া দেখিলেন। এবার সত্যই একটা কৃষ্ণবর্ণ রেখা তাঁহার দৃষ্টি পথে পড়িল।—সেটা দ্বীপের অস্পষ্ট রেখা। কিয়ৎক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া তিনি জাহাজের ডেক ত্যাগ করিয়া কল ঘরে নামিয়া আসিলেন। কলচালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দূরে ঐ যে রেখাটা দেখা যাচ্ছে ওটা কোন দ্বীপ?"

"ওর নাম নেই, এ সমুদ্রে অমন ছোট দ্বীপ আরও অনেক আছে।"

"আচ্ছা, শুনলুম ওখানে তিনজন যোগী আত্মার নির্ব্বাণকামনায় বাস করেন, কথাটা কি সত্য?"

"আমিও তাই শুনেছি, সত্যি মিথ্যে জানিনা। জেলেরা বলে তারা নাকি স্বচক্ষে এই যোগীদের দেখেছে;—হ'তে পারে কথাটা হয়ত সম্পূর্ণ আজগুবি নয়।"

"আমি ওখানে নেবে যোগীদের দেখতে

চাই। তুমি তার একটা উপায় করে দাও।”

“জাহাজ ওখানে ভিড়োন যাবে না; তবে বোটে করে যেতে পারেন। এ বিষয়ে ক্যাপটেনের সঙ্গে কথা কইলেই ভাল হয়।”

ক্যাপ্‌টেনকে ডাক পড়িল।

তিনি আসিলে ধর্ম্মযাজক মহাশয় বলিলেন,—“আমি একবার ঐ দ্বীপে যেতে চাই, আপনি বোটের বন্দবস্ত করে দিন।”

ক্যাপটেন প্রথমে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিলেন,—“অবশ্য তা করে দিতে পারি কিন্তু তাহ’লে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে আমাদের অনেক দেরী হবে। যদি অপরাধ না নেন তাহ’লে একটা কথা বলি, সে বুড়োগুলোর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার মজুরিই আপনার পোষাবে না। শুনেছি তারা নাকি ভারি নির্ব্বোধ। সমুদ্রের মাছের মত তারা মানুষের কোন কথা বুঝতে পারে না বা কারো সঙ্গে কথা কইতে পারে না।”

“তবু আমি তাঁদের দেখতে চাই। আমি আপনার ক্ষতি পূরণ ক’রব, আপনাকেও যথেষ্ট পারিশ্রমিক দেব, অনুগ্রহ ক’রে এখন আমায় একখানা বোটের বন্দবস্ত করে দিন।”

ধর্ম্মযাজকের কথার উপর আর ‘না’ বলা যায় না, কাজেই ক্যাপটেন অগত্যা বোট নামাইতে আদেশ দিলেন। নাবিকগণ বোটে পাল তুলিয়া দিয়া দাঁড় ধরিয়া বসিল এবং একজন হালিয়ান হাইল ধরিল। এইভাবে ধর্ম্মযাজক মহাশয় যোগী দর্শনে যাত্রা করিলেন। একখান চেয়ারের উপর বসিয়া তিনি সেই দ্বীপের দিকে চাহিয়া রহিলেন। জাহাজের অন্যান্য যাত্রীরাও জাহাজের রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই দ্বীপটী দেখিতে ছিল। একটু একটু করিয়া দ্বীপের পাহাড়গুলা দেখা দিতেছিল। দাঁড়িরা বলিল তাহারা একখানি মৃৎকুটির দেখিতে পাইতেছে। তাহার পর তাহারা যোগীদের দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল। ধর্ম্মযাজক মহাশয় একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলেন বাস্তবিক তাহারা ঠিকই বলিয়াছে। তিনি দেখিলেন, প্রথম ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, তাহার পর দ্বিতীয় এবং সর্ব্বশেষে খর্ব্বকায় যোগী পরস্পর হাত ধরিয়া সমুদ্র তীরে দাঁড়াইয়া আছেন! ক্রমে তাঁহারা দ্বীপের অতি নিকটে আসিয়া পড়িলেন। এবার সাদা চোখেই ধর্ম্মযাজক দেখিলেন দীর্ঘাকৃতি যোগীর কোমরে একখানা ছেঁড়া মাদুর মাত্র জড়ান আছে; দ্বিতীয়টীর গায়ে একটা ছেঁড়া কৃষাণের পোষাক এবং খর্ব্বাকৃতি যোগীর পরিধানে একটী ধর্ম্মযাজকের পরিচ্ছদ।—তিনজনে হাত ধরিয়া পাশাপাশি দণ্ডায়মান।

বোট আসিয়া তীরে লাগিল। পুরোহিত মহাশয় দ্বীপে উঠিয়া গেলেন।

যোগীত্রয় তাঁহাকে নত হইয়া প্রণাম করিবামাত্র তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন তাঁহারা ততোধিক নত হইয়া দ্বিতীয়বার প্রণাম করিলেন।

এইবার ধর্ম্মযাজক মহাশয় আলাপ আরম্ভ করিয়া দিলেন,—“শুনলুম দেবোপম আপনারা তিন জনে এই দ্বীপে ব’সে আপনাদের আত্মার উন্নতি কামনা আর মানুষের হিত কামনায় আমাদের প্রভু যীশু

খৃষ্টের কাছে প্রার্থনা ক'রছেন! আমি তাঁরই এক দীন ভৃত্য তাঁরই করুণায় মানুষকে সাধ্যমত উপাসনা করতে শেখাই। তাই আপনাদের মত ভগবানের দাসদের আমার দেখতে বড় ইচ্ছা সাধ্যমত উপদেশ দেবারও ইচ্ছে আছে।

যোগীত্রয় একবার পরস্পরের দিকে সহাস্য মুখে চাহিলেন কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

ধর্ম্মযাজক প্রশ্ন করিলেন,—"আগে বলুন কি ভাবে আপনারা এখানে ভগবানের প্রার্থনা করেন, কি ভাবে আত্মার মুক্তিকামনা করেন?"

দ্বিতীয় যোগী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রথম যোগীর দিকে চাহিলেন; প্রত্যুত্তরে ঈষৎ হাস্য করিয়া তিনি বলিলেন,—"ভগবানের পূজা কি করে করতে হয় তা আমরা জানিনা। আমরা শুধু নিজেদের পূজা করে, নিজেদের সেবা করি।"

"তবু আপনারা কি ভাবে উপাসনা করেন?"

"আমরা বলি,—হে ত্রিগুণময়, আমরা তিনটী, আমাদের দয়া কর!'"

সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ যোগী এই কথা বলিবা মাত্র তিনজনে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া যুক্ত করে বলিলেন,—"হে ত্রিগুণময়, আমরা তিনটী, আমাদের দয়া কর!"

ধর্ম্মযাজক ঈষৎ হাস্য করিলেন।

"তাহলে আপনারাও ভগবানের ত্রিত্বের বিষয় জানেন? কিন্তু আপনাদের উপাসনা ত ঠিক হল না। সুপবিত্র দেবতার মত লোক আপনারা, আপনাদের উপর আমার বড় স্নেহ জন্মেছে। দেখচি ভগবানের তুষ্টিসাধন ক'রতে আপনাদের আন্তরিক ইচ্ছে রয়েছে কিন্তু কি কোরে যে তা ক'রতে হয় তা জানেন না। ওরকম ক'রে উপাসনা করে না! আমার কথা শুনুন, আমি আপনাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। আমি যা আজ আপনাদের শিখিয়ে দেব তা আমার মনপদ্ধতি মনে করবেন না, ভগবান স্বয়ং এইভাবে উপাসনা করবার কথা বাইবেলে লিখে গেছেন।"

তাহার পর ধর্ম্মযাজক মহাশয় বলিতে লাগিলেন—কেমন করিয়া ভগবান মানবের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন, কেমন করিয়া মানবের জন্য হুকের আঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন ইত্যাদি!

তাহার পর ত্রিত্বের কথা বলিলেন। সর্ব্বশেষে বলিলেন,—"পালনকর্ত্তা রূপে ভগবান সংসারে প্রাণী রক্ষা করতে এলেন। শুনুন এইবার উপাসনা পদ্ধতি বলি। আচ্ছা, আপনারাও ব'লে যান সঙ্গে সঙ্গে; বলুন,—"হে পিতা!"

প্রথমযোগী বলিলেন,—'হে পিতা!'

দ্বিতীয়যোগী বলিলেন,—'হে পিতা!'

তৃতীয়যোগী বলিলেন,—'হে পিতা!'

ধর্ম্মযাজক বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"হে স্বর্গবাসী পিতা!"

প্রথমযোগী বলিলেন,—হে স্বর্গবাসী পিতা!" দ্বিতীয় যোগী বলিতে বলিতে তাঁহার কথা বাধিয়া গেল এবং শ্মশ্রুমণ্ডিত অতি বৃদ্ধ তৃতীয় যোগী কথাটা মোটেই বলিতে পারিলেন না।

ধর্ম্মযাজক কথাটা পুনরায় আবৃত্তি করিলেন

এবং যোগীত্রয়ও তাহার সহিত কথাটা আবৃত্তি করিলেন। ধর্ম্মযাজক একখণ্ড প্রস্তরের উপর উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন এবং বৃদ্ধ যোগীত্রয় সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার বাক্যের আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন। সারাদিন ধরিয়া ধর্ম্মযাজক মহাশয় শ্রমস্বীকার করিলেন, এক কথা দশবার বিশবার এমন কি একশত বার বলিতে হইল; যোগীরাও আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একটা ভুল করিলে পুরোহিত মহাশয় তাহার সংশোধন করিয়া পুনরায় গোড়া হইতে আরম্ভ করাইতে ছিলেন।

যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা আপনা আপনি সমস্তটুকু আবৃত্তি করিতে শিখিলেন সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মযাজক সে স্থান হইতে নড়িলেন না। দ্বিতীয় যোগীই সর্ব্বপ্রথম আয়ত্ত করিলেন, এবং একাকী সবটুকু আবৃত্তি করিয়া গেলেন ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে বলিলেন; ক্রমে অন্য দুইজনও প্রার্থনা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল; সম্মুখে বিশাল সমুদ্র হইতে ধীরে ধীরে চন্দ্র উদিত হইতেছিলেন। এইবার পুরোহিত মহাশয় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য উঠিলেন। তাঁহাদের নিকট বিদায় লইবার সময় তিনজনেই পুরোহিতমহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদিগকে তুলিয়া তিনি সস্নেহ চুম্বন দান করিয়া বলিলেন অতঃপর তাঁহারা যেন তাঁহার প্রদর্শিত পন্থায় উপাসনা করেন। তাহার পর তিনি বোটে করিয়া জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন।

বোটে উঠিয়াও তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলেন দ্বীপে যোগীত্রয় মিলিত কণ্ঠে ভগবান যীশুর উপাসনা করিতেছেন। জাহাজে উঠিয়া তাঁহাদের সে উচ্চ কণ্ঠ তিনি আর শুনিতে পাইলেন না বটে কিন্তু চন্দ্রালোকে তখনও তিনি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন। তখনও তাঁহারা ঠিক তাঁহারই ইচ্ছানুরূপ দাঁড়াইয়া ছিলেন; খর্ব্বাকৃতি ও তাঁহার পশ্চাতে তদপেক্ষা দীর্ঘকায় যোগী সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান।

ধর্ম্মযাজক জাহাজে উঠিবামাত্র জাহাজ ছাড়িয়া দিল। পালে হাওয়া লাগায় পাখীর মত দ্রুত জাহাজ ছুটিয়া চলিতে লাগিল। তিনি ডেকের উপর একখানি চেয়ার পাতিয়া দ্বীপের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। আরও কিছুক্ষণ তিনি যোগী-দিগকে দেখিতে পাইলেন তাহার পর ক্রমেই তাঁহাদের মূর্ত্তি অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। তখনও দ্বীপটী বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল ক্রমে তাহাও অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া গেল; অবশিষ্ট রহিল কেবল চন্দ্রকরোজ্জ্বল ঊর্ম্মি-মালার তালে তালে নর্ত্তন!

তীর্থযাত্রীরা ডেকের উপর শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল; চতুর্দ্দিক নীরব। ধর্ম্ম-যাজকের শয়ন করিতে ইচ্ছা হইল না। তিনি পূর্ব্বস্থলে বসিয়া সেই দৃষ্টিপথবহির্ভূত দ্বীপের অভিমুখে চাহিয়া যোগীবরের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন যোগীরা আজ উপাসনাপদ্ধতি শিখিয়া নিশ্চয়ই হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়াছেন! এমন দেবোপম লোককে শিক্ষা

দিবার সুযোগ আজ যিনি তাঁহাকে দিয়াছিলেন, সেই ভগবানকেও তিনি প্রাণ পুরিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

যেদিকে দ্বীপটা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল সেই দিকে চাহিয়া তিনি এইসব কথা ভাবিতেছিলেন। তাঁহার প্রশংসমান দৃষ্টির সম্মুখে চন্দ্রকর সাগরতরঙ্গের উপর অগ্নি কণিকার মত স্থানে স্থানে দীপ্তিমান হইয়া উঠিতেছিল। অকস্মাৎ রজত সমুদ্রের উপর কি একটী দীপ্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল। একি এ? সিন্ধুঘোটক নাকি? অথবা ক্ষুদ্র বোটের উজ্জ্বল পাইল নহে ত? বিস্মিত ভাবে পুরোহিত মহাশয় সেই দিকে চাহিয়াছিলেন।

তিনি মনে করিলেন,—"নিশ্চয়ই আমাদের জাহাজের পিছু পিছু আর একখানা ছোট জালিবোট আসছে; কিন্তু খুব জোরে আসছে ত! আমাদের জাহাজ ধরে ফেল্লে বলে! মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কত দূরে ছিল কিন্তু এরই মধ্যে এত কাছে এসে পড়েছে! কিন্তু না এ ত বোট নয়, কই পাল টাল কিছু দেখছি না ত'! যাই হক, ওটা নিশ্চয়ই কিন্তু আমাদের অনুসরণ কচ্ছে! এই ধরে ফেল্লে বলে!"

সেটা যে কি তাহা তখনও তিনি বুঝিতে পারেন নাই। মাছ বা নৌকা যে নহে তাহা ধ্রুব সত্য! মানুষের মতই দীর্ঘ, কিন্তু সমুদ্রের মাঝখানে মানুষই বা আসিবে কি করিয়া? তিনি উঠিয়া হালিয়ানকে ডাকিলেন।

"দেখ দেখি ওটা কি?—কি ও?"

এইবার তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। সেই যোগীত্রয় জলের উপর দিয়া ছুটিয়া আসিতেছিলেন। সারা অঙ্গ চন্দ্রকর-স্নাত হইয়া তুষার ধবল হইয়া গিয়াছিল। শুভ্র শ্মশ্রুগুলা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল! ছুটিয়া আসিয়া তাঁহারা প্রায় জাহাজ ধরিয়া ফেলিলেন। যেন সেখানকার কোনই গতি নাই, নির্জ্জীব!

হালিয়ান ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে হাইল ছাড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিল,—"ঠাকুর যোগীরা আমাদের পিছু পিছু সমুদ্রের উপর দিয়ে ছুটে আসছেন; সমুদ্র যেন মাটির রাস্তা!"

যাত্রীরা তাহার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া রেলিংএর ধারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা দেখিল যোগীত্রয় হাত ধরাধরি করিয়া জাহাজের দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন। সম্মুখস্থ যোগী ইঙ্গিতে জাহাজ থামাইতে বলিলেন। তিন জনে জলের উপর পদ সঞ্চালন না করিয়া অমনই অগ্রসর হইতে'ছলেন। জাহাজ থামাইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা জাহাজের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার পর মুখ তুলিয়া তিনজনে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"হে ভগবানের দাস, আমরা আপনার কথিত উপাসনা পদ্ধতি ভুলে গেছি। যতক্ষণ আবৃত্তি করছিলুম ততক্ষণ বেশ মনে ছিল তারপর একটু থেমে আবার যখন বলতে গেলুম তখন একটা কথা পড়ে গেল; এখন ত আর কিছুই মনে নেই; আবার আমাদের শিখিয়ে দিন।"

পুরোহিত মহাশয় বক্ষে হস্ত রাখিয়া ডেকের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া বলিলেন,—"হে ঈশ্বরসৃষ্ট জীব। তোমাদের কৃত

প্রার্থনাই ভগবানের চরণে পৌঁছিবে। আমার সাধ্য কি তোমাদের দীক্ষা দিই! আমার মত পাপীর জন্যও প্রার্থনা কর।"

এই বলিয়া তিনি সসম্ভ্রমে তাঁহাদের প্রণাম করিলেন, তাঁহারা সমুদ্র পথে ফিরিয়া গেলেন। যেস্থানে গিয়া তাঁহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন উষায় প্রাকাশ অবধি সে স্থান দীপ্তিময় হইয়া রহিল।

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিপীলিকাদের যুদ্ধ প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকার শত্রুদুর্গ আক্রমণপ্রণালীও বিভিন্ন। আমরা পূর্ব্বেই এমাজন (Amazon) জাতীয় পিপীলিকার যুদ্ধপ্রণালীর কথা বলিয়াছি। স্যানগুইনিয়া (Sanguinea) জাতীয় পিপীলিকাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া শত্রু গৃহাভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যদলের অগ্রপশ্চাৎ অসংখ্য দূত ও সংবাদদাতা ছুটাছুটী করে এবং এইরূপে যাবতীয় সৈন্যবাহিনী পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকায় প্রত্যেক দল স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন বাহিনীর গতিবিধি সম্পূর্ণ অবগত থাকে। প্রথম দল শত্রুদুর্গে উপনীত হইয়াই এমাজনদের মত তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করে না। শত্রুদুর্গের প্রান্তদেশে ইহারা সৈন্য সংস্থাপন করিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে এবং সুযোগ মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আক্রমণকারীদের অভিযানের সংবাদ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইলে শত্রুরা অনেক সময় উহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক অনেককে বন্দী করিয়া ফেলে; ইতিমধ্যে পশ্চাৎ হইতে আবশ্যক মত অধিক সৈন্য আসিয়া ইহাদের দলের পুষ্টি সাধন করে এবং নিয়মমত শত্রুদুর্গকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে।

অবরুদ্ধ পিপীলিকাগণ অবশেষে বাধ্য হইয়া রণসজ্জাপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হয় এবং অবরোধকারীদিগকে আক্রমণ করে। আক্রমণকারীদিগকে ক্রমাগত পরাজিত করিতে করিতে যখন অবরোধকারীরা বুঝিতে পারে যে উহাদের সৈন্যবল সম্পূর্ণরূপে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে তখন উহারা সকলে একযোগে দুর্গ আক্রমণ করে। নতুবা Amazonদের মত ইহাদিগকে কখনও হঠাৎ আক্রমণ করিতে দেখা যায় না।

প্রথমতঃ দুর্গদ্বারগুলি ইহারা উত্তমরূপে সুরক্ষিত করিয়া দুর্গাভ্যন্তরস্থ শত্রু-পিপীলিকদিগকে সে দুর্গ হইতে বহির্গত হইবার আদেশ করে। সম্পূর্ণ রিক্ত-হস্তে ইহারা বহির্গত হইয়া আসে।

কীট ও গুটী সমস্তই দুর্গাভ্যন্তরে থাকিয়া যায়।

এমাজনদের মত স্যান্‌গুইনিয়াদের রণকৌশলও তেমন নাই। কিন্তু ইহারা অপেক্ষাকৃত বলশালী এবং আয়তনেও বৃহত্তর।

যাহা হউক আক্রান্ত ও পরাজিত শত্রুগণ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যাওয়ার পর অধিকাংশ সৈন্য দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া গুটী ও কীটগুলিকে স্থানান্তরিত করিবার প্রতি মনোনিবেশ করে। কতকগুলি সৈন্য আবার পরাজিত ও মুক্ত পিপীলিকাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হয় এবং ঘটনাচক্রে যদিই বা উহারা লুকাইয়া দুই একটী কীট বা গুটী সঙ্গে লইয়া গিয়া থাকে তাহাও কাড়িয়া লয়। এইরূপে ইহারা লুণ্ঠনকার্য্য যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া তবে প্রতিনিবৃত্ত হয়। প্রত্যাবর্ত্তন বিষয়েও ইহারা কখনও বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়েনা। কারণ ইহারা জানে তাহাদের আর কোনরূপে আক্রান্ত হইবার বা কোনরূপ বিঘ্ন লাভ করিবার মোটেই সম্ভাবনা নাই। দূরবর্ত্তী এবং বৃহৎ শত্রুদুর্গের লুণ্ঠন সম্পূর্ণ করিতে ইহাদিগের কখনও কখনও অনেকদিন অতিবাহিত হইয়া থাকে।

বিজিত পিপীলিকারা আর কখনও লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত গৃহে পুনরায় সংসার পাতিতে আসেনা।

হুবার (Huber) স্যান্‌গুইনিয়াদের (Sanguinea) যুদ্ধপ্রণালী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

প্রাতে দশটায় ইহাদের একদল সৈন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ পিপীলিকা-দুর্গাভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। সে স্থানে উপনীত হইয়া ইহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। কতকগুলি কালো পিপীলিকা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং আক্রমণকারীদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া উহাদিগের অনেককে পরাজিত ও বন্দী করিয়া ফেলিল। এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায় অবশিষ্ট আক্রমণকারীরা পশ্চাৎবর্ত্তী সৈন্যগণের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। দলবৃদ্ধি হওয়ার পরও কিছু কাল ইহারা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল এবং নিজেদের দুর্গে ক্রমাগতই দূত প্রেরণ করিতে লাগিল। এইরূপ সংবাদ প্রেরণের ফলে অবিলম্বে আরও অধিকসংখ্যক সৈন্য আসিয়া ইহাদের দলপুষ্টি করিল। কিন্তু তবুও ইহারা যুদ্ধে লিপ্ত হইলনা; অবশেষে কৃষ্ণপিপীলিকাগণ দুর্গ হইতে এক সঙ্গে দল বাঁধিয়া বাহির হইল এবং দুই দলে শীঘ্রই কতকগুলি খণ্ড যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কোনও প্রকার মীমাংসা হইবার বহু পূর্ব্বেই নিগ্রোর পিপীলিকাগণ তাহাদিগের গুটী ও কীটগুলিকে—গৃহের দূরতম প্রদেশে স্থানান্তরিত করিয়াছিল। এখন যুদ্ধে পরাজয় সুনিশ্চিত বুঝিতে পারিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়া ইহারা গুটী ও কীটগুলিকে লইয়া পলায়ন প্রয়াসী হইল। কিন্তু ইহাতে আক্রমণকারীরা বাধা প্রদান করায় অবশেষে বাধ্য হইয়া—যাবতীয় গুটী ও কীটগুলিকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া যে যে দিকে পারে পলায়ন করিল। বিজেতারা সে

রাত্রি ও পর দিবস একদল সৈন্যকে পাহারায় রাখিয়া—সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য নিজেদের দুর্গে স্থানান্তরিত করিল।

বুকনার (Buchner) বলেন—

একই জাতীয় পিপীলিকাদের ভিতর যুদ্ধবিবাদ সংঘটিত হইলে অনেক সময়ই এই আন্তর্জ্জাতিক সংগ্রাম স্থায়ী সখ্যতায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যাই যদি অল্প থাকে। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণীরা এরূপ স্থলে মানুষের অপেক্ষা অনেক শীঘ্র ও সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে যে এরূপ সংগ্রামে কেবল নিজেদেরই ধ্বংস সাধিত হইতেছে। এস্থলে সখ্যতা ও একতায় উহাদের উভয় পক্ষেরই উপকার ও মঙ্গল সংঘটিত হইবে। সময় সময় উহারা সম্পূর্ণ বন্ধু ভাবেই—অন্যকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। ফোরেল একবার একটী টেবিলের উপর স্বভাবশান্ত Lepto thorax acervoram জাতীয় পিপীলিকাদের একটী গৃহ সংস্থাপিত করেন এবং তাহার উপর অন্য একটী বিবর হইতে সেই জাতীয় অন্য কতকগুলি পিপীলিকা ছাড়িয়া দেন। ইহারা সংখ্যায় অনেক অধিক ছিল সেইজন্য শীঘ্রই সেই পিপীলিকাগৃহ হইতে পূর্ব্বের পিপীলিকা গৃহীগুলিকে বিতাড়িত করিয়া সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিল। গৃহবহিষ্কৃত পিপীলিকারা এ বিপদে কোথায় যাইবে কি করিবে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না সুতরাং অগত্যা শত্রু অধিকৃত গৃহাভিমুখেই ফিরিয়া আসিল। প্রতিপক্ষীয়গণ তখন তাহাদিগকে এক একটী করিয়া ধৃত করতঃ যথাসম্ভব দূরস্থানে রাখিয়া আসিতে লাগিল। যতবার ইহারা ফিরিয়া আসিতে লাগিল ততই তাহারা অধিক দূরে নীত হইতে লাগিল। একটী পিপীলিকা এইরূপ ভাবে একটী পরাজিত পিপীলিকাকে ধৃত করিয়া টেবিলের একেবারে প্রান্তদেশে উপনীত হইল এবং "তাহাদের পৃথিবীর" একেবারে শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া নির্দ্দয় ভাবে সেই পিপীলিকাটীকে একেবারে অসীম শূন্য পথে ছাড়িয়া দিল। মুহূর্ত্তেক সময় সেখানে অপেক্ষা করিয়া পিপীলিকাটী সম্পূর্ণ-রূপে দূরীকৃত হইয়াছে কিনা তাহা দেখিয়া তবে সে গৃহে ফিরিয়া আসিল। ফোরেল পরিত্যক্ত পিপীলিকাটীকে মাটী হইতে তুলিয়া লইয়া একেবারে নিক্ষেপ্তার সম্মুখে ছাড়িয়া দিলেন। সে ইহাকে পুনর্ব্বার ধৃত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নিম্নে নিক্ষেপ করিল। তিনি যে কয়েকবারই পিপীলিকাটীকে টেবিলে তুলিয়া দিয়া-ছিলেন প্রতিবারই সে একইভাবে শূন্য পথে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। অবশেষে তিনি উভয় পক্ষের পিপীলিকাগুলিকেই একস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং কিছুকাল পরে উহারা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে লাগিল।

প্রতিপক্ষীয়দের প্রতি যথাসম্ভব সদ্ব্যবহারের একটী দৃষ্টান্ত দিলাম। অনেক সময় কিন্তু আবার দেখা যায় সম্পূর্ণ অনাবশ্যক স্থলেও পিপীলিকারা শত্রুদের প্রতি ভয়ানক নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া থাকে।

অন্যস্থলে বুকনার লিখিয়াছেন—(১)

"দুর্গদ্বার গুলি সাধারণতঃ বিশেষ ভাবে নিযুক্ত রক্ষীদিগের দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। এই রক্ষীরা নানা উপায়ে তাহাদের কার্য্য সম্পাদন করে। ফোরেল একটী Colobopsis truncata জাতীয় পিপীলিকা দুর্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবেশপথগুলি সৈন্যগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত থাকিতে দেখিয়াছেন। ইহারা ইহাদের স্থূল মস্তক সমূহদ্বারা এই দ্বারগুলি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—ঠিক বোতলের মুখ ছিপিদ্বারা যেরূপ আবদ্ধ থাকে। ইনি Myrmecina Latreillei জাতীয় পিপীলিকাদিগকে দ্বারদেশে এইরূপ এক একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া রাখিতে দেখিয়াছেন। উহারা দ্বারগুলি মস্তক কিম্বা উদর দ্বারা সম্পূর্ণ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। Componotus জাতীয় পিপীলিকারাও প্রবেশ পথে মস্তক বহির্গত করিয়া দিয়া দুর্গদ্বার সংরক্ষণ করিয়া থাকে এবং এইরূপে অবস্থিত থাকিয়া প্রত্যেক আক্রমণকারী শত্রুকেই দেহের সমুদয় বলের সহিত ধাকা দেয় অথবা দংশন করে। ম্যাক্ কুক্ (Mac cook) পেন্সিলভেনিয়ার স্তূপনির্ম্মাতা পিপীলিকাদের উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহাদের দুর্গদ্বারে শাস্ত্রীরা পাহারা দেয় এবং বিপদের একটু সন্ধান পাইলেই—অমনি ইহারা শত্রুর প্রতিরোধের জন্য ছুটিয়া বাহির হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—নিতান্ত অত্যল্প কালের মধ্যেই বিপদবার্ত্তা গৃহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং সাতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিতই যাবতীয় সৈনিকেরা একযোগে শত্রুর প্রতিরোধ করিবার জন্য দুর্গের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। Lasius জাতীয় পিপীলিকারাও সমান বিক্রমে ও সমান তৎপরতার সহিত তাহাদের সুবিস্তৃত দুর্গের প্রবেশ পথগুলি রক্ষিত করিয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য ভীরু সম্প্রদায়ের পিপীলিকারা উহাদের গুটী ও কীট এবং গর্ভবতী রমণী পিপীলিকাদিগকে লইয়া যতশীঘ্র সম্ভব পলায়ন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। Lasius রা প্রত্যেকটী প্রবেশদ্বার যথাসম্ভব শক্তিশালী শাস্ত্রী কর্ত্তৃক উত্তমরূপে সুরক্ষিত ও আবদ্ধ করিয়া ফেলে, যাহাতে আক্রমণকারীরা একযোগে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে না পারে। আক্রমণকারীরা সংখ্যায় অসম্ভব রূপ অধিক না হইলে এইরূপ সুরক্ষণের ফলে যুদ্ধ বহুদিন ব্যাপিয়া সংঘটিত হইতে থাকে। এই সময় মধ্যে অতিরিক্ত শ্রামিক পিপীলিকারা দুর্গ হইতে পশ্চাৎ দিকে সুরঙ্গ কাটিয়া অগ্রসর হয় এবং দুর্গরক্ষা অসম্ভব হইলে এই গুপ্তপথে যাহাতে পলায়ন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করে।

দাসপ্রিয় পিপীলিকাদের যুদ্ধের কথা সংক্ষেপে বলিলাম। কৃষিজীবি পিপীলিকারাও সময় সময় অতি ভীষণ সমরে নিরত হয়।

Moggridge বর্ণনা করিয়াছেন,—

যত সংগ্রাম দেখিয়াছি তাহার মধ্যে এক স্থলে একই জাতীয় পিপীলিকাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার মত ভীষণ ও মারাত্মক—সংগ্রাম আর কখনো দেখি নাই। ইহারা A. barbara সম্প্রদায়। শস্য লুণ্ঠনের জন্য ইহারা সেই

জাতীয়ই অন্য সম্প্রদায়ের পিপীলিকার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল।

অন্য যে সকল জাতীয় পিপীলিকাকে আমি যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি—সে সকল স্থলে সাধারণতঃ অতি অল্প সময় ব্যাপিয়াই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে—কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন। কিন্তু A. barbaraরা দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ যুদ্ধ চালাইতে থাকে। এইরূপ একটী যুদ্ধে—এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের গৃহ আক্রমণ করিয়া প্রায় ৬০ দিন যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ৮ই জানুয়ারী যুদ্ধ আরম্ভ হয় ও ৪ঠা মার্চ্চ সে যুদ্ধের শেষ হয়!

অবশ্য ৬০ দিন অবিশ্রান্তই যে তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারিনা। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে প্রতি সপ্তাহে যে দুই দিন আমি সেস্থলে উপস্থিত হইয়াছি—তখনই উহাদিগকে ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত দেখিয়াছি।

শ্রীসুধাংশু কুমার চৌধুরী।

লাইকা

(২৮)

বেলা তিন প্রহরের পর একবার সজোরে বৃষ্টি নামিল। লাইকা তখন অন্যান্য কয়েকটী গ্রামস্থ লোকের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিল। কিন্তু বালক কোথায়? এই জলের সময় সে কোথায় গেল? সন্ধান লইয়া জানিল যে সে এই মন্দিরের পশ্চাতে বসিয়া আছে।

অতি অল্প পরিসর গৃহভিত্তিরই এক অংশ,—তাহাতে কোনরূপে মাথা বাঁকাইয়া বারি বসিয়া ছিল,—লাইকা আসিয়া বলিল "এইখানে বসিয়া আছ? কেন শরণ! মানুষের কাছে তুমি থাকিতে ভালবাস না কেন?"

বারি উত্তর দিল না, সবিস্ময়ে লাইকা ভাবিল—যে জন সন্ন্যাসীর সঙ্গী ভিক্ষাই যাহার জীবিকা—সে বালক এমন অভিমানী কেন? অতি ক্ষুদ্র কথার বেগও এ সহ্য করিতে পারেনা! কথার উত্তর নাই কিন্তু শুষ্ক মুখ সহসা এমন আরক্ত হইয়া উঠিল কেন? কিন্তু তখন লাইকা আর তাহাকে কিছু বলিল না,—গৃহমধ্যে আশ্রয় লইতে বলিয়া চলিয়া গেল।

ক্রমাগত বৃষ্টি চলিতেছিল,—সন্ধ্যার পর লাইকা ভৈরব মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দেখিল—সেখানে বড় জল আসিতেছে,—দ্বারের নিকট সঙ্কুচিত ভাবে বারিকে দাঁড়াইতে দেখিয়া বলিল, "এখানে যে আজ ভারী জলের ঝাপটা বিছানা কোথায় হইবে?"

বারি বলিল "তাহাই ভাবিতেছিলাম!"

"দুর্গামন্দিরের পাশের ঘরে আজ থাকিতে হইবে। ঘরে আমার মোটে ঘুম হয় না—কিন্তু কি করিব?" শুনিয়া বারি লাইকার শয্যা

বস্ত্রাদি তুলিয়া বলিল, "তবে আমি সেখানে যাই ?"

হাসিয়া লাইকা বলিল—"এখনি ? ভাল, যাও।"

আরতি ভোগ শেষ হইয়া গেলে লাইকা আসিয়া দেখিল বারি শুইয়াছে,—সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া সে আজ তাঁহার অভ্যাসের বিপরীতে—অর্থাৎ লাইকার শয়নের পূর্ব্বেই শয়ন করিয়াছিল! তাহার আগমন জানিতে পারিলনা দেখিয়া লাইকা নীরবে তাহার মাথার কাছে আসিয়া বসিল। মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত, তাহার হাতখানিকে হাতের মধ্যে লইয়া সস্নেহে বলিল,—"আজ এত শীঘ্র শয়ন করিয়াছ কেন? কোন অসুখ বোধ কর নাই ত ?"

বারি চমকিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু লাইকা তাহাতে বাধা দিল—,আর সে তাহার শয্যার এত নিকটে বসিয়া যে উঠিতে হইলে প্রায় তাহার দেহে দেহ স্পর্শ সম্ভাবনা;—তখন সঙ্কুচিত ভাবে বারি বলিল,—আজ বড় শীত,—তাই—"

হাসিয়া লাইকা বলিল,—"তাহা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি! যখন তুমি স্নান করিয়া ফিরিতেছিলে তখনি আমার কেমন সন্দেহ হইয়াছিল যে তোমার শরীর আজ অসুস্থ! কিন্তু সন্ধ্যাতেও আহার করিয়াছ কেন ?"

কম্বলাবরণের মধ্যে বারির চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া লাইকা হাসিয়া বলিল—"না ভয় পাইওনা সে খাদ্য তুমি আহার করিতে পার নাই তাহাও আমি দেখিয়াছি! কিন্তু এ ফাঁকিটুকু কেন শরণ? আমার কাছে যখন তুমি আছ,—তখন তোমার সকল দুঃখ সকল কথা আমায় লুকাইলে চলিবে কেন ভাই ?"

বারি নিরুত্তর;—লাইকা তাহার উষ্ণ ললাটে করসঞ্চালন করিতে লাগিল। একবার বারি তাহাতে প্রতিবাদের ক্ষীণ প্রয়াস করিয়াছিল—কিন্তু লাইকা তাহা শুনিল না। বারির উপাধানে অশ্রুজলেরও চিহ্ন দেখা যায়—কিন্তু লাইকা সে প্রসঙ্গ করিল না। রাত্রি অধিক হইতেছিল—বারি বলিল—"আর থাক, আপনি শয়ন করুন!"

"করিতেছি,—শরণ! তোমায় কয়েকটি প্রশ্ন করিব—উত্তর করিবে কি ?—"

লাইকা তাহার এত সন্নিকটে আসিয়া বসিয়াছিল যে তাহার জানুতে বারির মস্তক স্পর্শ করিল—এবং মুখ তুলিতেই বারি দেখিল স্বামীর চক্ষু প্রায় তাহার চক্ষুর উপরই স্নেহবর্ষণোদ্যত! তাহার শ্বাস প্রবল হইল—সে প্রাণের মধ্যে কি একটা ব্যথাপূর্ণ সুখানুভব করিল। লাইকা বলিতেছিল—আমার কাছে তোমার কোন আশঙ্কা নাই—কিছু ভয় নাই একটি কথার উত্তর আমায় দাও!"

বারি স্থির হইয়া ছিল—লাইকা বলিল—"কি কষ্টে সর্ব্বদা তুমি এমন কাতর হইয়া থাক? কিসের অভাব তোমার পীড়িত করে?—আমায় বলিতে কি তোমার কোন বাধা আছে ?"

একটু থামিয়া বারি বলিল,—"কিছু না!"

"সুখী হইলাম! বল শরণ! তোমার কি কষ্ট আমায় সব বল; যদিও আমি

সামান্য তবু বড় ইচ্ছা করে যে তোমার এই নির্ব্বাক ব্যথাগুলি আমি দুইহাতে ঠেলিয়া ফেলি! এই বয়স তোমার, আর এত—না শরণ! তাহা হইবে না, এমন জীবনটিকে ব্যর্থ হইতে দিও না—তুমি ঠিক্ জানিও ভগবানের উদ্দেশ্য,—মানব জন্মের সার্থকতা—যে বিফল করিতে চায় সেই তাঁহার ইচ্ছা—" বলিতে বলিতে লাইকার স্বর স্তম্ভিত হইল! মাথার নিকট দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দে বারি চাহিয়া দেখিল স্বামী একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া আছেন—বিশাল নয়ন তরলতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সে দৃষ্টিতে অগাধ স্নেহ আর প্রশান্ত আত্মপ্রকাশ! পুলকিত অথচ লজ্জাহত ভাবে সে বালিসে মুখ চাপিবার চেষ্টা করিল। তাহাতেও লাইকা বাধা দিল—

"না, আজ তাহা হইবে না। কেন তুমি আমায় এত সঙ্কোচ করিবে? আমি তোমার নিকট কেবল প্রভুর সেবাই পাইব—বন্ধুর ভালবাসা পাইব না—এ ত আমার পক্ষে অসহ্য শরণ!"—

বারি উত্তর করিল না কিন্তু এতক্ষণ ধরিয়া যেন নিজের মস্তকটি যত্নে লাইকার স্পর্শ বাঁচাইয়া আড়ষ্ট হইয়া ছিল—এবারে আপন'কে ছাড়িয়া দিয়া—মস্তক ও শরীরের অর্দ্ধাংশ প্রায় লাইকার পদতলে সমর্পণ করিল! তখন সযত্নে তাহাকে নিকটে লইয়া লাইকা বাহুতে ভর দিয়া অর্দ্ধশায়িত হইল।

কিছুক্ষণ পরে লাইকা বলিল—"তোমার পিতামাতা নাই—না?—

বারি নীরব—, লাইকা আবার বলিল, "বলিতে কি তোমার আপত্তি আছে?"

বারি বলিল, "না"—

তখন কোমলমধুর স্বরে লাইকা বলিল —"তবে বল না ভাই?—সব কথাতেই নীরব কেন?"

বারি বলিল—"কি বলিব আজ্ঞা করুন।"—

লাইকা উচ্চ হাসিল?—"আজ্ঞা করিব? —তুমি করজোড়ে "ক্ষমা আজ্ঞা প্রভু?" বলিতে পারিবে ত?"—

হাসিয়া হাসিয়া একটু স্থির হইয়া লাইয়া বলিল—"সত্য বল না—, তোমার কি কেহ নাই?"

""আছেন বৈ কি! সকলেই আছেন।"

আশ্চর্য্য হইয়া লাইকা বলিল—"সকলেই আছেন? মানে কি—? তোমার পিতামাতা আছেন?"—

মৃদু অকম্পিত স্বরে বারি বলিল— "আছেন"।

পূর্ণ বিস্ময়ে লাইকা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিল—পরে বলিল,—"তবে তুমি গৃহত্যাগ করিয়াছ কেন?"—

"আমার অদৃষ্ট!"—

ইহার পর দুইজনেই নীরব থাকিল,— নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা এতক্ষণ স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছিল—এইবার নিভিয়া গেল।— বাহিরে ভেক ও ঝিল্লির প্রবল শব্দ। অনতিদূরে কোন মন্দিরে কে গান ধরিয়াছে—"সীয়া সঙ্গ রামজীও মিলন ভয়ো!—"

একসঙ্গে দুই জনেরই দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ মিলিল,—মৃদু হাসিয়া লাইকা বলিল,

—"অদৃষ্ট?—সে কথা মিথ্যা নহে!—অদৃষ্টের বন্ধন কেহ ছেদন করিতে পারে না ইহা আমিও জানি!—নিজের দুর্ব্বুদ্ধি ও অদৃষ্ট—এই দুইটির পরস্পর দ্বন্দে আমার জীবনের কত কি যে বলি দিয়াছি—তাহা তোমায় কি বলিব বালক!—কিন্তু তবু জানিও, চেষ্টা করিয়াছি,—চির জীবনটা নিজের শান্তির জন্য—সুখের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছি!—ফল কি হইয়াছে তা জানি না—তবু কাহারো কষ্ট বা বেদনা দেখিলে তাহা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে ইচ্ছা হয়!—"

বারি চমকিয়া স্বামীর প্রতি চাহিল;—কিন্তু অন্ধকার, কিছু দেখা গেল না। লাইকা বলিল "আজ কয়দিন তোমার ম্লান মুখ দেখিয়া আমার প্রাণ যেন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।—যদি কিছু বল—যদি আমার দ্বারা শান্তির কোন উপায় থাকে—" অথবা—

সহসা লাইকা থামিল।—একটা তীব্র বিদ্যুতালোকের উজ্জ্বল দীপ্তিতে দুইজনেই দুইজনার মুখ দেখিতে পাইল। বারির মুখে প্রশ্নসূচক আশঙ্কা—আর লাইকার চক্ষে অশ্রুময় করুণা!—

বাহিরে গুরু গুরু মেঘ ডাকিল,—তালের উচ্চ শিরে বাতাস বাজিতেছিল। দ্রুত কম্পিত হৃদয়াবেগের সহিত বারি বলিল,—আর যদি আমি আপনার কাছে কোন অপরাধ করিয়া থাকি,—"

বিস্ময়ত্বরিত স্বরে লাইকা বলিল,—"অপরাধ? আমার নিকট অপরাধ? তুমি হাসাইলে শরণ! আমার কাছে তুমি কোন অপরাধ কর নাই—বরং তোমার সেবা ভক্তি আমায় আশ্চর্য্য করিয়াছে। আর ধর যদি কিছু অপরাধ করিতেই—"

বাধা দিয়া বারি বলিল,—"করিয়াছি—আমি আপনার নিকট বড় দোষ করিয়াছি জানিবেন? কিন্তু আমার যেন আশা হয়—আপনার নিকট তাহার ক্ষমাও—"

আর বলা হইল না, লাইকা বেশ বুঝিল কোন বন্যায় এ বাক্যরাশি ভাসিয়া গেল!—বারির ধৃত হস্তখানি মুষ্টিমধ্যে পেষণ করিয়া লাইকা বলিল,—আমি বুঝিতে পারিতেছি না তুমি কেন ও কথা বলিতেছ? কিন্তু জান কি তুমি?—না না, এই সামান্য কথা লইয়া এমন কষ্ট পাইও না শরণ! সত্যই ইহাতে আমার কষ্ট হইতেছে!—সংসারে চাহিয়া দেখিলে কি দেখা যায় দেখিয়াছ কি?—মানুষ কার্য্যশেষে কয়টাতে সাফল্য বা তৃপ্তি পায় বল দেখি?—কত অনুশোচনা কত অতৃপ্তি কত পরিতাপ!—জগৎ প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী—লক্ষ্য করিয়া দেখিও পরস্পর ওতঃপ্রোত ভাবে অপরাধ করিতেছে—কিন্তু ইহার মধ্যে দণ্ডদাতা কে?—যেখানে প্রত্যেকে ক্ষমাভিক্ষু সেখানে কার অধিকার প্রবল তাহা কে বলিতে পারে?—"

বারি বোধ হয় কথাটা বুঝিল না, বলিল,—"আমার অপরাধ আপনি জানেন না,—"

লাইকা হাসিয়া বলিল,—"জানিলে তোমার দূর করিয়া দিতাম!—এইত তোমার বক্তব্য?—কিন্তু ওরে শিশু! তুইও জানিস না—যে ক্ষমা নামক বস্তুটির সম্বন্ধে

একটা পরিতৃপ্তিময় পূর্ণ মীমাংসা যদি আমি না পাইতাম তবে আমার নিজের জীবনেরই সমস্ত অপরাধ সমস্ত দণ্ড এই হতভাগ্য লাইকাকে—"

বলিতে বলিতে লাইকা একবার থামিল, —পরে আবার বলিতে লাগিল।—"হাঁ, সে কথা থাক্?—শোন শরণ!—ক্ষমা নামটি আর যে কেহ যে ভাবে উচ্চারণ করুন না কেন,—আমার নিকট উহার মূল্য অনেক! —আমি উহাকে যেমন ভাবে গ্রহণ করিয়াছি —এমন বোধ হয় অতি অল্প লোকেই করে—তাই এই কথা বলিতে গিয়া আমার অন্তর বিচলিত হইয়া উঠে। তুমি আর অনর্থক ক্ষমা ক্ষমা বলিও না—যদি কোন দোষ থাকেই তোমার ভগবান তোমায় মার্জ্জনা করুন! আমার নিকট কেন ম্লান হও ভাই?"—

বারি আর কথা বলিতে পারিল না;—তাহার উদ্বিগ্ন-নত হৃদয়ে লাইকার সঙ্গীত-মধুর কণ্ঠস্বর—পরিপূর্ণ ক্ষমায়—ভালবাসায় বিগলিত কথাগুলি অপূর্ব্ব ধ্বনিতে বাজিতে লাগিল—"এই দেবতা কি তাহারই স্বামী? —জীবনের জন্মের এতবড় সার্থকতা কি সত্যই সে পাইয়াছে?—দেবতা! অদৃষ্ট! ভগবান! কেমন করিয়া—সমস্ত দেহে কতখানি লুটাইয়া সে তোমার চরণে প্রণাম করিবে প্রভু!—এ কৃতার্থতা সে তোমায় কেমন করিয়া দান করিবে? আর স্বামী! তাঁহাকে সে কি দিতে পারে?—এই অভিমানিনী আত্মপ্রেমগর্ব্বিতা নারী—! হায় হায়! সে এতদিন কি ইহা বুঝিত?—আজ তাহার সমস্ত দর্প সকল গর্ব্ব চূর্ণীকৃত ধূলিমুষ্টি! এস হে,—চিরবাঞ্ছিত! আজ এই দগ্ধ অভিমানের চিতা ভস্ম তোমার চরণে মাখাইয়া দিই—সদানন্দ ভোলানাথ!—এই তোমার যোগ্য —এই তোমার একমাত্র উপযুক্ত পূজার উপাদান!—

বারিকে নীরব দেখিয়া লাইকা আর কিছু বলে নাই,—অনেকক্ষণ মৌনের পর বলিল—"তোমার কি ঘুম পাইতেছে?"—

বারি বলিল—"না, কিন্তু প্রভু!"—

লাইকা উচ্চ হাসিল! "প্রভু কিরে পাগল?—কে কার প্রভু"—

বারি সত্যই অন্যমনস্কে সেকথা উচ্চারণ করিয়াছিল,—লাইকার হাসিতে লজ্জিত হইয়া মুখ লুকাইল।—তখন তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া হাসির সহিত গুঞ্জন স্বরে লাইকা বলিল—"একটি গান শুনিবি ভাই?—আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে একটু গান গাহিতে।"—

কি জানি কেমন অপূর্ব্ব সুখাবেগে বারির শরীরে যেন বিদ্যুৎ শিহরিয়া উঠিল!—সমস্ত দেহের গ্লানি ভুলিয়া সে পাশ ফিরিল—তাহার চরণে হাত রাখিবা মাত্র পা টানিয়া লাইকা বলিল—বটে! এই বুঝি! না, তোকে আর আমি পারিব না!—কিন্তু শরণ, তুইত আমাকে তোর কোন কথাই বলিলি না?—"

হাসিয়া বারি বলিল,—"বলিব না কেন সব বলিব!"

আরও হাসিয়া লাইকা বলিল—"কেবলি ফাঁকি!—তুই বড় দুষ্ট!"—

বারির মস্তক লাইকার বক্ষ স্পর্শ করিয়াছিল,—লাইকা তাহাতে একটু চাপ

দিল—বারিও তাহাতে ভর দিল,—উত্তরের প্রত্যাশায় লাইকা তাহার প্রতি চাহিয়া উৎকীর্ণ হইয়াছিল—প্রথমে একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস—তাহার পরে বারি বলিল—"আজি আর পারিব না!—কাল—কাল আমার কথাটুকু বলিয়া শেষ করিব—নিশ্চয় কাল শেষ হইবে,—হয় আমার—

সে নীরব হইল—এবং লাইকা বিস্মিত হইল। এ বালকচরিত্র সত্যই দুর্জ্জয়!"—

তথাপি লাইকা সেদিন প্রফুল্ল হইল। এই বালকের ভাবেভঙ্গিতে কথায় সে বড় কৌতুক বোধ করিত আশ্চর্য্য হইত। সাধারণ লোকের অপেক্ষা সে যে অনেক খানি তাহার প্রাণস্পর্শ করিয়াছে—তাহাও সে বুঝিয়াছিল। এ বালক আর তাহার বড় দূরের নয়—সহজত্যজ্য নয় উপেক্ষার নয়—ইহা ভাবিতে লাইকা ব্যথা না পাইয়া এত সুখ বোধ করে কেন? ইহা ভাবিয়াও সে আশ্চর্য্য হইয়াছিল! তাই তাহাকে আজ কিছু প্রকাশিত ভাবে পাইয়া লাইকা বড় প্রফুল্ল হইল।

প্রভাতে উঠিয়া বলিল,—"তুমি আজ বাহিরে আসিও না,—বড় শীতল বাতাস!" —তাহার পর স্নানান্তে পুষ্প লইয়া পূজায় বসিয়া লাইকা আরাধ্য দেবতার নিকট বালকের কুশল প্রার্থনা করিল!—আজ তাহার প্রাণে অকারণে যে হর্ষউজ্জ্বলতা সঞ্চিত হইয়াছে -হাঁ কতকটা অকারণ বৈকি!—যদিও সংসারে কেহ কাহারও পর বা আপন নয়—নিজের স্বার্থের উপরই অনিষ্ট সম্বন্ধের বিচার নির্ভর করে,—তবু এই সহসাগত তরুণ মানবটির হৃদয় লইয়া লাইকার এতখানি উৎকণ্ঠা ও তাহার কষ্ট নিবৃত্তির আশায় এমন আনন্দোদ্বেগ তাহা অকারণ বৈকি?—তবু সে ভাবিয়া পাইল না কোন্ অদৃশ্য হস্তের আকর্ষণে আজ সে কেবলই বালকের কাছে ছুটিতে যায়—শুধু শুধু তাহাকে দুটা কথা বলিয়া আসিতে চায়—তাহার লজ্জারুদ্ধ কণ্ঠের একটু অস্পষ্ট স্বর শুনিতে চায়!

প্রভাতের কোমল আলোক দেখিয়া আজ লাইকা বড় প্রসন্ন হইল,—পুষ্পবনের স্নিগ্ধ সুগন্ধে সেদিন যেন অভিনব সৌন্দর্য্য দেখিল! সরোবরজল বুঝি আজ তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া স্পর্শ করিল! আনন্দ! কারণহীন প্রসন্নতার স্বার্থগন্ধহীন স্নেহের জয়ে পরম প্রশান্তির নিরাবিল আনন্দ!—তাই আজি সে জীবনদেবতার চরণে সে সুখ নিবেদন করিয়া—তাহার কারণস্বরূপ বালকের মঙ্গল প্রার্থনা করিল।—প্রসাদী ফুল আনিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ দিল।

আহারাদির পর একবার লাইকা তাহার অন্বেষণ করিতেছিল,—কিন্তু একটু আশ্চর্য্য —আজ সে কেবলি লুকাইয়া বেড়াইতেছে কেন? তাহার স্বভাব বিরুদ্ধে—আজ সে কেবলি মানুষের সঙ্গে ঘুরিতেছে। এতক্ষণ দুর্গামন্দিরে লোক ছিল সেও বসিয়া ছিল। আবার জনশূন্য দেখিয়া মন্দিরের মর্ম্মরসোপানশ্রেণীর নিকট বসিয়া তাহার প্রবল চীৎকার বা গীত শুনিতেছে!

লাইকা যেন বিস্মিত হইল! আবার একটু হাসিলও!—

সন্ধ্যার পর যথারীতি পূজান্তে আসিয়া

সে দেখিল—বালক অন্ধকারে আচ্ছন্নপ্রায় কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আস্তৃত শয্যায় লাইকা শুইয়া পড়িল!—তখন সেও উঠিয়া আপনার স্থানে আসিল। বিষম গ্রীষ্ম—ততোধিক বিষম এই মৌনতা!—কেন বালক আজ এত নীরব? কেন সে অন্য দিনের ন্যায় তাহার আগমনে সচকিত হইল না? তাহাকে গ্রীষ্মপীড়িত দেখিয়া তালবৃন্ত লইয়া ছুটিয়া আসিল না? এই নবজাত মনঃক্ষোভে লাইকা যেন কাতর হইয়া উঠিল।

রাত্রি গভীর হইতেছে—চারিদিক নিস্তব্ধ—বারির শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনিয়া বোধ হয় সে নিদ্রিত!—একটি ক্ষুদ্র মেঘে লাইকার প্রাণ যেন আঁধার হইয়া গেল! হায় সে এই বালককে যতখানি আপনার ভাবিয়াছে—সেত তাহা নহে!

রজনী দ্বিতীয় প্রহর! গ্রামের কোটাল মহা চীৎকার ঘোষণা করিল—"রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর!" নিদ্রাভঙ্গে বারি দেখিল লাইকা ঘরে নাই!—বাহিরে ও কে শুইয়া? তিনিই কি? সচকিতে সে বাহিরে আসিল। মৃত্তিকায় বাহুতে মাথা দিয়া তিনিই ত—যেন কিছু অস্থির, নিদ্রাহীন! উদ্বিগ্নভাবে বারি বলিল "মাটিতে কেন? বিছানা আনিয়া দিই?"

লাইকা বলিল—"কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, ঘরে বড় গ্রীষ্ম তাই এখানে আসিয়াছি! তুমি ঘরে যাও!"—বারি সেকথার উত্তর না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। নিশ্বাস ফেলিয়া লাইকা ভাবিল, "কি সুদৃঢ় আচরণ এই বালকের! কোনখানেই ইহার মধ্যে প্রবেশ যায় নাই! কিন্তু—লাইকা কেন তাহার কথা ভাবিয়া এমন অস্থির হইতেছে? সামান্য একজন মৌনপ্রায় রহস্যময় বালকের চিন্তায় সেই বা এমন অধীর কেন? নাই বা পাইল তাহার পরিচয়—তাহাতে এত ব্যাকুলতার প্রয়োজন কি? নিজের হৃদয়ের অকারণ চাঞ্চল্যে লাইকা কিছু আশ্চর্য্য হইল—ভাবিল আর তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিবে না—সহজ ভাবে—সাধারণ মানুষের ন্যায় চলিতে হইবে।

বারি ফিরিলে লাইকা বলিল,—"আজ তুমি আছ কেমন বল দেখি? সন্ধ্যায় প্রশ্ন করিতে ভুলিয়াছিলাম!"

"আমি ত আজ বেশ ভালই আছি!"—বলিতে বলিতে বারি ঘরে গিয়া শয্যা আনিয়া লাইকার নিকট বিছাইল—এবং একখানি ব্যজনী আনিয়া নিকটে বসিয়া বীজন করিতে লাগিল। অলিন্দের পার্শ্ব দিয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিতেছে—সম্মুখে আমলকী তরুর পাতা কাঁপাইয়া ঝিরি ঝিরি বাতাস আসিতেছে।

সহসা লাইকা বলিল,—ভাল শরণ! "তুমি আমার কাছে কতদিন থাকিবে?"—

অতর্কিত প্রশ্ন! বারির হস্তের ব্যজনী শিথিল হইল—সে চমকিত আর্ত্তস্বরে বলিল—কতদিন থাকিব? কেন?—

এ প্রশ্ন কেন আজ? এ প্রশ্নের অর্থ কি?"

লাইকা চাহিল। সত্যই ত এ প্রশ্ন কেন করিল সে?—চাহিয়া দেখিল বালকের মুখ বেদনায় মলিন হইয়া গিয়াছে।

কণ্ঠস্বরের কাতরতাও লাইকাকে ব্যথিত করিল! বুঝিল তাহার প্রাণের গূঢ় অভিলাষ লুকাইতে গিয়া সে তাহাই প্রকাশ করিয়াছে—! আহা দুঃখি! তোর উপর রাগ কি করিতে পারা যায়!—তখন ব্যস্তভাবে ফিরিয়া লাইকা তাহার হাত ধরিল—বলিল—"ওকি শরণ! তুমি অন্য অর্থ করলে যে? আমত তাহা বলি নাই?—আমি ভাবিয়াছিলাম এই যে যদি আমার কাছে থাকিতে তোমার বিরক্তি বোধ হয় তাহা আমায় জানাইবে কি না তাই!"

"বিরক্ত বোধ কেন হইবে?"—বারির এই কথায় হাসিয়া বলিল—"কেন? বিরক্ত হইবার কি কিছু কারণ থাকিতে পারে না?"—বারি বলিল— "আমার থাকিতে পারে না নিশ্চয়—তবে আপনি—"

বারি থামিয়া গেল,—তখন অভিমান ভুলিয়া লাইকার হৃদয় আবার প্রফুল্ল হইতেছিল—সে সবিস্ময়ে বলিল—"আমার বিরক্তি! তাই বটে! তাই আজি দিনমান তোমার নিকট হইতে পলাইয়া বেড়াইয়াছি!"

লজ্জিত আনন্দে বারি মুখ ফিরাইল। সে হাসি সে ভঙ্গী লাইকার চক্ষে বড় নূতন বড় সুন্দর বোধ হইতেছিল—সে বারির জানুর উপর মাথা রাখিয়া সস্পৃহ চক্ষে তাহাকে দেখিতে দেখিতে বলিল—

"সত্যই বিশ্বাস করিস ভাই—আমি তোমাকে বড়—বড় ভালবাসিয়াছি!—"

হৃদয়ের স্পন্দনে বারির মাথা নীচু ও হাসি অদৃশ্য হইল! তখন লাইকা তাহার বক্র মুখখানি ধরিয়া ফিরাইবার চেষ্টায় ছিল—সে তাহাতে আরও আড়ষ্ট হইয়া উঠিল! হাতের পাখা পড়িয়া গেল। তাহার গণ্ডদেশে আদরের আঘাত দিয়া লাইকা বলিল,—"সব তাতেই ম্লান! একটু আদরও সহ্য হয় না! এত কোমলতা লইয়া তোকে কে পুরুষ করিয়াছিল তাই ভাবি!—আর শরণ! আমি অনুমান করি তুই যদি স্ত্রীলোক হইয়া জন্ম লইতিস্,—তবে কত রাজাধিরাজ তোর পায়ে লুটাইত!" বলিতে বলিতে উচ্চ হাসিল।

কিন্তু একথায় বারি হাসিল না। তখন লাইকা বলিল—"কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য পিতামাতা তোকে ছাড়িয়ে দিলেন কেন?—তোর মনে আছে কি? কাল আমার একথার উত্তর দিতে চাহিয়াছিস্ তুই!—বলিবি কি সব কথা?—ও কি! মুখ ভার করিস্ কেন? তবে থাক্!"

একটু বিষণ্ণ হাসিয়া বারি বলিল—"কেন? থাকিবে কেন? আজই সব বলিব! কিন্তু আমি ভাবিতেছি আপনি আমার ছলনার কথা শুনিয়া কি বলিবেন!"—

লাইকা বিস্মিত হইয়া তাহার প্রতি চাহিল। এ সেই অবিচলদৃষ্টি প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি! সে মাথা তুলিয়া বলিল—"ছলনা? ছলনা আবার কি! কাকে ছলনা করিয়াছ তুমি?"—

"আপনাকেই!"—

লাইকা উচ্চ হাসিল। আবার তাহার ক্রোড়ে মাথা দিয়া বলিল—"ওঃ সেই কথা?—তা হৌক, আমায় ছলনা করিলে কোন ক্ষতি নাই!—কিন্তু পিতামাতাকে ছলনা করিয়া এস নাই ত?...

বারি উত্তর করিল,—"তাহাও করিয়াছি!—নতুবা তাঁহারা আমায় ছাড়িতেন কি?"—

এবার লাইকা হাসি ছাড়িয়া বলিল,—"তাহা ত অনেকদিনই বুঝিয়াছি!—কিন্তু কেন একাজ করিলে শরণ?—এই বয়সে গৃহত্যাগ করিবার তোমার কি প্রয়োজন ছিল?"—

"কি প্রয়োজন ছিল বলিব?—এই আপনাকে ছলনা করিবার জন্যই কেবল—"

বারি থামিয়া গেল। তাহার ঘনঘন শ্বাস বহিতেছিল—সে দুই হাতে আপনার মুখ ঢাকিল। লাইকা তখন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিল,—কি আশ্চর্য্য!—এ বালক বলে কি?—তাহাকে ছলনা করিবার জন্য?—ছলনা?—ছলনা মানে?—ছলনা? সহসা বজ্রাহতের ন্যায় চমকিয়া সে সরিয়া গেল। দ্রুত কণ্ঠে বলিল—ছলনা তুমি কাহাকে বল শরণ?—বল শীঘ্র বল তুমি কে? তুমি কি আমায় চেন? কৈ আমিত তোমায় কোথাও দেখি নাই?"

বারি আর কোন কথা বলিল না,—আপনার বুকের কাপড় হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া লাইকার নিকট ফেলিয়া দিল। তাহার অশ্রুবিবর্ণ আকৃতির প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়া সে তাহা তুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। আজকার জ্যোৎস্নার ক্ষীণ আলোকে লেখা পড়া যায় না!—অথচ বালককে ত্যাগ করিয়া যাইতেও ইচ্ছা হয় না—যদি সে পলায়ন করে? রুদ্ধস্বরে লাইকা বলিল—"আমি আলোকের নিকট যাইতেছি,—কিন্তু তুমি এইখানেই থাকিবে ত?" বারি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। লাইকা আবার বলিল—"যাইও না—মিনতি থাকিল!"—

দেবালয়ের দ্বার সম্মুখে আলোক ক্ষীণ জ্যোতিতে জ্বলিতেছিল,—লাইকা আসিয়া তাহা উজ্জল করিয়া দিল। পার্শ্বের দুর্গা দেবীর সেবক গঞ্জিকার কলিকা হাতে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—স্থানটিও গঞ্জিকার গন্ধে পূর্ণ—লাইকা সে সকলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পত্রখানিতে দৃষ্টি ক্ষেপ করিল। ক্ষুদ্র সুন্দর পরিষ্কার ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তাক্ষরে লেখা,—

"আমি শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছি তাহা বলিব? আমি আপনাকে ছলনা করিয়াছি দেবতা।—কিন্তু আর এ পাপ আমার সহ্য হয় না!—আজ আমি সকল কথাই বলিব শুনুন! আমি আপনারই সেই সেবাবঞ্চিতা পত্নী! আর কি লিখিব? সব অপরাধ ক্ষমা করিবেন।—ইতি"

বিশ্বজগতের অনুভূতি লাইকার নিকট শূন্য হইয়া গিয়াছিল—সে আবার পত্রখানি পড়িল—আবার পড়িল!—তাহার পত্নী?—রাজকুমারী বারি?—এখানে? এত কষ্টে?—তাহারই জন্য?—বিশৃঙ্খল ভাবে এই কয়টি কথাই তাহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ফিরিতেছিল!—তাহার বারি! তাহার জীবনসর্ব্বস্ব—বাসনার আকাঙ্ক্ষা! সেই জীবনপ্রতিমা বারি?—লাইকা যেন মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল!—

কতক্ষণে সম্বিৎ লাভ করিয়া সে কম্পিত পদে ফিরিয়া চলিল। বারি দূর

হইতে স্বামীর মদিরামত্তের ন্যায় স্খলিত গতি দেখিতে পাইয়াছিল—সে এত অধীরতার কারণ বুঝিল না!" ভাবিল বুঝি সর্ব্বনাশ হইয়াছে! লাইকা আসিয়া দাঁড়াইতেই সে বলিল, "আপনি কোন আশঙ্কা করিবেন না! আমি আপনার ইচ্ছার বিপরীতে কোন কায করিতে চাই না!"

লাইকার বোধ হয় সে কথা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইল না—সে বিহ্বল চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া ছিল—সে দৃষ্টিতে বারির মুখের সে কঠিন ভাব দূর হইল—সে লজ্জাবিবর্ণ ভাবে অধোবদন হইল। লাইকা বুঝি আর দাঁড়াইতে পারে না—,দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে ধীরে ধীরে বারির রচিত শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। বারি বুঝিতে পারিল না যে স্বামী এমন অস্থির হইলেন কেন,—কি একটা নিদারুণ আশঙ্কায় সে যেন স্তম্ভিত হইয়াছিল—, লাইকা পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে কিন্তু নিকটে যাইতেও সাহস নাই—,এমন সময় শুষ্ককণ্ঠে লাইকা বলিল—"জল! একটু জল!"—বারির বুক ফাটিয়া চোখে জল আসিতেছিল,—কেন তাহার এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল? স্বামী কেন এত কাতর হইলেন? তখন সে দৌড়িয়া কমণ্ডলুর জল আনিয়া তাহার সম্মুখে ধরিল—; জলপান করিয়া লাইকা যেন সুস্থ হইল। বারি নিঃশব্দে তাহার মাথায় বাতাস দিতেছিল।

কিছুকাল স্থির থাকিয়া অস্ফুটকণ্ঠে লাইকা বলিল—"কাঁদিতেছ তুমি?—কিন্তু একটি কথা রাখ—আজিকার দিন আর কাঁদিও না! আজ তোমার চোখে জল দেখিলে আমি বাঁচিবনা!"

বারি অশ্রুমার্জ্জনা করিল।—লাইকা এক দৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিতে চাহিতে বলিল—"কত কষ্ট দিয়াছি! এই অভাগার জন্য নাজানি কত কষ্ট পাইয়াছ!—ওঃ সে কথা যে আমি ভাবিতেও পারিনা!" বলিয়া একটু থামিল—পরে আবার ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল—"তোমার কষ্টের তুলনা নাই জানি;—কিন্তু বিশ্বাস করিবে কি আমিও বড় সুখে ছিলাম না! যতদিন তোমায় ছাড়িয়াছিলাম তখনও কষ্ট,—তার পর যখন শুনিলাম তোমায় হারাইয়াছি—,ও হো!—আমার এ পাপমুখে সে কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে?—কিন্তু সে সব কথা যদি তোমায় বলিতে পারিতাম—আমার সে সর্ব্বস্বহারা দিনগুলির ইতিহাস যদি তোমায় শোনাইতে পারিতাম—তবে বোধ হয় তুমিও আমায় ক্ষমা করিতে!"

বলিতে বলিতে হাত বাড়াইল—বারি বুঝিল স্বামী তাহার চরণ স্পর্শে উদ্যত!—সে সরিয়া যায় লাইকা তাহার হাত ধরিল। বলিল—,"কোথায় যাও? আমার কাছে এস আরও কাছে এস!—তোমায় ভাল করিয়া দেখি আমি! জাননা ত প্রাণাধিকে! কেবল তোমায় দেখিবার কামনাই আমার অন্তর ও বহির্দৃষ্টির সম্মুখের জগৎকে কত বিসদৃশ করিয়া দিত! আজ আমায় দেখিতে দাও!"

বারি যেন জ্ঞান হারাইতেছিল,—

সে বুঝিতেছিল না যে কি শুনিতেছে!—লাইকা হাত বাড়াইয়া তাহার শিরোবেষ্টনী খুলিয়া দিল,—ঘনকুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ-রাশি তাহার পদ্মমুখখানি বেষ্টন করিতেছিল জ্যোৎস্নার মোহময় আলোকে লাইকা তাহা দেখিতে লাগিল।—

রোহিতাশ্ব পর্ব্বতের নির্জ্জন উপত্যকায় দুইজনে বসিয়াছিল। পদতলে রক্তশ্বেত পুষ্পাভরণবিচিত্র শ্যামল শৈবাল সজ্জা—, সম্মুখে বর্ষাবারিপুষ্টা গিরিনদীর উপল ক্রীড়া—,বাতাসে তাহারই ঝঙ্কারের প্রতি-ধ্বনি বাজিতেছে;—মাথার উপর সদ্যো-মেঘবিমুক্ত কোমল নীলাকাশে প্রভাত সূর্য্য হাসিতেছে;—লাইকা ও বারি, দুইজনে দুইজনের বাহুবেষ্টনে বসিয়া অন্তরে অন্তরা-লিঙ্গনের স্বর্গানুভব সুখ উপভোগ করিতে-ছিল!

লাইকা ভাবিতেছিল—সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময় সুখ,···প্রবাহিনী গতিময়ী সুখ,—বায়ু সঙ্গীতময় সুখ! আর বারি ভাবিতেছিল—এতখানি সুখের মধ্যে আজ যদি মরিতে পারি তাহা হইলে না জানি তাহা কত সুখ?

নীরবে কতক্ষণ তাহারা বসিয়াছিল—অবশেষে লাইকা সে মৌন ভঙ্গ করিল—; পত্নীর রক্তপাণিপল্লব লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে সে বলিল—"এখনও একটি কায বাকী আছে! আমায় একবার মহারাজার সহিত তোমার পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে!"

বারি হাসিল,—বলিল—আমারই কি তাহা ইচ্ছা করে না? কিন্তু এ মুখ দেখাইব কি করিয়া?

"এ মুখ? কেন? এমুখে কি কোন মালিন্য আছে প্রাণেশ্বরি! বলিয়া সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া লাইকা আবার বলিল,—"তাঁহাদের শোক আমার সহ্য হয় না! যদিও রাজপুরীতে বাস আমার অসহ্য তথাপি বৎসরশেষে একবার করিয়া তোমায় লইয়া সেখানে যাইতেই হইবে। কোন ভয় নাই—আমি সঙ্গে থাকিলে কেহ তোমায় কিছু বলিবে না!

বারি একটু হাসিল! আর সে হাসিতে সন্দেহহীন বাধাহীন আনন্দের মধুর বিকাশ দেখিয়া লাইকাও হাসিয়া আবার তাহার মুখ চুম্বন করিল।

সমাপ্ত

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

যুদ্ধে ব্যোমযান

(১)

বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধাদি ব্যাপারে ব্যোমযানের কার্য্য বিশেষরূপে গণনা করা হইয়া থাকে। ব্যোমযানের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে ইহার মূল্য বিশেষরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। বিমানচারী এক একটী 'এরোপ্লেন' কিম্বা 'এয়ারসিপ' (১) শত্রুর সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকিয়া অলক্ষ্যে বজ্রনির্ঘোষে রাশি রাশি গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া শত্রুসৈন্য ছারখার

(১) 'এরোপ্লেন' এবং 'এয়ারসিপের' পার্থক্য এই প্রবন্ধের অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে।

করিয়া দিয়া যাইতে পারে—কিম্বা রাত্রির অন্ধকারে সুপ্ত নগরের উপরে বোমা নিক্ষেপ করিয়া মৃত্যুর বিভীষিকা উৎপন্ন করিতে পারে; সাগর উপকণ্ঠে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুসজ্জিত যুদ্ধ জাহাজ মুহূর্ত্তে ধ্বংস করাও ইহাদের পক্ষে একটু বিচিত্র নহে।

এতদ্ব্যতীত শত্রুর গতিবিধি নির্ণয়ে 'এরোপ্লেন' বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে। কোন স্থানে কিরূপ শক্তি লইয়া শত্রু অবস্থান করিতেছে, কোন্ দিকে শত্রুসৈন্য অগ্রসর হইতেছে ইত্যাদি সংবাদ সৈন্য পরিচালনায় কত মূল্যবান। অনেক সময় এ সকল সংবাদের অভাবে অনুমানে সৈন্য পরিচালনা করিতে হয়—তাহাতে বিপদ এবং বিফলতার পূর্ণ আশঙ্কা। কিন্তু ব্যোমযান শত্রুর গতিবিধির সংবাদ আনয়ন করিতে সমর্থ বলিয়া সৈন্যপরিচালনায় কত যে সুবিধা হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

যুদ্ধে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কার্য্যে ব্যোমযানের ব্যবহার হইয়া থাকে। ১। শত্রুসৈন্যের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ। ২। গোলন্দাজ সৈন্যের কামান সংস্থাপন কার্য্যে সহায়তা—বিপক্ষীয়দের কামানের অবস্থান—এবং স্বপক্ষীয়দের অগ্নিবর্ষণের নির্ভ্রান্তি নিরূপণ। ৩। আকাশ যুদ্ধে বোমা, কামান, বন্দুক, কিম্বা অন্যপ্রকার অস্ত্রাদির সাহায্যে শত্রুর গুপ্তচর এবং ব্যোমযান আক্রমণ। ৪। শত্রু পরিচালিত সৈন্য বাহিনী প্রেরিত রসদ ইত্যাদি কিম্বা এয়ারসিপের আশ্রয়গৃহ, শত্রুশিবির, ইত্যাদির উপর বোমা অথবা গোলাবর্ষণ করিয়া উহাদের ধ্বংস সাধন। ৫। সৈন্য সরবরাহের জাহাজ, বাণিজ্যপোত এমনকি যুদ্ধ জাহাজের নির্ব্বিঘ্ন পরিচালনা কার্য্যে সহায়তা—আকাশে অবস্থিত থাকিয়া সমুদ্রের বহুদূর পর্য্যন্ত বিপক্ষীয় যুদ্ধ জাহাজের কিম্বা জলতলস্থিত সবমেরিন এবং মাইনের অস্তিত্ব অবগত হইতে পারিয়া ইহারা সঙ্কেতে নিজেদের জাহাজগুলিকে বিপদবার্ত্তা জানাইয়া রক্ষা করিতে পারে। (২)

ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দ গত কয়েক বৎসরের ভিতর বায়ুরথের যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি সংসাধনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন তাহাতে সকলেরই আশঙ্কা হইত, যে জাতি ব্যোমযানে যতদূর শক্তিমান হইবে বিজয় লক্ষ্মী তাঁহাদেরই অঙ্কশায়ী হইবেন; এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধিলে বিমানবাহিনীর বলেই সংগ্রামের ফলাফল নির্দ্ধারিত হইবে।

কারণ বর্ত্তমান কালে যুদ্ধের প্রকৃতি সমূহ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধ এখন বহুব্যয় সাপেক্ষ এবং ভীষণ হইতে ভীষণতর। সমস্ত প্রকার উন্নত প্রণালীর বিজ্ঞান যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহার করা হইতেছে—ফলে যুদ্ধের ধ্বংস করিবার শক্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে সেকথা ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়—কল্পনা করিলে এক বীভৎস ভীষণ চিত্র মানুষকে ভীতিস্তব্ধ করিয়া ফেলে।

ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দ মনে করিলেন—যে জাতি যুদ্ধ উপকরণ সংগ্রহার্থে যত অধিক টাকা ব্যয় করিবে তাঁহাদের জয়াশা তত বেশী। যে জাতি রাশি রাশি অর্থ ছড়াইয়া অগণিত সৈনিক বাহিনী প্রস্তুত রাখিবে—কিম্বা ব্যয়ের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া রণতরী সমূহ প্রস্তুত করাইবে তাহারাই জয়মাল্যের অধিকারী হইবে। তাই কোনো জাতি যদি সৈন্য ও যুদ্ধপোত ধ্বংস করিবার কোনো নূতন উপায় উদ্ভাবন করে—প্রতিপক্ষীয়েরা যথাসম্ভব সত্বর নিজেদের যুদ্ধ সজ্জায় সেই সকল নব প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক উহাদের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করে; এবং স্বাধীন জাতিবৃন্দ নিজেদের সৈন্যবল, নৌবল এবং অর্থশক্তি ইত্যাদি হিসাব করিয়া প্রতিপক্ষীয়দের সহিত তাহার তুলনা করিয়া থাকে।*

(২) Cf. Aircraft in the German war by H. Massac Buist p. p. 14.

* See Aerial Warfare by Hearne p.p. XXXIV

সুবিখ্যাত লেপ্টেনাণ্ট জেনারেল—স্যার জে. এম, গ্রিয়ারসন বলিয়াছিলেন—"It is impossible to carry on warfare unless we have mastery of the air"

"শূন্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারিলে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব।"

ভবিষ্যৎ যুদ্ধে এই বায়ুরথ সমূহের কার্য্যকারিতা বুঝিতে পারিয়াই ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দ প্রভূত উন্নত প্রণালীর বিমান-বাহিনী একত্রিত করিতেছিলেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এমন সব শূন্য-যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছিল—যাহাদের একএকটী বিশ ত্রিশজন আরোহী, কামান, বোমা নিক্ষেপের যন্ত্র, সার্চ্চলাইট (Search light) ইত্যাদি এবং কয়েক টন্ বিস্ফোরক পদার্থ বহন করিতে পারে এবং ঘণ্টায় ৬০।৭০ মাইল পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

এই সমস্ত শূন্যরথ আবিষ্কারে প্রথমতঃ ফরাসী এবং জার্ম্মেণরাই অধিক দক্ষতা দেখাইতেছিলেন। ফরাসী জাতি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রেঙ্কো-প্রুসিয়ান যুদ্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া—দুর্দ্দমনীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রের সন্ধানে মত্ত হইলেন। অনেক ভাবনা চিন্তা এবং চেষ্টা চরিত্রের পর উহারা ব্যোম-বাহিনী প্রস্তুত করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।† আজ ফরাসী জাতির বিমানবাহিনী সকলকে অতিক্রম করিয়া আস্ফালন করিতে পারে।

জার্ম্মেন এবং ইংরেজদের ভিতর পরস্পর ব্যবসা বাণিজ্যে কঠোর প্রতিদ্বন্দিতার ফলে সামরিক প্রতিযোগিতা দেখা দিল। কিন্তু অতুলনীয় ব্রিটিশ নৌবাহিনী দেখিয়া জার্ম্মেনদের সকল আশায় বালি পড়িল।‡ নৌশক্তিতে ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার আশা যে আকাশকুসুম মাত্র ইহা জার্ম্মেনরা হৃদয়ে বিশেষ করিয়া অনুভব করিলেন।—কিন্তু জার্ম্মেন জাতি সহজে হতাশ হইবার নহেন—তাই তাঁহারা একদিকে যথাসাধ্য উৎসাহ উদ্যমের সহিত নৌশক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন অপরদিকে বিমান বাহিনীকেও যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের একনিষ্ঠ সেবাব্রতের ফলে—জার্ম্মাণির বিমানবাহিনী আজ জগতে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিয়াছে। §

ইউরোপের অন্যান্য শক্তিগণ ইঁহাদের অসাধারণ আবিষ্কারে মুগ্ধ হইয়া এবং বায়ুরথের সামরিক মূল্য বুঝিতে পারিয়া সশঙ্কিত হইয়াছিলেন। (৩) তাঁহারা

---

† Aerial warfare, Hearne "The airship was one of the latest of her schemes after many others had been tried, and in recent years with a declining population and internal troubles the Air-ship fleet of France has been one of her few hopes". p.p. XXV.

‡ "———and there is no more distressing no more infuriating spectacle to the ferbid German patriot of to day than the huge British fleet as it stands out proudly predominant, a marvellous demonstration of invested capital." Aerial Warfare p p. XXVI.

§ See Aerial Warfare by Hearne, Forecast.

(৩) Cf. Pearson's Magazine July, 13.

"The next war in the air"

"These dreadnoughts of the air could hover over our big cities under cover of darkness; they could smash up our arsenals, our docks, our shipping, our railway lines of communication, our public buildings. They could cripple our defences irretrievably in a single night".—"Some morning England perhaps or France or Germany or some other European power, will open its eyes to find its capitals & its armies menaced by hostile airships. It will then be called upon to decide whether to accept peace on ignonimous terms or destructive war with humiliating defeat as an almost certain result."

বুঝিতে পারিয়াছিলেন—যদি যুদ্ধে লিপ্ত জাতিগণ উভয়পক্ষই বিশেষরূপে বিমানবাহিনীতে শক্তিমান থাকেন—তবেই শক্তিপরীক্ষা সম্ভব হইবে নতুবা কোনো শক্তি বিমান-বাহিনীতে নিতান্ত দুর্ব্বল হইলে যুদ্ধ বাধিতে না বাধিতেই জয় পরাজয় মীমাংসা হইয়া যাইবে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান সজ্জিত, ঘণ্টায় ৮০।৯০ মাইল বেগবান, ব্যোমযানগুলিকে তেমনি শক্তিশালী বিমান-বাহিনী দ্বারা প্রতিরোধ করিতে না পারিলে পরাজয় একরূপ সুনিশ্চিত।

এই সমস্ত বিষয় অনুধাবন করিয়াই ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দ যথাসাধ্য তাঁহাদের নিজ নিজ বিমানচারী যুদ্ধ জাহাজের উন্নতির প্রতি মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিরূপ ব্যস্ত ভাবে ইঁহারা নিজ নিজ বিমান-বাহিনী বৃদ্ধি কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন—নিম্নলিখিত ব্যয়ের পরিমাণ হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের বিমান-বাহিনীর জন্য ব্যয় সংখ্যা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ছিল ২৪৮,০০০ পাউণ্ড, ১৯১২ তে ৮০০,০০০ পাউণ্ড, ১৯১৩ তে ১,৭০০,০০০ পাউণ্ড। জার্ম্মেণীতে ১৯১৩ সালে এই কারণে প্রায় ২,১৫০,০০০ পাউণ্ড খরচ মঞ্জুর হইয়াছিল।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে Army Air Battalion সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডে এবিষয়ে প্রকৃত কাজ আরম্ভ হয়। শীঘ্রই এবিষয়ে পার্লিয়ামেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ফলে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই Royal Flying Corpsএর সৃষ্টি হয় এবং বিমান-বাহিনীর বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইতে থাকে।

ফরাসী-জার্ম্মেন সীমান্তে এই সময় হইতেই বিমান-বাহিনীর অসংখ্য আড্ডা স্থাপনের কার্য্য আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান কালে ফরাসী সীমান্তে টুল, ভার্ডল, বালেডুক্, এপিনেল ইত্যাদি স্থানে গবর্ণমেণ্টের সামরিক এরোপ্লেনের আড্ডা সংস্থাপিত আছে; এবং রিমস্, আইসি-লে-মুলিনো, প, মরশ, পোট্রোভাইল ইত্যাদি স্থানে বৃহৎ বৃহৎ "এয়ারসিপের" আশ্রয়-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ভার্ডুন, বেলফোর্ট, এপিনেল, টুল ইত্যাদি স্থানেও এই সকলের "সেড" (shed) বা আশ্রয়গৃহ অবস্থিত আছে। এয়ারসিপের জন্য হাইড্রোজেন উৎপাদন কল্পে প্যারী, লাইল, লেঙ্গারস্, মণ্টফোর্ড রিউভেল ইত্যাদি স্থানে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের হাইড্রোজেন কারখানা খোলা হইয়াছে।

জার্ম্মাণ সীমান্তে ইহার আয়োজন আরও অধিক। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই চারিটী ভীষণাকৃতি "জেপ লিন" (Zeppeline) রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া দিবারাত্রি সীমান্ত প্রদেশ প্রহরা দিত। উহাদের মধ্যে Z উত্তরসাগর উপকূলে উইলহেমলেভেনে, Z.I. কোনিগস্বার্গে, Z.II. কলোনে এবং Z.III. মেজে (Metz) অবস্থিত থাকিয়া সে সময়ই—মুহূর্ত্তের ইঙ্গিতে ফরাসী সীমান্ত উত্তীর্ণ হইয়া ধ্বংসের বীজ ছড়াইবার জন্য প্রতীক্ষা করিত। (৪)

ফরাসীদের অসংখ্য এরোপ্লেন আছে—জার্ম্মেনীরও এরোপ্লেনের সংখ্যা প্রচুর। "এয়ারসিপের" সংখ্যায় জার্ম্মেনী সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন। উঁহারা বলেন বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের ৮০টী "জেপ্‌লিন" আছে ৫০টী নির্ম্মিত হইতেছে। (Statesman, Sunday, December 6, 14) কিন্তু অনেকেই অনুমান করেন তাঁহাদের "জেপ্‌লিন" ২৫।৩০ টীর অধিক হইবে না। তবে অন্য শ্রেণীর "এয়ারসিপ" আরও অনেক থাকিতে পারে। এবিষয়ে সত্য সংবাদ জার্ম্মেন গবর্ণমেণ্ট অপ্রকাশ্য রাখিয়াছেন। সমস্তই অনুমানের কথা। ফরাসীদের "এয়ারসিপের" সংখ্যা অল্প। ফরাসীতে এরোপ্লেন যত ইচ্ছা নির্ম্মিত হইতে পারে—কিন্তু 'এয়ারসিপ" নির্ম্মাণ বিশেষ ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ।

ইংরেজদের বিমানবাহিনীও যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইংলণ্ডে ৮০০ সুশিক্ষিত বিমানচারী সৈন্য আছে এবং Central Flying School ব্যস্তভাবে যথেষ্ট পরিমাণ নূতন

(৪) See Pearson's Magazine, July, 1913—"Four Zeppeline built giant air dreadnoughts armed & munitioned as if war were a thing of today, keep almost constantly in the air—training their crews etc. etc."

সৈনিককে বিমানযুদ্ধে শিক্ষিত করিতেছেন। নানাস্থানে ব্যোমযানের কারখানায় দিবারাত্রি শূন্যরথ নির্ম্মিত হইতেছে—এবং ব্যোমযানের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। (৫) ইংরেজগণ "হাইড্রো-এরোপ্লেন" (অন্য নাম "সিপ্লেন") নির্ম্মাণেই অধিক মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। জলেই তাঁহাদের একাধিপত্য জলেই তাঁহাদের অত্যাশ্চর্য্য শক্তি তাই যে ব্যোমযান জল হইতেই উড্ডীন হইতে পারে এবং জলেই অবতরণ করিতে পারে—সেরূপ বায়ুরথ নির্ম্মাণের প্রতিই তাঁহাদের মনোযোগ স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহাদের দেশের অবস্থান বিবেচনায় এই শ্রেণীর ব্যোমযানই তাঁহাদের নিকট বিশেষ কার্য্যকরী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। "Brittannia rules the Waves" এই বাক্যের সার্থকতা আমরা ইংরেজদের প্রতি কার্য্যেই দেখিতে পাই।

আমরা "এয়ারসিপ" "এরোপ্লেন" এবং "শিপ্লেনের" উল্লেখ করিয়াছি। ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যোমযান। যে সকল ব্যোমযান বায়ু অপেক্ষা লঘু—তাহাদিগকে 'এয়ারসিপ' বলে। 'এয়ারসিপ'গুলি আয়তনে অতি বৃহৎ হইয়া থাকে এবং ইহাদের নির্ম্মাণ ব্যয়ও অত্যন্ত অধিক। একটী লম্বা থলের (bag) ভিতর বায়ু অপেক্ষা লঘু গ্যাস্ ভরিয়া দেওয়া হয়—এবং তাহাতেই 'এয়ারসিপ' শূন্যে উড্ডীন হয়। বিশ ত্রিশজন আরোহী বৃহৎ বৃহৎ কামান এবং নানাপ্রকার আবশ্যকীয় যন্ত্র ও ব্যবহার্য্য জিনিস বহন করিবারও ইহাদের শক্তি থাকে। জলবায়ুর পার্থক্যে ইহাদের কিছু আসে যায় না। শূন্যে থাকিয়াও ইহার আরোহী সৈনিক লক্ষ্য সন্ধান করিয়া গোলা ছুড়িতে এবং বোমা নিক্ষেপ করিতে পারে। অতি বেগে সে গোলাগুলি শত্রুসৈন্যের উপর পতিত হইয়া—উহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারে।

বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তিন প্রকার 'এয়ারসিপ' নির্ম্মিত হইয়াছে। এক প্রকার—ধাতু নির্ম্মিত কাঠামোর (Frame) উপর সুচিক্কণ এলুইমিনিয়াম পাতের থলে বিশিষ্ট (Rigid airships) অন্য প্রকার কোনো কাঠামো ছাড়া শুধু একটা থলের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস্ আবদ্ধ এয়ারসিপ, (Nonrigid airships)। ইহাদের একটী সুবিধা এই যে আবশ্যক মত গ্যাস বাহির করিয়া ফেলিয়া থলেটী সঙ্কুচিত করিয়া রাখা যায়। তৃতীয় প্রকারের "এয়ারসিপ" মাঝামাঝি রকমের, সম্পূর্ণ কাঠামোও ব্যবহৃত হয় না আবার একেবারে কাঠামো ছাড়া শুধু থলেও নয় (Semirigid type)। প্রথমোক্তগুলিই অধিক প্রকাণ্ড হইয়া থাকে—জার্ম্মেনরা এই শ্রেণীর 'এয়ারসিপের' রাজা। অন্য কোনও জাতি এই শ্রেণীর 'এয়ারসিপ' নির্ম্মাণ কার্য্যে তেমন সফলতা লাভ করেন নাই। জার্ম্মেনীর কাউণ্ট জেপ্লিন প্রথম এই শ্রেণীর বৃহৎ 'এয়ারসিপ' নির্ম্মাণ করেন তাঁহার নামে এই ব্যোমযানগুলির সাধারণ নাম জেপলিন হইয়াছে।

'এরোপ্লেন' সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। 'এয়ারসিপ' এবং এরোপ্লেনের কার্য্যও ভিন্ন প্রকার। অনেক সময় এই দুই প্রকার যন্ত্রের মধ্যে বড় গোল বাধিয়া যায়। "এয়ারসিপ" গ্যাস্পূর্ণ বেলুনের দ্বারা শূন্যে উড্ডীন হয় বলিয়াছি। ইহা ছাড়া উহাদের মধ্যে মোটর শক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিনও সংযোজিত থাকে—তাহারই শক্তিতে উহারা কেবল বায়ুস্রোতের অনুকূলে পরিচালিত না হইয়া স্বাধীনভাবে ইচ্ছানুরূপ পরিচালিত হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

'এয়ারসিপের' বেলুনে সাধারণতঃ হাইড্রোজেন গ্যাস্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বায়ু অপেক্ষা হাল্কা বলিয়া এই গ্যাসের উত্তোলন ক্ষমতা আছে। 'এয়ারসিপে'—গ্যাসপূর্ণ বেলুন অন্যান্য কলকব্জা, ইঞ্জিন, পরিচালক, সৈন্যসামন্ত ছাড়াও বিমান-বিহারীর অত্যাবশ্যক দ্রব্য যথা—জ্বালাইবার কাঠ বা কয়লা এবং যুদ্ধ কার্য্যে ব্যবহার্য্য গোলা বারুদ, অস্ত্রশস্ত্রাদি উত্তোলন করিবার মত—যথেষ্ট পরিমাণ গ্যাস্ ব্যবহার করা আবশ্যক। এই কারণে

---

(৫) See Aircraft in the German War p. p. 77.

সাধারণতঃ গ্যাস্-বেলুনটীকে আকৃতিতে বিশাল করিতে হয়। আবার বেলুনের আকৃতি যত বড় হইবে বায়ু ভেদ করিয়া ইহাকে পরিচালিত করিতে মোটরের তত অধিক শক্তির প্রয়োজন হইবে। 'গ্যাস্ বেলুনের' কেবল উত্তোলন ক্ষমতা আছে কিন্তু পরিচালন ক্ষমতা নাই। ইত্যাদি কারণে এয়ারসিপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, করা বড় কঠিন। "জেপলিন" গুলি ৪।৫ টন বিস্ফোরক পদার্থ বহন করিতে পারে।

'এরোপ্লেন' গুলির একটা সুবিধা এই যে ইহাদিগকে উত্তোলন করিবার জন্য কোনও গ্যাসের প্রয়োজন হয় না। "এরোপ্লেনে" যে মোটর শক্তি সংযোজিত হয় তাহাদেরই এরূপ বেগে 'এরোপ্লেনকে' ছুটাইবার শক্তি থাকা প্রয়োজন যাহাতে পাখার নীচে বায়ুর যথেষ্ট পরিমাণ চাপের জোরে—ইহারা শূন্যে উড্ডীন হইতে পারে। বাধাপ্রাপ্ত বায়ুরাশি "এরোপ্লেনের" পাখার নীচে বেগে প্রতিহত হয়—তাহাতেই "এরোপ্লেন" শূন্যে উড্ডীন থাকে। (৬) শূন্যে থাকিতে হইলে এরোপ্লেনকে ক্রমাগত ছুটিতে হয়—নতুবা পরিচালন শক্তি বন্ধ করিলে ইহারা প্রস্তর খণ্ডেরই মত বেগে ভূমিতে পতিত হইবে। এ বিষয়ে "এয়ারসিপের" খুব সুবিধা। ইহারা একস্থানে থামিয়া দাঁড়াইতে পারে। "এরোপ্লেনের" মত মোটার শক্তির সহিত ইহাদের শূন্যে উড্ডীন থাকিবার কোনও সম্বন্ধ নাই। "এরোপ্লেন" আকারে অনেক ছোট। ইহাদের নির্ম্মাণ ব্যয়ও অনেক অল্প। একটী "এয়ারসিপ" নির্ম্মাণে যে ব্যয় হয় তাহাতে ৩৫টী এরোপ্লেন নির্ম্মিত হইতে পারে। 'এরোপ্লেন' গুলি বায়ু অপেক্ষা ভারী। এ গুলি পেট্রোল ইঞ্জিনে পরিচালিত হইয়া থাকে। ভারবহন ক্ষমতা অল্প হইলেও—"এরোপ্লেনের" কতকগুলি বিশেষ সুবিধাও আছে।

"সিপ্লেন" বা "হাইড্রো-এরোপ্লেন" জল হইতে শূন্যে উঠিতে এবং শূন্য হইতে জলে নামিতে পারে। কিন্তু "এরোপ্লেন" কেবল সমতল ভূমিতেই উঠা নামা করিতে পারে। অন্যান্য বিষয়ে "সিপ্লেন" "এরোপ্লেনে" কোনো বিশেষ পার্থক্য নাই। ইংরেজদের বড় বড় যুদ্ধ জাহাজে "সিপ্লেন" থাকে। যে কোনও মুহূর্ত্তে ইহারা জল হইতেই শূন্যে উড্ডীন হইতে পারে এবং আবশ্যক মত জলেই অবতরণ করে। "এরোপ্লেনে" এবং "হাইড্রো-এরোপ্লেনে" সার্চ্চ লাইটেরও বন্দোবস্ত রহিয়াছে তাহার সাহায্যে রাত্রির অন্ধকারেও উহারা নির্দ্ধারিত স্থানে অবতরণ করিতে পারে। কিন্তু "এয়ারসিপের" পক্ষে রাত্রে অবতরণ করিবার কল্পনা নিশ্চিত মৃত্যুরই পূর্ব্বাভাস মাত্র।

(২)

বিমানবিহারীর অতি বিচক্ষণ হওয়া দরকার। তাহাদের যেমন কঠিন দায়ীত্ব তেমনি বিপদও তাহাদের অসংখ্য। প্রাণের মায়া সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া বিমানবিহারীকে আকাশে উড়িতে হয়। প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। এই কঠোর কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত করিবার পূর্ব্বে বিমানচারীদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদান করা হইয়া থাকে। শূন্য হইতে শত্রুসৈন্যের গতিবিধি এবং অবস্থান নিরূপণ—বিমানবিহারীর একটী অতি মূল্যবান কার্য্য। কিন্তু এই প্রকার সংবাদ ঠিকমত সংগ্রহ করিতে হইলে বিমানবিহারীর বহু উচ্চ হইতে নিম্নের সমস্ত জিনিস অভ্রান্তরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার প্রকৃষ্ট শক্তি থাকা আবশ্যক। উপর হইতে বিন্দু কিম্বা রেখাবৎ প্রতীয়মান হওয়া সত্ত্বেও বিমানবিহারীকে প্রত্যেকটী নদী, রাস্তা, রেলোয়ে, বড় বড় বাড়ী এই সমস্তই চিনিতে হইবে। অভিযানকারী বিভিন্ন সৈন্যবাহিনীকেও উপর হইতেই ঠিক মত চিনিতে হইবে; যাহাতে বিমানবিহারী

(৬) পাখা যন্ত্রের দুইদিকে দুইটীও থাকে—আবার দুইস্তরে একটীর উপর অন্য একটী এরূপ ভাবেও থাকে। প্রথমোক্ত গুলিকে "মনোপ্লেন" (mono plane) এবং শেষোক্ত গুলিকে "বাইপ্লেন" (Biplane) কহে।

ব্যোমবাহিনী
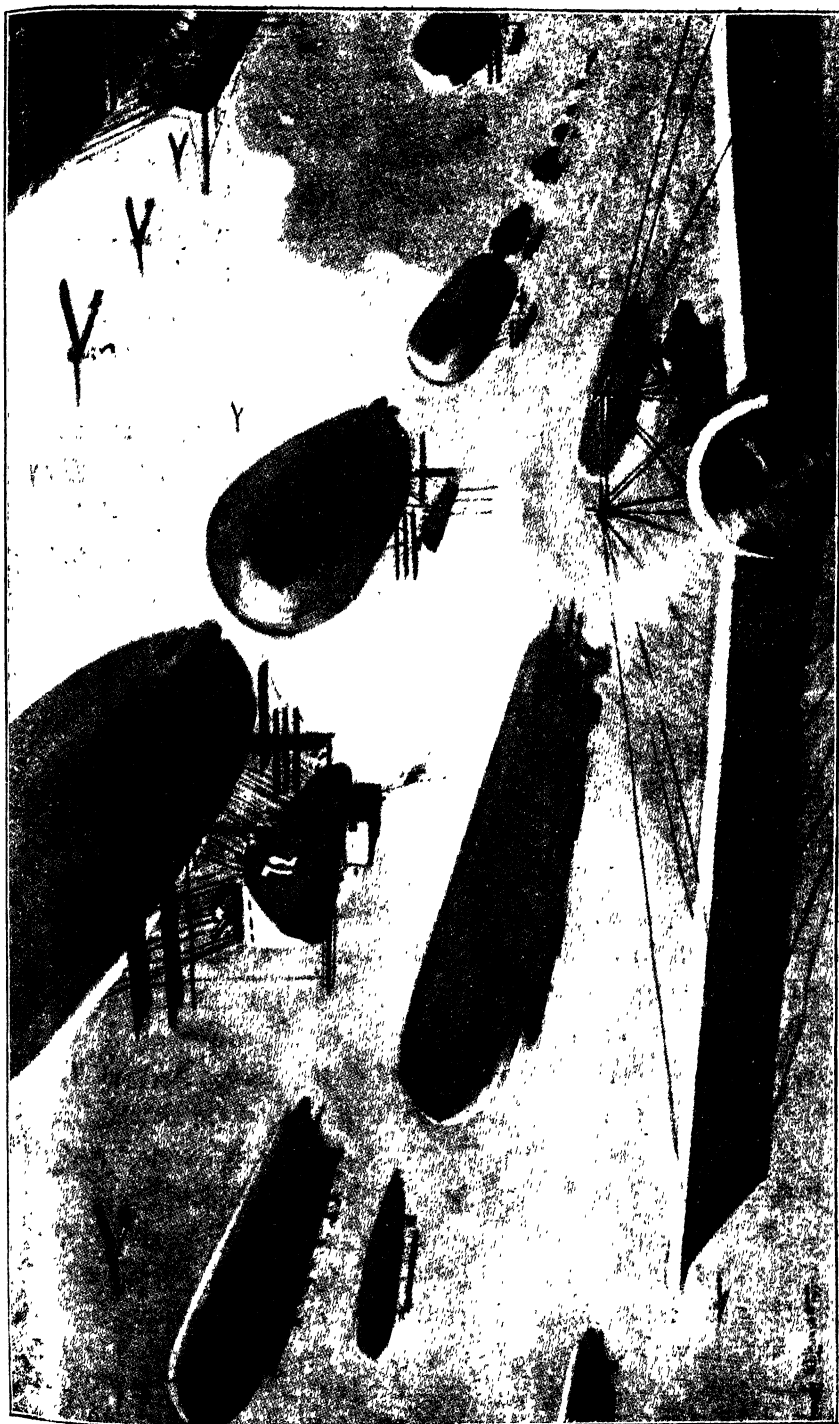
১ চিহ্নিত কতকগুলি এরোপ্লেন এবং ২ চিহ্নিত একসারি এয়ারসিপ।

তাহাদের সংখ্যা ও বল উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট জ্ঞাপন করিতে পারে। এদিকে আবার শূন্য হইতে বিমান-বিহারী শত্রু যাহাতে তাহাদের গুপ্ত সংবাদ অবগত না হইতে পারে—বিপক্ষীয়গণ সেই উদ্দেশ্যে যত রকম বাধাবিঘ্ন জন্মান সম্ভব তাহার ত্রুটী করে না। ছাউনী করিয়া অবস্থান করিবার সময়—তাহারা তাঁবুগুলিকে বড় বড় গাছের, ডালপালা দিয়া ঢাকিয়া রাখে—যাহাতে শূন্যস্থিত শত্রুগণ ইহাদের অস্তিত্ব না বুঝিতে পারে। উপর হইতে সহজেই ব্যোমচারী এগুলিকে বৃক্ষ-লতা বলিয়া ভ্রম করিয়া বসে। ছোট কামানের সারির ভিতর বড় বড় কামান ঢকাইয়া লওয়া হয়—পদাতিক সৈন্যের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া অশ্বারোহী সৈন্য অভিযান করে—এবং উপরে আকাশে শত্রুর ব্যোমযানের অস্তিত্ব আশঙ্কা করিলে বড় বড় সৈন্যবাহিনী—বৃক্ষপাতার আড়ালে লুক্কায়িত থাকে। এসব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও যাহাতে সত্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে তাহার জন্য বিমানচারীকে বিশেষরূপে শিক্ষালাভ করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রিটিশ আকাশবিহারী মিঃ মার্কাস ডিঃ মেণ্টনের ইংলণ্ডে ব্যোমবিহার শিক্ষালয়ের—নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের বর্ণনা উল্লেখ করিতেছি। (৭)

"ভোরের আলো প্রকাশ হইতে না হইতেই সেড্‌গুলি বিমান-বহারী এবং যন্ত্রবিদ্যাবিদ্ ব্যক্তিগণে পূর্ণ হইয়া পড়ে। কয়েক মিনিট পর পরই এক একটী বৃহৎ "বাইপ্লেন" কিম্বা দ্রুতগামী বার্ত্তাসংগ্রাহক ব্যোমযান সেড্ হইতে ঠেলিয়া বাহির করা হয় এবং এক একজন যন্ত্রবিদ্যাবিদ্ ইঞ্জিনগুলি পেট্রোলে পূর্ণ করে। ট্যাঙ্কগুলি (Tanks) পূর্ব্ব রাত্রিতেই পূর্ণ করিয়া রাখা হয়।

"সৈনিক ব্যোমচারীরা খাকিবর্ণের পোষাক পরিয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট অবস্থান গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আসে এবং একটু চকোলেট ইত্যাদি ভোজনের পর বায়ুসমুদ্রে সন্তরণে প্রস্তুত ব্যোমযানগুলির সঙ্কীর্ণ উপবেশন স্থলে আরোহণ করে। অবিলম্বে যন্ত্র চালাইয়া দেওয়া হয় এবং পাঁচ ছয় জন বিমান-বিহারী—প্রাতঃভোজনের পূর্ব্বেই ৫০ মাইল স্থান পর্য্যটন করিয়া আসিবার উদ্দেশ্যে একসঙ্গে আকাশে উড্ডীন হয়। শীতের প্রভাতে ভীষণ ঠাণ্ডা বায়ুর ভিতরেই বহু শিক্ষানবিশ অনবরত ৮০০ ফুট উর্দ্ধে উড়িতে থাকে।

একজন অভিজ্ঞ বিমানচারী হয় ত তাহার সঙ্গে একজন শিক্ষানবিশ পর্য্যবেক্ষক লইয়া আকাশে উঠিবে। শিক্ষানবিশকে নিম্নে দৃশ্যমান সকল জিনিষেরই চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে এই উদ্দেশ্যে তাহার সঙ্গে পেন্সিল কাগজ থাকে।

"একেবারে নূতন লোক হইলে তাহার অধিকাংশ পর্য্যবেক্ষণই ভ্রমপূর্ণ হয়। সূর্য্যকিরণ হয় ত টীনের ছাদে পড়িয়া প্রতিহত হইতেছে—সে ভাবে উহা একটী হ্রদ। কর্ষণকরা ক্ষেত্র তাহার অনভ্যস্ত চোখে একটী উত্তম অবতরণ স্থান বলিয়া মনে হয় এবং সেই বিশ্বাস মতই সে ঐ কথা লিপিবদ্ধ করে। পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে অভ্যস্ত হইতে হইতে—এ সকল ভ্রমও ক্রমে দূর হইতে থাকে।

"অন্য একজন বিমানবিহারী হয় ত একাই ৮০ অশ্ববেগ সমন্বিত (80 H. P.) একটী দ্রুতগামী "মনোপ্লেনে" আকাশ ভ্রমণ করিতে চলিয়াছে—এবং নানাদেশের মধ্য দিয়া কম্পাস এবং মানচিত্রের সাহায্য মাত্র গ্রহণ করিয়া—তাহার পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। একদেশ পার হইয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অন্যদেশে উড়িয়া গিয়া সেখানকার সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে, এইজন্য অপরিচিত স্থানের উপর দিয়া বার বার ব্যোমযান পরিচালনা করিয়া অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জ্জন করিতে হয়।"

শিক্ষানবিশদের নিকট নূতন দেশের উপর দিয়া পথ চিনিয়া উড়িয়া যাওয়া বড় কঠিন কার্য্য। বিশেষতঃ যদি নদী, পর্ব্বত বা এই প্রকার বিশেষ কোনও চিহ্নের দ্বারা পথ নির্ব্বাচন না করা যায়। কেননা শূন্যে ব্যোমযান পরিচালনা করার সঙ্গে সঙ্গে অধিকক্ষণ মানচিত্রের প্রতি চাহিয়া থাকা অসম্ভব। সর্ব্বদাই

(৭) See Pearsons Magazine, November 1914. The Super Soldier

যন্ত্রটিকে আয়ত্তে রাখিতে হয়, মানচিত্র অধ্যয়ন তো পরের কথা। বায়ুস্রোতের নানারকম অবস্থায় ব্যোমযানকে সতর্কতার সহিত উত্তমরূপ পরিচালনা করিতে না পারিলে বিপদ সম্ভাবনা। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ব্যামযান ঠিক পশ্চাৎদিকে বায়ুকর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে থাকে অথচ বিমানবিহারীর এইরূপ পশ্চাৎ গতি উপলব্ধি করিতে পারা কঠিন। এরূপ অবস্থায় কম্পাসের উপর নির্ভর করিলে বিমান-বিহারী প্রকৃতগতি কিছুই অবগত হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে কেবল কম্পাস এবং মানচিত্র ভরসায় ব্যোমযানের ঠিক মত পরিচালন সর্ব্বদা হইয়া উঠে না। তাই ব্যোমচারীকে এরূপ বিচক্ষণতা অর্জ্জন করিতে হয় যাহাতে বহুনিম্নে অবস্থিত স্থানগুলি সহজেই তাহারা প্রণিধান করিতে পারে।

সংবাদ সংগ্রহ ও শত্রুসৈন্য পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত বিমানবিহারীর সৈনিকবিদ্যার বিশেষ জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন। অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রদেশ দিয়া মিনিটে একমাইল বেগে উড়িয়া যাওয়া কালীন নীচের জিনিস পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কিছু স্থির করা বড় কঠিন। এ অবস্থায় মনে হয় পৃথিবী অতিবেগে পশ্চাৎ অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। এরূপ স্থলে সৈন্যের বিভিন্ন অবস্থার গতিবিধি নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব—কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চপ্রদেশে উড্ডীন হইয়া—বহুদূর বিস্তৃত সৈন্যবাহিনীর একটা ছবি (Birds eye view) চক্ষের উপর স্থাপন করিতে পারা যায়। যুদ্ধবিদ্যার কূট-নীতিতে পারদর্শী হইলে নিম্নে অবস্থিত সৈন্যব্যূহ মসীরেখাবৎ প্রতীয়মান হইলেও উহাদের অবস্থানের কথা অনেকটা অনুমানে স্থির করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার বায়ুর পরিবর্ত্তনের মধ্যেও বিমান-বিহারীকে ব্যোমযান আয়ত্তে রাখিতে পারার শক্তি ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হয়। যে সৈনিক কেবলমাত্র পরিষ্কার আকাশে এবং অনুকূল বায়ুর মধ্যেই আকাশে বিহার করিয়াছে—সে এই কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এবিষয়ে ব্রিটিশ বিমানচারীগণ অত্যন্ত বিচক্ষণ। অত্যন্ত বিপরীত জলবায়ুর ভিতরও উহারা কর্ত্তব্য কার্য্য সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিতে পারে এবং ইহার পরিচয় তাহারা বর্ত্তমান যুদ্ধেও প্রদান করিয়াছে। (৮) যদিও এরূপস্থলে সুনির্ম্মিত ব্যোমযানের সাহায্য অনেকটা মূল্যবান—তথাপি বায়ুর অবস্থা ও পরিবর্ত্তন বিষয়ে ব্যোমবিহারীর প্রভূত অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। ক্রমাগত আকাশ ভ্রমণ করিতে করিতে বিমানবিহারীগণ এমন ভাবে বায়ুর অবস্থার সহিত পরিচিত হয় যে কোন্ সময় কোন্ স্থানে কি অবস্থায় বায়ুর কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা তাহারা আশ্চর্য্যরূপে পূর্ব্বেই অনুভব করিতে পারে। নৌ-বিভাগের সুদক্ষ অধ্যক্ষ যেমন আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই ঝড়ের সম্ভাবনা পূর্ব্বাহ্নেই অবগত হইতে পারেন অভ্যস্ত বিমানচারীও সেইরূপ ভাবেই বায়ুর অবস্থা পরিবর্ত্তনের বিষয় নিম্নে পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্বেই জানিতে সমর্থ হন। একটি পর্ব্বত কিম্বা জলাভূমি, কিম্বা হ্রদ সাগর অথবা বনভূমি লক্ষ্য করিয়াই বিচক্ষণ ব্যোমবিহারী বায়ু অনুকূল কিম্বা প্রতিকূল হইবে—তাহা জানিতে পারে। যদি শূন্যচারী নিম্নে আঁকা বাঁকা নদী বহিয়া যাইতেছে দেখিতে পায় অমনি তাহাকে বায়ু-তরঙ্গে নিম্নে প্রক্ষিপ্ত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। সমতল ভূমির উপর দিয়া যাইবার সময় বিনা বিঘ্নে গা ছাড়িয়া দিয়া সে ভাসিয়া চলিয়া যায় কিন্তু যখনই নিম্নে কোন পাহাড় পর্ব্বত বন জঙ্গল লক্ষ্য করে অমনি সে তাহার পরিচালন যন্ত্রটি চাপিয়া ধরিয়া বেগবান উর্দ্ধনিম্নগামী বাত্যার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এইরূপে সুদক্ষ বিমানবিহারী কোথায় নামিবার উপযুক্ত ভূমি থাকা সম্ভব তাহাও উপর হইতে

(৮) Cf. Sir JohnFrench's official dispatch in which he says that our airmen have gone up in all weathers and have reported with exactness of detail.

সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারে। যে সকল ভূমিতে গরু ঘোড়া ইত্যাদি তৃণজীবি পশু চড়িয়া বেড়ায় সে সকল ভূমি সমতল এবং ব্যোমযান নামাইবার প্রকৃষ্ট স্থান বলিয়া উপর হইতেই জানিতে পারে। যখন এই শ্রেণীর পশুরা একদিকে মুখ করিয়া চরিতেছে দেখা যায় তখন বুঝিতে পারে—হয় সে ভূমি একদিকে বিশেষ ঢালু অথবা প্রবল বাত্যা একদিক হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ স্থলে বিমানবিহারীর অবতরণ তত নিরাপদ নহে। মাঠের প্রান্তদেশে নদী কিম্বা বনভূমি ব্যোমচারীর নিকট বিপদের চিহ্ন। কারণ এরূপ স্থান ঢালু হওয়ার আশঙ্কা,—সে স্থানে অবতরণ করিতে গেলে—ব্যোমযান ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে—অভিজ্ঞতা না থাকিলে বিমানবিহারীর বিপদ প্রতি পদে।

দৌত্য এবং পর্য্যবেক্ষণ "এরোপ্লেনের" প্রধান কার্য্য। এতদুদ্দেশ্যে বিমানবিহারী-সৈন্যদিগকে কিরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করা হয় তাহা উপরে লিখিয়াছি। ব্যোমযানের পরিচালনা, বায়ুর স্বভাব নির্ণয়, যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদি শিক্ষা করা ভিন্নও উহাদিগকে জল ও স্থলযুদ্ধ সম্বন্ধেও পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে হয়। শূন্যে বহু উচ্চে অবস্থান করিয়া শত্রুসৈন্যের গতিবিধি নির্ণয় করিতে হয় বলিয়া ইহাদের সম্পাদ্য কার্য্য অত্যন্ত কঠিন। শূন্যে শূন্যে এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমন করিতে হইলে ৩০০০ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উপরে উঠিলেই চলে কিন্তু শত্রুসৈন্যের উপর অবস্থান করিতে
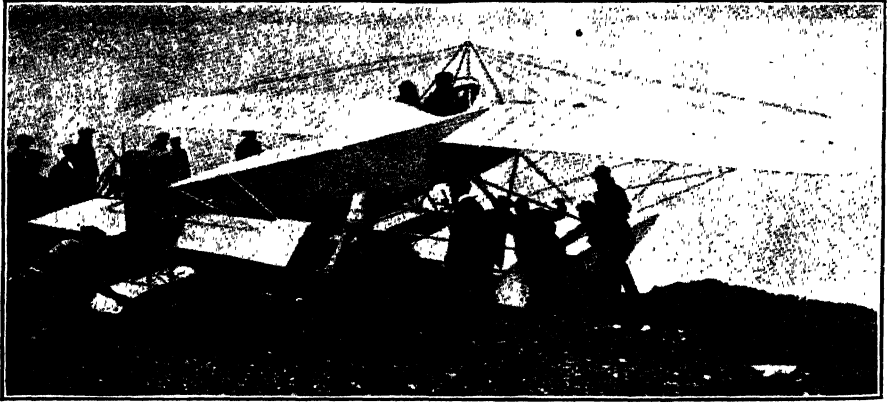
হাইড্রো এরোপ্লেন

জলে নামাইয়া শূন্যে উড়াইবার আয়োজন হইতেছে।

হইলে অন্ততঃ ৬০০০ ফিট উপরে সর্ব্বদাই থাকিতে হয় নতুবা বিশেষ বিপদের আশঙ্কা। বর্ত্তমানকালে কোনো কোনো "উর্দ্ধমুখী কামান" (High-angle gun or Anti-aircraft gun) এতদূর উন্নত প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছে যে শত্রুসৈন্যের উর্দ্ধে অবস্থিত বিমানবিহারীকে এই সকল কামানের আঘাত হইতে নিরাপদ থাকিতে হইলে অন্ততঃ ১০,০০০ ফিট পর্য্যন্ত উপরে উঠিতে হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধে কাপ্তান অস্‌ওয়াল্ড ঘণ্টা দুই জর্ম্মান সেনার ৬০০০ ফিট উচ্চে পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন—তিনি বলিয়াছেন যে জার্ম্মানদের কয়েকটি গোলা তাঁহার ব্যোমযানেরও ৩,৩০০ ফিট উপরে বিস্ফোরিত হইয়াছিল।

ব্যোমযান যথেষ্ট পরিমাণ নিম্নে (ভূমি হইতে প্রায় এক মাইল উপরে) অবস্থানকালেও তথা হইতে গরু, ঘোড়া এমন কি সমুদ্রস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যুদ্ধ জাহাজগুলিও কাল কাল বিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বর্ণের পার্থক্য ত একেবারেই চোখে পড়ে না। যাহা হউক এই সমস্ত অসুবিধা দূর-

বীক্ষণের সাহায্যে অনেকটা বিদূরিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত খুঁটীনাটী সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইলে বিমানদূতকে অনেক সময় শত্রুর গোলার মুখে অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থান পর্য্যন্তও অবতরণ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে হয়। একবার সংবাদ লাভ করিতে পারিলেই তাহারা তৎক্ষণাৎ কামানের মুখ হইতে সরিয়া অনেক উপরে উড্ডীন হয় এবং মেঘের আড়ালে লুক্কায়িত হইয়া সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া পলায়ন করে।

বিমানবিহারী দিগকে শত্রুসৈন্যের উপর অবস্থান-পূর্ব্বক খুটীনাটী বিষয়ের সংবাদ কি কৌশলে সংগ্রহ করিতে হয় এবং সে সকল বিবরণ কি করিয়া লিপিবদ্ধ ও অঙ্কিত করিতে হয় তাহাও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। দিবারাত্রি অসংখ্য বিমানবিহারী এই প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। একজনের সংবাদ সংগ্রহে ভুল থাকিলে অন্যের বর্ণনা হইতে তাহা ধরা পড়ে।

সংবাদ আনয়নের ক্ষিপ্রতার উপর এই সকল সংবাদের মূল্য নির্ভর করে। ইংরেজরাজের অধিকাংশ "সিপ্লেনেই" তারশূন্য টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু কোনো "এরোপ্লেনে" বা 'এয়ারসিপে' এরূপ বন্দোবস্ত নাই। তবু "এরোপ্লেনে"র প্রচলন হওয়ায় শত্রু-সৈন্যের অবস্থান এবং গতিবিধির খাঁটী সংবাদ অল্লাধিক ৩৷৹ ঘণ্টার ভিতর প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ সৈন্যাধ্যক্ষ-গণ লাভ করিয়াছেন।

"এরোপ্লেনের" সংবাদদাতার চক্ষু এড়াইবার এক মাত্র উপায় বনমধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় অভিযান করা। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে এরূপ লুক্কায়িত থাকিয়া অগ্রসর হওয়ারও সুবিধা নাই কেননা বিমানচারিগণ সর্ব্বদাই আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যে মুহূর্ত্তে শত্রু সৈন্য বনান্তরাল পরিত্যাগ করিবে—সেই মুহূর্ত্তেই কোনো না কোনো "এরোপ্লেনের" সংবাদদাতার চোখে উহাদের পড়িতেই হইবে।

রাত্রিকালে "এরোপ্লেনের" আকাশ বিচরণ এক-রূপ অসম্ভব ছিল। ইংলণ্ড ইত্যাদি স্থানে রাত্রি বিচরণও অভ্যাস করা হইতেছে। এবিষয়ে কিন্তু এখনও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বন্দোবস্ত হয় নাই।

বিমানবিহারীরা সংবাদপ্রেরণকল্পে মাঝে মাঝে কতকগুলি থলে (bag) ব্যবহার করিয়া থাকে। সুবিধা অনুযায়ী এই থলেগুলিতে লিপিবদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ বিবরণ এবং শত্রুসৈন্যের অবস্থান-চিত্র ভরিয়া সেগুলিকে মিত্র সৈন্যের উপর নিক্ষেপ করে।

একস্থানে স্থায়ী জিনিস (এয়ারসিপের আশ্রয় গৃহ, শত্রুশিবির, যুদ্ধ জাহাজ ইত্যাদি) ধ্বংস করিতে হইলে বোমা কিম্বা বায়ু টর্পেডো (air torpedo) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হাতে বোমা নিক্ষেপ করা কোনো কর্ম্মেরই নয়, তাই বোমা নিক্ষেপের পৃথক সরঞ্জাম প্রত্যেক "এরোপ্লেন" "এয়ারসিপ ইত্যাদিতেই সংযুক্ত থাকে। সাধারণতঃ ১ ডজন বোমা স্তরে স্তরে সাজান থাকে। এক একটী আন্দাজ ১০পাউণ্ড ওজনে এবং ২ পাউণ্ড পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থে নির্ম্মিত হয়। যখন নিশ্চিতরূপে কোনও জাহাজ বা "এয়ারসিপ সেড" (air ship shed) ইত্যাদি গোলা বর্ষণে বিধ্বস্ত করিতে হয় তখন ঐ এক ডজন বোমা এক সঙ্গে ২১ সেকেণ্ডের ভিতর নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। বোমার বিস্ফোরণে নিম্নে ৬০০ ফিট বিস্তৃত ভূমি পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হইতে পারে।

শত্রুকে ঠিক মত লক্ষ্য করিবারও পৃথক যন্ত্র আছে। উহার ভিতর দিয়া চাহিলেই ঠিক মত লক্ষ্য সন্ধান করা যায়। কতকগুলি চিত্র আছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই শত্রুসৈন্য কত নিম্নে অবস্থিত, লক্ষ্য স্থির করিবার কতক্ষণ পরে বোমা নিক্ষেপ করিলে সেই গতিশীল "এরোপ্লেন" হইতে নিক্ষিপ্ত বোমা লক্ষ্যসামগ্রী ঠিক আঘাত করিবে ইত্যাদি অতি সহজে জ্ঞাত হওয়া যায়। এইরূপ বোমা নিক্ষেপে শত্রুসৈন্যের প্রভূত ক্ষতি সংসাধিত হইতে পারে। নানা প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বোমাও এতদুদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল বোমার অসাধারণ শক্তির কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। জার্ম্মেনীতে ক্রুপের কারখানায় (Krupp gunfactory) একরূপ বোমা নির্ম্মিত হইয়াছে— এগুলি শূন্য হইতে নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্রই এক

অতি উজ্জ্বল আলোক বিকিরণ করিতে থাকে। নিম্নে যে কোনো পদার্থের উপর উহা পতিত হয় তাহাই জ্বলিয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়; এতদ্ব্যতীত উহার উজ্জ্বল আলোকে বিমানচারী রাত্রির অন্ধকারেও নিম্নের জিনিস উত্তমরূপ লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িতে পারে। ব্যোমযান হইতে একরূপ সার্চ্চলাইটও ৫০০ ফিট নিম্ন পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেওয়া হয় উহার আলোকে ব্যোমবিহারী ঠিক মত লক্ষ্য সন্ধান করিতে পারে। কিন্তু সার্চ্চলাইটের উজ্জ্বল আলোকে দিশাহারা হইয়া নিম্ন হইতে ব্যোমযানকে কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না।

জার্ম্মেনরা আর একরূপ বোমা আবিষ্কার করিয়াছেন এগুলি ব্যোমযান হইতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং সেই সুযোগে ধূমের অন্তরালে থাকিয়া অলক্ষ্যে বিমানচারী শত্রুসৈন্যের অগোচরে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

আরো ভয়ানক এক প্রকার বোমা নির্ম্মিত হইয়াছে এগুলি বিস্ফুরিত হইয়া যে বিষাক্ত বাষ্প উদ্গীরণ করে তাহা নিম্নে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া ১০০ গজ পর্য্যন্ত যে কোনও প্রাণী থাকে তাহাদিগকেই মৃত্যুমুখে প্রেরণ করে।

শূন্যশত্রু নিধন কল্পে যেমন "উর্দ্ধমুখী কামান" (anti aircraft guns) নির্ম্মিত হইয়াছে তেমনি জাপানীরা এই উদ্দেশ্যে একপ্রকার বোমাও নির্ম্মাণ করিয়াছেন। টোকিও সহরের নিকট একস্থানে একটী বেলুনে একটা কুকুর রাখিয়া সে বেলুন উপরে উড়াইবার পর একটী রাসায়নিক বোমা আকাশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বোমাটী বেলুনটীর ৩০০ ফিট নিম্নে বিস্ফুরিত হইয়াছিল। বোমা বিস্ফুরিত হওয়ার কয়েক মিনিট পর বেলুনটীকে নামাইয়া দেখা গেল কুকুরটীর জীবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে।

সুখের বিষয় এই ভয়ানক বোমা ২০০০ ফিটের অধিক উর্দ্ধে পৌছান সম্ভবপর হয় নাই। বিমানবিহারীরা পৃথিবী হইতে ৬০০০ হইতে ১০,০০০ ফিট উচ্চে অবস্থান করিয়া সহজেই এই প্রকার বোমার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে।

শ্রীসুধাংশু কুমার চৌধুরী।

নবাব

দশম পরিচ্ছেদ

সদস্য-নির্ব্বাচন।

"পজোনিগ্রো। কর্সিকা।"

মস্যুঁ জুজ,

আজ ক'দিন পরে আপনাকে এই চিঠিখানি লেখবার অবসর পেয়েছি। আজ পাঁচ দিন হল আমরা কর্সিকায় এসেছি, কিন্তু এসে অবধি এত কাগজ-পত্র দেখা, মিটিং করা, দলিল-দস্তাবেজে সই, পথ-ঘাট দেখা, মজলিস করার হাঙ্গামে মেতে আছি যে এক ছত্র চিঠি অবধি আপনাকে লেখবার সময় পাইনি। আপনাদের সঙ্গে প্রায় দু'হপ্তা দেখা হয়নি,—যাই হোক—আর বেশীদিন অদর্শনে থাকচি না; শীঘ্রই ফিরবো। পরশু কর্সিকা ছেড়ে একেবারে সটান্ প্যারিতেই যাব—পথে আর কোথাও নামতে হবে না।

তারপর এই নির্ব্বাচনের ব্যাপার!—সেদিকটায়, বলতে গেলে, আমাদের কাজ বেশ গুছিয়েই ফেলেছি। তবে ঐ যে এখানকার কাজ-কারবারের বিজ্ঞাপনে ওখানকার কখানা কাগজ লোককে যে রকম দম্ দিয়ে বেড়াচ্ছে—কথার ছটায় দেশের

লোকের তাক্ লাগাচ্ছে যে এখানকার কারবারে কিছু টাকা ঢাললেই একেবারে রাতারাতি লাখোপতি হবে, সে সব একেবারে ঝুটো কথা! কাজ-কারবারের যে লোভ দেখাচ্ছে, সে একেবারে ভুয়ো! খালি ফাঁকা আওয়াজ। কাজ-কারবার বলতে গেলে এখানে তার পাঠ মোটেই নেই। তা বলে খনি কি নেই? আছে—কিন্তু তার ভিতর আর-কিছু নেই, —শুধু জঙ্গল—সাপ-খোপ বিস্তর মেলে। জমি যা, তাতে চাষ চলে না—চাষের যুগ্যি করতে হলে সে জমির উপর আগে লাখো-লাখো টাকা ঢাললে তবে জমি তোয়ের হতে পারে—তার পর চাষ-আবাদ! বন আছে—কিন্তু সেখান থেকে কাঠ আনতে হলে এরিয়োপ্লেনে চড়ে গাছ কাটতে হবে, না হলে সে অজগর বনে ঢোকবারই সাধ্য নেই। ঝর্ণা কতকগুলো আছে বটে—কিন্তু সে জল মুখে দিলে সদ্য বিকার হয়! নদীতে ষ্টীমার একখানি নেই! আর রেল? রেলের কথা তুললে এ-দেশের লোক হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারা ভাবে, বুঝি কোনরকম ঠাট্টা করছি। "রেল" মানে এদেশের লোক কি বোঝে, জানেন?—"টিকটিকি পুলিশ!" এই হল দেশ, আর এই ত সে দেশে কারবারের হাল!

আসল কথা, দেশে খানকতক পুরানো তক্তা আর পাঁচ-ছ' খানা ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর আছে! আপনি ভাবছেন, তবে কিসের জন্য নবাব ঐ সব বাজে কাগজ দেখে এত টাকা কোথায়ই-বা ঢালছেন! এই পাঁচ মাস ধরে লোকেও ত শেয়ার কিনছে—এ কেন! লোকে যে কিনছে, এ শুধু নবাবের নাম দেখে—এ কোম্পানির ডিরেক্টার নবাব নিজে—তাই তাঁর নামে লোকে আজ বিশ্বাস করে টাকা ঢালছে। জানে না, এ টাকা তারা জলে কি কোথায় ঢালছে! যাই হোক, নবাবের নাম নিয়ে শয়তানরা এই যে টাকা-রোজগারের জন্য এক জুচ্চুরির কল পেতেছে—খালি বাজে ধাপ্পায় সকলকে ঠকিয়ে বেড়াচ্ছে, এ আর আমি ঘটতে দিচ্ছি না। ওখানে ফিরেই নবাবকে সব আমি সাফ্ খুলে বলবো, এদের ভুয়ো চাল ধরিয়ে দেব। নবাবকে এই সব ফন্দীবাজ চোরের হাত থেকে রক্ষা করব। আজ আর বেশী কথা থাক। শীঘ্রই ত ফিরছি। আপনার মেয়েদের কাছে আমার কথা বলবেন, তাঁরা যেন আমার এ দীর্ঘ অনুপস্থিতি ক্ষমার চক্ষে দেখেন! আপনার টেবিলের এককোণে যে ঠাঁইটুকু পেয়েছি, ফিরে গিয়ে শীঘ্রই তাতে আবার দাবী বসাবো—এ কথাটুকুও তাঁদের মনে রাখতে বলবেন। আজ তবে আসি। ইতি

পল দে গেরি।"

নবাবের প্রাসাদে এ দিকে অতিথি সমাগমের বিপুল ধুম বাধিয়া গিয়াছিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অতিথির আর বিরাম নাই। নানা আকারের, নানা বেশের লোক সাগ্রহ চিত্তে নবাবের প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছে, আবার পূর্ণ পকেটে হৃষ্ট মনে ফিরিয়া যাইতেছে। নৈরাশ্যে কাতর একখানি মুখেরও দেখা মিলে না। সকলেই যেন এক কল্পতরুর সন্ধান পাইয়া সাগ্রহে ছুটিয়া আসিতেছে—আবার আগ্রহ মিটাইয়া বাসনা পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে! নবাবের

প্রাসাদ যেন একটা সরাইয়ের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এক বিরাট কামনা-সত্র! যে যে কামনা লইয়া আসিতেছে, তাহার সেই কামনাই নবাবের প্রসন্ন দৃষ্টি-কিরণে, করুণার মিষ্ট ধারায় ভরিয়া পূরিয়া উঠিতেছে! এই নির্ব্বাচনের উপলক্ষে সকলেই আপনার আপনার তহবিলটিকে ভালো করিয়া ভরিয়া লইবার সুযোগ পাইয়া যেন বর্ত্তাইয়া গিয়াছে।

ওদিকে বাজারের একপ্রান্ত হইতে আর একটা দুঃসংবাদও জাগিয়া উঠিয়াছে—নবাবের জয়ের আশা না কি ততটা পরিপূর্ণ নহে! ইহা সেই হেমারলিঙের চাল—নিশ্চয় ইহার মূলে হেমারলিঙের ষড়যন্ত্র! হেমারলিঙের বিরুদ্ধে নবাব তাই এই নিষ্ঠুর কঠোর অর্থ-যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। স্কুল, লাইব্রেরী, ক্লাব, চিত্রশালা সর্ব্বত্র বিরাট চাঁদা দিয়া, লোকের পকেটে টাকা ঢালিয়া—টাকায় তিনি সেই আশঙ্কা-মূলক জনরবটাকে ঢাকিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যে নবাবের চিত্ত সংক্ষুব্ধ সাগরের মত গভীর থাকিত, শত সহস্র বিদ্বেষ ও হিংসার বাণে এতটুকু বিচলিত হইত না—সেই নবাব আজ মুহুর্মুহু উত্তেজিত, বিচলিত, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছেন। গেরি তাহা লক্ষ্য করিল। তাহার প্রাণে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। আহা, নবাব, বেচারা নবাব! রাক্ষসের মত এই পারির লোকেরা নির্দ্দয়ভাবে নবাবের অর্থ শোষণ করিতেছে! উপায় নাই—উপায় নাই! এ মারণের হাত হইতে নবাবকে রক্ষা করিবার গেরির এতটুকু সামর্থ্য নাই! দাঁড়াইয়া তাহাকে এ মারণ-যজ্ঞ দেখিতে হইবে! সে কি শুধু নবাবের নিমক খাইয়াছে? না—নবাবের স্নেহে, নবাবের করুণায় আজ যে সে ভদ্রলোকের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে। তাহার প্রাণটা ত শুকাইয়াই গিয়াছিল,—নবাবই তাহাতে সহানুভূতির স্নিগ্ধ শীতল ধারা ঢালিয়া তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন! নবাব যে তাহার সব—তাহার বন্ধু, তাহার পিতা, তাহার বিধাতা! সেই নবাবের এই নির্য্যাতন কেমন করিয়া স্থিরভাবে সে দাঁড়াইয়া দেখিবে! অথচ নবাবকে বুঝান দুষ্কর—বুঝাইলেও তিনি বুঝিবেন না যে! কতবার সে বলিবার চেষ্টা করিয়াছে—কথা পাড়িতে গেলেই নবাব ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠেন, "আচ্ছা, গেরি, পরে তোমার সব কথা শুনবো। এখন আমার একটুও দাঁড়াবার সময় নেই!" বলিয়াই তিনি এই রাক্ষসদের দলে অধীর সবেগে ছুটিয়া গিয়াছেন। গেরির মনে পড়িল, সেই প্রাচীন রূপকথার গল্প। কোন্ অজগরের নিশ্বাসের এমন জোর ছিল যে সে শ্বাস গ্রহণ করিলেই চারিধার হইতে নর-নারী অধীর আগ্রহে তাহার গ্রাসে ছুটিত। সে নিশ্বাসের যাদু নবাবকেও মজাইয়াছে! নবাব না জানিয়া এই ধ্বংসের পথে আপনার মৃত্যু-গহ্বরে অন্ধভাবে ছুটিয়া চলিয়াছেন! নিরুপায় গেরি তখন আর এক পথ অবলম্বন করিল।

একদিন রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার সময় নবাব বালিশের উপর একখানি পত্র পাইলেন। তাঁহারই নামে পত্র—তাহাতে গেরির নাম সহি রহিয়াছে। নবাবের

কৌতূহল হইল—তখনই তিনি পত্রখানি পাঠ করিলেন। পত্রের প্রতি ছত্রে গেরির তরুণ হৃদয়ের নির্ম্মল সারল্য, তাহার সাধুতার অনাবিল উচ্ছ্বাস স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মতই যেন লুটাইয়া রহিয়াছে। গেরি কোন কথা ঢাকিয়া রাখে নাই, সব—সব কথা খুলিয়া লিখিয়াছে। নবাবের বিরুদ্ধে সারা নগরের এই বিপুল ষড়যন্ত্র—নবাবের ঐশ্বর্য্যের বিরুদ্ধে এই নিষ্ঠুর অভিযান, তাঁহার পুণ্য-নামের বিরুদ্ধে অপবাদ ও লাঞ্ছনার শরক্ষেপ—সব কথা গেরি খুলিয়া লিখিয়াছে—প্রমাণ অবধি বাকী রাখে নাই। রাক্ষসগুলার নাম পর্য্যন্ত সে ধরিয়া দিয়াছে। কোথা দিয়া কেমন করিয়া কোন্ পাষণ্ড আপনার কোন্ অভীষ্ট সাধনের সুযোগ খুঁজিতেছে, তাহাও গেরি নবাবের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে ছাড়ে নাই। কর্সিকার কারবার একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পা—খনি সার-হীন, দেশ জঙ্গলময়, লোকজন বর্ব্বর! নবাবকে কি করিয়া সকলে ফাঁদে ফেলিতেছে—সমস্ত বিষয়েরই গেরি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়াছে। চিঠির শেষে গেরি লিখিয়াছে, "প্রমাণের সমস্ত কাগজ-পত্র আমার ঘরের টেবিলের বাঁ দিককার ড্রয়ারে পাইবেন। সেগুলি এই চিঠির সঙ্গেই রাখিতে পারিতাম—কিন্তু রাখিলাম না, কারণ আপনার বাড়ীর একটী লোককেও আমি আর বিশ্বাস করি না—আপনার চাকর নিলকে অবধি না। আমার মনে হয়, আপনার বিরুদ্ধে সকলেই কি এক ষড়যন্ত্র করিতেছে।

কাল ভোরেই আমি চলিয়া যাইব, স্থির করিয়াছি। ড্রয়ারের চাবি আপনাকে দিয়া যাইব—তখন খুলিয়া সে সকল কাগজ পত্র দেখিবেন।

কেন চলিয়া যাইতেছি, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমার এখানে কোন অভাব ছিল না, কোন অনুযোগ নয়। তবু যে যাইতেছি জানিবেন, সে বড় মনের দুঃখে। আপনি আমার কে, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়। তবু আমায় যাইতে হইতেছে। তাহার কারণ, আপনার কোন উপকারে লাগিতেছি না—আপনার খাইয়া, আপনার পরিয়া, দাঁড়াইয়া আপনারই সর্ব্বনাশ দেখিব, সে শক্তি আমার নাই। আপনাকে যে এই সব রাক্ষসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছি না, এই দুঃখই কাঁটার মত বিঁধিতেছে। কিছু করিতে পারিতেছি না—এজন্য আমার সমস্ত প্রাণ জ্বলিয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে। হে আমার গুরু, হে আমার বিধাতা, হে আমার সব, আপনাকে এ প্রাণের কৃতজ্ঞতা না জানাইয়াই তাই চলিয়া যাইতেছি, আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

কিন্তু চারিদিকে ভীষণ চক্রান্ত, এই ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া আমার ভয়ও হইতেছে—নিজের উপরও ক্রমে বিশ্বাস হারাইতেছি। ভয় হয়, কোন্ দিন বা আমিও এই সব নিমকহারাম শয়তানের দলে মিশিয়া যাই! সেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় আজ আমি বিদায় লইলাম। এ-সঙ্গে আর বেশী দিন থাকিলে, আমিও যে আপনার শত্রু হইয়া দাঁড়াইব না, তাহা কে বলিতে পারে।"

পত্রখানি ধীরে ধীরে নবাব পড়িয়া শেষ করিলেন। তাঁহার দুই চোখের

কোণে দুই বিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গেরির কক্ষাভিমুখে চলিলেন।

গেরি তখন কতকগুলা কাগজ-পত্র তাড়া করিয়া গুছাইয়া বাঁধিতেছিল—হঠাৎ নবাবকে দেখিয়া তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল। নবাব ডাকিলেন, "পল—"

গেরি সসম্ভ্রমে নবাবের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল -তাহার দৃষ্টি নত।

নবাব ঘরের দ্বারটা ভেজাইয়া দিলেন, পরে কহিলেন, "তুমি চলে যাচ্ছ, পল?"

গেরি কোন উত্তর দিল না; তাহার বুকের মধ্যে কি একটা ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। নবাব আবার কহিলেন, "কিন্তু একটা কথা, সত্য করে বল পল, এই যে পারির এক কোণে আমার নামে আজ একটা কুৎসা জেগে উঠেছে, সেই শুনেই আমার উপর ঘৃণা করে তুমি চলে যাচ্ছ, না, আর কোন কারণে যাচ্ছ? বল,— এ কথাটুকু শোনবার বোধ হয় আমার অধিকার আছে, পল—কেন না, তুমি নিজেই বলেছ, আমায় তুমি নিজের বাপের মতই ভাল বাস।"

পল বলিল, তাহার চিঠিতেই সে চলিয়া যাইবার কারণ কি তাহা খুলিয়া বলিয়াছে ত—তাহা ছাড়া যাইবার আর দ্বিতীয় কারণ নাই।

নবাব কহিলেন, "তবে শোন পল, তোমায় এক নতুন কথা বলি। তোমার চিঠি আমি পড়েছি—এ চিঠি তোমারই যোগ্য হয়েছে। তুমি ঠিকই বলেছ, পল, এই পারি সহরটাকে আমি যে রকম ভাবতুম, সে রকম সে মোটেই নয়। এ যেন রাক্ষসীর মতই দিবারাত্র হাঁ করে আছে! চারিধারে ষড়যন্ত্র—চারিধারে ফন্দীবাজী চলেছে। আমি এখানে এমন একজন বন্ধু খুঁজছিলুম, যে আমায় এই সব দারুণ ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করে—এই সব ফন্দীবাজ লুঠের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। ভগবান তাই তোমায় জুটিয়ে দিয়েছেন। পল, সহরের যত হতভাগা তাদের জুতোর কাদা আমার ঘরের কার্পেটে এসে মুছে গেছে, সে কাদা আমায় সাফ করতেই হবে। রাজ্যের জঞ্জালে আমার ঘর ভরে আছে— সে জঞ্জাল শক্ত হাতে সরাতে হবে। কিন্তু এ জঞ্জাল সাফ করা আমার একার কাজ নয়। তাতে তোমারও সাহায্য চাই। কিন্তু কিছুদিন সবুর কর—একবার এই ডেপুটিটা হয়ে নি,—কর্সিকার ডেপুটি। আর সেই ডেপুটিগিরি পেতে হলে এই সব চোরগুলোকে হাতে রাখা চাই—শুধু সেই কটা দিন তুমি ধৈর্য্য ধরে থাকো, তার পর সব বোঝা-পড়া হবে!

তা-ছাড়া ডেপুটি না হলেও চলবে না। কারণ আছে, শোন। তুমি জানো, বে-কে সেদিন অগাধ টাকা ধার দিয়েছি। সে টাকা শোধ করবার তার ত মতলবই নেই। সে টাকা চাওয়ায় উল্টে সে আশি লক্ষ টাকার দাবী করেছে—বলে, এ টাকা তার ভাইকে ঠকিয়ে ভুলিয়ে আমি আত্মসাৎ করেছি—বুঝলে? কিন্তু ভগবান জানেন, সে আমার ন্যায্য পাওনা কড়ি; গতর খাটিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা। আমি কমিশন

এজেণ্ট ছিলুম—বে-র ভাই আহম্মদ আমায় ভালবাসত, আমার এ টাকা রোজগার করবার সে সুযোগ দিয়েছিল মাত্র, এই যা; এ বে-ও লোক মন্দ ছিল না, কিন্তু ঐ হেমারলিঙের দল আমার নামে লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে তার মন বিষিয়ে দিয়েছে। তাদেরই পরামর্শে আমার টাকা সে আজ উড়িয়ে দিতে চায়—উড়িয়ে দিয়ে উল্টো দাবী করে! তার উপর টিউনিসে আমার যথাসর্ব্বস্ব—আমার কারবার, আমার জাহাজ, আমার বাড়ী, জমি, টাকাকড়ি সমস্ত ফাঁকি দিয়ে সে নিতে চায়। নেওয়া সাজেও—নিলেই হল। কে তার বিচার করবে? আমার হকের টাকা, বিচারে কে আমায় পাইয়ে দেবে! যে বিচার করবে, সে বে'র মাইনে খায়—সে বে'র মুখের দিকেই চেয়ে আছে,—কাজেই বিচারের কোন আশা নেই। কিন্তু যদি এই ডেপুটি গিরিটা বরাতে মিলে যায়—তাহলে আমার কোন ভয় নেই—কোন ভাবনা নেই। কর্সিকার ডেপুটি, ফ্রান্সের শাসন-সভার সদস্য জাঁসুলের জিনিযে হাত দিতে বে'র সামর্থ্যও থাকবে না। বুঝলে—না হলে সর্ব্বনাশ—আমায় পথের ভিখিরী হয়ে পথে দাঁড়াতে হবে! তার মানে কি, জানো? আমি মরব!

"এখন ত সব শুনলে পল—এখন বল—এ শুনেও তুমি আমায় ছেড়ে যেতে চাও? আমার কেউ নেই—বন্ধু বল, সহায় বল, আমার কেউ নেই। আমার স্ত্রী? সে কি মানুষ! তাহলে ভাবনা কি ছিল! ছেলেরা—? তারা ত মাটির ঢেলা। তবে আমার মা—! কিন্তু সেই মা আমার দূরে আছেন, তা-ছাড়া নানান্ দুঃখ-শোকে তিনি জর্জ্জর হয়ে পড়েছেন, বুড়ো হয়েছেন—এই মা—আর তুমি। পল, তুমি আর মা ছাড়া আমার এমন কেউ নেই যে আমার পানে চায়, দুটো পরামর্শ দেয়! এ দুঃসময়ে তুমি আমায় ছেড়ে যেও না! ক্লাবে, থিয়েটারে যেখানেই আমি যাই, সেখানেই দেখি, একটা চক্রান্তের ঢেউ চলেছে—হিংসের ছুরি ঝিক্‌ঝিক করছে—হেমারলিঙের দল সাপের মত ফণা তুলে গর্জ্জে বেড়াচ্ছে, চারিধারে বিপদ। এ বিপদে তুমি চলে যেয়ো না।"

নবাবের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। কাশিয়া নবাব আবার কহিলেন, "এই দেখ—ফেলিসিয়া। সে আমার মূর্ত্তি গড়ছিল, এক্সিবিশনে দেবার জন্য—যেই তার সময় এগিয়ে এল, অমনি সে বললে, কোন বিশেষ কারণে মূর্ত্তি শেষ হয়ে উঠল না, কাজেই এক্সিবিশনে দেওয়া গেল না। আমি কোন কথা বলিনি—ভাবেও দেখালুম, তার কথায় আমি বিশ্বাস করেছি। কিন্তু এ কি বিশ্বাস করবার মত কথা! আমি জানি, এ কারণ আর কিছু নয়—এ'ও পারির সহুরে চাল, পারির ফন্দী। চারিধারেই আমি দেখছি, নিরাশা! আজ যদি সালোঁয় আমার মূর্ত্তি ঠাঁই পেত— সে মূর্ত্তি আবার ফেলিসিয়ার হাতে গড়া, তাহলে আমার কম লাভ হত! কিন্তু তা হবে কেন—? আমার বরাত! যেটাকে আমি সহায় বলে অবলম্বন করছি, সেইটেই ঘুন-ধরা ঘুঁটির মত ভেঙ্গে খসে পড়ছে! পল, তুমিই এখন আমার একমাত্র ভরসা। আমায় এ বিপদে ফেলে এখন তুমি চলে যেয়ো না।" (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক ভারত

য়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে ভারত অধিকারে কাহার যোগ্যতা বেশী?

(ম্যাজ্‌লিয়েরের ফরাসী হইতে)

কোনও য়ুরোপীয় জাতির দ্বারা ভারতজয় ভারতের ক্রমোন্নতির জন্যই নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। এমন কোন জাতির দ্বারা ভারতে সামুদ্রিক উপনিবেশ স্থাপন করা আবশ্যক যে জাতির লোক-সংখ্যা অবিরাম নবীকৃত হইবে। কেননা, ডাঙ্গা পথ দিয়া যেকোন জাতিই আসুক না কেন, সে জাতি সমগ্র দেশকে সভ্য করিয়া তুলিতে পারিবে না; স্বীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার পূর্ব্বেই সেই সব আক্রমণকারীরা আব-হাওয়ার নিকট হার মানিয়া দেশীয়দিগের সহিত একত্র মিশিয়া যাইবে।

কিন্তু য়ুরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে কোন্‌ জাতির দ্বারা ভারত অধিকৃত হওয়া উচিত? উহাদের মধ্যে অধিকাংশ জাতিই ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, তন্মধ্যে কাহারো-কাহারো কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্প ছিল না। দেনেমারেরা অতীব দুর্ব্বল; জর্ম্মনেরা বিভক্ত, এবং অন্য স্বার্থ লইয়া পূর্ব্ব হইতে ব্যাপৃত। ইহাদের মধ্যে চারি জাতি ভারতে স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং তাহাদের বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রকৃতি, য়ুরোপীয়দিগের বিচিত্র মনোগতির পরিচয় দিয়া থাকে। এই চারি জাতি—পোর্টুগী, (এক শতাব্দী ধরিয়া স্পেন জাতির সহিত সংযুক্ত) ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ।

*
* *

পূর্ব্বে স্পেনজাতি মুরদিগের সহিত যুদ্ধে যে-ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, সেই ভাবের ভাবুক হইয়াই বীরধর্ম্মী খৃষ্টান ভাস্‌কো-দা-গামা, আল্‌বুকার্ক, জুয়ান-দা-কাস্ত্রো বিপদের অন্বেষণে যাত্রা করে।

সম্রাট্‌ Charlemagneএর সমকক্ষ হইবার স্পর্দ্ধায় তাহারা সম্রাজ্যবিজয়ের স্বপ্ন মনোমধ্যে পোষণ করিয়াছিল। ক্রমে গোয়া, কালিকট্‌, সিংহল, মলক্কা, মাকাও তাহাদের হস্তগত হইল।

Camoens বলেন;—"আমি সেই সকল জগদ্‌বিখ্যাত বীরগণের বাহুবল কীর্ত্তন করিব যাঁহারা লুসিটানিয়ার পশ্চিম কূল হইতে, জাহাজে করিয়া অজ্ঞাত সমুদ্রপথে Trapobane ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। কি যুদ্ধবিগ্রহে, কি বিপদ-আপদে,—তাঁহাদের সাহস সর্ব্বপ্রকার মানব-শক্তির উর্দ্ধে স্বকীয় শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছিল। সুদূর দেশবাসী-দিগের মধ্যে তাঁহারা এরূপ এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন যাহার খ্যাতি দ্যুলোক পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছিল। আমি সেই রাজাদিগেরও মহিমান্বিত

কীর্ত্তিকলাপ গান করিব যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, আফ্রিকা ও এসিয়ার অধর্ম্মপরায়ণ দেশ-সমূহকে উজাড় করিয়া দিয়া অমর কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন।" গোড়ায় ঐ সকল দিগ্-বিজয়ীদিগের এইরূপ ভাবই ছিল। কিন্তু হঠাৎ প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করায় পোর্ট্গাল ও স্পেনের আর্থিক জীবনটা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। উহাদের মধ্যে যাহারা খুব শ্রমী ছিল, শ্রমের কার্য্যে তাহাদের অরুচি জন্মিল; বিপদ-অন্বেষণের কাজটা তাহারা পছন্দ করিল, এমন-কি বিপদান্বেষণের স্বপ্নও তাহাদের ভাল লাগিতে লাগিল। একটি অতিবিস্তৃত সাম্রাজ্য পোর্টুগালের ক্রমোন্নতির গতিরোধ করিল এবং তাহাদের নিজের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অধিকৃত রাজ্যেরও অবনতি হইল।

তাহার পর উপনিবেশগুলির শাসন-কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইতেছিল না। অসংযত ক্ষমতালুব্ধ কর্ম্মচারীদিগকে উদ্ধত ও নৃশংস করিয়া তুলিল। য়ুরোপীয় (Inquisition) বিধর্ম্মীদিগের বিচারার্থ একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মাধি-করণ স্থাপিত হইল।

উহারা ভীরু, সন্দিগ্ধ ও কোন নূতন কার্য্য প্রবর্ত্তনে অসমর্থ হইয়া উঠিল। অথচ, তরুণ উপনিবেশের পুষ্টিসাধনের জন্য, কোন উন্নতিজনক কার্য্য আরম্ভ না করি-লেও চলে না। দেশীয় লোকদিগের বিরুদ্ধেও Inquisition প্রতিষ্ঠিত হইল। জাতীয় ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান দেশীয় লোকেরা উহাদের প্রতি উৎপীড়ন করিতে লাগিল; দেশীয় রাজাদিগের প্রতি, প্রটেষ্টাণ্ট ওলন্দাজ-দিগের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। যাহারা নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল, তাহারা পোর্টুগী নাম ধারণ করিল, য়ুরো-পীয়দিগের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ হইল। এইরূপে একদিকে যেমন শাসনপদ্ধতির অবনতি হইল, সেই সঙ্গে সমস্ত জাতিটাই অবনতিগ্রস্ত হইল। সপ্তদশশতাব্দীতে পোর্টুগীরা তাহাদের অধিকৃত রাজ্যের অধিকাংশই হারাইল; যাহা তাহাদের বজায় রহিল, সে সমস্ত রাজ্যও শক্তিহীন ও দরিদ্র হইয়া পড়িল। কেবল ভয়ত্রাসই তাহাদিগকে বিদ্রোহী হইতে দেয় নাই। অতএব ঐ জাতি এমন সকল গুণ কখন পাইতে পারে না যাহা থাকায় মানুষ। বিপদসঙ্কুল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, কিংবা স্থায়ী সাম্রাজ্যস্থাপনে সফলতা লাভ করিতে পারে।

*
* *

পোর্টুগীদিগের পরে ওলন্দাজ। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজদিগের সামুদ্রিক বাণিজ্য একচেটিয়া ছিল। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে, বিশ হাজার য়ুরোপীয় জাহাজের মধ্যে, ষোল হাজার ওলন্দাজদিগের ছিল। উহাদের দুই কোম্পানী,—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ইণ্ডিয়া কোম্পানী—সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের গতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিত; অ্যামষ্টার্ডামের শ্রেষ্ঠিচত্বর (Exchange) সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত করিত। উহাদের বেঙ্কের কোষে ৩০ কোটি ফ্লোরিণ মজুদ থাকিত। কার্পাস বস্ত্র, মসিনার সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র, বুটার কর্ম্ম,

ও গালিচা—এই সমস্ত শ্রমশিল্পে উহাদের খুব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

১৩৩৫ হইতে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দ—এই কালের মধ্যে ওলন্দাজেরা, গোয়া ছাড়া পোর্টোগীদিগের প্রায় এসিয়ার সমস্ত অধিকৃত রাজ্য তাহারা কাড়িয়া লইয়াছিল। সেই অবধি, উত্তমাশা-অন্তরীপ,—য়ুরোপের যাত্রাপথকে ওলন্দাজদিগের আয়ত্তাধীন করিয়া দিল; আবার মলাক্কা,—চরমপ্রান্তবর্ত্তী এসিয়ার পথ উহাদের দখলে আনিয়া দিল। উহাদের রাষ্ট্রনীতি বণিকের রাষ্ট্রনীতি ছিল। সমস্ত প্রতিযোগিতা অপসারিত করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত—উহারা প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পরাঙ্মুখ ছিল না! উহারা ধন সম্পদ উপভোগ করিতেই ব্যস্ত সুতরাং উহাদের দেশবিজয়ের চেষ্টা ছিল না। উহারা দেশীয় রাজাদিগের আশ্রয় লাভ করিতেই ভালবাসিত। উহারা যতদূর পারিত দেশের ধন শোষণ করিয়া দেশীয় লোকদিগকে কুলি মজুরে পরিণত করিত।

Guexএর যুদ্ধসময়ে ওলন্দাজেরা যে সকল গুণ অর্জ্জন করিয়াছিল, সমৃদ্ধি ঐ সকল গুণ ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে অপহরণ করিল। ক্রমওএলের অধীনে ইংরাজদিগের সামুদ্রিক প্রভুত্ব যে সময় পরিপুষ্ট হইতেছিল, যে সময়ে চতুর্দ্দশ লুই-র যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল, সেই সময়েই ওলন্দাজদিগের প্রভুত্বের অবসান হয়। সোণ্ডের দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া, এসিয়ার সমস্ত উপনিবেশগুলি হলণ্ডের হস্তচ্যুত হইল। প্রাচীন পোর্টুগী নগরগুলি, বড় বড় নামজাদা মেটে-ফিরিঙ্গি অধিবাসী লইয়া, গির্জ্জাগুলিকে বহুমূল্য ভূষণে বিভূষিত করিয়া, পোর্টুগী-মর্ম্মভাব কতকটা বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু ওলন্দাজেরা ভারতে সেরূপ কোন কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারে নাই—কেবল কতকগুলি ক্ষুদ্র বন্দরে কতকগুলি পুরাতন গৃহ রাখিয়া গিয়াছে মাত্র। আবার সে বন্দরগুলিও এখন প্রায় পরিত্যক্ত।

*
* *

অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগে, ইংরাজ ও ফরাসী—ইহাদেরই মধ্যে প্রাধান্য লইয়া বিবাদ চলিতে লাগিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রয়োজন, এই দুই জাতির রাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন গতি নির্দ্দেশ করিল। ফ্রান্স-দেশের ব্যক্তিগত আরম্ভিক উদ্যোগ আদৌ ছিল না। রাজমন্ত্রিগণ প্রাচ্য সাম্রাজ্য স্থাপন-কল্পনায় বাণিজ্যের কোম্পানী স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা য়ুরোপে ফরাসী প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য এরূপ ব্যস্ত ছিলেন যে, ভারতীয় ব্যাপারে বহুকাল ধরিয়া মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। তাহার পর Lawএর হঠাৎ নানা প্রকার খামখেয়ালী মৎলবের আবির্ভাব হইল; অভিজাতবর্গ, বেঙ্ক-কর্ত্তা, সওদাগর, এমন কি শ্রমজীবিরা পর্য্যন্ত সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল,—এসিয়া পরমাশ্চর্য্য অদ্ভুত ব্যাপারের লীলাভূমি, এবং কতকগুলি ভারতীয় বাণিজ্যকোম্পানী স্থাপন করিলেই তাহারা অচিরাৎ ধনশালী হইয়া উঠিবে। কিন্তু তার পরেই

বণিক্‌সম্প্রদায় দেউলিয়া হইয়া পড়িল; তখন ভাগ্যান্বেষী বণিকেরা তাহাদের শেয়ারগুলি বিক্রয় করিতে এত ব্যস্ত হইল যে তাহার বিনিময়ে তাহারা রত্ন-অলঙ্কার ও বাসন কোষণ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে লাগিল এবং রাজ-সরকার হইতেও জহুরী ও স্বর্ণকার-দিগের ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইল। তথাপি ফ্রান্সের স্থাপিত ভারতীয় কোম্পানী কতকগুলি গুরুতর অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল—যথা,—তামাকের একচেটিয়া ব্যবসায়। ঐ কোম্পানী ফ্রান্স-দ্বীপ, La Reunion, পণ্ডিচেরীর বন্দর—এই স্থান গুলির অধিকারী ছিল। কিন্তু Law দেউলিয়া হইয়া যাইবার পর, উপনিবেশের কথা কেহ আর মুখে আনিত না। কিন্তু ভারতে ব্যবসায় বাণিজ্যে হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। সেই সময়ে শাসনকর্ত্তা ডুপ্লে এমন একটা মৎলব আঁটিয়াছিলেন—যাহা প্রতিভার পরিচায়ক:—

অর্থাৎ—ভারতীয় উপাদান লইয়াই একটি ভারতীয় সাম্রাজ্য সৃষ্টি করা। তিনি বিজয়-সূত্রে এই সাম্রাজ্য স্থাপন করিবেন মনে করেন নাই, মোগল সম্রাট ও কর্ণাট-নবাবের প্রদত্ত অধিকার-পত্রের বলেই এই সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বেতনভুক ভারতীয় সৈন্যই তাঁহার সৈন্য হইবে, কেবল কতকগুলি ফরাসী সেনা-নায়ক থাকিবে। তাছাড়া, তাঁহার শাসনপদ্ধতি দেশীয় লোকেরই শাসনপদ্ধতি হইবে; কেবল কতকগুলি ফরাসী তত্ত্বাবধায়ক থাকিবে। এতদ্ব্যতীত তিনি মুসলমান ও হিন্দু রাজাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিতে চাহিলেন না; তিনি তাহাদিগকে সামন্ত রাজা অথবা মিত্ররাজা করিয়া রাখিতে চাহিলেন। তিনি দেশীয় রাজাদিগের রাজ-কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন. উত্তরাধিকার সম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি একজন উত্তরাধিকারী খাড়া করিয়া দিতেন, এবং তাঁহার আশ্রিত উত্তরাধিকারীকে সৈন্য, অর্থ, ও যুদ্ধসরঞ্জাম প্রভৃতি যোগান দিয়া সাহায্য করিতেন। কতকগুলি রক্ষিসৈন্যের সহিত একজন ফরাসী Resident তিনি রাখিয়া দিতেন এবং সেই রেসিডেণ্ট তাঁহার মিত্র রাজাদিগের উপর নজর রাখিত। এবং সেই মিত্র রাজারাই রেসিডেণ্টের বেতন যোগাইত। এক সময়ে ডুপ্লেই দাক্ষিণাত্যের প্রভু হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান রাজারা, এমন কি নিজাম পর্য্যন্ত, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু ডুপ্লের কার্য্য—এক ব্যক্তির কার্য্য। একার্য্যে সমস্ত ফরাসী জাতির বড় একটা হাত ছিল না, সুতরাং ফ্রান্স একার্য্যে কিছুমাত্র অনুরাগ দেখাইল না। অন্যান্য প্রধানেরা এমন কি বীর-পুরুষ লাবুদোনে পর্য্যন্ত মনে করিলেন, ডুপ্লের বিনাশে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বিনষ্ট হইবে মাত্র। তাহার দরুণ স্বদেশের কিছুমাত্র স্বার্থ হানি হইবে না। ফলতঃ প্রধানদের বিরোধেই ভারতে ফ্রান্সের ইষ্টসিদ্ধ হইল না। ডুপ্লে, ফ্রান্সে পুনরাহূত হইলেন, ডুপ্লের সাম্রাজ্য অন্তর্হিত হইল।

*
* *

ইহার বিপরীতে, যে চারিত্র্যের প্রভাবে ইংরাজ সমস্ত পৃথিবীতে উপনিবেশ স্থাপন

করিতে সমর্থ হইয়াছে, ভারতবিজয়েও ইংরাজের সেই চরিত্র-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কতকগুলি শ্রেষ্ঠ লোকের দ্বারা গঠিত হয় নাই, উহা সমস্ত জাতির ধৈর্য্যসহকৃত কার্য্যের ফল। ইংলণ্ডের রাজ্যবৃদ্ধির পক্ষে, সমুদ্র একটি বিষম অন্তরায়। ইংলণ্ডের নৌ-বহর এবং উহার উপনিবেশগুলিই দূরবর্ত্তী রাজ্য সকল জয় করিতে পারে। লৌহ ও কয়লার খনি থাকায়, ইংলণ্ডের শ্রমশিল্পে শক্তিমান হইবারই কথা। এবং বাণিজ্যই তাহার শ্রমজাত দ্রব্যসামগ্রীর কাটতির পথ সুগম করিয়া দিতে পারে। শিল্প ও বাণিজ্য-সম্পদে এইরূপ সমৃদ্ধ হইয়া, ইংলণ্ড স্বকীয় অর্থ, ব্যবসায়ে খাটাইবার জন্য স্বভাবতই ইচ্ছুক হইবে। উপনিবেশ সমূহের যে মূলধনের অভাব, তাহাদিগকে সেই মূলধন যোগাইয়া ইংলণ্ড লভ্যজনক রাজস্ব আদায় করিতে সমর্থ হইবে।

সৌভাগ্যের অভ্যুদয়ে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়ায়, অতীব ক্ষুদ্রায়তন ইংলণ্ড, বসতি স্থাপনের জন্য দেশান্তরে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিল। এবং ইংরাজের অন্তঃ-প্রকৃতিই তাহাকে আত্মনির্ব্বাসনে প্রবৃত্ত করিল। দেশীয় লোকদিগের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ না হইয়াও কিরূপে তাহাদিগকে বশীভূত করা যায়, ইংরাজ তাহা বিলক্ষণ জানে। ইংরাজ বিজনতাকে ভয় করে না। Robinson Cruso—দেশান্তরবাসী ইংরাজের আদর্শ। ঝটিকার তাড়নায় একটা বিজন দ্বীপে নিক্ষিপ্ত হইয়া রবিন্‌সন্ ক্রুসো জীবন ধারণের জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; একটা খাল খনন করিবার মৎলব করিয়া কত বৎসরের পর তবে সেই খাল কাটা শেষ করিল।

ইংরাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও যাহাকে প্রকৃত ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ বলে—সেই ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ ইংরাজের নাই। ইংরাজ নিজের জন্য শুধু দৈহিক সুখস্বচ্ছন্দতা চাহে। তাহার মতে বড়কাজ মাত্রই সম-বেত লোকের কাজ। ইতুর্বিদ্ যেরূপ মেক্‌সিকোর সম্রাট্ হইতে ইচ্ছুক হইয়া-ছিলেন, সেইরূপ কোন ইংরাজ, স্বতন্ত্র রাজ্য স্বরূপ কোন উপনিবেশ স্থাপন করিতে কল্পনাও করিবে না। ইংরাজ-সরকারের সাহায্য না লইয়া, রাজা ব্রুক্‌স্ ও সেসিল রোড্‌সের মত যাহারা সম্রাজ্য জয় করিয়া-ছিল তাহারাও রাজসরকারের আশ্রয় চাহিয়াছিল।

ব্রিটিস্ সম্রাজ্যের বৃহত্ত্বের জন্য ইংলণ্ড উদার প্রতিষ্ঠানাদির নিকটেও ঋণী। ইংরাজ কখনই এই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতিকে মিশাইয়া একাকার করিতে চাহেন নাই, অথবা একই প্রকার প্রতিষ্ঠানাদি তাহাদের সকলের উপর চাপাইতে চাহেন নাই। ভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানকার খুব বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যেও যাহা সেই সব জাতির স্বভাবসিদ্ধ এরূপ নানাপ্রকার শাসনতন্ত্র রহিয়াছে। হিন্দু, চিনীয়, মালাই, আরব, কাফ্রি, য়ুরোপীয়—এই সব জাতিরা স্ব স্ব আচার ব্যবহার, বিধি-ব্যবস্থা এবং অনেক পরিমাণে স্বকীয় প্রাচীন রাজনৈতিক মূলসূত্রগুলি বজায় রাখিয়াছে।

এবং যাহারা কোন এক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, সেই প্রত্যেক উপনিবেশ তাহাদের মর্ম্মভাবটি রক্ষা করিতেছে।—হৌক তাহারা "পুরিটান্," হৌক তাহারা নগরের "বুর্জোয়া" কিংবা কাঞ্চন-অন্বেষীর দল। এই প্রকার সমন্বয়ের প্রভাবেই এই জটিলতাপূর্ণ সাম্রাজ্য সংরক্ষিত হইতেছে ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে। কিন্তু ইংরাজেরা ওলন্দাজ- দিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নাই। ইংরাজেরা দেশীয় লোকদিগকে সভ্য করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, এবং ইংলণ্ডের উদার প্রতিষ্ঠানাদি দ্বারাই সভ্যতা বিস্তার করিতেছে।

কলম্বস্ ভাস্কো-ডি গামা, পিজারো, ডুপ্লে ইঁহারা যেরূপ কীর্ত্তিসমুজ্জ্বল অপারসীম সৌভাগ্যসম্পদ অর্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের উপনিবেশ বিস্তারে সেরূপ সৌভাগ্যসম্পদ অর্জ্জিত হইল না। রিশলিউর অথবা পিটর দি গ্রেটের কল্পিত দানপত্রে যে সকল ভাবী বিরাট সঙ্কল্প সমূহের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, ইংলণ্ডের উপনিবেশ বিস্তারে, সেরূপ কোন সঙ্কল্পের আভাস পাওয়া যায় না। এই উপনিবেশ বিস্তারের কাজ—"দিন খাটুনির" কাজ, প্রতি দিনের কাজ। দার্শনিক-দৃষ্টিতে বিচার করিলে, ইহার মধ্যে বহুল অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। কখন বা নৈরাশ্যের আবেশ, কখন বা উন্মত্ত ঔদ্ধত্য; আজ বিশ্বমানব-প্রীতি, কাল পাশব নৃশংসতা; কিন্তু এই আত্মচেতনাবিরহিত কার্য্য প্রকৃতির কার্য্যকলাপকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই অসঙ্গতির মধ্যেও বলের পরিচয়, সহজসংস্কারগত ধ্রুবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যান্য জাতিরা, অনুকরণের ভাবে, গর্ব্বের ভাবে, এমন কি, স্বকীয় রাষ্ট্রনৈতিক শক্তিবর্দ্ধনের অভিলাষে, স্বকীয় ভাষা ও রীতিনীতির প্রভাব বিস্তারের অভিপ্রায়ে, উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ইংরাজেরা পূর্ব্বতন ফিনিসীয়দিগের ন্যায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে; কেননা, ইংলণ্ডের পক্ষে, অথবা প্রত্যেক দেশান্তর-যাত্রীর পক্ষে ইহা জীবন মরণের কথা!

দক্ষিণ আফ্রিকা ও এসিয়ার সমস্ত য়ুরোপীয় আবিষ্কৃত দেশ, পোর্টুগীদের দ্বারা বিজিত হইয়াছিল। পরে, ওলন্দাজেরা পোর্টুগীদের নিকট হইতে ঐ সকল দেশ কাড়িয়া লয়; তাহারা আবার ঐ সকল দেশ ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ফলতঃ এই তিন জাতির প্রণালীই উপনিবেশের তিন বৃহৎ প্রণালী। যথা:— সামরিক বিজয়-সাধন, বাণিজ্যের দ্বারা কোন দেশের ধন শোষণ, এবং দেশশাসনের সুব্যবস্থা। এই সভ্যতা যেরূপ পরপর বিকাশ লাভ করিয়াছিল, এই তিন প্রণালী সেই বিকাশের অনুরূপ। এইরূপে, যে তিন বিভিন্ন জাতির প্রকৃতি এই তিন বিভিন্ন সভ্যতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক, সেই তিন জাতিই পর্য্যায়ক্রমে এসিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

ইংরেজই শেষে অন্যান্য য়ুরোপীয় শক্তিকে পরাভূত করিয়া সমস্ত জয় করিল।

ফলতঃ ইংলণ্ডই ভারতের সহিত একটা বিশেষ বন্ধন সূত্রে আবদ্ধ হইল, তাহার জন্য আবশ্যক

মত ত্যাগ স্বীকার করিল, য়ুরোপীয় প্রাধান্য লাভের সঙ্কল্পকে এসিয়িক প্রাধান্য লাভের সঙ্কল্পের অধীন করিয়া রাখিল। কেননা, ভারত অধিকার করা একমাত্র ইংলণ্ডেরই নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। এসিয়া ও সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জের বিজয় সাধনের জন্য ভারত তাহাদের একটা আশ্রয়স্থান হইল, তাহাদের পণ্য দ্রব্যের কাটতির জন্য ভারতই একটি তাহাদের বৃহৎ বিপনি হইল, এবং ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদিগকে মোটা বেতনে কাজ যোগাইবার জন্য ভারতের শাসনকার্য্যই তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র হইল।

য়ুরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডই অধিক ধনশালী, সুতরাং ভারতে আবশ্যকীয় মূলধন আনিবার জন্য একমাত্র ইংলণ্ডই সমর্থ। ত্রিশ বৎসরের মধ্যেও হলণ্ড সুমাত্রাদ্বীপের অন্তর্গত আচিন প্রদেশে শান্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। এবং বোর্ণিও দ্বীপে যে অংশ ওলন্দাজদিগের অধিকারে অবস্থিত সেই অংশটিতে নরমাংসাশী লোকের বসতি। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, ওলন্দাজেরা এই সকল দ্বীপের জঙ্গল আবাদ করিবার জন্য, জলাভূমির জল শোষণের জন্য, রাজপথ ও রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য আবশ্যকীয় অর্থ ব্যয় করিতে অসমর্থ। ইংরাজের প্রভূত অর্থই ভারতকে ইংরাজ ভূমি করিয়া তুলিয়াছে।

তাছাড়া একমাত্র ইংলণ্ডই সেই মনুষ্য জাতি গড়িয়া তুলিতে পারে যাহারা ভারত জয় করিতে ও ভারত শাসন করিতে সমর্থ;—সেই সব লোক যাহারা স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য কোন প্রকার সংকোচ করে না, অথচ নিজ শক্তির অহঙ্কারেও কখন উন্মত্ত হয় না। এই ভারত বিজয়ীর প্রতি অতিমাত্র ঔদ্ধত্য বা কঠোরতা আরোপ করা যায় না; কোন প্রকার অত্যাচার বা নৃশংসতার জন্য উহাদিগকে নিন্দা করিতে পারা যায় না।—সেই সব লোক যাহারা অনতিপরিমাণ বেতনের বিনিময়ে, গ্রীষ্মদেশোচিত প্রখর সূর্য্যাতাপ সহ্য করে, বন জঙ্গলের জ্বররোগের আক্রমণ সহ্য করে—শুধু কতিপয় দিবসের জন্য নহে, পরন্তু খাল কাটিবার সময়ে, রেলপথ করিবার সময়, বৈদ্যুতিক তারের জাল বিস্তার করিবার সময়, বৎসরের পর বৎসর এইরূপ সহ্য করিয়া থাকে;—সেই সব লোক যাহারা আবহাওয়ার দারুণ অবসাদ ও এসিয়িক সমাজের প্রচলিত ব্যসনাদির প্রলোভন অতিক্রম করিয়া থাকে। এ কথা সত্য, ইংলণ্ডের ইংরাজেরা ইঙ্গভারতীয়দের আচার ব্যবহারে বিস্মিত হয়; কিন্তু ইংরাজ চরিত্র ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ভারতের পর একবার সুমাত্রা ও জাভায় যাত্রা করা আবশ্যক;—যেখানে ওলন্দাজেরা দেশীয় লোক-দিগের সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়, দেশীয়দিগের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, দেশীয়দিগের মত পরিচ্ছদ পরিধান করে।

অবশেষে বক্তব্য, সমস্ত য়ুরোপীয় জাতি দিগের মধ্যে ইংরাজেরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার পথে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। এবং এই সকল বীজমন্ত্রগুলিই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও বর্ণভেদ প্রথার উচ্ছেদ করিতে সমর্থ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১৭)

বিকাল বেলা। বিপিন মহিলাদের পাঠসভায় মহাভারত পাঠ করিতেছে। এমন সময় রোহিণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—ভটচাযি্য মশায়রা একঘরে হয়েছেন।

এই অবিশ্বাস্য অদ্ভুত সংবাদে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিপিন অবিশ্বাস করিয়া রোহিণীর দিকে রুষ্ট দৃষ্টিতে চাহিল। রোহিণী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, সত্যি দাদাবাবু, মুখুয্যে মশায় কাছারীতে রাজাবাবুর কাছে এসে সব ঠিক করে গেছে।

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—ভট্‌চাযি্য জ্যাঠার কি অপরাধ, কিছু শুনেছিস?

রোহিণী বলিল—দাদাঠাকুর নাকি মোছলমানের ভাত খেয়েছে।

বিপিন বই মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—যাই, দেখে আসি ব্যাপার কি।

বিপিন ঘরের মধ্য দিয়া যাইবার সময় দেখিল দরজার আড়ালে আজ মালতী বসিয়া নাই। চারিদিকে চাহিয়া মালতীকে অনুসন্ধান করিতে করিতে বিপিন বাহির বাড়ীতে যাইতেছিল; হঠাৎ দেখিল মালতী তাহারই পথে যেন তাহারই অপেক্ষায় তাহাকে কিছু বলিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। বিপিন স্পন্দিত হৃদয়ে মালতীর কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। যে মালতীকে দেখিবার জন্য সে ছলের পর ছল সৃষ্টি করিয়া ফিরিতে ফিরিতে কুণ্ঠিত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল সেই দুর্লভদর্শন মালতী আজ একাকিনী নির্জ্জনে একেবারে তাহার সামনে! বিপিন কোমল দৃষ্টিতে মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মালতী চলিয়া না গিয়া মুখ তুলিয়া বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া বেশ সহজ ভাবেই বলিল—ভটচাযি্য মশায়দের খবর জেনে এসে আমায় একটু বলবেন।

মালতীর সহিত বিপিনের এই প্রথম বাক্যালাপ। বিপিনের কানে সৌন্দর্য্যের সুর বাজিতে লাগিল। সে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বলিতে পারিল—আচ্ছা।

মালতী তখন ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিয়া গেল। স্তব্ধ বিপিন একটু সম্বিৎ পাইতেই তাহার মনের মধ্যে ছ্যাঁত করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, নবকিশোরের জন্যই এই ব্যাকুলতা! মালতী তাড়াতাড়ি পাঠসভা হইতে চলিয়া আসিয়া তাহার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এবং নিজে যাচিয়া তাহার সহিত প্রথম কথা বলিল—সেও নবকিশোরেরই সংবাদ পাইবার জন্য! বিপিনের মনের কানে ঈর্ষা গুঞ্জন করিয়া বলিল—ভাগ্যবান নবকিশোর!

বিপিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

বিপিন বিষণ্নমুখে নবকিশোরের বাড়ীতে

গিয়া দেখিল টোলের ঘরে একখানি শতরঞ্চ বিছাইয়া নবকিশোর বসিয়া পড়িতেছে। বিপিন বুঝিল বিক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করিবার এই আয়োজন।

বিপিনকে দেখিয়া বই বন্ধ করিয়া হাসিয়া নবকিশোর বলিল—শুনেছ?

—শুনেছি। কিন্তু ব্যাপার কি?

—বস। বলছি।

বিপিনকে পাশে বসাইয়া নবকিশোর আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিল। শুনিয়া বিপিন হাসিয়া বলিল—এই! আমি মনে করলাম না জানি কি মহামারী ব্যাপার। কিন্তু যাই হোক, আমাদের এই প্রথম মোহড়ায় একটা এরকম বাধা ওঠা সুবিধের হল না। তুমি অতটা না করলেই পারতে; কিন্তু স্থান কাল বিবেচনা করে কাজ করা তোমার কুষ্ঠিতে লেখে না জানি। তবু অল্পে অল্পে রইয়ে সইয়ে আমাদের মত প্রচার করলে ভালো হত।

নবকিশোর জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—কক্‌খনো না। ভগবানের স্বরূপের মধ্যে প্রথমেই ঋষিরা নির্দ্দেশ করেছেন যে তিনি সত্যং। এই সত্যকে জীবনে স্বীকার করতে না পারলে কিছুই হল না। যা সত্য তা চিরকাল খাঁটি, খোলাখুলি সাদা-সিধে; তার সঙ্গে আধাআধি রফা করা চলে না। যে রফা করে' সকল দিক বাঁচিয়ে চলতে চায় সে কখনো সত্যকে ত পায়ই না, অধিকন্তু যে অসত্যের খাতিরে সত্যের সঙ্গে রফা করে সেই অসত্য তাকেই আশ্রয় করে' বেঁচে থাকে কেবল তাকেই লজ্জা আর ধিক্কার দেবার জন্যে।

নবকিশোরের বজ্রনিনাদ শুনিয়া বিপিন ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিল—তা ঠিক। জ্যাঠা মশায়ের মধ্যে যে এতখানি উদারতা প্রচ্ছন্ন ছিল তা আজ তোমার দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হল।

নবকিশোর হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ আমি যে একটুও উদার হতে পেরেছি, তার আদি কারণ আজ আবিষ্কার হল।

বিপিন বলিল—বাবা তোমাদের এক-ঘরে করেছেন; কিন্তু আমি ত তোমাদের ত্যাগ করতে পারব না; আমি ত তোমারই দোসর! আমি তোমার সঙ্গে এসেই একঘরে হয়ে থাকব।

নবকিশোর বিপিনের কাঁধের উপর হাত দিয়া বলিল—দূর পাগল! এত নিষ্ক্রিয় ভাবে একঘরে হবার সাধ কেন? যে ব্রত গ্রহণ করেছ করে যাও। আপনিই একঘরে হবে, কিছু চেষ্টা করতে হবে না।—বলিয়া নবকিশোর উচ্চরবে হাসিতে লাগিল।

বিপিন বলিল—চল একবার জ্যাঠা-মশায় জ্যেঠিমাকে প্রণাম করে যাই।

—যেয়ো, এত তাড়াতাড়ি কেন? একঘরের ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে ভয় হচ্ছে?—বলিয়া নবকিশোর আবার জোরে হাসিয়া উঠিল।

বিপিন লজ্জিত হইয়া বলিল—স্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয় কি! কিন্তু মালতী তোমার খবর পাবার জন্যে বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। সে সত্যি তোমায় খুব ভালোবাসে।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—সে আমায় ভালোবাসে কিনা জানিনা, তবে তুমি যে তাকে এরই মধ্যে ভালোবেসেছ তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বটে।

—কখনো না! এখনো আলাপই হয়নি। সেই আজ আগে কথা কয়েছে শুধু তোমার খবর জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে।

—তা তুমি যেরকম লাজুক, এক বাড়ীতে থেকেও এ জন্মে ত আলাপ করতে পারতে না। ভালোই হয়েছে এই সূত্রে আলাপটা হয়ে যাবে। বরফ একবার ভাঙ্‌লে গলতে আরম্ভ করে। তবে বিনা আলাপেই এই, আলাপ হলে আর বাঁচবে না দেখছি।—নবকিশোর আবার হাসিয়া উঠিল।

বিপিন লজ্জিত হইয়া বলিল—ছিঃ পরনারীর সম্বন্ধে এরকম আলাপ তোমার ভারি অন্যায়।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—হুঁ! এর মধ্যেই এত দরদ হয়েছে! তা নিজনারী করে নেবে বলেই ত এই কথা বলা হচ্ছে।

—না না, কি যে বল তুমি তার ঠিক নেই।

নবকিশোর হাসিয়া বলিল—প্রণয়-রোগের স্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আশীর্ব্বাদ করি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

নবকিশোরের পুনঃ পুনঃ হাসিতে বিপিন লজ্জিত হইয়া বলিল—যাও, কি যে ঠাট্টা কর! চল জ্যাঠামশায়কে প্রণাম করে আসি।

ভট্টাচার্য্য সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য হাত মুখ ধুইতেছিলেন। বিপিন গিয়া প্রণাম করিল। ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন —আমরা একঘরে হয়েছি বাবা, শুনেছ!

—জ্যেঠামশায় আমাকেও শিগগীর আপনাদেরই পরিবারভুক্ত হতে হবে।

—না বাবা, কোনো রকম উদ্ধত ব্যবহার করে বাপ-মার মনে কষ্ট দিয়ো না।

—না, আমি কোনো উদ্ধত ব্যবহার করব না। তাঁরা আপনারাই আমায় ত্যাগ করবেন।

—তা কি হয় বাবা, আত্মজকে ত্যাগ করা কি সহজ!

—দেখবেন তখন।

বিপিনের গলার আওয়াজ শুনিয়া নবকিশোরের মা বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—কে বাবা বিপিন এসেছ?

বিপিন প্রণাম করিয়া বলিল—হ্যাঁ জ্যেঠিমা, দেখতে এলাম কিশোর গুণ্ডাটা কি হাঙ্গামা বাধিয়ে বসেছে।

নবকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাতে সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা জ্যেঠিমা, কিশোর একি কাণ্ডটা করলে বল দেখি? তোমার রাগ হচ্ছে না?

—রাগ হবে কেন বাবা? কিশোর ত কোনো অন্যায় কাজ করেনি। থালায় করে খাবার ত আমিই দিয়েছিলাম।

—তোমার মোছলমানকে ঘেন্না করল না?

—নিজেও ত এমন শুচি নই বাবা যে পরকে ঘেন্না করব। অশুচিতার জন্যে ত্যাগ করতে হলে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ

বাদ পড়েন না; তবে মোছলমানেরই কি যত দোষ হল বাবা?

বিপিন বলিল—জ্যেঠিমা, তোমার মতো আমাদের দেশের সব মেয়েদের জ্ঞান থাকলে আমাদের দেশের অনেক গণ্ডগোল সোজা হয়ে যেত।

নবকিশোরের মা একটু হাসিলেন।

বিপিন বলিল—তবে এখন আসি জ্যেঠিমা।

নবকিশোরের মা বলিলেন—এস বাবা।

(১৮)

বিপিন ফিরিয়া আসিয়াই খুড়িমার ঘরের দ্বারে গিয়া ডাকিল—খুড়িমা।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। ঘরের মধ্যে একটি প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। বিপিনের ডাক শুনিয়া সম্মুখে দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া মালতী অগ্রসর হইয়া বলিল—মাসিমা নেই।

বিপিন থতমত খাইয়া বলিল—কোথায় তিনি?

—ঠাকুরঘরে জপ করছেন।

বিপিন ইতস্তত করিতেছিল, এই শীতের বিজন সন্ধ্যার অন্ধকারে দাঁড়াইয়া মালতার সঙ্গে অধিকক্ষণ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হইবে কিনা। কিন্তু মালতীই তাহার দ্বিধা ঘুচাইয়া প্রশ্ন করিল—ভটচায্যি মশায়দের বাড়ী গিছলেন?

বিপিন লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া বলিল—গিছলাম।

মালতী কৌতূহলী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিল। বিপিন তাহার প্রশ্ন বুঝিয়া বলিতে লাগিল—ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়, কিশোর নিজের ঘরে মুসলমানকে বসিয়ে থালায় করে খেতে দিয়েছিল এই জন্যে তারা একঘরে হয়েছে।

মালতী আশ্বস্ত হইয়া বলিল—আপনিও কি বন্ধুকে ত্যাগ করবেন?

বিপিন জোরের সহিত বলিল—অসম্ভব! আমার শিক্ষা দীক্ষা চরিত্রের মধ্যে যতটুকু ভালো সে কিশোরের কাছেই আমার ধার করা। আমি তাকে ত্যাগ ত করতেই পারি না; অধিকন্তু আমি যে মতলবে এই পাঠসভা দিয়ে সংস্কারের গোড়াপত্তন করতে চেষ্টা করছি, তাইতে আমাকেও শিগগীর কিশোরের দলে ভিড়তে হবে। আর এসব অনুষ্ঠানও কিশোরেরই উদ্ভাবন, আমি শুধু তার হুকুম তামিল করছি মাত্র।

বিপিনের এই অকপট বন্ধুঋণ স্বীকার দেখিয়া মালতী শ্রদ্ধায় প্রীতিতে চোখ দুটিকে ভরিয়া একজোড়া আরতি-প্রদীপের মতো বিপিনের মুখের উপর তুলিয়া ধরিল। মুগ্ধ বিপিন আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

বিপিন পরিপূর্ণ হৃদয়ে প্রস্থানের জন্য যখন ফিরিল তখন একটা ছায়া তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। বিপিন তখন তাহা দেখিয়াও দেখিল না।

বিপিন চলিয়া গেলে মালতী গিয়া বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিল—বেশ এই দুটি লোকের বন্ধুত্ব, কেমন অকপট, কেমন মহৎ! লোক দুটিও বেশ মজার। একজন যেন দেবদারু, সরল উন্নত সুন্দর; আর একজন যেন দ্রাক্ষা-লতা, আপনার ঐশ্বর্য্য আপনি জানে না, পরের উপর নির্ভর করিয়া জগতে সুধা বিতরণ করিতেছে!

এই দ্রাক্ষার উপমার কথাটা মনে হইতেই মালতীর মুখে ক্ষীণ হাসির আভা ফুটিল। দ্রাক্ষারসের মধুরতার অন্তরালে যে মাদকতা আছে তাহাই মালতীর মনে পড়িল। কিন্তু সে ইহা স্পষ্ট করিয়া চিন্তা করিতে চাহিল না, চাপা দিবার জন্য অন্য চিন্তা আনিয়া ফেলিল—আঃ বেঁচেছি, ইনি আসাতে তবু দুপুর বেলাটা একরকম ভালোই কেটে যাচ্ছে; কেউ আর যা-তা বলে' বিরক্ত করবার অবসর পায় না······

হঠাৎ তাহার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাইয়া খুড়িমা হনহন করিয়া ঘরে আসিয়া চাপা গলায় তর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—পোড়ারমুখী, করেছিস কি? দুদিন কি তুই নিজেকে সামলে রাখতে পারিস নে? একটু গণ্ডগোল কমেছিল, আর চুপ করে থাকা সইল না, আবার আগুন উস্কে তোলা হল? শতেকখোয়ারী তোর কি মরণ হয় না। হয় তুই মর, নয় আমি মরি!

মালতী এই আকস্মিক আক্রমণে বিমূঢ় হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে বলিল—কেন, কি, হয়েছে কি?

খুড়িমা তাহার মুখের সামনে দুই হাত নাড়িয়া বলিলেন—হয়েছে আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু! মরতে মাথা খেতে বিপিনের সঙ্গে কথা কইছিলি কেন লা শতেকখোয়ারী। তোর কিছুতে কি হায়া হবে না! তোর জন্যে আমার মাথামুড় খুঁড়ে রক্তগঙ্গায় ডুবে মরতে ইচ্ছে হয়!

খুড়িমা চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে মালতী হাসিবে কি কাঁদিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বিছানার উপর শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

বিপিন যে-ছায়াটি সরিয়া যাইতে দেখিয়াছিল সেটি শ্রীমতী রোহিণীর। রোহিণী অন্ধকারে বিপিন ও মালতীকে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে দেখিয়াই মনে করিল সে একটা খুব বড় রকমের কৌতুক আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। যে ঘরে নবীনা পুরন্ধ্রীগণ জটলা করিয়া কেহ পান সাজিতেছিল, কেহ সুপারী কাটিতেছিল, কেহ জলের ঘটীর মুখে চুল বাঁধিয়া দড়ি বিনাইতেছিল, কেহ পা ছড়াইয়া বসিয়া সলিতা পাকাইতেছিল, কেহ বা নিষ্কর্ম্মা বসিয়া বসিয়া অনর্গল বকিতেছিল, রোহিণী ছুটিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া মেঝের এলায়িত ভাবে বসিয়া পড়িয়া বেদম হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে সে একবার করিয়া পেট চাপিয়া ধরিতে লাগিল, আবার হাসিয়া উলটি পালটি খাইতে লাগিল।

পাঁচুর মা জিজ্ঞাসা করিল—কি রোহিণী, তোর হল কি, পাগল হলি, না ভূতে পেলে, যে, এত হাসছিস?

রোহিণী হাসির ধমকে সর্ব্বশরীর মোচড়াইয়া মোচড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল—বাপরে! আমি আর এ বাড়ীতে চাকরি করবনি···আমি মাইনে বুঝিয়ে নিয়ে চলে যাব। বাপরে! আর হাসতে পারিনি...পেটে খিল ধরে গেল··· সত্যি বলেছ বৌদি, এ বাড়ীতে থাকলে সত্ত পাগল হয়ে যাব···আজ একেবারে আস্ত সদ্যোভূত দেখেছি।

ক্ষমা বলিল—ব্যাপার কি মাগী খুলেই বল না।

—রোসো রোসো, পেটে খিল ধরে গেছে, হাসতে হাসতে চোখের জল বেরিয়ে গেছে।

—আ মর মাগী, এক ঘণ্টা ধরে ন্যাকরামিই করতে লাগল, বল না কি হয়েছে?

রোহিণী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া একটু সম্বৃত হইয়া বসিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল—ওগো তোমাদের মালতী গো মালতী!—বলিয়াই আবার সে হাসিতে লুটিতে লাগিল।

পাঁচুর মা পরম উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—মালতী কি? মালতী কি করেছে রে?

মালতীর নামে সকলের মন ঔৎসুক্যে ছটফট করিয়া উঠিয়াছিল। সকলে হাতের কাজ ফেলিয়া রোহিণীকে আসিয়া ঘিরিয়া বসিল।

রোহিণী বলিল—মালতী ঠাকরুণ ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাদাবাবুর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা কচ্ছিল।......... কাউকে বোলোনি যেন তোমরা, মাথা খাও বোলোনি।

ক্ষমা বলিল—অ্যাঁ! এমন! আমরা মনে করি মালতী বুঝি বিপিনদার সঙ্গে কথা কয় না! ওমা! এ যে ডুবে ডুবে জল খাওয়া!

পাঁচুর মা হাসিয়া চোখ মটকাইয়া বলিল—ওলো লোকের সামনে কয়না; কিন্তু আড়ালে আবডালে কইতে দোষ কি?

ঘরের মধ্যে হাসি বিদ্রূপ ও কুৎসার বান ডাকিয়া উঠিল।

রোহিণী এইরূপে এই কথাটি বাড়ীময় রটাইয়া বেড়াইল এবং যাহার কাছে একথা বলিল তাহাকেই মাথার দিব্য দিয়া বারণ করিয়া দিল, একথা যেন কিছুতেই প্রচার না হয়।

বাড়ীময় যখন ফিসফিস শব্দে আলোচনা হইতেছে তখন খুড়িমা ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন স্থানে স্থানে এক একটি মণ্ডলী একই কথা যেন আলোচনা করিতেছে; এবং তাঁহাকে দেখিয়া টেপাটিপি করিতেছে। খুড়িমাকে উৎসুক দেখিয়া রোহিণী গম্ভীরভাবে খুড়িমাকে অতিক্রম করিয়া কার্য্যান্তরে যেন চলিয়া যাইতেছিল। খুড়িমা বলিলেন—কি রে রোহিণী, কি হয়েছে?

রোহিণী উদাসীন ভাবে মুখ ঘুরাইয়া বলিল—কি জানি বাবু, আমি অতশত কান দিইনি কি সব বলছে...মালতী দিদি নাকি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চুপচুপি দাদাবাবুর সঙ্গে কথা কইছিল,......না কি, ঠিক জানিনে মা আমি।

রোহিণী যেন কিছুই বলিতে পারিল না এবং বলিবার তাহার ইচ্ছা ও অবসর নাই এইভাবে তাড়াতাড়ি খুড়িমার কাছ হইতে চলিয়া গেল।

রোহিণী আগুনটি ধরাইয়া দিয়াই যখন প্রস্থান করিল তখন ফুঁ দিবার লোকের অসদ্ভাব ঘটিল না। খুড়িমা লজ্জায় অপমানে ব্যথিত আহত হইয়া মালতীর উপর মনের ঝাল ঝাড়িতে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে ক্রমে একথা গিন্নি ও বিপিনের কানেও গেল। গিন্নি বলিলেন, বিপিন আমার তেমন ছেলে নয়; ঐ নচ্ছার

ছুঁড়িরই সমস্ত দোষ। ছুঁড়ির চোখ নয় ত যেন চরকিবাজি!

বিপিন অনুসন্ধান করিয়া জানিল এ কাজ রোহিণীর। তাহার একবার ইচ্ছা হইল রোহিণীকে তখনই তাড়াইয়া দিবে; কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল যে সৌধের ভিত্তিই কুসংস্কার ও অজ্ঞানের কত স্তরসম্বন্ধ পাহাড়ের উপরে, সেখানকার এক-টুকরা জমাট খসাইয়া কতটুকু লাভ হইবে।

বিপিন কৃতসঙ্কল্প হইল যেমন করিয়া হোক অজ্ঞানে আবদ্ধ কুসংস্কারের আবর্জ্জনা দূর করিতে হইবে এবং সকল সঙ্কোচ ঠেলিয়া প্রকাশ্যে মালতীর সঙ্গে আলাপ করিতে হইবে।

বিপিন চিন্তা করিয়া দেখিল, এই যে সমস্ত নীচতা তাহার পরিবারে জমাট বাঁধিয়া আছে, তাহা পুরুষানুক্রমের সঞ্চিত আবর্জ্জনা। এই পরিবার যে-সমাজের আদর্শে নিজের মনকে গড়িয়া তুলিয়াছে সে-সমাজে স্ত্রীশিক্ষা মহাপাপ; স্ত্রীস্বাধীনতা সে ত দুঃস্বপ্ন, স্বৈরিতার নামান্তর; পুরুষেরা আপনাদিগকে ও স্ত্রীলোকদের এত দুর্ব্বল ও পাপপ্রবণ মনে করে যে তাহারা নারীদিগকে পুরুষের সংসর্গে আসিতে দেখিলেই চাণক্যনীতি স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠে; নারীগণ যেন কর্পূরের মতো উবিয়া যাইবার জন্যই উন্মুখ হইয়া আছে, অসূর্য্যম্পশ্য অন্তঃপুরের কৌটার মধ্যে কড়া পাহারা দিয়া তাহাদিগকে রক্ষা না করিলেই সর্ব্বনাশ! যুগযুগান্ত ধরিয়া পুরুষের এই কদর্য্য ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নারীদিগেরও মন এমন জড়ীভূত হইয়া গিয়াছে, যে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের আর বিশ্বাস করে না, মানুষ বলিয়া নিজেদের মনে করিতে পারে না, সমাজে তাহাদেরও যে স্থান ও কর্ত্তব্য আছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না এবং বুঝিতে চাহেও না। এজন্য চিরাগত সংস্কার যেখানে বাধা পায়, যেখানে নূতন কিছু দেখে, সেখানেই বিরূপ ও বিদ্রোহী হইয়া কেবলই বিপদের আশঙ্কা করিতে থাকে। অন্ধকারে যে লোক পথ চলে তাহার প্রতিপদেই আশঙ্কা হইতে থাকে গর্ত্তে পড়িবে কি সাপের ঘাড়ে পা দিবে কিংবা কোন্ দিক হইতে অলক্ষ্যে কোন্ হিংস্র পশু তাহাকে আক্রমণ করিবে। এই অকারণ ভয় নিবারণের একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় জ্ঞানের আলোক। সমাজে পরিবারে যে-সকল সংস্কারগত মিথ্যা আশঙ্কার আবর্জ্জনা বদ্ধমূল হইয়া আছে তাহা ধ্বংস করিবারও একমাত্র উপায় তাহাতে জ্ঞানের আগুন জ্বালিয়া দেওয়া। যেমন করিয়া হোক এই-সমস্ত কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতেই হইবে ইহাই এখন বিপিনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

কর্ত্তব্য যখন স্থির হইয়া গেল তখন বিপিন ইহাও স্থির করিল রফা করিয়া কাজ করিলে আর চলিবে না, তাহাতে শুধু সময় নষ্ট; যাহা উচিত বলিয়া মনে হইবে তাহা জোর করিয়াই করিতে হইবে। তাহার আদর্শ ও তাহার বন্ধু নবকিশোর ত এই জন্যই তাহার শ্রদ্ধাভাজন। সেই কি শুধু আদর্শকে শ্রদ্ধামাত্র দিয়া কাজের

বেলা রক্ষা করিয়া করিয়া চলিবে? না। যদি তাহার মতে ও কাজে এক না হয় তবে সে কখনো তাহার মতকে শ্রদ্ধা করে না, সে অমানুষ।

(১৯)

কাল হইতে যে কুৎসার কালি বিপিনের চারিদিকে ছড়াছড়ি হইতেছিল তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই বিপিন নিত্যকার মতো স্বাভাবিক ভাবেই নিজের পাঠসভায় আসিয়া দেখিল আজ কেহ পাঠসভার আয়োজন করিয়া রাখে নাই। তখনো বিছানা পাড়া হয় নাই, তখনো কোনো শ্রোত্রী আসিয়া জুটে নাই। শুধু তরুণীরা পাঠস্থানের আশে পাশে টেপামুখে হাসি চাপিয়া ঘুর-ঘুর করিতেছিল; তাহারা কৌতূহলী হইয়া দেখিতেছিল এত কাণ্ডের পরও বিপিন নিয়মমত পড়িতে আসে কি না, আর সেই বেহায়া মেয়েটা তাহার কালামুখ দেখাইতে বাহির হইবে কিনা। বিপিনকে আসিতে দেখিয়া সকলের ভারি কৌতুক বোধ হইল, একবার সকলের চোখে চোখে হাসি খেলিয়া গেল।

বিপিন বেশ সপ্রতিভ ভাব ধারণ করিয়া ক্ষমাকে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁরে ক্ষমা, তোরা কি করে' বেড়াচ্ছিস? পড়বার জোগাড় করিস নি এখনো? যা বিছানা টিছানা পাড়তে বল। আমি মাকে ডেকে আনি।

বিপিন মায়ের সন্ধানে প্রস্থান করিল। তরুণীরা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া কলহাস্যে ঘরখানিকে ধ্বনিত করিয়া পাঠ-সভার আয়োজন করিতে লাগিল।

বিপিন মায়ের ঘরের কাছে গিয়া ডাকিল—মা!

গিন্নি বলিলেন—কেন রে?

—তুমি আজ আমাদের পাঠসভায় যাওনি যে বড়—বলিয়া বিপিন ঘরে ঢুকিল।

গিন্নি গম্ভীর হইয়া বলিলেন—না, আর রোজ রোজ পড়া শুনতে ভালো লাগে না।

বিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া বিপিনের হাঁটু দুটি দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দাদা, আমি পল্‌ব। আমি ভালো মেয়ে, মা দুষ্টু।

বিপিন নত হইয়া বিনিকে চুমু খাইয়া বলিল—না, মাকেও দুষ্টু হতে দেওয়া হবে না; মাকে ধরে নিয়ে পড়তে চল।

বিনি গিয়া গিন্নির দুই হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিতে লাগিল—দুষ্টু মেয়ে কোথাকার! পল্‌তে যেতে হবে না? পল্‌তে চল!

এই স্নেহের কৌতুকে গিন্নির গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়া গেল। তিনি পুত্রকন্যার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—যা তোরা, আমি পরে যাচ্ছি।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বিনিকে কোলে করিয়াই পাঠসভায় আসিয়া দেখিল, সকলে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু মালতী ও খুড়িমা আসেন নাই। বিপিনের লজ্জায় বাধো বাধো ঠেকিলেও জোর করিয়া বলিল—মালতী আসেনি? চ বিনি তোর মালতী দিদিকে ডেকে আনি।

বিনি বিপিনের গলা জড়াইয়া বলিল—না বলদা! মা বকবে!

বিপিন বিনির নিষেধ সত্ত্বেও তাহাকে কোলে করিয়া যখন মালতীকে ডাকিতে চলিল তখন তাহাতে বিনিরও আনন্দ ছাড়া আপত্তি দেখা গেল না।

বিপিন খুড়িমার ঘরের কাছে গিয়া ডাকিল—খুড়িমা।

খুড়িমা বলিলেন—এস বাবা।

বিপিন ঘরের মধ্যে গেল। খুড়িমা বসিয়া মালাজপ করিতেছেন, মালতী চুপ করিয়া পাশে বসিয়া আছে। মালতী একবার চকিতে বিপিনের দিকে চাহিয়া মাথা নত করিল, তাহার গাল দুটি লাল হইয়া উঠিল।

সেই চকিত দৃষ্টিতেই বিপিনের চোখে মালতীর লজ্জা ধরা পড়িল; বিপিনেরও মুখ লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া গেল। বিপিন ঢোক গিলিয়া বলিল—খুড়িমা, আজ যে বড় আমার পড়া শুনতে যাওনি? ভালো লাগে না বুঝি?

—ভালো খুবই লাগে বাবা। একে মহাভারত, তায় তোমার মুখে শোনা, ভালো লাগবে না? কিন্তু বাবা, আমি আর কিছুর মধ্যে থাকব না; তুমি দয়া করে আশ্রয় দিয়েছ; তোমায় প্রাতঃবাক্যে আশীর্ব্বাদ করে একবেলা দুটি হবিষ্যি করতে পেলেই যথেষ্ট মনে করব।

খুড়িমার চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

বিপিন হাসিয়া বলিল—খুড়িমা, তোমায় আশ্রয় দিয়েছি আমি? আগে তুমি, না, আগে আমি। আগে তুমি এক বাড়ীতে ছিলে, একলাটি; সেখান থেকে এসে তোমার ছেলের কাছে আছ। এই প্রভেদ। এ বাড়ীও ত তোমারই খুড়িমা। এখানেও এসে একলাটি থাকবে? তা হবে না, চল।

খুড়িমা সজল স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আমি যাব না বাবা; আমি এই জপ করতে বসেছি।

—আচ্ছা, তুমি জপ সেরে যেয়ো। কিন্তু মালতীর ত মালাজপে তেমন অনুরাগ দেখছি নে। মালতী তুমি চল।

মালতী নিরুত্তরে নতমুখে বসিয়া রহিল। খুড়িমা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিলেন। বিপিন লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, তথাপি জোর করিয়া সহজ ভাবেই বলিল—সেইজন্যেই ত আরো যাওয়া উচিত খুড়িমা। প্রকাশকে ভয় করে পাপ; নির্দ্দোষ যে সে অপবাদকে গ্রাহ্য করবে কেন।...চল মালতী, তোমায় যেতে হবে।

মালতীর মুখখানি অরুণোদয়ে শতদল পদ্মের মতো সলজ্জস্মিতহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল। সে চোখের উপর দীর্ঘ-পক্ষ্মরাজির অবগুণ্ঠন টানিয়া মৃদুকম্পিত কণ্ঠে বলিল—আপনি চলুন, আমি যাচ্ছি।

বিনি বিপিনের কোল হইতে নামিয়া মালতীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—মাতী দিদি, বল্‌দা দাকে, তল।

মালতী বিনিকে কোলে করিয়া বিপিনের পশ্চাতে ঘর হইতে বাহির হইল। খুড়িমা নিস্পন্দ নির্ব্বাক বসিয়া মালাজপ করিতে লাগিলেন।

বিপিন ফিরিয়া আসিয়া দেখিল সকলেই অপেক্ষা করিতেছে। গিন্নিও আসিয়াছেন। বিপিন নিজের আসনে বসিয়া বলিল—কাল

থেকে আমিই শুধু পড়ব না, তোমাদেরকেও পড়াব। তোমাদের পড়তে হবে।

গিন্নি বলিলেন—ছি, মেয়েমানুষের কি পড়তে আছে? মেয়েমানুষে পড়লে বিধবা হয়, কলঙ্কিনী হয়।

এই বলিয়া তিনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মালতীর দিকে চাহিলেন। এবং গিন্নির দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া সকলেই মালতীর দিকে চাহিল। মালতী চকিতে একবার বিপিনের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মাথা নত করিয়া বিনির হাত দুখানি নিজের মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

বিপিন মায়ের দিকে অনুযোগের দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখলেই বিধবা হয়, খারাপ হয়, এ কথা তোমাদের কে বল্লে? এই যে কলকাতার সব মেয়েরাই প্রায় লেখাপড়া শিখছে, পুরুষেরাই ত শেখাচ্ছে? পুরুষেরা কি তাহলে আত্মহত্যা করবার অস্ত্র তৈরি করচে?

জয়া বলিল—যারা মানে না তাদের হয় না। যারা মানে তাদের হয়।

বিপিন হাসিয়া বলিল—তবে ত সোজা উপায়ই রয়েছে, তোমরাও মেনো না।

গিন্নি বলিলেন—না না, ওসব অনাচার আমাদের হিঁদুদের সয় না।—ঐ ত ছোট ঠাকুরপো কিছু মানতেন না, ছোট বৌকে ত লেখাপড়া শেখাচ্ছিলেন। তাতে ছোট-বৌয়ের ভালোটা কি হল? লেখাপড়া শিখে করবেই বা কি? জমিদারিও দেখতে হবে না, চাকরীও করতে হবে না। আরো লেখাপড়া শিখে অনেক মেয়েই খৃষ্টান বিবি হয়ে যায়, চেয়ারে বসে, বই মুখে দিয়ে কাজ কর্ম্ম ভুলে যায়, রান্নাবান্না ঘরকন্না তখন ভাড়াকরা দাসদাসীর হাতে ওঠে, আর এদিকে ভিটেয় ঘুঘু চরবার জোগাড় হয়। যারা ঘরকন্না করবে, দুবেলা হাঁড়ি ঠেলবে তাদের লেখাপড়ার দরকার কি?

বিপিন বলিল—হাঁ, রান্নাবান্না ঘরকন্না করাই মেয়েদের প্রধান কাজ বটে, কিন্তু লেখাপড়া জেনে ঐসব করলে আরো ভালো করে করতে পারে; ছেলে পুলেদের সুপথে সুভাবে পালন করতে পারে। তুমি বলছ লেখাপড়া শিখলে কেউ ঘরকন্নার কাজ করে না; কিন্তু এটা কি ঠিক কথা হল? যারা করে না তারা না শিখেও করে না। বড়লোকের ঘরের মেয়েরা লেখাপড়াও শেখে না, কাজকর্ম্মও করে না। তোমার বাড়ীতে ত এতগুলি মেয়ে আছে, কে কত কাজ করছে? রাতদিন লোকের কুৎসাই আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু লেখাপড়া শিখলে তবু একটা ভালো অবলম্বন ত পায়। আর শুধু কি তাই, মনটা বড় হয়, কত দিকে চোক খুলে যায়, এখন যেসব ব্যাপারের কোনো মানে বোঝে না, লেখাপড়া শিখলে তার মধ্যে কত আশ্চর্য্য অর্থ দেখতে পায়; লেখাপড়া শিখলে মন চিন্তা করতে শেখে; আসল ধর্ম্ম কি, মঙ্গল কিসে তা চিনে নিতে পারে; মন পবিত্র হয়, উন্নত হয়; আর কত বলব। আর জমিদারী দেখা, চাকরি করা?—দরকার হলে তাও স্বচ্ছন্দে করতে পারে। এই ধর মালতীর মতন যার কেউ নেই তার পরের বাড়ীতে উঠতে বসতে গঞ্জনা সহার চেয়ে স্বাধীন ভাবে নিজের অন্ন নিজে উপার্জ্জন করা

কি ভালো মনে হয় না; আর খুড়িমা যদি লেখাপড়া জানতেন তা হলে তাঁর জমিদারী তিনি নিজেই দেখতেন, অন্য কাউকে কষ্ট করতে হত না।

মালতী ও খুড়িমার প্রতি তাঁহাদের দুর্ব্যবহারের কথা প্রকারান্তরে স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে গিন্নি বিপিনের প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তোর ত রাতদিন শুধু খুড়িমা আর মালতীরই চিন্তা! সকল তাতেই তাদেরই তুলনা! তুই তাদের নিয়েই তবে থাক, তাদেরই লেখাপড়া শেখা, আমাদের নিয়ে টানাটানি করিস কেন?—বলিয়া গিন্নি মুখ ভার করিয়া বসিলেন।

বিপিন হাসিয়া বলিল—ওঁদের ত শেখাবই, কিন্তু তোমাদেরও টানাটানি করতে ছাড়ব নাকি। আমি তোমারই ত ছেলে, জান ত তোমারই মতন একগুঁয়ে!

বিপিনের একটু স্নেহের স্পর্শে গিন্নি আবার প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—তুই কি চিরকাল ছেলেমানুষই থাকবি?

জয়া গিন্নিকে প্রসন্ন দেখিয়া বিপিনের প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য বলিল—আচ্ছা বিপিন, আমি ত বিধবা মানুষ, আমি তোমার কাছে পড়ব, আমার ত কোনো ভয় নেই।

বিপিন ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে শুধু একবার তাহার দিকে তাকাইয়া মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া লইয়া বলিল—ক্ষমা, তোদের পড়তে হবে। বুঝলি? কাল থেকেই। তোরা কে কতদূর পড়েছিলি, একটু আধটু কিছু জানিস, না, একেবারে ক খ থেকে আরম্ভ করতে হবে।

বিপিনের উপেক্ষা গ্রাহ্য না করিয়া জয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলিল—আমি আর দিদি পেরথম ভাগ থেকেই আরম্ভ করব। আর সবাই একটু আধটু তবু জানে।

বিপিন বলিল—কাল থেকে আমাদের পাঠশালা খোলা যাবে। বৌরা যদি আমার কাছে পড়তে লজ্জা করে তবে তাদের মালতী পড়াবে।...মালতী তুমি কি পড়বে? তোমার যে বই দরকার হবে যখন খুসি আমার ঘর থেকে নিয়ে এসে পড়বে।

এমনি জোর করিয়া বিপিন মালতীর সহিত আপনার পরিচয়টা সহজ করিয়া তুলিতে চাহিতেছে বুঝিয়া মালতী ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। বিপিন তখন উৎফুল্ল ভাবে মহাভারত পাঠ আরম্ভ করিল।

এমন সময় রোহিণী আসিয়া বলিল—মা, দুবেজি বল্লে মাইজীকো বল ঘরামি এসেছে।

—হাঁ, ঐ গোয়ালঘরের পাশে একখানা চালা তৈরি করে দিতে বলগে।

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—ওখানে চালা কি হবে মা?

—আঁতুড় হবে। পাঁচুর মার ছেলে হবে কিনা তাই।

পাঁচুর মা আর একটু ঘোমটা টানিয়া মাথা নত করিল।

বিপিন বলিল—কি সর্ব্বনাশ! এই আজ বাদে কাল ছেলে হবে, ঐ স্যাঁতা কুঁড়ে ঘরে, গোয়ালের পাশে, পুকুর পাড়ে, বাড়ীর বড় নর্দ্দমাটার ধারে! এ যে একেবারে মেরে ফেলবার ব্যবস্থা!

গিন্নি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—কেন? মেয়ে ফেলবার ব্যবস্থা কেমন করে হল? তুই কোথায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলি?"—তারপর নিজের মৃত পুত্রটিকে স্মরণ করিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া গিন্নি বলিলেন—সেই হতভাগা পুলিন, আর বিনোদ, বিনি, সবাই ত ঐখানেই হয়েছে।

—হবে না কেন? কিন্তু তার ফল কি হয়েছে দেখ দেখি। আমাকে প্রসব করে আমার মা তিনদিন পরেই মারা গেলেন। ভাগ্যিস তুমি আমায় আঁতুড় থেকে বাড়ীতে এনেছিলে, তাই এখনও তোমার সঙ্গে তর্ক করছি, নইলে আমারই নজিরের নথি বেড়ে যেত—

গিন্নি বলিলেন—ষাট ষাট ও কি কথা বিপিন!

—না, তোমার ভয় নেই, আমার মরবার জন্যে আপাতত তত আগ্রহ নেই। আমি তোমার কোল জোড়া করে অনেক দিন এখনো বাঁচব আর জ্বালাব।...

গিন্নি সস্নেহ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তা জ্বালাস, বেঁচে থেকেই জ্বালাস। যমের জ্বালা ত আমার জনেতে বাকি নেই...তেমন জ্বালা যেন শক্ররও না হয়।

গিন্নি উদাসভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন।

বিপিন হাসিয়া বলিল—যম রাজাকে ত নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আস তোমরা নিজেরা, তার পরে হা হুতাশ করে সারা হও। জগতের নূতন অতিথিদের অভ্যর্থনা করবার ঘর যে পরিপাটি করে তৈরি কর, তা দেখে তাদের আত্মাপুরুষ পালাই পালাই ডাক ছাড়তে থাকে। আমি এ বাড়ীর প্রথম অতিথি, আমার ভাগ্য ভালো যে মা হারিয়েও মা পেলাম, আবার ফাঁকতালে বেঁচেও গেলাম। কিন্তু আমার পরে যারা এসেছে তাদের দেখ দেখি—পুলিনের সেই যে আঁতুড়ঘরে অসুখ হয়ে শরীর খারাপ হয়ে গেল তা আর শোধরাতে পারলে না। বারো বছর কোনো রকম করে টিকে ছিল কিন্তু সেও ত বেঁচে মরে থাকা। তার পর বিনো আর বিনিও ত তালপাতার সেপাই।

বিনি মালতীর কোল হইতে উঠিয়া বিপিনের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—বলদা আমি সেপাই না, আমি বিনি।

বিপিন তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—এই-সব আনন্দের পুতুলের আরো কত স্ফূর্ত্তি হতে পারত, যদি এরা সৌন্দর্য্যের মধ্যে, সুস্থ আব-হাওয়ার মধ্যে বাড়তে পেত।

গিন্নি বলিলেন—আঁতুড়-ঘর ত চিরকাল সকলেরই অমনি জায়গায় হয়।

—যাদের হয় তাদের হয়, আর তার ফলও তেমনি হয়। কিন্তু তোমার কি ঘরের অভাব আছে যে একটা স্যাঁতা জায়গায় চালা তুলে তবে ছেলে হবে? যাদের বুকে করে রাখতে ইচ্ছে করে, তাদের অভ্যর্থনা হবে কিনা নর্দ্দমার পাড়ে সারকুড়ের গন্ধে! ছি!

গিন্নি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তবে তোর কি মত যে ঠাকুরঘরে ছেলে হবে?

বিপিন স্থির শান্তভাবেই উত্তর দিল—হ্যাঁ, ঠাকুরঘরে না হোক ঠাকুরঘরের মতন ভালো ঘরেই ছেলে হওয়া উচিত।

—ওসব ম্লেচ্ছপনা আমরা থাকতে ত হবে না। আমরা মরে গেলে তোর যা খুসি করিস।

—না মা, তা হবে না, তোমরা বেঁচে থাকতেই আমার যা খুসি তাই তোমাদের করতে হবে। ওরকম আঁতুড়ঘরে আমি কিছুতেই কারো ছেলে হতে দেবো না।

—আমার বাড়ীতে ত একপাশে এমন খালি ঘর নেই যেখানে ছেলে হতে পারে। ঠাকুর-দেবতার বাড়ী, ওসব অনাচার আমি দেখতে পারব না। ওসব সইবে না।

—মা, ঠাকুর দেবতাই ত ছেলে দেন, এ আশীর্ব্বাদ ত মা তাঁরই। তুমি ঘর ছেড়ে দিতে না পার আমি ঘর ছেড়ে দেবো। আমার শোবার ঘরে ছেলে হবে।

গিন্নি অতিমাত্র বিরক্ত ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন—বিপিন তোর সব অনাছিষ্টি আবদার! তুই ক্ষ্যাপা না পাগল! শোবার ঘরে ছেলে হবে কি? তুই শুবি কোথায় শুনি?

—আমি আমার পড়বার ঘরে শোব।

—সেখানে তোর বইয়ের জায়গা হয় না, খাট ধরবে?

—খাটের দরকার নেই, আমি কৌচের ওপর শুতে পারব।

গিন্নি পরাস্ত হইয়া বলিলেন—এই ঘরে দাই আসবে, হাড়িবৌ এসে সব একাকার ঘটমঙ্গলা করবে?

—হাড়িবৌ ত রোজ ওপরে আসে তোমার পাইখানা ধুতে, তাতে দোষ হয় না?

—সে ত একবারটি আসে, চলে গেলে গোবরজল ছড়া দিয়ে শুদ্ধ করা হয়।

—এও একবারটি এসে চলে যাবে। তারপর ইচ্ছে হয় গোবরজল ছড়া দিয়ে শুদ্ধ করে নিয়ো।

—একবারটি এলেই হল? আঁতুড় ঘরে থাকবে কে? ঝাল, পাচন, জল খাবার দেবে কে?

—ঐ নোংরা হাড়ি বুঝি আঁতুড়ঘরে থাকবে আর খেতে দেবে? আরে রাম। তার সঙ্গে একঘরে থাকলে জাত যাবে না? ছোঁয়া খেলে জাত যাবে না?

—আঁতুর ঘর শুদ্ধ, তখন জাত যায় না।

—তোমাদের শাস্তরের মহিমা বুঝে ওঠা ভার। লোকের মনগড়া শাস্তর, যখন যেমনটি চাই তখন তেমনি বিধান প্রস্তুত। কিন্তু শাস্তর যাই বলুন, চোখে ত দেখছ যে হাড়ি ডোমেরা কত অপরিষ্কার। আর ওরা অপরিষ্কার বলেই ত ওরা অস্পৃশ্য হয়েছে। তার চেয়ে তোমাদের একজন থেকো না কেন? এই ত মোক্ষদা, ক্ষমা, জয়া ঠাকরুণ কত লোক নিষ্কর্ম্মা রয়েছে—আর দাসীও ত আছে গণ্ডা পাঁচেক। তবু ঐ হাড়িবৌটি না থাকলে চলবে না?

—আঁতুড়ঘরে কেউ ত থাকতে পারবে না; অশুদ্ধ হয়ে যাবে যে; গঙ্গা না নাইলে শুদ্ধ হবে না।

—আমি না হয় গঙ্গা নাইয়ে আনবার ভার নিচ্ছি! কে থাকবে আঁতুড়ে বল। ক্ষমা থাকবি?...মোক্ষদা তুই থাকবি?

সকলে নিরুত্তর।

তখন মালতী তাহার বড় বড় চোখ

তুলিয়া শান্ত স্বরে বলিল—আমায় থাকতে দিলে আমি থাকতে পারি।

বিপিন নিরাশার মধ্যে আশ্বাস পাইয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় মালতীর দিকে একবার চাহিয়া মাকে উৎফুল্ল ভাবে বলিল—এই দেখ মা, আমি লোক পেয়েছি, আর তোমার ওজর খাটবে না।…যা রোহিণী, চুবেজীকে বলগে ঘরামি আর চাইনে।

—তোদের যা খুসি করগে যা—বলিয়া গিন্নি ক্রোধভরে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন; বিপিনকে তিনি হয় ত কাবু করিতে পারিতেন, কিন্তু গায়ে-পড়া মালতী ছুঁড়ির জন্য যে তাঁহার পরাজয় ঘটিল ইহাতে গিন্নির মন মালতীর প্রতি অতিরিক্ত বিরূপ হইয়া উঠিল।

সেদিন আর বিপিনের পাঠসভা জমিল না। বিপিন মালতীকে বলিল—এস মালতী, তোমাকে আমার বইয়ের ঘর দেখাইগে।

মালতীর চারিদিকে সংঘাতের আবর্ত্ত যতই ফেনাইয়া উঠিতেছিল বিপিন সেই ঘূর্ণাবেগে ততই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। আজ মালতীর সহিত মতের একতায় বিপিনের অনুরাগ-পক্ষপাতী চিত্ত মালতীকে পরমাত্মীয় মনে করিতে লাগিল, এবং বিপিনের সৎসাহস ও সদনুষ্ঠান প্রবৃত্তি দেখিয়া মালতীরও অন্তর বিপিনের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে আকৃষ্ট হইতেছিল। মালতী বিপিনের সহিত প্রস্থান করিলে পুরাঙ্গনাদিগের বিদ্রূপহাস্য তাহাদের পশ্চাতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

য়ুরোপে প্রলয়

আজি ঈশানের বেজেছে বিষাণ দিক্ দিগন্ত ব্যাপিয়া,
করিছে নৃত্য বহ্নি-নাগিনী লক্ষ রসনা মেলিয়া।
বুঝি নরকের দক্ষিণদ্বার করিয়াছে কেবা মুক্ত,
দৈত্য-দানব রক্ত ধারায় করেছে ধরণী সিক্ত।
পক্ষ দাপটী উড়িছে গৃধ্র, ফেরুপাল ভ্রমে ঘুরিয়া,
ভীষণ শবদে রুদ্র সেবক নাচিছে তাথিয়া তাথিয়া।
পিতা ভুলিয়াছে পুত্রেরে তার, জননী পাসরে কন্যা।
ভগ্নী-শোণিতে তর্পিছে ভ্রাতা বহিয়া নরক-বন্যা।
অদ্ভুত বজ্র উগারে মৃত্যু চৌদিকে প্রতি পলকে,
নয়ন ধাঁধিয়া মরণ-রশ্মি ঝলসে কৃপাণ-ফলকে।
ধর্ম্ম-মোক্ষ ভুলেছে মানুষে ব্রহ্ম-আত্মা সুপ্ত,
অর্থেরি সাথে মিলিয়াছে কাম, পরম জ্ঞান লুপ্ত।
মাতার স্তন্য-পীযূষ প্রবাহ বহেনা শিশুর বদনে,
বক্ষ-উপরে র'য়েছে শুষ্ক ডাকেনা সাদরে সঘনে।
ইন্দ্র ভুলেছে বর্ষিতে তাঁর অমৃত-শান্তি-ধার,
শস্য-শীর্ষ শুকায় ক্ষেত্রে শুধুই হাহাহা-কার।
নন্দন বনে পশেছে পিশাচ, শিহরে প্রাণ তরাসে,
সন্তাপ হর, হে ত্রাসবারণ, উদ্ধার কৃপাপরশে।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন।

কিশোরীমোহন

কালপূর্ণ না হইতে সর্ব্বনিয়ন্তা করাল কাল কিশোরীমোহনকে করায়ত্ত করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য তাঁহার আর একটি একনিষ্ঠ সেবক হারাইলেন। ভারতমাতাও কিশোরীতে তাঁহার একজন সাধক হারাইলেন।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনা ষ্টেটের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান ৺গোবিন্দমোহন রায়মহাশয়ই কিশোরীমোহনের পিতা। বিদ্যাবিনোদ উপাধিক ৺গোবিন্দমোহন রায় মহাশয় কেবল বৈষয়িক ব্যাপার লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন না। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং প্রাচীন সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া 'মৃণ্ময়ী' নামে একখানি সুলিখিত পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহা আর্য্যজাতির সিদ্ধান্ত বা গণিত শাস্ত্রোক্ত ভূগোল বিদ্যার সার সঙ্কলন গ্রন্থ হইলেও ইহার দুইটি সংস্করণ হইয়াছিল। ১৭৯৯ শকাব্দে মৃণ্ময়ীর প্রথম সংস্করণ এবং ১৫ বৎসর পরে ১৮১৪ শকাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ৺গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পত্নী 'মৃণ্ময়ীর' নামানুসারেই এই জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছিল।

সুপণ্ডিত গোবিন্দমোহনের উপযুক্ত পুত্র কিশোরীমোহনও সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্কুল কলেজে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলেও কিশোরীমোহন গৃহে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং অনেক বিষয়ে তিনি প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।

কিশোরীমোহন প্রকৃত কর্ম্মী ছিলেন। প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়া এবং অর্থধ্বংস সুনিশ্চিত জানিয়াও তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র পাবনা হইতে "সুরাজ" নামক একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদন করিয়া আসিতে ছিলেন। সংবাদপত্রের পাঠকগণ অবগত আছেন যে মফস্বলের কাগজের মধ্যে সুরাজ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। যাঁহারা 'প্রবাসী' বা 'গৃহস্থে'র মফস্বলের প্রতিধ্বনি পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিবেন।

কিশোরীমোহন রায়

তিনি পরলোকগত সম্রাট এডওয়ার্ডের অমরবাণী সংগ্রহ করিয়া 'সুরাজ' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'সুরাজে'র আয় পাবনা এডোয়ার্ড কলেজের হিতার্থে দান করিয়াছিলেন। কয়েকমাস পূর্ব্বে তিনি বৌদ্ধ আধ্যাত্মিকামূলক "কর্ম্মফল" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "কর্ম্মফল" দেশস্থ সকল সুধীবৃন্দের প্রশংসার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিল। কিশোরীমোহন তাঁহার পিতার এক জীবনী প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। সে পুস্তক প্রকাশিত হইলে তদানীন্তন দেশের ও দশের অনেক বৃত্তান্ত যাহা এযাবৎ লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল তাহা সুপ্রকাশ হইত।

৺গোবিন্দমোহন ৺উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেক মনস্বীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

কিশোরীমোহন দেশের সুসন্তান ছিলেন। বহুবার তিনি কংগ্রেসে প্রতিনিধিস্বরূপ যোগদান করিয়াছিলেন। দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রথম ৭ই আগষ্টের সভার পরে তিনি আর বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করেন নাই।

কিশোরীমোহনের কথা ও কার্য্যে প্রভেদ ছিল না। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান বিনয়কুমারের বিবাহে কন্যাপক্ষ হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অনেক আত্মীয় "দেশকাল" বিবেচনা করিয়া "দাঁ'ও" মারিবার জন্য অনুরোধ করিতে বিরত হন নাই। "মুখে যাহা প্রচার করিয়াছি, কার্য্যে অন্যভাব দেখাইতে পারিব না"—পুরুষসিংহ কিশোরী-মোহন এই কথা বলিতেন।

লেখকের সহিত কিশোরীমোহনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। লৌকিকতা হিসাবে ধর্ম্মসম্পর্কে তাঁহার ভাগিনের স্থান অধিকার করিলেও, কিশোরী-মোহন আমাকে আপন সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। আমার সাহিত্যিক জীবনে তিনি আমার প্রথম উৎসাহদাতা। অথচ তিনি এরূপ নিরভিমানী ছিলেন যে, কদাচ আমাকে এ কথা কাহারও নিকটে উল্লেখ করিতে দিতেন না। সকল বিষয়েই, সকলের সহিতই তিনি এইরূপ ব্যবহার করিতেন।

পাবনার সাহিত্যপরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিশোরীমোহনের অকাল মৃত্যু যে পাবনার পক্ষে গভীর পরিতাপের বিষয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জ্যোতিবাবু শির-সামুদ্রিক (Phrenology) বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। এই সময় "সাধনা"য় এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল—যে-কোন ব্যক্তি জোড়া-সাঁকোর বাটীতে আসিয়া জ্যোতিবাবুর নিকট ৭টা হইতে ১১টার মধ্যে মাথা পরীক্ষা করাইতে পারিবে। লোকে হুজুগ্ চায়। দুইটি চারিটি দশটি করিয়া ক্রমশঃ লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শেষে এত লোক আসিতে আরম্ভ করিল যে বেলা দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়াও তিনি শেষ করিতে পারিতেন না।

অনেক দিন হইতে জ্যোতিবাবুর ইচ্ছা ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি আঁকেন ও তাঁহার মস্তক পরীক্ষা করেন, কিন্তু এ সুযোগ তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। "বালকে" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে ছবি ও মস্তক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছিল সেটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচলিত বাজারে বিক্রীত ছবি দেখিয়া। একদিন কোনও একটি বিবাহ-সভায় জ্যোতিবাবুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। জ্যোতি বাবু—তাহার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি একদিন জ্যোতিবাবুকে তাঁহার বাসায় যাইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার কিছু দিন পরেই সমগ্র বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি স্বর্গপ্রয়াণ করেন। জ্যোতি-

বাবুর এ সাধ আর পূর্ণ হইল না, এজন্য তিনি এখনও দুঃখ করেন।

জ্যোতিবাবুর সঙ্গীতপ্রিয়তা, Phrenology ও ছবি আঁকাকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবু একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম (কবিতাটি অপ্রকাশিত):—

"বেয়ালা কি মিঠে অমৃতের ছিঠে
ঐ হাত টিতে শুনায়,
পিয়ানো ঢং ঢং ঢ ঢং ঢং,
সেতার গুন্‌গুনায়।
মাথার তত্ত্ব খুঁজি, পুঁথি করেন পুঁজি,
মাথা পেলে আর কিছু চান না।
ল'ন্ যবে ছবি মনে ভাবে কবি
"হইয়াছে, থামো—আন্না,
চক্ষে আসিয়াছে মোর কান্না!"

জ্যোতিবাবু বলেন, অতিলৌকিক রহস্য-ব্যাপার জানিবার জন্য তাঁহার বড়ই কৌতূহল হইত। কোথাও প্রসিদ্ধ গণৎকার বা ভবিষ্যদ্‌বক্তা আছে শুনিলেই তিনি বন্ধু বান্ধব সহ সেইখানে যাইতেন। কিন্তু প্রায়ই তাহাদের গণনার নিষ্ফলতা দেখিয়া নিরাশ হইতেন। কোষ্ঠীর ফলাফলেও তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, এ সমস্ত ব্যাপার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষিত হওয়া উচিত। তবে "প্লাঞ্চেটের" কাণ্ড দেখিয়া তিনি কখনকখনও খুবই আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছেন। একবার তাঁহার গুণুদাদা এবং তাঁর ভগিনীপতি যদুনাথ কর্ত্তৃক ধৃত প্ল্যানচেট-কাষ্ঠফলকে কৈলাস মুখুয্যের প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইল। কৈলাস মুখুয্যে বাড়ীর একজন পুরাতন কর্ম্মচারী। লোকটি খুব মজলিসী ও সুরসিক ছিল। তাহার প্রেতাত্মাকে পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিল:—"আমি কত কষ্ট করিয়া, মরিয়া যাহা জানিয়াছি, আপনারা না মরিয়াই তা জানিতে চান? আপনারা ত বড় মজার লোক দেখছি।" তার পর অনেক পীড়াপীড়ি করায় সে পরলোক সম্বন্ধে যে দুই চারিটি কথা বলিয়াছিল, তা তোমাকে বলিতেছি:—

"আপনারা যাহাকে "ইস্ফীয়ার" sphere বলেন, মৃতেরা মৃত্যুর পর সেইরূপ এক এক ইস্ফীয়ারে গমন করে।"

"সকলেরই এক যাত্রা-পথ।"

"প্রথমে কিছুকাল নিদ্রাবস্থায় থাকে।"

"এখানে মশায়, আর যাই হোক, পেটের জ্বালা নাই।"

যে ঘরে এই সব কাণ্ড হইতেছিল, সেই ঘরে একটা দরকারী কাগজ খোঁজ করিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। কৈলাস মুখুয্যের প্রেতাত্মার কথা অনুসারে সেই কাগজ একজন জলের pipe-ওয়ালার নিকটে পাওয়া যায়। সে ভুলক্রমে তাহার bill-প্রভৃতির সহিত সেই কাগজ লইয়া গিয়াছিল।

ইহার পর জ্যোতিবাবু পুনরায় সঙ্গীতে মনোনিবেশ করেন। সহজ ও সরল প্রণালীতে কিরূপে গানের স্বরলিপি হইতে পারে এই দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইজন্য প্রথম প্রথম "ভারতী"তে জ্যোতিবাবু সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি

পদ্ধতি প্রকাশ করিতেন! পরে তাহা অপেক্ষা আরও সহজ করিবার নিমিত্ত আকার মাত্রিক স্বরলিপি উদ্ভাবিত করিয়া "সাধনা"য় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্ত পদ্ধতিই এক্ষণে সর্বাধিক প্রচলিত।

এই সময় জ্যোতিবাবু সত্যেন্দ্রনাথের নিকট সেতারায় গমন করেন। সেখানে গিয়া একজন মারাঠী পণ্ডিতের নিকট তিনি মারাঠী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই মারাঠী শিক্ষার ফলে তিনি তৎকালে "সাধনা"য় মারাঠী ও বাঙ্গলা ভাষার তুলনা করিয়া সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দত্তাত্রয় বলবন্ত পারসনীস্ প্রণীত "ঝাঁশি সংস্থান মহারাণী লক্ষ্মীবাই সাহেব হ্যাঁচে চরিত্র" এই গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকারের অনুমতি লইয়া তিনি "ঝাঁশিররাণী" লেখেন। "চল্‌রে চল্ সবে ভারতসন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান" এগানটি এই সময় রচিত হয়।

জ্যোতিবাবু বলিলেন, "একদিন মেজ' বৌ ঠাকুরাণী আমায় বলিলেন—অনেকদিন তুমি নাটক রচনা কর নাই—একখানা নাটক এই খানে লিখে ফেল।" আমি বলিলাম—এখন আমার মাথায় কোন প্লট্ নাই, লেখা হইবে না। তিনি শুনিলেন না; জবরদস্তি আমাকে একটা ঘরে পুরিয়া, তারকদাদার (সার পালিত) কন্যা লীলুকে আমার পাহারায় নিযুক্ত করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। যতক্ষণ নাটক না লেখা হইবে, ততক্ষণ আর আমার মুক্তি নাই। দায়ে পড়িয়া এইরূপে "হিতে বিপরীত" রচিত হইল। এই ক্ষুদ্র নাটিকাখানি পরে আমাদের বাড়ীতে ও সঙ্গীতসমাজে অভিনীত হয়।"

পুনায় সত্যেন্দ্র নাথের নিকট অবস্থান কালে তথাকার "গায়ন সমাজ" দেখিয়া কলিকাতায় তদনুরূপ একটি সভা স্থাপন করিতে জ্যোতিবাবুর ইচ্ছা হয়। কলিকাতা ফিরিয়া তিনি "গায়ন সমাজে"র আদর্শে এক সভা প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইলেন। উদ্দেশ্য—বাঙ্গলা দেশে সঙ্গীতশিক্ষা, সঙ্গীত অধ্যাপনা, তাহার প্রচার এবং বাঙ্গলার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন।

শীঘ্রই এক অনুষ্ঠানপত্র প্রস্তুত হইল। সকল সংবাদপত্রেই এই অনুষ্ঠানপত্র এবং উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত হইল। দেশের অনেক সুধী এবং দেশহিতৈষী মহাত্মা এরূপ একটি সমিতি বা সঙ্ঘের অভাব ও আবশ্যকতা বুঝিলেন। এই সভাস্থাপন কল্পে একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইল। চাঁদার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ধনাদের দ্বারস্থ হইলেন। কেহ সহস্র, কেহ পঞ্চশত, কেহবা দুইশত রজত মুদ্রা দান করিবেন বলিয়া স্বাক্ষর করিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র বাবু নিজ পরিবার হইতে দ্বিসহস্রেরও অধিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সভা-স্থাপিত হইল, নাম হইল—"ভারত সঙ্গীত সমাজ।"

প্রথমে সমাজ স্বর্গীয় কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটিতেই বসিত। সকলশ্রেণীর লোকেই এই সমাজের সভ্য হইতে লাগিলেন। সম্মিলিত উদ্যমে এবং ঐকান্তিক

আগ্রহে বেশ কায চলিতে লাগিল; সমাজও নিজের উদ্দেশ্যপথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। কোনও গুণীব্যক্তি কলিকাতায় আসিলেই এই সমাজে তাঁহার গান বাজনা হইত। কলিকাতার অনেক বড়লোক এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ নিয়মিত ভাবে সভায় যোগদান করিতেন এবং পরস্পর বেশ মেলা মেশাও হইত। কিন্তু বাঙ্গালীর সমবেত কার্য্যে দেবতার যেন-একটা অভিশাপ আছে, সেই অভিশাপের ফলে মতদ্বৈধ ঘটিয়া দুই দল সৃষ্ট হইল।

এবারকার দলাদলিতে বেশ গাঢ় রকমের একটু ঢলাঢলিও হইয়াছিল। একদল অন্য দলকে "সঙ্গীতসমাজ" হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চায়; বিপক্ষও "বিনা যুদ্ধে নাহি দিবে সূচাগ্রপ্রমাণ ভূমি" বলিয়া কৃত সংকল্প। ক্রমে জোর-দখল ও ফৌজদারি মোকদ্দমা!

জ্যোতিবাবু এ সময়ে কলিকাতা পুলিশ কোর্টের একজন অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট্, তিনিও হইলেন সাক্ষী। তুমুল মোকদ্দমা চলিল। যাহা কিছু অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল, এই গৃহবিবাদে সমস্তই প্রায় ব্যয়িত হইয়া গেল। প্রথম দল মোকদ্দামায় হারিয়া গৃহচ্যুত হইলেন।

বিজেতারা সিংহমহাশয়ের বাটিতেই আখ্ড়া চালাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সদ্য সদ্য মোকদ্দমা জিতিয়া যেরূপ উৎসাহ ছিল, পরে কর্পূরের মত সেটা উবিয়া গেল।

এদিকে হারিয়া অবধি প্রথম দলের উৎসাহ দ্বিগুণভাবে উদ্দীপিত হইল, অন্যত্র বাড়ী ভাড়া লইয়া সেইখানে "ভারত সঙ্গীতসমাজ" নামে সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল। এখনও সেই বাড়ীতেই "ভারত সঙ্গীতসমাজ" চলিতেছে। এবার এ দলের পৃষ্ঠপোষক হইলেন কুমার মন্মথনাথ মিত্র। মিত্র মহোদয়ের সাহায্যেই সঙ্গীত সমাজ হারিয়াও জিতিয়াছিল, এবং আজও তাহা সেই পাষাণ ভিত্তির উপরেই দণ্ডায়মান। কুমার প্রথম হইতেই সঙ্গীত সমাজকে নানারূপে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার সহানুভূতি ভিন্ন কখনই আজ পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্ব থাকিত না, তবে সঙ্গীতসমাজ যে কতদূর আপনার উদ্দেশ্য সফল করিয়াছে—তাহা দেশের জনসাধারণ বিচার করিবেন।

সঙ্গীত সমাজে জ্যোতিবাবুর "অশ্রুমতী" "পুনর্বসন্ত" "বসন্তলীলা" "হিতে বিপরীত" "অলীকবাবু" প্রভৃতি নাটকনাটিকাগুলি বহুবার অভিনীত হইয়া গিয়াছে।

এই সঙ্গীত সমাজের সহিত জ্যোতিবাবুর যখন খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল সেই সময়ে দোয়ার্কিনদিগের (Dwarkin and Sons) ব্যয়ে "বীণাবাদিনী" নামে সঙ্গীত বিষয়ক একখানি মাসিকপত্র তিনি সম্পাদন করেন। এখানি বৎসর-দুই চলিয়া শেষে বন্ধ হইয়া যায়।

তাহার পর ত্রিপুরার স্বর্গীয় নৃপতি রাধাকিশোর মাণিক্য-দেববর্ম্মন্ বাহাদুর জ্যোতিবাবুকে সঙ্গীতবিষয়ক একখানি মাসিক পত্র সম্পাদন করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধক্রমেই জ্যোতিবাবু তখন "ভারত সঙ্গীত সমাজ" হইতে "সঙ্গীত প্রকাশিকা" নামে সঙ্গীত বিষয়ক

একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। মহারাজা বাহাদুর ইহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মাসিক ৫০ টাকা করিয়া অর্থসাহায্য করিতেন। কাগজখানি দশ বৎসর চলিয়াছিল তারপর মহারাজা বাহাদুরের আকস্মিক ও শোচনীয় মৃত্যুর পর বর্ত্তমান মহারাজার সাহায্যে কিছুদিন চলিয়াছিল। পরে তিনি এই অর্থসাহায্য রহিত করায় কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়।

জ্যোতিবাবু "সঙ্গীত সমাজের" সংস্রবে থাকিতে থাকিতেই সংস্কৃত নাটকগুলিকে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি বলিলেন, "একদিন মেঝ বৌ-ঠাকুরাণী আমাকে "শকুন্তলা পড়িতে

কুমার মন্মথনাথ মিত্র

বলিলেন। ইহার আগে আমি সংস্কৃত নাটক একখানিও পড়ি নাই। "শকুন্তলা" পড়িয়া আমি বাস্তবিক মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম—এ জিনিস এখনও কেন বাঙ্গালা ভাষায় তর্জ্জমা হয় নাই। দুই এক জনকে অনুবাদ করিতে অনুরোধও করিয়াছিলাম। কিন্তু কেহই তেমন গরজ করিলেন না। তাই আমি নিজেই শেষে আরম্ভ করিয়া দিলাম।"

১৩০৬ হইতে ১৩১১ সালের মধ্যেই যথাক্রমে "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা" (১৩০৬), "উত্তর-চরিত" "মুদ্রারাক্ষস" "রত্নাবলী" "মালতী মাধব" (১৩০৭), "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" "বেণী সংহার" "মহাবীর চরিত" "মালবিকাগ্নিমিত্র" "বিক্রমোর্ব্বশী" "চণ্ড কৌশিক" (১৩০৮) "নাগানন্দ" (১৩০৯) "বিদ্ধশালভঞ্জিকা" "ধনঞ্জয় বিজয়" (১৩১০) "কর্পূর মঞ্জরী" ও "মৃচ্ছকটিক" (১৩১১) অনুবাদিত ও প্রকাশিত হয়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন সভ্যতার উপর কশ্যপ ঋষির প্রভাব

কশ্যপ ঋষি ভারতের একজন প্রসিদ্ধ ঋষি। তিনি যে পৃথিবীর প্রথম যুগের ইতিহাসের একজন প্রধান নায়ক ছিলেন—তিনি যে 'প্রজাপতি' বলিয়া পরিগণিত এবং পৃথিবী যে তাঁহারই নামে 'কাশ্যপী' বলিয়া অভিহিত হয় তাহাতেই তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাণাদিতে কশ্যপঋষিকে দেব-দানব-নাগ প্রভৃতির পিতারূপে বর্ণিত দেখা যায়। ইহাতেই পৃথিবীর উপর তাঁহার প্রভাবের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কশ্যপ ঋষির পূর্ব্বোক্ত দেব-দানব-নাগ প্রভৃতি সন্তান যে একই পত্নীর গর্ভজাত ছিল তাহা নহে। কথিত আছে তিনি দক্ষ প্রজাপতির সপ্তদশ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেব-দানব-নাগ প্রভৃতি উক্ত ভিন্ন ভিন্ন কন্যারই গর্ভজাত। অদিতি হইতে আদিতেয় বা দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন, দিতি হইতে দৈত্য ও দনু হইতে দানবগণের জন্ম হয়—কদ্রু হইতে সর্পগণের ও বিনতা হইতে গরুড় বা পক্ষিরাজের উৎপত্তি হয়।

কশ্যপের ভিন্ন ভিন্ন পত্নীর ভিন্ন ভিন্ন সন্তানের উদ্ভব-আখ্যান হইতে ঐতিহাসিক অতি মূল্যবান সত্য উদ্ধার করা যাইতে পারে। কশ্যপের পত্নী ও পুত্রদিগকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিলে আদিতেয় বা দেবতাদিগকে আর্য্যজাতি এবং দৈত্য-দানব-নাগ পক্ষী প্রভৃতিকে আর্য্যেতর জাতি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহাদিগের মাতাদিগকেও আর্য্যজাতীয়া ও আর্য্যেতর জাতীয়া বলিয়া বুঝিতে হয়। সুতরাং ইহা হইতে কশ্যপ ঋষিই অনার্য্য সম্বন্ধের প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন—তাহাই আমরা অনুমান করিতে পারি। শাস্ত্রে অনুলোম বিবাহের যে বিধান দৃষ্ট হয় তাহাতে এরূপ

অনার্য্য সম্বন্ধ যে সম্ভবপর ছিল তাহাই প্রমাণিত হয়।

পুরাণের বর্ণনা পাঠ করিলে দৈত্য-দানব-নাগ প্রভৃতি জাতিকে যেমনই সমৃদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়—তেমনই সভ্যতালোক প্রাপ্তও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেই ইহারা দেবতাদিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কশ্যপ ঋষি ইহাদিগের পিতা হওয়াতেই আর্য্য-সভ্যতার সংস্রব ইহাদিগকে নূতন উন্নতির পথ প্রদর্শন করিয়া যে ইহাদিগকে আর্য্য-দিগের সমকক্ষ করিয়াছিল তাহাই বুঝিতে পারা যায়। পুরাতত্ত্বের প্রমাণে পশ্চিম আসিয়ায় কেল্ডিয়, বেবিলনীয়, মিডীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতি সকলই দৈত্য-দানবরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। তাঁহাদিগের সভ্যতা এরূপই উচ্চসীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে তাঁহাদের অধিষ্ঠিত আসিয়াভূভাগ আসিয়া মাইনর অর্থাৎ অপ্রধান আসিয়া নামে স্বতন্ত্র আসিয়া নামের গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছে। উল্লিখিত সুসভ্য প্রাচীন আর্য্যেতর জাতির পিতা বলিয়াই যে কেবল তাঁহাদের উপর কশ্যপ ঋষির প্রভাব প্রমাণিত হয় তাহা নহে কিন্তু আসিয়া মাইনরের প্রধান স্থানে যে তদীয় নামের নিদর্শন এখনও বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে তদীয় প্রভাব তদপেক্ষাও অধিক প্রখ্যাপিত হয়।

ককেসাস্ আসিয়া মাইনরের একটী প্রধান পর্ব্বত ও কাস্পিয়ান একটী প্রধান হ্রদ। এই উভয় নামই কশ্যপ ঋষির নামের সহিত সংযুক্ত। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌দিগের অনুসন্ধানের দ্বারাই এই নিদর্শ-নের আবিষ্কার হইয়াছে। 'কাস্পীয়ান' নামটী কাশ্যপ নামেরই যে অপভ্রংশ তাহা সহজেই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। 'কাস্পীয়ান' নামের আদিরূপ "কাশ্যপীয়" ছিল। ইহার 'য' লোপ হইয়াই কাস্পীয় বা কাস্পীয় এইরূপ রূপান্তর হইয়াছে। তৎপর কাস্পীয় হইতেই পাশ্চাত্যদিগের দ্বারা কাস্পীয়ান্ নাম হইয়াছে। পুরাতত্ত্ববিৎ—হিউইট্ (Hewitt) তদীয় "The ruliug Race of Prehistroric Times" প্রাগৈতি-হাসিক সময়ের রাজবংশ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—Kashyapa * * * whose name survives in that of the Caspian sea," Vol I p 507 "কাস্পীয়ান সাগরের নামে কাশ্যপের নাম জীবিত রহিয়াছে।

'ককেসাস্' নামের মধ্যে কেহ কেহ কাশ (Kas) শব্দেরই অন্তর্ভাব দেখিতে পান। কাশ্মীর নামের পুরাতত্ত্ব ব্যাখ্যা স্থলে ভারতকল্পদ্রুম (Cyclopaedia of India) নামক গ্রন্থে এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে—"Kasmir is not the Country of the Kas but the Kasia-montes (mer) of Ptolemy the Kha (mer) Kas or Caucasus. ইহা হইতে ককেসাস্ নামটী যে 'খাকাশ' নামেরই অপভ্রংশ এবং 'খাকাশ যে কাশদিগের পর্ব্বত (খা) অর্থ প্রকাশ করে তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। 'কাশ'শব্দ আবার 'কাশ্যপ' শব্দেরই অপভ্রংশ। 'কাশ্যপ' কশ্যপের বংশধরদিগকেই বুঝায়, 'কাশও'

সুতরাং কশ্যপ বংশীয়দিগকেই বুঝায়। এতৎ সম্বন্ধে টডের রাজস্থানে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"But Kash, Khash, or Kas, a frequently recurring prefix in India, is supposed by Mr. Campbell to have its origin from Rishi Kashyapa who gave his name to Kashmir, Kashgar, and to the people originally called Kashi or Kasia.—Campbell, p 58, Tod's Rajasthan i p 303.

উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে 'কাশ্মীর' ও 'কাশগড়' নামক স্থানদ্বয়ও যে 'কাশ্যপ' নামেরই সহিত সংযোগের প্রমাণ দিতেছে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কাশগড় মধ্য-আসিয়ার অন্তর্গত স্থান—'কাশ্মীর' ভারতের উত্তর সীমান্তবর্ত্তী স্থান। এই প্রকারে আসিয়ার পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ তিন অংশেই কাশ্যপ নামের নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষে কাশ্মীর নামে কাশ্যপ নামের নিদর্শন অপেক্ষা অন্য একটী নামে কাশ্যপ নামের নিদর্শন সম্পূর্ণ রূপে রক্ষিত দেখা যায়। মূলতানের প্রাচীন নামে সেই নিদর্শন পরিষ্কাররূপেই প্রকাশ পায়। "ভারতকল্পদ্রুম" (Cyclopaedia of India) নামক গ্রন্থে মূলতানের প্রাচীন নাম 'কাশ্যপপুর' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা কশ্যপ ঋষির দ্বারা হয় বলিয়াই কিম্বদন্তী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—যথা—

(Kashyapapura—the modern Multan. According to the traditions of the people, Kashyapapura, the Kasherira of Ptolemy, was by founded Kashyapa who was the father of the twelve Adityas or sun-gods by Aditi and of the Daityas or Titans by Diti." 519

এখানে গ্রীক্ ভৌগোলিক টলেমির লেখা হইতেও আমরা কাশ্যপপুরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইতেছি। টলেমির লেখায় কাশ্যপপুর যে রূপান্তরিত হইয়া 'কাস্পিরির হইয়াছে—তাহা হইতেই 'কাশ্যপীয়, যে কি প্রকারে 'কাস্পিয়ান্' রূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহার যথেষ্ট আভাসই আমরা পাইতে পারি।

মূলতান নামটীও 'মূলস্থান' নামেরই অপভ্রংশ। ইহা হইতে এই স্থানই যে ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের প্রথম অধিষ্ঠান তাহাই বুঝিতে পারা যায়। কাশ্যপঋষি প্রথম এই স্থানের প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়াই ইহার আদিনাম 'কাশ্যপপুর' হয় ইহাই কশ্যপপুর নামের প্রকৃত পুরাতত্ত্ব বলিয়া বোধ হয়। এই প্রকারে ভারতবর্ষের কশ্যপপুর (মূলতান) হইতে সুদূর আসিয়া মাইনরের কাস্পিয়ান্ ও ককেসাসে পর্য্যন্ত কশ্যপ নামের নিদর্শন ব্যাপ্ত। এবং ইহা দ্বারা ভারতীয় সভ্যতা, মধ্য-আসিয়ার সভ্যতা ও পশ্চিম-আসিয়ার সভ্যতা যে কশ্যপ ঋষির প্রভাব দ্বারাই অনুপ্রাণিত —তাহাও প্রমাণিত করিয়া কশ্যপ ঋষির নামে পৃথিবী কেন যে 'কশ্যপী' নামে আখ্যাতা হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া দিতেছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কনগ্রেস

জাতীয় মহাসমিতির বাৎসরিক অধিবেশন এবার মান্দ্রাজ সহরে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহাসমিতির সভাপতি ছিলেন কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু; এ পর্য্যন্ত বাঙলা হইতে ৭জন সভাপতি নির্বাচিত হইলেন;—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ ও
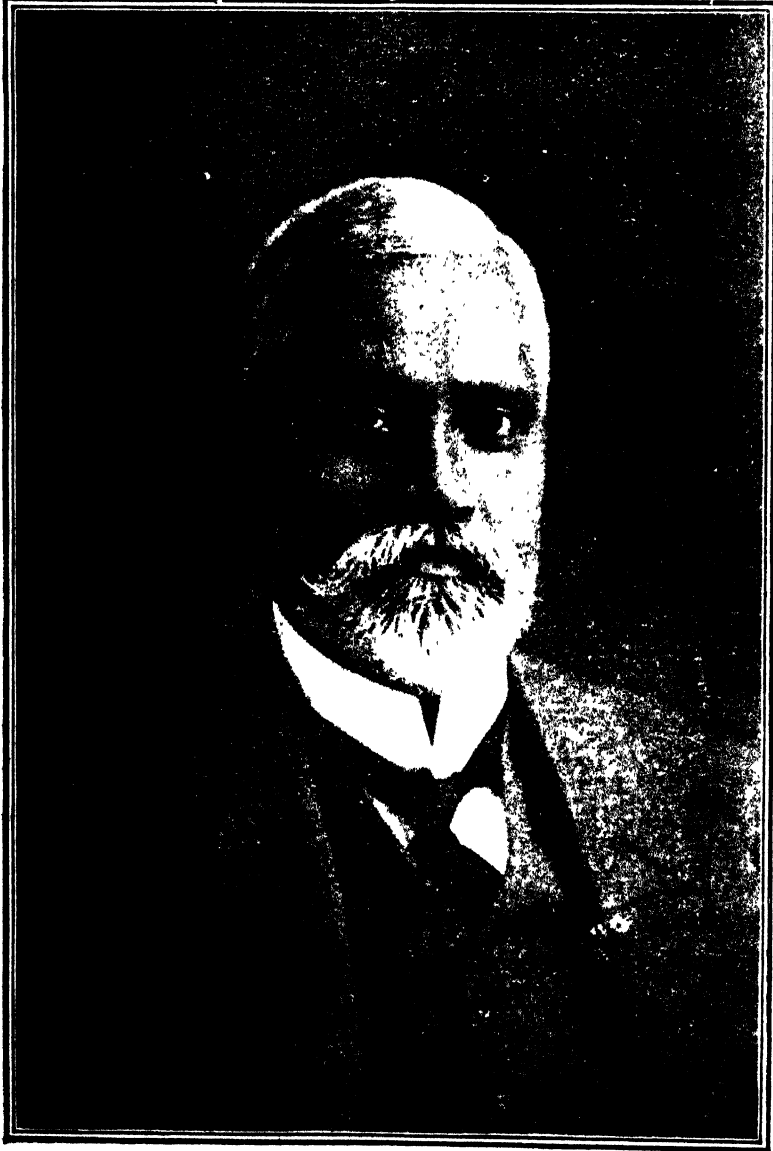
শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু; আমাদের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

এবারকার কনগ্রেসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির গভর্ণর লর্ড পেন্টল্যাণ্ড কনগ্রেসের অধিবেশনকালে সভামণ্ডপে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে—এতদিন পরে কনগ্রেস গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে—কয়েক বৎসরের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের মত একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। কনগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশন সময়ে কনগ্রেসের পরিচালকগণ সেই সময়ের ছোট লাটকে সাত খানা টিকিট পাঠাইয়া দিয়া কনগ্রেসে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তর আসিল যে, রাজনৈতিক সভাসমিতিতে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণের যাওয়া নিষেধ। এই বলিয়া টিকিটগুলি ফেরৎ পাঠান হইল। একজন বড় লাট কনগ্রেসকে "microscopic minority" বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, সে সব দিনের অবসান হইয়াছে। এখন গভর্ণমেণ্ট ও কনগ্রেসের মধ্যে একটা বিশ্বাস স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা অবস্থানকালে লর্ড হার্ডিং কনগ্রেসপ্রতিনিধিগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সেদিন বিলাতে লর্ড ক্রু India council Bill সম্বন্ধে কনগ্রেসের মত জানিবার জন্ত প্রতিনিধিবর্গকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

সুযোগ্য সভাপতি তাঁহার অভিভাষণের প্রধান বক্তব্য সুন্দররূপেই প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন আমরা এখন স্বায়ত্তশাসন লাভের উপযুক্ত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ইতালি ও জাপানের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিলে দেখা যায় যে আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সেই সময়ের ইতালি অথবা জাপান হইতে অনেক ভাল—অথচ সেই সময়েই (১৮৬০) এই দুই জাতি উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে থাকে। ধর্ম্মবিচ্ছেদ, রাজাপ্রজার মনোমালিন্স,—নগরে নগরে ও প্রদেশে প্রদেশে বিবাদ সেই সময়কার ইতালির প্রধান ব্যাপার ছিল; অথচ তাহার মধ্যেই অত বড় জাতির সৃষ্টি হইল। বসু মহাশয় বলেন আমরা যদি কানাডা কিম্বা দক্ষিণ-আফ্রিকার মত শাসনপ্রণালী প্রাপ্ত হই তাহা হইলে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের বন্ধনটী আরও সুদৃঢ় হইবে।

অস্ত্র-আইন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্তও সভাপতি মহাশয় প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—লর্ড হার্ডিং ইচ্ছা করিলেই এ আইন উঠিয়া যাইতে পারে। এবং তাহা হইলে তাঁহার একটি অমরকীর্ত্তি থাকিয়া যাইবে।

কনগ্রেসের আনুষঙ্গিক সামাজিক সমিতি, একেশ্বরবাদীর সভা, প্রভৃতির অধিবেশনও সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীসু

শিল্প সমিতি

২৬শে ডিসেম্বর শিল্প সমিতির দশম অধিবেশন হইয়াছিল। এই শিল্প সমিতির প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন রাজবাহাদুর মধোলকার। এবারকার বৈঠকে মাননীয় মনোমোহন দাস রামজী মহাশয় সভাপতি ছিলেন। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতায় ভারতের শিল্পযুগের বর্ত্তমান অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান শিল্পাবলী রামজী মহাশয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—প্রথম স্বদেশীয় উত্থান এবং বিকাশ; দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্য এবং শিল্পের উপরে যুদ্ধের প্রভাব; তৃতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা। এক সময়ে ভারতবর্ষ কৃষি ও শিল্প এই উভয়প্রধান দেশ ছিল এবং ভারতের সকল প্রকার অভাব ভারতবর্ষ হইতেই পূর্ণ হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে রপ্তানীর প্রভাবে দেশজাত দ্রব্য হইতে আর আমাদের অভাব পূরণ হয় না। অধিকন্তু আমাদের দেশ হইতে মূল উপাদান রপ্তানী হইয়া অন্তভাবে উহা পুনর্ব্বার আমদানী হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন যে গতবৎসর আমাদের দেশ হইতে ৩২ লক্ষ টাকার তামাক রপ্তানী হয় এবং ঐ তামাকই চুরুট রূপে যখন আমাদের দেশে আমদানী হয় তখন উহার মূল্য দাঁড়ায় ৭৫½ লক্ষ টাকা। ১৩ লক্ষ টাকার চামড়া রপ্তানী হয় এবং সেই চামড়াই চর্ম্ম-নির্ম্মিত দ্রব্যরূপে যখন আমাদের দেশে আইসে তখন

উহার মূল্য হয় ৫৫ লক্ষ টাকা। সভাপতি মহাশয় বলেন যে স্বদেশী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল যাহাতে উপরোক্ত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। এতদুদ্দেশ্যেই কতকগুলি কলকারখানা ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু সেগুলি তেমন কার্য্যকারী হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে এ বিষয়ে আমাদের দেশবাসী এখনও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় নাই। মিঃ রামজীর বক্তৃতাটী সাতিশয় জ্ঞানগর্ভ হইয়াছিল।

শ্রী যো

বর্ত্তমান অর্থসমস্যা

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে আমাদের দেশে ভীষণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কারণ কি? বিদেশে স্বদেশী জিনিষের রপ্তানী বন্ধই ইহার প্রধান কারণ। আমাদের দেশ হইতে ইউরোপের সকল দেশে এবং আমেরিকায় নানারূপ জিনিস যায়। সেই সমস্ত মূল দ্রব্য (Raw Material) লইয়া নানা প্রকার জিনিস প্রস্তুত হইয়া আবার আমাদের দেশে আসে, আমরা তখন টাকা দিয়া সেগুলি কিনিয়া রাখি।

বাংলা দেশের প্রধান রপ্তানীর জিনিস হইল পাট; এবার পাটের বাজার বন্ধ সুতরাং টাকার বাজারও মন্দ। অনেক চাষা পাট বিক্রি করিয়া ধান, কাপড়-চোপড়, তেলনুন প্রভৃতি আবশ্যকীয় জিনিস এবং অনেক প্রকার অনাবশ্যকীয় বিলাতী বিলাসদ্রব্যও কেনে এবং জমির খাজনা দেয়। কৃষকের অর্থে যাহারা ধনী তাহাদেরও বিলাসবাসনার চরিতার্থতা হয় ঐ উপায়ে—অর্থাৎ পাটের টাকায়।

এবার পাট ভালরূপ বিক্রি হয় নাই সেইজন্য সকল অবস্থার লোকের বিলাস ব্যয় কমিয়া আসিয়াছে। অন্নবস্ত্রের খরচকে মানুষ সংক্ষেপ করিতে পারে না; টাকায় যখন টান পড়ে তখন সৌখিনতাকেই খর্ব্ব করিতে হয়। ইহা অর্থশাস্ত্রের নিয়ম। এবার ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। অর্থাভাবে এবার চাষা জার্ম্মেনীর প্রস্তুত সস্তা জিনিসে বাবুগিরি করিতে পারে নাই;—প্রজা খাজনা দেয় নাই বলিয়া এবার মধ্যবিত্ত অবস্থার ভূস্বামীগণ যথাসম্ভব ব্যয়সংক্ষেপ করিয়াছেন; জমিদারদিগেরও এবার বিশেষ আড়ম্বর করা সম্ভবপর হয় নাই। এক পাট এত মুখ বন্ধ করিয়াছে।

ইহাতে বুঝা যায় কি? বুঝা যায় এই যে আমরা যে টাকার উপরে ভর করিয়া বাবুগিরি করিয়া বেড়াইতেছি তাহা আসে বিলাত হইতে। বিলাতী বণিক টাকা দিয়া আমাদের জিনিস কিনিয়া নেয়, সেই টাকা দিয়া আমরা বিলাসিতা করি। গভর্ণমেন্ট আমাদিগকে কোনও টাকা দেন না; যাহা কিছু দেন তাহার অধিকাংশ রাজকর্ম্মচারীগণের বেতনরূপে দেন; আরও কিছু টাকা পাওয়া যায় তাহা সৈনিকবিভাগের জন্য। সৈন্যদের জন্য যে সমস্ত জিনিস ক্রয় করা হয় সেজন্য দেশের লোক গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে কিছু টাকা পায়।

এই টাকা যে দেশের পক্ষে যথেষ্ট নয় তাহা আমরা আজ বেশ বুঝিতে পারিতেছি। বর্ত্তমানের এই অর্থসমস্যার মীমাংসা কি? যুদ্ধ থামিয়া গেলেই অর্থ কষ্ট ঘুচিবে, আপাতত ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে বটে কিন্তু আসল সমস্যার মীমাংসা হইল কই?

সমস্যার মীমাংসা ওখানে নয়। যুদ্ধ না থামিলেও দেশের অর্থকষ্ট ঘুচিতে পারে। আর যুদ্ধ থামিলেই অর্থকষ্ট দূর হইবে এমন কথা কে বলিল? যুদ্ধের পূর্ব্বে কি আমাদের দেশে অর্থাভাব ছিল না? যুদ্ধের পূর্ব্বে কি আমাদের অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল? তাহা ত নয়। যুদ্ধের পূর্ব্বেওত আমরা গরীব ছিলাম; এ দারিদ্র্যের কারণ কি? দারিদ্র্যের কারণ বুঝিতে হইলে বিদেশের সহিত আমাদের সম্পর্কটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

বিদেশ হইতে কি সত্য সত্যই আমরা টাকা পাই? আর সেই টাকাতে কি বাস্তবিকই আমাদের লাভ হয়? বিদেশী বণিক আমাদের নিকট হইতে অল্প মূল্যে Raw material কিনিয়া তাহাদ্বারা নানাপ্রকার জিনিস প্রস্তুত করে, সেই জিনিস জাহাজ বোঝাই করিয়া আবার আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেয়, আমরা তাহা বেশি মূল্যে কিনিয়া রাখি। সুতরাং বিষয়টি দাঁড়াইতেছে এই যে আমরা ত বিদেশীকে

জিনিস দিই; সেই সঙ্গে তাহাদিগকে টাকাও দিই;—আমাদের দেশের সকল প্রকার মূলদ্রব্য পাঠাইয়া দিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতগুলি টাকাও পাঠাইয়া দেই। এই ভাবে আমাদের দেশ হইতে কেবলই অর্থ চলিয়া যাইতেছে। ইহা ছাড়া অনেক জিনিস আছে যাহা বিলাতী মালমশলায় বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া আমাদের দেশে আসে—সেই সমস্ত জিনিসে আমাদের দেশের মালমসলা কিছুই নাই, তাহার জন্য আমরা কিছুই পাই না বরঞ্চ সেই সব জিনিস খরিদ করিয়া আমরা বিদেশীকে অর্থ দিয়া থাকি।

বিদেশীর সহিত অর্থের আদানপ্রদানেও আমাদের ক্ষতি আছে। বিদেশী আমাদের ঋণ শোধ করে রূপার টাকা দিয়া, আমরা বিদেশীর প্রাপ্য দেই সোণার মোহরে। আমাদের দেশে যে টাকা প্রচলিত তাহার যথার্থ মূল্য ৷৶৹ দশ আনা মাত্র সুতরাং প্রতি টাকার আমাদের ।৶৹ আনা করিয়া ক্ষতি। যে ব্যক্তি আমার নিকট ৩০৲ টাকা পাইবে তাহাকে এদেশে আমি আমাদের টাকার ত্রিশটি টাকা দিয়া ঋণ শোধ করিতে পারি। ত্রিশ টাকার যথার্থ মূল্য ১৮৸৹ আনা। কিন্তু এই লোক যদি বিলাতে থাকে তবে তাহাকে আমার গিনি দিয়া ঋণ শোধ করিতে হইবে, সেখানে ত্রিশ টাকার স্থলে তাহাকে পুরোপুরি ত্রিশ টাকার আসল মূল্য দিতে হয়।

এই ভাবে বিদেশীকে কত রকমে যে আমরা কত টাকা দিতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। যে-দেশ এত রকমে শোষিত হইতেছে সে-দেশ দরিদ্র হইবে না ত কি? দেশের দারিদ্র্যের আর এক কারণ বিদেশে খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি। আমাদের দেশের খাদ্য দ্রব্য অন্য দেশে চলিয়া যায়, তাহার ফলে আমাদের দেশে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যায়, অনেক সময় খাদ্য দ্রব্যের অভাব ঘটে ও দুর্ভিক্ষ হয়।

পাট বিক্রি বন্ধ হওয়ায় আজ যে আমাদের অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নাই। কারণ এখনকার এ ভাবের অর্থাভাব চিরদিন থাকিবে না, বরঞ্চ যুদ্ধ যত দিন স্থায়ী হইবে ততদিন বিদেশের সহিত আমাদের সকল আদান প্রদান বন্ধ থাকিবে বলিয়া বাধ্য হইয়া নিজের অভাব দূর করিবার জন্য আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে; যদি তাহা সত্যই ঘটিয়া উঠে তাহা হইলে এই যুদ্ধের ফলে আমাদের পরম লাভ।

আগামী বৎসর চাষাগণ আর পাট বুনিবে না সুতরাং ধানের চাষ বেশি হইবে। ফলে দেশে খাদ্যদ্রব্য খুব সস্তা হইবে। টাকার যেমন অভাব হইবে খাদ্যদ্রব্যও তেমনি সস্তা হইবে। সুতরাং আমাদিগের কষ্টের মাত্রা আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না। এইভাবে দেশের প্রধান অভাব যাহা তাহা অনেক পরিমাণে দূর হইয়া আসিবে।

সহসা অর্থাভাবজনিত আমাদের যে কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে তাহা যখন থাকিবে না,—যখন আমরা মোটা ভাত মোটা কাপড় পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিব তখন অন্যান্য দিকেও আমাদের দৃষ্টি পড়িবে; বিদেশ হইতে আমাদের জন্য যে-সমস্ত জিনিস আসে তাহা যখন আসিবে না তখন আমরা সে-সমস্ত জিনিসের দরুণ দারুণ অভাব বোধ করিব। এবং সেই অভাব জাগিলে তাহা দূর করিবার চেষ্টাও যদি জাগাইয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে দেশে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ঘটিবে এবং তাহারই ফলে আমাদের অর্থ কষ্ট দূর হইবার পথ পরিষ্কার হইবে।

আমাদের দেশীয় শিল্পগুলি যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না তাহার প্রধান কারণ বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা। সকল দেশেই অপরিণত শিশু-শিল্প বিদেশের বর্দ্ধিষ্ণু শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। এজন্য সংরক্ষণ নীতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। জার্ম্মাণি এই নীতি অবলম্বন করিয়া এত বড় হইয়াছে; জাপান এই নীতি অবলম্বন করিয়া এত বড় হইয়াছে; ইংলণ্ড এই নীতিকে আশ্রয় করিয়া এত বড় হইয়াছে।

ইংলণ্ডের আর একটা সুবিধা ছিল। সমগ্র ইউরোপ যখন নেপোলিয়ানিক সমরে ব্যাপৃত ছিল তখন তাহাদের শিল্প বাণিজ্য সবই বন্ধ ছিল। বন্ধ ছিল না কেবল ইংলণ্ডের; ইংলণ্ড তখন আপন মনে

শিল্পের উন্নতি বিধান করিতেছিল। ইউরোপের সকল অভাবের জিনিস ইংলণ্ড একা জোগাইত।

আজ আমাদের সেইরূপ সুযোগ উপস্থিত। আমাদের দেশে সংরক্ষণ নীতি নাই, সেজন্য বিদেশী শিল্পের সহিত দেশীয় শিল্প প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধ কার্য্যতঃ সংরক্ষণ-নীতির সকল সুবিধা আমাদের দেশে আনিয়া দিয়াছে। ইহার আড়ালে থাকিয়া আমরা যদি এখন কিছু করিতে না পারি তবে আর কখন পারিব?—সমগ্র পৃথিবী এখন যুদ্ধে ব্যাপৃত, আমরাও যুদ্ধের খবরের জন্য ব্যস্ত। আমাদের এই ব্যস্ততার কোনো সার্থকতা নাই; যুদ্ধের ফলাফল আমাদিগকে মুখ্য ভাবে স্পর্শ করিবে না।—যাহা আমাদিগকে মুখ্য ভাবে স্পর্শ করে বর্ত্তমানে সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টিপাত করা উচিত।—শিল্প বাণিজ্যের দিকে মনোযোগ দিবার সুযোগ এবং অবসর আসিয়াছে; বাণিজ্যই ধনাগমের প্রধান পন্থা। আমাদের আপাতপ্রতীয়মান অর্থকষ্ট দূর করিতে চেষ্টা না করিয়া আমাদের চিরকালের অর্থ কষ্ট যাহাতে সমূলে তিরোহিত হয় সেই চেষ্টা করা দরকার; দারিদ্র্যনাশের অন্য কোনো উপায় নাই।

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ।

সমালোচনা।

অরণ্যবাস। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস, এম-এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্রহ্ম মিশন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র। এই গ্রন্থখানি 'উপন্যাস' নামে গত বৎসরের 'প্রবাসী' পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন "জীবন-সংগ্রামে জয়লাভের একটি ধারাবাহিক বৃত্তান্তকে যদি উপন্যাস বলা যায়, তাহা হইলে "অরণ্যবাস উপন্যাসের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।" উপন্যাস হিসাবে দেখিতে গেলে "অরণ্যবাসে" অনেক ত্রুটি পাওয়া যাইবে। উপন্যাসের আর্ট ইহাতে নাই বলিলেও চলে। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে কোন চরিত্র ইহাতে তেমন ফুটিয়া উঠে নাই—রসেরও একান্ত অভাব। তবে কাহিনী হিসাবে "অরণ্যবাসকে" সুখপাঠ্য বলিতে পারি। জীবনসংগ্রামে বিধ্বস্ত বাঙ্গালীকে সুপথ দেখাইতে, তাহার ক্লান্ত বিপর্য্যস্ত মনকে সান্ত্বনায় পুনর্জীবিত করিয়া কর্ত্তব্যে সচেষ্ট করাইবার পক্ষে 'অরণ্যবাস' বাঙ্গলা সাহিত্যে এক অভিনব সামগ্রী হইয়াছে। ইহাতে রোমান্সের ঘটা নাই, প্রেমের উদ্ভট উদ্‌গার নাই—শান্ত সরল বাঙ্গালী জীবনের একটি অনাড়ম্বর কাহিনী লেখক বেশ গুছাইয়া বলিয়া গিয়াছেন। তবে স্থানে স্থানে বর্ণনা আতিশয্যের ভারে মনকে পীড়িত করিয়া তুলে; সে সময় উপন্যাস হিসাবে ধরিতে গেলে, বহি ফেলিয়া দিবার ইচ্ছা হইবে, কিন্তু লেখকের প্রকৃত উদ্দেশ্যটি ধরিয়া লইলে তাহাতে অনেক কাজেরও কথার সন্ধান, অনেক প্রয়োজনীয় ব্যাপারের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। গ্রন্থখানি ভাগ্যান্বেষী বাঙ্গালী মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য—পাঠে উপকার হইবে। তবে এইটুকু আমরা সতর্ক করিয়া দিই, উপন্যাসের রস-আস্বাদের যিনি প্রয়াসী হইবেন, তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইবে। লেখক 'ভূমিকায়' সে বিষয়ে ইঙ্গিতও করিয়াছেন। এ ধরণের কাহিনীর বঙ্গদেশে যথেষ্টই প্রয়োজন আছে; সুতরাং লেখকের এ উদ্যমের আমরা বিশেষ প্রশংসা করি। বহিখানির ছাপা কাগজ ভালই হইয়াছে।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

৩৮শ বর্ষ]   ফাল্গুন, ১৩২১   [১১শ সংখ্যা

আধুনিক ভারত

ইংরাজের ভারত-বিজয়ে ভারতের রূপান্তরসাধন

ইংরাজের ভারত-বিজয়ে ভারতের যে রূপান্তর সাধিত হইয়াছে তাহার ইতিহাস তিন যুগে বিভক্ত:—য়ুরোপীয় সভ্যতার ক্রমবিস্তার, য়ুরোপীয় সভ্যতা; হিন্দুসভ্যতার সংঘর্ষ, হিন্দুসভ্যতার পরাজয়; এবং ঐ দুই সভ্যতার সবিলম্ব অথচ অবিরাম সংমিশ্রণ।

প্রথম যুগ

ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী

এই ইতিহাসের প্রথম যুগ আবার তিনটি কাল-বিভাগে বিভক্ত।

১

প্রথম কালবিভাগ:—ভারতে ইংরাজের কুঠী স্থাপন। প্রথম কাল-বিভাগের এই ইতিহাস:—

স্বদেশকে কি করিয়া বড় করা যায় তাহার আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মূলসূত্র সম্বন্ধে ইংরাজেরা তখনও অনভিজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা কোন সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই ভারতে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেখানে আসিয়া তাঁহারা ভারত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিলেন, এবং সেখানে কি করা কর্ত্তব্য তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতবাসীগণ, অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকদিগের সহিত এই ইংরাজ বণিকদিগের কোন পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারিল না। এবং মোগলসম্রাটের প্রবল কেন্দ্রীভূত শাসন বিদ্যমানে, এই বৈদেশিকদিগকে উহারা বিনীত রাজসেবক বলিয়াই মনে করিল, শত্রু বলিয়া মনে করিল না।

*
* *

দুই Roseর যুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় সংস্কারের সংগ্রামে ইংলণ্ড লোক-বিরল, দুর্ব্বল, ও নিধন হইয়া পড়িয়া, বিলম্বে উপনিবেশ-বিস্তারের কার্য্যে অগ্রসর হইল। পোর্টুগাল উত্তমাশা অন্তরীপের পথটা আপনার জন্য রাখিয়াছিল; সুতরাং এসিয়ায় প্রবেশ করিবার জন্য ইংরাজনাবিকদিগকে মাগেলান খাড়ী পার

হইতে হইত। মহাসমুদ্র অথবা বেরিং খাড়ী দিয়া রাস্তা খুঁজিতে গিয়া তাহাদের মধ্যে অনেকে প্রাণ হারাইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা পোর্টুগী-উপনিবেশগুলি দখল করিয়া বসিল; তাহাদের খুব কড়া ও সতর্ক পাহারা ছিল। যাহারা প্রথমে ধনশালী হইয়াছিল, সহরের সেই বণিকেরা হলণ্ড দেশে প্রাচ্যখণ্ডের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য—বিশেষত সর্ব্বজনবাঞ্ছিত গরমমশলাদি ক্রয় করিত। একচেটিয়া বাণিজ্যের বলে, ওলন্দাজেরা ইংরাজদিগের প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্রায়ই মূল্যের হার বৃদ্ধি করিত। যখন ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা তিন শিলিংএর স্থলে গোলমরিচের মূল্য ১০ শিলিং চাহিল, নগরের ইংরাজ বণিকেরা তাহাতে সম্মত হইল না। কতকটা বিপদের সম্ভাবনা থাকিলেও, সমস্ত ঝুঁকি স্বীকার করিয়া লইয়াও তাহারা ভারত ও সৌণ্ড-দ্বীপপুঞ্জে কতকগুলি জাহাজ পাঠাইল। ইহাই ভারতে ইংরাজ-সাম্রাজ্য স্থাপনের মূল।

স্বকীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে অপসারিত করিবার জন্য ওলন্দাজেরা কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পরাঙ্মুখ হইল না। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে উহারা মলক্কা দ্বীপে, আম্বয়নার দুর্গরক্ষী ইংরাজ সৈন্যদিগকে হত্যা করিল। দ্বীপপুঞ্জ হইতে বিদূরিত ইংরাজেরা ভারতে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, তাহাদের কুঠী সকল তিন স্থানে সংস্থাপিত হইল। মালাবার উপকূলের কুঠীগুলি পরিপুষ্ট হইয়া বোম্বাই বিভাগ (Presidency) গড়িয়া তুলিল। করমণ্ডল-উপকূলের কুঠীগুলি মাদ্রাজ-বিভাগ গড়িয়া তুলিল। হুগলী প্রতিষ্ঠিত কুঠীগুলি, বঙ্গ-বিভাগ গড়িয়া তুলিল। ঐ সকল ইংরাজ-বণিক রাষ্ট্রবিপ্লব-কালের অন্তঃসার বিশিষ্ট মহৎবংশের লোক;—যাহারা আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে সেই সর্ব ধর্ম্মপরায়ণ, সচ্চরিত্র বিদেশ-যাত্রীর দল। মোগল সম্রাট তাহাদের গুণমর্য্যাদা বুঝিলেন, কিন্তু ঔরংজেবের রাজত্বকালে, তাহাদের দ্বারা কোন প্রদেশ জয় কিংবা কোন নৈতিক প্রভাব বিস্তার করা—এ দুয়ের কোনটারই সম্ভাবনা ছিল না।

১৬৬০ ইংলণ্ডে রাজ্যচ্যুত রাজবংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে, পিউরিটান-সম্প্রদায়ের তাপসিক কঠোরতার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল;—সর্ব্বত্রই লাম্পট্য, চরিত্রকলুষতা, এমন কি "খুন-খারাপি"র আবির্ভাব হইল।

ইংলণ্ডে ইংরাজদিগের এইরূপ দুষ্ট রীতি নীতি,—ভারতেও ইংরাজদিগের এইরূপ দুষ্ট রীতিনীতি দৃষ্ট হইত। কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও গর্ব্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের (mysticisme) গুহ্যধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ছিল; এবং ইহা হইতেই তাহাদের তথ্যদর্শী কাজের ভাব উৎপন্ন হয়। সেই সময়েই এই সব আধুনিক বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিল; পরীক্ষা-পদ্ধতি পরিস্ফুট হইল। ইংরাজ তাহার নিজের প্রকৃত কাজটি বুঝিল; সে কাজ বাণিজ্যঅনুসরণ করা, উপনিবেশ স্থাপন করা।

কিন্তু সেই পুরাতন ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী ইংলণ্ডের এই শিথিল রীতিনীতি ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইল না। উন্নতির প্রতি অনুরাগ তাহাদের খুবই

কম ছিল। তাহারা একচেটিয়া ব্যবসায়টি খুব সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতে লাগিল এবং তাহার অন্তরঙ্গ সভ্যসংখ্যার বৃদ্ধি করিতে অস্বীকৃত হইল। কোম্পানির এই প্রতিরোধিতা ভাঙ্গিবার জন্য, ইংলণ্ডের মন্ত্রিবর্গ স্থির করিলেন যে, এই কোম্পানীর চার্টার-নির্দ্দিষ্ট মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হইলে, অন্য এক কোম্পানী রাজদত্ত অধিকার প্রাপ্ত হইবে। ইংলণ্ডে ও ভারতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজ পরস্পরের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল; অবশেষে এই দুই সমাজ একত্র মিশিয়া গেল। এই সময় হইতেই ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইল (১৭০৮)। সেই সময়ে ঔরংজেবের মৃত্যুতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইল। বদমাইসী, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ, চারিদিকে দেখা দিল; উৎকৃষ্ট প্রদেশগুলি, স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইল; সমস্ত রাজকর্ম্মচারী প্রজা-পীড়ন করিতে লাগিল; এবং যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী টাকা দিত, তাহার নিকটেই তাহারা আত্মবিক্রয় করিত। ইংরাজ-রীতিনীতির দ্বারা কলুষিত ইংরাজ বণিকেরা পরে ভারতীয় রীতিনীতির দ্বারা আরও কলুষিত হইল। তখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ভারতের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই; কিন্তু ভারত, ভারতেপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজদিগের উপর, এমন কি ইংলণ্ডেরও উপর একটা দুষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কেননা, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীর মধ্যে যখন দারুণ বিবাদ চলিতেছিল তখন তাহারা উভয়েই নির্ব্বাচক-দিগকে ক্রয় করিতেছিল, প্রতিনিধিদিগকে ক্রয় করিতেছিল এবং এইরূপে অনেক পরিমাণে রাষ্ট্রনৈতিক রীতিনীতির অবনতি ঘটাইবার পক্ষে সাহায্য করিতেছিল।

দ্বিতীয় যুগ

২

প্রথম যুগে আমরা দেখিতে পাইলাম, ইংরাজেরা (তখনও দুর্ব্বল) কতকগুলি কুঠী দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিয়া ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। দ্বিতীয় যুগে দেখিতে পাই, ভারতে অরাজকতা উপস্থিত এবং ইংরাজেরা নিজ শক্তি বুঝিতে পারিয়া সমস্ত ভারতে প্রবল শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

*
* *

শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যের পরিপুষ্টি, য়ুরোপীয় উপনিবেশগুলির ক্রমোন্নতি—ইংরাজের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র কি, তাহা ইংরাজদিগকে দেখাইয়া দিল। ফরাসী ও ওলন্দাজ নাবিকদিগের উপর জয়লাভ করিয়া, তাহারা সমস্ত পৃথিবীতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার অবসর প্রাপ্ত হইল। সর্ব্বপ্রথমে তাহারা ভারত লইয়াই ব্যাপৃত ছিল। যেদেশে কতকগুলা ভাগ্যান্বেষী রাজ্যস্থাপন করিতে পারিত, সেখানে কোন এক য়ুরোপীয় প্রবল রাজশক্তি কেননা বিস্তৃত ভূখণ্ড অধিকার করিতে সমর্থ হইবে? কিন্তু ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি বণিক সম্প্রদায় মাত্র, তাহারা অংশীদারের প্রাপ্য ডিভিডেণ্ট লইয়াই ব্যাপৃত।

কি উপায়ে একটা ভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করা যাইতে পারে, তাহা কেবল ডুপ্লে নামক একজন ফরাসী বুঝিয়াছিলেন। ভারতবাসীদের লইয়াই সৈন্যগড়িয়া তোলা; ভারতীয় রাজাদিগকে সামন্তশ্রেণী বা মিত্র-

শ্রেণীভুক্ত করা; রাজ্যবিস্তার না করিয়া য়ুরোপীয় কোম্পানীর প্রভাব বিস্তার করা —ইহাই তাঁহার মৎলব ছিল। ফ্রান্সের ঔদাস্য-বশতঃ দুপ্লে তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। ক্লাইভ তাঁহার মৎলবগুলি গ্রহণ করিয়া তাহা পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলেন। দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া ক্লাইভ বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং পলাসীক্ষেত্রে (১৫৭) ৩২০০ ইংরেজ ও সেপাই সৈন্য লইয়া বঙ্গনবাবের ৫০,০০০ হাজার লোককে পরাভূত করিলেন। কোম্পানী বঙ্গদেশের প্রভু হইয়া দাঁড়াইল।

এই আকস্মিক ভাগ্যোদয়ে বনিকদিগেরে মাথা ঘুরিয়া গেল; যাহারা গরম মশলাদি কিনিবার জন্য আসিয়াছিল, হঠাৎ তাহাদের হাতে একটা সাম্রাজ্যের কাজ আসিয়া পড়িল। কেবল একমাত্র ক্লাইবই কোম্পানীর প্রতিনিধিদিগকে বাগাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন--তাহাকেই তাহারা মানিত; আর কাহাকেও তাহারা গ্রাহ্য করিত না।

মেকেলে কি লিখিয়াছেন, দেখ :—

"ক্লাইভ চলিয়া যাইবার পর, পাঁচ বৎসর কাল ইংরাজদিগের কুশাসনের মাত্রা এতটা বাড়িয়াছিল, যে তাহাতে সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত রক্ষা পাওয়া ভার।......

বঙ্গদেশ, ইংরাজের নীতির কথা জানিবার পূর্ব্বেই তাহার বাহুবলের কথা জানিয়াছিল। যে সময়ে বাঙ্গালীরা আমাদের প্রজা হইল এবং তাহার পর যখন আমরা বুঝিলাম তাহাদের প্রতি আমাদের কতকগুলি রাজোচিত কর্ত্তব্য আছে—এই দুইয়ের মধ্যে একটা কালের ব্যবধান ছিল। এই কাল-ব্যবধানের মধ্যে যত শীঘ্র সম্ভব যাহাতে ২০-৩০ কোটী টাকা আত্মসাৎ করিতে পারা যায় তাহাই কোম্পানীর প্রতিনিধিদিগের একমাত্র চিন্তা হইল।...... পূর্ব্বে রোমক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা, মার্ব্বেলের প্রাসাদ ও "কাম্পানি"তে উদ্যান-ভবন নির্ম্মাণ করিবার জন্য, অভ্র-পাত্রে সুরাপান করিবার জন্য, গ্লাডিয়াটোর-সৈন্য প্রদর্শন করিবার জন্য, প্রত্যেক প্রদেশে প্রজাদিগকে নিপীড়ন করিয়া কত অর্থ-শোষণ করিত। আবার, স্পেনদেশের রাজ-প্রতিনিধিগণ যাহারা মেক্সিকো" বা "লিমা"র অভিসম্পাৎ পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছিল—তাহারা স্বর্ণমণ্ডিত গাড়ীর ঠাট্ এবং জম্‌কালো সাজসজ্জাবিভূষিত ও রজত-পাদুকাবদ্ধ-খুর অশ্ববৃন্দ সঙ্গে লইয়া মাদ্রিদ্-নগরে পুনঃপ্রবেশ করে। কিন্তু এই সময়কার ইংরাজদিগের প্রজাপীড়ন ও অর্থশোষণ,—রোমক ও স্পেনীয়দিগের কথা পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দিয়াছিল।" (মেকেলের Warren Hastings)।

যাই হোক্, শীঘ্রই এই নেশা ছুটিয়া গেল; দায়িত্ববোধ এই সকল বণিকদিগকে নীতিকুশল রাষ্ট্রপরিচালক করিয়া তুলিল। ইহা নিশ্চয় যে, অংশীদারদিগের আদেশ পালনে বাধ্য হইয়া, রাষ্ট্রনীতিকে তাহারা আয়ব্যয় ঘটিত প্রয়োজনের অধীন করিয়া রাখিয়াছিল। অবনতিগ্রস্ত দেশে, বাণিজ্যের কখনই উন্নতি হয় না; তাই কর স্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছিল, সেলামী আদায় করিতে হইয়াছিল, সৈন্যদল বিক্রয় করিতে হইয়াছিল, প্রদেশাদি বিক্রয় করিতে

হইয়াছিল, রাজ্য বিক্রয় করিতে হইয়াছিল।(১) কিন্তু ক্রমে অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক হইয়া, এই বণিকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করিলেন যাহা, ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন সহকারে, একশতাব্দীকাল ভারত শাসন করিতে ইংলণ্ডকে সমর্থ করিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুরুলিয়ার কুষ্ঠাশ্রম

কলিকাতা হইতে পুরুলিয়া ১৭৯ মাইলের পথ; রাত্রিটুকু গাড়ীতে থাকিয়া সকালে নামিতে হয়। মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিব এ আশা লইয়া এখানে আসি নাই এবং তাহা দেখিও নাই। তবে কলিকাতার কোলাহল, গাড়ীর ঘড়্ঘড়ানী ফিরিওয়ালার চীৎকার এবং যখন শীতের প্রথমে ধূঁয়ার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, সে সময় এখানে আসিয়া খোলা মাঠ, দূরে পর্ব্বত মালার দৃশ্য দেখিয়া এবং বিশুদ্ধ বাতাস সেবন করিয়া যে কিরূপ আনন্দ এবং তৃপ্তি বোধ হয়, তাহা কলিকাতা ছাড়িয়া যাঁহারা সময়ে সময়ে মফস্বলে গিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। পুরুলিয়ার রাস্তা গুলির এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। রাস্তাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং জমি হইতে অনেকখানি উচুঁ; মাটির সঙ্গে অভ্র মিশান থাকায় রাস্তাগুলিকে একেবারে শাদা দেখায়। জ্যোৎস্নারাত্রে মনে হয় যেন রূপার পাত বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক আমি পুরুলিয়ার দৃশ্য বর্ণনা করিব বলিয়া এ প্রবন্ধ লিখিতে বসি নাই। পুরুলিয়ায় আসিবার সময় টাইম টেবিল খুলিয়া দেখিলাম এখানে একটি কুষ্ঠাশ্রম আছে এবং তাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। খৃষ্টিয়ান মিশনারির হস্তে ইহার ভার। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এখানে আসার পর সেই মিশনারি সাহেবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তাঁহার সঙ্গে পরিচয়ের পর তাঁহার মুখেও শুনিয়াছিলাম যে এখানে একটি কুষ্ঠাশ্রম আছে। কিন্তু এমন একটি মহৎ কীর্ত্তি যে তাঁহাদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে এরূপ ভাবের কোনও কথা তাঁহার মুখে শুনি নাই। শুনিলাম বড় দিনে এই কুষ্ঠ রোগীদের প্রত্যেককে নূতন কাপড়

---

(১) ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী-যুদ্ধের পর যখন কোম্পানী বঙ্গসিংহাসনে মীরজাফরকে স্থাপন করিয়াছিলেন তখন কোম্পানী ২,৬৯৭,৭৫০ পৌণ্ড দাবী করেন; কিন্তু ইহার অর্দ্ধেকমাত্র টাকা দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল এবং কেবল ইহার তৃতীয়াংশ, রত্নঅলঙ্কার ও বাসন-কোসন দিয়া পরিশোধ করা হয়। Warren Hastings ৫০ লক্ষ টাকা লইয়া অযোধ্যার উজীরকে এলাহাবাদ ও কোরা বিক্রয় করেন; আরও কিছুকাল পরে, তিনি উজীরের নিকট আরও অধিক টাকার (৫৫ লক্ষ) দাবী করেন।

এবং অন্যান্য ছোটখাট উপহারও কিছু কিছু দেওয়া হয়। আমাদের দেখিতে যাইবার বড়ই আগ্রহ হইল। গিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না।

সহরের অনতিদূরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যস্থিত শালবনের মধ্যে এই আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। সহরের প্রান্ত হইতে বৃক্ষাভ্যন্তর-স্থিত সুদৃশ্য কুটিরাবলী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং উন্নত শাল তরুরাজির পশ্চাৎ হইতে একটি গির্জ্জার উচ্চ চূড়া দূর হইতে দেখা যায়। সহরের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র গ্রামের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই। কারণ এখানে কুষ্ঠরোগীদের জন্য স্বতন্ত্র বাজার ইস্কুল ডাক্তারখানা গির্জ্জা সমুদায়ই আছে; এবং বিশেষ সুব্যবস্থার সহিত এখানকার সমুদায় কার্য্য পরিচালিত হয়।

এখানকার অধিবাসী কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা সাতশতেরও অধিক। দুই শত বিঘা জমির উপরে ইহাদের জন্য ৭৫ খানি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল গৃহ, জলাশয়, কূপ ও পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ। মধ্যে ঔষধালয়, বাজার এবং গির্জ্জা। তাহার একদিকে পুরুষ এবং বালকদিকের জন্য এবং অপরদিকে স্ত্রীলোক ও বালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ। পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের অংশে যাইতে পারে না এবং স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের অংশে আসিতে পারে না। পুরুষদিগের অংশে ২২টি বাসগৃহ এবং ৩টি বালকদিগের বোর্ডিং আছে এবং স্ত্রীলোকদিগের অংশে ১৮টি বাস গৃহ এবং বালিকাদিগের জন্য ৩টি বোডিং আছে। প্রত্যেক গৃহে ১৫ হইতে ১৮ জন করিয়া থাকিবার নিয়ম। ইহা ভিন্ন ১০টি বিদ্যালয় এবং একটি হাঁসপাতাল আছে। হাঁসপাতালের
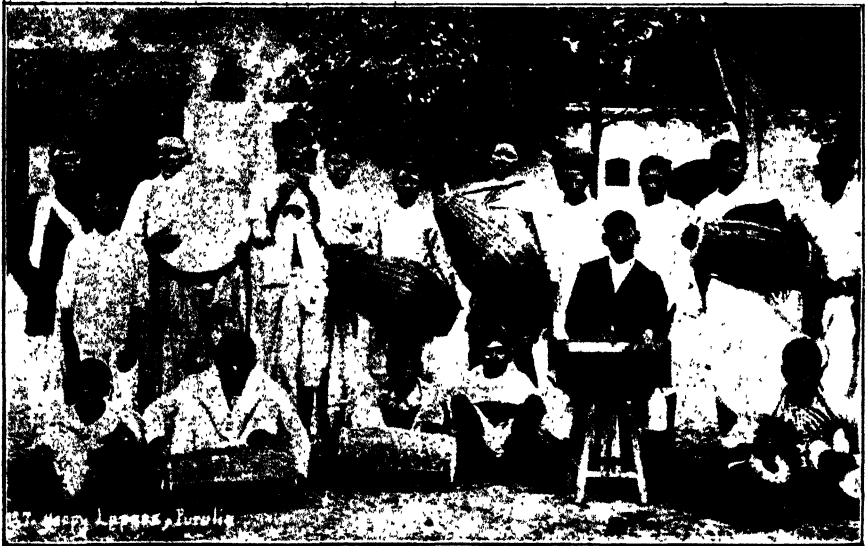
কুষ্ঠরোগীগণের আমোদ প্রমোদ

একদিকে পুরুষ ও অন্য দিকে স্ত্রীলোকের বাসস্থল।

কুষ্ঠরোগীদের সন্তানসন্ততিদের মধ্যে যাহাদের রোগ স্পর্শ করে নাই তাহাদের জন্য এই আশ্রম হইতে দূরে পৃথক একটি বাল্যাশ্রম (Home) আছে। ঐখানে বালক বালিকারা একজন অভিভাবকের (Resident house father) আশ্রয়ে বাস করে। তাহাদের জন্য বিদ্যালয়ও আছে সেখানে তাহারা প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে কোন একটি ব্যবসায়ও শিক্ষা করে। কেহ কেহ এই আশ্রমের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। বালিকারা বন্ধন কার্য্য সেলাই প্রভৃতি শিক্ষা করে।

তিন বৎসরের অধিক বয়স্ক সুস্থ শিশুকে রোগগ্রস্ত পিতা কিম্বা মাতার সঙ্গে থাকিতে দেওয়া হয় না। এরূপ বালকবালিকাদের রোগ স্পর্শ করিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য প্রথমে তাহাদিগকে পরীক্ষাবিভাগে (Observation ward) রাখা হয়, এবং রোগ স্পর্শ না করিয়া থাকিলে উপরি লিখিত বাল্যাশ্রমে রাখা হইয়া থাকে।

যাহাদের রোগ স্পর্শ করে নাই এইরূপ বালকবালিকাদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক বাসস্থল থাকায় অনেক বালক বালিকা এই ভীষণ কুষ্ঠরোগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এখানকার অধিবাসী বালক বালিকার মধ্যে অনেকে এক্ষণে বয়োপ্রাপ্ত হইয়া সুস্থ শরীরে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই আশ্রমে শিক্ষকের কার্য্য করিতেছে। আশ্রমের গৃহ নির্ম্মাণ, মেরামৎ ও সূত্রধরের কার্য্য এই আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসীগণই করিয়া থাকে। যে সকল বালকবালিকাদের রোগস্পর্শ করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় অথচ যাহারা স্পষ্টরূপে আক্রান্ত হয় নাই তাহাদিগকেও পৃথকভাবে রাখা হয়।
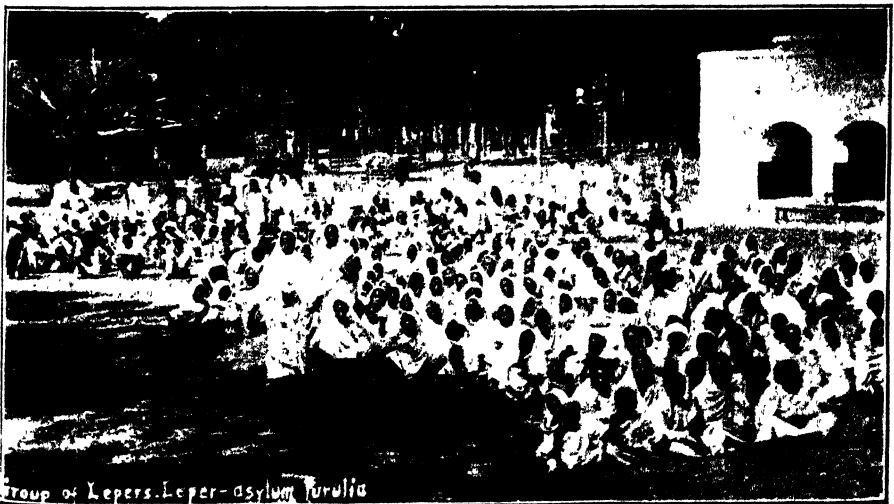
কুষ্ঠাশ্রমের অধিবাসী

আশ্রমে কয়টি বিদ্যালয় আছে তাহার বিবরণ ও ছাত্র সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

		ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা
১।	রোগগ্রস্ত বালিকাদের জন্য	১৪
২।	রোগ সন্দেহ এরূপ বালিকাদের জন্য	১৫
৩।	রোগ স্পর্শ করে নাই এরূপ বালিকাদের জন্য	১৬
৪।	রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদের জন্য	৩৫
৫।	কিণ্ডার গার্টেন	২৩
৬।	রোগগ্রস্ত বালকদিগের জন্য	১৬
৭।	রোগ স্পর্শ করে নাই এরূপ বালকদিগের জন্য	১৯
৮।	রোগ সন্দেহ এরূপ বালকদের জন্য	১০
৯।	রোগগ্রস্ত পুরুষদিগের জন্য	৪৩
১০।	কম্পাউণ্ডারের কার্য্য শিখিবার জন্য	৩

আশ্রমের সমুদায় কার্য্য পরিদর্শনের ভার রেভারেণ্ড পল উয়েগনারের উপরে। তিনি কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে নিজের সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া এই আশ্রমের সেবা করিতেছেন এবং নিঃসঙ্কোচে এই ভীষণ ব্যাধিগ্রস্ত লোকদিগের সঙ্গে মিশিতেছেন তাহা না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তাঁহার অধীনে কয়েকজন কার্য্যকারক আছেন। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক স্বতন্ত্র গৃহের জন্য রোগীদের মধ্যেই একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী তত্ত্বাবধারক আছে। ইহাদিগকে Eldrs বলা হয়।

যতদূর সম্ভব রোগীদিগকে কোন একটি কার্য্য শিক্ষা দিয়া তাহাতে নিযুক্ত করিয়া রাখা হয়। তবে এমনও অনেকে আছে যাহারা কার্য্যক্ষম নহে। তদ্ভিন্ন অপর সকলের জন্য কার্য্যের ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে একটি শাক সবজির বাগান আছে। সেখানে প্রত্যেক অধিবাসী আপন আপন চিহ্নিত স্থানে আবশ্যকীয় শাক সবজির চাষ করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন রাস্তা পরিষ্কার, গরু বাছুরের সেবা, গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য আছে। কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে মন প্রসন্ন থাকে সেই জন্য বালক বালিকা ভিন্ন অন্য সকলকেই নিজেদের খাদ্য প্রস্তত করিতে হয়। রোগীদিগকে সপ্তাহের চাউল এবং পয়সা দেওয়া হয়। এই পয়সা দিয়া তাহারা আশ্রম সংলগ্ন বাজার হইতে চাল ডাল লবণ তৈল তরকারি ইত্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে। রোগীরা দোকানে জিনিষ পত্র কেনার পর যে পয়সা ফিরাইয়া দেয় তাহা ঔষধে (Strong Carbalic acid) এবং গরমজল দিয়া ফুটাইয়া রাখা হয়। পীড়া হইলে রোগীকে চাউল ও পয়সার পরিবর্ত্তে সাগু দুগ্ধ ইত্যাদি দেওয়া হয়। বালক বালিকাদিগকে খাদ্য প্রস্তত করিয়া দেওয়া হয়; তাহাদের চাউল ও পয়সা দেওয়া হয় না।

বৎসরে দুইবার প্রত্যেককে কাপড় দেওয়া হয়। পুরুষদিগকে ধুতী কোট চাদর ও গামছা এবং স্ত্রীলোক দিগকে সাড়ী, ঝুলা ও গামছা। প্রত্যেকে আপন আপন বস্ত্রাদি ধৌত করে। ইহা ভিন্ন প্রত্যেককে বৎসর অন্তর কম্বল দেওয়া হয়। চিকিৎসালয়ের জন্য একজন ডাক্তার ও একজন এপোথিকারি আছেন। স্থানীয় সিভিল সার্জ্জেন ইহার তত্ত্বাবধান করেন এবং আবশ্যক হইলে রোগীদিগকে দেখিয়া থাকেন।

বড় দিন প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে ইহাদের জন্য আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হয় তাহা আগেই বলিয়াছি। বড় দিনের দিন দেখিলাম

৭০০ লোক প্রত্যেকে নূতন কাপড় পরিয়াছে, এবং এই ৭০০ লোককেই উপহার দেওয়া হইল। কুষ্ঠরোগীরা খোল করতাল বাজাইয়া কীর্ত্তন করিল এবং নানারূপ ক্রীড়া কৌতুক করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। ছোট ছেলে মেয়েদের অতি সুন্দর সুন্দর খেলানা, পুতুল বই ইত্যাদি দেওয়া হইল। বয়োপ্রাপ্ত দিগকে গরম কাপড় মোজা কম্ফার্টার ইত্যাদি দেওয়া হইল। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে কয়েকজন অন্ধও আছে। সেদিনকার দৃশ্য দেখিয়া সে সময় মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা বর্ণাতীত। উপহার বিতরণের পর তাহাদিগকে কিছু বলা হইল।

দুঃখের বিষয় এই; উহাদিগকে যে সকল উপহার প্রদান করা হইল, তন্মধ্যে একটিও আমাদের দেশের লোকের দান নয়। সমস্ত জিনিষই বিদেশীয় মহিলারা নিজ হাতে প্রস্তুত করিয়া এবং বুনিয়া এই হতভাগাদের জন্য পাঠাইয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া দেশবাসী একটি ২৫ বৎসর বয়স্কা ভদ্র মহিলা—তিনি চিররুগ্ন এবং শয্যাশায়ী; তথাপি নিজের রোগ যন্ত্রণা ভুলিয়া ইহাদের জন্য ভাবিয়াছেন। শয্যায় শুইয়া নিজ হাতে শেলাই করিয়া অনেকগুলি গরম জামা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছেন। Revd wagner প্রত্যেক রোগীর হস্তে জিনিষগুলি কত স্নেহে কত ভালবাসার সহিত তুলিয়া দিতেছিলেন, ঘৃণা বা ভয়ের লেশ মাত্র নাই! এত দিন মনে করিতাম রোগীদের সকলকেই বুঝি খৃষ্টিয়ান করা হয় কিন্তু শুনিলাম ইহাদের মধ্যে অনেকে খৃষ্টিয়ান নহে। ধন্য ইঁহাদের জীবন। ধর্ম্ম বিশ্বাসও সার্থক। ইঁহাদের এই আত্মত্যাগ ও নীরব সেবা দেখিয়া আত্মধিক্কার জন্মে।

এই সুবৃহৎ অনুষ্ঠানের পরিচালনা যে কিরূপ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। আমরা তত্ত্বাবধারক মহাশয়ের মুখে শুনিলাম আশ্রমের সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে তাঁহাদের বৎসর ৪৫০০০ হাজার টাকা আবশ্যক হয়। আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট এই নিমিত্ত বৎসরে ১৫০০০ হাজার টাকা এবং ঔষধের নিমিত্ত ১০০ শত টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র দান ইত্যাদি হইতে সামান্য কিছু টাকা আদায় হয় অবশিষ্ট সমুদায় টাকা য়ুরোপ হইতে আসিত। আমরা অবগত হইলাম বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে য়ুরোপ হইতে সমুদায় টাকা আসিতেছে না এবং সেইজন্য আশ্রমের পরিচালকগণকে কষ্টে পড়িতে হইয়াছে। যাঁহাদের মস্তকের উপর এই ৭০০ শত নিরাশ্রয় আতুরের প্রতিপালনের গুরু ভার রহিয়াছে তাঁহারা আজ এ অবস্থায় কিরূপ চিন্তিত তাহা বোধ হয় সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন। এই সঙ্কটে তাঁহারা একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া আছেন।

আমাদের দেশে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের হস্ত নানারূপ মঙ্গল কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে এবং যাঁহাদের প্রাণ দুঃখী আতুরের জন্য ব্যথিত। আমি কাতরে তাঁহাদের এবং আমার দেশবাসী সকলকে জানাইতেছি যে তাঁহারা যেন এই সঙ্কটের

দিনে ইহাদের জন্য চিন্তা করেন। বিদেশীয় লোকেরা আমাদের দেশের অনাথ আতুরের জন্য দুঃখ ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া পরিশ্রম করিতেছেন এবং ভাবিতেছেন, এ সময় আমরা কি বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব। যাঁহার যাহা ক্ষমতা বিনা সঙ্কোচে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া এই সৎকার্য্যে সাহায্য করুন :—Revd P. Wagner. Superintendent Leper Asylum. Purulja. B. N. R.। অতি ক্ষুদ্র দানও সাদরে গৃহীত হইবে।

শ্রীঅনুপমা দেবী।

স্রোতের ফুল

(২০)

চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া নিবারণ মুখুয্যে একটি থেলো হুঁকোয় তামাক খাইতেছিল। তাহার পার্শ্বে একটি মাটির তামাকদানিতে কয়লা, তামাক, টিকে, চকমকি, সোলা এবং একটা কাঠের ছোট পিঁড়িতে দুসারে আটটা গোল গোল ফুটোর উপর আটটি সাজা কল্কে মুখ অগ্নির প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। মুখুয্যে মুহুর্মুহু পোড়া কল্কে নামাইয়া সাজা কল্কেতে আগুন দিয়া হুঁকার মাথায় চড়াইতেছে।

শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। গোয়ালঘর ও পাকশালা হইতে ধূমরাশি কুণ্ডলি পাকাইয়া উঠিতেছে; কিন্তু হিমমন্থর অলস বাতাস তাহা বহন করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিতেছে না, উঠানের পাশের কৃষ্ণচূড়ার চূড়ায় দীর্ঘ ধূসর পাগড়ী পাকাইয়া জড়াইয়া দিতেছে। ঘাসের মধ্যে একটা ঝিল্লি সন্ধ্যার নিস্তব্ধতাকে করাত দিয়া চিরিতেছিল, একটা কাঠঠোকরা থাকিয়া থাকিয়া ঠক্‌ঠক্‌ঠর্‌র্‌ করিয়া মৌন সন্ধ্যার ধ্যান ভঙ্গ করিতেছিল।

নিবারণ ডাকিল—ওরে গোবরা, গোবরা!

অন্তঃপুর হইতে বিরক্তিকর্কশ কণ্ঠে উত্তর হইল—কি? কেন চেঁচাচ্ছ? কেবলই গোবরা গোবরা।

নিবারণও বিরক্ত হইয়া বলিল—ওরে সন্ধ্যে হয়ে গেল, আরতি করতে যাবি কখন?

শ্রীমান গোবর্দ্ধন গাঁজা টিপিতে টিপিতে বাহিরে আসিয়া বলিল—রোজ রোজ আমি যেতে পারব না। তুমি যাওনা কেন? আজ মুচিপাড়ায় ঝুমুর নাচ হবে; আমি দেখতে যাচ্ছি।

নিবারণ মিনতির স্বরে বলিল—ওরে ঝুমুর নাচ ত সারারাত হবে; একবার ঘণ্টাটা নেড়ে পঞ্চপ্রদীপটা ঘুরিয়ে নৈবিদ্যি শেতল জলখাবারগুলো বাড়ীতে এনে তারপর তোর যেখানে খুসি সেখানে মরগে না।

—আমি রোজ রোজ যাই, তুমি একদিন যাওনা কেন?

—আরে আমি কি ছাই আরতি টারতি করতে জানি?

—আমিই বড় জানি কিনা ?

—তবু তোদের কচি হাড়, ইচ্ছে মতন ঘোরে টোরে। আমাদের হাড় আড়ষ্ট হয়ে গেছে, ঘণ্টা নড়ে ত প্রদীপ নড়ে না, প্রদীপ নড়ে ত ঘণ্টা চুপ করে।

—ন্যাও! অতশত কেউ দেখবে কি না? ঘণ্টাটা নেড়ে দুটো ফুল ছড়িয়ে দিয়ে চলে এসগে।

—তুই ত বল্লি চলে এসগে। কিন্তু সত্যি কথা বলি শোন্। ঐ কিশরে আর বিপনেকে দেখলে আমার হৃৎকম্প হয়; ওদের চাউনি দেখলে বুকের রক্ত জল হয়ে আসে। তাতে আবার ভটচায্যিকে একঘরে করেছি বলে বিপ্‌নে আমার ওপর তিরিথ্‌খি হয়ে আছে। কি জানি বাবা ঠাকুরঘরে একলা পেয়ে ঠুকে মুকে দেবে!

—তোমায় ঠুকতে পারে আর আমায় বুঝি ঠুকতে পারে না।

—তোকেও ঠুকতে পারে। কিন্তু তোদের হাড় ভাঙলে জোড়া লাগবে, আমার বুড়ো হাড় জন্মের মতন যাবে।

—না, আমার হাড় ভেঙেও কাজ নেই, জোড়া লেগেও কাজ নেই। ভট্‌চায্যিকে একঘরে করলে কি শেষে আমার হাড় ভাঙবার জন্যে। এত ভয়েভয়েই যদি থাকতে হল তবে ওদের একঘরে করে লাভ হল কি ?

—লাভ আবার হয়নি? এক ঢিলে দুপাখী মরেছে দেখছিস নে? ভটচায্যি জব্দ হয়েছে; আর লক্ষ্মীজনার্দ্দনের আশীর্ব্বাদে সেদিন থেকে তোর গর্ভধারিণীকে উনুনে হাঁড়ি চড়াতে হয়নি। প্রসাদ, নৈবেদ্য, শেতল, জলপানি রোজ যা আসে খেতে খেতে পেটের অসুখ হয়ে গেল; তবু বলিস লাভ হয়নি ?

—তা যাই বল, আমি আজ কিছুতেই যেতে পারব না। তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে বকবক করছি, এতক্ষণ হয়ত ওদিকে ঝুমুর আরম্ভ হয়ে গেল। জানো, এ ঝুমুর ভাগলপুর থেকে এসেছে!

আর কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া শ্রীমান গোবর্দ্ধন প্রস্থান করিলেন। নিবারণ—অকালকুষ্মাণ্ড, পাজি, প্রভৃতি বিবিধ উপযুক্ত ও সম্পর্কবিরুদ্ধ বিশেষণে পুত্রকে অভিহিত করিতে করিতে হুঁকা রাখিয়া উঠিল। বাঁশের আলনা হইতে গামছা ও নামাবলি এবং ঘরের কোণে ঠেসানো একগাছি বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া ডাকিল—ওরে ছিরে, ছিরে রে!

এজ্ঞে—বলিয়া হাতে সানি মাখা ও পায়ে গোবর লেপটানো অবস্থায় ছিরে গোয়ালঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

নিবারণ তাহাকে বলিল—ওরে একবার লণ্ঠনটা জ্বেলে দে ত, বাবুদের বাড়ী আরতি করতে যেতে হবে।

ছিরে লণ্ঠন জ্বালিতে চলিয়া গেল। নিবারণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—দোহাই মা কালী, জয় বাবা লক্ষ্মীজনার্দ্দন, বিপনের সামনে যেন না পড়ি। দোহাই বাবা! জয় মা! ভালোয় ভালোয় প্রাণে প্রাণে বেরিয়ে আসতে পারলে একপয়সার হরির লুট দেবো বাবা। শ্রীহরি শ্রীহরি! বিপত্তে মধুসূদন! দুর্গা দুর্গতিহারিণী!... সাধে কি ঠাকুর দেবতার ধার ধারিনে!

ঠাকুর দেবতার কথা মনে করলে মনের ভেতরটা কেমন ছমছম করতে থাকে, কোনো কাজই নির্ভয়ে করবার জো থাকে না। রামঃ!...না না, এখন ও-কথাটা ভাবা ভালো হচ্ছে না। দুর্গা দুর্গা! মধুসূদন মধুসূদন!

ছিরে একটি চৌকোণা লণ্ঠনের মধ্যে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়া আনিল। লণ্ঠনটির একপাশের কাঁচ নাই, সে দিকটায় ছেঁড়া হিন্দুহিতৈষী আঠা দিয়া লাগানো; তার পাশের কাঁচখানার উপরদিকটা টিনের জোড় হইতে খুলিয়া ভিতর দিকে ঝুলিয়া পড়িয়া নড়নড় করিতেছে; তার পাশের কাঁচখানা ফাটা; একখানা মাত্র কাঁচ আস্ত আছে। লণ্ঠনের ভিতরটায় গলা বাতির উপর বেড়ি কেরোসিন পড়িয়া থকথক করিতেছে! কেরোসিনের ডিবে হইতে আলোক অপেক্ষা ধূমই অধিক নির্গত হইতেছিল। ছিরে লণ্ঠনটি আনিয়া নিবারণের হাতে দিল। নিবারণ লণ্ঠন হাতে করিয়াই বলিল—এঃ! কি লাগিয়েছিস? গোবর নাকি?

ছিরে দাঁত বাহির করিয়া বলিল—এঁ! গোবর ক্যানে? খোল-পচা! আমি সানি দিতেছিনু কিনা!

নিবারণ বলিল—এঃ এঃ! আহাম্মক বেটা। হাতটা ধুয়ে মুছে নিতে পারিস নি? দে দে এখন একটু ন্যাকড়া কি কাগজ দে। রামঃ! হাতময় লেগে গেল।

ছিরে একটু কাগজ আনিয়া দিল। তাহাতে হাত ও লণ্ঠন কথঞ্চিৎ মুছিয়া নিবারণ যাত্রা করিল—দুর্গা দুর্গা! মধুসূদন মধুসূদন!

বাড়ীর বাহির হইতেই 'বেড়ার পাশে শুকনো পাতার উপর কি খড়খড় করিয়া উঠিল; একটা শেয়াল রাস্তার একদিক হইতে অন্য দিকে ছুটিয়া গেল; একটা বাদুড় তাহার কালো দীর্ঘ ডানা মেলিয়া মুখুয্যের সামনে ছায়া ফেলিয়া উড়িয়া গেল; একটা হুতুম-পেঁচা তেঁতুল-গাছের ঘন কুঞ্জ হইতে গম্ভীর রবে ডাকিয়া উঠিল ধুতু-ধুতু-ধুতুরুম্!

নিবারণ মনে মনে বলিতে লাগিল —রাম রাম! সব অলক্ষণ! খড় খড় করল ওটা নিশ্চয় সাপ! বামে সর্প, দক্ষিণে শৃগাল, সম্মুখে বাদুড়, ঊর্দ্ধে কালপেঁচা! একেবারে চারপোয়া অলক্ষণ পরিপূর্ণ! মধুসূদন মধুসূদন! আজ নির্ঘাত লাঞ্ছনা আছে বিপনের হাতে! দুর্গা! দুর্গা! জমিদারের ছেলে হবে নাদুসনুদুস গোবরগণেশ গোচের। তা না, যেন রঘো ডাকাতের চেলা! জমিদারের ছেলে বিছানায় শুয়ে ভুঁড়িতে হাত বুলুতে বুলুতে তামাক খাবি, বড়জোর এক চক্কর গাড়ীতে চড়ে' মেঠো হাওয়া খেয়ে আসবি! তা না, সব অনাছিষ্টি! খেলবেন কিনা ব্যাটবল, ভাঁজবেন কিনা ডম্বল! আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ! ...দূর কর ছাই, আবার বাজে চিন্তা করছি। কেমন অনভ্যেস, কিছুতেই ঠাকুর দেবতার নাম জপ করতে পারিনে। দুর্গা দুর্গা! শ্রীহরি শ্রীহরি! মধুসূদন মধুসূদন!

অন্দরের দেউড়িতে আসিয়া নিবারণ দেখিল অন্দরের বৃদ্ধ দ্বারবান চুবেজি দুই

হাতে তাহার সুশুভ্র শ্মশ্রুরাজি চিবুকের মধ্যস্থলে বিভক্ত করিয়া উপর দিকে তুলিয়া দিতে দিতে সুর করিয়া গাহিতেছে—

সুমিরত রামহি তজহি জন তৃণসম বিষয়বিলাসু।
রামপ্রিয়া জগজননি সিয় কছু ন আচরজু তাসু॥

নিবারণ আসিয়া ভয়জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—নমস্কার দুবেজি! ছোট বাবু কাঁহা?

—নমস্কার মুখুয্যা মাহাশে। ছোটবাবু ত আভি বাহার গিলো। ভট্চায মাহাশের বাড়ী গিয়ে উয়ে হোবে।

নিবারণ আশ্বস্ত হইয়া অন্দরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—রোহিণী।

রোহিণী দুধ জ্বাল দিতেছিল। উচ্ছ্বসিত দুগ্ধ আলোড়ন করিতে করিতে বলিল—কে গা?

—আমি নিবারণ। ঠাকুরের আরতি করতে এসেছি।

রোহিণীর নিকটেই একজন দাসী বাটনা বাঁটিতেছিল ও দুজন কুটনো কুটিতেছিল। রোহিণী ব্যস্ত হইয়া বলিল—সারি, সারি, দুধটা একটু নাড় না ভাই। আমি মুখুয্যে মশায়কে ঠাকুরঘরে দিয়ে আসি·········বাবা! সবারই মুখে শুধু রোহিণী আর রোহিণী! রোহিণী ছাড়া যেন বাড়ীতে আর লোক নেই।

রোহিণী মুখুয্যের আহ্বানের প্রথম আনন্দ-উল্লাস চাপা দিয়া যেন কত অনিচ্ছায় বিরক্ত হইয়া দুধের হাতা সারদার হাতে দিয়া প্রস্থান করিল।

নিবারণ উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল। রোহিণী আসিয়া বলিল—এস্থন।

রোহিণীকে অনুসরণ করিয়া যাইতে যাইতে মুখুয্যে বলিল—কি রোহিণী, তোমাদের রাজবাড়ীর খবর কি? নতুন খবরটবর কিছু আছে?

—আমাদেব তো নিত্যি নতুন খবর। দাদাবাবু মেয়েদেরই সব বই পড়াচ্ছে; শোবার ঘরে আঁতুড় করছে,......দেখছ কি অবাক হয়ে মুখুয্যে মশায়, সত্যি মাইরি বলছি এই তোমার গা ছুঁয়ে, এই সব হচ্ছে!

—এ্যাঁ বলিস কি? গিন্নি কিছু বলেন না।

—রাণীমা আমাদের মাটির মানুষ। নইলে আর সতীনপুতের এত আবদার সয়! তুমি একবার রাজাবাবুকে বল না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ তা ত বলতে হবে। এমন সব অনাচার! তারপব শুনচি, বিপনে নাকি একঘরেদের বাড়ী যায়?

—তা যায় বৈ কি! কিশোর হল গিয়ে দাদাবাবুব প্রাণের ইয়ার।

নিবারণ গম্ভীর চিন্তিত ভাবে বলিল—হুঁ!......আচ্ছা বলতে পার রোহিণী, কাব আঁতুড় বাবুর শোবার ঘরে হবে। ঐ মালতী ছুঁড়ির নাকি?

—না, না, এখনো অতদূর হয়নি; তবে হতে বিলম্বও নেই। আপাতত পাঁচুর মার পালা।

—ও! তা ওর ওপর অত দরদ কেন?

—কি জানি বাবু, ওর ভেতরে কি মতলব আছে!

—হরি হে মধুসূদন! তোমার ইচ্ছা! —বলিয়া নিবারণ পা ধুইয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল।

রোহিণী বলিল—আপনি ততক্ষণ আরতি করুন, আমি জয়াপিসিকে বলে আসি ঠাকুরের শেতল আনতে।

ঠাকুরঘরে কাহাকেও না দেখিয়া নিবারণ পরম আরাম বোধ করিল। সে তাড়াতাড়ি পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া খুব জোরে ঘণ্টা নাড়িতে লাগিল এবং শাঁখের জল ছড়াইয়া, এখানকার জিনিষ সেখানে রাখিয়া চটপট আরতি সম্পন্ন করিল।

ঠাকুরের জলপানি লইয়া জয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—রোহিণী এখানটা একটু হাত মার্জ্জনা করে দে।

রোহিণী হাত মার্জ্জনা করিতেছে, জয়া জলখাবার হাতে দাঁড়াইয়া আছে, মুখুয্যে আসনের উপর দাঁড়াইয়া দুই হাতে ধরিয়া প্রাণপণ শক্তিতে শাঁখে ফুঁ পাড়িতেছে, এমন সময় বিপিন ঘরে আসিয়া হা হা করিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল।

তাহার অট্টহাস্তে চমকিত হইয়া রোহিণীর হাত হইতে জলের ঘটী, জয়ার হাত হইতে জলখাবার, মুখুয্যের হাত হইতে শাঁখ ঝন ঝন ঝন ঝন শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—বাঃ! বাঃ! ঠাকুরের অদৃষ্ট ভালো! নন্দকিশোর স্মৃতিরত্নের বদলে নিবারণ মুখুয্যে, খুড়িমার বদলে জয়াঠাকরুণ ঠাকুর-সেবার ভার পেয়েছেন; আর তার ওপর রোহিণী এসে জুটেছেন! একেবারে ত্রি অস্পর্শ!

বিপিন আবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঝন ঝন শব্দ শুনিয়া গিন্নি "কি হল, অ্যাঁ! কি হল?" বলিতে বলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন সকলে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর বিপিন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

ঘোমটা টানিয়া ফিসফিস করিয়া গিন্নি উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—এঁ জয়াঠাকুরঝি, এসব ফেল্লে কেমন করে? এখন কি হবে? কি দিয়ে ঠাকুরের শেতল হবে বল ত? ওলো রোহিণী, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি, জল থৈ থৈ করছে, মুছে নে।

কেহ একটু নড়িতেও পারিল না। উহাদের কানে বিপিনের বিদ্রূপের হাসি প্রলয়কালের ভৈরব-বিষাণের প্রতিধ্বনির মতন বাজিতেছিল হা হা হা।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—মা, ঠাকুর এমন শুদ্ধ আচারের লোকেদের হাতে কিছু খাবেন না বলে খাবার উল্টে ফেলে দিয়েছেন। যেখানে নিবারণ মুখুয্যে পূজারী, জয়াঠাকরুণ জোগাড়ী, আর রোহিণী পাটকরণী, সেখানে মানুষেরই খেতে প্রবৃত্তি হয় না, ত ঠাকুরের! নিজেরা যদি সেবা করতে পারবে না তবে পাপের বোঝা বাড়াতে বাড়ীতে ঠাকুরের ল্যাঠা রেখেছ কেন? ঠাকুর কি তোমার জমিদারী সেরেস্তার গোমস্তা যে তোমার হুকুম শুনবে আর তোমার হাততোলা প্রসাদ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে যাবে?

গিন্নি ফিসফিস করিয়া বলিলেন—আঃ কি অলক্ষুণে কথা বলিস বিপিন, ঠাকুর দেবতাও তোরা মানিস নে?

বিপিন উচ্চ কণ্ঠে বলিল—মানি বলেই

ত এই-সব ভণ্ডামি আর অনাচার সহ্য হয় না। যাদের মুখ দেখলে পাপ হয়......

—আঃ কি করিস! যা যা তুই এখান থেকে যা......

বলিয়া গিন্নি বিপিনকে ঠেলিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। বিপিন হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

গিন্নি বলিলেন—যাও জয়াঠাকুরঝি, আলাদা দুধ সন্দেশ নিয়ে এসে ঠাকুরের জলপানি দাও।......মুখুয্যে মশায়কে বল একটু যেন থাকেন, আমি এক্ষুনি লুচি ভাজিয়ে দিচ্ছি।

নিবারণ এদিক ওদিক চাহিয়া বিপিন আছে কিনা দেখিয়া বলিল—আমার বিশেষ কাজ আছে মা, আমি আর বিলম্ব করতে পারব না, এক্ষুনি যাব।......মধুসূদন মধুসূদন!

সে এই যমপুরী হইতে পলাইতে পারিলে বাঁচে, তাহার আর লুচি খাইয়া কাজ নাই। তাহার মনে হইতেছিল এখনি হয়ত কোনো দেয়াল বজ্রহাস্তে বিদীর্ণ করিয়া নৃসিংহ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া বিপিন তাহাকে নখে করিয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিবে।

গিন্নি বলিলেন—তবে আমি দুবেজিকে দিয়ে আপনার খাবার পাঠিয়ে দেবো।

গিন্নির সঙ্গে সঙ্গে জয়া রোহিণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মুখুয্যে শূন্য ঘরে একাকী বসিয়া বসিয়া আড়ষ্ট হইয়া জপ করিতে লাগিল—মধুসূদন মধুসূদন!

(২১)

অন্দরের দেউড়ী পার হইয়া তবে নিবারণের চিন্তা-শক্তি ফিরিয়া আসিল। সে বিপিনের শ্লেষ ও অট্টহাস্য মনে করিয়া দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া চোখ পাকাইয়া বলিল—হুঁ! এর শোধ আমি না তুলি ত......কি বলেছি।—নিবারণ শপথটা সামলাইয়া লইল। কারণ সে ভাবিল যে জমিদারের ছেলে বিপিনকে জব্দ করা খুব সহজ কাজ না হওয়াই সম্ভব।

নিবারণ ভাঙা লণ্ঠন হাতে লইয়া ফাটা লাঠি ঠবর্ ঠবর্ করিতে করিতে হরিবিহারী বাবুর বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইল। তখন হরিবিহারী আহারে যাইবার উপক্রমণিকা-স্বরূপ বোতল ও গেলাস লইয়া হজমি আরক পান করিতেছিলেন।

হরিবিহারী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—কি খুড়ো! এত রাত্রে কি মনে করে? ......বড় শীত! হবে?

হরিবিহারী স্ফটিকপাত্রে শোণিত-লোহিত তারল্য নিবারণের সম্মুখে নাচাইল। নিবারণের মনটা প্রসন্ন ছিল না। সে অমন লোভনীয় আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া বলিল—না বাপু, অত আদরে আমার আর কাজ নেই। অন্দর থেকে অপমান হয়ে এসে সদরের আদর ভেঙচানো মনে হচ্চে। আমি বলতে এসেছি, কাল থেকে ঠাকুরপূজোর জন্যে অন্য লোক দেখো। আমা হতে ও কাজ হবে না।

—কেন? হয়েছে কি?

—বুড়ো বয়সে শেষে কি মার খাব? তোমরা বড়লোক, তোমরা সব পার বাবাজী। তোমাদের বেলা লীলে খেলা, পাপ লিখেছে আমাদের বেলা।

হরিবিহারী নিতান্ত একান্তবাসী,

সংসারের কোনো খোঁজ খবরই রাখেন না, কাহারো সহিত বড় একটা মেশেনও না। খাইতে শুইতে দুটিবার অন্দরে যান, আর সমস্ত দিন একলাটি বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেসান দিয়া তামাক টানেন। সুখদুঃখের সঙ্গী তাঁহার রামধন খানসামা। জমিদারীর কাজ কর্ম্ম সব দেওয়ানজিই দেখেন; যখন দেওয়ানজির নিতান্ত দরকার বোধ হয় তখন তিনিই প্রভুর পরামর্শ লইতে আসেন। অন্যথা অলসপ্রকৃতির সঙ্গবিরক্ত প্রভুটি কোনো কর্ম্মেই কখনো নিজে হইতে হস্তক্ষেপ করিতেন না; তাঁহার ভয়, পাছে তাঁহাকে নিজে কোনো চেষ্টা করিয়া নূতন আয়োজনের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিতে হয়। এই ভয়েই কোনো প্রচলিত ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ও সাহস হইত না। ভট্টাচার্য্যকে একঘরে করিয়া কোনো অসুবিধা হয় নাই নিবারণের জন্য। এখন সেই নিবারণ কাজে ইস্তফা দিতে উদ্যত হওয়ায় চিন্তিত হইয়া বলিলেন—আরে হয়েইছে কি তাই আগে বল শুনি।

নিবারণ বলিল—তোমার পুত্তুর, বাবাজী, গুণধর পুত্তুর। পাঁচটা পাশ করেছেন, জমিদারের ব্যাটা, তা আর অহঙ্কার ধবে না। আমার ওপর একেবারে মারমুখো! ক্যান রে বাপু—অপরাধের মধ্যে ত তোদেরই ঠাকুরের পূজো হয় না, দয়া করে পূজো করে দিতে এসেছি। তা অত কেন? না হয় আসব না!

হরিবিহারী স্তিমিত নেত্রে বলিলেন—না না, বিপিন কি তোমার অপমান করতে পারে? যদি কিছু অন্যায় করে থাকে আমি ধমকে দেবো।

নিবারণ সাহস পাইয়া বলিল—হয় না-হয় জিজ্ঞাসা করে' দেখো, সেখানে গিন্নি ছিলেন, জয়াঠাকরুণ ছিল, রোহিণী ছিল। সকলের সামনে আমায় সে কী অপমান! না ভূত না ভবিষ্যতি! এই মারে ত এই মারে! গিন্নি এসে বাই হাঁ হাঁ করে পড়লেন তাই রক্ষে! নইলে আজ তোমার বাড়ীতে ব্রহ্মহত্যা হয়ে যেত!

—না খুড়ো তুমি কিছু ভেব না, আমি খুব করে তাকে ধমকে দেবো। তোমরা যেমন পূজো করছ কোরো। বিপিন তোমায় আর কখনো কিছু বলবে না।

—বিপিন না বললেও ত তোমার বাড়ী আর আমাদের আসা হবে না। তুমি গাঁয়ের জমিদার, আমাদের মাথার মণি! কিন্তু বাবাজী সকলের ওপর ধর্ম্ম ত আছেন! তুমি খুসি হবে কি রাগ করবে বলে ত আর জাত ধর্ম্ম ছাড়তে পারিনে।

—কেন আবার কি হয়েছে?

—হয় নিই বা কি? তোমার বাড়ীতে মেয়ে-স্কুল বসেছে; বাড়ীর ভেতরে আঁতুড় ঘর হচ্ছে; একঘরেদের ঘরে যাতায়াত চলছে; ম্লেচ্ছপনার আর বাকি কি? তোমাদের পেয়ারের ভট্‌চায্যিকে একঘরে করে ভালো করিনি দেখছি, আমাদেরই একঘরে হয়ে থাকা উচিত ছিল।

—এঁ! এতসব কাণ্ড হয়েছে? রামধন ডাক ত একবার বিপিনকে!

নিবারণ শশব্যস্ত হইয়া বলিল—না না

বাবাজী কর কি সর্ব্বনাশ! আজ রাত্তিরে কিছু বলো না, বলো না, সাত দোহাই বাবা। তাহলেই সে ঠিক বুঝতে পারবে আমি তোমার কাছে লাগিয়েছি। আর সে যে গোঁয়ার-গোবিন্দ, অমনি ছুটে গিয়ে আমার ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়ে ছাড়বে। দোহাই বাবাজী! ধর্ম্ম সাক্ষী, আমি তোমায় কিছু বলি নি! আমি শুধু তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছিলাম, নিজেই আমি একঘরে হয়ে থাকব তাই বলতে এসেছিলাম। মধুসূদন মধুসূদন!

হরিবিহারী বলিলেন—আচ্ছা থাক, আমি পরেই বলব।

নিবারণ তাড়াতাড়ি আপনার ফাটা লাঠিগাছটি লইয়া উঠিল। হরিবিহারী বলিল—তোমরা যেমন পূজো করতে আসছিলে তেমনি আসবে কিন্তু।

নিবারণ একথার কোনো জবাব না দিয়া মধুসূদন-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

হরিবিহারীর তোষাখানার একতলায় সাধারণ বৈঠকখানা। সেখানে জমিদার-পরিবারের আশ্রিত আত্মীয় অনাত্মীয় সকলে জটলা করিত, তাস পাশা খেলিত, গাঁজা গুলি মদ খাইত। নিবারণ আস্তে আস্তে একটি ঘরের দ্বারে গিয়া ডাকিল—শিবচরণ আছ?

শিবচরণ গিন্নির বোনপো, পাঁচুর বাবা। শিবচরণ তাড়াতাড়ি মদের বোতল লুকাইয়া হাতের উল্টা পিঠটা ফস করিয়া গোঁপের উপর রগড়াইয়া লইয়া বলিল—ক্যা?

মুখুয্যে বলিল—আমি হে আমি।

—কে মুখুয্যে মশায়? এত রাত্রে কি মনে করে?—বলিতে বলিতে শিবচরণ দুই-হাতে কাছা গুঁজিতে গুঁজিতে বাহির হইয়া আসিল।

নিবারণ তাহার কাঁধে হাত দিয়া একান্তে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল—একটা কথা আছে তোমাব সঙ্গে। তোমরা ত আমাদের বুড়ো-হাবড়া বলে একটুও মানো না; কিন্তু আমাদের কেমন দয়ার শরীর, কারুর বিপদ দেখলে ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারিনে, বুক দিয়ে এসে পড়ি। আহা তুমি নিতান্ত ভালোমানুষ, কোনো কিছুরই খোঁজ রাখ না, তোমার এমন বিপদ দেখে আমি শতকার্য্য ফেলে এই দারুণ শীতের রাতে হিহি করতে করতে ছুটে এসেছি · তাতে আজকে আবার হাঁপানিটা চাগিয়েছে···।—বলিয়া নিবারণ সাঁইসাঁই শব্দ করিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

শিবচরণের ত ভূমিকা শুনিয়াই চক্ষু স্থির। কি বিপদরে বাবা! সেদিন সে একজন প্রজার খাজনা বাবদ পাঁচ টাকা তের আনা সরকারি বাক্সে না ফেলিয়া নিজের ট্যাঁকে গুঁজিয়াছিল। সেই অবধি বেচারার মনে শান্তি ছিল না, প্রাণ ধুকপুক করিতেছিল। তাই সে মদের বোতল লইয়া বসিয়া গিয়াছিল। সেই চুরি কি ধরা পড়িয়াছে? সে কোন কথাই বলিতে পারিল না। ভয়কাতর দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করিয়া মুখুয্যের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মুখুয্যে বলিল—ভায়া, শুনেছ কি তোমার

ব্রাহ্মণীর আঁতুড় হচ্ছে দোতালার ওপর বিপিন বাবুর শোবার ঘরে?

শিবচরণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। যাক, তবে টাকা চুরির কথা নয়। কিন্তু আঁতুড়-ঘরে আবার বিপদ কি? কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া বলিল—হ্যাঁ শুনছিলাম বটে আজ ঐরকম কি একটা কথা হয়েছে।

—হঠাৎ তোমার ব্রাহ্মণীর ওপর বিপিন বাবুর এত মমতা কেন হল কিছু বুঝতে পারছ কি? যদি জাত ধর্ম্ম বাঁচাতে চাও ত পালাও বৌকে নিয়ে দেশে। আজই বড়-বাবুকে গিয়ে বলগে, গিন্নিকে গিয়ে কেঁদে ধরগে, নইলে সর্ব্বনাশ!

মুখুয্যের কথায় শঙ্কিত হইয়া শিবচরণ বলিল—এ যে ভরা দশমাস, কেমন করে যাব?

মুখুয্যে একটু চিন্তা করিয়া বলিল—আচ্ছা, নাইবা গেলে, কিন্তু কর্ত্তাকে আর গিন্নিকে গিয়ে বলগে বিপিনের ঘরে কিছু-তেই ছেলে হতে পারে না; আর তোমার ব্রাহ্মণীকেও শিখিয়ে দিয়ো, সে যেন কিছুতেই রাজি না হয়।...যাও এখুনি যাও একবার কর্ত্তার কাছে, সেখানে এখন কেউ নেই।

নিবারণ শিবচরণকে টানিয়া লইয়া গিয়া সিঁড়িতে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। শিব-চরণ ইতস্তত করিতে করিতে উপরে উঠিয়া গেল দেখিয়া নিবারণ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

শিবচরণ গিয়া দেখিল হরিবিহারী খাইতে অন্দরে যাইবার জন্ম উঠিয়াছেন, দুইহাতে কোমরে কাপড়ের খুঁট গুঁজিতে গুঁজিতে চটির মধ্যে পা দিতেছেন। শিবচরণ ডাকিল—পিসেমশায়!

হরিবিহারী বলিলেন—কেন রে?

শিবচরণ ভয়ে ভয়ে আমতা-আমতা করিতে করিতে বলিতে লাগিল—বিপিন তার ঘরে আঁতুড় করবে বলছে। সে কি রকম করে হবে?

—যা যা সে আমি ঠিক করে দেবো। যেখানে চিরকাল আঁতুড় হয়ে আসছে সেখানেই হবে।

শিবচরণের আর কোনো কথা জোগা-ইল না। সে আস্তে আস্তে নামিয়া গেল।

হরিবিহারী অন্দরে যাইতেছেন। পশ্চাতে রামধন গুড়গুড়ি ও পানের ডিবা লইয়া আসিতেছে। তোষাখানা ও অন্দরের মধ্যপথে জয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে ধীরস্বরে ডাকিল—শোনো!

হরিবিহারী হাসিয়া কাছে গিয়া বলিল—কে জয়ী! কিরে? অনেক কাল পরে আজ দেখা! কিছু বলবি?

—আমি আর তোমার বাড়ীতে থাকতে পারব না। আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও। বিপিন উঠতে বসতে আমায় অপমান করছে, টিট্‌কারি দিচ্ছে। আমি এবাড়ীতে আর এক দিনও থাকতে পারব না।

—যা যা পাগলি, আর কাশী যেতে হবে না। আমি বিপিনকে শাসন করে দেবো।

তারপর একটি দৃষ্টিতে অনেকখানি অতীত ইতিহাসের ছায়া ফেলিয়া উভয়ে সরিয়া গেল।

বারংবার বিপিনের নামে নালিশ শুনিতে শুনিতে বিরক্তমনে হরিবিহারী অন্দরে আসিয়া শয়নকক্ষে পালঙ্কের উপর বসিলেন। গিন্নি আসিয়া একপাশে বসিলেন। হরিবিহারী বলিলেন—বিপিন নাকি মেয়েদের পাঠশালা করছে, দোতালায় আঁতুড় করছে?

গিন্নি মুখভার করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ! বিপিন এবার কলকেতা থেকে এসে অবধি কেমন উদাস উদাস, সদাই অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। যেমন খিটখিটে তেমনি একগুঁয়ে হয়েছে, নিত্যি নতুন খেয়াল নিয়েই আছে। তারপর ঐ যে ঘরজ্বালানি ছুঁড়ি মালতী এসেছে, ঐটে এসে অবধি ত বাড়ীতে একদিনের তরে শান্তি নেই। একবার নবকিশোরকে নিয়ে কত কাণ্ডটাই করলে! এখন আবার বিপিনকে পেয়ে বসেছে! সোমত্থ সব ছেলে, বিয়ে থা হয়নি, এতে ওদের মন চঞ্চল হতেই ত পারে। কিন্তু তুই বিধবা মানুষ, তোর কি অমন পুরুষ-ঘ্যাঁসা হওয়া উচিত?

হরিবিহারী স্তিমিতনেত্রে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন—তা ঝাড়ে মূলে সব দূর করে দিলেই ত সব ল্যাঠা চুকে যায়।

—বাপরে! তা কি বিপিনের প্রাণে সইবে? তার ত খুড়িমা-অন্ত প্রাণ! তারপর ত আজকাল খুড়িমার খুঁটির জোর হয়েছে, বোনঝি অমনি বিপিনের চোখে চোখে ফিরছে।

—আচ্ছা, আমি বিপিনকে দিয়েই ওদের তাড়াব।

—কিন্তু বিপিনের একটি বিয়ে দেওয়া দরকার হয়েছে। যেটের কোলে অতবড়টি হয়েছে, আর বিয়ে না হলে কি ভালো দেখায়?

—হুঁ! আচ্ছা কালই আমি সব ঠিক করে ফেলব। ঝিনুকপোঁতার জমিদার হরিশ চাটুয্যে তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে আমায় চিঠি লিখেছে।

হরিবিহারীর স্বভাব যেমন একদিকে বিষম নিষ্ক্রিয় ছিল, অন্য দিকে আবার তেমনি একবার উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলে বিলম্ব করিতে জানিত না। বিপিনের বিয়ে দেওয়া দরকার, তা কালই ঠিক হইয়া যাইবে—হরিশ চাটুয্যের মেয়ে প্রস্তুত আছে।

গিন্নি উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—তা হলে ত বেশ হয়!

(২২)

প্রাতঃকালে বিপিন লাইব্রেরীতে বসিয়া পড়িতেছে। গিন্নি আসিয়া ডাকিলেন—বিপিন!

বিপিন তাড়াতাড়ি বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কেন মা?

গিন্নি হাসিয়া বলিলেন—সকাল বেলাই তোকে একটা সুখবর দিতে এসেছি। তোর বিয়ের সম্বন্ধ করছি। আজকে উনি সব পাকা করে চিঠি লিখবেন।

বিপিন চিন্তিত হইয়া বলিল—কোথায় মা এ শুভকর্ম্ম স্থির করচ? খুকিটি এসে বিনির খেলুড়ে হতে পারবে ত?

—না না, তোর সকল তাতেই ঠাট্টা! তুই যেটের কোলে ডাগরটি হয়েছিস, তোর সঙ্গে কচি মেয়ের বিয়ে দেবো কেন?

এ বেশ ডাগর সোমথ মেয়ে। ঝিনুক-পোঁতার জমিদার হরিশ বাবুর মেয়ে! ওরা নিজেরাই যখন লিখেছে বয়েস ন বছর, তখন দশ এগার বচ্ছরের কম কিছুতেই হবে না!

বিপিন গম্ভীরভাবে বলিল—উঃ! তবে ত অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছে! কিন্তু মা আমার ত এখন বিবাহে তেমন আগ্রহ বোধ হচ্ছে না।

—আরে আগে শোন সব কথা, তারপর আগ্রহ হয় কিনা দেখব।......মেয়েটি বাপের একমাত্র সন্তান; যদি পুষ্যিপুত্তুর না নেয় ত সব জমিদারী তোরই হবে; মেয়েটি রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী; বেশ বিদ্বান; বিদ্যেসাগরের কি বলে কথামালা না কি তাই পড়ে; তুই যেমনটি চাস ঠিক তেমনি!

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—এত শুনেও ত বিশেষ আগ্রহ বোধ হচ্ছে না মা। তুমি বাবাকে বোলো আমি এখন বিয়ে করতে পারব না।

—তুই যে অবাক করলি বিপিন! সময়ে তোর বিয়ে হলে আজ যে তোর কাচ্চা-বাচ্চায় ঘর ভরে যেত! আমাদের কি তুই কোনো সাধ আহ্লাদ করতে দিবিনে? কি রকম কনে তুই চাস তাই বল? তোদের এখন মস্ত ধাড়ি মেয়ে পছন্দ, কিন্তু আমাদের হিঁদুর ঘরে তা ত আর পাওয়া যাবে না; ওরই মধ্যে দেখে শুনে একটু বড়সড় দেখে বিয়ে ত করতে হবে?

বিপিন হাস্তমুখেই বলিল—বিয়েটা যে করতেই হবে এমন কি কথা আছে? আমি ঐ প্যানপেনে কচিখুকিদের কিছুতেই বিয়ে করব না।......আর কাজ কি মা বিয়ে করে। আমরা মায়েপোয়ে বেশ আছি, ঝগড়া ঝাটি, আদর আবদার করছি; এর মধ্যে আবার আর-একজন শরিক জোটানো কেন? সেই অচেনা অজানা লোকটির মেজাজ মতলব কেমন হবে তা ত বলা যায় না; শেষকালে কি আমাদের মাঝখানে দেয়াল তুলে দাঁড়াবে।

গিন্নি বিপিনের কথায় প্রীত হইয়া বলিলেন—তা ত বটে, কিন্তু তোর মন যদি খাঁটি থাকে তবে বৌ-বেটি যেমনই হোক না, আমাদের সে কি করতে পারবে?

বিপিন হাসিয়া বলিল—কিন্তু তুমিই ত বল মা, মন না মতি, যদি বিগড়ে যায়।.. ... আমরা ত বেশ আছি মা, আর কোনো উৎপাত জুটিয়ো না।

—না না, তা কি হয়, যখনকার যা তখন সেটি নইলে মানাবে কেন? মায়ের খোকা হয়েই কি চিরকাল থাকবি। তুই বিয়ে করতে চাসনে, লোকে বলে—আহা মা নেই, কে বা গা'করে বিয়ের জোগাড় করবে? মা যদি থাকত......এসব কথা শুনলে কি আমার কষ্ট হয় না। তুই-ই বল ত।

—এতে আর কষ্ট কি মা? তুমিও জান যে তুমিই আমার মা, আমিও জানি যে তুমিই আমার মা। তবে যার যা খুসি বলুক না?

—না না লোকনিন্দে বড় ভয়ানক, স্বয়ং রামচন্দ্র ভগবান হয়ে সতীলক্ষ্মী সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন।......তুই এই বিয়ের মত দে বাবা, লক্ষ্মীটি।

—না মা, সে কিছুতেই হতে পারবে না। তোমাদের যেখানে পছন্দ হবে আমার সেখানে হবে না, আর আমার যেখানে হবে তোমাদের সেখানে হবে না। তাইত বলছিলাম যে এমন অশুভ বিয়ের কথাটা না তোলাই ভালো। সবাই ত বিয়ে করে, আমি না হয় নাই করলাম।

গিন্নি বড় সাধে বাধা পাইয়া বিরক্ত হইয়া—যা খুসি তাই কর; আমি তোর কোনো কথার মধ্যে যদি থাকি। বলব ওঁয়াকে, তিনি যা ভালো বোঝেন তা করবেন।—বলিয়া উঠিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নিধিরাম খানসামা এক বস্তা সেমিজ ও বডিস আনিয়া উপস্থিত হইল।

গিন্নি বলিলেন—ওতে কিরে?

বিপিন বলিল—এই সব সেমিজ তৈরি করে আনিয়েছি মা। এক-একজনের বারোটা করে; যতবার কাপড় ছাড়বে ততবার সেমিজও ছাড়বে; কাচা সেমিজ পরলে ত আর কোনো দোষ থাকবে না?

—এইসব সেলাই-করা কাপড় পরে ঠাকুর দেবতার কাজ করবে? তুই কি সবাইকে মালতী পেয়েছিস নাকি? সেই শতেকখোয়ারি এসেই ত তোর মাথা বিগড়ে দিয়েছে। তুই কেন বিয়ে করতে চাচ্ছিসনে এখন আমি বুঝতে পারছি। যাই দিকিন একবার ছোট বৌয়ের কাছে; ঝাঁটা মেরে শতেকখোয়ারিদের বাড়ীর বার না করে ত আমি জল খাবনা।

গিন্নি ক্রোধভরে উঠিলেন। বিপিন কাতর দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—মা, আশ্রিত নিরাশ্রয়কে অপমান করায় পাপ হয়। তাদের যদি তুমি বাড়ী থেকে তাড়াও, তোমার অকল্যাণ হবে; তাদের সঙ্গে আমিও তোমার বাড়ী থেকে চলে যাব।

গিন্নি চীৎকার করিয়া বলিলেন—কী! তুই আমাকে গাল দিলি আমার পাপ হবে, আমার অকল্যাণ হবে! আমি তোর মা হলে কখনো এমন কথা মুখে আনতে পারতিসনে!

ইহার উত্তরে বিপিন কোনো কথা বলিতে পারিল না। শুধু অশ্রুবিগলিত নয়নে গিন্নির দিকে চাহিয়া করুণ স্বরে ডাকিল—মা!

গিন্নি সে আহ্বানের অর্থ বুঝিলেন না; বিপিনের অশ্রুম্লান মুখের দিকে ফিরিয়া দেখিলেন না। তিনি নিতান্ত বিরাগভরে চলিয়া গেলেন।

ভাবপ্রবণ ও আবেগশীল বিপিনের অভিমানী কোমল অন্তর মাতার তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে সোফার উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে সকল তিরস্কার অগ্রাহ্য করিতে পারে কিন্তু তাহার মাতা যে তাহার ভালোবাসা ও ভক্তির প্রতি সন্দেহের আঘাত দিয়া গেলেন ইহা মিথ্যা বলিয়াই সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল।

কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মনে হইল এতক্ষণ হয়ত মা খুড়িমা ও মালতীকে না জানি কত লাঞ্ছনা করিতেছেন। বিপিন তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া খুড়িমার ঘরের উদ্দেশে ছুটিল।

বিপিন যাইবার পূর্ব্বেই গিন্নি গিয়া খুড়িমাকে তর্জ্জন করিয়া শুধু "ছোটবৌ,

বোনঝিকে নিয়ে এ বাড়ীতে থাকা তোমার আর পোষাবে না। তোমরা আপনার আপনার জায়গা দেখ।”—বলিয়াই প্রস্থান করিয়াছেন। খুড়িমা কারণ জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর পান নাই।

বিপিন যখন গেল তখন খুড়িমা ও মালতী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। বিপিনকে দেখিয়া খুড়িমার দুই চোখ দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মালতীও নতমুখে অশ্রুদমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিপিনেরও সদ্যসংরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহির হইবার জন্য বিপিনের মনের মধ্যে জড়ো হইয়া চোখ দিয়া বাহির হইবার জন্য আকুলিবিকুলি করিতে লাগিল।

সকলেই নির্বাক। পরের গলগ্রহ যাহারা তাহাদিগকে বিদায় হইবার আদেশ হইয়াছে, ইহাতে কাহারো বিরুদ্ধে অভিযোগের ত কিছু নাই। সুতরাং খুড়িমার বিপিনকে বলিবার কিছু ছিল না। মা কি বলিয়াছেন, না বলিয়াছেন, তাহা না জানিয়া বিপিনেরও কিছু বলা শক্ত ঠেকিতেছিল। বিপিন অনেক কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া বলিল—খুড়িমা, মা কি কিছু বলে গেলেন?

—হাঁ বাবা, আমাদের অন্যত্র যেতে বলে গেলেন '......আমরা কাশী যাব বাবা, শুনেছি মা অন্নপূর্ণার রাজ্যে কারো অন্নের অভাব হয় না।

এবার আর বিপিনের চোখের জল বাধা মানিল না। গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিপিন তাড়াতাড়ি রুমালে চোখ মুছিয়া বলিল—খুড়িমা, তুমি ঢের সয়েছ; আরও এক মাস আমার জন্যে সহ্য কর। এই একমাসে হয় তোমার জমিদারী তোমায় আমি ফিরিয়ে দেওয়াব, নয়ত তোমাদের সঙ্গে আমিও এ বাড়ী ছেড়ে বেরুব।

খুড়িমা অশ্রু মুছিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন—ছি বাবা, আমার জন্যে তুমি বাপ মার সঙ্গে কোনো রকম বিরোধ করলে আমি সুখী হব না। লক্ষ্মী বাবা আমার, বাপ মাকে তুমি অসুখী কোরো না। আমার জন্যে তুমি ঢের করেছ! ভগবান এই হতভাগীর ওপর বিরূপ; তাকে রক্ষা করতে গিয়ে বাপমার অসন্তোষ ডেকে এনো না; আমার জন্যে তোমার এতটুকু অকল্যাণ হলে আমার বুকে শেলের মতো বাজবে যে বাবা।

বিপিন এবার দৃঢ়স্বরে বলিল—এ ত তোমার জন্যে কিছু নয় খুড়িমা, এ ধর্ম্মের জন্যে আমি করছি। এতে কাউকে দুঃখ সইতে হয় সইতে হবে! তুমি একটি মাস আর চুপ করে থাক; তারপর দরকার হয় আমিই তোমায় কাশীতে নিয়ে যাব। লেখা পড়া শিখেছি খুড়িমা, তোমাদের দুজনকে রোজগার করে খাওয়াতে পারব, সে ভরসা আছে। বাবা যে পাপ করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে; বাবাকে আমি কখনো ঋণী রাখতে পারব না।

খুড়িমার চিত্ত স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভগবানের কাছে বিপিনের কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন। কোনো কথা তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না।

বিপিনের বীরের মতো দৃঢ়তা ও নারীর মতো কোমলতা দেখিয়া মালতীরও অন্তর প্রীতিসরস কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মালতী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া নীরব ভাষায় বিপিনকে অভিনন্দন করিল।

(২৩)

গিন্নি কর্ত্তাকে পুত্রের প্রতিকূলতার সংবাদ দিবার জন্য যখন অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া ঘব আর বাহির কবিতেছেন এবং কর্ত্তাকে খাইতে আসিবার জন্য তাগাদা করিয়া যখন ডাকিতে লোকের উপর লোক পাঠাইতেছেন, ঠিক তখনই বিপিনের আনন্দ-চঞ্চল চটিজুতার ফটর ফটর শব্দ তাঁহার কানে গেল। বিপিন ডাকিল—মা!

গিন্নি কোন উত্তর না দিয়া মুখখানি তোলো হাঁড়ির মতো ফুলাইয়া জানালার ধারে পুকুরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিপিন ঘরে আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইল। গিন্নি বিরক্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেই বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—মা, আমি পাশ হয়েছি। খুব ভালো পাশ হয়েছি।

গিন্নির মনের মেঘ তৎক্ষণাৎ কাটিয়া গেল। মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অভিমানের উপর মাতৃত্ব প্রবল হইয়া উঠিল। পুত্রের সকল অনাচার আতিশয্য তিনি ভুলিয়া গেলেন, উদ্যত অভিযোগ শান্ত হইয়া গেল, চারিদিক আবার প্রশান্ত প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—ওলো ও ক্ষ্যামা, সক্কলকে ডেকে বল আমার বিপিন পাশ হয়েছে। ও রোহিণী, রোহিণী, ভুবেজিকে দশ টাকার বাতাসা আর পঁচিশ টাকার নাড়ু আনিয়ে দিতে বল; ঠাকুরের ভোগ দিয়ে হরির লুট হবে। ওলো ও হাবার মা, ঠাকুর ঘরে গিয়ে গোবর্দ্ধনকে বলগে যেন চলে না যায়...আজকে ঠাকুরের ডবল ভোগ দিতে হবে।

বাড়ীময় আনন্দ-কলরবের হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সবাই চেঁচায়, সবাই সবাইকে খবর দেয়, সবাই একটা-না-একটা ফরমাস করে।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বলিল—মা, গোবরা পূজো করলে আমার কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণই হবে।

—চুপ চুপ! অমন কথা বলতে আছে! বেরাম্ভন!...

—অমন ব্রাহ্মণের চেয়ে অটলামুচি ঢের ভালো মা। গোবরা আবার ব্রাহ্মণ!

—চুপ চুপ! শুনতে পেলে ওর মনে কষ্ট হবে। আজকে আনন্দের দিনে কারো মনে কষ্ট দিতে নেই।

—তবে মা, আজকে বাবাকে বল ভট্‌চায্যি জেঠা এসে পূজো করুন; খুড়িমাকে ঠাকুরঘরের ভার ফিরিয়ে দাও। উৎসব যদি করতে হয়, এমনি করে প্রসন্ন আশীর্ব্বাদ দিয়ে উৎসব আরম্ভ হোক। সকল দিককার কালি ধুয়ে মুছে দাও।

গিন্নি বলিলেন—ওরে কে আছিস যা ত ছোট-বৌকে ডেকে আন ত। মালতীকেও ডেকে আনিস।

বিপিন বলিল—খুড়িমাকে আমি ডেকে আনছি মা।

বিপিন খুড়িমাকে ডাকিতে গেল। কিন্তু খুড়িমা বিপিনের পাশের সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া আপনিই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সকলের আনন্দের মধ্যে নিজেরও একটু স্থান করিয়া লইবার সঙ্কোচকুণ্ঠিত চেষ্টা করিতেছিলেন। বিপিন ঘরে গিয়া দেখিল, মালতী একাকিনী মেঝেতে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া আছে। তখন তাহার অবগুণ্ঠন নাই, বেশবাস শ্লথ, দীর্ঘ কেশরাশি মেঝের উপর লুণ্ঠিত। এই অনাবরণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ লজ্জিত বিপিন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। মালতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আপনাকে সম্বৃত আবৃত করিল।

এক মুহূর্ত্ত উভয়েই নীরব। লজ্জিত স্মিত হাস্যে মালতীর দিকে চাহিয়া বিপিন বলিল—খুড়িমা কোথায়?

মালতী চকিতে একবার বিপিনের দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া নতমুখে ধীরস্বরে বলিল—ঐদিকে গেছেন।

—আমি পাশ হয়েছি।

—শুনেছি।

বিপিন বলিল—মা তোমাকে ডাকছেন, তুমি এস।

মালতী স্মিতপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—আপনি চলুন, আমি যাচ্ছি।

বিপিন আনন্দাতিশয্যে বিহ্বল হইয়া ঘর হইতে বিদায় লইতে ইতস্তত করিতেছে, এমন সময় নবকিশোর ঝড়ের মতন ঘরে প্রবেশ করিয়া বজ্রকণ্ঠে বলিল—বিপিন, বিপিন শুনেছ, কি অত্যাচার হয়ে গেছে!

নবকিশোরের রোষঘূর্ণিত চক্ষু, বিস্ফারিত নাসা, উদ্ধত ভাব দেখিয়া মালতী ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া রহিল; বিপিনের মুখ শুকাইয়া গেল। বিপিন শুষ্ক ওষ্ঠ জিহ্বা দ্বারা ভিজাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে?

নবকিশোর তেমনি আকাশভেদী রবে বলিল—তোমার কাকা, কাকা!...নিবারণ মুখুয্যের কথা শুনে কালীতারাকে পথে তাড়িয়ে দিয়েছে!

বিপিন স্তম্ভিত নির্ব্বাক। নবকিশোর তেমনিভাবেই বলিতে লাগিল—ভাবছ কি? তোমার জ্ঞাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতে হবে। কালীতারার প্রসববেদনা হয়েছে শুনে নিবারণ মুখুয্যে গিয়ে মেজবাবুকে বল্লে—'ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে না দিলে তোমাকে আমরা একঘরে করব'। আর ছোটবাবুও অমনি সুবোধ শিশুর মতন সেই অসহায়াকে দরোয়ান দিয়ে বাড়ী থেকে দূর করে দিলেন। এই সব ধর্ম্ম! এঁরা সব সমাজপতি! ধন্য তোমাদের নিবারণের ভয়, যে, সে অন্যায় করতে বললেও প্রতিবাদ করবার শক্তি কারো নেই।......নাও, বিলম্ব করবার সময় নেই, তুমি কালীতারাকে খুঁজে নিয়ে এস, নিজের বাড়ীতে আনতে সাহস না হয় আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেয়ো। আমাকে এখুনি নবিনগরে যেতে হচ্ছে, সেখানকার পুলিশ-দারোগা স্বদেশী পাঠশালায় রাজদ্রোহ শিক্ষা দেওয়া হয়, বোমা তৈরি করা হয় বলে পাঠশালা থেকে আসমতকে ধরে নিয়ে গেছে। গাঁয়ের লোকেরা ভয়ে পাঠশালায় ছেলে পাঠানো বন্ধ করেছে; আমায় একবার সেখানে এখনই যেতে হচ্ছে। কালীতারার

ভার তোমার ওপর, দেখো যেন কর্ত্তব্য অবহেলা কোরো না।

নবকিশোর বিপিনের হাত ধরিয়া বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। মালতী স্তম্ভিত নির্ব্বাক একাকী দাঁড়াইয়া রহিল।

মালতী কিছুক্ষণ পরে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, বাড়ীময় একটা কি যেন অমঙ্গল-আশঙ্কার ছায়া পড়িয়াছে। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ, দৃষ্টি চকিত, বাক্য স্তব্ধ। আনন্দ-উৎসবের সূত্রপাতেই সমস্ত পণ্ড হইয়া গেল। রাঁধুনি রাঁধিতে রাঁধিতে রান্না নামাইয়া বসিয়া আছে; যে তরকারি কুটিতেছিল সে বঁটী কাত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে; জয়া পূজার জোগাড় করিতে করিতে চন্দনমাখা হাতেই দৌড়িয়া আসিয়া গিন্নিকে বলিতেছে—বৌ বৌ, গোবর্দ্ধন ত পূজো করতে করতে কিশোরের মুখে বাপের নাম শুনেই দৌড় দিয়েছে, ঠাকুর টাটের ওপর বসানোই আছেন! পূজো করবার, ভোগ দেবার কি হবে?

গিন্নি শুনিয়াও কাঠের মতন শক্ত হইয়া নিরুপায়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সমস্ত লোকের প্রাণচেষ্টা যেন মন্ত্রপ্রভাবে সংরুদ্ধ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে!

বিনিও আজ অনর্গল বকিতেছে না, সে একলাটি এককোণে পা ছড়াইয়া বসিয়া তাহার রং-ওঠা গা-ফাটা কাঠের পুতুলটিকে আস্তে আস্তে চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইতেছে, কিন্তু ঘুমপাড়ানিয়া গান আজ মুখে সরিতেছে না।

বিনোদও আজ অকারণে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে লাফাইয়া বেড়াইতেছে না। সেও বিনির কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

মালতী আসিয়া বিনিকে কোলে করিল। বিনি তাহার গলা জড়াইয়া চুপিচুপি বলিল—মাতী দিদি, তুপ তুপ, দাদাঠাকুল আগ কলেছে, মালবে।

মালতী বিনোদের হাত ধরিয়া তুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল—চল তোমরা আমার ঘরে, আমরা খেলা করিগে।

বিনি জোর করিয়া মালতীর গলা জড়াইয়া তাহাকে গমনে বাধা দিয়া বলিল—না না, মাতী দিদি, আবাল দাদাঠাকুল আছবে।

মালতী তাহাদের লইয়া সেইখানেই বসিল। গিন্নি অর্থহীন উদাস দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

(ক্রমশঃ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভুঁই-কুমীর

পশু জগতে যেমন এক শ্রেণীর জীব উদ্ভিদ খাইয়াই জীবন ধারণ করে। কীট জগতেও তেমনি এক শ্রেণীর জীবের উদ্ভিদই জীবনসম্বল। পশু জগতে যেমন অন্য একশ্রেণীর জীব কেবল মাংস খাইতে ভালবাসে তেমনি কীট-রাজ্যেও অন্য এক দল বিশেষ ভাবে আমিষ-ভোজী।

পশু জগতের আমিষ ভোজী জীব গুলি যেমন অত্যন্ত তৎপর ও ফন্দীবাজ কীট জগতের মাংস ভোজী জীবগণও তেমনি ধূর্ত্ত ও তৎপর। কীট-রাজ্যে মাংসভোজী অনেক শ্রেণীর কীট আছে—অদ্য যে কীটের বিষয় বলিতে যাইতেছি—তাহাকে ইংরাজীতে "The Ant-lion" বলে। বঙ্গদেশে কীট

ও পতঙ্গ পর্য্যবেক্ষণের তেমন আবশ্যকতা কোন দিন অনুভূত না হওয়ায়—কীটও পতঙ্গদের কোন নাম নাই। কেবল যেগুলো কীট আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত অর্থাৎ যাহারা সব সময়ই আমাদের নজরে পড়ে তাহাদের নামকরণ আমরা করিয়া লইয়াছি—যথা গুবরেপোকা গুটিপোকা মাকড়সা মশা মাছি ইত্যাদি। পর্য্যবেক্ষণের কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া কীটের নামকরণ এদেশে খুব অল্প লোকেই করিয়াছেন।

ইংরাজীতে যাহাকে "The Ant-lion" বলে—বঙ্গদেশে সে কীটের অভাব খুব বেশী আছে বলিয়া ত মনে হয় না, অন্তত: পক্ষে এই অঞ্চলে উক্ত কীটের ছড়াছড়ি। কীট ও পতঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইয়া আমাদের হাতে এই কীট আসিয়া পড়ায় —আমরা ইহাদের শিকার ধরার উপায় ও প্রণালী দেখিয়া ইহাদিগের নাম দিয়াছিলাম "ভূঁই-কুমীর"। ইংরাজী গ্রন্থে পর্য্যবেক্ষণের রচনা পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে উক্ত কীটের শিকার ধরার উপায় ও প্রণালী প্রত্যক্ষ করিয়াই ইংরাজী পর্য্যবেক্ষক মহাশয়গণ উহার নাম "The Ant-lion" দিয়াছেন। আমাদের মনে হয় বাংলায় "ভূঁইকুমীর" নামে উক্ত কীটকে অভিহিত করায় কোন দোষ হয় নাই। অবশ্য এটা খুব ঠিক যে "Ant-lion" বলিলে পিপড়ের সিংহ যে খুব একটা ভয়ানক হইবে এটা কথনই কেহ অনুমান করিবেন না। পক্ষান্তরে "ভূঁই-কুমীর" বলিলে কীটের ক্ষুদ্রায়তনের প্রতি কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন অর্থাৎ "ভূঁই-কুমীর" একটা বৃহৎ কোন স্থল জন্তু কল্পনা করা অসম্ভব নহে। সুতরাং "ভূঁই-কুমীর" না বলিয়া "কীট-কুম্ভীর বা "কীট-সিংহ" বলা চলে। যাহা হউক এটা একটা নাম। খুব বেশী যুক্তির মধ্য দিয়া নামকরণ না হইলে যে বিশেষ ক্ষতি আছে তাহা বোধ হয় না। নামের পরেই নামের পরিচয় পাইলে নামের প্রতি আর তেমন নজর থাকে না।

ভূঁই-কুমীর

"ভূঁই কুমীরের দেহের আয়তন খুব বৃহৎ না হইলেও তিনি যে শ্রেণীর জীবের পক্ষে কুমীর বিশেষ, সেই শ্রেণীর জীবের দেহের তুলনায় ইহাঁদের দেহ যে বড় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করা চলে না।

ভূঁইকুমীর এক জাতীয় ছোট কীট, অঙ্গের গড়ন অনেকটা "সিন্দুরে কীট পোকা" বা "বীরবউটির" অঙ্গের গড়নের অনুরূপ। বর্ষা ঋতুতে মাটির উপর ও ঘাসের মধ্যে "সিন্দুরে পোকা" নামে মখ্‌মলের মত পালিস সিন্দুরে বর্ণের এক জাতীয় কীটের আবির্ভাব হয়। অনেক সময় ছোট ছোট ছেলেরা (ছোট বেলায় আমি নিজেও) ইহাদিগকে একটি শিশিতে ভরিয়া তন্মধ্যে কিছু ভিজা চাউল দিয়া

ছিপি দ্বারা শিশির মুখ উত্তমরূপে (পাছে কীট বাহির হইয়া যায়) বন্ধ করিয়া দেয়। ইহাতে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে, পোকার গায়ের রং চাউলে লাগিয়া চাউল লাল হইয়া যায়।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে কৃষকদের ও অন্যান্য অনেক ব্যক্তিদের ধারণা যে এই কীট মেঘের মধ্যে জন্মলাভ করে। ক্ষেত্রে যে অনেক শস্য হইবে এই বার্ত্তা ইন্দ্রের রাজ্য হইতে ইহারা বহন করিয়া মেঘ হইতে বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে ধরায় অবতরণ করে। এইজন্য যে বৎসর অতি বৃষ্টির জন্য এই কীটের সংখ্যা অধিক হয় সে বৎসর কৃষকদিগের মনে আনন্দ ধরে না। উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা এই কীটকে "বীরবউটি" নাম দিয়াছেন। যাহা হউক এই কীট যে মেঘে জন্মলাভ না করিয়া মাটিতেই জন্মগ্রহণ করে আপাতত এইটুকু বলিয়া—পুনরায় আলোচ্য "ভুঁই কুমীরের কথা বঁলি।

কুম্ভীর জলের মধ্যে বাস করে ও জলের ভিতরেই স্বীয় বাসস্থানে নিজের শিকারকে লইয়া যথাকর্ত্তব্য সম্পন্ন করে—"ভুঁই-কুমীরও তেমনি বালুর অভ্যন্তরে নিজের বাসস্থানে স্বীয় শিকারকে লইয়া গিয়া উদর পূজা সমাপ্ত করে। "ভুঁই-কুমীর" বালুর মধ্যে একটি গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। এই গর্ত্ত ছোট ছোট পিঁপড়েদের পক্ষে ভয়ানক ও মারাত্মক।

ইহারা মাটির ভিতরে প্রবেশ করিয়া ও সামনের পায়ের সাহায্যে নীচে হইতে মুখ ক্রমাগত উপরে মাটি ছুড়িতে থাকে—এই গর্ত্তের আকার এবং গড়ন অনেকটা—কালি না পড়ে এমন একটি গোলমুখো চার পয়সা দামের দোয়াতের মুখের মত হইয়া যায়। গর্ত্তের চারি পাশের দেয়াল অত্যন্ত পালিস ও সামান্য উঁচু।

ছোট ছোট পিঁপড়ে কিম্বা ঐ রকম আয়তনের অন্য কোন কীট ভুলক্রমে একবার ঐ ভয়ঙ্কর গর্ত্তের দেয়ালের উপর উঠিয়া পড়িলে তৎক্ষণাৎ গর্ত্তের ভিতরে পড়িয়া যায়। গর্ত্তের ভিতরে বালুর মধ্যে "ভুঁই কুমীর তাহার মাথা বালুর মধ্য হইতে ঈষৎ বাহির করিয়া বসিয়া থাকে সুতরাং শীকার গর্ত্তের মধ্যে পড়িবামাত্র সে তাহাকে এক লাফে ধরিয়া ভিতরে টানিয়া লয়। অনেক সময় পিঁপড়ে গর্ত্তে পড়া মাত্র জীবন রক্ষা করিবার জন্য গর্ত্তের দেয়াল বহিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করে, কিন্তু "ভুঁই কুমীর নীচে হইতে ক্রমাগত বালুকণা উর্দ্ধ দিকে নিক্ষেপ করায় সে আর উপরে উঠিতে না পারিয়া জীবন হারায়। প্রদত্ত চিত্রের প্রতি চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে গর্ত্তের মধ্যে "ভুঁই কুমীর" চিংড়ি মাছের মত দুটি পা বাড়াইয়া শীকার ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে।*

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

* ইংরাজ পর্য্যবেক্ষণগণ বলেন এই কীট অবশেষে জল ফড়িং জাতীয় পতঙ্গে পরিণত হয়। আমরা স্বচক্ষে এখনো তাহা দেখি নাই বলিয়া প্রবন্ধে একথা উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করিলাম না।

সমুদ্রবক্ষে*

সেদিন সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি পাঠ করিলাম,—

"(বলগনী সংবাদদাতার পত্র

"২২শে জানুয়ারি

"একটা আকস্মিক ভয় অদ্য দুই বৎসর যাবৎ মৎস্যজীবিদিগের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে। ক্যাপটেন জ্যাভেলের মৎস্য ধরিবার জাহাজ খানি বন্দরে প্রবেশ করিবার সময়, কি করিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়া জেটীর অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রে আহত হইয়া শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া যায়।

"লাইফ-বোট ও লাইফ-বয়ার সহায়তায় অন্যান্য সকলে প্রাণ পাইলেও একটি বালক এবং চারিজন পুরুষকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এখনও পর্য্যন্ত জল-বায়ুর যেরূপ ভীষণ প্রকোপ রহিয়াছে, তাহাতে এরূপ বিপদ আরও ঘটিবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে।"

এই ক্যাপটেন জ্যাভেলটি যে কে তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। একি সেই ছিন্ন-হস্ত মৎস্যজীবির ভ্রাতা ?

হতভাগ্যের নিজের জাহাজখানি ভাঙ্গিয়া গেল এখন সে বোধ হয় সমুদ্রের লোনা জলে হাবুডুবু খাইয়া জীবন রক্ষার শেষ চেষ্টা করিতেছে। এই জাহাজের জাল রক্ষার জন্য তাহার ভ্রাতার হাতখানিকে ইতিপূর্ব্বে সে বলিদান দিতে সঙ্কোচ করে নাই। হা-ভগবান! এ বুঝি তাহার সেই কর্ম্ম ফলেরই প্রতিশোধ! সে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ঠিক আঠার বৎসর পূর্ব্বে।

দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ জ্যাভেল তখন এক খানা জেলে-জাহাজের ক্যাপটেন ছিল। সকল প্রকার মৎস্য ধরিবার জাহাজের মধ্যে এই "জেলে-জাহাজ" শ্রেষ্ঠ; সকল প্রকার ঝড়-ঝাপটা সহ্য করিবার উপযোগী করিয়া গঠিত। যেমন ঝড়ই হউক না কেন, এ-জাহাজ শোলাখণ্ডের ন্যায় উত্থাল সমুদ্র উর্ম্মির উপর নাচিয়া ফিরিত। মাথার উপর বায়ুশূন্য পাইল, নিম্নে একখানা কড়ির মত মোটা কাঠের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ একখানি জাল। সমুদ্র মধ্যে যে কোন প্রাণীই থাক্ না কেন, এ জালের হাত হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার উপায় ছিল না। জলমগ্ন পর্ব্বত গহ্বরের সুপ্ত প্রাণী, বালুকার উপরের রোহিত মৎস্য, তীক্ষ্ণ দাঁড়াসম্পন্ন কর্কট ও সূক্ষ্ম করাত পরিহিত গল্‌দা প্রভৃতি নানা প্রাণীকেই জাতি ও শ্রেণী নির্ব্বিভেদে এই জালের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইত।

বাতাস যখন ফুরফুরে এবং সমুদ্র যখন শান্ত সেই সময় এই জাহাজ মৎস্য ধরিতে যাত্রা করিত। জলটা তখন সেই মোটা কাঠে বাঁধা; আর দুই পাশে

* বিখ্যাত ফরাসী গল্প লেখক Guy De monpassant কর্ত্তৃক রচিত এ গল্পটি ইহার ইংরাজী অনুবাদ কর্ত্রী Mrs. Ada Galsworthyএর অনুমতি অনুসারে বাঙ্গলাতে অনুদিত।—লেখক।

চাপ রাখিবার জন্য লোহার কাঠি, তুইটী রসির সাহায্যে জাহাজের তুই পার্শ্বের তুইটি রোলারের উপর দিয়া নিম্নে নামান।

জাহাজের সম্মুখ ভাগে সমুদ্রউদ্ভিদ বিনষ্ট করিবার উপযোগী একখানা তীক্ষ্ণধার ফলক সন্নিবিষ্ট। বেগে অগ্রসর হইবার সময় ইহা তাবৎ উদ্ভিদের মূলচ্ছেদ করিত!

জ্যাভেলের সহিত চারিজন কর্ম্মচারী, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও একজন বালক ছিল। মৎস্য ধরিবার জন্য বেশ সহজ বাতাসেই সে সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিল। শীঘ্রই কিন্তু বাতাস বেগে বহিতে লাগিল; একটা ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও সে জাহাজ ফিরাইতে পারিল না, তীব্র বেগে জাহাজ সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলিল।

ইংরাজাধিকৃত তটের দিকে জাহাজ চালাইলেও উন্মত্ত সাগরউর্ম্মি জলমগ্ন শিখরে আহত হইয়া এমনি ভীমবেগে আসিয়া জাহাজে বাধা দিতেছিল যে তখন কোন বন্দরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। ক্ষুদ্র জাহাজখানি সেদিকে যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া ফরাসী অধিকৃত তটের দিকে চলিতে চাহিল; কিন্তু উন্মত্ত সমুদ্র সেদিকেও জেটীর নিকট পৌঁছিতে দিল না; নিকটবর্ত্তী সকল বন্দর ফেনিল সমুদ্রের বাষ্পে অন্ধকার হইয়া গেল; একটা বিকট হুঙ্কার, প্রলয়ের বিশাল রব দিকে দিকে গর্জ্জিয়া উঠিল।

পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউগুলি একবার আকাশের দিকে তুলিয়া পরমুহূর্ত্তে পাতাল গর্ভে নামাইয়া দিতে লাগিল। এমন দুর্য্যোগেও জাহাজখানি ডুবিল না, তুইটি বন্দরের মধ্য স্থানে জোয়ারের মুখে কুটার ন্যায় এপাশ ওপাশ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অবশেষে তীর হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইয়া উত্থাল তরঙ্গ মুখে নৃত্য করিতে থাকিলেও ক্যাপটেন জাল নামাইতে আদেশ দিলেন।

সুবৃহৎ জালখানি নামাইবার জন্য তুই পার্শ্বে তুইজন করিয়া চারিজন লোক দাঁড়াইয়া সেই ভীষণ ভারযুক্ত লৌহ সমন্বিত জালখানি নামাইয়া দিল। ভারাকৃষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে জালখানি নামিতে লাগিল, তুই পার্শ্বের রোলারের উপর দিয়া দড়িগুলি দ্রুত নামিতে লাগিল। এই সময় জালের একটা ঝাপটায় জাহাজখানি এক পাশ হইয়া গেল; ধারে দাঁড়াইয়া জ্যাভেলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া দড়িটা ধরিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভারাকৃষ্ট বৃহৎ দড়ি ও রোলারের মধ্যে তাহার হাতখানি আটকাইয়া গেল। জ্যাভেলের ভ্রাতা অপর হস্তে দড়িটা তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। সেই বিপুল ভারাক্রান্ত দড়ি তখন দারুণ বেগে নিম্নে নামিতে ছিল ক্ষুদ্র মানব একাকী তাহা সরাইতে পারিল না।

যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া উঠিল। সকলে তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল। সকলে মিলিয়া সেই কাছির-তল হইতে তাহার হস্ত মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না।

একজন কর্ম্মচারী বলিয়া উঠিল,—"কেটে ফেলতে হবে।" এই বলিয়া সে পকেট হইতে একখানি দীর্ঘ ধারাল ছোরা বাহির করিল; সে অস্ত্রের একটী আঘাতেই জ্যাভেলের ভ্রাতার হাতখানি কাটিয়া যাইতে পারিত।

কাছিটা কাটিয়া দিলে জাল খানা সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে। জাল ডুবিয়া গেলে অনেকগুলি টাকায় হাত পড়িবে—প্রায় পোনের শ' ফ্রাঙ্ক। সেটা জ্যাভেলের সম্পত্তি, সে এটা ছাড়িতে চাহিল না। মর্ম্মাহত জ্যাভেল বলিল,—"না, কেটনা, দাঁড়াও। আমি জাহাজের মুখ হাওয়ার দিক থেকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।" ছুটিয়া গিয়া সে হালের হাণ্ডলটা ঘুরাইয়া দিল; কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। ভীষণ বায়ু বেগে পাগলের মত জাহাজ ছুটিয়া চলিয়াছিল সে ফিরিবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করিল না; তাহা ছাড়া জাল ফেলায় জাহাজের পাশ ফিরিবার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

জ্যাভেলের ভ্রাতা যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইতেছিল না। জ্যাভেলের প্রাণে ভয় হইতেছিল পাছে তাহার কর্ম্মচারিরা জালের দড়ি কাটিয়া ফেলে! কাজেই সে জাহাজ ফিরাইতে অকৃতকার্য্য হইয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল,—"দাঁড়াও দাঁড়াও দড়ি কেটনা, জাহাজ এখনি নঙ্গর ক'রছি।"

তখনই নঙ্গর ফেলিয়া দেওয়া হইল; নঙ্গরের দীর্ঘ শৃঙ্খল ভীষণ শব্দে সমুদ্র গর্ভে নামিয়া গেল। এইবার দড়ি তুলিবার চাকাটা এক পাক ঘুরাইয়া দিয়া দড়ির অধোগতি নিবৃত্ত করা হইল; এতক্ষণ পরে একজন সহকারী চেষ্টা করিয়া জ্যাভেলের ভ্রাতার হস্তটা টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। তাহার জামার হাতাটা রক্তে সিক্ত হইয়া গিয়াছিল।

জামার হাতাটা গুটাইয়া দিতেই এক ভয়াবহ দৃশ্য দৃষ্ট হইল; বাহুর মাংস দড়িতে পিশিয়া পিণ্ডাকৃতি ধারণ করিয়া ছিল এবং তাহা হইতে উৎসের ন্যায় রক্তধারা ছুটিতেছিল। লোকটা হস্তের দিকে চাহিয়া বলিল,—"এ ত, জন্মের মত গেছে!" রক্তের স্রোত ডেকের উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দেখিয়া একজন বলিয়া উঠিল,—"হাতটার শিরের মুখ গুলো বেঁধে দেওয়া দরকার, নইলে ক্রমাগত রক্তস্রাব হয়ে এখুনি ও মরে যাবে যে!" এই বলিয়া সে একটা মোটা ন্যাকড়া লইয়া তাহার ক্ষতস্থানে বাঁধিতে লাগিল। শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিবার পর রক্ত স্রোত ক্রমশ কম হইতে হইতে একেবারে থামিয়া গেল।

জ্যাভেলের ভ্রাতা উঠিয়া দাঁড়াইল; পার্শ্বে তাহার ভগ্ন হস্তখানি ঝুলিতেছিল; অপর হস্তে সেখানি ধরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল; দেখিল হস্তখানি জন্মের মত গিয়াছে, ভিতরের হাড়টা একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে কেবল মাংসপেশীর জন্য সেটা তখনও দেহে লিপ্ত ছিল! যন্ত্রণা পীড়িত চিন্তিত মুখে সে হাতখানি সস্নেহে

দেখিতে লাগিল। পার্শ্বে পতিত একখানা পাইলের উপর সে বসিয়া পড়িল; একজন কর্ম্মচারীর উপদেশে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর নিকটের একটা বালতি হইতে জল লইয়া পুনঃপুনঃ ক্ষতস্থান সিক্ত করিতে লাগিল।

তাহার ভ্রাতা আসিয়া বলিল,—"এখানে বসে আছিস কেন, তুই নীচেয় যা।" সে দাদার কথায় তখন নিম্নতলে চলিয়া গেল বটে কিন্তু আবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে ডেকের উপর আসিল; নিম্নের নির্জ্জনতা তাহার ভাল লাগিল না। আর তাজা হাওয়াটাও তখন তাহার প্রয়োজন। কাজেই সে আবার 'পূর্ব্বস্থানে বসিয়া ক্ষতস্থানে জল ঢালিতে লাগিল।

সেদিন যথেষ্ট মৎস্য পড়িয়াছিল। জ্যাভেলের ভ্রাতার পার্শ্বেই একটা বৃহৎ শ্বেত মৎস্য পড়িয়া মৃত্যুশ্বাস টানিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে লম্ফ প্রদান করিতেছিল। সে সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া বসিয়া ক্ষতস্থানে জল সেচন করিতে লাগিল।

জাহাজখানা বলগনির কাছাকাছি আসিবামাত্র আবার বাতাসটা নূতন উদ্যমে বহিতে আরম্ভ করিল। বাত্যাহত হইয়া উত্থাল তরঙ্গমালার উপর নৃত্য করিতে করিতে আবার উন্মত্তের ন্যায় দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য ভাবে ছুটিয়া চলিল। নৃত্যরত জাহাজের ডেকে বসিয়া বেচারা জ্যাভেলের ভ্রাতা ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি হইল। প্রভাত পর্য্যন্ত বায়ুর বেগ সমান রহিল। প্রভাত হইলে ইংরাজাধিকৃত তীরভূমি দৃষ্ট হইল; তখন সমুদ্র শান্ত হইয়া আসিতেছিল কাজেই জাহাজ সে দিকে না গিয়া ফরাসী অধিকৃত তীরের দিকেই অগ্রসর হইল।

বৈকালে ক্ষতটা দেখাইবার জন্য জ্যাভেলের ভ্রাতা কয়েকজন কর্ম্মচারীকে ডাকিল। সেটা এমনই বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে তখন সেটাকে দেহের একটা অংশ বলিয়া চিনিবার উপায় ছিলনা। কর্ম্মচারীরা দেখিয়া আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করিল।

একজন বলিল,—"হুঁ পচ্ ধরেছে দেখছি।

আর একজন বলিল,—"ওতে নোনা জল ঢালা উচিত।"

বলিয়া খানিকটা সমুদ্র জল আনিয়া ক্ষতস্থানে ঢালিয়া দিল। রোগী লাফাইয়া উঠিল, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া একবার মুখ বিকৃত করিল কিন্তু চীৎকার করিল না।

লবণের জ্বালা একটু কম পড়িলে সে ভ্রাতাকে বলিল,—"তোমার ছুরিখানা একবার দাও ত।"

জ্যাভেল ছুরিখানা বাহির করিয়া দিল।

"হাতটা ঠিক সোজা ক'রে ধর; শক্ত ক'রে ধোরো যেন ছেড়ে যায় না।"

তাহার প্রার্থনা মতই কার্য্য হইল।

এইবার সে স্বয়ংই কাটিতে লাগিল। সেই ক্ষুরের মত ধারাল ছুরি দিয়া অবিকম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে সে ছিন্ন হস্ত কাটিয়া ফেলিল। বাকি রহিল কেবল

একটা মাংস পিণ্ড। একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিল,—"কেটে ফেলতেই হ'ত; তা নইলে প্রাণ নিয়ে টান প'ড়ত।"

অতঃপর সে যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইল। ক্রমাগত দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্ষতাংশের উপর জল সেক করিতে লাগিল।

প্রভাত হইলে জ্যাভেলের ভ্রাতা ছিন্ন হস্তটা কুড়াইয়া লইয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার সহকর্ম্মীরা আসিয়া সেটা হাতে লইয়া নাড়িয়া নাড়িয়া দেখিতে লাগিল। সকলেই তাহার এই ক্ষতিতে সহানুভূতি প্রকাশ করিল।

জ্যাভেল বলিল,—"এইবার ওটা ফেলে দে'না, আর কেন?"

কথাটা শুনিয়া জ্যাভেলের ভ্রাতা বিরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল—"না, আমি থাকতে তা হবে না। ওটা যখন আমার হাত, তখন ওতে ত তোমার কোন দাবী নেই।"

সে ছিন্ন হস্তটা লইয়া জানুর মধ্যে চাপিয়া রাখিল।

জ্যেষ্ঠ বলিল,—"তা ও ত' দিন দিন পচতেই থাকবে!"

এই সময় কনিষ্ঠের মনে একটা মৎলব আসিল। জাহাজ কোন দূরদেশ হইতে মৎস্য ধরিয়া আনিলে ধৃতমৎস্য লবণের জারের মধ্যে রাখা হইত। ইহাতে মৎস্য পচিত না।

সে জ্যেষ্ঠকে বলিল,—"জারের ভিতর এটা রাখতে পারি?"

"হ্যাঁ, তা পার।"

তখন কয়েকজন মিলিয়া একটা মৎস্যপূর্ণ জার খালি করিয়া ফেলিল। সর্ব্বপ্রথম ছিন্ন হস্তটা রাখিয়া তাহার উপর লবণ চাপা দেওয়া হইল, তাহার পর এক এক করিয়া মৎস্যগুলি তাহার উপর রাখিয়া দিল।

একজন কর্ম্মচারী বিদ্রূপের স্বরে বলিল,—"আশা করি এটাও বাজারে মাছের সঙ্গে বিক্রি হ'য়ে যাবে না!"

কথাটা শুনিয়া জ্যাভেল ও তাহার ভ্রাতা ব্যতীত আর সকলেই হাসিয়া উঠিল।

তখনও ঝড় থামে নাই। পরদিনও বেলা প্রায় দশটা অবধি বলগনির কাছাকাছি জাহাজখানা ঘুরিতে লাগিল। আহত ব্যক্তি একবারের জন্যও জল ঢালা বন্ধ করে নাই। মধ্যে মধ্যে উঠিয়া সে ডেকের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত অবধি পদচালনা করিতেছিল তাহার ভ্রাতা কলের কাছে বসিয়া তাহাকে দেখিতেছিল ও মস্তক আন্দোলন করিতেছিল।

অবশেষে তাহারা বন্দরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

ডাক্তার ক্ষত পরীক্ষা করিয়া বলিলেন সেটা ক্রমেই আরোগ্য লাভ করিতেছে। হাতটায় ব্যাণ্ডেজ করিয়া তিনি ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। রোগী কিন্তু ছিন্নহস্তটী না লইয়া শয্যা গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। তখনই সে আবার জাহাজের সন্ধানে বন্দরে আসিল যে জারটিতে তাহার হস্ত রক্ষিত হইয়াছিল সে তাহাতে একটা খড়ির দাগ দিয়া রাখিয়াছিল; কাজেই এখন বিনাক্লেশে সেটাকে বাহির করিল।

তাহার সম্মুখেই জারটা খালি করিয়া ছিন্ন হস্ত বাহির করা হইল; লবণাক্ত হইয়া সেটী কুঞ্চিত হইয়া গেলেও তখনও বেশ তাজা ছিল।

তাহার পুত্র ও পত্নী বহুক্ষণ ধরিয়া সেটী নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। নখের মধ্যে যে লবণের গুঁড়া প্রবেশ করিয়াছিল ব্রুস দিয়া তাহারা সেগুলা ঝাড়িয়া ফেলিল। তাহার পর একটা ক্ষুদ্র শবাধারের মাপ লইবার জন্য ছুতারের ডাক পড়িল।

পরদিন জাহাজের নাবিকরা সেই হস্তের শোক-যাত্রা করিল। জ্যাভেল ভ্রাতৃদ্বয়ই প্রধান শোক-কারী।

গির্জ্জার পুরোহিত শবটী বহিয়া লইয়া চলিলেন।

সেই হইতে জ্যাভেলের ভ্রাতা সমুদ্র গমন বন্ধ করিল। বন্দরে একটা অপেক্ষাকৃত স্বল্প-শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। ইহার পর কাহারো নিকট এই দুঃখের কাহিনী বলিতে হইলে উপসংহারে চুপি চুপি তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সে বলিত,—"দাদা যদি তখন জালের মায়া ছেড়ে দড়িটা কেটে দিত তাহ'লে আর আমাকে এমন নুলো হ'য়ে থাকতে হ'ত না। কিন্তু আমার হাতের চেয়ে জালটাই দাদার কাছে বড় হ'ল।"

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তীর্থ-স্মৃতি

ভকতের হৃদিদ্বার করি উদ্‌ঘাটন
প্রবাহিত ভক্তিস্রোত সঞ্চিতে মনন
করিল মানব তারে, অপূর্ব্ব কৌশলে।
কবি যথা কাব্য রচে, রচনার ছলে
রেখে যায় আপনার চিত্তের সংবাদ
ক্ষণিক আনন্দ তার ক্ষণিক বিষাদ
গাঁথিয়া অক্ষর পাতে; সেইমত জানি
ভকত হৃদয় তার সুগভীর বাণী—
প্রকাশিতে নারে যাহা মানবের ভাষা
তাহারে মূরতি দিবে করেছিল আশা,—
গড়েছিল মূর্ত্তি শত অনিন্দ্য সুন্দর
প্রস্তরে খোদিত করি আপন অন্তর।
সেই হতে শত শত তীর্থ উঠে জাগি
মানব চিত্তের সেই স্মৃতি-চিহ্ন লাগি
ক্ষুধিত মানব মন; তীর্থ দরশনে
চলেছে যাত্রীর দল, নাহি রাখি মনে
অসহ পথের ক্লেশ—রোগ মৃত্যু ভয়
মানব পুণ্যের স্মৃতি হেরিবে নিশ্চয়
আশায় করিয়া ভর।
ছিল এ কামনা
হেরিব তীর্থের সাধ, তীর্থের সাধনা;
আসিনু দেখিতে তাই তীর্থ বুদ্ধ-গয়া,
স্থাপিল যাহাকে ভক্ত স্মরি বুদ্ধ-দয়া—
বুদ্ধের সে মহাতপ সে মহা নির্ব্বাণ
করিবে সাধকে যাহা মহাসিদ্ধি দান
রাখিতে স্মরণে তারে। সাধকের দল
লভিত হেথায় মহা সাধনার বল
আয়োজন তারি তরে, ভকতের সাধ

সাধক লভিবে মহানির্ব্বাণের স্বাদ
বুদ্ধ-স্মৃতি-চিহ্ন ধরি, তাই অভ্রভেদী
সুকঠিন প্রস্তরের বক্ষঃপট ছেদি
মন্দির সৃজন হেন; তাই স্তরে স্তরে
বুদ্ধের অটল মূর্ত্তি গ্রথিত প্রস্তরে
নিশ্চল আসনে বসি মহাবোধিরূপ
দেখান সবারে মহা স্থিতির স্বরূপ;
এ শুধু তাহারি ভাব বক্ষে ধরি রয়
প্রস্তর প্রস্তরই বটে—অন্য কিছু নয়।
নির্ব্বাণ-সমাধি-স্থান, হেরি স্তূপে স্তূপে
রক্ষিত সাধক-শব, প্রস্তরের বুকে
রাখিয়া স্মৃতির চিহ্ন সমাধি বিলীন
বৌদ্ধ সাধকেরা, মহা প্রয়াণের দিন।
নিদ্রিত ভিক্ষুক দল সুপ্ত বৌদ্ধ প্রাণ
হেথায় নির্ব্বাণ ঊর্দ্ধে জ্বলে অনির্ব্বাণ।

শ্রীহেমলতা দেবী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি

জ্যোতিবাবু বলিলেন,—"ক্রমে আমার বাল্যসহচর বন্ধুবান্ধব একে একে সকলেই ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে কৃষ্ণবিহারীও চলিয়া গেলেন। মধ্যে, কৃষ্ণবিহারীর সঙ্গে বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হইত না। কিন্তু শেষাশেষি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব আবার গাঢ়তর হইয়া উঠিল। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। আমরা ছাদের উপর মাদুর পাতিয়া মুখামুখী বসিয়া দুইজনে মন খুলিয়া গল্প করিতাম। যেমন একদিকে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি তাঁহার হৃদয়ও স্নেহমমতায় পূর্ণ ছিল। তাঁহার অসাধারণ মনের বল ও কষ্টসহিষ্ণুতা ছিল। যখন তাঁহার সায়েটিকা রোগের যন্ত্রণা বাড়িয়া উঠিত, তখন তিনি ইণ্ডিয়ান মিরারের জন্য ইংরাজি প্রবন্ধ লিখিয়া সেই যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকিতেন। তাঁহার বাঙ্গলা লেখা অভ্যাস ছিল না—কিন্তু পরে সাধনার বলে, বাঙ্গলা লেখাতেও সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন। তিনি পরে বাঙ্গালা ভাষায় "অশোক চরিত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।"

জ্যোতিবাবুর বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তিনি একটি গান রচনা করেন, তাহাতেই তাহার মনোভাব সম্যক্ ব্যক্ত হয়:—সম্ভবতঃ তাঁহার পত্নী-বিয়োগের পর নিম্নলিখিত গানটি রচিত।

ইমন্—আড়াঠেকা

কি হবে এ জীবনে সেই ধন বিনে।
সঙ্গের সঙ্গী যারা, কে কোথায় চলে গেল,
ফেলিয়ে মোরে একা শূন্য ভবনে॥"

জ্যোতিবাবু স্বাস্থ্যলাভের জন্য ইতিপূর্ব্বে কয়েক বার রাঁচী আসিয়াছিলেন। বারকয়েক রাঁচী আসা যাওয়াতে রাঁচীতে বাস করিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। সেই ইচ্ছার ফলেই তিনি রাঁচীর "শান্তিধামে" এখন বাস করিতেছেন। জীবন কথা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, "এখন এই খানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম! এবং

তোমার পাঠকেরাও হয়ত হাঁপ ছাড়িয়া বলিবেন :—"রাম বল, বাঁচ্‌লাম।"

জ্যোতিবাবুর রাঁচীর বাড়ী, শান্তিধাম, সম্বন্ধে পূর্ব্বে একবার একটু লিখিয়াছি * সুতরাং সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে তাহাতে যে কয়টি কথা লেখা হয় নাই এখানে তাহাই লিখিতেছি।

প্রথম, একটি গুহা। গুহাটি কৃত্রিম নয়। যে পাহাড়ের উপর জ্যোতিবাবুর বাড়ী, তাহারই পশ্চিম দিকে কয়েকটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর এমন ভাবে আছে, যে তাহা দ্বারা আপনাআপনিই নীচে একটি ভীষণ গহ্বর সৃষ্ট হইয়াছে। গুহার ভিতরে স্থান নিতান্ত কম নয়। সাত আট জন লোক সেখানে বসিয়া শুইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে আলাপ করিতে পারে। সম্প্রতি তাহার ভিতরটি বাঁধাইয়া আরও আরামপ্রদ করা হইয়াছে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অন্ধকারও নয়। উপরে নীচে পাশে চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো কালো পাথর। গুহার ভিতরে বসিলে মনে হয় যেন গিরিপ্রস্তরময়ী ধরণীর কোলে বসিয়াছি। তার পাথর গুলির গায়ে ঠেস দিলে বা স্পর্শ করিলে মনে হয় মূর্ত্তিমতী পৃথিবীকেই যেন স্পর্শ করিতেছি। গুহাটির প্রায় ২০০ ফুট নীচে সমতল ক্ষেত।
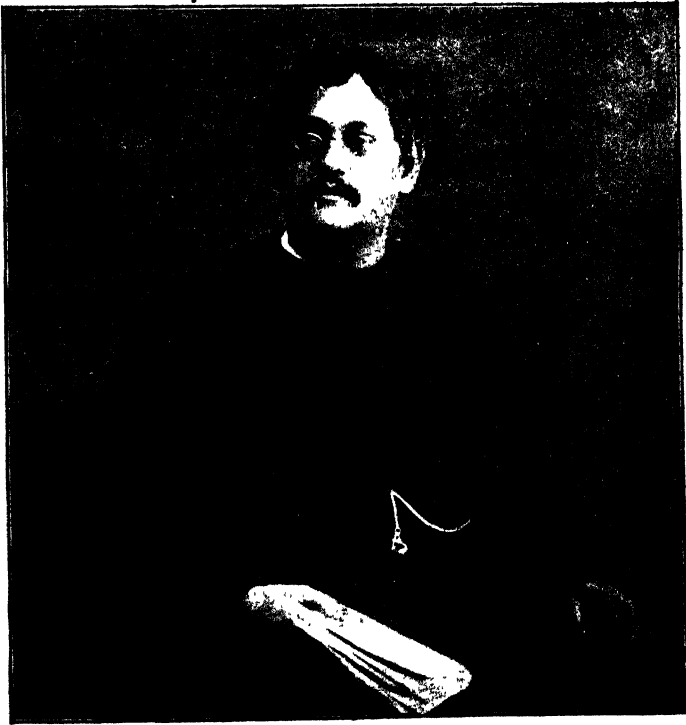
কৃষ্ণবিহারী সেন

* আমালিখিত "সাহিত্যরথী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ"—ভারতী, শ্রাবণ ১৩১৯,

শান্তিধাম

দ্বিতীয়, একটি লতামণ্ডপ। ঠিক এই গুহার নীচে, পাহাড়টির গায়েই এই মণ্ডপটি যেন আঁকা। মণ্ডপটি সমতল ক্ষেতভূমি হইতে একটু উচ্চে অবস্থিত। মণ্ডপের তলাটি বেশ শান্ বাঁধ,ন'—"বেঞ্চি"-গাঁথা। উপরের ছাদে একটি মঞ্চ রচিত হইয়াছে, তাহাতেই লতা-গাছটিকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন সেই লতা-জালে মঞ্চটি আচ্ছন্ন।

মধ্যে মধ্যে জ্যোতিবাবুর এই নির্জ্জন শৈলাবাসে সত্যেন্দ্রনাথও আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তাঁহার সঙ্গীর মধ্যে দুইটি জীব। এক "গঞ্জু" কুকুর, অপর "রূপী" বানরী। রূপীকে আগে দেখি নাই, এই-বার দেখিলাম। তাহার হৃদয় মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ। রূপীর কোলে একটি ছোট কুকুরের বাচ্ছা। একদণ্ডও সে বাচ্ছাটিকে ছাড়িয়া দেয় না। বাচ্ছাটি মাতৃহীন, রূপীও বন্ধ্যা। কুকুর-বাচ্ছাটি রূপীর স্তন পান করে, এবং দিন রাত্রি তাহার নিকটেই থাকে। কেহ বাচ্চাটিকে লইতে গেলে রূপী এক-বারে সিংহীর মত তাহাকে আক্রমণ করিতে আসে। বাচ্ছাটি রূপীর বক্ষঃস্থল আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিয়াছে তবুও সে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখে। রূপী যখন যায়, তখনও বাচ্ছাটিকে এক হাতে ধরিয়া থাকে, পাছে সে পলাইয়া যায়। এই

শান্তিধামে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

বাচ্ছাটি আজ কয়েক দিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে, রূপী দিন দুই প্রায় অভুক্ত ছিল। কেহ যদি "আয় আয়" বলিয়া চুম্‌কারি দিত, অমনি সে একবারে সচকিত নেত্রে চাহিয়া চারিদিক খুঁজিত, ভাবিত বুঝি সে আবার ফিরিয়াছে! হায়রে মাতৃস্নেহ! আগে জানিতাম কুকুরে ও বানরে কখনই বনে না। কিন্তু মাতৃস্নেহের নিকট আজ সে জাতিগত পার্থক্য কোথায়? শান্তিধামে, সবই শান্ত, সবই পবিত্র!

এই জন্যই বুঝি শান্তিধামের দর্শক-সংখ্যা এত বেশী! প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে বেলা ১০টা সাড়ে দশটা ও অপরাহ্নে ৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দর্শকের ভিড়। সকলের জন্যই দ্বার অবারিত। বাড়ী ঘর সারাদিনই খোলা পড়িয়া আছে, ফটকও দিবারাত্র অরুদ্ধ, যে-কেহ আসিয়া সব পরিদর্শন করিয়া যাইতে পারে, কাহাকেও কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করিতে হয় না। কিন্তু সাহেবেরা যখন দেখিতে আসেন, তখন নীচে হইতে আগে অনুমতি লইয়া তবে উপরে উঠেন। যদিও এরূপ অনুমতির কোন প্রয়োজন নাই, তাঁহারাও জানেন।—তথাপি একটা ভদ্রতা বা সভ্যতাসূচক কায়দার জন্য তাঁহারা বিনা অনুমতিতে কখনও উপরে আসেন না।

এই স্থানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই এ প্রবন্ধ শেষ করিব। জ্যোতিবাবু একদিন * আমায় কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে "আজ-কালকার স্কুলের পড়ান'তে আমার আস্থা নাই। যে রকমে ছেলেদিগকে পড়ান হয় সে যেন অনেকটা বেগার-ঠেলা কাজ, না করিলে নয় এই ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ছেলের কি পড়িতে ইচ্ছা, কিসে অনিচ্ছা, কোন্‌টা তাহারা শীঘ্র শিখিবে, কোন্‌টা তাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ—তার কোন' বিচারই করা হয় না। পরীক্ষা যাহা হয় সে শুধু বানান্ ও মানে মুখস্থ, এবং ধারাপাতের আবৃত্তি। ছেলের যে কি ক্ষমতা বা কোন্ বিষয়টি কোন্ ছেলে শীঘ্র ধারণা করিতে পারিবে—এই অত্যন্ত দরকারী বিষয়টাকে একবারে উপেক্ষা করা হয়। ছেলেদের জন্য যে একটা Routine করে দেওয়া আছে, চোখ বুজে সেই রুটিনেরই তারা অনুসরণ করে।

"আমার মতে প্রাথমিক শিক্ষা রামায়ণ মহাভারতে যতটা হয় এমন বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। আজকাল শিশুপাঠ্য নামে অনেক পুস্তকই প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু সেগুলি বাস্তবিক শিশুর উপযোগী কিনা একটা চিন্তার বিষয়। শিশুর নমনীয় হৃদয়খানিকে ভাবের, ধর্ম্মের, কল্পনার, জ্ঞানলিপ্সার, ধারণার উপযোগী বিষয় সে সব পুস্তকে একত্র আছে কিনা সন্দেহ। এই হিসাবে, শিশুদের উপযোগী করিয়া রচিত রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক ধর্ম্মগ্রন্থগুলি অমূল্য।"

পূজনীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ এই কথা স্বীকার করিয়া জ্যোতিবাবুর প্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রণালীর অনুমোদন করিলেন।

* ৩টা আগষ্ট, রবিবার ১৯১২

জ্যোতিবাবু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি পুত্র ও একটি কন্যার শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন, আমি গতবার দেখিয়া গিয়াছিলাম। শিক্ষাপ্রণালীটি একটু অদ্ভুত-প্রকারের বলিয়া তাহার পরিচয়ও একটু এই প্রসঙ্গে দিব।

শিশু দুইটি গান শেখে, পিয়ানো শেখে, সর্ব্বদা "দাদাভাই"-এর স'হত গল্প করে—আবার পড়ে এবং অঙ্ক কষে। দুইজনের বয়সই আট বৎসরের ভিতর।

জ্যোতিবাবু সুবীরেন্দ্র ও মঞ্জুর দুই খানি খাতা বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ছেলেদের মত কয়েকটি কবিতা ও গান; প্রথমতঃ সেই কবিতা মুখস্থ করিয়া গান করিতে হয়, তারপর সেইটি পিয়ানোতে বাজাইতে হয়—তাহারও স্বরলিপি আছে। আবার যেটি যেমন কবিতা, তার পাশে তদনুরূপ একটি চিত্রও আছে। একাধারে ভাব, ছন্দ ও রূপশিক্ষার প্রণালী আমার এই নূতন দেখা। চিত্রগুলি কোনটি কালিতে, কোন'টি পেন্সিলে, কোনটি বা দুই তিন রঙের কালিতে। বলা বাহুল্য এগুলি সবই জ্যোতিবাবুর হাতের আঁকা। শিশুদের জন্য বলিয়া সেগুলিতে চিত্র সম্পদের অভাব কিছুই নাই।

এইরূপ অধ্যাপনার কিরূপ সুফল ফলিয়াছে তাহারও একটু পরিচয় এইখানে দিতেছি :—

জ্যোতিবাবু বলিলেন সেই "দেশ দেশ" গানটা গাওত?" অমনি সুবীর ও মঞ্জু দুই ভাই বোনে গাহিতে লাগিল :—

মিশ্র ঝিঁঝিট।

দেশ দেশ ভাই আমাদের দেশ
সকল দেশের আগে সে কোন্ দেশ,
ভাই আমাদের দেশ॥
উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর
পুবে দক্ষিণে ভাই পাহাড় মনোহর
—ভাই পাহাড় মনোহর—
তার মধ্যে মায়ের আঁচল, সোনা ঢালা বেশ,
গাছ গাছালি ক্ষীরের নদী, সোনা ধানের ক্ষেত
—ভাই আমাদের দেশ॥
ঝিকিমিকি সূর্য্যি উঠে, রেতে ফুটে তারা,
চাঁদের জ্যোছনা ভাই যেন ফটিক ধারা
—ভাই যেন ফটিক ধারা।
এমন দেশ ভাই আছে কোথায়, এমন সোনার দেশ,
মায়ের কোলে দেশের ছেলে আমরা আছি বেশ
—ভাই আমাদের দেশ॥

সুবীর অতি নিপুণভাবে পিয়ানো বাজাইয়া গাইতে লাগিল, ছোট্ট বোন মঞ্জু দাদাটির পাশে দাঁড়াইয়া অতি চমৎকার কোরাসে গাইল। এই গানটির পাশেই ভারতবর্ষের মানচিত্র। এই এক গানেই ছেলেদের মনে স্বদেশের রূপ, ও স্বদেশের ভক্তি যে কিরূপ পরিস্ফুট হয়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়।

এর পর জ্যোতি বাবু বলিলেন, "সেই থিয়েটারটা কর' ত? অমনি একটা ত্রিপদ টেবিলের নীচে মঞ্জু বুড়ী হইয়া বসিল, আর জ্যোতিবাবু পিয়ানোতে বসিলেন, সুবীর হাত ছানিয়া তপন আহ্বান করিতে করিতে গাইতে লাগিল :—

'আয় রদ্দুর হেনে, ছাগল দিব মেনে,
ছাগ্লির মা' পাগ্লি, ক'খান্ কাপড় পেলি?"

মঞ্জু গাইল,

সুবীর ও তাহার ভগিনীদ্বয়

"ছ'খান্ কাপড় পেলুম্, ছ' বৌকে দিলুম্ (ছয়টি পুতুল ছয়টি বৌ) (কাঁপিতে কাঁপিতে) আপনি মরি জাড়ে কলা গাছের আড়ে।"

সুবীর গাইল,

"কলা পরে টুপ্ টাপ্, বুড়ী খায় গুপ্ গাপ্।"

তার পর, দুইজনেই হাসিয়া গড়াগড়ী!

খাতাতেও এমনি একটি ছবি আছে। বুড়ী কলা গাছের নীচে উপবিষ্ট। কলা পড়িতেছে পাশে ছয়টি বৌ দাঁড়াইয়া আছে, অদূরে একটি বালক হাত ছানিয়া রৌদ্র আহ্বান করিতেছে।

এইরূপ প্রায় ২০।২৫টি কবিতা পড়া হইয়া গিয়াছিল। জ্যোতিবাবু নিজে আবাল্য সঙ্গীতানুরাগী এই জন্য সঙ্গীতকেও তিনি শিশুদের শিক্ষার পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দিয়া কৌশলে, হাসি-তামাশা গান-নাচের মধ্য দিয়া অধ্যাপনার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। জ্যোতিবাবুর ছাত্রেরাও অল্প দিনের মধ্যে অনেকটা শিখিয়াছে।

বেশ বুঝা গেল, শিক্ষাশালায় শুধু বেত ও নীরস বানান মুখস্থের স্থান একটুও নাই।

(সমাপ্ত)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

তীর্থ দর্শন

স্থান মধুপুর। শরৎকাল, বর্ষার পর শুভ্রস্বচ্ছ মেঘ, রাত্রে জ্যোৎস্নার ফুটফুটে আলো, শেফালি ফুলে গাছতলা ছেয়ে গেছে, মধুর গন্ধে মন মাতিয়ে তুলছে, প্রকৃতির শোভা দেখে যেন আর আশা মেটে না, এই সময় আমাদের পরামর্শ হোল—আরো সুদূর পশ্চিমে গিয়ে তীর্থ দর্শন করে আসা যাক। আমরা অনেকগুলি লোক একত্র হয়ে দল বেঁধে যাত্রা করলেম। মধুপুর থেকে রাত ১০টায় ট্রেণে উঠতে হয়। গাড়ীতে উঠে জানালা দিয়ে দেখলেম, বাইরে ঘোর অন্ধকার, আকাশ নক্ষত্রে ছেয়ে রয়েছে, জোনাকী পোকা দপ দপ করে জ্বলছে আর নিবছে, ঝিল্লি ঝিঁঝিঁরব করছে। ঈশ্বরের সৃষ্টির যে কত রকম কারিগিরি! আর ইংরাজদেরই বা কি রকম বুদ্ধিকৌশল, কত দূরের জায়গা কেমন এক সূত্রে বেঁধে ফেলেছে। সম্মুখের গতিশীল দৃশ্য দেখতে দেখতে কেমন যে মুগ্ধ হয়ে পড়লেম—সে রাত্রে আর ঘুম হোলনা। সূর্য্য যখন আস্তে আস্তে উদয়াচলে উঠলেন—তখন আমরা আগরায় এসে উপস্থিত হলেম। এই থান থেকে গাড়ী বদল করে মথুরায় যেতে হয়।

আমাদের একজন আত্মীয় আমাদের জন্য মথুরার একজন শেঠের বাড়ী ঠিক করে রেখেছিলেন, মথুরায় পৌঁছে আমরা সেই বাড়িতে উঠলেম। বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আসবাব পত্রেরও কোন অভাব নেই, খাবার জিনিসও আমাদের তারা দিয়ে গেল—বিদেশে এসে আর কোন বিষয়েই ভাবতে হোলনা।

ফুলসজ্জায় দেখলুম বাড়ীর বাগানটি ভরপুর, গন্ধে দিক যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছিল! সেদিনটা আমরা বাগানে ঘুরেই কাটিয়ে দিলেম। পরদিন মন্দির দর্শনে বার হওয়া গেল।

কংশটিলা যেখানে কংসকে কৃষ্ণ বধ করেছিলেন অনেকটা উঁচু; একটা ছোট পাহাড়ের মত স্থান; তার উপরে একটি ছোট ঘর; সেই ঘরে কংস চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন আর কৃষ্ণ বলরাম পাশে তীর ধনুক নিয়ে কংসের প্রতি লক্ষ্য করছেন। সব মূর্ত্তিই মাটির নির্ম্মিত।

ফেরবার সময় রাস্তায় এসে দেখা গেল মাটির নীচে থেকে আগেকার পুরাতন দ্রব্য সব খুড়ে বার করেছে। দেখবার জন্য কৌতূহল হতে লাগলো কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল বলে দেখা হলো না।

একটা বসতির পাশ দিয়ে চলেছি, হঠাৎ চীৎকার উঠলো "বাঙ্গালী আয়া হ্যায়।" আর অমনি যে যেখানে ঘরের কাজে রত ছিল—সব ফেলে "ভিক্ষা দাও" বলে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো, তার মধ্যে ছোট ছেলে কম নয়। আমরা অবশ্য ভিক্ষা দিলেম—তারা সন্তুষ্ট হোল কিনা জানিনা। তাদের চীৎকার ত নিবারণ হোল না। এই রকম ছোট ছেলেদের ভিক্ষা করতে দেখলে বড়

কষ্ট হয়। ভবিষ্যতে ওদের কি দশা হবে! উপার্জ্জনে আর মন দেবে না।

একদিন শেঠেদের একখানা বজরা করে যমুনার উপর আরতি দেখতে গেলেম। বড় প্রদীপের ঝাড় জ্বেলে যখন আরতি আরম্ভ হোল তখন তার ছায়া জলে পড়ে যেন যমুনায় আলোর বিজুলি খেলতে লাগলো! সেদিন আবার রামলীলা, নৌকা করে ছোট দুটি ছেলেকে রাম লক্ষ্মণ ও একটি মেয়েকে সীতা সাজিয়ে জরির কাপড় পরিয়ে বনবাসে দিতে চলেছে। সাজসজ্জায় তাদের সুন্দর দেখাচ্ছিল।

যমুনায় কি কচ্ছপ! সিঁড়ির কাছে ছোলা ভাজা খাবার জন্য এসে তারা যেন জল ঢেকে ফেল্লে! জলে যেন কচ্ছপের মেলা লেগে গেল!

মথুরার রাস্তায় যখনই বার হওয়া যেত—দেখতে পেতেম, ছোট বাছুরগুলির কারু ঘাড়ের উপর কারু পিঠের উপর খুর সমেত পা ঝুলচে। এই রকম একটা আধটা নয়—প্রতি রাস্তাতেই প্রায় দেখা যেত। পয়সা উপার্জ্জনের বেশ একটা উপায় বটে!

একটি সুন্দর ভাব ওদেশে দেখে বড় মোহিত হয়েছি। পশু পক্ষী মানুষে এখানে এমন সদ্ভাব! ষাঁড় গরু কেমন রাস্তায় খেলা করছে, বানরের ত কথাই নাই, পালে পালে হুপহাপ করে এ বাড়ী ও বাড়ী লাফিয়ে বেড়াচ্চে, কারও কোন অনিষ্ট করতে দেখি নাই, খাবার পেলেই সন্তুষ্ট। ময়ুর ময়ুরী মনের আনন্দে মাঠে মাঠে নৃত্য করে, মানুষরা তাদের প্রতি কোনই অত্যাচার করে না।

মথুরা থেকে বৃন্দাবন বেশীদুর নয়। সকালবেলা গাড়ী করে যেতে দু তিন ঘণ্টা লাগে মাত্র; এখানেও শেঠেদের একটি বাড়ীতে গিয়ে আমরা আড্ডা করলেম। বামুন ঠাকুরকে আমাদের রাঁন্নার বন্দোবস্ত করে দিয়ে আমরা সকালেই দেবালয় দেখতে বাহির হলেম। বাড়ীর কাছেই একটি মন্দির সেইখানে গিয়ে দেখা গেল একটি ঘরে ছোট একটি সিংহাসনে কৃষ্ণরাধিকা রয়েচেন,—একজন টানা পাখার বাতাস করছে। দালানটি চকচকে মার্ব্বল পাথরের। যাঁরা মন্দির করেছেন সেই পাথরেরই গায়ে তাদের মুখ আঁকা রয়েছে। এক-জনের একটা চোখ কানা, সেই ছিল ম্যানেজার! তার মনিব নাকি বড় বাড়ী করতে হুকুম দিয়েছিল কিন্তু সে অল্প টাকা খরচ করে ছোট বাড়ী করে দিয়ে কানা হয়ে গিয়েছে। এই মন্দিরের আসবাব অনেক, বড় বড় রঙ্গিন ঝাড়, দেওয়ালগিরী, তার সঙ্গে অল্প দামের কতকগুলি ইংরাজি মেমদেরও ছবি!

মন্দির দেখে আমরা যমুনায় স্নান করতে গেলেম। এখানে কচ্ছপ তেমন বেশী নেই। রোদ্দুরে ঘুরে নদীতে অবগাহন স্নান করে কি যে আরাম পাওয়া গেল তা আর বলবার কথা নয়; মনে হলো এই আরাম থেকেই 'মা গঙ্গা' এই শব্দ মুখ দিয়ে আপনা হতেই বেরিয়ে যায়।

স্নান আহার করে বিকেলে আবার আমরা মন্দির দেখতে বাহির হলেম। শেঠদের একটি মন্দিরের সম্মুখে, উঁচু থামের মত একটি সোনার গাছ; ভিতরে কৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গে একদিকে রাধিকা একদিকে

বিশাখা। যত মূর্ত্তি দেখা গেল সব ছোট ছোট, কেবল লালাবাবুর লালাজি ঠাকুরটি বেশ' বড়; যেন ছোটো একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে মনে হয়। আমাদের যেতে একটু বিলম্ব হয়েছিল তখন ঠাকুরের সব ভাল সাজ খুলে তাঁকে একখানি ধুতি চাদর পরিয়ে শয়ন করাতে নিয়ে যাচ্ছিল, বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল, যেন ছোট একটি ছেলে ধুতি পরে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানকার পূজারী বল্লেন তোমাদের খুব সৌভাগ্য এ রকম শয়নের বেশ দেখলে, এ বেশ সর্ব্বদা দেখা যায় না।

বৃন্দাবনের নিধুবন এখন আর কুঞ্জবন নেই, এখানে কেবল বানরেরই রাজত্ব। আমরা ছোলা ভাজা নিয়ে তাদের ছড়িয়ে দিতে লাগলেম, তবে তারা পথ করে দিলে। নিধুবনে এখন কেবল বড় বড় কতকগুলা গাছ পড়ে আছে ফুল ফল কিছুই নাই; তার শুকনা পচা পাতাতে বনভূমি আচ্ছন্ন।

একটি মন্দিরে দেখলেম রাধিকা মান করে আছেন, কৃষ্ণ পায়ে ধরে মান ভঞ্জন করছেন; বাইরে দুটা পচা জলের কুণ্ড রয়েছে। একটা বিশাখা কুণ্ড একটা রাধিকা কুণ্ড। রাধিকা ও বিশাখার একদিন রাত্রে জল তৃষ্ণা পাওয়াতে কৃষ্ণকে বল্লেন আমরা জল খাব বড় তৃষ্ণা পেয়েছে, কৃষ্ণ কি করেন অত রাত্রিতে জল কোথায় পান তার বাঁশী দিয়ে মাটি খুঁড়ে জল বের করলেন। সে ডোবার জল সবুজ রঙ্গের। সেই পচা জল সকলকে খেতে দিয়ে পাণ্ডারা পয়সা আদায় করে। আমরা খেলেম না, মাথায় ছড়িয়ে দিয়ে পয়সা দিলে।

এখানে ভিখারীর অন্ত নাই চারিদিকে যেন মাছির মত ছেঁকে ধরে। একস্থানে কৃষ্ণ কালিয়া দমন করেছেন। সাপের মাথায় কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন নাগকন্যারা দু পাশে দাঁড়িয়ে যোড় হাতে কৃষ্ণের স্তব করছেন। কৃষ্ণের যতরকম লীলা আছে সকলেরই মূর্ত্তি করে রেখেছে। এই সব দেখে আমরা বাড়ী ফিরে এলেম; কেবল গোকুল আর গিরি-গোবর্দ্ধনটা দেখা হলো না।

হিন্দুধর্ম্মের যে কতটা প্রভাব সাধারণ লোকদের মধ্যে এখনও আছে তীর্থ স্থানে গেলে তাহা বেশ বোঝা যায়; কিন্তু মেয়েদের ভিতর ভক্তির ভাব যেরূপ প্রবল পুরুষদের মধ্যে সে রকমটা নেই। আরতির সময় মেয়েরাই দেখলেম যোড় হাতে দাঁড়িয়ে আছে, আরতির শেষে ভক্তিভরে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করছে।

বৃন্দাবন মথুরা দেখে আমরা হিন্দুর তীর্থ থেকে একবারে মুসলমানের কীর্ত্তিরাজ্য আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করলেম। তাজ দেখে যে মনে কি রকম ভাব হোল তাহা অবর্ণনীয়। সম্মুখের ফটক থেকে তাজমহল যেন একখানি ছবির মত। দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। তাজমহল পৃথিবীর মধ্যে সত্যিই একটা আশ্চর্য্য জিনিস। কিন্তু সাজাহান তাজ বিবিকে যে কত ভাল বাসতেন এই তাজে তার যে মূর্ত্তিমান নিদর্শন পাওয়া যায় সেইটি আরো সুন্দর। তাজবিবি মৃত্যুর সময় বলেছিলেন আমার গোর যেন চির স্মরণীয় হয় তাই সাজাহান সে আজ্ঞা পালন করে গেছেন। কি রকম পাথরের সব কারুকার্য্য! পাথর সব এখনও যেন সাদা ধপ ধপ করছে,—দেখলে মনে

হয় আজিকারই তৈরী; তাজের নানা রকম পাথরের রঙে যখন জ্যোৎস্না প'ড়ে ঝকমক করে উঠে তখন যে কি চমৎকার দেখতে হয় যিনি তা না দেখেছেন তিনি বুঝতে পারবেন না।

সেকেন্দ্রাবাদে আকবর বাদসার গোরও দেখে এসেছি। অত বড় বাদসার গোরস্থানও তাজের তুলনায় নগণ্য। প্রীতির এমনই মাহাত্ম্য! একটি ঘরে তিনটি গোর রয়েছে মধ্যের বড়টি আকবর বাদসার। তার দুদিকে দারার দুটি কন্যার গোর। সম্মুখের ঘরের দেয়াল সোনার জলের লতাপাতা দিয়ে সাজান। কিন্তু একদিকটা পুড়ে কাল হয়ে রয়েছে; গোয়ালিয়ার রাজার লোকেরা এসে নাকি পুড়িয়ে দিয়েছে। আকবরের সমাধি সাদা মর্ম্মর পাথরের। উপরের সাজ সোনা দিয়ে মোড়া ছিল সোনাগুলো খুলে নিয়ে এখন গিল্‌টী করে রাখা হয়েছে। এই গোরের ফটকে ফার্সীতে অনেক বয়েদ লেখা। একটা লাইনের অর্থ এই যে, এই সব যে দেখছ এর কিছুই চিরস্থায়ী নয়। একটি বস্তু যিনি আছেন তিনিই চিরস্থায়ী। এ সব লয় হয়ে যাবে তাঁর কিন্তু বিনাশ কখন হবে না।

এই সব কীর্ত্তি কাণ্ড দেখলে মন যেন কেমন উদাস হয়ে যায়, যারা এত কাণ্ড করে গেল তাদের বংশে ত কেহ দেখবার লোক রইল না!

একদিন কেল্লা দেখতে যাওয়া গেল; সেখানে অনেক দেখবার জিনিস। খাস-দরবার আমদরবার, বেগমদের স্নানের ঘর, শিশ মহল মচ্ছিভবন ইত্যাদি। মচ্ছিভবনে বাদসা বেগমদের নিয়ে মাছ ধরতেন। সিসমহলে রঙ্গিনকাচ বসান তাতে আলো পড়লে চমৎকার দেখায়। লাল নীল আলোর আভাতে ঘর উজ্জল হয়ে উঠে। উঠানে বড় বড় সব গোলাপ জলের ফোয়ারা রয়েছে তাতে বাদশারা স্নান করতেন; বাদসার এই প্রাসাদ ভবন এক সময়ে কত হাসি তামাসা আমোদ আহ্লাদে ভরপুর ছিল!

একটা ছোট অন্ধকার ঘর দেখালে বেগমদের মধ্যে কেহ কোন দোষ করলে সেইখানে তাকে শেষ করে ফেলত। সে ঘরটা দেখলে যেন আতঙ্ক হয়। আকবরের হিন্দুবেগম যোধাবায়ের মহলে তাঁর পূজা গৃহে লাল পাথরের গণেশ আর দেবদেবীর মূর্ত্তি এখনো রয়েছে। জাহাঙ্গীর যে রাস্তা দিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন সেটা দেখলে বোধ হয় প্রকাণ্ড রাস্তা নয়। একটা ছাতে বড় একটা কাল পাথর পড়ে আছে—তার উপর বসে নাকি বাদসা হাতীর লড়াই দেখতেন। পাথরের উপর একটা গোলা এসে পড়েছিল বলে একটা গর্ত্ত হয়ে রয়েছে। জাহাঙ্গীরের পুস্তকখানার দেওয়ালে তক্তা টাঙ্গান রয়েছে তাতে পুস্তক সব সাজানো থাকত। তক্তাগুলি পোকায় কাটেনি যেমন তেমনই আছে। ঔরঙ্গজেব তার বাপকে যেখানে কয়েদ করে রেখেছিলেন সে ঘরটি দেখলে বড় কষ্ট হয়। একটী ছোট ঘর তাতে দরোজা জানলা কিছুই নাই। শীতে গ্রীষ্মে কি কষ্টই অত বড় বাদসা ভোগ করেছেন। তাঁর ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না অথচ তাঁর মত দুঃখের জীবন একজন সামান্য

লোকেরও দেখা যায় না। ওই দুঃখের মধ্যেও সাজাহানের একটি কন্যা তাঁর সান্ত্বনা স্বরূপ তাঁর কাছে ছিলেন। সাজাহান মৃত্যুর সময় বলেছিলেন আমাকে একবার তাজমহল দেখতে দাও তাজ দেখতে দেখতে আমি মরব। এ প্রার্থনা তাঁর গ্রাহ্য হয়েছিল। তাজ দেখতে দেখতে, তিনি মরেছিলেন। তাজের পাশেই তাঁর এবং তাঁর কন্যার গোর রয়েছে। মৃত্যুর পরেও দুজনে এক স্থানেই শয়ন করে আছেন।

আগ্রা থেকে তিন চার মাইল দূরে কৈলাস বলে একটা স্থান আছে সেখানে যমুনায় যোধবাই স্নান করতে যেতেন। স্নান করে উঠে তীরে একটি শিবালয়ে তিনি পূজা করতেন। যমুনার ঘাট পাথর দিয়ে বান্ধান; ঘাটে বড় বড় সিঁড়ি, সিঁড়ির দু দিকে দুটা নহবত খানা পাশে কাপড় ছাড়বার একটা ছোট ঘর, স্নান করে উঠে সেই ঘরে রাণী কাপড় ছাড়তেন; শিবালয় সংলগ্ন একটা পুরাতন বটগাছ মাটিতে প্রায় নুয়ে পড়েছে, গাছটি দেখে অনেক দিনকার গাছ বলেই মনে হয়; এমন নির্জ্জন স্থান পূজা করবারই উপযুক্ত, আমরা এসে যমুনায় স্নান করে স্নিগ্ধ হয়ে বসে পূজারী ব্রাহ্মণের কাছে সব ইতিহাস শুনতে লাগলেম।

এখন আর শিবের তেমন আদর নেই মন্দির অমনি অযত্ন অবস্থায় রয়েছে, কেহ কখন যায় ত পূজা দেয়। সে স্থানটি এমন চমৎকার নির্জ্জন যে আমাদের ছেড়ে আসতে ইচ্ছা করছিল না। যমুনা কুলকুলরবে বয়ে যাচ্ছেন গাছের ডালে পাখীরা কলরব করছে—বড় মধুর। আগ্রার সব জায়গাই প্রায় দেখা হয়েছে কেবল ফতেপুর সিকড়ী দেখা হলো না। সেটা হচ্ছে সাজাহানের গুরুর গোর।

আমরা আগরা থাকতে থাকতেই সেখানকার ভদ্র লোকদের সখের থিয়েটার হয়ে গেল। বিষয়টা ছিল ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। এত বাজে লোকের ভিড় হয়েছিল পুলিষের লোকেরা পর্য্যন্ত তাদের আটকে রাখতে পারে না, সবাই সিদ্ধি খেয়ে ষ্টেজের উপরে উঠতে যায়। যারা অভিনয় করছিল তারা অনেক করে বুঝিয়ে বলাতে কিছুক্ষণ ক্ষান্ত থাকে আবার মাতামাতি করে বেড়ায়। তারা কিছুই বুঝতে পারছিল না কেবল গোলমাল করে বেড়ানই তাদের আমোদ।

অভিনয় আমাদের মন্দ লাগল না। হিন্দুস্থানী গান সব যে বুঝতে পারলুম তা না তবে হাবভাবে অনেকটা বোঝা গেল। আলো, দোকান সাজান, গান, অভিনয় সব সমেত আমাদের দেখতে ভালই লাগল।

শ্রীসৌদামিনী দেবী।

নবাব

একাদশ পরিচ্ছেদ

দুর্দ্দিনে।

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিয়াছে। সকাল হইতেই থাকিয়া থাকিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। এখনও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই, ভারী কয়টুকরা কালো মেঘ প্রকাণ্ড কালো পাখীর মতই যেন ডানা মেলিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। পথে বেশ কাদা হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে জলও দাঁড়াইয়াছে। অত্যন্ত শোচনীয় মলিন দৃশ্য! চারিধারেই একটা অপরিচ্ছন্ন নিরানন্দ ভাব যেন জমাট বাধিয়া রহিয়াছে।

এই নিরানন্দ দৃশ্য একটি প্রাণীর হৃদয়ে কিন্তু এক অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছিল। বদ্ধ ঘরে সাশির পাশে সোফাটা টানিয়া আনিয়া তাহাতেই আপন দেহ-ভার লুটাইয়া দিয়া সে এই পথের কদর্য্যতা লক্ষ্য করিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া দুই চারি পশলা বৃষ্টি নামিতেছে—পথে ত্রস্ত পথিক সহসা অমনি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেহ ছুটিয়া অদূরে কোন গাড়ী-বারান্দার তলে আশ্রয় লইতেছে, কেহ বা ভিজিতে ভিজিতেই অপ্রসন্ন মুখে দেহটাকে যথাসাধ্য সঙ্কুচিত করিয়া দ্রুত পথে চলিয়াছে। ঘরের ভিতরকার এই প্রাণীটি এই দৃশ্যে ঈষৎ কৌতুক অনুভব করিতেছিল। সহসা এক পশলা বৃষ্টি নামিলে সে নিকটোপবিষ্টা সঙ্গিনীকে কহিল, "দেখ পরী, আজকে এই বাদলাটা হয়ে ভারী চমৎকার হয়েছে। রাস্তায় লোকগুলো চলেছে, দেখ। অন্য দিন সে কি জাঁক কি জমক করেই সব পথে চলেন, আজ তেমনি জব্দ! কাদা মেখে জলে ভিজে চেহারা হয়েছে, দেখ না! এই জল-কাদার দিনগুলো আমার সুন্দর লাগে, মনটা যখন ভারী থাকে অবশ্য!"

পরী কহিল, "তুমি কি যে বল ফেলিসিয়া—আজ আবার তোমার মনের হল কি?"

"সে কথা থাক্। সে তুমি বুঝবে না, পরী!"

বাস্তবিক ফেলিসিয়াকে বুঝা সহজ ব্যাপার নহে। তাহাকে সামলাইয়া বেড়ানো—এক জেঙ্কিন্স ছাড়া আর কাহারও সাধ্যে কুলাইয়া উঠে না! অথচ ঈশ্বর জানেন, জেঙ্কিন্সের প্রতি ফেলিসিয়ার মনের ভাব কেমন। বেশী দিনের কথা নহে—এই কালই জেঙ্কিন্স আসিয়া দুই ঘণ্টা ধরিয়া ফেলিসিয়ার দরবারে হাজিরা দিয়াছে, অথচ ফেলিসিয়া তাহার সহিত একটাও কথা কহে নাই। জানি না, আজ যে সম্ভ্রান্ত অতিথি মহাশয়ের অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছে, তাঁহার প্রতি ফেলিসিয়া কিরূপ ব্যবহার করিবে!

ফেলিসিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। বৃষ্টির বেগটা বাড়িয়া উঠিল। ফেলিসিয়া সঙ্গিনীকে কহিল, "তুমি ওঠো পরী—দেখগে, কতদূর কি হল। মোদ্দা আর একটা কথা মনে রেখো,

কেউ যদি আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে ত বলো, দেখা হবে না। আমার শরীর ভালো নেই।"

সহসা বাহিরে দ্বারের পার্শ্বে হাসিয়া কে কহিয়া উঠিল, "কিন্তু আমি আজ তোমার সঙ্গে দেখা না করে নড়ছি না, ফেলিসিয়া।"

স্বর শুনিয়া ফেলিসিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ কি! মিনার্ভা যে—গেরি এ সময় হঠাৎ কি মনে করিয়া! ফেলিসিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইল। মুখখানা তাহার রাঙা হইয়া উঠিল, গালে যেন গোলাপ ফুটিল। আপনাকে সামলাইয়া লইয়া হাসিয়াই সে কহিল, "কিন্তু তুমি মিনার্ভা যে এ সময় আসতে পার, তা কে ভেবেছিল, বল। তা কি করে এলে?"

গেরি কহিল, "কেন, দরজা খোলা আছে, চলে এলেই হল ত!"

"দরজা খোলা! তা কর্ত্তার কাজই ত ঐ রকম—বিশেষ আজ আবার এক-জনকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে কি না।"

"নিমন্ত্রণ! ওঃ, ঠিক ও ঘরে তাই দেখলুম বটে, ফুলের রাশ জড়ো করা রয়েছে—যেন একখানা গোটা বাগানই কে তুলে এনে ও ঘরটায় বসিয়ে দিয়েছে। তা এ সৌভাগ্যটা কার?"

ফেলিসিয়া একটা ঢোক গিলিয়া কহিল, "ও কিছু না, কিছু না। এর সঙ্গে প্রাণের কোন সম্পর্ক নেই—নেহাৎ ব্যবসাদারী ধরণের ভোজ এ। তা যাই হোক, বসো, বসো, এই পাশের ইজি-চেয়ারটায় বসো—তোমায় দেখে ভারী খুসী হলুম। পরী তুমি যাও।"

সঙ্গিনী চলিয়া গেল। পল স্থ গেরি বসিল। তাহার প্রাণের ভিতরে কেমন একটা উত্তেজনার স্রোত বহিতেছিল। ফেলিসিয়াকে গেরি আজ বড় সুন্দর দেখিল। এত রূপ! ইহার পূর্ব্বে এমনটি তাহাকে আর সে কোন দিন দেখে নাই। সায়াহ্নের স্তিমিত আলোকে ষ্টুডিও-কামরায় সজ্জিত দৃশ্যাবলীর মাঝে সত্যই আজ ফেলিসিয়াকে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী দেবী-প্রতিমার মতই দেখাইতেছিল। তাহার উপর কণ্ঠস্বরে কি এ লালিত্য! যেন বীণার সুর!

গেরিকে দেখিয়া ফেলিসিয়ারও বড় আনন্দ হইল। এতদিন কেন সে আসে নাই? কোথায় ছিল সে? বোধ হয়, একমাস, না প্রায় দেড়মাস, দুইজনের দেখা হয় নাই! কেন? গেরি কি এ বন্ধুত্ব রাখিতে চাহে না! এমনই কত কথা হইল। গেরি মার্জ্জনা চাহিল—বিশেষ কাজে সে বাহিরে গিয়াছিল, তাই আসিতে পারে নাই। না আসিলেও তাহার কথা কতদিন সে কহিয়াছে—কত দিন!

ফেলিসিয়া কহিল, "বটে! কার সঙ্গে কথাটা হচ্ছিল, শুনি।"

গেরি বলিতে যাইতেছিল, "আলিনের সঙ্গে" কিন্তু কথাটা কেমন বাধিয়া গেল। কোথা হইতে লজ্জা আসিয়া মুখে চাপা দিল। কেন এ লজ্জা,—তাহাই বা কে বলিবে? তবু কেমন লজ্জা হইল। হঠাৎ এমন সময় বিদ্যুতের মত একটা কথা তাহার মনের মধ্যে চমকিয়া উঠিল। সে ভাবিল, একটা মিথ্যা বলিবে সে। হৌক্ মিথ্যা—ইহারই সাহায্যে সে আপনার অভীষ্ট

সাধনেরও উপায় করিয়া লইবে। গেরি কহিল, "এমন একজন ভালো লোকের সঙ্গে,—যাঁর মনে অকারণ তুমি বড় বেদনা দিয়েছ! আচ্ছা, বল ত, নবাবের মূর্ত্তি কেন তুমি গড়ে শেষ কর নি? এটা করলে কতখানি তাঁকে আনন্দ দিতে তুমি! কতখানি তিনি গৌরব বোধ করতেন, যদি এই মূর্ত্তি আজ এক্সিবিসনে ঠাঁই পেত! মনে তিনি বড় আশা করেছিলেন—"

নবাবের নামোল্লেখে ফেলিসিয়ার কেমন একটা গোল বাধিয়া গেল। সে অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "সত্যি, আমি আমার কথা রাখতে পারিনি। কি যে খেয়াল থেকে থেকে আমার মাথায় চাপে। তবে দু-তিন দিনের মধ্যেই আমি কাজটা সেরে ফেলবো। ঐ দেখ, কাপড়ে ঢাকা আছে,—নবাবেরই মূর্ত্তি, মাটিটা এখনও শুকোয়নি।"

"তাহলে যে দুর্ঘটনার কথা শুনেছিলুম—আমি কিন্তু সেটা বিশ্বাস করিনি, জেনো।"

"তোমার ভুল, গেরি। ফেলিসিয়া মিথ্যা বলে না। সত্যই পড়ে গিয়ে মাটিটা তাল পাকিয়ে গেছল—এখনও কাঁচা ছিল, তাই আমি সেরে নিয়েছি—চাও ত এই দেখ।"

ফেলিসিয়া উঠিয়া গিয়া কাপড়ের আবরণ সরাইয়া লইল—কাদায় গড়া নবাবের মূর্ত্তি, সেই সহাস মুখচ্ছবি নিমেষেই গেরি প্রত্যক্ষ করিল। চমৎকার সাদৃশ্য! গেরি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। ফেলিসিয়া কহিল, "ঠিক হয়নি? দু-চারটে আর তুলির আঁচড় টেনে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে—" বলিতে বলিতে সে কোণের টেবিলের উপর হইতে ছোট তুলিটা টানিয়া লইয়া অসম্পন্ন মূর্ত্তির উপর ধীরে ধীরে বুলাইতে লাগিল। পরে মূর্ত্তিটা আলোর দিকে ঘুরাইয়া, নিজের ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার পানে সযত্ন দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "ক'ঘণ্টারই বা কাজ আর! তবে এক্সিবিসনে দেওয়া—? আজ ত হল ২২শে। সবাই নিজের নিজের যা-কিছু জিনিষ পাঠিয়ে ফেলেছে, বোধ হয়! এখন কি আর পাঠানো যাবে?"

"তোমার জিনিষ আবার পাঠানো যাবে না? এত যার লোকবল—"ফেলিসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, এ কথায় ঈষৎ অপ্রসন্নও হইল। তবু কথায় একটু তীব্র জ্বালা মিশাইয়া সে কহিল, "ঠিক বলেছ! ডিউক মোরার আশ্রিত যে—না, না, কোন কথার দরকার নেই, গেরি। আমি জানি, লোকে কি বলে! আর তাদের কথা-গুলোকে আমি এমনি ঘৃণা করতেও জানি—" বলিয়া সে একটা কাদার ঢেলা লইয়া ভূমে নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপর পদাঘাত করিল—"আমার নিজের মনে যদি আমি—কিন্তু থাক্—ও সব কুকথার আলো-চনাও আমি পছন্দ করি না। তবে তোমায় একটা সুখবর দি, শোন, মিনার্ভা, তোমার বন্ধুর মূর্ত্তি এবার সালোঁয় যাচ্ছে; এ তুমি নিশ্চয় জেনো—যাবেই।"

এই সময় হঠাৎ একরাশ ফুলের গন্ধে ঘরটা ভরিয়া গেল। একটা ট্রেতে করিয়া বড় একটা ফুলের তোড়া লইয়া পরী আবার সেই কক্ষে আসিল, আসিয়া ফেলিসিয়াকে কহিল, "এই বড় তোড়াটা টেবিলের জন্য এল! কেমন?"

ফেলিসিয়া কহিল, "বেশ।"

তাহার পর গেরির দিকে চাহিয়া পরী কহিল, "পল, আজ ভারী সুন্দর কেক তোয়ের করেছি, আমি। দুখানা আনব,—খাবে?"

ফেলিসিয়া স্থির কণ্ঠে কহিল, "এখন নয়, পরী—খাবার সময় দিও।"

"খাবার সময়?" পরী অবাক হইয়া গেল। বিস্মিত নেত্রে ফেলিসিয়ার পানে সে চাহিয়া রহিল।

ফেলিসিয়া কহিল, "হাঁ, আমি মনে কচ্ছি, পলকে আটকে রাখবো। এখানে খেয়ে তবে ও যাবে। কেমন গেরি, তোমার কোন অসুবিধা হবে না ত? ছোট-খাট অসুবিধা হলেও আমি তা শুনছি না। আজ এখানে খেয়ে যাও। আমার ভারী উপকারও হবে তাতে—"

গেরি কহিল, "কিন্তু এ পোষাকে—, তাই ত কত ভদ্দর লোক আসবে—"

ফেলিসিয়া কহিল, "কে ভদ্দর লোক? কেউ না—আমরা তিনজনে—শুধু তুমি, আমি আর পরী। ব্যস্—তাতে পোষাক বদলাবার কোন দরকার হবে না, পল।"

পরী বাধা দিয়া কহিল, "কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ, ফেলিসিয়া—আজ কাকে তুমি নিমন্ত্রণ করেছ। আর একটু পরেই তিনি এসে পড়বেন—"

ফেলিসিয়া কহিল, "তার জন্য ভেবো না, তুমি, পরী। আমি এখনি চিঠি লিখে তাঁকে আসতে বারণ করে দিচ্ছি—"

"ফেলি—"

"কোন ভাবনা নেই, পরী। আমি লিখে দিচ্ছি, আমার শরীরটা হঠাৎ খারাপ বোধ হওয়ায় নিমন্ত্রণ স্থগিত হইল। এখন মোটে এই ছটা বেজেছে। সাড়ে সাতটায় খাওয়া—ওঃ, দেড় ঘণ্টা সময় আছে।" ফেলিসিয়া উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া তাড়াতাড়ি টেবিলের ধারে গিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। পরী বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। এ কাণ্ড কি! এমন খামখেয়ালি—

চিঠিখানা খামে মুড়িয়া পরীর হাতে দিয়া ফেলিসিয়া কহিল, "যাও, এ চিঠিখানা এখনই পাঠিয়ে দাও! হঠাৎ যদি কারও শরীর খারাপ হয়—সে ত আর মানুষের হাত ধরা নয়। যাও, বুঝলে, চিঠিখানা পাঠিয়ে দাও।"

ফুলের ট্রে ঘরে রাখিয়া চিঠি লইয়া পরী চলিয়া গেল। ফেলিসিয়া সোফায় আসিয়া বসিল, কহিল, "কি পল, কি ভাবছ?"

পলও অবাক হইয়া গিয়াছিল। ব্যাপারটা তাহার কাছে হেঁয়ালির মতই জটিল মনে হইতেছিল। এ যে রাজার যোগ্য আয়োজন, রাজার অভ্যর্থনার যোগ্যই সাজ-সজ্জার ঘটা! কোন্ ভাগ্যবান অতিথিকে আজ এমন ভাবে বিমুখ করা হইল! আর এ বিমুখ করা তাহারই জন্য! কে সে—কে?—যাহাকে রাখিয়া ফেলিসিয়া তাহাকে এতখানি যত্ন, এতখানি সম্মান করিতেছে—কে সে?

ফেলিসিয়া পলের ভাব দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "আমার খামখেয়ালি দেখে তুমি অবাক্ হয়ো না। যাক্, তোমাকে আর খুলে বল্‌তে কি—তুমি ত আর আমায় বিয়ে করতে যাচ্ছ না! কি বল—? আমার

মত বুনো স্ত্রী নিয়ে সংসার করা চলে না, পল। স্বামী যখন চাচ্ছেন, এখনই তাঁর আনুগত্য করি, আমার ভিতরটা তখন হয়ত রাশ-ছেঁড়া ঘোড়ার মতই অন্য-কোথায় ছুটতে চলেছে! এই মাত্র কি একটা মনে করলুম, ঠিক তার এক মিনিট পরেই মতলব উল্টে গেল—এ-রকম স্ত্রী এক দারুণ অস্বস্তি! আমার কি প্রাণ আছে, না, মন আছে, যে তাকে বশ করব!"

পল এবার কথা কহিল—অনেক দিন ধরিয়া একটা কথা তাহার বুকের মধ্যে বলি-বলি করিয়া ফুটিতে চাহিতেছিল। আজ তাহাকে জোর করিয়া সে ফুটাইয়া তুলিল। পল কহিল, "কিন্তু এইটুকুতেই আমার প্রাণে বাজে, ফেলিসিয়া। তুমি মেয়েমানুষ, সে কথা তুমি ভুলে যাও কেন? মেয়েমানুষ চিরদিনই তার মমতা তার স্নেহ তার ভালবাসা দিয়ে পুরুষকে ঘিরে রাখে, নৈলে বেচারা উদ্‌ভ্রান্ত পুরুষের দল সান্ত্বনা শান্তি কোথায় খুঁজে পাবে? আপনাকে বলি দেওয়াতেই মেয়েমানুষের জীবনের সার্থকতা। নয় কি?"

ফেলিসিয়া আঁধার-ম্লান বাহিরের পানে চাহিয়াছিল, চোখ না তুলিয়াই সে কহিল, "হয়ত তোমার কথাই ঠিক, পল। আমারও থেকে থেকে মনে হয়, এ বুকটা একেবারে খালি—সে খালি জায়গাটা পূরণ না করতে পারলে বুঝি বাঁচবো না। থেকে থেকে কেমন হাঁপিয়ে উঠি। তখন মনে হয়, যদি আমার একটা সংসার থাকত—একজন স্বামী, যাকে দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আঁকড়ে ধরতে পারি,—একটি ছেলে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে যার মঙ্গল কামনা করব—যে আমার পানে চেয়ে থাকবে! আমার এ কাজের মধ্যেও যাদের পানে চেয়ে একটু বল পাব, আশ্রয় পাব!" একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "কিন্তু তা যে হবার নয়। আমার জীবনটা এমনি এলোমেলো হয়ে গেছে, যে আর তাকে নতুন করে বাঁধা যায় না—বাঁধা অসম্ভব! ছেলেবেলায় আমার মা মারা গেছে—বাপের কাছে আমি মানুষ হয়েছি। বাড়ীতে মেয়েমানুষ না থাকায় শুধু পুরুষের কাছে থেকে-থেকেই আমার মনটা গড়ে উঠেছে, তাই পুরুষের মতই সে জেদী হয়ে দাঁড়িয়েছে! কিন্তু হাজার হোক্ আমি ত মেয়েমানুষ। তাই ওদিকেও পুরুষের মত মনটাকে একেবারে খাপ খাওয়াতে পারি নি। ভিতরে পুরুষ আর মেয়েলি ভাবে একটা যুদ্ধ চলেছে। তাই মনটা পুরুষের মত হলেও আমি পুরুষ নই, আবার নিজে মেয়েমানুষ হয়েও ঠিক তাদের মতও নই।"

গেরি কোন কথা বলিল না। তাহার বুকের মধ্যে একটা তরঙ্গ উঠিয়াছিল। প্রাণ আজ একটা কথা বলিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, একবার সে বলে, "ওগো সুন্দরী, বীরাঙ্গনা, এস, আমার কণ্ঠে তোমার ঐ বাহুর মালা পরাইয়া দাও, আমার স্কন্ধে ও শ্রান্ত শির রক্ষা কর—আমি তোমায় ভালবাসি, বড় ভালবাসি—তোমায় পূজা করি, তোমায় বিবাহ করিয়া, এস, আমি নিজে সুখী হই—তোমাকেও সুখী করি!" কিন্তু না, বড় লজ্জা করে। গেরি কোন কথা বলিতে পারিল না। পাছে মনের মধ্যকার এ

কথাটার আভাসও কেহ পায়, সেই ভয়ে সে কেমন শিহরিয়া উঠিল।

ফেলিসিয়া আবার কহিল, "তবে একটা জিনিষ আমি স্থির করে রেখেছি—আমার যদি কখনও মেয়ে হয় ত তাকে কখনও এমন দুর্দ্দশা পেতে দেব না। মেয়েকে মেয়ের মতই মানুষ করব—সে যেন মেয়েই হয়, পুরুষ না হয়।"

গেরি এবারও কিছু বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ফেলিসিয়া আবার কহিল, "আঃ পল, পল, তুমি আজ এসেছ—এতে আমি বড় সুখী হয়েছি, বড় সুখী! তোমার মত একজন বন্ধু আমার পাশে থাকে,—সে আমার বড় সাধ, বড় সুখ। মানুষের উপর আর ঘৃণা জন্মে গেছে—দারুণ ঘৃণা! যাদের এই দিবা-রাত্রি দেখছি, এরা কি মানুষ! যাই হোক পল, আমার সুদিনে দুর্দ্দিনে তুমি আমার পাশে থেকো—এমনি বন্ধুর মত পাশে থেকো—তাহলে আমার বুকে একটা বল পাব, কিছুতে আমি হঠবো না—কেউ আমায় হঠাতে পারবে না। কেন তোমায় এত কথা বলছি, জান, পল? তোমাকে দেখলে আর একজনকে আমার মনে পড়ে। সে আমায় বড় ভালবাসে—তার মত বন্ধুও আমার কেউ নেই। তার মুখ তোমারই মুখের মত—প্রাণটাও ঠিক এমনি! তাই কি তোমায় এত ভালবাসি? ভাবি, দুজনে এত মিল, এত—"

কথাটা শেষ হইল না। পরী আসিয়া কহিল, "একবার এদিকে এস—দেখ, কি হল না হল!"

"চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েছ?"

"তখনই দিয়েছি!"

* * *

রাত্রি সাড়ে আটটা। ভোজের পর সকলে আসিয়া ঘরে বসিয়াছে। গেরি ভাবিল, এই নারীর প্রতি কি অন্যায় অশ্রদ্ধাই সে মনের মধ্যে পুষিয়া আসিতেছিল।

এমন প্রেমময়ী পবিত্রতাময়ী দেবী প্রতিমাকে সে পিশাচিনী পাষাণী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল! কি অন্যায়! এখনই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবে, সব অপরাধ স্বীকার করিয়া নতজানু হইয়া ক্ষমা চাহিবে! কি বলিবে কথাটা সে গুছাইয়া লইল। যেমন বলিবে, অমনি দ্বার খুলিয়া এক দাসী প্রবেশ করিল। দাসী সংবাদ দিল, ডিউকের ওখান হইতে লোক আসিয়াছে, মাদামোসেলের শরীরের তত্ত্ব লইতে।

ফেলিসিয়া কহিল, "বলগে, শরীর তেমনি আছে—তবে বিশেষ খারাপ নয়—ভাবনার কারণ নেই।"

গেরির বুকে সহসা যেন কে ছুরি বিঁধিয়া দিল। সে বুঝিল, এই অতিথির জন্যই আজ এতখানি আয়োজন হইতেছিল, বটে! সে কহিল, "ডিউক মোরার এখানে খাবার কথা ছিল, আজ?"

"হাঁ,—জ্বালাতনে পড়েছিলুম আমি।"

"ডচেসও আসছিলেন?"

"ডচেস? না, সে কেন আসবে? তার সঙ্গে আমার আলাপই নেই।"

গেরি এবার কঠিন হইল—কঠিন স্বরেই সে কহিল, "আমি যদি তুমি হতুম, তাহলে কি করতুম, জানো? ডচেসকে

ছেড়ে শুধু ডিউককে কখনও এ রাত্রি-ভোজে নিমন্ত্রণ করতুম না, ফেলিসিয়া। তুমি বলছিলে, তোমার বুকটা সময় সময় খালি বলে মনে হয়! নিজেই তুমি নিজেকে খালি করে দিচ্ছ? তুমি মেয়েমানুষ, তুমি নিষ্পাপ, কিন্তু এ লোকের কুৎসাটাকে প্রশ্রয় দেওয়া মেয়ে-মানুষের পক্ষে উচিত নয়। আমি তোমায় এসব কুৎসারও ঊর্দ্ধে দেখতে চাই! কথাটা শুনে তোমার কষ্ট হল, ফেলিসিয়া?"

"না, না,—তুমি ঠিক বলেছ, মিনার্ভা। তোমার এ কথা আমি মাথায় তুলে নি। এমন স্পষ্ট, এমন সরল কথাই আমি শুনতে চাই! জেকিন্সের দলের ভদ্রতার পাত-মোড়া কথায় আমার অরুচি ধরে গেছে, ঘৃণা জন্মেছে। আমি ত তোমায় বলিইছি, আমার এমন একজন বন্ধু চাই যে আমার ঠিক বিচার করবে! যাকে আমি আশ্রয়ের মত আঁকড়ে ধরতে পারব!"

তাহার পর ফেলিসিয়া উঠিয়া কাগজে মোড়া একটা ছবি আনিয়া পলের সম্মুখে রাখিল, কহিল, "এই আমার সেই বন্ধুর ছবি, যার কথা বলছিলুম। এমন সরল উঁচু মন আমি ত কখনও দেখিনি। যখনই কোন নীচ বাসনা আমার মনে আসে, তখন আমি এর কথা ভাবি! শুধু মনে হয়, এ কি বলবে। শুধু এই চিন্তাই আমায় দারুণ দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেও রক্ষা করে এসেছে—এরই জন্য আজও আমি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছি, পল!"

পল কোন কথা বলিল না। সে ছবি দেখিতেছিল। এ যে আলিনের ছবি—আলিন জুজ! সেই সুন্দর শুভ্র অমলিন মুখখানি, সেই নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক পবিত্র মূর্ত্তি! আসুক এখন ডিউক মোরা—ইহার পাশে লক্ষ ফেলিসিয়াকেও গেরি তুচ্ছ করিতে পারে!

গেরি কহিল, "এ ছবিখানি আমায় দেবে?"

"স্বচ্ছন্দে। কেমন—চমৎকার মুখ নয়—সুন্দরী নয়? যেমন রূপ, গুণও তেমনি। পৃথিবীর সমস্ত নারী একদিকে, আর এই আলিন অন্যদিকে। শোন পল,—এর সঙ্গে কখনও যদি তোমার দেখা হয়, কখনও যদি এর দেখা পাও—কখনও একে জানবার—"

ফেলিসিয়া কথাটা শেষ করিতে পারিল না। কে যেন কণ্ঠটাকে সবলে চাপিয়া ধরিল। পল ফেলিসিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল,—ফেলিসিয়ার দুই চোখে—সেই সস্মিত সহাস দুই চোখে বড় বড় দুই বিন্দু অশ্রু—মুক্তার মত ফুটিয়া উঠিয়াছে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দশকর্ম্মের ভাষা

ভারতের হিন্দু অধিবাসিগণ ভারতের দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েরই এক একটি ঐশী উৎপত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন। আর্য্য ঋষিগণ মনুষ্য ছিলেন; তাঁহাদের দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। তাঁহারা কেবল স্বপ্রকাশ ব্রহ্মাদেশ ভাষায় ব্যক্ত করিয়া মানবমণ্ডলীকে বুঝাইয়াছেন। এবম্বিধ ধারণা বশতঃ সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা, এবং সংস্কৃত লিপিমালা দেবনাগরী বা দেবতাগণের আবাসস্থল হইতে উৎপন্ন বলিয়া সাধারণ্যে অভিহিত হয়। ভারতের সকল হিন্দু সম্প্রদায়ই ধর্ম্মসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যকলাপ সংস্কৃত ভাষায় সম্পন্ন করিয়া থাকেন। দেবভাষা পবিত্র ভাষা; সুতরাং সমগ্র পবিত্র কার্য্য দেবভাষায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাই হিন্দুর ভারতে কখনও হিন্দু মন্ত্রাবলী দেবেতর ভাষায় রচিত হয় নাই।

কিন্তু যতদিন সংস্কৃত ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা ছিল ততদিন উক্ত মন্ত্রাদির অর্থ বোধ করিতে দেশবাসীকে কষ্ট পাইতে হইত না। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। অনেক দিন হইতেই ভারতের অধিবাসীবৃন্দের সহস্রে একজনও সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে বা বলিতে পারে না। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের ভাষা। ভারতের অনেক ভাষারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ভাবেই সংস্কৃতের সহিত সংস্রব নাই। তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম প্রভৃতি ভাষাকে এই পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। আর সমগ্র হিন্দুজাতিকে পুনরায় অষ্টাধ্যায়ী পাণিনী শিক্ষা দিয়া সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন করিবার কল্পনাও বাতুলের আশা মাত্র। এ অবস্থায় প্রাদেশিক ভাষাই আমাদের ভাব প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন। মানুষ তাহার চিন্তা রাশিকে ভাষায় গড়িয়া তুলিতে পারে বলিয়াই তাহার মহত্ব। ধর্ম্মকার্য্য প্রাণের বস্তু; কাহাকে কি বলিয়া ডাকিতেছি, তাহা যদি হৃদয়ঙ্গম না হইল, তবে ত ভগবানকে ডাকিবার কোন তাৎপর্য্য থাকে না। কার্য্যের সহিত যদি চিন্তাশক্তির উন্মেশ ও সমাবেশ না হইল, তবে জড়ে ও চৈতন্যময় মানুষে পার্থক্য রহিল কোথায়? মানুষ যদি পরের কথায় ভিন্ন নিজে চিন্তা করিতে না পারিল, তবে আর তাহার পৃথক ভাবে চিন্তাশক্তি লাভের কি প্রয়োজন ছিল? চিন্তার রাজ্য যে এখানে রুদ্ধ হইয়া গেল!—দর্শন বিজ্ঞান সবই যে বৃথা! বাস্তবিক আমাদের দেশে সকলই রুদ্ধ হইতে বসিয়াছে বা পূর্ব্বেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা ভগবানকে ডাকিতে হইলেও, এক দুর্ব্বোধ (আমাদের পক্ষে নির্ব্বোধ) ভাষার সাহায্যে ভগবানকে ডাকিয়া থাকি। নইলে যে আমাদের 'জাতি যাইবে'। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা কল্পনাতেও আইসে না। আমাদের জাতীয় সকল ক্রিয়াই ধর্ম্মভাব প্রসূত; কিন্তু বিবাহ, উপনয়ন, পূজা, আরাধনা সকল বিষয়েই এক অবোধ্য, ভাষায় ধর্ম্ম প্রেরণা জাগাইতে হয়।

নির্ব্বোধ চাষা কোন দুর্দ্দৈব বা পাপ-

শান্তির জন্য পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট ব্যবস্থা লইতে গেল। পণ্ডিত মহাশয় ১০।২০ টাকা প্রণামী পাইয়া লম্বা লম্বা কথা জোড়া দিয়া এক "পাঁতি" লিখিয়া দিলেন, কিন্তু হায়, নির্ব্বোধ বুঝিল না, কিম্বা বুঝিবার জন্য ইচ্ছাও করিল না যে সে কি পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইতেছে। কিন্তু তাহার "পাঁতি" যদি তাহার নিজের ভাষায় লিখিত হইত, তবে হয়ত তাহার অপরাধী হৃদয় আপন কর্ম্ম বুঝিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইত! কিন্তু সে যে যন্ত্র হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে এবং যন্ত্রের মত খাটিয়াই বিদায় লইবে।

ইহার কারণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে অবারিত ব্রাহ্মণপ্রভাব ভারতের বিচারশক্তি চিরদিনের জন্য সুপ্ত করিয়া দিয়াছে! লোকের ধর্ম্ম-জ্ঞান ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি দৃষ্টি-শক্তি ও শ্রবণ-শক্তি হীন হইয়া জড়ে পরিণত হইয়াছে। তাই এই চিরন্তন ধর্ম্মকপটতা ও কর্ত্তব্যশৈথিল্য তাহার হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাই বলিতে হয় যে আমরা কলকণ্ঠে সুর চড়াইয়া "আমরা ব্রহ্ম নিষ্ট" "আমরা সত্য প্রত্যাশী" বলিয়া যতই ঘোষণা করি না কেন ফলে কিন্তু আমরা ঘোর ভণ্ড সুতরাং নাস্তিক জাতি হইয়া বসিয়াছি। যাহারা ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে এইরূপ ভিত্তিহীন ভাবে স্থায়ী করিতে চায়, তাহারা দিন দিন ক্ষয় ও ধ্বংসের পথে ছুটিবে না ত কি? এই সব কারণ বশতই ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজের অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতেছে। আমাদের শাস্ত্র এবং শাস্ত্রীয় ভাষা যুক্তি-হীনতা ও হৃদয়হীনতার আশ্রয় ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। Prof Hardayal বড় আক্ষেপেই বলিয়াছেন—

"We have worshipped the Goddess of Sakti (enrgy) for centuries, how is it that we have remained so weak and helpless as a nation? We are the devout worshippers of Saraswati (the Goddess of learning); and at the same time have received a scant share of her blessings. The priests who are the monopolits of the religious rites & ministrations are for the most part as innocent of the Vedie knowledge of the present day as the Sudras were in the days when the gates of knowledge were shut against them by the iron rules of castes. We offer devotions to Lakshmi (the Goddess of wealth) every year and we remain none the less a nation of paupers."

আমরা বেদের ধার ধারি না, কিন্তু, বিবাহ, উপনয়ন, পূজা পার্ব্বণে বৈদিক মন্ত্রের ঘটায় এক একজন বৈদিক সাজিয়া বসি।

সকল দেশেই ধর্ম্ম ও সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ তত্তদ্দেশীয় ভাষায় সম্পন্ন হয়। ইংরাজ তাহার ধর্ম্মের মূল উৎস হিব্রুগ্রীক্ পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী ভাষায় ভগবৎগান গাইয়া থাকে; জার্ম্মান ফরাসী নিজ নিজ ভাষায়

ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আপন পিপাসা পরিতৃপ্ত করে। চৈনিক ও জাপানীয়গণ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল উৎস পালি পরিত্যাগ করিয়া চীন ও জাপানী ভাষায় ধর্ম্মকার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু পারিনা শুধু আমরা? ভারতবাসীর বোধগম্য হউক বা না হউক তাহাকে সংস্কৃত ভাষাতেই ভগবানকে ডাকিতে হইবে; কারণ সে যে দেশাচার ও ব্রাহ্মণ শাসিত একটি যন্ত্রমাত্র।

দেশের পৌরোহিত্য যে কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে তাহাত কাহারও জানিতে বাকি নাই। সকলেই জানেন পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণের ছেলের আর কিছু না হইলেও "দশ কর্ম্ম" করিয়া তিনি জীবন ধারণ করেন। অথচ পুরোহিত নিজেও মন্ত্রার্থ জানেন না, অর্থশূন্য মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেশাচার রক্ষা করেন। প্রাচীন কালে উচ্চারণ-বৈষম্য ইন্দ্রের শত্রু বৃদ্ধি করিয়াছিল। দৈব কার্য্যে দেবভাষার এরূপ নির্য্যাতন কোন ক্রমেই সমর্থিত হইতে পারে না। কাজেই মনে হয়, আমাদের দেশে দৈব কর্ম্মে আমাদের মাতৃভাষা ব্যবহৃত হইলে সুফল ভিন্ন কুফল ফলিবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি কত শত শত বিষয়ে পতিত হইতেছে—এই একটি বিষয়ে কিছুতেই তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে না। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত তাঁহাদের কাছে—এ প্রস্তাব কখনই ভাল লাগিবে না। তাঁহারা নিজে ত সংস্কৃত জানেন্। অন্যের জন্য তাঁহারা কখনও চিন্তা করেন না, বা করিতে আগ্রহও প্রকাশ করেন না। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসম্প্রদায় এই বিষয়ে অভাব উপলব্ধি করিয়া মাতৃভাষাকে দৈবক্রিয়ার ভাষারূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। দেশীয় খৃষ্টানগণও আপন আপন মাতৃভাষাকে তাঁহাদের "দশ কর্ম্মের" ভাষা করিয়াছেন। হিন্দুর কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই। হিন্দুর নিকট এ বিষয়ে কল্পনাও যে একটা অনাচার।

বেদের সময়ে ভারতের প্রত্যেক নিকুঞ্জ হইতেই সামগান গীত হইত; কিন্তু চিরকাল তাহা হইতে পারে না; তাই হয়ও নাই। ভক্তির পুতুল চৈতন্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে, তাহার মাতৃভাষায় যে চিন্তালহরী তুলিয়াছিলেন, তাহা শুধু ব্রাহ্মণের মধ্যে নয়,—চণ্ডালের মধ্যেও ভগবৎভক্তি ও স্বাধীন চিন্তার স্রোত বহাইয়া ছিল। তাই আজও ধানের ক্ষেতে, হাটের পথে, খেয়ার ঘাটেও হরিনামের অমৃত ধারা শুনিতে পাওয়া যায়। বাউল নিতাই প্রভৃতিকে সংস্কৃতে গান গাইতে হইলে, বেদের দেবতার সমাচার যেমন বেদেই বাঁধা পড়িয়া আছে, সেইরূপ কাঙ্গালের ভগবানের সমাচার কাঙ্গাল পাইত না—পুস্তকের মধ্যেই লুকাইয়া থাকিত।

সংস্কৃত পবিত্র দেবভাষা,—সে ভাষা চিরকালই মানব হৃদয়ের ভক্তি আকর্ষণ করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমার নিজ মাতৃভাষা ত অপবিত্র নহে। যে কার্য্য আমার মাতৃভাষায় করিতে পারি না তাহার পবিত্রতা ত উপলব্ধি করিতে পারি না। জানিনা ভারতের সহিত রক্ষণশীলতার কি এক নিগূঢ় সম্বন্ধ। ভারতের ধর্ম্ম চীন জাপানে যাইয়া, ভারতের ভাষা ত্যাগ

করিতে পারিল, মানুষের কার্য্যোপযোগী হইবার জন্য তৎ তৎ দেশীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম ভারতে আসিয়া আবার রক্ষণশীলতায় বাঁধা পড়িয়া গেল। বুঝুন আর না বুঝুন, আরবী ভাষার মন্ত্রে আমাদের মত তাঁহাদিগকেও ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। তাই বলিতেছিলাম রক্ষণশীলতা ভারতের সহিত এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। এমন দিন কি আসিবে না যে যখন ভারতবাসী রক্ষণশীলতার বন্ধন কাটিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে!

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চৌধুরী।

পিপীলিকার সমাধিযাত্রা

নানা জাতীয় পিপীলিকার ভিতরই মৃতদের সমাধিস্থ করিবার প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যভঙ্গ ভয়েই ইহারা এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া অতি সত্বর শবগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া ফেলে বলিয়া অনেকে মনে করেন। পিপীলিকা সমাধির বিস্তৃত প্রণালী MacCook এর বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যাইবে। তিনি বলিতেছেন—

"আমি সকল জাতীয় পিপীলিকাদিগকেই, স্বপক্ষীয় কিম্বা বিপক্ষীয়ের মৃতদেহ সম্বন্ধে একরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। স্বপক্ষীয় আত্মীয়াদির শবগুলির প্রতি ইহাদের একটু সম্ভ্রমের ভাব লক্ষ্য করিয়াছি। অন্যজাতীয় পিপীলিকার মৃতদেহগুলি হইতে ইহারা সমস্ত রসটুকু চুষিয়া খায় অতঃপর শুষ্ক কঙ্কালগুলিকে বাস গৃহ হইতে কিয়দ্দূরে স্তূপীকৃত করিয়া রাখে—কিন্তু স্বপক্ষীয়দের মৃতদেহের উপর এরূপ ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। আমার নির্ম্মিত কৃত্রিম পিপীলিকা গৃহগুলি হইতেই আমি এ বিষয়ে একটু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; সচরাচর উহারা কি প্রণালীতে সমাধি ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ আমার বাস্তবিক হয় নাই। প্রথমতঃ এইরূপ একটি পিপীলিকা-উপনিবেশে অন্যস্থল হইতে কতকগুলি পিপীলিকাকে আনিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিয়া দিলাম। অনতি বিলম্বেই কতক গুলি পিপীলিকা ঐ গুলিকে মুখে করিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। পরবর্ত্তী দিবসও এইরূপই চলিল। দেখা গেল ইতিমধ্যে তাহাদের নিজদলের যে কয়টা পিপীলিকা মরিয়াছে তাহাদের নিয়াও এইরূপই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মৃতদেহ গুলিকে লইয়া বাক্সের কোণে কোণে, উপরে নীচে, সম্মুখে পশ্চাতে অস্থিরভাবে উহারা ছুটাছুটি করিতে লাগিল। যতদূর সম্ভব মৃতদেহগুলিকে দৃষ্টির বাহিরে নিক্ষেপ করিবার আগ্রহই এই ব্যস্ততার কারণ। কিন্তু তাহাদের বাসগৃহ যে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে—উহাকে বাড়াইবার ক্ষমতা যে তাহাদের

নাই এইটুকু বুঝিতে উহাদের লাগিল সম্পূর্ণ চার দিন। এই চার দিন উহারা আর বিশ্রাম করে নাই। একজন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে নূতন একজন আসিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে এবং মৃতদেহ লইয়া ছুটাছুটি করিয়াছে। অবশেষে একেবারে হতাশ হইয়া উহারা কাচের দেয়াল ঘেঁষিয়া গৃহাভ্যন্তরেই একপাশে শবগুলিকে সমাধিস্থ করিতে লাগিল। কোণে কানাচে বা গর্ত্তের মধ্যে অর্থাৎ যতদূর দৃষ্টির বাহিরে সম্ভব উহারা মৃত পিপীলিকা গুলিকে রাখিতেছে দেখিতে পাইলাম।

বারবেটিস্ ও ক্রুডেলিস্ জাতীয় পিপীলিকাদের মধ্যেও ঠিক এইরূপ ভাব লক্ষ্য করিলাম। মৃতদেহ যতশীঘ্র সম্ভব স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছা এ ক্ষেত্রেও তদ্রূপই প্রবল। Crudelis জাতীয় পিপীলিকাদের সমাধিযাত্রা সম্বন্ধে আমি যাহা যাহা লক্ষ্য করিয়াছি Mrs. Treat প্রদত্ত বর্ণনার সঙ্গে উহার খুবই ঐক্য আছে।

ইনি Formica Sanguineaদের সমাধিযাত্রা সম্বন্ধে আমাকে একটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার আবাসবাটীর সন্নিকটে এই দাসপ্রিয় পিপীলিকাদিগের এক উপনিবেশ গঠিত হইয়াছিল।

একদিন লক্ষ্য করিলাম ঐ পিপীলিকা গৃহের প্রবেশ-দ্বারগুলির খুব কাছেই উহারা F. Fusca জাতীয় দাস পিপীলিকাদের কতকগুলি মৃতদেহ স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছে। দেখা গেল মৃত পিপীলিকা গুলি সমস্তই দাস জাতীয়। পরে মিসেস ট্রিট আমাকে জানাইলেন যে F. Sanguineaরা নিজেদের মৃতদেহগুলি দাসদের সঙ্গে কখনও সমাধিস্থ করে না। বাসগৃহ হইতে অনেকটা দূরে স্বতন্ত্র ভাবে উহারা নিজেদের শব গোর দেয়। যেখানে সকলকেই মাটিতে মিশিয়া মাটি হইতে হইবে সেই সমাধি ক্ষেত্রেও যাহারা আপনাদের জাতিধর্ম্ম ও পদমর্য্যাদার গৌরব বিস্মৃত হইতে পারেন না তাঁহাদের সঙ্গে যে এই F. Sanguineaদের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে তাহা কে অস্বীকার করিবে?"

পিপীলিকার সমাধি ব্যাপার সম্বন্ধে আর একজন মহিলা কি বলিতেছেন দেখা যাউক্। মহিলাটির নাম Mrs. Hutton। কতকগুলি সৈনিক পিপীলিকার মৃতদেহ এক স্থানে রাখিয়া গিয়া ত্রিশমিনিট পর প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ তিনি যাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা প্রদান করেন :—

আসিয়া দেখিতে পাইলাম এক দল পিপীলিকা মৃতদেহগুলিকে ঘিরিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। উহারা কি করে দেখিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম। দেখিতে পাইলাম পাঁচ সাতটি পিপীলিকা অনতিদূরবর্ত্তী একটা মাটীর স্তূপের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। পাঁচ মিনিট কাল বিলম্ব হইল, তৎপর উহারা স্তূপ মধ্যবর্ত্তী বিবর হইতে আরও পিপীলিকা সমভিব্যাহারে লইয়া বাহির হইল। ক্রমে সমস্ত পিপীলিকাগুলি সুন্দররূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রতি শ্রেণীতে দুইটি করিয়া পিপীলিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। উহারা এইরূপ ভাবে চলিতে চলিতে মৃত সৈনিক পিপীলিকাদের নিকট আসিয়া পৌছিলে প্রথম সারির পিপীলিকা দুইটি একটি মৃতদেহ উঠাইয়া লইল—তৎপর দ্বিতীয় সারির পিপীলিকারা অন্য একটা মৃতদেহকে লইল, তৃতীয় সারির পিপীলিকারা লইল অন্য একটাকে; এইরূপ ভাবে যখন মৃতদেহ গুলির একটাও আর অবশিষ্ট রহিল না তখন 'উহারা পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল। প্রত্যেক শববাহী পিপীলিকাসারির পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক সারি করিয়া পিপীলিকা উহাদের সাহায্যের জন্য চলিতেছিল। যখনই পূর্ব্বগামীরা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল তখনই উহারা যাইয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতে লাগিল;—এইরূপে ক্রমে উহারা সাগর তটবর্ত্তী এক বালুকাময় স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে কতকগুলি গর্ত্ত খোদিত হইয়া গেল—এবং মৃতদেহ গুলিকে উহাদের মধ্যে স্থাপন করিয়া পিপীলিকারা প্রাণপণ চেষ্টায় গর্ত্তগুলি আবার পূর্ণ করিয়া দিল। —এই বিস্ময়কর ব্যাপারের এই খানেই অবসান নয়। পাঁচ ছয়টি পিপীলিকা খনন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়নে তৎপর হইয়াছিল—অন্য পিপীলিকারা উহাদের ধরিয়া আনিয়া সেইখানেই নিহত করিল—এবং খুব তাড়াতাড়ি একটা বড় গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাদিগকে সমাধিস্থ করিল।"

উল্লিখিত বর্ণনায় আমরা পিপীলিকার শ্রমবিকাশ এবং শৃঙ্খলার অন্য এক নিদর্শন পাইয়াছি। পিপীলিকার বুদ্ধির কথা অনেক শোনা গিয়া থাকে। মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদের বুদ্ধির অভাব নাই। বারান্তরে পিপীলিকার বুদ্ধিবৃত্তি আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুধাংশু কুমার চৌধুরী।

সাঙ্কেতিক ভাষা

অগ্রহায়ণের ভারতীতে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জ্যোতিবাবুর সাঙ্কেতিক ভাষার পাঠোদ্ধার করিবার জন্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। আমি ভাষাতত্ত্ববিদ্ নহি এবং এ সম্বন্ধে ভারতীর পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার ভরসাও রাখি না। তবে মুটামুটি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

বাঙ্গলা ভাষার		জ্যোতিবাবুর সাঙ্কেতিক ভাষার
অ	=	আ
আ	=	অ
ই	=	উ
উ	=	ই
ঈ	=	ঊ
ঊ	=	ঈ
এ	=	ও
ও	=	এ
ঐ	=	ঔ
ঔ	=	ঐ
বর্গের প্রথম অক্ষর	=	বর্গের তৃতীয় অক্ষর
বর্গের দ্বিতীয় অক্ষর	=	বর্গের চতুর্থ অক্ষর

বর্গের তৃতীয় অক্ষর	=	বর্গের প্রথম অক্ষর
বর্গের চতুর্থ অক্ষর	=	বর্গের দ্বিতীয় অক্ষর
ণ, ন	=	ম
ম	=	ন, ণ
য	=	ল
ল	=	য
র	=	ব
ব	=	র
শ, ষ, স	=	হ
হ	=	শ, ষ, স,

জ্যোতিবাবুর ভাষায় "আমি ভাত খাই" ইহার অনুবাদ হইবে—"অনী ফদা ঘউ"। এবং এই প্রকারেই সঞ্জীবনী সভা' "হাক্ পাদু হাফ" হইয়াছে।

শ্রী কৃষ্ণপ্রসন্ন পাল।

পুরাতত্ত্বে ভৃগুবংশীয়দিগের স্থান

ভৃগুবংশীয় ঋষিদিগের দ্বারাই যে অগ্নির প্রথম আবিষ্কার হয় বেদের আলোচনা করিলে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্য ভাষায় অগ্নির জ্বালা ও জ্বলন-বাচক 'flame' ও 'blaze' শব্দের মধ্যে ভৃগুদিগের অগ্নি আবিষ্ক্রিয়ার ইতিহাস মুদ্রিত দেখিতে পাইয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত স্থল হইতে এতৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য অনুসন্ধানের মর্ম্ম জানিতে পারা যাইবে :—

"But then philology, by a careful comparative study of the name and the large family of its kindred or derived word in the Aryan languages both ancient and of later formation, has proved that the mythical Bhrigus had something to do with such things as "flame" and "blaze", if not with the lighting itself." Vedic India p p 164—5.

"ভাষাবিজ্ঞান, আর্য্যভাষার 'ভৃগু' নাম ও ইহার একধাতুমূলক বা এতদুৎপন্ন প্রাচীন ও পরবর্ত্তী সময়ে গঠিত বহু স্বজাতীয় শব্দের সাবহিত তুলনামূলক অধ্যয়ন দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে পৌরাণিক ভৃগুগণের সাক্ষাৎ বিদ্যুতের সহিত যদিবা সম্পর্ক নাই থাকে অগ্নিশিখা ও অগ্নির জ্বলনের সহিত কোননা কোন সম্পর্ক অবশ্যই আছে।"

শুক্রঋষি ভৃগুর পুত্র ছিলেন তাহাতেই তিনি "ভার্গব" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই শুক্রই প্রথম আর্য্যেতর জাতিকে আর্য্য সভ্যতায় দীক্ষিত করেন। তাহাতেই তিনি "শুক্রাচার্য্য" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পুরাণাদিতে তিনি অসুর ও দৈত্যগুরু বলিয়া পরিচিত। অসুর ও দৈত্য কোন অলৌকিক জাতি নহে। ইঁহারা পশ্চিম আসিয়ার প্রাচীন আর্য্যেতর সভ্যজাতি বলিয়াই বোধ হয়। শুক্রাচার্য্য ইহাদিগের মধ্যে অগ্নির প্রচলন করতঃ এবং ইহাদিগকে আর্য্যজ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করতঃ ইহাদিগকে কেবল আর্য্যদিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু তাঁহাদিগের সাময়িক বিজেতাও করিয়া তুলিয়াছেন। শুক্রাচার্য্য যে সঞ্জীবনী বিদ্যা নামে

নূতন জীববিদ্যার উদ্ভাবনদ্বারা দৈত্যদিগকে দুৰ্দ্ধর্ষ করিয়াছিলেন তাহা সুরগুরু বৃহস্পতি পুত্র কচের তাঁহার নিকট ঐ বিদ্যালাভের জন্য শিষ্যত্ব স্বীকারের আখ্যান হইতেই বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়!

শুক্রাচার্য্য দৈত্য ও অসুরদিগকে এই প্রকারে নবজীবন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হইতে যে দেব সম্মান লাভ করিবেন তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। পশ্চিম আসিয়ার প্রাচীন সভ্যজাতিই অসুর ও দৈত্যনামের প্রতিপাদ্য তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পশ্চিম আসিয়ার প্রাচীন সভ্য একেডিয় জাতির প্রধান দেবতার নাম শুক্রেরই নামানুসারে শুকাস্ দেখিতে পাওয়া যায়। ১

কেবল শুক্রেরই নাম যে পশ্চিম আসিয়ার প্রাচীন সভ্যতার সহিত সংযুক্ত তাহা নহে তাঁহার পিতা ভৃগুর নামও পশ্চিম আসিয়ার সভ্যতার সহিত সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ভৃগু অগ্নির আবিষ্কর্ত্তা ছিলেন বলিয়া এবং ভৃগুদিগের দ্বারা অগ্নির প্রথম প্রচার হয় বলিয়া অগ্নির আবিষ্কারক ও প্রচারক রূপে যে ভৃগুগণ বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী হইবেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ ভৃগুবংশের একশাখা পশ্চিম আসিয়ার অসুর ও দৈত্যদিগের মধ্যে উপনিবিষ্ট হয়; এবং আপনাদের আদি পুরুষ ভৃগু-ঋষির নামে তাঁহাদের উপনিবেশের নাম-করণ করেন! পশ্চিম আসিয়ার "ফ্রিজিয়া" প্রদেশই পূর্ব্বোক্ত উপনিবেশ বলিয়া অনুমিত হয়। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ফ্রিজিয়াকে ভৃগু নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে "প্রাগৈতিহাসিক কালের রাজবংশাবলী" "The Ruling Races of Prehistoric Times" নামক গ্রন্থে হিউইট এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"They first formed themselves into a nation of the sons of fire called Briges, Bhrigu, Phrygoi, or Phleyges, in Phrygia. Vol I p 500.

"তাঁহারা ব্রিজেস্, ভৃগু, ফ্রিজিয়, বা ফ্লেজেস্ নামে অগ্নিবংশ রূপে আপনারা ফ্রিজিয়াতে এক জাতিতে গঠিত হইলেন।"

ফ্রিজিয়া হইতেই ভৃগুগণ Phleyges নামে গ্রীসে যাইয়া অধিষ্ঠিত হয়। ২

পুত্র শুক্রই যখন দেবরূপে পরিণত হন তখন পিতা ভৃগুও যে দেবরূপে পরিণত হইবেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ ভৃগুকে আমরা একেডিয় ও গ্রীক্ উভয় জাতি কর্ত্তৃকই দেবরূপে পূজিত দেখিতে পাই। ভৃগু অগ্নির আবিষ্কর্ত্তা ছিলেন বলিয়া তিনি অগ্নি-দেব রূপেই ইহাদের নিকট প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। হিউইট লিখিয়াছেন:—

We thus find in the Akkadian fire-god, the same who, as the Greek Phlegyas, appears as the king of the Heraclidae or sons of the fire and the Sun-god, on their first entering into, and conquest of Greece." "The Ruling Races of Prehistoric Times", Vol I p 38.

1 See "The Ruling Races of Prehistoric Times"—by J. F. Hewitt Vol I p 6.
2 See "The Ruling Races of Prehistoric Times"—by Hewitt Vol I p 83.

উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে গ্রীক্‌দিগের মধ্যে ভৃগু 'ফ্লিজিয়াস্‌' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি হিরাক্লিডিদিগের রাজারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। হিরাক্লিডিদিগের গ্রীক্‌বিজয় হইতে গ্রীসের নূতন সভ্যতার পত্তন হয়। সুতরাং হিরাক্লিডিদিগেব রাজারূপে বর্ণিত হওয়ায় তিনি যে গ্রীক্‌ সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাহাই বুঝিতে পারা যায়। আরম্ভেই যে আমরা ' flame ও blaze শব্দের সহিত ভৃগু ঋষির যোগের উল্লেখ করিয়াছি—গ্রীক্‌ সভ্যতার সহিত ভৃগু ঋষির পূর্ব্বোল্লিখিত যোগেই আমরা তাহার প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হই। পাশ্চাত্য সুপণ্ডিত রেগোজিন যে প্রকারে 'flame' ও 'blaze, শব্দের সহিত ভৃগু শব্দের যোগ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে গ্রীক্‌ ভাষার মধ্যেই যে ইহার প্রথম সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিম্নে রেগোজিনের আলোচনা উদ্ধৃত হইতেছে :...

"Bhrigu" comes from a root Bhrij —"to burn," "roast", and must have been an old name of "flame", of Lightning itself. It survives in Greek phlego, Latin flagrare, fulgere (to blaze, to flame, to flare, flash, be resplendent) with all their derivatives, chief of which is the Latin fulgur, "lightning bolt," not to speak of their numerous posterity in our modern tongues." Vedic India by Ragozin p 364 foot note.

মনুষ্যের কৃষিজীবন আরম্ভ হইতেই প্রকৃত সভ্যতার সূত্রপাত হয়। হলযন্ত্রই সেই কৃষি জীবনের প্রধান উপকরণ। হলযন্ত্র বাচক পাশ্চাত্য ভাষার প্লাও (plough) শব্দ যে "ভৃগু" শব্দেরই অপভ্রংশ পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্বদিগের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতেই তাহা জানিতে পারা যায় :—"

"Also, as we find the northern "r" altered into "l" in the Akkadian Bil-gi, we find a similar change in the name Phlegyas, the Greek form of Phre-gu-as, and we thus see that the German pflug and our plough are names taken from that of the Phrygian fire father-god by a race which, besides changing the r into an l, changed the ph, into a p." The Ruling Races of Prehistoric Times," Vol I p 39.

পূর্ব্বোদ্ধৃত ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে ভৃগুকেই হলযন্ত্রের প্রথম উদ্ভাবয়িতা বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে। ভৃগু যে অগ্নির আবিষ্কর্ত্তা তাহাও আমরা দেখিতে পাইয়াছি। সুতরাং পুরাতত্ত্বের দিক্‌ এবং ভাষাতত্ত্বের দিক্‌ এই উভয় দিক্‌ দিয়াই ভৃগুই যে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃত প্রাণদাতা তাহার প্রমাণ আমরা পাইতেছি।

এই প্রকারে কেবল পশ্চিম আসিয়ার ইতিহাসেই যে প্রাচীন সভ্যতার নেতারূপে ভৃগুদিগের স্মৃতি অঙ্কিত দেখা যায় তাহা নহে, প্রাচীন গ্রীক্‌সভ্যতার নেতারূপে পাশ্চাত্য ইতিহাসেও পাশ্চাত্য ভাষাতেও, ইহাঁদিগের স্মৃতি অঙ্কিত দেখা যায়।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

যুদ্ধে ব্যোমযান

(৩)

যে পাঁচ প্রকার কার্য্যে প্রধানতঃ ব্যোমযান ব্যবহার করা হয় তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে দৌত্য কার্য্যই প্রধান। অসংখ্য "এরোপ্লেন" এতদুদ্দেশ্যে যুদ্ধ-সীমান্তে দিবারাত্রি ছুটাছুটী করিয়া থাকে—এমন কি শত্রু মিত্র উভয় পক্ষীয়েরই অগ্নিবর্ষণের মুখে। এরূপ অবস্থায় শূন্যে প্রতিপক্ষীয় ব্যোম বিহারীর সাক্ষাৎ ঘটায় দ্বৈরথ-যুদ্ধও মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান জার্ম্মান সমরে এই প্রকার দ্বৈরথ-যুদ্ধের বিবরণ অহরহ পাওয়া যাইতেছে। অনেকে বলেন কোনও স্থায়ী জিনিস ঠিকমত লক্ষ্য সন্ধান করিয়া আক্রান্ত করা অপেক্ষা শূন্যে শত্রু-ব্যোমযানের অল্পমাত্র উচ্চে অবস্থিত থাকিয়া উহাকে আঘাত করিয়া জখম করা সহজ। প্রকৃত পক্ষেও ব্রিটিশ বিমান-বিহারীগণ যত সহজে বিপক্ষীয় ব্যোমযান পিস্তল সাহায্যে আক্রান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন—মেজের ফ্রেস্‌কেটি এয়ারসিপের আশ্রয়গৃহ (Frascati airship shed at Metz) কিম্বা ডাসেলডর্ফের জেপ্‌লিন শেড়ে বোমা-নিক্ষেপ কার্য্য তত সহজ
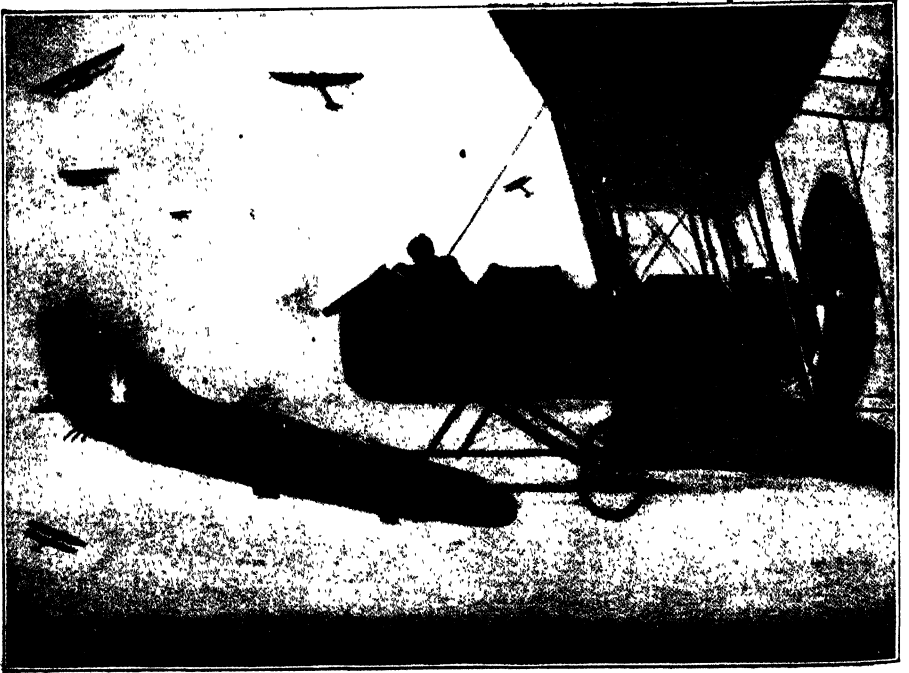
শূন্য-যুদ্ধ

"এরোপ্লেন" হইতে "জেপলিন" আক্রমণ।

হয় নাই। একেতো কোনো স্থায়ী জিনিস উপরে চলন্ত অবস্থায় থাকিয়া লক্ষ্য করাই অতি কঠিন, তাহার উপর এ সমস্ত স্থান সাধারণতঃ উর্দ্ধমুখী কামান ইত্যাদি দ্বারা উত্তমরূপে সুরক্ষিত থাকে। ডাসেল-ডর্ফে পূর্ব্বে জার্ম্মানগণ উর্দ্ধমুখী কামান সংস্থাপিত করেন নাই—কিন্তু একবার উহাদের আশ্রয় গৃহ বিনষ্ট হওয়ায় নূতন আশ্রয় গৃহের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য উর্দ্ধমুখী কামান সংস্থাপিত করিয়াছিলেন কিন্তু তবুও লেপ্টেনাণ্ট মেরিক্স সেডের ছাদ হইতে মাত্র ৫০০ ফিট ব্যবধানে অবতরণ করিয়া উহার উপরে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহার "এরোপ্লেন" নানা স্থানে জখম হইয়াছিল সত্য, তবু তিনি কোনও প্রকারে সীমান্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সেস্থানে স্বপক্ষীয় একটী মোটরগাড়ী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তুলিয়া লইয়া যায়। জার্ম্মানদের মত বীরজন-অনুচিত প্যারী, এন্‌টোয়ার্প এবং রীম্‌সে সহরে বোমা নিক্ষেপ করিয়া ঐতিহাসিক ইমারৎ কিম্বা হাঁসপাতাল ইত্যাদি ধ্বংস করা অপেক্ষা উল্লিখিত কার্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাতে প্রকৃত বীরত্ব আছে।

একজন বিমানবিহারী সৈনিক রুগ্ন অবস্থায় লণ্ডন হাঁসপাতালে অবস্থান কালে, রাণী আলেকজান্দ্রার নিকট শূন্য-যুদ্ধের যে গল্প বর্ণনা করিয়াছিল তাহা এই :—

"ব্রিটিশ সৈন্য যখন পূর্ব্ব দিনের তুমুল সংগ্রামের পর বিশ্রাম লাভ করিতেছিল,

লেপ্টেনাণ্ট ভন্ হিড্‌সেন্
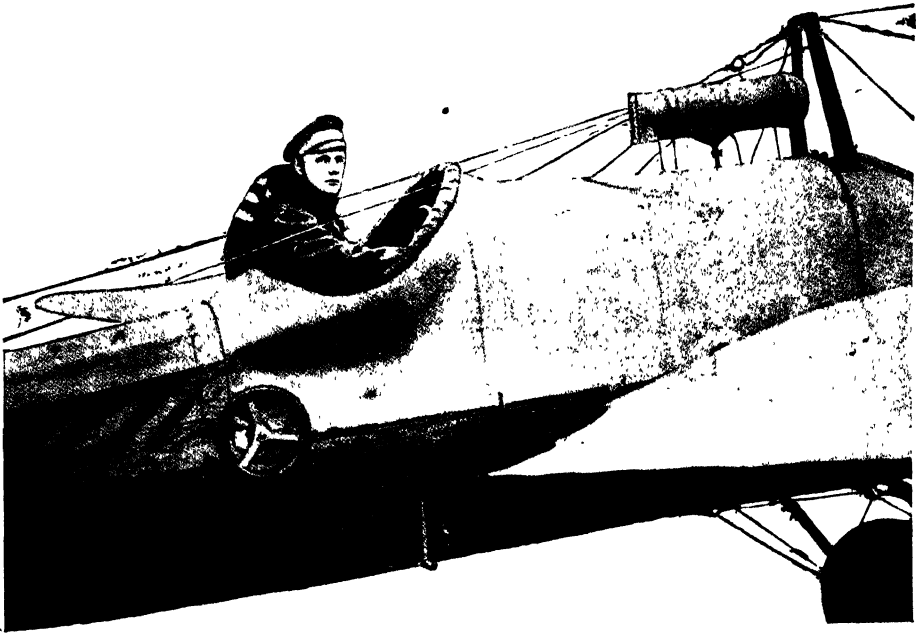
"এরোপ্লেনে" শূন্য হইতে প্যারীতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া ফিরিতেছেন।

সেই সময় শূন্যে একটী জার্ম্মান "এরোপ্লেন" দেখা দিল। ব্রিটিশ সৈন্যের ঠিক উপরে অবস্থিত থাকিয়া ইহা স্বপক্ষীয়দের নিকট তাহাদের অবস্থানের বিবরণ সঙ্কেতে জানাইতে লাগিল! তৎক্ষণাৎ দুইটী "এরোপ্লেনে" একজন ইংরেজ এবং একজন ফরাসী ব্যোমচারী আকাশে উড্ডীন হইলেন এবং যথেষ্ট ক্ষিপ্রগতিতে উঁহারা জার্ম্মান ব্যোমযানটী আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে তদভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন।

নিম্নে সৈন্যগণ ঔৎসুক্যের সহিত নিস্পন্দভাবে ইহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিল। অল্প একটু পরে ফরাসী ও ইংরেজ ব্যোমবিহারী এরূপ ভাবে আক্রমণের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া শত্রু ব্যোমবিহারী অপেক্ষা অধিক উচ্চে উড্ডীন হইবার জন্য তাহার সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষই মনে করিতেছিল যে অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চে অবস্থিত থাকিয়া সহজে বিপক্ষীয় শূন্যরথের উপর গোলাবর্ষণ করিতে পারিবে। নীচ হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া কোনো "এরোপ্লেনকে" জখম করা—একরূপ অসম্ভব; সকল "এরোপ্লেনেরই" নিম্নভাগ কঠিন বর্ম্মে সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু একবার অপেক্ষাকৃত উচ্চে অবস্থিত হইতে পারিলে তথা হইতে লক্ষ্য সন্ধান করা অনেকটা সহজ ও কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

উচ্চে, আরো উচ্চে—ক্রমে "এরোপ্লেন" দুইটী এত উচ্চে উড্ডীন হইল যে নিম্ন হইতে উহাদের ভাল করিয়া দেখিতেই পাওয়া গেল না। "এরোপ্লেন" দুইটী প্রায় দৃষ্টির বহির্ভূত হইতেছে—এমন সময় দেখা গেল ব্রিটিশ বিমানচারী তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরে উঠিয়াছে। তার পর আকাশে গোলাবর্ষণের একটী অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল, পর মুহূর্ত্তেই দেখা গেল জার্ম্মান "এরোপ্লেনটী" অবতরণ করিতেছে। জার্ম্মান "এরোপ্লেন" ভূমিপৃষ্ঠে আসিয়া অতি জোরে প্রতিহত হইল এবং কিছুদুর ভূমিতে পরিচালিত হইয়া—থামিল। সেই স্থানে ছুটিয়া গিয়া ব্রিটশ সৈনিকগণ দেখিতে পাইল—ব্যোমচারীর মৃত্যু হইয়াছে। ব্রিটিশ বিমানচারীর অব্যর্থ সন্ধানে উহার মস্তক স্ফুটিত হইয়াছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে—সেই সৈনিক তাহার যন্ত্রটীকে আয়ত্তে রাখিয়া অবতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতেই ব্যোমযানটী অক্ষতভাবে ভূমিতে অবতরণ করিয়াছে। তাহার হস্ত তখনও পরিচালন যন্ত্রটীতে রহিয়াছে।"

যুদ্ধে ব্যোমযানের আরেকটী প্রধান কার্য্য গোলন্দাজ সৈন্যের কামান সংস্থাপন কার্য্যে সহায়তা এবং বিপক্ষীয়দের কামানের অবস্থান এবং স্বপক্ষীয়দের অগ্নিবর্ষণের নির্ভ্রান্তি নিরূপণ করা। সাধারণতঃ এতদুদ্দেশ্যে "এরোপ্লেন" যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, কেহ কেহ নিম্নে আবদ্ধ বেলুনও (captive baloon) শূন্যে উড্ডীন করিয়া থাকেন। দৌত্য কার্য্য দ্বারা বিপক্ষীয় কামানের অবস্থান এবং সংখ্যা নিরূপিত হওয়ার পর—সৈন্যাধ্যক্ষগণ গোলন্দাজ সৈন্যদিগকে নানারূপ উপদেশ প্রদান করিয়া অতঃপর ব্যোমযানের সাহায্যে তাহাদের অগ্নিবর্ষণের নির্ভ্রান্তি অবগত হইয়া থাকেন। কামানশ্রেণীর পশ্চাতে—ব্যোমবিহারী আব-

শুকমত শূন্যে উড্ডীন হয়। নানারূপ প্রণালীতে শূন্য হইতে সংবাদ প্রেরণ করা হইয়া থাকে। তারশূন্য টেলীগ্রাফির ব্যবহার আজো তত সুবিধা মত হইতে পারিতেছে না। নানাপ্রকার আলোর সাহায্যে অনেক স্থলে সঙ্কেতে সংবাদ অবগত হওয়া যায়। সাধারণতঃ নিম্নে এক ব্যক্তি দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়া সঙ্কেত-বার্ত্তা গ্রহণের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকে; অন্য এক ব্যক্তি খালি চোখে দেখে ঠিক নিজেদের ব্যোমযানটী হইতেই সঙ্কেত গ্রহণ করা হইতেছে কি না। অনেক সময়ে একই স্থানে একাধিক ব্যোমযান উড্ডীন থাকায়—এ সম্বন্ধে নানারূপ গোল-যোগ উপস্থিত হওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা। তাই এ বিষয়েও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ ঠিক লক্ষ্য অভিমুখে গোলা বর্ষিত হইতেছে কি না তাহাই নির্ণীত হয়। দিক্ স্থির হইয়া গেলে নিম্ন হইতে "এরোপ্লেন"কে সঙ্কেতে বলা হয়—"এইবার 'পাল্লা' (range) নির্ণয় কর।" এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র ব্যোমবিহারী আবশ্যক মত যন্ত্রের মুখটি ঘুরাইয়া লয় এবং কামানের 'পাল্লা' নির্ণয় করে।

'পাল্লা' নির্ণীত হওয়ার পর ব্যোমবিহারী সঙ্কেত-বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিবর্ষণের নির্ভ্রান্তি পর্য্যবেক্ষণের প্রতি মনোযোগী হয়। অনেক সময় পর্য্যবেক্ষণ বৃত্তান্ত কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া নিম্নে স্থান মত নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে; আবার "আলোক-সঙ্কেতেও" সংবাদ প্রেরণ করা হইয়া থাকে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের Field Artillery Training Bookএ "আলোক-সঙ্কেতের" নিম্নলিখিত প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে।

"এরোপ্লেন" হইতে নিম্নে আলোক সাহায্যে নিম্নলিখিতরূপে সঙ্কেতে সংবাদ জানান হইবে।

(ক) অগ্নিবর্ষণের পূর্ব্বে:

একটি শাদা আলোক—আমি লক্ষ্যের উপরে অবস্থান করিতেছি।

একটি সবুজ আলোক—আমি অগ্নি বর্ষণ পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি।

(খ) পাল্লা এবং দিক্ নির্ণয় করিবার সময়:—

আলোক সঙ্কেত	দিক্‌নির্ণয়	পাল্লা
একটী লাল আলোক	দক্ষিণে	দূরে
দুইটী লাল আলোক	অনেকটা দক্ষিণে	অনেকটা দূরে
একটী সবুজ আলোক	বামে	বেশী কাছে
দুইটী সবুজ আলোক	অনেকটা বামে	অনেক বেশী কাছে
একটী লাল, একটী সবুজ আলোক	ঠিক লক্ষ্য অভিমুখে হইয়াছে	পাল্লা ঠিক হইয়াছে
একটী সবুজ, একটী লাল আলোক	দেখি নাই	দেখি নাই

লক্ষ্য হইতে ৮ ডিগ্রির বেশী দক্ষিণে কিম্বা বামে গোলা পতিত হইলেই "অনেকটা দক্ষিণে" কিম্বা "অনেকটা বামে" সঙ্কেত করিতে হয়। ৫০০ গজ কিম্বা আরো

কাছে থাকিতেই গোলা স্ফুরিত হইলে সঙ্কেত হইবে "অনেকটা বেশী কাছে" সেইরূপ লক্ষ্য হইতে ৫০০ গজের অধিক দূরে বিস্ফুরিত হইলে সঙ্কেত করিতে হইবে "অনেকটা দূরে"।

(গ) অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ হইলে:

লাল সবুজ আলোক, অগ্নিবর্ষণ কার্য্যকরী হইতেছে।

অগ্নিবর্ষণের সময় একটী শাদা আলোক দেখাইলে সঙ্কেত হইবে—"থাম, আমি সংবাদ প্রেরণ করিতে চাই।"

নিম্ন হইতে ৬ ফুট লম্বা ১ ফুট প্রশস্ত শাদা কাপড়ের তৈরি অক্ষর ভূমিতে রাখিয়া এইরূপে ব্যোমবিহারীকে সংবাদ জানান হইবে।

L—লক্ষ্যের দিক্ নির্ণয় কর।

X—পাল্লা লক্ষ্য কর।

V—অগ্নিবর্ষণের কার্য্যকারিতা পর্য্যবেক্ষণ কর।

N—যে সঙ্কেত করিয়াছ উহা আবার দেখাও। ইত্যাদি।

"হাইড্রো-এরোপ্লেন" ("সিপ্লেন") দৌত্য কার্য্যে বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাগর উপকূলে সর্ব্বক্ষণ বিচরণ করিয়া ইহারা বহুদূরে অবস্থিত বা আগমনকারী শত্রু-যুদ্ধপোতের বিষয় অবগত হইতে পারে এবং সঙ্কেতে স্বপক্ষীয়দিগকে সে সংবাদ জানাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন উপর হইতে জলতলস্থিত "সবমেরিণ" বা "মাইনের" অস্তিত্ব অবগত হইতে পারিয়া ইহারা সঙ্কেতে যুদ্ধ জাহাজগুলিকে সময়ে বিপদবার্ত্তা জানাইয়া রক্ষা করিতে পারে।

'এরোপ্লেনের' মোটামুটী কার্য্য বিবৃত হইল। "এয়ারসিপ" কিন্তু এ সমস্ত কার্য্যে খুব অল্পই ব্যবহৃত হয়—একেবারেই ব্যবহৃত হয় না এরূপও বলা যাইতে পারে। উহাদের বিশাল দেহ এবং অপেক্ষাকৃত মন্থর গতি নিয়া দৌত্যাদি কার্য্যে ইহারা তেমন সুবিধা করিতে পারে না। গোলাবর্ষণে দুর্গ, নগর, যুদ্ধপোত এবং শত্রুব্যূহ ধ্বংস করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য—অনিষ্ট করাই ইহাদের ধর্ম্ম। প্রায় ২৪।২৫ টন গোলাগুলি, বোমা ইত্যাদি বিস্ফোরক পদার্থ বহন করিতে পারে বলিয়া ইহাদের ধ্বংস করিবার ক্ষমতাও অত্যন্ত অধিক। বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মানগণ জেপ্‌লিন সাহায্যে সহরে বন্দরে কত প্রাসাদ কত অট্টালিকা, কত বহুমূল্য ঐতিহাসিক স্মৃতিই না বিনষ্ট করিতেছেন। ২৫শে এবং ২৬শে অগাষ্ট এন্‌টোয়ার্পে গোলা-বর্ষণ করিয়া উহারা "এয়ারসিপের" ব্যবহারের প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। কিন্তু এই প্রকার যুদ্ধপ্রণালী সভ্যসমাজে বড় নিন্দনীয় হইয়াছে। অরক্ষিত স্থানে অলক্ষ্যে থাকিয়া গোলাবর্ষণ করিয়া ধ্বংসের বীজ ছড়ান সভ্যসমাজ কাপুরুষতা বলিয়া গণ্য করিতেছেন; কত নিরীহ—শিশু বৃদ্ধ—স্ত্রীলোক রুগ্ন ব্যক্তিই না অকস্মাৎ বোমা বিস্ফোরণে জীবন হারাইতেছে, ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিকদের চিরকালের আদরের জিনিস পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে—কে গণনা করিবে। এমনকি রুগ্ননিবাস হাঁসপাতালেও জর্ম্মানদের "জেপ্‌লিন" হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া শোনা গিয়াছে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে Hague Convention-এ

সমস্ত শক্তিবৃন্দ একত্রিত হইয়া নিয়ম করিয়া ছিলেন—ব্যোমযান হইতে কোনো প্রকার গোলাবর্ষণ করা যাইতে পারিবে না। ব্যোমযান কেবল দৌত্য কার্য্যে এবং সংবাদ সংগ্রহেই ব্যবহার করা যাইবে। আবার ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় Hague Convention-এ জার্ম্মাণী, ফরাসী এবং ইটালী এবং আরো অনেক শক্তি পূর্ব্বোক্ত নিয়মটী সমর্থন করেন নাই। সুতরাং এই নিয়মটী কেবল ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রীয়া হাঙ্গারী (Contracting powers) পালন করিতে বাধ্য ছিলেন। কেবল উহাদের পরস্পরের মধ্যেই এই নিয়মের বন্ধন আছে।—কিন্তু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জার্ম্মানী এবং জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, ফরাসীর বিরুদ্ধে অষ্ট্রীয়া কিম্বা অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে ফরাসীগণ যখন যুদ্ধ করিবেন তখন কাহারও উপর এ নিয়মের কোনও বন্ধন থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান যুদ্ধে উপরোক্ত নিয়মটীর প্রচলন নাই বলিলেই চলে।

কিন্তু অরক্ষিত স্থানের উপর গোলাগুলি নিক্ষেপ সর্ব্বদাই নিয়ম বহির্ভূত। সুতরাং প্রত্যক্ষ ভাবে জার্ম্মানগণ নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন।

যাহাহউক "এয়ারসিপ" পরিচালনা বড়ই বিঘ্নবহুল। যুদ্ধকালে উভয় পক্ষীয়ের অসংখ্য "এরোপ্লেন" দিবারাত্রি আকাশে বিচরণ করিতে থাকে। ইহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যাওয়া "এয়ারসিপের" পক্ষে সহজসাধ্য হয় না। বিশেষতঃ "এরোপ্লেন" অত্যন্ত দ্রুতগামী এবং শূন্যে "এয়ারসিপ" অপেক্ষা ইহারা অধিক উচ্চে উড্ডীন হইতে পারে। ইহাদের পক্ষে "এয়ারসিপকে" আক্রমণ করাও সহজসাধ্য—ইহাদের বিশাল দেহে গোলা নিক্ষিপ্ত হইলে যত সহজে ইহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় "এরোপ্লেন" তত সহজে বিনষ্ট হইতে পারে না।

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

মরণের রথ

আসিতেছে মরণের রথ
দিতে তোমা নূতন জীবন,
নিঃশব্দ চক্রনেমী তার
ধীরে ধীরে করে আগমন,
স্বর্ণময় কেতনে তাহার
নব রবি হের, উদ্ভাসিত।
শান্তিময় স্নিগ্ধ সমীরণ
চারি ধারে সদা প্রবাহিত।
পূত শ্বেত কুহেলিকা-বাসে
বিরচিত যবনিকা গুলি,
লাগিবে না পথের সন্তাপ
শত নেত্র দিবে না আকুলি।
—বিবর্ণিত-বিশীর্ণ ও তনু,
আবরিয়া জগতের চক্ষে,
স্নেহময়ী জননীর মত
নিয়ে যাবে আচ্ছাদিয়া বক্ষে।
ভীত কেন, নববধূ সম
ওরে মোর দুর্ব্বল হৃদয়,
এখন ভাবিছ যারে পর,
সেই তোর চির প্রেমময়।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

আরবের অজ্ঞানযুগ

ইসলামের পূর্ব্বতন সময়কে আরব পণ্ডিতরা আরবদেশের 'অজ্ঞানযুগ' (আয়া-মু'ল জাহিলিয়েৎ—Days of Ignorance) বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে আরব সমাজের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ এই অজ্ঞান-যুগের ভীষণ তমসাচ্ছন্ন দৃশ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যখন আরবদেশে সমাজ অতি কুৎসিৎ ও বিশৃঙ্খল ভাব ধারণ করিয়াছিল—যখন ঘোর দুর্দ্ধর্ষ রক্তপিপাসু আরববাসী সামান্য উপলক্ষে বিবাদ বাধাইয়া পঞ্চাশৎ বা শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া অকারণ রক্তপাত করতঃ শত শত নরনারীর প্রাণসংহারকার্য্যে নিযুক্ত ছিল (১) যখন ঘোর ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মরুবাসী আরবগণ লাম্পট্যে ও মদ্যপানে জ্ঞানহারা হইয়া জগতের যাবতীয় দুষ্ক্রিয়ায় রত ছিল —যখন আরব সমাজে 'অল-আতিয়াবন' নামে কুকার্য্যের স্রোত খরতর ধারে প্রবাহিত হইতেছিল (২) যখন আরবের নারীচরিত্র অতি হীন হইতে হীনতর ছিল—যখন শিশুকন্যার জন্ম অশুভ ঘটনা বিবেচনা করিয়া তাহাকে জীবন্ত প্রোথিত করা হইত এবং শিশুহত্যা, ভ্রূণহত্যা এমনকি ভ্রাতৃহত্যা তাহাদের নিত্যকর্ম্ম ছিল; যখন 'কায়নাদ' নামে অভিহিতা হতভাগিনী দাসীগণ নৃত্যগীতে অর্থোপার্জ্জন করতঃ তাহা স্ব স্ব প্রভুকে প্রদান করিত (৩) যখন দাম্পত্যপ্রণয়ানু-রাগবিরহিতা রামাগণ পরপুরুষের মনো-রঞ্জনার্থ আপন সতীত্বধর্ম্ম অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মপালনে সম্পূর্ণ উদাসিনী ছিল এবং পুরুষগণও পরদারগমনে রত ছিল এবং উদ্বাহিক নিয়মপালনে বা নিষিদ্ধ- শ্রেণী-ভেদে অমনোযোগী হইয়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই পত্নীস্বরূপ গ্রহণ করিত, যখন আরবদেশে 'নেকা-অল-অস্তিব্দা, 'নেকা-অল-সীর') নিয়োগ সদৃশ বিবাহপ্রথা), 'নেকা-অল-সাফা' 'নেকা-অল-বাঘায়া, (বহুপুরুষের সহিত বিবাহ), 'নেকা-অল-মোক্ত' (নিন্দার্হ অর্থাৎ বিমাতৃবিবাহ), 'নেকা-অল-মোতা' (উপস্বত্বভোগী বা অল্পদিনস্থায়ী বিবাহ) প্রভৃতি

---

(১) বকর ও তগ্‌লব পরিবারের যুদ্ধ আরবদেশে বিখ্যাত। একটি উষ্ট্র কোন স্ত্রীলোকের শস্য নষ্ট করিয়াছিল। রমণী উষ্ট্রস্বামীর প্রতি কটূক্তি করায় বক্ষে অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হয়। ইহাতেই পঞ্চাশবর্ষব্যাপী মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল। ঘোড়দৌড়ের খেলা লইয়া ইহাপেক্ষা ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'হরবে ওয়াহেস'।

(২) C. F. *The Arabs before Islæm* in the History of Islamic Civilization.

(৩) Syed Ahmed. *Essays on the Life of Mohammed.*

বর্ব্বর প্রথা প্রচলিত ছিল (৪) যখন আরব-দেশে স্বামী অভ্যাগতব্যক্তিকে আপন স্ত্রী ভাড়া দিত, বিদেশ যাত্রাকালে তাহার স্থান পূরণ করিবার জন্য বন্ধুর অনুসন্ধান করিত, এবং রাখালের মত কার্য্যের বিনিময়ে অন্যলোকের সহিত দাম্পত্য সর্ত্তে অংশীত্ব স্থাপন করিত, যখন আরবেরা ইচ্ছামত অসংখ্য অসংখ্য নারীর পাণিগ্রহণে ও তাহাদিগের বর্জ্জনে তৎপর ছিল,—যখন আরব ও তৎসন্নিহিত দেশসমূহে স্ত্রীলোক বিক্রয়যোগ্য বস্তুর মধ্যে পরিগণিত ছিল, যখন সেখানে পৌত্তলিকতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছিল এবং দেবদেবীর তুষ্টির জন্য বা দেশের মঙ্গলার্থে নরবলি পর্য্যন্ত দেওয়া হইত—সেই সময় হজরত মোহম্মদ ঈশ্বরের সুসমাচার লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

তাঁহার সুসমাচারালোক চতুর্দ্দিকস্থ অন্ধকার দূরীভূত করিল। তাঁহার গদ্য কবিতা 'মোয়াল্লাকা,' 'কসিদা, 'মারাসি, প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবির উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট

(৪) The History of Muslim Legue Institutions, chap. Arabia and the Arabs in the days of Ignorance. C, F. Also Robartson Smith's Kinship and Marriage of the Early Arabs.

এতদ্ব্যতীত 'মা মালাকাৎ আয়মান কো'ম (Marriage by capture- বন্দী করিয়া বিবাহ); ক্রয় করিয়া বিবাহ (Marriage by parchase), চুক্তি করিয়া বিবাহ (Marriage by contract), 'বা' আল বিবাহ (baal Marriage), বিনা বিবাহ (Bina marriage), 'নেকা-অল-তফ্‌উইজ' (Marriage by delegation), 'নেকা-অল-শেগার' Mariage of privation), 'নেকা-অল-মোবাদালা (Marriage by exchange), সাদিকা বিবাহ (Shadika marriage) প্রভৃতি আরও অনেক রকম কুৎসিত ও নীচ এবং বর্ব্বরোচিত (Left-hand, Morganatic) বিবাহপ্রথা আরব ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে প্রচলিত ছিল।

আরবদিগের মধ্যে যদিও মাতা, ভাই প্রভৃতি নিষিদ্ধ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিল, কিন্তু আরবের সন্নিহিত দেশে আবার এরূপ শ্রেণীভেদও ছিল না। সার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বাহাদুর লিখিয়াছেন যে, এরূপ নীতিভ্রষ্ট আচরণে পারস্য দেশ অগ্রগণ্য ছিল। বিবাহবিধিকে গণনার মধ্যেই ধরা হইত না। দূর সম্পর্কই হউক আর নিকট সম্পর্কই হউক আত্মীয়তার প্রতি আদৌ লক্ষ্য ছিল না। পিতার পক্ষে কন্যা বা ভ্রাতার পক্ষে ভগিনী যেরূপ বৈধ ছিল, মাতার পক্ষে পুত্রও তদ্রূপ বৈধ ছিল; বাস্তবিকই তাহাদিগকে ঠিক পশুদলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, কারণ পশুরা কোনরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী নহে।

মিশরে ভ্রাতা ও ভগ্নীর বিবাহ সর্ব্ববাদী-সম্মত ছিল। স্পার্টা নগরবাসীগণ পিতার কন্যাকে এবং এথেনিয়ানেরা মাতার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিত, এথেন্সে ভ্রাতৃকন্যার সহিত পিতৃব্যের বিবাহ অতীব প্রিয়তম সম্পর্কের সুখজনক (বা সৌভাগ্যশালী) মিলন বলিয়া প্রশংসিত ছিল। রোমক ব্যবস্থাপকেরা এই নিষিদ্ধ শ্রেণীর বিবাহপ্রথা রহিত করিতে মনোযোগী হন নাই বটে, কিন্তু ভ্রাতাভগিনীর বিবাহ বন্ধ করেন। রোমক সম্রাট জষ্টিনিয়ানের ব্যবস্থাপনের কঠোরতা সত্বেও সম্রাট ক্লডিয়াসের ভ্রাতা জার্ম্মানিকসের কন্যা—তদীয় ভ্রাতৃকন্যা এগ্রিপার সহিত তাঁহার বিবাহ হেতু ভ্রাতৃকন্যাকে বিবাহ করা লোকের পক্ষে বিধিসঙ্গত হইল।

রচনাকে মলিন করিয়াছিল। তাঁহার চীৎকারধ্বনি মরুভূমির বড় বড় সঙ্গীতাচার্য্যকে শান্ত করিয়াছিল। তাঁহার গন্থের অতুল মাধুর্য্যে ও অনুপম রচনাভঙ্গিতে মোহিত হইয়া এবং তাঁহার রচনাবিষয়ের (বা প্রসঙ্গের) মহত্বে বিভোর হইয়া আরবদেশীয় গায়কেরা গান করিতে ভুলিয়া গিয়া মহাগ্রন্থের (কো'রাণ-ই-মজীদের) উত্তেজক সুর উল্লাসিতভাবে মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছিল। তাঁহার কোরাণের প্রগাঢ় বিষয়বুদ্ধি ও নির্দ্দোষ যৌক্তিকতা অজ্ঞতা বা মুর্খতার পর্দ্দা ছিন্ন করিয়া আরব কুসংস্কাররূপ লূতাতন্ত সমূলে নষ্ট করিয়াছিল।

আব্দুল্লার পুত্র মোহম্মদের বিস্ময়জনক কার্য্যাবলী ও নাটকীয় জীবনব্যাপারের লোমহর্ষক আখ্যায়িকা বর্ণনা করা এক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে।

প্রেরিত পুরুষের ধর্ম্মপ্রচারের পঞ্চমবর্ষে বৈরনির্যাতনবিদ্বেষপ্রণোদিত কোরেশগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া যে নবতিজন মুসলমান আবিসিনিয়াদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে জাফর অল তায়ার নামে একজন তৎকালীন আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান রাজা নেগুসের নিকট যে বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও মোহম্মদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ধর্ম্মসংস্কার ও তদানীন্তন আরব সমাজের অবস্থার বিষয়ও কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন,—"হে রাজন! আমরা মূর্খ ও ভ্রান্ত ছিলাম, আমরা প্রতিমা উপাসনা করিতাম, মৃতদেহ ভক্ষণ করিতাম, লম্পট ছিলাম, আমাদিগের প্রতিবেশীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিতাম, বলবানেরা দুর্ব্বলের সম্পত্তি অপহরণ করিত। বহুদিন পর্য্যন্ত আমরা এই অবস্থায় ছিলাম, এমন সময় উচ্চবংশজাত, সত্যবাদী, সরল, ধর্ম্মপরায়ণ ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ আসিয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট আসিতে, তাঁহার ও তাঁহারই কেবল উপাসনা করিতে আহ্বান করিলেন এবং আমাদিগের পিতা ও পূর্ব্বপুরুষেরা যে সকল দেবমূর্ত্তি ও শিলামূর্ত্তির সম্মুখে প্রণিপাত করিয়াছিলেন তাহাদের অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিতে এবং ঈশ্বরের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে ও অন্য কাহাকেও তাঁহার সমতুল্য না করিতে আদেশ করিলেন। তিনি আমাদিগের জন্য উপাসনা আরাধনা, দান, এবং সময় বিশেষে উপবাস অবশ্য পালনীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে সত্য কথা বলিতে, গচ্ছিত দ্রব্য সমুদয় নিরাপদে প্রত্যর্পণ করিতে, আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহশীল হইতে, প্রতিবেশীর উপর দয়ালু হইতে, নৃশংস ও দুর্বিনীত কার্য্য, লাম্পট্য ও নিষ্ঠুরতা-পরিচায়ক বিবাদ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য না দিতে, অনাথদিগের সম্পত্তি অপচয় বা গ্রাস না করিতে, দুরভিসন্ধি বা কুমতলব আরোপ না করিতে, এবং নারীচরিত্রে সন্দিগ্ধ না হইতে আজ্ঞা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অনুযোগ ও উপদেশবাণী শ্রবণে ব্যথিত ও অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার সত্যবাদিতায় বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল অনুশাসন জ্ঞাত করাইয়াছেন তাহার অনুসরণ করিয়াছি এবং ঈশ্বরের একত্বে

বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। যাহা নিষিদ্ধ তাহা হইতে বিরত হইয়া যাহা অনুজ্ঞাত তাহার নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছি। আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস, মত ও কার্য্যের এই পরিবর্ত্তনে আমাদের দলের লোকেরা ক্রুদ্ধ ও সংক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহারা আমাদিগের উৎপীড়ন করিয়াছে, দেবমূর্ত্তি, প্রতিমা ও যে সকল নিষ্ঠুর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছি তাহাতে পুনর্প্রবৃত্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিতি করা অসাধ্য ও নির্য্যাতন যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় আমরা আমাদের দেশ পরিত্যাগ করিয়াছি এবং আপনাকে একজন উদার নৃপতি বলিয়া বিশ্বাস করতঃ আপনার রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছি। (৫)

আরবে ঘোর মূর্খতা ও অজ্ঞতা প্রবল ছিল বলিয়াই যে আরবসমাজের ঐরূপ দুর্দ্দশা ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ইসলামালোক আরবের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়ায় সমাজ হইতে প্রাগুক্ত কুনীতি ও ক্রিয়াপদ্ধতির স্রোত রুদ্ধ হইল। ইসলাম পৌত্তলিকতা, বহু দেবার্চ্চনা, মানবোপাসনা, অগ্ন্যুপসনা, উদ্ভিদপূজা ও প্রাণী উপাসনা সমূলে উৎপাটন করিয়াছে। ইসলাম ঈশ্বরাবতারবাদ, ঈশ্বরে মনুষ্যভাব আরোপ প্রভৃতি মতকে সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করিয়া থাকে। ইসলাম আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism), হিতবাদ (utilitarianism), হেতুবাদ (Rationalism), প্রত্যক্ষবাদ (Positivism-নিসর্গবাদ), জড়বাদ (materialism), অদ্বৈতবাদ (Pantheism), সংশয়বাদ (Scepticism), অতীন্দ্রিয় সারাৎসারতত্ত্ব (Transcendentalism), প্রভৃতি তত্ত্বের (বা মতের) ঘোর প্রতিবাদী ও খণ্ডনকারী। ইসলাম ভোজনবিলাসিতা, দেহাত্মবাদ, দৈহিক পরিণামবাদ, সর্ব্বশূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, অনুমেয়-বাহ্যবস্তুবাদ, প্রত্যক্ষ বাহ্যবস্তুবাদ প্রভৃতি নাস্তিক দর্শনান্তর্গত মতের পরম বিদ্বেষী।

ইসলাম এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব ও মহিমা স্বীকার করে। ইসলাম সর্ব্বনিয়ন্তা অক্ষয় সনাতন, অজর, অমর, নির্ব্বিকল্প নিষ্কাম ঈশ্বরের মহিমা যেরূপ বিবৃত করিয়াছে, আর কোন ধর্ম্ম-মতেই এরূপ দেখা যায় না বলিয়া বোধ হয়। কারণ, ঈশ্বরের এরূপ সর্ব্বশক্তিমানত্বের ব্যাখ্যা করায় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ বলেন যে, মোহম্মদের ঈশ্বর যথেচ্ছচারী (Despot)।

যখন তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তখন তাঁহার সৃষ্টবস্তুর উপর তাঁহার যে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে এক মূহূর্ত্তেই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ সাধন করিতে পারেন! তাঁহার মহিমা অপার। তবে কতকগুলি নিয়ম ও শক্তির উপর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য পরিচালনের ভার ন্যস্ত হইয়াছে।

(৫) এব্নে অল-আসির, ও এব্নে হিশাম ১ম খঃ, ২১৯পৃঃ।
Cf. Contributions to the History of Islamic Civilisation. The History of Muslim League Institutions. pp 363

নৈসর্গিক নিয়ম (laws of Nature), নৈসর্গিকশক্তি (Forces of Nature), প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য (Iconomy of (Nature), মহাকর্ষণশক্তি (Gravilation) প্রভৃতি তাঁহারই কৃত ও তাঁহারই অধীন!

মহাকর্ষণশক্তি আবিষ্কার হওয়ায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচালন ক্রিয়ার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইতে পারে না বলিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু এই মহাকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণশক্তির উপর আর কি কোন মহাশক্তি নাই যাহা ইহার বিঘ্ন ঘটাইতে পারে? অবশ্যই এই শক্তির এক আদিউৎপাদক ও পরিচালক আছেন, যিনিই ঈশ্বর। এজন্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক মহাত্মা নিউটন বলিয়াছেন (৬) যে, মহাকর্ষণ শক্তির উপর নিশ্চয়ই একজন স্বেচ্ছাচারী পরিচালক বা কর্ত্তা (Voluntory agent) আছেন, নচেৎ ইহা বিশৃঙ্খল (Chaotic) হইয়া যাইত। এই নিমিত্তই ইসলাম এই মহাকর্ষণ শক্তির উপারতন পরিচালক ঈশ্বরকে মহাপরাক্রান্ত ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বভৌম সম্রাট বলিয়া স্বীকার করে। ইসলাম এই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন ঈশ্বর বা সৃজনক্ষম সত্তের বিদ্য-মানতা স্বীকার করে না, এবং তাঁহারই আদেশ ও নিষেধআজ্ঞা পালন করিতে ও তাঁহারই উপাসনা করিতে আদেশ করে।

মোহম্মদ কে, চাঁদ।

দান

আমার এ প্রেম আকাশের মত
বিছায়ে দিলাম তোমার পরে,
আমার এ গান, বাতাস নিয়ত
নিখিলে ছড়াল তোমারি তরে।
দূরতা কেমন, বাধা সে কোথায়
ঘুচিল আড়াল দোঁহার মাঝে,
অপার সোহাগ ঘিরেছে কায়ায়
অশেষ ছন্দ হিয়ায় বাজে।
বুকের পরশ পারে নিশিদিন
যেথা যাবে তুমি রহিবে সাথে
তুমি ঘুমাইলে স্বপন প্রহরী
চন্দ্র তারকা জাগিবে রাতে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

(৬) Brewsters (Sir David) *Life of Sir Isaac Newton* Chap XV, pp. 242-265. Elsewhere he writes, "He admits that gravity might put the planets in motion, but he maintains that,' without the Divine powers it could never give them such a circulating motion as they have about the sun, becouse a proper quantity of a transverse motion is necessary for this purpose, and he concludes that he is compelled to ascribe the frame of this system to an intelligent agent."

অভাগা

(ইংরাজি হইতে)

অন্ধকার। একটা রেলিং-ঘেরা বাড়ীর সামনের বাগানে, এক গাছের তলায় একটা লোক অনেকক্ষণ হইতে এদিক ওদিক চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছিল। যেন একটা কিছু কুমতলব সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সে অনেকক্ষণ হইতে অপেক্ষা করিতেছে! যখন সে দেখিল কেহ কোথাও নাই, বীটের পাহারাওয়ালা টহল দিয়া চলিয়া গেল, তখন ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে গাছের ছায়া হইতে সরিয়া আসিল। আর একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কৌশলে, নিঃশব্দে রেলিং টপকাইয়া সেই বাড়ীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে লাফাইয়া পড়িল!

চোর সে! চুরি করিতে আসিয়াছে কি?

বাড়ীর কেহ জাগরিত আছে কিনা পরখ করিবার জন্য প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সে জোরে একটা শিশ্ দিল। শিশের শব্দ নিস্তব্ধ গগনতলে প্রতিধ্বনিত হইয়া বায়ুস্তরে মিলাইয়া গেল—কাহারও জাগিয়া থাকিবার লক্ষণ সে দেখিতে পাইল না!

দিনের বেলায় লুকাইয়া সে বাড়ীর বাহির দিকটা একবার দেখিয়া গিয়াছিল। বাড়ীর পশ্চাৎ দিকে একটা লোহার সিঁড়ি ছিল; ধীরে ধীরে সোপানরাজি অতিক্রম করিয়া চোর দ্বিতলের খোলা বারান্দায় উঠিল। অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া ভিতরের রোয়াকে প্রবেশ করিল। পায়ে ঠেকিয়া একটা কাচপাত্র দূরে গড়াইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল—বুকের ভিতর রক্তের ঢেউ খেলিতে লাগিল—আপনার বুকের স্পন্দন শব্দ সে যেন নিজেই শুনিতে পাইল; মনে হইল যেন শব্দটা সজীব হইয়া গৃহস্বামীকে তীব্রস্বরে সতর্ক করিয়া দিতেছে—ওঠ, ওগো ওঠ, ঘরে চোর এসেছে! চকিতে সে দুয়ারে টাঙ্গান একটি নীল পর্দ্দার পার্শ্বে সরিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল। কাণ পাতিয়া শুনিল কেহ জাগিল কিনা, কেহ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল কিনা! অনেকক্ষণ কাটিল—যখন সে নিশ্চিত বুঝিতে পারিল কেহ শয্যা ত্যাগ করে নাই—তখন সে পকেট হইতে চোরা লণ্ঠনটি বাহির করিল,—কল টিপিয়া তাহার স্বল্পোজ্জ্বল আলোকে একবার স্থানটির চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া লইল। এই গৃহ একদিন তাহারই গৃহ ছিল, শত স্মৃতিপূর্ণ তাহার সেই গৃহখানি চোর সাজিয়া আজ সে একবার দেখিতে আসিয়াছে! হায় রে!

গৃহপ্রবেশ করিতেই দেয়ালের একখানি চিত্র তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সুঠাম-সুন্দর এক যুবক, কুশন চেয়ারে উপবিষ্টা বিংশতি বর্ষীয়া এক অনিন্দিতা যুবতীর গলা জড়াইয়া দণ্ডায়মান—যুবতীর ক্রোড়ে আড়াই বৎসরের এক শিশু; কি কমনীয় তা'র মূর্ত্তি—কি মধুর তা'র কচি মুখখানিতে হাসির রেখাটি—কি সুন্দর তা'র বড় বড় ওই চোখ্ দুটি! কপালে কপোলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

অযত্ন-ন্যস্ত দীর্ঘ কেশরাজিতে তাহার মুখখানি পত্রপরিবৃত ফুলের মত সুন্দর দেখাইতে-ছিল। চিত্র দেখিয়া তাহার গায়ের রক্ত বরফের মত জমাট বাঁধিয়া গেল—নিশ্চল প্রস্তরের মত সে দাঁড়াইয়া রহিল। তীব্র স্মৃতির জ্বালায় তাহার হৃদয় জ্বলিতে লাগিল। মনে পড়িল সে খুনে,—ভগবানের চক্ষে না হউক, লোকের চক্ষে, সমাজের চক্ষে রাজ্যের চক্ষে সে খুনে! পুলিশের ভয়ে সে পলাতক! সতের বৎসরের পুরাতন স্মৃতি যেন তাহার হৃৎপিণ্ডটাকে সবলে টানিয়া ছিঁড়িতে উদ্যত হইল। হায়! এ যে তাহারই ছবি—অনেক দিনের পুরাতন ছবি। চক্ষু দুটি তা'র অশ্রুসজল হইয়া উঠিল! তাহারই প্রিয়তমার কোল আলো করিয়া তাহাদের প্রণয়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রিয়তম পুত্র 'জিম! হায়! সেই অতীত সুখের দিন! সে যে নির্দ্দোষ একথা সে কি বিশ্বাস করিবে? এই গৃহে সে চোরের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছে। সে যে পত্নীঘাতী নয় কাহার নিকট সে একথা বলিবে? কে তাহার বাক্য প্রত্যয় করিবে? নির্দ্দোষী হইয়াও আজ ১৭ বৎসর সে পথে পথে নিরাশ্রয়, অর্দ্ধাশনে, অনশনে, অনিদ্রায় সদাসশঙ্ক ভাবে দিনযাপন করিতেছে! যেদিন তাহার পত্নী আততায়ীর হস্তে (কে সে আততায়ী, নরঘাতক দস্যু কে জানে!) নিষ্ঠুর ভাবে হত হয়, যেদিন নির্ব্বোধ পুলিশের দল অন্য প্রমাণাভাবে তাহাকেই তাহার পত্নীর হত্যাকারী বলিয়া ধরিয়া চালান দেয়। সেই দিন হইতেই তাহার এই যন্ত্রণাময় জীবন আরম্ভ হইয়াছে,—পুলিশের হাজত হইতে পলাইয়া সে এই অজ্ঞাত বাস আরম্ভ করিয়াছে। প্রিয়তম পুত্র 'জিম্'কে ছাড়িয়া, সমস্ত সম্পৎ সুখ ত্যাগ করিয়া সে আজ সতের বৎসর এই দুঃখের জীবনকে বরণ করিয়া লইয়াছে,—আর যে-সে পারে না! এ জীবন যে তাহার নিকট বড় দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে!"

সহসা পশ্চাতে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুত হইল। সে যেমন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে যাইবে অমনি ব্যাঘ্রের মত এক বিংশতি বর্ষীয় যুবক তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। হস্তস্থিত গুপ্ত লণ্ঠন মাটিতে পড়িয়া গেল, অতর্কিত আক্রমণে কাবু হইয়া অবসন্নহৃদয় চোর স্বেচ্ছায় বন্দী হইল। ষোড়শ বর্ষীয়া অর্দ্ধবিকম্পিতা গোলাপের মত সুন্দরী এক কিশোরী গৃহস্থিত বৈদ্যুতালোকের কল-টিপিয়া যুবকের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুতের তীব্রালোকে চোর যুবকের মুখখানা একবার দেখিয়া লইল। একি! এযে সেই আড়াই বৎসরের শিশুর পরিণত বয়সেরই মুখচ্ছবি! মুখখানা যে জিমেরই মত! এ কিশোরী—তরুণী তন্বী কে? হয়ত ইহারই পত্নী! তাহার মনে হইল একবার সেই যুবককে আপনার বক্ষে জড়াইয়া ধরে,—সহস্র চুম্বনে তাহার মুখখানি ছাইয়া ফেলে, বক্ষে টানিয়া বলে—"আমার বুকের ধন বুকে আয়—আমি যেরে হতভাগ্য বাপ তোর!" কিন্তু সে সাহস হইল না—কি জানি, পাছে লোকে কিছু বলে, যদি না সে চিনিতে পারে—পাছে কিছু মনে করে—যদি চোরকে সে পিতা বলিতে ঘৃণা করে! হায়, হতভাগ্য! জীবনে তাহার ধিক্কার

হইল—তাহার ঘৃণিত জীবনের পরিচয় দিতে—সেই নিষ্কলঙ্ক কুসুমের পিতৃত্ব গ্রহণ করিতে—তাহার নিজেরই লজ্জা হইল। আপনার প্রতি একটা ঘৃণা একটা ধিক্কার তাহাকে নীরব করিয়া রাখিল। * * * প্রত্যুষে,—সে বন্দী হইয়া পুলিশের করে সমর্পিত হইল। অভিযোগ চুরি!

* *
*

সপ্তাহকাল পরে যুবকের নিকট পুলিশের বড় সাহেবের একখানা চিঠি আসিল,—"বন্দী হাজতে আত্মহত্যা করিয়াছে,—মৃত্যুর পূর্ব্বে সে অভিযোক্তা যুবকের নামে একখানা চিঠি রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাও এই সঙ্গে প্রেরিত হইল।" যুবক বন্দীর চিঠি খুলিয়া পাঠ করিল,—

"প্রিয়তম পুত্র,

তুমি আমায় চিনিতে পার নাই, কিন্তু আমি তোমায় চিনিয়াছিলাম। আমি তোমার সেই নিরুদ্দিষ্ট, লোকসমাজে ঘৃণিত, পুলিশ প্রপীড়িত হতভাগ্য পিতা! আমি নির্দ্দোষ কিন্তু সেকথা কে বিশ্বাস করিবে? যদি পার—বিশ্বাস করিও তোমার পিতা নর-ঘাতক দস্যু নয়,—যদিও ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আজ সে চৌর্য্য অপরাধে অভিযুক্ত তথাপি সে একটি দিনের জন্যও পরস্বাপহরণ করে নাই! তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিবে এই ভাবিয়াও আমি শান্তিতে মরিতে পারিব। পৃথিবীতে কেবল তুমিই জানিলে আমি নির্দ্দোষ!

ইতি—তোমার হতভাগ্য পিতা

টম্।"

যুবক আর্দ্র নয়ন মুছিয়া চিঠিখানা পেপার বাস্কেটে ফেলিয়া দিল!

শ্রীদানীশচন্দ্র সরকার।

কোথায়?

জীবনের মিছে আশা যত
ওগো তারা কোথা চলে যায়?
কোন সাগরের অতল গভীরে
কোন্ আকাশের অসীমায়?

ওগো তারা কোথা চলে যায়
পলকের হাসির বিজুলি?
কোন্ চিত্রকর তাদেরে লুকায়
বুলাইয়া আঁধারের তুলি!

কোন্ পথে পলায় কেমনে
নিমেষের কথা আর গান,
কোন জনমের বুকের মাঝারে
স্মৃতি হয়ে লভে অবসান?

ওগো ফিরে দে ফিরে দে তোরা
যত সব হারান নিমেষ,
শুধু তাই দিয়ে রচিব একেলা
আমার সে অসীমের দেশ!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

স্বর্গীয় ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৫০—মৃত্যু ১৯১৫, ২৯ শে জানুয়ারী।

আমাদের শ্রদ্ধেয় ও বিশেষ বন্ধু ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় আর ইহজগতে নাই। এই নিদারুণ সংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁর সুস্থ শরীর, আনন্দময় স্বভাব, ও যুবকের ন্যায় কাজে উৎসাহ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতাম। তাঁহার শরীরে কোন রোগের চিহ্নমাত্র ছিল না। তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ, চলা ফিরা এবং কর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া কখনও মনে হইত না তিনি এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন। সর্ব্বদাই কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। অসুখ হইয়াছে একথা তিনি কখনও বলিতেন না বা বলিতে দিতেন না। হায়! হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া—তাঁর পরিবার পরিজন ও বন্ধুবর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন। বিধাতার অভিপ্রায় কি তাহা তিনিই জানেন।

ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণ গাঁতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বর্গগত পণ্ডিত রামচরণ চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্থ পুত্র ছিলেন। তিনি ঢাকা ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। অধ্যয়ন পরে গিলক্রাইষ্ট স্কলারসিপ লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ বৎসর বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া Dr of Science উপাধি লাভ করেন। তৎকালিন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন; তাহার প্রমাণ তিনি Boxter physical Science Scholership এবং Hope Prize লাভ করিয়াছিলেন। আমরা যতদূর অবগত আছি এ পর্য্যন্ত কোনও দেশীয় বা বিদেশীয় ব্যক্তি এই দুইটি বিষয়ে এক সঙ্গে পারদর্শী হইতে পারেন নাই। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ডাক্তার অঘোরনাথ রসায়ন শাস্ত্রের বিশেষরূপ চর্চ্চা করিবার জন্য জার্ম্মাণীতে গমন করেন এবং Bohn বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর বিশেষ কৃতত্বের সহিত অধ্যয়ন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় হায়দ্রাবাদ নিজামরাজ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। সে সময় তাঁহার মত লোক হায়দ্রাবাদ নিজাম কলেজে না থাকিলে সেখানকার কলেজ আজ এরূপ ভাবে মাথা তুলিতে পারিত কি না সন্দেহ। হায়দ্রাবাদের সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ভক্তি করিত ও ভাল বাসিত।

দূর হইতে সকলে তাঁহাকে জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াই জানিতেন, কিন্তু যিনি তাঁহার সহিত একবার পরিচিত হইতেন তিনিই বুঝিতেন, যে, গভীর পাণ্ডিত্যের মধ্যে কিরূপ একখানি স্নেহময় কোমল হৃদয় লুকান রহিয়াছে। সর্ব্বদাই দেখিতাম তিনি প্রফুল্ল এবং এক মুহূর্ত্তও তাঁহাকে কাজ হইতে বিমুখ হইতে দেখি নাই। বাহিরের কাজ সারিয়া গৃহে আসিয়া পাঁচ মিনিট বিশ্রাম না লইয়াই কলেজ ও স্কুলের ছাত্রদের পড়াইতেন। সে পরিশ্রমের মধ্যে

তাঁহার নিজের কোনরূপ স্বার্থ ছিল না,—জ্ঞানের আনন্দ উপভোগ করা এবং পরোপকার করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কখনও তাঁহাকে বিরক্ত হইতে বা রাগ করিতে দেখি নাই। আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম "লোকে বলে যাদের রাগ নেই তারা মানুষই নয় এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?"—তিনি উত্তর দিলেন "নিশ্চয়ই এতো সত্যি কথা"।

"আমি তবে একটা কথা বলি ক্ষমা করিবেন আপনার তো রাগ নেই।" তিনি হাসিয়া বলিলেন "রাগ খুবই আছে কেবল সে জিনিষটার ব্যবহার করা হয় না।" কি সুন্দর কথা, কয়জন লোক এরূপ ভাবে ক্রোধকে জয় করিতে পারিয়াছেন।

ছোট বড় সকলেই নির্ভয়ে তাঁহার সহিত মিশিতেন। তাহার সরল শিশুর ন্যায় হাসিতেই তাঁর হৃদয়ের ছবি প্রকাশ পাইত। এমন অমায়িক এবং নিরহঙ্কার,—এমন স্নেহময় উদার হৃদয়,—এমন নির্দ্দোষ স্বভাব কমই দেখা যায়। একাধারে এরূপ জ্ঞানী ও গুণী আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যে কেহ তাঁহার নিকট আসিত প্রত্যেককেই তিনি নিকটতর করিয়া লইতেন এবং ভালবাসিতেন। তাঁহার গুণের কথা আমি আর বিশেষ করিয়া কি বলিব। আজ কত হৃদয় তাঁহার অভাবে হাহাকার করিতেছে। তাঁহার স্নেহের ঋণ শোধ হইবার নয়, কিন্তু তাঁহার স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ শতাংশের একাংশও আমরা তাঁহার জন্যে কিছু করিতে পারি নাই—এ দুঃখ জীবনেও যাইবে না।

ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিধাতা তাঁহার পরিত্যক্ত পুত্রকন্যা এবং বিধবা পত্নীর অন্তরে সান্ত্বনা দিন। তাঁহার স্বনামধন্যা কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কবি বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। আশা করি অন্যান্য পুত্র কন্যারাও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ধন্য হইবেন।

শ্রীঅনুপমা দেবী।

সমালোচনা

গীতগোবিন্দ। (মূল ও তাহার পদ্য অনুবাদ) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। কবি জয়দেব রচিত 'গীত-গোবিন্দ" ভাবের মহিমায় ও ছন্দের লালিত্যে বিশ্ব-সাহিত্যে অমরতা লাভ করিয়াছে। ইহার বহু গান বহু শ্লোক লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। সুকবি বিজয়চন্দ্র তাহারই সমগ্র পদ্যানুবাদ মূলসহ প্রকাশ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি সংক্ষেপে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা যেমন মধুর, তেমনই সুবিন্যস্ত হইয়াছে; তাহাতে গবেষণার হুঙ্কার নাই, ভাষার প্যাঁচ নাই—পাঠকের মনে সে সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু একেবারে গাঁথিয়া যায়। বাঙ্গালা অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যও তিনি বেশ দক্ষতার সহিত রক্ষা করিয়াছেন। না বাছিয়া যেখান-সেখান হইতে আমরা দুই একটি অনুবাদ মূলসহ উদ্ধৃত করিলাম—তাহা হইতেই লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। জয়দেব গাহিয়াছেন,

"নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুং।
বহুমনুতে ত্তনুতে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুং।

কবি বিজয়চন্দ্র অনুবাদ করিয়াছেন,

"সঙ্গীতে তব নামে করি কত সঙ্কেত
গাহিছেন হরি মৃদু বেণুতে;
তব তনু-পূত বায়ু ধূলি দেয় অঙ্গেতে,—
তিরপিত তবু সেই রেণুতে।"

জয়দেব গাহিয়াছেন,—

"মৃগমদরসবলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে।
বিহিতকলঙ্ককলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে॥"

বিজয়চন্দ্রের অনুবাদ,

"ললাট হইতে মুছি শ্রমজল, আঁক শুচি
ললিত-তিলক অতি যতনে;
কনক-চাঁদেতে যেন শোভিছে তিলক হেন;
ফুটিবে অমল শোভা বদনে।"

গ্রন্থের ছাপা-কাগজ প্রভৃতিও বেশ নয়নাভিরাম হইয়াছে।

ক্লিওপেট্রা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু এম, এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীমনোহরচন্দ্র বসু, কলিকাতা, ৬নং ভীম ঘোষের লেন। গ্রেট ইডিন্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি 'পঞ্চাঙ্ক বিয়োগান্ত নাটক'। লেখক 'ভূমিকায়' বলিয়াছেন, "মূল ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া কাল্পনিক চরিত্র-সংযোগে বাংলা রঙ্গালয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া এই নাটকটি রচিত। ইহা কোনও বিদেশী নাটকের অনুবাদ নহে। ফেরো-চরিত্রের অনেকটা আভাষ বায়োস্কোপ হইতে লওয়া। তা-ছাড়া সমস্ত চরিত্র গুলিই আমার নিজের কল্পনা।" সুখের বিষয়, এই নাটকখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ইহাতে নাটকীয় গতিটুকু বেশ সুশৃঙ্খল ধারায় বহিয়া চলিয়াছে—কোথাও জটিলতা নাই। ক্লিওপেট্রা-চরিত্রে উদ্দামতা ও তীব্র রোমান্সের একটা ঝাঁজ আছে। এণ্টনি-চরিত্র একেবারে নিখুঁত না হইলেও তাহাতে অসন্তোষ ও চাঞ্চল্যের দাহটুকু মোটের উপর মন্দ উপভোগ্য হয় নাই। লাসোর চরিত্রে লেখক স্বদেশ-প্রেম ও এণ্টনি-ভক্তির যে রেখাপাত করিয়াছেন, তাহাতে একটু আতিশয্য-দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইল—চরিত্রটি তেমন সজীব নহে, অনেকটা পুঁথিগত ও নাটকের দৃশ্য-বর্দ্ধনের সহায়তাই শুধু করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। নাটকে এ চরিত্রটি না থাকিলে কোনও ক্ষতি হইত বলিয়া ত মনে হয় না। নাটকে কথা-বার্ত্তার ভাষায় ও ভঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব এতখানি পড়িয়াছে যে অনেক স্থলে তাঁহার ব্যবহৃত ছত্রের পুনরাবির্ভাবও ঘটিয়া গিয়াছে; যথা ক্লিওপেট্রা এক জায়গায় বলিতেছে, "রাণীর প্রেম হিংসার চেয়েও নিষ্ঠুর—নিয়তির চেয়েও দুর্ব্বার—খড়্গের চেয়েও কঠোর।" আবার এণ্টনি বলিতেছে, "আজ আর তার হৃদয়ে সে বল নেই, বাহুতে সে শক্তি নেই—আজ তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে।" ইত্যাদি। অবশ্য এমন কথা আমরা বলি না যে লেখক ইচ্ছা করিয়াই এ ছত্রগুলি ব্যবহার করিয়াছেন—অপ্রতিহত

ভাবেই হয় ত আসিয়া থাকিবে। গানেও তেমনই কয়েকস্থলে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা আসিয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নর্ত্তকীরা গাহিতেছে, "ওগো যৌবনখানি মম—নিঙাড়ি এনেছি পায়ে আজিকে দলিত দ্রাক্ষাসম।" লেখক সুশিক্ষিত, নাটক-রচনায় তাঁহার হাত আছে, তাঁহার ভাষাও শক্তিমানের ভাষা।—সেইজন্যই ত্রুটিগুলির প্রতি আমরা বিশেষভাবে ইঙ্গিত করিলাম। আশা করি, এগুলির প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখিবেন। কারণ তাঁহার নিকট হইতে আমরা নির্দ্দোষ-সুন্দর নাটকের প্রত্যাশা করি। ক্লিওপেট্রার ছাপা-কাগজ ভালো; কভারে এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার একখানি ক্ষুদ্র রঙ্গিন ছবি আছে।

সপ্তস্বরা। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 'মানসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। প্যারাগণ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানিও কবিতা-পুস্তক। লেখক কবিতাগুলির স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পল্লীসপ্তক, বর্ণসপ্তক, পূজাসপ্তক, সুরসপ্তক, শোভাসপ্তক, নারীসপ্তক ও গীতিসপ্তক। প্রত্যেক বিভাগে সাতটি করিয়া কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'পল্লী-সপ্তকে'র কবিতাগুলিতে বঙ্গপল্লীর অনাড়ম্বর সরল সৌন্দর্য্যটুকুর সুন্দর রেখাপাত হইয়াছে —কবিতাগুলিতে 'নীরব দুপুরে ঘুঘুর ডাক', 'পল্লী রূপসীর কাঁকণে-কলসে বেজে ওঠা ছন্দ' যেমন বিচিত্র সুরে বাজিয়াছে, পল্লীর আনন্দ, উৎসব ও সুখ-দুঃখের রাগিণীও তেমনই তাহারই পাশে পাশে রণিয়া উঠিয়াছে। তবে কবি এখনও নবীন, তাই মাঝে মাঝে ভাষা একটু জটিল হইয়া পড়িয়াছে—ভাবও দুই চারি স্থলে অবাধে সাড়া দিয়া উঠে নাই—ছন্দেও ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। "যুবতীরা অসংকোচে ডুবিয়ে দেহবল্লরী —ভাসিয়ে ঘড়া গা হাত মাজে ঝুমঝুমিয়ে মল চুড়ি।" এ সুরটুকু সহজ বা সরল নহে; অথচ, অপর কবিতায় "পুরুষ দেখে নাইতে যেতে গিন্নি ঝি-বউ নিয়ে—রাস্তা ছেড়ে পিছন ফিরে দাঁড়ান ঘোমটা দিয়ে"—চিত্রটুকু সুন্দর। 'নারী-সপ্তকে'র অধিকাংশ কবিতাই আমাদের ভালো লাগিয়াছে। লেখক 'বঙ্গ-বধূর যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা দিব্য মধুর হইয়াছে—যেমন স্বাভাবিক, তেমনই মনোরম।

"বাসন মাজা, ঘরনিকান, পিদিম-সজি করা
জল তোলা আর কাপড় কাচা, ছেলে-পিলেও ধরা
বাটনা বাটা, কুটনো কোটা রান্না-বাড়ি কাজে
এমন নিপুণ একটু মেয়ে,—কোথায় বা আর আছে!
সবার শেষে পাতের ভাতে লাগে কাহার সুধা—
অতিথ এলে সময় গেলে কার থেকে যায় ক্ষুধা?
প্রেমের তরে প্রেমাস্পদের কোথায় এমন দাসী?
বাংলা দেশের বঙ্গবধূ—ধন্য সে-দেশবাসী।"

'নারী' কবিতাটিও ভাবৈশ্বর্য্যে মণ্ডিত, মহিমায় উজ্জ্বল।

"রূপের প্রতিমা নারী পরিচয় রূপেরি কেবল
রূপেই সম্মান,
নারীত্বের এমন দুর্নাম? নহে এ ত উপাসনা
ঘোর অপমান!

* * * * *

বাহিরের চাক্‌চিক্য ক্ষণিকের এই আবরণ—
রঙ্গীন্ মলাট,—
এত তার স্তব গান! তারি হেন বিজয়-নির্ঘোষ?
এত তার ঠাট।
আনিতম্ববিলম্বিত এই ত্রস্ত চিকুর কলাপ
এ হেম বরণ,
এ বিলোল অনাবিল সলীল চাহনি ভঙ্গী
ললিত চরণ—
এর মাঝে আছে শুধু একখানি অলক্ষিত প্রাণ
সুন্দর সে কত;

* * * * *

দেখিবে এ রূপ যদি এস তবে ঝাঁপ দিয়ে পড়
মায়ের হৃদয়ে,
কি যে সে গরিমাময় সরত সুন্দর রূপখানি
আত্মবিনিময়ে!
ভগ্নীর হৃদয়-সৌধে আয় ওরে অনর্গল দ্বার
খোলা আছে পড়ি—

উদগ্র সে বাহুদুটি প্রসারিত দ্বারপথে অই
নিতে গলা ধরি।

দয়িতার বক্ষ-দ্রাক্ষা -কুঞ্জবনে এসে দেখ রূপ
উজ্জ্বল মধুর—" ইত্যাদি

ছন্দগুলি চমৎকার, কবি-হৃদয়তার পরিচায়ক বটে। 'গীতি-সপ্তকে'র কয়টি কবিতায় লেখক কৌতুক-রস অবতারণার চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু কৌতুক-রসে তাঁহার শক্তির সেরূপ পরিচয় পাইলাম না। এ কবিতাগুলিতে কৌতুকরস ত উথলিতে পারেই নাই, উপরন্তু ছন্দে, রীতিমত জটিলতা থাকায় বর্ণনাও পরিস্ফুট হয় নাই। 'পুজাসপ্তকে' লেখক রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাপতি ও দ্বিজেন্দ্রলাল ও মাইকেল মধুসূদনের আরতি করিয়াছেন ও সেই প্রসঙ্গাবলম্বনে তাঁহাদের কয়খানি প্রতিকৃতিও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, 'সপ্তস্বরা' পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। কবির সাধনা সফল হৌক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। বহিখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই চমৎকার হইয়াছে।

তৃষা। শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ সরকার প্রণীত। কলিকাতা, নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয় হইতে এস, কে, বাগচি কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। এখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস। পুস্তকখানির প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

খঞ্জনী। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, 'মানসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। প্যারাগণ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এখানি ক্ষুদ্র 'গীতি-কাব্য'; খণ্ড ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। অধিকাংশই ইংরাজীর অনুবাদ এবং 'অনেকগুলিই লেখকের বাল্য-রচনা।' কবিতাগুলি মোটের উপর মন্দ নহে।

মুকুল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত। শিলচর ১৩২১। মূল্য আট আনা; বাঁধাই দশ আনা। এখানি কবিতা-পুস্তক; বিশেষত্ব-হীন রচনা।

মোহ-মুদ্গর। মূল ও বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য এক আনা।

খেয়াল। শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী-প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীতারকনাথ বাগচী, ৯।২ নং গৌর লাহা ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা, কলিকাতা। অবসর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। এখানি কবিতা-পুস্তক। লেখক "মুখ-বন্ধে" বলিয়াছেন, "মনে যদি ভাব ওঠে, কে রাখে তা চেপে। যে রাখে সে বোবা হয়—নয় যায় ক্ষেপে।" তাই তিনি ছোট-খাট যে ভাবটুকু যখনই মনে আসিয়াছে, তাহাই ছন্দাকারে গাঁথিয়া গিয়াছেন। অনেকগুলি কবিতাই চুটকির ধরণে লিখিত—সেগুলি ভাবৈশ্বর্য্যে ও প্রকাশের সরলতায় প্রবাদের মতই লোকের মুখে মুখে চলিবার মত হইয়াছে। কবিতাগুলি আগাগোড়া ঝরঝরে; সরসতাও অধিকাংশ স্থলে নিপুণতার সহিত রক্ষিত হইয়াছে, পড়িতে বাধে না। দুই-একটি চুটকি কবিতা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না;—

"প্রেম যদি চাও, তবে চেয়োনাক মান।
এক কোষে দুই অসি—কোথা বর্ত্তমান।"
"হৃদয়-বিহীন রূপ—রূপই কেবল।
ভিতরটা সব ফাঁপা, যেন ফুটবল।"

অনেক কবিতায় ব্যঙ্গও তীব্র মধুর ফুটিয়াছে যেমন,—

"তাকিয়া তামাক তাস নিয়ে তোষামুদে।
বাঙ্গালী কাটায় কাল হায়, আঁখি মুদে।"
"ধর্ম্ম কর্ম্ম করে যারা চেঁচায় বেজায়।
ঘুড়ির লাঙ্গুল ধরে তারা স্বর্গে যায়।"
"তড়িৎ ও চাটুবাদ—পদার্থ এ দুটা।
শক্তিবলে এ ধরাকে করে আছে মুঠা।"

তবে চুটকি কবিতাগুলির ভাবের সহিত সর্ব্বত্র আমাদের মতের মিল নাই। আবার এমন কতকগুলি কবিতাও এই গ্রন্থে ছাপা হইয়াছে, ভাবে ও ছন্দে যেগুলি নিতান্তই দীন; সেগুলি প্রকাশ না করিলেই ভাল হইত। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ ভাল। গ্রন্থে স্বনামধন্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের একখানি ও গ্রন্থকারের নিজের একখানি—এই দুইখানি ছবিও প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

৩৮শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩২১ [১২শ সংখ্যা

বর্ষবিদায়

আয়রে দলে-বলে জুটে, আয়রে ছুটে নবপ্রাণ !
এবার ভবে তোদের পালা ; মোদের খেলার অবসান।

রৌদ্রে পোড়া দুঃখে ব্যথায়,
তরু-লতার ঝরা-পাতায়
লুটিয়ে পড়ে ঐ যে অতীত, ব্যর্থ করে অর্থ, মান।
বর্ষশেষে আয়রে হেসে, ওরে শিশু বর্ত্তমান।

পরাজিত জীবন-রণে
অন্ধ বৃদ্ধ, বিজন বনে
লুকিয়ে থাকুক ; আবার জাগুক বিশ্বজনের ইষ্টগান।
মুছিয়ে অশ্রু, ফুটাও হাসি গৃহে গৃহে বিশ্বপ্রাণ !

ওগো নবীন, ওগো তরুণ !
দৃষ্টি ফেলে মিষ্ট করুণ
প্রাচীনে আজ দাওগো বিদায় ; বর্ষ হল অবসান।
নবোৎসবের বিশ্ব-বাসে এস প্রভু ভগবান।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বসন্তের কথা

শীতাকাশে ধূসর ম্লানিমা আর নাই। দিক্‌চক্রবাল অন্তরাল করিয়া কুয়াশার যে ঘন যবনিকা আমাদের উৎসুক দৃষ্টিরোধ করিতেছিল তাহাও অন্তর্দ্ধান। প্রকৃতি যোগনিদ্রাহত ছিলেন তাই জীবনের গতি যেন স্থগিত ছিল; উৎসরাজির কলসঙ্গীত হিমানী-ব্যাঘাতে নিস্তব্ধ, স্রোতস্বিনীর স্রোতধারা শ্রান্ত মন্থরগতি, ম্রিয়মান-প্রবাহ, পত্রহীন রিক্ত তরুসমূহ মর্ম্মর গান ভুলিয়া মূক হইয়াছিল। গায়ক বিহঙ্গকুল দূরান্তর প্রবাসে; আশার কাকলি আর কে শোনায়? অন্তরে বাহিরে মৌন প্রতীক্ষা বিরাজ করিতেছিল। পৌষ মাঘে যে রস-সৌন্দর্য্যধারা ফল্গুর ন্যায় অন্তরবাহিনী ছিল, ফাল্গুনে আজ তাহা দিকে দিকে উৎসারিত; ধূসর আকাশের ক্লান্ত দৃষ্টি আনীল অপরাজিতার স্নিগ্ধ বর্ণে নয়ননন্দন, নবপল্লবশোভিত বনপ্রান্তর মর্ম্মর গানে মুখর, পিক পাপিয়ার ঝঙ্কারে আনন্দময়, শ্যাম-পত্রান্তরে কুসুমসুষমা বর্ণবৈচিত্র্যে নব বসন্তের অভ্যুদয় প্রচার করিতেছে, বৎসরের এই প্রভাত কাল, এই তরুণ কৈশোর অরুণ পুষ্পের লাবণ্য বহিয়া আনে, তাই আজ অশোক কিংশুকের প্রভাব, বলভদ্রের মদবিহ্বল নেত্রের মত আরক্ত পুষ্পসম্ভারে পথের দুইধারে বলরামচূড়ার বাহার। এ যে শীতাপগমে প্রকৃতির প্রথম জাগরণ, তাই অরুণোদয়ের বর্ণমাধুরী তাঁহার অঙ্গরাগে প্রোজ্জ্বল হইয়া ওঠে। সাজ তাঁহার আঙ্গিয়া আবীরে কুঙ্কুমে লালে লাল।'

শ্রীপঞ্চমীতে অলকে নব চূতমঞ্জরী দোলাইয়া, পীত উত্তরীয়াঞ্চলে বিকাশোন্মুখ তনু অঙ্গযষ্টি আচ্ছাদন করিয়া বাসন্তী লক্ষ্মী আসিয়া দেখা দেন। চারিদিকে পূজার আয়োজন পড়িয়া যায়, নবমালতী কুসুম বিকাশ চেষ্টায় উৎসুক হইয়া তাহার কোরকাবলিকে বিদীর্ণ করিয়া দেয়, চারিদিকে কুঞ্চিত দল ছড়াইয়া পড়ে, সৌরভে দিক্-প্রাঙ্গণ প্লাবিত হইয়া যায়। আম্রশাখার প্রবালরক্ত-কিশলয়ের পাশে পাশে মুখ রাখিয়া শুক-বক্ষ-পীতবর্ণ নব মুকুল ফুটিয়া ওঠে, সুগন্ধের মৌন মধুর স্বাগত জানাইয়া তাহারা মুখর কলকণ্ঠ পিক-বৈতালিক দলকে আবাহন করিয়া আনে, প্রহরে প্রহরে আনন্দের নহবৎ বাজিতে থাকে। সে সাড়ায় বনানীর তোরণাবলীতে আরক্ত পুষ্পস্তবক প্রস্ফুটিত হয়, অশোক পলাশ কিংশুক অগ্নিরাগপ্রভায় অহোরাত্রি হোমাগ্নি জ্বালাইয়া রাখে, বর্ণে গন্ধে গীতে পূজার আয়োজন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

শরতের শেষ-দিনগুলির সহিত এই নবীন বসন্তের বড় একটি সাদৃশ্য আছে, আকাশ তেমনি অপার সুনীল বর্ণ, স্বচ্ছ উজ্জ্বল; মেঘলেশহীন, বসন্তের প্রারম্ভে তরুরাজির পল্লবসজ্জা তখনও সম্পূর্ণ পর্য্যাপ্ত হয় না, প্রায় শেষ শরতে তাহার সব পাতাগুলি তখনও ঝরিয়া যায় না।

শস্যশ্যামল প্রান্তর প্রচুর শিশিরপাতে অধিকতর লাবণ্যময়, পাখীর গানের তখনও বিরাম হয় না। কোকিল পাপিয়া দূরান্তর প্রবাসে যাইবার পূর্ব্বে, একবার প্রাণ ভরিয়া গান গাহিয়া লয়, বিদায়কে মিলনের মতই রমণীয় করিয়া তোলে। প্রভাতের অতি সুকুমার কুয়াসা সূর্য্যোদয়ে অমল শুভ্র, সন্ধ্যায় নারাঙ্গী-রাঙা হইয়া উঠে। শীত-শেষ বসন্তের সূচনা মনে জাগাইয়া তোলে। তাই শীতের ধূসর রাজ্যে প্রবেশ করিবার সময়ও আমরা বসন্তের স্বপ্নে উদ্‌ভ্রান্ত হই। নব চূতাঙ্কুরের পীত লাবণ্য, অশোকের অরুণ বর্ণ থাকে না সত্য, তবে দিগন্তচুম্বি প্রান্তরে আপক্ক ধান্যমঞ্জরীতে কনক শোভা জাগিয়া ওঠে, শেফালি অজস্র ফুটিতে থাকে, এই স্নিগ্ধ সুরভি পূজার ফুলগুলির নবনীত শ্বেত কোমল দল, দীপ্ত রক্তিম সুকুমার বৃন্তের উপর ভর করিয়াই ফুটিয়া ওঠে। হায়! আমাদের জীবনের শারদ আশ্বাস জীবন কৈশোরের অশোক আশার আশ্রয় করিয়াই সঞ্জীবিত থাকে।

আমাদের দেশের প্রকৃতিতে বসন্তের প্রাদুর্ভাব বড় কম, সে আসে আর যায়। অশোক ফুটিয়া উঠে, আবীরের ছড়াছড়ি পড়িয়া যায়, বাঁশী বাজিতে থাকে তবে সে কত দিনের জন্য? হয় এক পক্ষ, নয় বিশটি দিনের মত। তাই হোরির আমোদে একটু বাড়াবাড়ি, কিঞ্চিদধিক চীৎকার শোনা যায়। যাহা ফুরাইয়া যাইবার ভয়ে ভঙ্গুর, যাহা ক্ষণিকের আনন্দে স্বপ্নময় তাহাই লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। মাঝে হইতে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না, বাকি থাকে শ্রান্তি গ্লানি, দীর্ঘ জাগরণের রাঙা চোখ আর ভাঙ্গা গলা!

বসন্তের এই যে অন্তরহীনতার কথা বলিলাম, আবার অন্য দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে, দেখিতে পাই ঠিক বলা হইল না। মুকুলের মধ্যেই ত পরিণতির সূচনা বাস করে। মুকুলের আভাসের মত বর্ণ গন্ধ, ফলের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া, বাস্তবতা লাভ করে; শুধু তাই নয় মুকুলের মধ্যে যে স্বাদের অস্তিত্ব আমরা জানিতাম না, ফলে তাহা পরিপক্কতার মধুরতায় রসে ভরপুর হইয়া উঠে। প্রত্যক্ষ না হইয়াও এই সবই তো মুকুলের ক্ষণিকতার মধ্যে জীবন্ত ছিল, অন্তরে তাহার নিঃস্ব শূন্যতা নয়, পরিপূর্ণ প্রাণ ছিল বলিয়াই এমন সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের বিকাশ সম্ভব হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখিতে গেলে সম্পূর্ণতার অপেক্ষা সূচনাই অধিক প্রাণ-সার। সম্পূর্ণতা অর্থে বিরাম, শেষ, অনন্তের অধিকার সেখানে সীমাগ্রস্ত; কিন্তু প্রারম্ভ, প্রথম বিকাশ-চেষ্টার মধ্যেই অনন্তের আবাহন, বিসর্জ্জন নহে। বসন্ত বৎসরের সূচনা বলিয়াই অন্তহীন সম্ভাবনার সঙ্গোপন আকর।

বসন্তে ফুলের বর্ণ লাবণ্য যত প্রচুর, সুগন্ধ-গৌরব তত নাই, এ যেন রূপের বিকাশ,—মন তখনও জাগে নাই। ইহার উৎসবের মধ্যেও মনের গভীরতার অভাব দেখিতে পাই। দোললীলা এই মধু ঋতুর আনন্দ-অনুষ্ঠান। এই দিনে আমরা যাহাদের সঙ্গে হোরি খেলা করি, তাহাদের সঙ্গে হয় কোন সম্পর্ক থাকেনা, নয়তো

কেবলমাত্র কৌতুকের সম্বন্ধ; যে রং গায়ে ছড়াইয়া দি, তাহাও ঝরিয়া পড়িয়া যায়, যে কুঙ্কুম ছুঁড়িয়া খেলি, তাহারো চিহ্ন বড় বেশী দিন থাকেনা, ধুইয়া ফেলিতে যা বিলম্ব, তাহার পর গ্রীষ্ম যায় বর্ষা গত হয়, শ্রাবণের শেষপূর্ণিমায় নীরবে দক্ষিণ হাতে এক একখানি রাখি বাঁধিয়া লই। এই বন্ধন যাহার প্রকোষ্ঠে বাঁধিয়া দি তাহার সঙ্গে বড় একটি পবিত্র মধুর সম্বন্ধের স্থাপনা হয়। তিনি আমাদের রাখী ভ্রাতা। রাঙা রেশমের সুকুমার বন্ধনটি খুলিয়া ফেলিয়া দিলেও, সে সম্বন্ধ ঘোচেনা, রাখী ভ্রাতা বন্ধুর চিরজীবনের আর্ত্তি সহায়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কোকিল

কোকিল আমাদের দেশে বেশ পরিচিত। বসন্তকালে কোকিলের প্রাণোন্মাদী কুহুধ্বনি বিরহব্যথাক্লিষ্ট নরনারীর প্রাণে ব্যথা জাগাইয়া তুলে। কবি ও প্রেমিকের নিকট কোকিল বড়ই আদরের জিনিষ। ইহাদের ডিম পাড়িবার প্রথা অনন্যসাধারণ। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রবন্ধের চিত্রগুলির সহিত মিলাইয়া প্রবন্ধটি পাঠ করিলে আমরা অনেক জিনিষ শিক্ষা করিতে পারিব। চিত্রগুলি মিঃ আলফ্রেড টেলর কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে অঙ্কিত।

কোকিল ডিম পাড়িবার সময় নিজে যে বাসা তৈয়ারী করে না, ইহা সকলেই জানেন। আমাদের দেশে তাহারা সাধারণতঃ কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। পাশাপাশি দু' তিনটি বাসা দেখিয়া জানা গিয়াছে যে, একই কোকিল ভিন্ন ভিন্ন বাসায় এক একটি ডিম পাড়িয়াছে। কোকিল একেবারে কতগুলি ডিম পাড়ে তাহা ঠিক করা দুরূহ। বোধ হয় প্রথম চারিটি পাড়ে, পরে মাসখানেক পরে আরও চারিটি পাড়ে। কাক কিম্বা অপর কোন পাখীর বাসায় ডিম পাড়িয়া নিজের ছানাগুলির ভরণপোষণের ভার সে পালক পিতা মাতার উপর ন্যস্ত করিয়া চলিয়া যায়।

কোকিল ছোট ছোট পাখীদের বাসাতেও ডিম পাড়ে। কোকিলের ডিম আকারে খুব ছোট। সেইজন্যই অন্য পাখীরা সেগুলিকে নিজেদের ডিম বলিয়া মনে করে। কোকিল প্রথমে মাটিতে ডিম পাড়ে। তারপর ঠোঁট কিম্বা পায়ের দ্বারা সেই ডিম অন্য পাখীর বাসায় রাখিয়া আসে। সে ইহাকে নিজের ডিমের সহিত তা দেয়।

কোকিল যখন ডিম রাখিবার জন্য বাসা খুঁজিয়া বেড়ায় তখন কোন স্থানে সে শূন্য নীড় দেখিলে প্রায়ই সে একটি ডিম তাহাতে পাড়িয়া যায়। আর যে সকল বাসায় ডিম আছে, সেখানেও নিজের ডিম রাখিয়া যায়। আসন্নপ্রসবা পাখীর বাসাতেও

বোধ হয় রাখে। ডিমশূন্য বাসায় নিজ ডিম রাখিবার পূর্ব্বে বাসাটিতে অপর পাখী যে যথার্থই বাস করে, তাহা সে ভাল করিয়া দেখিয়া লয়। কোকিল ডিম রাখিয়া গেলে বাসার পাখীরা হয় এই অতিরিক্ত ভার আদৌ লক্ষ্য করে না, কিম্বা জানিতে পারিলেও অপরিবর্জ্জনীয় বোধে নিজেদের ডিমের সহিত তাহাতেও তা দেয়। কোকিল নিজের ডিম এমন বাসায় রাখিয়া যায়, যাহাতে ডিম ফুটিয়া উঠিলে, ছানারা উপযুক্ত খাদ্য পাইবে। অন্য ডিমগুলি পরীক্ষা করিয়া তবে কোকিল সে বাসায় নিজের ডিম রাখে। কারণ সেই বাসার ডিমগুলি ফুটিবার সময় হইয়া আসিলে ছানাদের অঙ্গসঞ্চালনে তাহার ডিমটি ফাটিয়া যাইতে পারে। এই সব পরীক্ষা করিবার সময় কোকিল নিজ বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় প্রদান করে।

প্রতিপালিকা ষোল সতের দিন ডিমগুলিতে তা দিবার পর তাহাদের ফুটিবার সময় আসে। অন্য ডিমগুলি ফুটিবার দু একদিন পূর্ব্বে কোকিলের ডিম ফুটিয়া উঠে। কোকিলের ক্ষুদ্র ডিমের সহিত ছানার তুলনা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলে হয়। ডিম হইতে বাহির হইয়া কোকিল-ছানা যেন কোন ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র বলে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। দু'তিন ঘণ্টা পরে ইহার আকার দেখিলে কেহ বলিবে না যে, সে অত ছোট ডিমের ভিতর ছিল। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ডিমটি খুব ভারী এবং খোলার ভিতর নিশ্চয়ই অদ্ভুতভাবে ঘননিবিষ্ট।

চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়া গেলে, বাসার অপরাপর জিনিষ কোকিলছানার নিকট বড়ই বিরক্তিজনক লাগে। সে বেশ বুঝিতে পারে যে, অপর ডিমগুলি ফুটিয়া উঠিলে, তাহারাও তাহার খাদ্যে ভাগ বসাইবে। সেইজন্য অপর ডিম বা ছানাকে বাসা হইতে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করে। মাতার গুণ সর্ব্বাংশে সন্তানে বর্ত্তমান আছে। কোকিলমাত্রই অতীব স্বার্থপর ও বুদ্ধিমান।

কোকিলছানা নিম্নলিখিত উপায়ে অপর ডিম বা ছানাগুলিকে বাসা হইতে ফেলিয়া দেয়। সে প্রথমে বাসার সব নীচে চলিয়া যায় এবং ডিমগুলির ঠিক নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হয়। তারপর একটি ডিমকে পিঠের উপর চড়াইতে চেষ্টা করে। ডিমটি পিঠে চড়াইয়া পা দুটি সোজা করিয়া দাঁড়ায়। তখন পিঠস্থ ডিমটি বাসা ছাড়িয়া উপরে যায়। এই অবস্থায় একটু নাড়া পাইলেই ইহা পিঠ হইতে গড়াইয়া নীচে পড়িয়া যায়। কোকিল ছানা বুক ও ডানার সাহায্যে ধাক্কা দিয়াও ডিম নীচে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করে। নীচে যদি বা না ফেলিতে পারে ডিম-

বাচ্ছা কোকিল পিঠে করিয়া ডিম ফেলিয়া দিতেছে

গুলিকে মাঝে মাঝে বাসা হইতে একটু দূরেও ফেলিয়া দেয়। তাহার পক্ষে এই কার্য্য বিশেষ শ্রমসাধ্য নহে। এই প্রকারে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে বাসার অন্য জিনিষ-গুলি দূরীভূত হইয়া যায়। অপর ডিম ও ছানা সবই অদৃশ্য হইয়া পড়ে। তখন পালক পিতামাতা এই বলপূর্ব্বক অধিকারকারীর খাদ্য জোগাড় করিতে বিশেষ যত্ন সহকারে পরিশ্রম করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোকিলছানা আশ্চর্য্য দ্রুত গতিতে বাড়িতে থাকে। শীঘ্রই সে এত বলবান হইয়া উঠে যে পালক পিতা মাতাকে আর দু'তিন দিন মাত্র কষ্ট করিতে হয়। কোকিলছানার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তাহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হয়। তিন দিনের দিন কোকিলছানার দেহের আয়তনে বাসাটি প্রায় জুড়িয়া যায়। সেই সময় ইহাকে দেখিতে বড়ই বিশ্রী, কয়লার মতন কাল ও প্রকাণ্ড হাঁ বিশিষ্ট। উহাকে একটু রাগাইয়া দিলেই হাঁ এত বাড়িয়া উঠে যে, মুখের ভিতরের প্রকাণ্ড লাল গর্ত্তটি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পালক পিতামাতার প্রাণে দয়া মায়া না থাকিলে, তাহারা এই অপরিচিত অদ্ভুতাকৃতি ছোট প্রাণীটির আহার যোগাইতে এত কষ্ট স্বীকার করিবে কেন? অতএব কোকিল এবং ঐ জাতীয় অপর দু'একটি পাখী ব্যতীত সকল পক্ষীই সন্তান-বৎসল ও স্নেহশীল। আমরা মোরগীকেও পাতিহাঁসের ছানার দলকে আহার দিতে ও লালনপালন করিতে দেখিয়াছি।

প্রথম আট দিন কোকিলছানার মাংসই বাড়িতে থাকে; তাহার পালক তত বেশী গজায় না। তখনও ইহা দেখিতে

কোকিল-ছানার আহার

কুৎসিত। কিন্তু শীঘ্রই সরু সরু পালক গজাইতে আরম্ভ হয়। দিন দুই বাদে, পালক এত দ্রুত গতিতে বাহির হইতে থাকে যে, তখন তাহাকে দেখিতে বেশ সুন্দর হয়। এরূপ পালক-গজানো আমরা মাছরাঙ্গা পাখীতেও লক্ষ্য করিয়া থাকি।

ইহার সব পালক বাহির হইলে, শরীরের ভারে বাসাটি নীচে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়। মাটীর উপর বাসা থাকিলে, সেখানে কোকিলছানা প্রথম উড়িবার কিছুদিন পূর্ব্বে বাসাটি শূন্য করিয়া দিয়া ঘাসের ভিতর গুঁড়িসুড়ি মারিয়া থাকে। জমির উপর যে সকল গরু ছাগল চরে তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলেই সে সতর্ক হইয়া ডানা নাড়িতে থাকে এবং সর্পের ন্যায় হিস্‌হিস্ শব্দ করে। তাহাতেই তাহারা অন্য দিকে সরিয়া যায়। অন্ধকারে ভয়জনক চীৎকার করিয়া সে আপনাকে রক্ষা করে। এ চীৎকার তাহার স্বতন্ত্র।

কোকিল-ছানার প্রথম উড়িবার অবস্থা

ডিম ফুটিবার প্রায় একুশ দিন পরে কোকিলের উড়িবার সময় হয়। হঠাৎ একদিন সে প্রথম উড়িতে যায় কিন্তু পালক পিতামাতার কার্য্য তখনও শেষ হয় নাই। আরও কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া তাহারা ইহার তত্ত্বাবধান করিতে থাকে। কোকিল ছানা উড়িতে থাকে আর তাহারা মুখে খাবার লইয়া ইহার পিছু পিছু দৌড়ায়।

ভাল করিয়া উড়িতে শিখিলে, ইহার ফোটেগ্রাফ তোলা আদৌ সুবিধা-জনক নহে। সেইজন্য টেলর সাহেব এই অবস্থায় একটি কোকিল ছানা আনিয়া তিন মাস রাখিয়াছিলেন এবং ইহার দেশান্তরে গমনের সময়াবধি বিশেষ মনোযোগ সহকারে ইহার গতিবিধি পর্য্য-বেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে কোকিল বড় হইয়া উড়িতে শিখিলে পালক পিতামাতা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয় এবং অত্যধিক পরিশ্রমের পর বিশ্রাম লাভ করিতে পাইয়া বাঁচে।"

কোকিলছানাকে বাড়ীতে রাখিতে হইলে বিশেষ যত্ন লইতে হয়। প্রথমত ইহাকে বেশী খাইতে দিতে নাই। কারণ যত খাবার দিবে ততই সে খাইতে চাহিবে। কীট পতঙ্গই ইহার প্রধান খাদ্য। ইহাকে অল্প অল্প করিয়া অনেক বার খাইতে দিতে হয়। খাদ্য ইহার মুখে দিয়া দিতে হইবে, নচেৎ না খাইয়া মারা যাইবে তবু নিজে খাদ্য লইয়া খাইবার চেষ্টা করিবে না। খাঁচার ভিতর প্রচুর খাদ্য রাখিয়া দিলেও সে ইহার কণাও মুখে দিবে না।

টেলর সাহেবের কোকিলছানাটি বেশ পোষ মানিয়াছিল। সে সাহেবের কাঁধে ও মাথার উপর উড়িয়া বসিত। একদিন সাহেব ইহাকে গাছের ডালে বসাইয়া ইহার ফোটো তুলিতেছিলেন, পাখীটি হঠাৎ উড়িয়া গিয়া একটী উচ্চ বৃক্ষের শিরে

কোকিলের দেশান্তরে যাইবার অবস্থা

গিয়া বসিল। তাহাকে ধরিবার জন্ত গাছে উঠিতেই সে আবার উড়িয়া অন্ত গাছে চলিয়া গেল। এইরূপে একগাছ হইতে অন্ত গাছে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। সাহেব শেষে হতাশ হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। তাঁহার দুঃখ হইল যে ছানাটি না খাইতে পাইয়া পাছে মারা যায়। তিনি দুই ঘণ্টা ধরিয়া কোকিল ছানাটির প্রতি নজর রাখিলেন। পরে দেখিলেন যে, ক্ষুধার জ্বালায় সে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এক জোড়া সুন্দর পক্ষী (chaffinch) আসিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিল।

বাল্যকালের ন্তায় এই পরপুষ্ট পক্ষীর পরবর্ত্তী জীবনও রহস্তময়, পক্ষিজীবনের সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। দেশ বিদেশের কবিরা বিভিন্ন ভাষায় ও ভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পশ্চিম আসিয়ার শৈবধর্ম্ম প্রচারের নিদর্শন

বৈদিক সময়ে যে কেবল শিবোপাসনার উৎপত্তি নহে কিন্তু শৈবসম্প্রদায়ের গঠনও হইয়াছিল সর্ব্বপ্রধান ঋগ্বেদেই তাহার প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ১৮শ সূক্তের ৭ম ঋকে যে "শিবাসঃ" শব্দ পাওয়া যায় ইহা পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎদিগের মতে বৈদিক ত্রিৎসু জাতীয় সুদাস রাজার সপক্ষ শিবোপাসকদিগেরই বাচক। তুগ্র নামক অনার্য্য রাজা ইহাদিগের অধিনায়ক ছিল। (১) ইহার সহায়তায়ই ত্রিৎসুগণ, পুরুচালিত ভরতদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ হিউয়েট লিখিয়াছেন—

But the Tritsu anticipated them in their policy and allied themselves with the Tugra, who are called by Vashistha the Shiva a generic name of the cattle-breeding races, whose father-god was Shiva." (২)

সমগ্র অনার্য্য তুগ্র জাতি শিবনামে "শিব" বলিয়া কথিত হওয়ায় আর্য্যদিগের শিবোপাসনাই যে অনার্য্যগণকর্ত্তৃক প্রথম অবলম্বিত হয়, তাহারই স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। পুরাণাদিতে দৈত্য-দানব-যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতির শিবই যে অভীষ্ট-দেবতারূপে পূজিত দেখা যায় তাহাও ইহারই সমর্থন করে।

পশ্চিম আসিয়ার প্রাচীন সভ্য জাতি সকলই পৌরাণিক দৈত্য-দানব রূপে বর্ণিত হইয়াছে ইহাই কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মত। পশ্চিম আসিয়ার প্রাচীন সভ্যজাতি

1 Vide "Vedic India' pp 327—28.

2. 'The Ruling Races of Prehistoric times" by J. F. Hewett p 113.

সকল যদি আর্য্যেতর দৈত্যদানব জাতিই হয়; তবে শিব তাহাদিগের পরমোপাস্য বলিয়া শৈবধর্ম্মের নিদর্শন যে বিশেষ ভাবে তাহাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহা সহজেই অনুমিত হয়। আমরা এক্ষণে সেই নিদর্শনের সন্ধানেই ব্যাপৃত হইব।

একাডিয়ানেরা পশ্চিম আসিয়ার সভ্যজাতি দিগের অন্যতম। ইহাদিগের দেবতারূপে শিবের (Sib or Shib) উল্লেখ পাওয়া যায়। (৩)

ইউরাল ও আল্টাই পর্ব্বতাধিবাসী ফিন্ জাতির দেবতা শৈবনামে অভিহিত। এই "শৈব" যে শিবনামেরই রূপান্তর মাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। শিব যে কেবল ফিন্ জাতিরই সাধারণ দেবতা, তাহা নহে. কিন্তু সমস্ত সেমিটিক্ জাতিরও তিনি দেব-পিতারূপে স্বীকৃত—

"He is the god Saiv of the Ural Altaic Finns, meaning the ,protecting god, an epithet of the deity, which is according to Castren, common to all the Ural Altaic tribes. He is also the Hindu shepherd God Sib or Shiva, and the father-god of the Semitic race, who called themselves the sons of Sheva or Sheba the seven gods" 'The Ruling races of Prehistoric times by J. F. Hewett p 362.

ফিন্ দিগের দেবতার 'রক্ষার্থ' শিবনামের মঙ্গলার্থ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে এবং সেমিটীক্ দিগের দেবতার 'সপ্ত' অর্থ শিবের অষ্টমূর্ত্তি নাম হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

বাইবেলের বর্ণনাতেও আমরা শিবের উল্লেখ প্রাপ্ত হই। তথায় শিব—চিয়ন্ (Chiun) নামে পরিচিত। (৪) এই চিয়ন্ চিভিন্ বা শিব নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ৪

বাইবেলের সৃষ্টিপ্রকরণের দশম অধ্যায়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম. অনুচ্ছেদে প্রাচীন বংশাবলীর বর্ণনায় আমরা হামের (Ham) বংশধরদিগের মধ্যে শিবদিগের উল্লেখ দেখিতে পাই যথা—

"6. And the sons of Ham; Cush and Mzarim, and Phut, and Canaan.

7. And the sons of Cush; Seba and Havilah, and Sabta, and Raamah, and Sabtecha: and the sons of Raama; Sheba and Dedan"

উপরে যে Sheba (শিব) দিগের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, আরবদেশের দক্ষিণাংশ পুরাকালে ইহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। (৬) উহারা তথায় শেবিয়ান্ (Sabaean) এই বিশেষ নামে অভিহিত হইত। 'শেবিয়ান্' নাম শেব নামেরই স্পষ্ট. অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। আরবের মক্কাস্থিত কাবামন্দিরের কৃষ্ণপ্রস্তর শিবেরই শিলারূপ বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে আরবে মহম্মদীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যে শৈব-

3. See "The Ruling Races of Prehistoric times." by J. F .Hewett Vol I p 221.

4. See "Prophet Amos V. 26.

5. Cyclopaedia of India Vol I, p 705.

6. See "The Ruling Races of Prehistoric Times by Hewett Vol I, 427.

ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহারই আভাস পাওয়া যায়। মহম্মদীয় ধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী শেবিয়ানিজম্ (Sabaeanism) নামক ধর্ম্মের কথা যে পুরাতত্ত্ব হইতে জানিতে পারা যায় তাহা শৈবধর্ম্মের নামান্তর বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে।

আসিয়া মাইনরের বর্ত্তমান মানচিত্রেও শিবনামের নিদর্শন অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে শিবস্ (Sibas) নামে একটী স্থান চিহ্নিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সহিত শিবেরই যোগ আছে বলিয়া বিশেষরূপেই অনুমিত হয়। বেদে শৈবধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে 'শিবাসঃ' রূপে আমরা উল্লেখ পাইয়াছি মানচিত্রের 'শিবস্' যেন তাহারই অনুকরণ।

আমরা যে শিবোপাসক আর্য্যেতর জাতিদিগের অধিনায়ক তুগ্রের কথা প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি, তাহার রাজ্যের নাম তুগ্র বা ত্রিগর্ত্ত ছিল। (৭) ইহা বর্ত্তমানে জলন্ধর নামে পরিচিত। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ হিউইট তদীয় "প্রাগৈতিহাসিক সময়ের রাজবংশাবলী" The Ruling Races of Prehistoric Times") নামক গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের যে মানচিত্র সংকলিত ও সংযোজিত করিয়াছেন, তাহাতে 'তুগ্রশিবও' ত্রিগর্ত্তের নামান্তর রূপে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে 'ত্রিগর্ত্তই' যে শৈবদিগের আদিস্থান ছিল, তাহা বিশেষ রূপেই প্রমাণিত হয়। গ্রীক্ ঐতিহাসিকদিগের বিবরণ হইতেও ইহার স্পষ্ট সমর্থনই পাওয়া যায়। গ্রীক্ ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো (Strabo) চেনাবের উত্তরে সিন্ধুনদের তীরেই 'শিবয়' (Seboi) নামক লোকদিগের স্থাননির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"And the Shiva are one of the tribes conquered by the Tritsu in the battle of the Ten kings. They are the Seboi, placed by Strabo on the Indus north of the Chinab." The Ruling Races of Prehistoric Times by J. F. Hewett Vol I p 222.

এই প্রকারে শিবধর্ম্ম ইহার আদিস্থান সিন্ধুনদের তীরদেশ হইতেই যে ক্রমে আসিয়ার পশ্চিমসীমান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নবাব

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মেলা।

"চমৎকার!"

"এমনটির তুলনা নেই, আর! সুন্দর!"

"এ যে নবাবের মূর্ত্তি! আর্টিষ্ট ফেলিসিয়ার হাতে গড়া! বাঃ, খাসা হয়েছে ত!"

মুগ্ধ দর্শকমণ্ডলী একবাক্যে শিল্পীর প্রতিভার সমাদর করিল। বিরাট মেলা, বিপুল জনতা। পথে গাড়ীর ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হয়, এমন সাধ্য কাহারও নাই। ভিতরেও লোক একেবারে গিস্-গিস্ করিতেছে। বড় বড় ডিউক, কাউণ্ট, রাজ-

7. See "The Ruling Races of Prehistoric Times" by Hewitt, Vol I. p 113.

কর্ম্মচারী, সম্ভ্রান্ত উপাধি-ধারী হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবধি সকলেই মেলায় উপস্থিত। বিবিধ শিল্পীর হাতের তৈয়ারী ছবি ও ধাতুমূর্ত্তি স্তরে স্তরে সাজানো রহিয়াছে—কিন্তু সকলের চেয়ে সেরা হইয়াছে, ফেলিসিয়ার হাতের মূর্ত্তিগুলি। বিশেষ এই নবাবের মূর্ত্তিটি! কাদার মূর্ত্তি—কিন্তু দেখিলে মনে হয়, নবাব নিজেই যেন বসিয়া রহিয়াছে। চোখের উপরকার ভ্রূর রেখাটুকু পর্য্যন্ত এমন সূক্ষ্ম, এমন সঠিক! নবাবের মূর্ত্তিটির কাছেই তাই বিশেষ করিয়া এতখানি ভিড় জমিয়াছিল।

একদল রক্ষীর অগ্রে টিউনিসের বে আসিয়া মেলায় প্রবেশ করিল। মূর্ত্তি-মণ্ডপে ঢুকিয়াই সম্মুখে সে দেখে, ফেলিসিয়ার হাতে গড়া সেই কুকুর ও শৃগালের মূর্ত্তি। চমৎকার! দেখিয়া বে'র তাক লাগিয়া গেল। মানুষ এমন নিখুঁতও গড়িতে পারে। আশ্চর্য্য! কুকুরের পায়ের নখটি হইতে মুখ-চোখের ভাবটুকু অবধি কি পরিপাটী! মনে হয়, কুকুরটা যেন ডাকিতেছে—এত নিপুণ হাতের টান! বে'র মুখে প্রসন্নতার একটা হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল। শৃগালের পিছনে কুকুরটা ছুটিয়াছে। দেহটাকে দীর্ঘভাবে ছড়াইয়া দিয়া কি অধীর আগ্রহেই কুকুরটা ছুটিয়াছে! তাহার মুখে চোখে একাগ্রতার রেখাটুকু নিপুণ শিল্পী কি সুন্দর টানিয়া দিয়াছে। শৃগালও ছুটিয়াছে—শৃগালের মুখে-চোখে ভয়ের চিহ্নটুকু কি স্পষ্ট, কি দীপ্ত! মূর্ত্তিটির তলে, টিকিট আঁটা—টিকিটে লেখা আছে "ডিউক দ্য মোরার সম্পত্তি।" এটি ব্রোন্‌জের মূর্ত্তি।

নিকটেই মেলার এক তরুণ কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন, মূর্ত্তির বিষয়টি এক প্রাচীন উপকথা হইতে গৃহীত। হেমারলিঙও বে'র পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। সে কহিল, "এটা ফেলিসিয়ার হাতে গড়া।"

"ফেলিসিয়া! কে সে?"

হেমারলিঙ্ কহিল, "একটি স্ত্রীলোক, বয়সও বেশী নয়—"

স্ত্রীলোক! স্ত্রীলোকের হাতে গড়া এই মূর্ত্তি! বেশ ত! বে'র মুখে একটা আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল,—চোখে প্রশংসার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। স্ত্রীলোকের হাতের তৈয়ারী! মৃণালের মত কোমল হাত কঠিন ব্রোন্‌জকে এমন বাগ মানাইয়াছে? চমৎকার! বে কহিল, "এঁর তৈয়ারী আর কোন মূর্ত্তি আছে?"

তরুণ কর্ম্মচারী কহিলেন, "হাঁ—এই লাইনের শেষেই আর একটা আছে। ঐ যে—যেখানটায় ঐ খুব ভিড় জমেছে। দেখতে পাচ্ছেন?" হেমারলিঙের সহিত বে অগ্রসর হইয়া চলিল। কিন্তু আগাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে উভয়েই চমকিয়া উঠিল। নবাব! নবাবের মূর্ত্তি—এ যে একেবারে হুবহু সেই মুখ! কোন তফাৎ নাই! যেন নবাব, স্বয়ং জীবন্ত নবাব বসিয়া আছে—তাহার ঠোঁটের কোণে সেই হাসিটুকুও লাগিয়া আছে। বে যেন জ্ঞান হারাইয়াছিল। সে চীৎকার স্বরে কহিল, "জাঁসুলে?"

একজন কহিল, "হাঁ—বার্ণার্ড জাঁসুলে—কর্সিকার নতুন ডেপুটি।"

বে হেমারলিঙের পানে চাহিল, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "ডেপুটি?" হেমারলিঙ প্রথমটা কেমন ভড়কাইয়া গেল,—তারপর সে ভাবটা কাটিলে মৃদু হাসিয়া সে কহিল, "হাঁ, আজ সকাল থেকে ডেপুটি বটে! কিন্তু এখনও প্যাকা রকম মঞ্জুর হয়নি।" তার পর এক নিশ্বাসেই সে কহিয়া গেল, "কিন্তু ফ্রান্স কখনই এই বোম্বেটেকে কৌন্সিলে বসতে দেবে না।"

নাই দিক—তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। হেমারলিঙের উপর বের যে অগাধ বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাসের উপর কে যেন প্রচণ্ড একটা ঘা মারিল! এই হেমারলিঙ কি জোর গলাতেই না বলিয়াছিল যে, নবাব কখনই ডেপুটি হইবে না! সে সম্ভাবনাও মোটে নাই—আর তাহার সেই কথার উপর বে কি অখণ্ড বিশ্বাসই না স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে! কিন্তু আজ এ কি! সেই বোম্বেটেকে শুধু আজ ডেপুটি করিয়াই ফ্রান্স বসিয়া নাই; মেলায় ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী সেই বোম্বেটেরই মূর্ত্তি গড়িয়া এত সম্মান, এমন গৌরব তাহাকে দান করিয়াছে! আবার এই মূর্ত্তির কাছেই যত লোক জড় হইয়াছে!

হেমারলিঙ এতটুকু হইয়া গেল। তাহার ললাটে স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল! সে না শুনিয়াছিল, নবাবের মূর্ত্তি ফেলিসিয়া শেষ করিয়া তুলিতে পারে নাই, এবং কাল রাত্রি পর্য্যন্ত মেলার তালিকায় এ মূর্ত্তির কোন নামোল্লেখও ছিল না! আজ সহসা বিনামেঘে একি বজ্রাঘাত! এটুকু জানা থাকিলে হেমারলিঙ কখনই বেকে এমন ঘটা করিয়া এখানে আনিবার কল্পনা করিত না! আনিলেও এ ধারটায় যাহাতে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সে সতর্ক থাকিত! হায়, হায়, কি ভুলই না হইয়া গিয়াছে! আবার ফেলিসিয়াকেও এখন উড়াইয়া দিবার উপায় নাই! এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নিজের মুখেই সে ফেলিসিয়ার গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছে! সেদিন সাঁতে-রুমা ষ্টেশনে নবাবের অত সাধ-আশায় বাজ ফেলিয়া মনে যে আনন্দের আলো ফুটিয়া ছিল, আজিকার এ ঘটনায় নিমেষে তাহা ম্লান হইয়া নিবিয়া গেল।

বে অনেকক্ষণ ধরিয়া নবাবের সেই মূর্ত্তির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মুখে কথা নাই—কুঞ্চিত ভ্রূ—কি এক চিন্তা সমস্ত মনটাকে যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে! এমন সময় নিকটেই একটা উচ্চ হাস্যরব শুনিয়া বে ফিরিয়া চাহিল। নবাব আসিয়াছে। নবাব এক তরুণীর সহিত কথা কহিতেছে। কে ও তরুণী? হেমারলিঙ কহিল, "ও-ই ফেলিসিয়া।"

সেখানে আরও চারি-পাঁচজন লোক দাঁড়াইয়া ছিল। সকলেরই বেশ সম্ভ্রান্ত ধরণের—দেখিলেই বুঝা যায়, তাঁহারা কেও-কেটা নহে। বে পরিচয়ে জানিল, ঐ যে কালো হ্যাট মাথায়, উনি ডাক্তার। জেঙ্কিন্সের মুখে একটা গর্ব্বস্ফীত দীপ্ত ভাব। তাহারই পাশে মাদাম জেঙ্কিন্স। মাদাম জেঙ্কিন্স ফেলিসিয়ার কারুকার্য্যের তারিফ করিতেছিল। জেঙ্কিন্স বিশেষ করিয়াই আদেশ দিয়াছিল, "ফেলিসিয়ার সঙ্গে আলাপ করগে—তার কাজের তারিফ করগে।" বেচারী মাদাম,—কি করিবে সে?

লোকের মুখে যে কথাটা ঘুরিয়া ফিরিত, মাদামের কাণে তাহা পৌছিতে বাকী ছিল না। মনের মধ্যে আগুণ চাপিয়া তাই সে ফেলিসিয়ার করকম্পন করিল। সে জানিত, ডাক্তারের বুকের মধ্যে ফেলিসিয়ার প্রতি কি ভাব জাগিয়া রহিয়াছে—কিন্তু কোন দিন সে বিষয়ে সে এতটুকু ইঙ্গিত করে নাই! সে ইঙ্গিতে পরিণাম কি দাঁড়াইবে, সে বিষয়ে তাহার যথেষ্টই আশঙ্কা ছিল।

তাহার পরই নবাব সবলে তাঁহার ভারী হাতে ফেলিসিয়ার কোমল হাতটি সবেগে নাড়িয়া দিল, উচ্ছ্বসিতভাবে কহিল, "আজ আমায় বড় সম্মান দিয়েছেন—বড় গৌরব। এ ঋণ কখনও আমি শুধতে পারবো না। আমার নামে যে কুৎসা আজ চারদিকে রটে বেড়াচ্ছে, আপনি আজ সমস্ত পারিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আপনি সে-সব মোটে বিশ্বাস করেন না। এ উপকার আমি জীবনে ভুলবো না। এ মূর্ত্তিকে আজ যদি আমি হীরে-জহরতে মুড়ে দি, তবুও আমার এ ঋণ শোধ হয় না!"

ফেলিসিয়ার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। এতখানি প্রশংসা-সত্ত্বেও তাহার প্রাণ তৃপ্ত হইল না—সে আজ আর একটি মুখের দুইটা হর্ষ-বাণীর জন্য তৃষিত হইয়া ছিল—আজ আর কাহারও পানে তাহার দৃষ্টি নাই, কাহারও কথা তাহার মনের মধ্যে উঁকি দেয় না! শুধু সেই পরিচিত প্রিয়জনটির চিন্তায় মন তাহার ভরিয়া রহিয়াছে! কিন্তু কোথায় সে? কেনই বা তাহার কথা এমন করিয়া প্রাণের মধ্যে বার বার সাড়া দিতেছে? কেন? কেন? এ কি তবে ভালবাসা—এই কি প্রেম? ফেলিসিয়া কি তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে? সেই সরল উদার সুন্দর গেরিকে ফেলিসিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত আজ ভুলিতে পারিতেছে না—এতখানি সমাদর, এতখানি সম্মান, আজ শুধু তাহার অভাবেই নিতান্ত তুচ্ছ, নিতান্তই ম্লান বোধ হয়, কেন? দূরে ঐ যে তাহার মুখখানি দেখা গেল—ঐ যে ভিড়ের মধ্যে! ফেলিসিয়ার শরীরে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছুটিয়া গেল। সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঐ সে আসে না! না, ও ত গেরি নহে! তবে তাহারই মত মুখখানি, তাহারই মত দীপ্ত সরল চোখদুইটি! ও যে আলিন—আলিন! গেরি নহে। ফেলিসিয়া ছুটিয়া অগ্রসর হইল; ভিড়ের মধ্য হইতে তাহার হাতটি টানিয়া ডাকিল, "আলিন—"

"ফেলিসিয়া..."

তাহার পর পরস্পরে পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিল। কত দিন—কত দিন পরে আজ উভয়ের সাক্ষাৎ! বৃদ্ধ জুজ্ সগর্ব্ব দৃষ্টিতে দুই বন্ধুর এ মিলন-দৃশ্য দেখিল।

আলিন কহিল, "আজ তোমার কি সুখ, ফেলিসিয়া! এত বড় মেলায় সকলের মুখে তোমারই জয়ধ্বনি শুনছি, শুধু! আমারও আজ বড় আহ্লাদ হচ্ছে, ফেলিসিয়া।"

"কিন্তু আমার আহ্লাদ এইজন্য বেশী যে, তোমার দেখা পেলুম, আলিন। কত দিন পরে—আলিন—"

আলিম হাসিয়া কহিল, "কিন্তু সে কার দোষ, ফেলিসিয়া?"

ফেলিসিয়ার প্রাণে কে যেন ছুরি বিঁধিয়া দিল। সত্যই ত এ-জন্য দায়ী কে? কেন সে দেখা করে নাই—কেন সে কোনই খোঁজ লয় নাই! কিন্তু থাক্ সে কথা! ফেলিসিয়া কহিল, "তারপর কেমন আছ, আলিন? খপর কি, বল।"

"কিছুই নয়। নতুন আর কি খপর থাকতে পারে আমার?"

"জানি, জানি, আলিন। শুধু আপনাকে বলি দিয়ে চলেছ, তুমি—নয় কি?"

সে কথা কিন্তু আলিনের কানেও গেল না।

সে মৃদু হাসিল মাত্র। কিন্তু দৃষ্টি তাহার উতলা হইয়া আর কাহার পানে ফিরিয়া গেল। ফেলিসিয়া চাহিয়া দেখিল, নিকটেই গেরি দাঁড়াইয়া মাদামোসেল জুজকে অভ্যর্থনা করিল।

"তাহলে তোমাদের আলাপ-পরিচয় আছে, বল।"

"কি? আমায় বলছ?" আলিন কহিল, "পলকে আমি চিনি বৈ কি! পলের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে কত কথা হয় যে—"

ফেলিসিয়া কহিল, "বল কি—পল এত লাজুক—"

ফেলিসিয়া সহসা থামিয়া গেল। একটা কথা বিদ্যুৎ-রেখার মত তাহার প্রাণে ফুটিয়া উঠিল। গেরি তাহার অভ্যর্থনা করিল। সেদিকে ফেলিসিয়া লক্ষ্যমাত্র করিল না। কি একটা কথা সে চুপি চুপি আলিনের কাণে কহিল। নিমেষে আলিন অমনি লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল। তাহার কাণের ডগা দুইটা লাল হইয়া উঠিল। আলিন মুখ নত করিল। তার পর নিতান্ত ধীরস্বরে সে কহিল, "তুমি কি পাগল হয়েছ, ফেলিসিয়া! আমার এই বয়সে—বল কি, তুমি?" তারপর অতর্কিতে সে পিতার হাত ধরিয়া ফেলিসিয়ার দ্বিতীয় কথার আভাষ অবধি এড়াইবার উদ্দেশ্যে সরিয়া গেল।

ফেলিসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গেরি আলিনের হাত ধরিয়া চলিল। ফেলিসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। যে কথাটা ছায়ার মত তাহার মনের মধ্যে ফিরিতেছিল, সেটা তখনই সত্যের মতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। গেরি ও আলিন—চমৎকার মানায়! কিন্তু উহারা জানে না, জানে না, হয়ত কি নিবিড় বাঁধনেই দুইজনে ধরা পড়িয়া গিয়াছে—কি অসহ্যভাবেই দুইজনে দুইজনকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে! প্রেমের সাড়াটুকুও বুঝি তাহাদের প্রাণে গিয়া পৌঁছায় নাই! না পৌঁছাক—প্রেম তাহার কাজ সারিয়া লইয়াছে। ফেলিসিয়ার তাহা বুঝিতে এতটুকু বাকী রহিল না। তাহাই হউক্—দুইজনে দুইজনকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসুক! এই আলিন—সুন্দর সরল আলিন—তাহার কাছে ফেলিসিয়া! চাঁদের কাছে মোমের বাতি! ধিক্, তাহার স্বার্থ-চিন্তায়! ফেলিসিয়া দুই পায়ে আপনার মনটাকে চাপিয়া ধরিল। তাহার দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অন্য দিকে চাহিল। অমনি ডিউক-মোরার অভিনন্দন-বাণী কাণে পৌঁছিল।

"তার পর মাদামোসেল—এ যে চমৎকার হয়েছে, চমৎকার! একটা কথা শুধু বলি—কুকুরের মূর্ত্তির নীচে ব্যাখ্যাটা দিলেই

ভালো হত। সকলে মানেটা বুঝতে পারত।”

ফেলিসিয়া কোন কথা বলিল না—পাষাণের মূর্ত্তির মতই স্থিরভাবে সে দাঁড়াইয়া রহিল—দৃষ্টি তাহার উদাস, স্থির। তাহার পর কোনমতে ধীরস্বরে সে কহিল, “কিন্তু একটা কথা—রাবেলাস মিথ্যে বলেছে—শেয়ালটাকে শেষে হাঁপিয়ে শ্রান্ত হয়ে কুকুরের কাছে ধরা দিতে হল—এ কথাটা রাবেলাস লিখতে ভুলে গেছে। কি বলেন?” কথাটা শেষ করিয়া ফেলিসিয়া মৃদু হাসিল। মোরার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। তাহার মনে হইল, পৃথিবীর বক্ষ হইতে কে যেন তাঁহাকে টানিয়া উর্দ্ধে আকাশ-পথে লইয়া চলিয়াছে!

সেদিন মেলায় সকলের অপেক্ষা অধিক সুখ পাইলেন, নবাব। বন্ধুজনে পরিবেষ্টিত নবাব দীপ্ত উচ্চ হাস্যধ্বনিতে মেলা-প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া দিলেন। এই মূর্ত্তি, ফেলিসিয়ার গড়া এই মূর্ত্তি আজিকার বিরাট মেলায় জয়মাল্য আদায় করিয়াছে! এ কি কম সুখ—কম গৌরব! তাহার উপর তিনি ডেপুটি—কর্সিকার নূতন ডেপুটি হইয়াছেন। ভাগ্যলক্ষ্মী এক মুহূর্ত্তে যেন পথের ভিখারীর হাত ধরিয়া রাজ-সিংহাসনে তাহাকে বসাইয়া দিয়াছেন! এ কি শুভ মাহেন্দ্রক্ষণই না আজিকার প্রভাতে দেখা দিয়াছে! শুধুই সুখ, শুধুই সম্মান, শুধুই গৌরব! সমস্ত ধূলি-লাঞ্ছিত মলিন অতীতটাকে যেন সোনার বর্ণে কে রাঙাইয়া দিয়াছে—সমস্ত কদর্য্যতা, সমস্ত মলিনতা, সমস্ত দুঃখ-বেদনা নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে! আঃ, এ কি জয়, কি জয়—কি এ সৌভাগ্য!

ডেপুটি!

তাহার পর সকলের সহর্ষ অভিনন্দন—সকলের এই আন্তরিক শুভ-কামনা! নবাবের মনে হইল, বুঝি তিনি উন্মাদ হইয়া যাইবেন! এত সুখ, ছোট প্রাণে ধরে না যে!

গৃহে ফিরিবার সময় আসিল। মশার্দ আসিয়া কহিল, “নবাব বাহাদুর, আপনার গাড়ীতে আমাকে নিয়ে যাবেন?” নবাব তাহার স্পর্দ্ধা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি কঠিন স্বরে কহিলেন, “অসম্ভব মশার্দ—আমার গাড়ীতে আর জায়গা হবে না।”

এত-বড় একখানা প্রাসাদের মত গাড়ী! তাহাতে স্থান হইবে না?

মশার্দ কহিল, “নাই হোক—আপনার সঙ্গে আমার গোটাকতক দরকারী কথা আছে যে—”

“হাঁ! কিন্তু গেরির কাছে আপনার কথার জবাব পাননি, আজ সকালে? আপনি যা বলেছেন, সে কথা আমি রাখতে পারব না। বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক—আপনি চেয়েছেন! আস্পর্দ্ধা বটে!”

মশার্দ কহিল, “তবু আপনার জন্য যা করেছি—”

“তার চতুর্গুণ আপনি আদায় করে তবে ছেড়েছেন। আর কিছু হবে না, বুঝলেন—পাঁচ মাসে দু’লাখ ফ্রাঙ্ক আপনি নিয়েছেন—আরও চান? আপনার দাঁতে বড় ধার হয়েছে, বুঝলেন—সে ধার কিছু নরম পড়া দরকার।”

তাহার পর আরও দুইটা রূঢ় কথার পর নবাব জানাইলেন, তাঁহার নিকট হইতে আর একটি ফ্রাঙ্কও আশা করা বাতুলতা মাত্র। নবাব দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। আর একটি ফ্রাঙ্কও দেওয়া হইবে না—কোন সুপারিশ, কোন মিনতিতেও নয়!

"এই তাহলে আপনার শেষ কথা?"

নবাব তাহার দৈত্যের মতই ভীষণ চোখ দুইটার পানে চাহিয়া মুহূর্ত্ত স্থির হইলেন, পরে দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "এই আমার শেষ কথা।"

"বেশ—তাহলে দেখা যাবে—" বলিয়া মশার্দ আপনার ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

জাঁসুলে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। বাহিরে প্রকাণ্ড গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। নবাব উঠিতে যাইবেন, এমন সময় মোরা আসিয়া সবেগে তাঁহার করকম্পন করিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন, "আমার অভিনন্দন, ডেপুটি সাহেব!"

উচ্চ কণ্ঠে মোরার মুখে "ডেপুটি সাহেব" কথাটা শুনিয়া নবাব মুহূর্ত্তে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। গৌরব-দৃপ্তভাবে তিনি সেই জন-তরঙ্গের পানে চকিতে চাহিয়া দেখিলেন। এতগুলা লোকের সম্মুখে ডিউকের মুখের আজ এ বিরাট অভিনন্দন—এ বড় গৌরবের, বড় সম্মানের কথা!

আজ তাঁহার জীবন-আকাশে এ কি নূতন সূর্য্য অপূর্ব্ব দীপ্ত রাগে উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠিল, ভগবান! এত সুখ ঘটিতে পারে!

নবাব মোরাকে ধন্যবাদ জানাইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন—গাড়ী ভিড় ঠেলিয়া ছুটিয়া চলিল। মেঘ-ভাঙ্গা আকাশে সূর্য্য তখন স্নিগ্ধ শীতল কিরণ-ধারা বর্ষণ করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

হায়

প্রিয় মোর গিয়াছে কোথায়?
হায় শূন্য সকল জীবন,
যে আকাশ পূর্ণ ছিল লক্ষ তারকায়
সে আজিকে কুয়াশা মগন!

প্রিয় মোর গিয়াছে কোথায়?
হায় ব্যর্থ নিশীথিনী ছায়া,
হৃদয় ভরিয়া ওঠে শুধু পিপাসায়
তপ্ত নেত্রে মরীচিকা মায়া!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

অকাল সমাধি

[ইংরাজী হইতে]

প্রস্ফুট গোলাপের মত সুন্দরী এমি হাউয়ার্ড যাহাকে ভালবাসিত সে ছিল এক সৈনিক যুবা।

ধনীর সন্তান সে, বিলাসলালসার ক্রোড়ে প্রতিপালিত—তথাপি তাহার চরিত্রে উচ্ছৃঙ্খলতার কোনো লক্ষণ ছিল না। জীবনের সৌন্দর্য্যবিকশিত উদ্যানের মধ্যে সে উদ্দেশ্যবিহীন মৌমাছির মত উড়িয়া বেড়াইতেছিল, কোনো বিশেষ-কিছুর উপর তখনও সে স্থির হইয়া বসে নাই।

এমনি সময় গ্রীষ্মের এক শুভরাত্রে পুষ্পশোভিত আনন্দনর্ত্তনের মধ্যে এমি তাহার চোখে সুন্দরতম কুসুমের সুষমা লইয়া দেখা দিল। তাহার সুচারু দেহ-লতার উপর ছিল পবিত্র শুভ্র পরিচ্ছদ আর তাহার মুখের উপর ছিল সরল নীল আঁখি। সেই আঁখির সহিত, আরও দুইটি আঁখির মিলন হইল, চারি চোখের শুভ সম্মিলনে দুইটি প্রাণ পরস্পরের নিকট বাঁধা পড়িয়া গেল।

তারপর গ্রীষ্মের দিনরাত্রিগুলি যেন পাখা ধরিয়া পাখীর ঝাঁকের মত এক মুহূর্ত্তে উড়িয়া চলিয়া গেল। তরুণ তরুণীর জীবন-নদী তাহাদের পৃথক প্রবাহপথ পরিত্যাগ করিয়া একই খাতে বহিয়া চলিল,—প্রেমের স্রোত উভয়ের হৃদয়ে গভীর দাগ কাটিয়া গেল, তথাপি কেহ প্রকাশ করিয়া কিছু বলিল না সংসারের সহস্র নরনারীর মধ্যে তাহারাও দুইজন নরনারী মাত্র; তাহাদের মধ্যে যে প্রেমের অন্তর্গূঢ় টান রহিয়াছে তাহা অন্যে দূরে থাকুক আত্মীয়মহিলারাও কেহ টের পাইল না।

এমনি সময় ইউরোপের পূর্ব্বপ্রান্তে ক্রিমিয়ায় রণভেরী বাজিয়া উঠিল। সেই তূর্য্যনিনাদ ইংলণ্ডের সহস্র সহস্র শান্তি-কুটীরে পৌঁছিতে বেশি বিলম্ব হইল না। সেই ভেরী শুনিয়া মাতা কাঁপিয়া উঠিল পুত্রের জন্য, বোন কাঁপিয়া উঠিল ভাইয়ের জন্য, স্ত্রী কাঁপিয়া উঠিল স্বামীর জন্য। জীবনের সুখের আলো এক ফুৎকারে নিবিয়া গেল, গল্প হাসিগান উদ্বেগাশঙ্কার মধ্যে কখন যে বিলীন হইয়া গেল তাহা টেরও পাওয়া গেল না।

যুবক ভাবিল—আর ত নীরব থাকা চলে না; এই আসন্ন বিচ্ছেদের দিনেও যদি চুপ করিয়া থাকি তবে যে এ জীবনে আর মরমের কথা বলা হইবে না। আবেগে, উদ্বেগে, লজ্জায়, আশঙ্কায় যুবক একদিন এমিকে ডাকিয়া বলিল—"এমি, তোমায় আমি ভালবাসি!"…এমি একথার কি উত্তর দিবে? ইহা যে সে বহুদিন হইতেই জানে।—এমিও যে তাহার সমস্ত হৃদয়খানি তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া দিয়াছে।

এই বিচ্ছেদ বেদনার মধ্যেও তাহাদের মনে সান্ত্বনা ছিল। এতদিনের এই দুইটি

পৃথক জীবন আজ আত্ম-প্রকাশের দ্বারা যে ঐক্য লাভ করিয়াছে তাহার আনন্দ অনির্ব্বচনীয়। তাহারা যে পরস্পরকে ভালবাসে এবং সে কথা যে আজ দুজনেই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিয়াছে—ইহাই কি ভগবানের বিশেষ এক করুণা নহে?

তারপর?—নিয়তির অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিল। যুবক ভাবিল —এ যে যশের নিমন্ত্রণ পত্র!—ইহাইত আমি চাহিতেছিলাম। সে যুদ্ধে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।……কিন্তু এমির কি হইবে? তাহাকে সে বিবাহ না করিয়া ত যাইতে পারে না; এমিকে বিবাহ করিবার জন্য শত শত যুবক পাগল,—তাহাদিগকে বালিকা ঠেকাইবে কি বলিয়া? পিতার মতের বিরুদ্ধে বিবাহ করা,—সেও ত এক সমস্যা।……ভাবিয়া ভাবিয়া এ সমস্যার সুমীমাংসা হইল না; অগত্যা এক দিন সে এমিকে ডাকিয়া বলিল—'গির্জ্জায় গোপনেই আমাদের বিবাহ কাজ শেষ করিতে হইবে।' গুপ্ত বিবাহের নামে এমির নাসা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল কিন্তু অবশেষে প্রেমের গৌরবের নিকট আচার সৌষ্ঠবতার গর্ব্বকে পরাজয় মানিতেই হইল। একদিন প্রাতঃকালে তাহারা গির্জ্জায় গিয়া পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইল; পুরোহিত যখন মন্ত্র পড়িলেন এমির চোখ তখন অশ্রুবাষ্পে অন্ধপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল।…তারপর একটি দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনের পর দুইজনের ছাড়াছাড়ি হইল,—যুবক চলিয়া গেল একদিকে, যুবতী চলিয়া গেল আর এক দিকে।……অন্তিম বিদায়ের পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে বড় দেখা সাক্ষাৎ হইল না। তাহাদের জীবনে যে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িল সংসারের চোখে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইল না; সংসারের যদি দৃষ্টিশক্তি থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত যুবক এক মুহূর্ত্তে জীবনের দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রৌঢ় হইয়া গিয়াছে আর এমির কৈশোর জীবনের যবনিকা ভেদ করিয়া যে মূর্ত্তিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা ভার্য্যার না হইলেও একটি নববধূর।

* * *

সেদিন শ্রাবণের সুবর্ণসন্ধ্যা শান্ত সমুদ্রের নীলজলে মৃত্যুর রক্তিমা ঢালিয়া দিয়াছিল। একটি জাহাজ তখন চক্রমন্থনে ফেন পুষ্পের সৃষ্টি করিয়া আকাশের গায়ে ধূম্রকালিমা লেপন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। সেই যুদ্ধজাহাজ বোঝাই করা ছিল কতকগুলি তরুণ প্রাণে; ভাগ্যদেবতা আজ তাহাদিগকে প্রতি দিবসের অবশ অলসতা ও যশহীন শান্তি হইতে যুদ্ধ ক্ষেত্রের উদ্দাম আনন্দ ও শোণিতরাঙা খ্যাতির পথে লইয়া চলিয়াছেন। আঙিনার শুভ্র পুষ্প ফেলিয়া আজ তাহারা প্রান্তরের রক্ত গোলাপ চয়ন করিতে চলিয়াছে, তাহাতে তাহাদের হাত কণ্টকছিন্ন হইবে সত্য কিন্তু তাহারা আজ এই রক্তের আলিপনাকে অঙ্গের আভা করিতে চাহে।

জাহাজ যেখান হইতে অনাগত ভবিষ্যের কতকগুলি জীবন মৃত্যু ও দুঃখবেদনার বিচিত্র ভাগ্য বহন করিয়া রওনা হইয়াছিল সেখানকার শৈলসৈকতের বাগানে তখন ম্লানমৌন একটি তরুণী বালিকা বসিয়া-

ছিল। জাহাজ যখন তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল তখন রুমাল নাড়িয়া সে শুধু বলিল—"বিদায়, প্রিয়তম, বিদায়। জাহাজের ডেকের উপরেও তখন একটি রুমাল উড়িতেছিল।...জাহাজ যতক্ষণ দেখা গেল বালিকা ততক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল,—তারপর একটা মোড় ফিরিয়া জাহাজও অদৃশ্য হইয়া গেল, বালিকাও দুই হাতে বুক চাপিয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, নীলাকাশে যখন দুটি একটি করিয়া তারা জ্বলিয়া উঠিতেছিল, এমি তখন ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিয়া গেল। বৈঠকখানায় হাসির লহর উঠিতেছিল, এমি সেদিকে গেল না—চুপি চুপি তাহার শয়ন ঘরে গিয়া বিছানার উপর ক্লান্ত শরীর বিছাইয়া দিল।

* * *

প্রকৃতির অঞ্চল হইতে হেমন্তের হেম আভাখানি যেমন ধীরে ধীরে মুছিয়া গেল এমির মনেও তেমনি আশার সমস্ত আশ্বাস-বাণী নীরব হইয়া গেল। সম্মুখে শীত তাহার নগ্ন রিক্ততা লইয়া ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে, তাহার, করাল ছায়া এমিকে পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এমির জীবনের সমস্ত সজীবতা আজ ঝরিয়া পড়িয়াছে, রহিয়াছে শুধু একখানি মুমূর্ষ প্রাণের ম্লান অস্তিত্ব। তাহার চোখ বসিয়া গিয়াছে, বর্ণ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, গালের হাড় ভাসিয়া উঠিয়াছে। মানুষের সঙ্গ তাহার নিকট বিরক্ত বোধ হয়! একমাত্র মায়ের কণ্ঠস্বরে সে বিরক্ত হয় না কিন্তু মাতাও বহু চেষ্টা করিয়া কন্যার মনের অবস্থা জানিতে পারিলেন না,—সে এমনি চাপা!

যুদ্ধের সংবাদ আসিলে লক্ষ নরনারী তাহা শুনিতে ছুটিয়া যায়।...যুদ্ধ ক্ষেত্রে হত ও আহতদের নামের তালিকা বাহির হয়, —রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ নরনারী তাহার উপর চোখ বুলাইয়া যায়,—কয়েকছত্র পড়িতে না পড়িতেই কতজনের আঁখি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে, বাষ্পাচ্ছন্ন নয়নে তাহারা সংসার অন্ধকার দেখে, রুমালে মুখ ঢাকিয়া দুঃসহ শোকের আঘাত দমন করিতে চেষ্টা করে!

এমিও প্রতিদিন সংবাদ জানিতে যায়, সমরশায়ী বীরগণের তালিকা পাঠ করে, পাঠ করিবার সময় তাহার হৃদ্‌পিণ্ড উন্মাদের মত উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেয়; তালিকায় সেই নামটি যখন দেখে না তখন বুক হইতে আশঙ্কার একটা বোঝা নামিয়া যায়।......এমনি করিয়া দিন কাটে; তার পর একদিন,—এমি কেমন করিয়া বুঝিবে এ স্বপ্ন না সত্য? তাহার গাল লাল হইয়া উঠিল, কাণ গরম হইয়া উঠিল, অপরাজিত যৌবনের ম্লানিমা ভেদ করিয়া একটা সলজ্জ মাধুরী ফুটিয়া উঠিল। এতদিন পরে আজ প্রথম তাহার খবর পাওয়া গেল; এ সুসংবাদের বিনিময়ে এমি আজ কাহাকে কি দান করিয়া তৃপ্ত হইবে? এমি যখন রণক্ষেত্রে তাহার বীরত্বের কথা পড়িল,—কামানের গোলাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেমন করিয়া সে জাতীয় পতাকার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল, কেমন করিয়া সে একটি আহত বালককে আসন্ন মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল,—তখন

আনন্দে তাহার জ্ঞান লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল।...এমি চোখ বুজিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। সেনাপতি এই বীরত্বের জন্য তাহাকে রেড্ ক্রস্ উপাধি দান করিয়াছে,—এমি আজ কেমন করিয়া তাহার হৃদয় ভাব অপ্রকাশ রাখিবে।

আনন্দের সকল উচ্ছাস কিছুদিন পরেই আশঙ্কার উদ্বেগে উৎসাদিত হইয়া গেল। খবর আসিল নভেম্বরের শীতে যুদ্ধক্ষেত্রের জল স্থল দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে;—বরফে কোয়াসায় পথ চলা দুষ্কর লইয়া পড়িয়াছে; সামুদ্রিক ঝড়ে নৌ-সেনা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে,—তীরে যুদ্ধের ঝড়ও নিতান্ত কম নয়। এত খবর আসিল কিন্তু তাঁর কোনো খবর আসিল না। অপেক্ষা করিতে করিতে এমির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না; আহারে তাহার রুচি নাই, চোখে ঘুম নাই, মনে শান্তি নাই। খাইতে বসিয়া সে ভাবে, তিনি কয়দিন অনাহারে আছেন কে জানে? ঘুমাইতে গিয়া ভাবে তিনি কয়দিন অনিদ্রায় আছেন কে জানে? সুখশয্যা তাহার কণ্টক শয্যা বলিয়া বোধ হয়।

অবশেষে সে এক দুঃসাহসিক অভিযানে যাত্রা করিবে মনস্থ করিল। পিতামাতার শাসন, বন্ধুগণের উপদেশ, কিম্বা সখিগণের অনুনয় তাহাকে কিছুমাত্র টলাইতে পারিল না। একদিন ভোরে দেখা গেল তাহার ঘর শূন্য,—বালিসের উপর একখানি চিঠি পড়িয়া রহিয়াছে। চিঠিতে লেখা—"মা, তোমরা আমাকে ক্ষমা কোরো। কর্ত্তব্য আমায় টান্‌ছে; যেখানে আমার স্বামী আছেন সেখানেই আমার যথার্থ স্থান! আমি যাই, খুঁজে দেখি তিনি এখনো বেঁচে আছেন কি না। হয়ত তাঁর এখন যত্ন শুশ্রূষার দরকার,—যদি আমি তাঁর এতটুকুও সেবা করতে পারি তবেই আমার জীবন সার্থক জ্ঞান করব। কি জানি কেন মনে হচ্চে আমি তাঁকে বাঁচাতে পারব;—আমার অন্তরের বাণীকে আমি উপেক্ষা করতে পারি না।

* * *

এমি শুশ্রূষাকারিণীর বেশে ক্রিমিয়ার হাঁসপাতালে পৌঁছিল। সেখানে খোঁজ লইয়া জানিল তাহার স্বামী বীরত্বের জন্য উচ্চতর পদে উন্নীত হইয়াছেন।

ইহা শুনিয়া এমি স্বামীকে দেখিবার জন্য অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে তাহাকে একখানি চিঠি পাঠাইল, তাহাতে সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া লিখিল,—তাহার আচরণে যদি কোন অন্যায় হইয়া থাকে সেজন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল, আর ভিক্ষা করিল,—যদি সম্ভবপর হয়, একটিবার তাঁহার দর্শন। এ কথাও জানাইল যে তাহা সম্ভবপর না হইলে সে এই হাঁসপাতালে সেবিকারূপেই সন্তুষ্ট চিত্তে থাকিবে, তিনি যদি এমির নিকট একটী সোহাগবাণী প্রেরণ করেন তবেই সে যথেষ্ট জ্ঞান করিবে; আর কিছু সে চায় না।

কিন্তু তাহার স্বামী যখন সমস্ত কথা জানিতে পারিলেন তখন তাঁহার ভাবনার বোঝা ভারী হইয়া উঠিল। বালিকা বধূ সে, সংসার জ্ঞানে অনভিজ্ঞা, করুণায় কোমল, কমনীয় তনুমনে কেমন

করিয়া এই মৃত্যুযন্ত্রণার দারুণ আর্ত্তনাদের বাস ভূমিতে বাস করিবে? যুবক ভাবিল, ভাগ্যে কি লেখা আছে তা' কে জানে!

এমি এমন করিয়া চলিয়া আসিয়া তাহার দুর্ভাবনার কারণ হইয়াছে সত্য তথাপি তাহাকে সে কিছুই বলিতে পারিল না। এমিকে যে সে ভালবাসে। তাহারও কি একটিবার দেখিতে ইচ্ছা করে না? কিন্তু উপায় নাই যে!......তাই একদিন দিবসের হত্যাবিনাশের কাজ যখন শেষ হইয়াছে তখন তাঁবুতে বসিয়া এমিকে সে একখানি চিঠি লিখিল। চিঠিখানি প্রেমপত্র; তাহার সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া উহা সে লিখিয়াছিল। চিঠির শেষ কথা কয়টি এই;—"যুদ্ধক্ষেত্রে আমি যদি আহত হই তবে উহা পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিব কারণ তাহা হইলে তোমার সহিত মিলনের পথ সহজ হইয়া আসিবে! আর যদি মরিয়া যাই তবে ইহাই আমার বিদায় চুম্বন।"

চিঠিখানি সে যেমনি বন্ধ করিল অমনি নিশার অন্ধকার ভেদ করিয়া তাঁবুর উপর একটা আগুন দেখা দিল,—সেই সঙ্গে বিদীর্ণ বোমার একটা ভীষণ শব্দ শুনা গেল;—তারপর হাতের ছিন্ন চিঠি রক্তে রঞ্জিত হইয়া হাত হইতে খসিয়া পড়িল।

(২)

তৃষার্ত্ত হৃদয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যে হায় হায় করিতে লাগিল। অন্তবিহীন শ্রমক্লান্ত দিবস ও সুপ্তিহীন রাত্রির অনভ্যস্ত উদ্বেগ যে তাহাকে অধিকতর কাতর করিয়া তুলিল। এমির কষ্টের আর সীমা নাই; সে তাহার কোমল হাতে পুঁজবিকৃত ঘা পরিষ্কার করে, সেই ক্ষতে ওষুধ লাগায়, প্রলেপ দেয়, ব্যাণ্ডেজ বাঁধে। রাত্রে মুমূর্ষু, উন্মত্ত চীৎকারে শিহরিয়া উঠে। রোগীগণের শয্যায় শয্যায়, শিয়রে শিয়রে সে ঘুরিয়া বেড়ায়,......রক্তাক্ত কলেবরে আহত হইয়া একজন সৈন্য আসে, ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করেন, অস্ত্র করেন, ওষুধ দেন, রোগীর অবস্থা খারাপ হইলে, বিকারের ঘোরে সে প্রলাপ বকে, জ্বালার যন্ত্রণায় সে চীৎকার করে,—তারপর হয় শান্তি। তাহার মৃতদেহ সরাইয়া লওয়া হয়, সেখানে নূতন রোগী আসে। এইত হাঁসপাতালের ইতিহাস।......ইহারই মধ্যে এমি বাস করে। ইহাদিগকেই এমি শুশ্রূষা করে, মনে করে, ইহাদেরও ত স্ত্রী বোন কেহই কাছে নাই, কে ইহাদের শুশ্রূষা করিবে? তাহার মনে হয়—ইহাইত স্বামীর প্রতি ভালবাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন; তাঁহার সঙ্গীদিগকে শুশ্রূষা করা—সে কি তাঁকে শুশ্রূষা করার চেয়ে কম?

একদিন এমি দেখিল সুন্দর একটি বালক প্রলাপের ঘোরে তাহার স্বামীর নাম উচ্চারণ করিতেছে। জ্ঞান হইলে বালককে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেই সে উঁহার অজস্র প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিল। তিনিইত তাহাকে আগুনের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। যুদ্ধ যখন দুর্দ্দমনীয় বেগে বহিতেছিল তখনইত তিনি তাহাকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। উঃ সে কি যুদ্ধ! ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে॥

এমি যতই শুনিতে লাগিল ততই

আনন্দে তাহাও তাহার স্নেহ উত্তরোত্তর হইয়া চলিল। বেশি করিয়া সে তাহার যত্ন করিতে লাগিল, দিন রাত্রি জাগিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল, তাহার হইয়া তাহার মাকে এমি চিঠি লিখিয়াছিল। বালককে ভাল বাসিয়া এমি বুঝিল ধনীর মত দরিদ্রদের হৃদয় আছে, তাহারাও পরস্পরকে ভাল বাসিতে জানে,—আর ইহাও তাহার মনে হইল যে মানুষে মানুষে যত পার্থক্য সকলেরই মূলে অর্থ আর মান,—আত্মাভিমানই মানুষকে মানুষের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতেছে।

কিন্তু এমির চিঠির ত কোনো উত্তর আসিল না। অপেক্ষায় অপেক্ষায় ত বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। মনে এই আশঙ্কার বোঝা লইয়া আর যে সে এই আর্ত্তনাদের লীলাভূমিতে বাস করিতে পারে না।

এমনি সময় আহত সৈন্য বোঝাই একটা জাহাজ ঘাটে লাগিল। হায়, অল্পদিন হইল, সেই জাহাজই যে কতকগুলি উৎসাহদীপ্ত হরস প্রাণ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল।—এমি কি যে আশা করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। এই জাহাজে তিনি যদি আসিয়া থাকেন তবেত তিনি যুদ্ধে আহত হইয়াছেন, কত কষ্ট পাইতেছেন, কত কষ্ট পাইবেন, কিন্তু তবুত দেখা হইবে। আর যদি এ জাহাজে না আসিয়া থাকেন তবে হয়ত তিনি ভাল আছেন। কিন্তু তাহা হইলে ত পরস্পরের মধ্যে এখন দেখা হইবে না। স্বামীর মঙ্গল কামনা ও মিলন বাসনা মিলিয়া এমিকে অস্থির করিয়া তুলিল;—সে কোন্‌টা যে বেশী করিয়া চায় তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

সেই জাহাজে এমির স্বামী আসিল না। আশঙ্কায় আশঙ্কায় এমির দিন কাটিতে লাগিল,—এমনি সময় তাহার হাতে একখানি চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু এমি ত এ হস্তাক্ষর চিনে না। এ কাহার চিঠি? চিঠিখানা খুলিতেই তাহার ভিতর হইতে রক্তরঞ্জিত পরিচিত হস্তাক্ষরাঙ্কিত একটা চিঠির টুক্‌রা পড়িয়া গেল। রক্তের অনুলেপনা দেখিয়া এমির বুকের ভিতর রক্ত প্রবাহ থামিয়া গেল। আবার পর মুহূর্ত্তে মনকে প্রবোধ দিয়া সে চিঠিখানি কুড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহা এত অসম্পূর্ণ যে সে পড়িয়া কিছুই বুঝিল না। অবশেষে যিনি পত্রখানা পাঠাইয়া দিয়াছেন তাঁহার চিঠিখানি এমি পড়িল। তিনি লিখিয়াছেন—কয়েক সপ্তাহ হইল তাঁহার সঙ্গীকে তিনি তাঁবুর মধ্যে রক্তাক্ত কলেবরে অজ্ঞান অবস্থায় পাঠাইয়াছিলেন; তাহার পাশে ঐ চিঠিখানি পড়িয়াছিল। "তাঁহার শরীরে অসংখ্য ক্ষত, শরীরও অত্যন্ত দুর্ব্বল তাই এ জাহাজে তিনি যাইতে পারিলেন না। ঘাগুলি শুকাইয়া আসিয়াছে, আশা করা যায় পরবর্ত্তী জাহাজেই তিনি যাইতে পারিবেন।"—ইহা পড়িয়া প্রেমে, কৃতজ্ঞতায় এমির চোখে জল আসিল; ভগবান তাঁহাকে প্রাণে বাঁচাইয়াছেন ইহাই এমির পরম সৌভাগ্য। ছুটিয়া গিয়া সে সেই বালককে এই খবর দিল; বালকের চোখে মুখে কিসের আলো যেন দীপ্ত হইয়া উঠিল।

কিছুদিন পরেই আহত সৈন্য বোঝাই করিয়া আর এক জাহাজ আসিল। এমি পূর্ব্বেই ঘাটে উপস্থিত ছিল, দূর হইতেই স্বামীকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। জাহাজ ঘাটে লাগিলে তিনি তীরে নামিয়া আসিলেন, এমির দিকে চাহিয়া একটু ম্লান হাসিলেন তার পর একটি মিলন চুম্বনেই ক্লান্ত হইয়া এমির কাঁধে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিলেন। এমি তাঁহাকে হাঁসপাতালে লইয়া আসিল; প্রাণপাত করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল! এমির শুশ্রূষায় তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিলেন। * * *

সন্ধ্যার সময় যখন তাঁহারা সমুদ্রতীরে বেড়াইতেন তখন ভবিষ্যৎকালের কত স্বপ্নচিত্র যে আঁকিতেন তাহার ইয়ত্তা ছিল না। উপরে নীল আকাশ, সম্মুখে নীল সমুদ্র, তাহাতে জেলে ডিঙ্গির সহস্র রঙ্গিন্ পাল; চারিদিকের এই স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে তাহারা দুইটী প্রাণী যেন স্বপ্নজগতের রাজপুত্র ও রাজকন্যা। রাজপুত্রের স্বপ্নরচনায় সহসা একদিন বাধা পড়িল, তিনি পার্শ্বস্থ সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া শিহরিয়া চমকিয়া উঠিলেন। ইহাত এতদিন তিনি লক্ষ্য করেন নাই; তাঁহার শুশ্রূষায় এমি যে নিজের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল; অনিয়মের অত্যাচারে তাহার শরীর যে আজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, অচিরেই ঝড় উঠিবে, সে দুর্য্যোগে কে কাহাকে রক্ষা করিবে?

...উদ্বেগ শীঘ্রই আশঙ্কার পরিণত হইল। এমি বাঁচে কিনা সন্দেহ। তাহার দেহলতা শয্যার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাহার প্রাণ একটি ক্ষীণ শ্বাস প্রশ্বাসের ধারায় পরিণত হইয়াছে। হায়, এত করিয়া যে তাঁহাকে বাঁচাইয়া তুলিল তাহাকে বুঝি আর বাঁচান গেল না।

* * *

কানন বিদীর্ণ করিয়া কুসুম আবার বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, বসন্ত বাতাসে স্রোতস্বতীতে উর্ম্মি জাগিয়া উঠিয়াছে, বৃক্ষলতা সজীবতায় সবুজ হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু এমির গণ্ডে আজ প্রাণের রং কই? তাহার তরুণ প্রাণের সবটুকু রস যে রোগযন্ত্রণা শুষিয়া লইয়াছে। এমি তাহার স্বামীকে ডাকিয়া বলিল—"প্রিয়তম, বিদায় বলিতে বড় কষ্ট! তবে আমার আনন্দ এই যে আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি। কর্ত্তব্যের পথ কণ্টকাকুল নহে তাহা কুসুমাকীর্ণ। আমাকে এইখানে আমার স্বদেশের বীরদের সঙ্গে কবর দিও। দেশে গিয়া পিতামাতার নিকট আমার হইয়া ক্ষমা চাহিও। আমি তাঁহাদের অবাধ্য সন্তান, তাঁহাদের নিষেধ অমান্য করিয়া তোমার সন্ধানে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম। যুদ্ধশেষে যখন তুমি দেশে ফিরিবে, যখন আবার আমাদের সেই গিরিকাননে বিচরণ করিবে তখন আমার কথা স্মরণ করিয়া ছোট্ট একটি প্রার্থনা করিও। ঐ খানেইত তুমি আমার হৃদয়মন, জীবন যৌবন সব আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলে। সেদিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, মনে হয় যেন কাল। আমি আর কিছু চাই না, আমাদের সেই মিলনভূমিতে

তুমি একদিন তোমার এই বালিকা বধূকে আশীর্ব্বাদ করিও,—তার পর ইচ্ছা হয় আমাকে মনে রাখিও, ইচ্ছা হয় ভুলিয়া যাইও।"

এমির অন্তিম কার্য্য শেষ হইয়া গেলে তাহার স্বামীর মনে হইল এ সংসারে তাহার আর কোনো কাজ নাই, জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নাই, অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজন নাই। মরণ সঙ্কল্প করিয়া সে রণ সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু মৃত্যুকে যে আলিঙ্গনে গ্রহণ করিতে চায় মৃত্যু তাহাকে ধরা দেয় না। সে কত দুঃসাহসের কাজ করিল, সকল লোক বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল; অক্ষত দেহে সে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিল।

স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য জাহাজ প্রস্তুত।......সে ভাবিল যাইবার আগে তাহার কবরটা একটু দেখিয়া যাই।......তাহার কবরের উপর তখন তৃণ গুচ্ছের সবুজ আস্তরণ জমিয়াছে, কবরের চারিদিকে গাছে গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে।—হায়, মৃত্যুকে ঘিরিয়া জীবনের এই আনন্দোৎসব কেন?

......সে যে ঐ ফুলের মতই সুন্দর শুভ্র ছিল, অমনি কোমল অমনি পবিত্র।

সেখানে কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া সেই সমাধির উপর সে একটি ক্রুশ স্থাপন করিল ও তাহাতে সংক্ষেপে এমির জীবনী লিখিয়া দিল।...তারপর বিদায়কালে কবর হইতে একটি গোলাপ তুলিয়া বুকে গুঁজিল।

* *

তারপর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে এখনও এক বৃদ্ধ বাস করে, সুপ্তিহীন নিশাশেষে জাগিয়া জাগিয়া সে একটি বালিকার কথা ভাবে। দিনের বেলা যখন তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাতি নাতনীগুলি নৃত্য করে তখন তাহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া বৃদ্ধের মনে আর একটি মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠে, বর্ত্তমানকে ভেদ করিয়া অতীত তাহার সেই বালিকাদেহের বঙ্কিম ভঙ্গী, তাহার সেই বিদায় প্রার্থনা, তাহার যত্নশুশ্রূষা ও অকাল সমাধির সমস্ত চিত্র লইয়া উপস্থিত হয়; তথায় বৃদ্ধ অতীতকালে আবার যুবক হইয়া বাস করে। স্বপ্ন যখন ভাঙ্গিয়া যায় তখন দেখে সে বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা, চারিদিকে তাহার অসংখ্য পৌত্র পৌত্রী খেলা করিতেছে।

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ।

আকাঙ্ক্ষা

ভোগের প্রসঙ্গ ঘুচালে আমার,
ত্যাগের মহিমা শিখালে না।
জ্ঞানের গরব বিনাশিলে মোর,
ভক্তির সুধা পিয়ালে না।

মিথ্যা আমার দিলে সব মুছে,
সত্যের আলোক ফুটিল না,
জীবনের সাধ গেল ভেঙ্গে চুরে,
পরাণের সাধ টুটিল না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত।

(২৪)

বিপিন কালীতারার সন্ধানে যাইতে যাইতে শুনিল কালীতারাকে কাল সন্ধ্যার পর তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন বেলা প্রায় বারোটা। এই দুঃসহ শীতজর্জ্জর পৌষরাত্রি সেই আসন্নপ্রসবা অনাথা না জানি কোথায় কাটাইয়াছে। কাল হইতে অনাহারে না জানি সে কোথায় পড়িয়া আছে। কোমলপ্রাণ বিপিনের হৃদয় করুণায়, লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে ছাপাইয়া উঠিল; তাহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল।

তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল তাহার খুড়াকে গিয়া দশ কথা শুনাইয়া দিয়া আসে; নিবারণ মুখুয্যের মাথাটাকে দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলে। কিন্তু সময় নাই, সময় নাই! আগে সেই হতভাগিনীকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। কী নিষ্ঠুর সব লোক! এক সঙ্গে দুটি প্রাণীকে হত্যা করিতে মমতা হইল না!

জমিদারের ছেলে বিপিন অস্নাত অভুক্ত দুপ্রহরের রৌদ্র মাথায় বহিয়া পথে পথে সেই অভাগিনীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে যে সমাজের কাছে নিন্দিতা, যে সমাজের ত্যজনীয়া।

বিপিনকে ব্যাকুলভাবে পথে পথে পর্য্যটন করিতে দেখিয়া তাহার সহিত অনেক লোক জুটিয়া গেল; চাকর পেয়াদা পাইক বরকন্দাজ, চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই কোনো সন্ধান পাইল না।

রাত্রে আসন্নপ্রসবা কালীতারাকে এক-বস্ত্রা অবস্থায় দূর করিয়া দিলে সে আপনার মাতৃত্ব-সম্ভাবনার গুরু বেদনায় কাতর ও ভীত হইয়া বাবুদের মঠবাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। সেখানকার দারোয়ান প্রভাতে উঠিয়া কালীতারাকে মঠবাড়ীর মন্দিরচত্বরে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাকে অতি রূঢ় ভাবে সেখান হইতেও দূর করিয়া দেয়; বেচারার ইহাতে কোনো দোষ নাই, সে মনে করিয়াছিল যাহাকে তাহার মনিবেরা গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছে তাহাকে তাহাদেরই মঠবাড়ীতে থাকিতে দেওয়া তাহার পক্ষে নিতান্ত গর্হিত কার্য্য হইবে! কিন্তু এখন বিপিনকে এমন ব্যাকুলভাবে অন্বেষণ করিতে দেখিয়া সে বুঝিল যে সে সেই অসহায়াকে মৃত্যুর মুখে তাড়াইয়া দিয়া অন্যায় করিয়াছে। ভয়ে ও পরিতাপে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। বিপিন কিছুমাত্র সংবাদ না পাইয়া এই দুপ্রহর রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহা দেখিয়া সে যতটুকু জানে তাহা বলিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল; আবার নিজের অমানুষ ব্যবহারের জবাবদিহি বিপিনের কাছে কি বলিয়া করিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া বলিতেও তাহার সাহস হইতেছিল না।

অনেকক্ষণ নিজের দ্বিধার সঙ্গে তর্ক

করিয়া সে স্থির করিল যে, সে যাহা জানে তাহা অকপটে স্বীকার করিবে।

ভগবানদীন সুকুল জনতা ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া বিপিনকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। বিপিন অন্যমনস্ক উদাসভাবে যন্ত্রচালিতের মতো তাহাকে প্রতিনমস্কার করিল কিন্তু আজ স্বাভাবিক মধুর হাস্যে তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল না।

ভগবান হাতজোড় করিয়া বলিল- হুজুর আমার একটা কসুর হয়েছে-....

বিপিন জিজ্ঞাসু নীরব দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। ভগবান বলিতে লাগিল—কাল রাতে কালীতারা মঠবাড়ীতে কখন ঢুকে মন্দিরের চাতালে শুয়ে ছিল; পাছে মঠ অশুচি হয়ে যায়, কি আপনারা রাগ করেন, এই ভেবে আমি তাকে ভোর বেলা তাড়িয়ে দিয়েছি...... এখন দেখছি আমি ভারি অন্যায় করেছি......

বিপিন ঔৎসুক্যে উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি দেখেছিলে সে কোন্ দিকে গিছল?......

—সে ঐ আম-বাগানের ভিতর দিয়ে ঐ বনের দিকে গিছল মনে হয়।

বিপিন ব্যগ্রভাবে—যাও যাও কেউ একখানা পাল্কী নিয়ে এসগে।—বলিয়া আম-বাগানের ভিতর দিয়া বনের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

শেঁয়াকুলের বনে কাপড় জড়াইয়া যাইতে লাগিল, বেতের বন নত হইয়া ঝুলিয়া ঝুলিয়া তাহার জামা আটকাইয়া ধরিতে লাগিল......বিপিনের ভ্রূক্ষেপ নাই; কাপড় জামা ছিঁড়িয়া গেল, পায়ে কাঁটা ফুটিল, গায়ে বিছুটি লাগিল, সংজ্ঞা নাই। এই বনের মধ্যেই কালীতারা আছে কিনা কেহ নিশ্চয় জানে না, তবু অনুসন্ধানের বিরাম নাই।

অকস্মাৎ বিপিনের অনুচরবর্গ চীৎকার করিয়া উঠিল—আছে আছে আছে এইখানে আছে।

বিপিন ঝোপ ঝাড় ডিঙাইয়া অগ্রসর হইয়া দেখিল বনের মধ্যে একটু পরিষ্কার শষ্পাবৃত স্থানে একটি গাছের ছায়ায় রক্তাপ্লুত অর্দ্ধমূর্চ্ছিত কালীতারা পড়িয়া আছে, আর তাহার বুকের কাছে রক্তচন্দনলিপ্ত প্রফুল্ল শতদলের মতো একটি শিশু রৌদ্রতাপে অবসন্ন হইয়া পড়িয়া আছে; স্থানটি ছোট বড লাল কালো বিবিধ পিপীলিকায় ভরিয়া উঠিয়াছে—শৃগাল, কুকুর শকুনির রক্তলোলুপ দৃষ্টি এখনো এখানে পড়ে নাই, তাই রক্ষা।

বিপিন তাড়াতাড়ি আপনার জামা খুলিয়া তাহাতেই শিশুটিকে জড়াইয়া বুকে তুলিয়া লইল। তাহাকে জামা খুলিয়া শিশুকে জড়াইতে দেখিয়া পেয়াদার পাগড়ী পাইকের গামছা, বিপিনের সম্মুখে উপস্থাপিত হইতে লাগিল! বিপিন ভগবানকে ইঙ্গিত করিল, ভগবান আপনার পাগড়ী দিয়া কালীতারাকে ঢাকিয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে পাল্কী আসিয়া পৌছিল। বিপিন শিশুটিকে ভগবানের কোলে দিল; কোলের গরম ও নাড়া পাইয়া শিশুটি এতক্ষণে তারস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

বিপিন একবার শিশুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কালীতারার পাশে মাটিতে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া ডাকিল—খুড়িমা!

এমন সম্মান ও করুণার সহিত কালীতারাকে কেহ কখনো ডাকে নাই। সে ক্ষীণস্বরে বলিল—কেন বাবা? তুমি কে? —তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া প'ড়তে লাগিল।

বিপিন বলিল—খুড়িমা, আমি বিপিন। পাল্কী এনেছি, বাড়ী চল।

কালীতারা কষ্টে চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিল—বাড়ী?

—হাঁ খুড়িমা বাড়ী, আমার বাড়ীতে চল।

—আর কেন বাবা, অল্পক্ষণ পরেই ত মরণ আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিত, তুমি কষ্ট করে কেন এসেছ বাবা? এ পোড়ামুখ আমি লোকালয়ে কেমন করে দেখাব?

বিপিন ভগবানের কোল হইতে শিশুটিকে লইয়া কালীতারাকে দেখাইয়া বলিল—খুড়িমা, এই নিরপরাধ অসহায়টির জন্যে তোমায় বাঁচতে হবে।

কালীতারার মাতৃহৃদয় সন্তানকে দেখিবামাত্র স্নেহে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে ব্যাকুল হইয়া বলিল—দাও বাবা দাও ওকে আমার বুকে। ও আমার বড় লজ্জার বড় দুঃখের বড় সুখের ধন।

বিপিন শিশুটিকে তাহার মাতৃবক্ষে শোয়াইয়া দিল। কালীতারা তাহাকে বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া নিমীলিত নয়নে সুখাবেশের অলসভাবে জিজ্ঞাসা করিল—বাবা বিপিন, কি হয়েছে?

বিপিন বলিল—ছেলে হয়েছে খুড়িমা, পদ্মফুলটির মতো সুন্দর।

কালীতারা নিমীলিত নয়নে অস্ফুট স্বরে আপন মনেই বলিতে লাগিল—তোকে আমি বধ করতে পারিনি বলে আজ আমার এই লাঞ্ছনা। হতভাগা, এসেছিস যদি ত হতভাগিনীর কোল শূন্য করে পালাস নে। তোর জন্যেই আমি বাঁচব, সকল লজ্জা, সকল নিন্দা, সকল গ্লানি মাথায় করে নিয়েই বাঁচব!

এই স্নেহকরুণ দৃশ্য দেখিয়া বিপিনের চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—খুড়িমা, ওঠ, চল বাড়ী যাই।

বিপিনের ইঙ্গিতে পাল্কী কালীতারার পাশে রাখা হইল। কালীতারা উঠিতে চেষ্টা করিয়া পারিল না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বিপিন তাড়াতাড়ি শিশুটিকে তুলিয়া একজন চাকরের হাতে দিল এবং চারপাঁচজনে ধরাধরি করিয়া মূর্চ্ছিতা কালীতারাকে পাল্কীতে তুলিল। পাল্কী ছুটিয়া চলিল, বিপিনও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে। গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিন বলিল—ভগবানদীন, ডাক্তারবাবুকে খবর দাও, তাঁকে বড় তরফের অন্দরে নিয়ে এস।

গ্রামের পথ লোকে লোকারণ্য। স্ত্রীপুরুষ ছেলে বুড়ো কেহই আজ ঘরে নাই; পথে পথে পুরুষেরা জনতা করিয়া কোলাহল করিতেছে, অন্তঃপুরিকারা দরজার ফাঁকে চোখ দিয়া কৌতূহলী দৃষ্টি পথে পাঠাইতেছে। কেহ বিপিনের প্রশংসা করিতেছে, কেহ নিন্দা করিতেছে, কেহ উভয়ই করিতেছে; ফলে তর্কের অন্ত নাই, বিতণ্ডার বিরাম নাই।

নিবারণ ও গোবর্দ্ধনের মন কৌতূহলে

ছটফট করিতেছিল, কিন্তু সাহস করিয়া তাহারা পথে বাহির হইতে পারে নাই, কি জানি যদি বিপিন বা নবকিশোরের সম্মুখে পড়িয়া যায়; তাহারাও কপাটের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া রঙ্গ দেখিতেছিল।

বিপিনকে তাহাদের বাঁড়ীর দিকে তাকাইতে দেখিয়া নিবারণ তাড়াতাড়ি দরজার কপাট বন্ধ করিয়া দিল, কিন্তু তখন বিপিনের কোনো দিকে লক্ষ্য ছিল না, মনে অন্য কোনো চিন্তা ছিল না।

পাল্কী অন্দরের দেউড়িতে উপস্থিত হইতেই দ্বারবান দুবেজী অগ্রসর হইয়া জোড় হাতে বলিল—হুজুর, মহারাজ কিসিকে ভিতর লিয়ে যাতে মানা করিয়েসেন। হামাকে হুকুম দিয়েসেন রোকতে, আপনাকে বোলতে।

বিপিন বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি মহারাজকে গিয়ে বলগে যে ছোটবাবু মানা শুনলেন না।

তারপর সকল অনুচরের দিকে ফিরিয়া বিপিন দেখিল তাহারা মহারাজের অসম্মতি বুঝিতে পারিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছে। বিপিন চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উগ্রভাবে হুকুমের স্বরে বলিল—ধর তোমরা, একে ওপরে নিয়ে যেতে হবে।

তখন সকলে ভয়ে ভয়ে শুষ্ক মুখে আসিয়া ধরিল। বিপিন নিধিরাম খানসামাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল—নিধিদা, যা যা দৌড়ে আমার বিছানা থেকে একখানা তোষক তুলে নিয়ে আয়।

নিধিরাম তোষক আনিয়া বিছাইয়া দিল। বিপিন ও অন্যান্য সকলে ধরাধরি করিয়া শিশু ও মাতাকে পাল্কী হইতে বাহির করিল, এবং তোষকের উপর শোয়াইয়া সকলে সন্তর্পণে ধরিয়া কালীতারাকে অন্দরে লইয়া চলিল।

অন্দরে সকলে পুত্তলিকার মতন আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। আজ ঠাকুরের পূজা হয় নাই, ভোগ হয় নাই, রান্না হয় নাই, কাহারো খাওয়া হয় নাই। শিশুগুলি ক্ষুধায় নেতাইয়া পড়িয়াছে, কেহ কেহ বা মাটিতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যেন এ রূপকথার রাক্ষসপুরী, সমস্ত উপকরণ সজ্জিত আছে, নাই শুধু কাহারো প্রাণ! এখানে কৈ সে সোনার কাঠি যাহার স্পর্শে এই প্রাণহীন পুরীর জীবনলীলা জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারিবে?

বিপিনকে উঠানে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই গিন্নি বলিলেন—বিপিন বিপিন করিস কি? তোর কি আক্কেল বল দেখি, কোথাকার পাপ কোথায় এনে জোটাচ্ছিস? উনি শুনে ভারি রাগ কচ্ছিলেন... কথা শোন, ও বিপিন, বিপিন, ...যা খুসি করগে যা, ভাল বিপদেই পড়েছি বাপু!... ওরে ওরে ওকে ও কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস? ওপরে? ওমা কি ঘেন্নার কথা! ঐ নোংরা কাপড় চোপড় নিয়ে ওকে তোরা ওপরে তুলছিস। রাম রাম! জাত ধর্ম্ম আর রইল না।... ওরে ওরে ও রোহিণী, যা যা ওঁকে বলগে যা, শিগগির যা, দৌড়ে যা, বিপিনের কাণ্ডখানা একবার দেখুন এসে।

বিপিন কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কাশীতারাকে একেবারে নিজের শয়নকক্ষে লইয়া গেল। তখন ক্রমশ বাড়ীর সকলে একে একে আসিয়া দ্বার-প্রান্তে ভিড় করিতে লাগিল। বিপিন দেরাজ খুলিয়া একটা এনামেলের গামলা, স্পঞ্জ, তোয়ালে বাহির করিল। তারপর ষ্টোভ জ্বালিয়া নিজেই একটা কেটলি হাতে করিয়া জল আনিতে বাহির হইল—সে সকলের প্রতি এমন বিরক্ত হইয়াছিল যে কাহাকেও কোনো সাহায্য করিতে বলিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। তাহাকে কেটলি হাতে করিয়া যাইতে দেখিয়া নিধিরাম কেটলি কাড়িয়া লইয়া জল আনিয়া গরম করিতে দিল।

বিপিন নিধিরামকে বলিল—নিধিদা, তোর দেখছি আমার ওপর একটু দয়া আছে।... জল খানিকটা গরম করে এই গামলায় দে, আর খানিকটে চা করে ফেল। আর খানিকটে দুধ গরম কর,... বাড়ীতে দুধ না দেয় কাউকে পাঠিয়ে দে গোয়ালা-বাড়ী থেকে শিগগির কিনে আনবে,... বাড়ীর দুধ দেবে নাই বা কেন, না দেয় আমি জোর করে নেব।

বিপিনের অভিমানী অথচ একগুঁয়ে তেজস্বী মন একবার অভিমানে সকলকে ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করিবার জন্য উৎসুক হইতেছিল, আবার পরক্ষণেই সকলকে দমন করিয়া নিজে জয়ী হইবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিতেছিল। বিপিন দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল ক্ষমা, মোক্ষদা, জয়া, পাঁচুর মা, প্রভৃতি সকলে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিবার জন্য পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করিতেছে অথচ বিপিনের ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বিপিন তীব্র কণ্ঠে বলিল—ক্ষমা, উটের মতন গলা বাড়িয়ে কি উঁকিঝুঁকি মারছিস। অত কৌতূহল হয়ে থাকে ঘরের মধ্যে আয়, এসে সেবা কর।... মোক্ষদা, যা খানিকটে দুধ গরম করে চট করে নিয়ে আয়।

মোক্ষদা সেখান হইতে পলায়ন করিবার সুবিধা পাইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। কিন্তু আর সকলে না পারিতেছিল পলায়ন করিতে, আর না পারিতেছিল বিপিনের আহ্বান স্বীকার করিতে; তাহারা বিবর্ণ মুখে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

নিধিরাম গরম জল গামলায় ঢালিয়া দিল। তখন বিপিন বলিল—এঁকে পরিষ্কার করব কি আমরা পুরুষেরাই? স্ত্রীলোকের লজ্জা এতগুলি স্ত্রীলোক তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে?

সকলে আড়ষ্ট। কেহ একটু নড়িলও না। তখন সকলের পশ্চাৎ হইতে মালতী অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিপিনকে বলিল—আপনারা বাইরে যান, আমি সব করছি।

বিপিন সপ্রশংস স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মালতীর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল এই বিষম বিক্ষেপের মধ্যেও তাহার মুখ স্থির গম্ভীর, সে প্রবীণার মতো আত্মস্থ। বিপিন তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্ক খুলিয়া নিজের নূতন পুরাতন কতকগুলা কাপড় বাহির করিয়া ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ করিয়া ছিঁড়িয়া একটা ব্যাণ্ডেজ তৈরি করিল। কাঁচি, সেফটি পিন, সূচসূতা, সাবান, প্রভৃতি গুছাইয়া দিয়া সে নিধি-

রামকে ডাকিয়া লইয়া বাহির হইয়া আসিল। মালতী ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

বিপিন বলিল—নিধিদা, দেখ একবার ডাক্তার এল কি না।

গিন্নি বলিলেন—পোড়া কপাল! আর ডাক্তার ডাকতে হবে না! অমন লোকের মরাই ভালো!

জয়া বলিল—হঁ্যা, তা ত বটেই, মলেই ওর লজ্জা ঢাকে।

বিপিন শুধু একবার জয়ার দিকে চাহিল, কাহাকেও কিছু বলিল না। আজ তর্ক করিবার মতো মনের অবস্থা তাহার ছিল না। অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া নিধিরাম আসিল। তখন সকল অন্তঃপুরিকারা অন্তরালে সরিয়া গেল। বিপিন ডাকিল,—মালতী, হয়েছে? ডাক্তার বাবু এসেছেন।

মালতী ঘর হইতে বলিল—এই হল বলে। জ্ঞান হয়েছে। আপনি একবার ঘরে আসুন, বিছানাটা বদলে দিতে হবে।

বিপিন ও ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল মালতী মাতা ও শিশু উভয়কেই ধোয়াইয়া মুছাইয়া পরিষ্কার কাপড় পরাইয়া ফিট ফাট করিয়া ফেলিয়াছে। ময়লা কাপড় চোপড় পাশে জড়ো করা আছে।

বিপিন, ডাক্তার, নিধিরাম ও মালতী ধরাধরি করিয়া কালীতারাকে নূতন একটি বিছানায় শোয়াইয়া দিল। বিপিন বলিল—নিধিদা, দেখ্ দেখ্ দুধ।

নিধিরাম দুধ আনিতে গেল, ডাক্তার রোগী পরীক্ষায় নিযুক্ত হইল। ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া বলিল—রোগী বড় দুর্ব্বল। এঁকে খুব করে তাপ দিন, আর অল্প অল্প করে খেতে দিন। এই ওষুধটা আনিয়ে দুঘণ্টা অন্তর চার দাগ পর্য্যন্ত দেবেন। সন্ধ্যের সময় আমায় আর একবার খবর দেবেন।

ডাক্তার বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া ইঙ্গিত করিয়া বিপিনকে ডাকিল। বিপিন বাহিরে আসিলে ডাক্তার চুপিচুপি বলিল—বড় খারাপ অবস্থা। মনের উদ্বেগ, শীত, অনাহার, রক্তহানি সমস্ত মিলে ওঁর সমস্ত দেহযন্ত্রটাকে ভেঙে চুরে দিয়েছে—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত টিকবেন কিনা সন্দেহ। শিগগিব ওষুধটা আনিয়ে খাইয়ে দিন। সন্ধ্যার সময় আমায় আবার খবর দেবেন।

বিপিন ডাক্তারের সঙ্গে নিধিরামকে ঔষধ আনিতে পাঠাইল, এবং যাইবার সময় বলিয়া দিল—নিধিদা, দুবেজীকে বলে যাস বিদেশিয়ার বৌকে ডেকে দেবে, এই ময়লা কাপড়-চোপড়গুলো নিয়ে এখানটা সাফ করে দেবে।

বিপিন মালতীকে বলিল—তুমি ওঁকে একটু একটু করে দুধ খাওয়াও, আমি আগুন নিয়ে আসি।

বিপিন বাহির হইয়া দেখিল হাবার মা দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে বলিল—হাবার মা, যা দৌড়ে লোহার আঙটায় করে রান্নাঘর থেকে আগুন নিয়ে আয়, আর রামধনকে গিয়ে বল আমার এইখানে কতকগুলো কয়লা কি গুল আনিয়ে দেবে।

গিন্নি আসিয়া বলিলেন—বিপিন, নাওয়া খাওয়া করবি, না সমস্ত দিন এই নিয়েই

মেতে থাকবি? লোকদের খেতেটেতে দিবি?

বিপিন নরম স্বরে বলিল—তোমরা খাওগে মা, আমার এখন খাবার অবসর নেই।

—তুই খাবিনে আর আমরা খেয়ে বসে থাকব, কারো পেটে ত তেমন আগুন ধরেনি। খেয়ে এসে যা হয় করিস। আয়, আয়!

—না মা, একজন লোক অনাহারে অযত্নে মরছে, আর আমি তাকে ফেলে খেতে যাব, তোমার ছেলেকে এমন পাষণ্ড ভেবনা মা।

মালতী ধীরস্বরে বলিল—এখন আমি ত আছি। আপনি খেয়ে আসুন।

বিপিন প্রতিবাদের স্বরে বলিল—না না, খাবার সময় ঢের পাব, সেবার ত্রুটি হলে যে প্রাণটি যাবে তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

হাবার মা আগুন আনিয়া দূর হইতে কাপড়চোপড় গুটাইয়া চৌকাঠের বাহির হইতে আড়ষ্ট হইয়া ঝুঁকিয়া আলগোছে আগুনের আঙঠা ঘরের মধ্যে ধপাস করিয়া রাখিয়া দিল। বিপিন আগুন সরাইয়া দিল, মালতী তাপ দিতে লাগিল।

আহার ও তাপ পাইয়া কালীতারা একটু সুস্থ বোধ করিল। তখন তাহার মনে হইতে লাগিল সকলকার দৃষ্টি যেন তাহার বুকের ভিতরকার লুকানো লজ্জা উদ্ঘাটন করিয়া করিয়া বড় নির্ম্মম উপহাসের সঙ্গে দেখিতেছে। তাহার মুখ দিয়া কোনো বাক্য নিঃসৃত হইতেছিল না।

নিধিরাম ঔষধ আনিয়া দিল, বিদেশীয়ার বৌ আসিয়া ঘর পরিষ্কার করিয়া ফেনাইল দিয়া ধুইয়া দিয়া গেল। রামধন এক কেনেস্তারা গুল আনিয়া রাখিল। নিধিরাম আগুন করিতে বসিল। চারিদিকে শৃঙ্খলা দেখিয়া বিপিনের সরল মন আবার প্রসন্নতায় ভরিয়া আসিতেছিল, এমন সময় হরিবিহারীর খড়মের শব্দ শোনা গেল। হরিবিহারী ডাকিলেন—বিপিন!

বিপিন বাহিরে গিয়া বলিল—আজ্ঞে।

হরিবিহারী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—এসব কি? ওদের দূর' করে দাও।

বিপিন ধীর ভাবেই বলিল—বোধহয় দূর করতে হবে না; আপনিই দূর হবে।

—না না, আমার বাড়ীতে ওসব মরাটরার হাঙ্গাম চলবে না।

বিপিনের ইচ্ছা হইল বলে—আপনারা তা হলে মরবেন কোথায়?—কিন্তু সে-ইচ্ছা দমন করিয়া বলিল—এ অবস্থায় ওকে কোথায় নিয়ে যাব?

—রাস্তায় ফেলে দিয়ে এস। তোমার যেমন আক্কেল! পরের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে আনলে।

—পরের বোঝা ত ঠিক নয়, আমার খুড়োমশায়ের ছেলে, তাকে রক্ষা করতে আমি লোকত ধর্ম্মত বাধ্য।

হরিবিহারী বিরক্তির স্বরে বলিল—এঁঃ লোকত ধর্ম্মত বাধ্য!... দুপাতা ইংরিজি পড়ে ভারি তর্কবাগীশ হয়েছ দেখছি?... না না, আমার বাড়ীতে ওসব খাটবে না।

বিপিন ধীরভাবে বলিল—এ বাড়ীতে আমার যেটুকু অধিকার আছে, সেইটুকুতেই খাটবে।

—এঁএ? আমি থাকতে তোমার আবার

অধিকার কি? তুমি কথা না শোন, আমি ওদের দরোয়ান দিয়ে বার করে দেব।

বিপিন স্তব্ধ হইয়া পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া রহিল। অবশেষে বলিল—আজকের রাতটা থাকতে দিন। কাল হয়ত ওঁর মৃতদেহের সঙ্গে আমি আপনার বাড়ী ছেড়ে যাব। আর যদি ভালো থাকে তবুও আমি ওঁকে নিয়ে অন্য কোথাও যাব। আজ রাত্রে আমাদের তাড়াবেন না।

বিপিনের চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। এইসব দেখিয়া শুনিয়া হরিবিহারী দমিয়া গেলেন। থতমত খাইয়া বলিলেন—তো-তো-তোমাকে কে কি বললে যে তুমি কাঁদছ?… যা খুসি তোমাদের কর, আমি—আমি আর পারিনে।

হরিবিহারী খড়মের চটপট শব্দ তুলিয়া প্রস্থান করিলেন। গিন্নি বড় আশা করিয়াছিলেন যে হরিবিহারী আসিলেই এইসব অনাসৃষ্টি অনাচারের একটা সুমীমাংসা হইয়া যাইবে। কিন্তু যুদ্ধপ্রারম্ভেই তাঁহার যোদ্ধাকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে দেখিয়া গিন্নি হতাশ হইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

বিপিন ঘরের মধ্যে গিয়া কালীতারার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—খুড়িমা, কেমন আছ? কেমন বোধ হচ্ছে?

কালীতারার চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। চক্ষু ঈষৎ উন্মীলন করিয়া বলিল—আমার আর থাকাথাকি কি বাবা? আমার সময় হয়ে আসছে। খোকাকে আমার বুকের ওপর দাও।

মালতী খোকাকে তাহার বুকের উপর শোয়াইয়া দিল। কালীতারা—আঃ—বলিয়া একদণ্ড চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পুত্রস্পর্শ অনুভব করিতে লাগিল। তারপর চোখ মেলিয়া মালতীর দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি কে মা জানিনে। যেই হও তুমি, তুমি আরজন্মে আমার মা ছিলে।… বাবা বিপিন, তুমি আমার খোকাকে দেখো; ওর মায়ের পাপে নিষ্পাপ ও যেন কষ্ট না পায়।

বিপিন চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—খুড়িমা তোমার ছেলে তুমি দেখবে। অমন কথা বলছ কেন?

কালীতারার চক্ষু বিস্ফারিত মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে বলিল—উঃ বুকের মধ্যে যে কী করছে! নিঃশ্বাস যে বন্ধ হয়ে আসছে!

বিপিন তাড়াতাড়ি এক দাগ ঔষধ ঢালিয়া কালীতারাকে খাওয়াইল। তখন সে আবার একটু চুপ করিল। বিপিন বলিল—নিধিদা, যা, ডাক্তারকে ডেকে আন!

কালীতারা তৈলহীন প্রদীপের মতো ক্রমশই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতে লাগিল। আস্তে আস্তে তাহার চোখ মুদ্রিত হইয়া গেল, দেহ একবার হঠাৎ স্পন্দিত হইয়া নিস্পন্দ হইয়া গেল, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল।

মালতী তাড়াতাড়ি খোকাকে কালীতারার বুক হইতে নিজের বুকে তুলিয়া লইল। তাহার অশ্রুধারা গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিপিনও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ভ গ বা ন!

বিপিন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

(২৫)

কিছুক্ষণ পরে শিশুটি কাঁদিয়া উঠিল। তখন বিপিনের চমক ভাঙিল। অশ্রু মুছিয়া সে সকল পুরস্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিল—এই অসহায় জীবটির মা ত ওকে ছেড়ে গেল। এখন তোমাদের মধ্যে কে দয়ালু আছ, কে ওর মা হবে?

সকলে নিস্তব্ধ। নিশ্বাস পর্য্যন্ত যেন কেহ ফেলিতেছে না। বিপিন আবার বলিল—বল বল, কে এই অনাথ শিশুর ভার নিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করবে?

তখন গিন্নি বলিলেন—কে আবার ঐ ল্যাঠা সাধে সুখে ঘাড়ে করতে যাবে? ওকে বষ্টমদের আখড়ায় পাঠিয়ে দেবো এখন।

বিপিন একটু বেদনামিশ্র অভিমান ও তিরস্কারের স্বরে বলিল—মা, এমন নিষ্ঠুর কথা বলা তোমার সাজে না। আমার মা যেদিন মরেছিলেন সেদিন ত মা তুমিই আমাকে বুকে তুলে নিয়েছিলে, বষ্টমের আখড়ায় ত পাঠাও নি!

বিপিনের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। গিন্নিও আহত হইয়া বলিলেন—ষাট ষাট, শোন একবার পাগলামি কথা! তোকে কোন্ দুঃখে বষ্টমের আখড়ায় দিতে যাব? তুই যে আমাদের বংশের দুলাল! বড় দুঃখের প্রথম ছেলে! তোতে আর এতে সমান হল?

—তফাৎ বড় বেশি নয় মা। এ আমার খুড়োর ছেলে। তোমরা কেউ না স্বীকার কর, আমি একে স্বীকার করব এ আমার ভাই; আমার শরীরে যে-বংশের রক্ত, এর শরীরেও তাই। আমি ওকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না। ওর মা মৃত্যুকালে আমার হাতে ওকে দিয়ে গেছে। আমার প্রাণ দিয়েও ওকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমার প্রাণ দিলেও ত ওর মায়ের অভাব আমি পূর্ণ করতে পারব না। কে তোমরা দয়া করবে বল?

আবার সকলে নিস্তব্ধ। বিপিন একে একে সকলের মুখের দিকে চাহিল; তাহার দৃষ্টির সম্মুখে কাহারো দৃষ্টি অসঙ্কোচে স্থির থাকিতে পারিল না; কেহই স্বীকৃত হইল না। তখন বিপিন ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—এখানে কি তবে এমন একজনও নেই, যার হৃদয় এই অসহায় নিরপরাধকে আপনার স্নেহ দিয়ে রক্ষা করতে পারে? আমাকে কি শেষে মাইনে-করা দাসীর সাহায্য নিতে হবে?

তখন মালতী ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বিপিনের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে স্নেহ যেন ক্ষরিত হইতেছিল, করুণা যেন মাখানো ছিল, অভয় যেন উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পাইতেছিল; কিন্তু তাহারই সঙ্গে সে-দৃষ্টিতে কি সঙ্কোচ, কি বিনয়, কি আত্ম-বিলোপের চেষ্টা! সেখানে করুণার আগ্রহ আছে, বাহাদুরি লইবার ব্যগ্রতা নাই। বিপিনের মন আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। সে আশাভরে মালতীর দিকে চাহিয়া রহিল।

মালতী একবার সকলের দিকে চকিতে চাহিয়া লইল; দেখিল কাহারো মুখে কিছু বলিবার মতো ব্যগ্রতা নাই। তখন সে নতমুখে ধীরস্বরে বলিতে লাগিল—আমি এ-কে মানুষ করব। আমার জীবনে ত কোনো অবলম্বনই নেই, এই আমার অব-

লম্বন হবে। কিন্তু দুধের সংস্থান ত আমার নেই, সে ভার আপনাদের নিতে হবে।

বিপিন উৎসাহিত হইয়া বলিল—তার জন্যে ভাবনা কি? সে আমি ঠিক বন্দোবস্ত করে দেবো। আজ থেকে তবে এ শিশু তোমার।

মালতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল—হইল ভালো, যেমন সকলের ঘৃণিত আমি, আমার সম্বলও জুটিল তেমনি সকলের ঘৃণিত এই শিশু!

মালতীর মনের এই ভাব আলোচনা-ব্যগ্রা পুরস্ত্রীদের মনেও সংক্রমিত হইল। তাহারা এই বিষয় লইয়া কতবিধ আন্দোলন কতবিধ শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

শিশুর বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বিপিন শব সংকারের জন্য ব্যস্ত হইল। কে এই শব লইয়া যাইবে? এই পতিতার শব কোনো শুদ্র ব্রাহ্মণ স্পর্শ করিবে কিনা সন্দেহ। হায় হায়! এমন দিনে আজ নবকিশোর গ্রামে নাই! সে থাকিলে তাহারা দুজনেই সৎকার করিয়া আসিতে পারিত।

বিপিন নিধিরামকে বলিল—নিধিদা, যা ত দেউড়িতে আর ঠাকুরবাড়ীতে; সবাইকে বলগে শ্মশানে যেতে হবে। কাউকে ডাকিসনে, যে আপনি আসবে, আসবে। আর একবার ভটচায্যি জ্যেঠামশায়কে খবর দিস গিয়ে।

নিধিরাম চলিয়া গেল। বিপিন সেই শব কোলে করিয়া বসিয়া আছে। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এখনো তাহার স্নানাহার হয় নাই, বাড়ীরও কেহ তাহার জন্য খাইতে পায় নাই। বিপিনের অনাসৃষ্টি কাণ্ডের জন্য সকলেই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সব চেয়ে অসন্তোষ মালতীর উপর। বিপিনের প্রিয় হইবার জন্যই যে সবাইকে টেক্কা দিয়া মালতী বিপিনের গায়ে পড়িয়া সকল কাজ করিতেছে এ বিষয়ে কাহারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সকলেই ঢের ঢের মেয়ে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন পুরুষের-গায়ে-পড়া মেয়ে তাহারা বাপের জন্মেও দেখে নাই।

ঘর অন্ধকার হইয়া আসিল, গিন্নি বলিলেন—জয়া ঠাকুরঝি, সন্ধ্যে জ্বালোগে, একে ত ঠাকুর আজ উপুসী আছেন, আবার বাড়ীতে সন্ধ্যে উতরে যাবে······চারিদিকেই ত অলক্ষণ। যে অবধি মালতী অলক্ষ্মী বাড়ীতে পা দিয়েছে সে অবধি সংসার যেন পুড়ে ঝুড়ে যাচ্ছে।

বিপিন অনুযোগের স্বরে বলিল—মা!

গিন্নি বলিলেন—আমি অমন কারো মুখ চেয়ে কথা বলতে জানিনে। সত্যি কথা বলব, তার আবার ঢাকঢাক গুড়গুড় কি?··· যা ক্ষমা, মোক্ষদা যা, ঘরে ঘরে সন্ধ্যে দেখিয়ে চৌকাঠে জল দিগে। শাঁক বাজাসনে যেন, বাড়ীতে মড়া রয়েছে। ভালো আপদ বাপু, বাড়ীতে এক মড়া আগলে বসে থাকা। কোথাকার ঝঞ্ঝাট কোথায় এসে পড়ল দেখ দেখি।

জয়া, ক্ষমা, মোক্ষদা, পাঁচুর মা উঠিয়া গেল। পাঁচুর মাকে যাইতে দেখিয়া গিন্নি বলিলেন—বৌমা, একটা কুটো ভেঙে খোঁপায় গুঁজে রাখগে; ভরা পোয়াতি তুমি, সাবধানে থেকো। মড়া নিয়ে যাবার সময় তুমি দেখোনা যেন। তুমি ঠাকুর-

ঘরে বসে থাকগে; একলাটি থাকতে ভয় করে ত মোক্ষদাকে বোলো কাছে বসবে।

একটু অগ্রসর হইয়াই জয়া বলিল—দেখলি তোরা মালতীর কাণ্ডখানা! কি গায়েপড়া মেয়ে রে বাবা! বিপিনের যারপরনাই মা রয়েছে, আমরাও ত মায়েরই মতন, আমরা রয়েছি, ঐ ওর নিজের খুড়ি রয়েছে, কেউ কি আর আমরা ঐ কচিছেলের ভার নিতাম না! একটা প্রাণী যত্ন-অভাবে মারা যাবে এই কি কেউ চক্ষে দেখতে পারত! কিন্তু ওঁর আর তর সইল না। অমনি টপ করে বললেন—আমি ছেলে নেব। ভ্যালা রে আমার দরদী! তবু যদি এক পয়সার মুরোদ থাকত! মার চেয়ে যে দরদী তাকে বলে ডান!

ক্ষমা বলিল—সত্যি বাপু মালতীর সবই বাড়াবাড়ি। কি করে বিপিনদার সঙ্গে যে কথা কইবে সেই ছুতো খুঁজে ছোঁকছোঁক করে বেড়ায়।

মোক্ষদা বলিল—ওটা বয়সের দোষ লো বয়সের দোষ!

পাঁচুর মা বলিল—মরণ আর কি? বয়স ত আর কারো ছিল না, রূপসী বিদ্যেধরীরই শুধু বয়েস হয়েছে! আমাদেরও অমনি এককালে ছিল। পাঁচু হয়ে অবধি আমার হরতেলের মতন রং একেবারে কালো ঝুল হয়ে গেছে, তোরা ত তা দেখেছিস ঠাকুরঝি। কিন্তু আমরা কত রূপের গরব করে বেড়াচ্ছি। উনি রূপের ঠ্যাকারে আর বাঁচেন না!

মোক্ষদা বলিল—তা যাই বল বৌ, মালতী সুন্দরী বটে!

ক্ষমা বলিল—ছাই সুন্দরী, চোখ দুটে ড্যাবা ড্যাবা, নাকটা তিন হাত। ওর চেয়ে কালোতে আমাদের ছিরি আছে।

জয়া বলিল—সর্ব্ব দোষ হরেৎ গোরা—শাস্ত্রেই বলেছে। কটা চামড়া দেখেই লোক ভুলে যায়।

মালতীর শ্রাদ্ধ করিতে করিতে প্রদীপ জালা হইল। জয়া বলিল—যা ত মা ক্ষমা সব ঘরগুলোতে সন্ধ্যে দেখিয়ে আয়, আর মোক্ষদা চৌকাঠগুলোয় একটু জল দিয়ে আয়।

—না বাপু, আমরা একলা যেতে পারব না। বাড়ীতে মড়া পড়ে রয়েছে, গা কেমন ছমছম করছে। তুমিও সঙ্গে এস জয়া মাসি।

তখন চারজনেই রাম রাম বলিতে বলিতে সকল ঘরে প্রদীপ দিতে দিতে আবার বিপিনের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

গিন্নি প্রদীপের আলোক দেখিয়াই এক হাতের আঙুলের ফাঁকে উল্টা দিক হইতে অপর হাতের আঙুল শৃঙ্খলিত করিয়া কপালে বারবার ঠেকাইয়া ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন এবং উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন—দুর্গা দুর্গা! হরিবোল হরিবোল! রাম রাম! রাম রাম!

মোক্ষদা চৌকাঠে জল দিতে যাইতেছিল। গিন্নি বলিলেন—হাঁ হাঁ হাঁ—করিস কি? এ চৌকাঠে জল দিসনে। মড়া বেরিয়ে গেলে গোবরজল ছড়া দিতে হবে। তেশূন্যে ঘরের মধ্যে মাগী মরল। ও রকম লোকের

ত এমনি মরণই হয়......ওদের কি আর সদ্‌গতি হয়! তেশূন্যে মরে তেশূন্যে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াবে!

বিপিন বলিল—মা! মানুষ থাকবে ঘরে, মরবে কোথায় গিয়ে, ভাগাড়ে?

গিন্নি বিপিনের সঙ্গে তর্কে সুবিধা করিতে পারিবেন না বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকিলেন।

এমন সময় নিধিরাম আসিয়া বলিল—কেউ মড়া ফেলতে আসতে চায় না; সবাই বলে জাত গেছে যার তার মড়া ফেল্লে আমাদেরও জাত যাবে। শুধু ভগবান মুকুল আর মহীপত তেওয়ারি এসেছে। ভটচায্যি মশায় পরে আসছেন।

পশ্চাৎ হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—আমি এসেছি বাবা বিপিন! শবসৎকারের কি হচ্ছে?

—লোক পাওয়া যাচ্ছে না জ্যাঠামশায়!

গিন্নি বলিলেন—বষ্টমদের আখড়ায় খবর দিলেই ত কত লোক পাওয়া যাবে। মালসা ভোগ দিয়ে তাদের একটা মচ্ছব দিতে হবে...তা খরচ হবে বলে কি করা যাবে। নিজের দরজার ময়লা নিজেকেই ত সাফ করতে হবে।

বিপিন উত্তেজিত হইয়া বলিল—না, সে কখখনো হবে না। বষ্টম ফষ্টমকে ছুঁতে দেবো না।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—কেন বাবা, এতে তোমার আপত্তি কি? শবেরও কি ছুত বিচার আছে?

—তা নেই জ্যেঠামশায়, কিন্তু এটা যে শবের প্রতি অপমান! এ ত আমি কিছুতেই হতে দিতে পারিনে। এঁকে অপমান করবার অধিকার কারো নেই। আমি কিছুতেই স্বীকার করব না যে ইনি কোনো পাপ করেছিলেন। সন্তানকে রক্ষা করবার জন্যে কি মনের বলের পরিচয় দিয়েছেন! নিজের প্রাণ দিলেন, তবু অজ্ঞাত সন্তানের প্রাণ নষ্ট করতে কিছুতেই স্বীকৃত হন নি।...নিধিদা, ডাক তেওয়ারিদের, আমরা তিন জনেই কোনো রকম করে সৎকার করে আসতে পারব!

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—চল বাবা, আমি চতুর্থ হব।

—না না, আপনি বুড়ো মানুষ আপনার কষ্ট হবে। আমরা তিন জনেই পারব।

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—আমার কষ্ট হবে কি না সে কথা তোমার চেয়ে আমিই ভালো বুঝি বাবা।...আর এই মহীপত তেওয়ারিটিকেও ত আমার চেয়ে নবীন বোধ হচ্ছে না।

বিপিন মহীপতের শুভ্র শ্মশ্রু ও লোল শুভ্র চর্ম্মের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

তখন চারজন ধরাধরি করিয়া কালীতারার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া চলিল। কিন্তু তাহার চির বিদায়ের সময় কেহ একবার বিলাপ করিয়া কাঁদিল না, কাহারো হৃদয়ে একটু বেদনা বোধ হইল না। শুধু মালতী লুকাইয়া একবার চোখ মুছিয়া শিশুটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল, আর খুড়িমা শক্ত হইয়া বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

(২৬)

বিপিনেরা শব লইয়া বাড়ীর বাহির

হইতে-না-হইতে শব বহনের জন্য অসংখ্য লোক আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। গ্রামের জমিদারের ছেলেকে শব বহন করিতে দেখিয়া কাহারই উৎকট ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়া আর বাধা দিতে পারিল না। শব-সৎকার বেশ সমারোহের সঙ্গেই হইয়া গেল।

এদিকে অন্দর মহল হইতে শব বাহির হইয়া গেলে গিন্নি বলিলেন– নে নে রোহিণী, তোতে আর হাবার মাতে মিলে সব পরিষ্কার করে নে।

রোহিণী নাক সিঁটকাইয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল—আমি এই শীতকালে রাত্রে নাইতে টাইতে পারব না। হাবার মা পারে করুক।

হাবার মা বলিল–মুইও সে পারব নি, মোর জাড় করে জ্বর এসেছে।

গিন্নি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—তোরা কেউ পারবিনে তবে কি আমি করব?

মালতী বলিল—বড় মাসিমা, আমি সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

গিন্নি তাহার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। মালতী তৎপরতার সহিত সর্ব্বত্র ঝাঁট দিয়া, ধুইয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল!

গিন্নি বলিলেন--ওগো ও মেম সাহেব! গোবর দিলে কৈ? লক্ষীচরিত্তিরে আছে—

লক্ষীর বাস আমলকিতে, শঙ্খে, পদ্মে, গোবরে;
আর লক্ষী বিরাজ করেন সাদা ধপধপ কাপড়ে!

তোমরা ত শাস্তর টাস্তর কিছু মানো না; কিন্তু আমরা ত তোমার মত মেম হইনি……

মালতী অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি গোবর আনিয়া গোবরজল ছড়া দিতে লাগিল।

তখন গিন্নি বলিলেন—তুমি ঐ ছেলে নিয়ে কোথায় থাকবে গো? বিপিন যা বল্লে তাই কি করলে? শোবার ঘরখানা আঁতুড়ঘর করলেই?

মালতী বলিল—এ ঘর যখন আঁতুড়-ঘর হয়েছে তখন আমি এই ঘরেই থাকব।

—বিপিন তাহলে থাকবে কোথায়?

মালতী হাসিয়া বলিল—তা তিনিই জানেন, যিনি ইচ্ছে করে নিজের শোবার ঘরটাকে আঁতুড় করেছেন।

মালতীর হাসি দেখিয়া গিন্নির গা জ্বলিয়া গেল। তিনি তীব্র স্বরে বলিলেন —তোমাকে আগলাবে কে? ছোট বৌ?

খুড়িমা অমনি রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন —হ্যাঁ! ছোট বৌয়ের ত আর কাজকর্ম্ম নেই যে আঁতুড় আগলাতে যাবে? আমার পূজো আছে আহ্নিক আছে, আমি ত আর আঁতুড় নিয়ে জয়জয়কার করতে পারব না।

মালতী বুঝিল সমস্যা জটিল। তাহাকে কেহ আগলাইবে না, অথচ একলা থাকিলেও কুৎসার অন্ত থাকিবে না। এই কথা মনে হইতেই তাহার তেজস্বী মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে বলিল—আমি এখানে একলাই থাকব।

সকলে অবাক হইয়া এই সাহসিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রোহিণী বলিল—তা থাকলেই বা, ভয় কি, দাদাবাবু ত ঐ পাশের ঘরেই থাকবে।

জয়া রোহিণীর দিকে চাহিয়া হাসিল।

তারপর সকলেরই চোখে চোখে হাসি খেলিয়া গেল।

মালতী সমস্তই বুঝিল এবং বুঝিল বলিয়াই দিব্য নিশ্চিন্ত ও স্বাভাবিকভাবে শিশুটির শয়ন ও আহারের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

মালতীকে এইরূপে লোকাপবাদের ভয় উপেক্ষা করিতে দেখিয়া গিন্নি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। খুড়িমা তাড়াতাড়ি মালতীকে ঢাকা দিবার জন্য বলিলেন—তা ওকে ত এই ঘরেই থাকতে হবে, আঁতুড় নিয়ে আর কটা ঘর মজাবে। আমি না হয় ঐ পাশের ঘরে একদিন থাকব। আর দিদি তুমি বলে দিয়ো দাসীদের মধ্যে কেউ একজন এই দালানে শোবে।

গিন্নি এ কথার কোনোই উত্তর না দিয়া বলিলেন—দেখিগে ঠাকুরের কি হচ্ছে। কাকে দিয়ে তাঁর গতিমুক্তি হবে তাও জানিনে।

এই কথা শুনিয়া মালতীর এমন হাসি আসিল যে সে হঠাৎ খোকার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ দিতে বাধ্য হইল। ঠাকুরের ভাবনা মানুষ ভাবিয়া অস্থির কে তাঁহার গতিমুক্তি করিবে!

গিন্নি বলিলেন—যা রোহিণী; দুবেজীকে বলগে ঠাকুরবাড়ীর হারাধন পূজুরীকে ডেকে দেবে। মুখুয্যেমশায় কি গোবর্দ্ধন এবাড়ীতে ত আর পা দেবে না। ছিছি! আজকালকার যেমন সব ছেলেপুলে হয়েছে, বামুন দেবতা মানে না, শাপমন্যির ভয় নেই!... ওলো হাবার মা, উঠনে, বার-দরজার কাছে একটা পূর্ণ ঘট, আগুন, লোহা আর দুটি মটর ডাল রেখে দিগে। আর বংশীকে বল দুটো নিমপাতা এনে দেবে; বিপিন বাড়ী এলে ঐসব ছুঁয়ে তবে ঘরে উঠবে।...সে হয়ত ওসব মানবেই না! তা মানুক আর না-মানুক যা লক্ষণ আমায় ত তা সব করতে হবে। যা যা, কখন সে হুপ করে এসে পড়বে আবার।

সমস্ত দিনের বিষম বিক্ষেপের পর বাড়ীতে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল। ঠাকুরঘরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। উনন জ্বলিল। ছেলেমেয়েগুলি আহার নিদ্রার জন্য জননীদিগকে জড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে লাগিল, বিনি একবার সমস্ত দিনের পর মার কাছে যাইবার জন্য কাঁদিতে লাগিল। গিন্নি বলিলেন—থাম, থাম, আমি একবার সব দেখে শুনে আসি, বিপিনের খাবার, ঠাকুরের শেতল তৈরি টৈরি হল কি না!

জয়া বলিল—কচি মেয়ে ভরসন্ধ্যেবেলা মা ছেড়ে কি থাকে? তুমি একে একটু নেও, আমি ওদিকে দেখছি।

জয়াকে যাইতে দেখিয়া খুড়িমা সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। গিন্নি বিনিকে কোলে লইয়া বলিলেন—আমার ত তোমায় কোলে করে নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। চল ঠাকুর-ঘরের দালানে গিয়ে বসিগে, সকল দিকই দেখতে শুনতে পাব।...মালতী, তুমি একলা থাকতে পারবে? এই আমরা ত সব কাছাকাছিই থাকব।

আজ এই প্রথম একটুখানি সদয় ব্যবহার পাইয়া মালতী যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বলিল—তা পারব মাসিমা।

তখন গিন্নি গিয়া ঠাকুরঘরের দালানে বসিলেন।

খানিকক্ষণ পরেই বিপিন ফিরিয়া আসিল। সে বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। গিন্নি বলিলেন—হাঁ, হাঁ হাঁ... ঐখেনে একটু দাঁড়া। ঐ আগুন লোহা ছোঁ। একটা মটরের ডাল আর নিমপাতা দাঁতে কেটে ফেল, তার পর আয়।

বিপিনের মন তখন এমন ক্লান্ত হইয়া ছিল যে সে বিনা প্রতিবাদে এই অর্থহীন অনুষ্ঠান করিল।

গিন্নি বিপিনকে বলিলেন—বোস বোস, এইখানে বোস।

বিপিন মাতার গা ঘেঁসিয়া বসিল।

গিন্নি পুত্রের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—একি! মাথা যে একেবারে শপশপ করছে, ভালো করে মাথাও পুঁছিসনি বুঝি। রাত্তিরে ভিজে মাথায় থাকলে অসুখ করবে যে

তারপর তিনি নিজের অঞ্চল দিয়া বিপিনের মাথা মুছিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিপিন বলিতে লাগিল—থাক থাক হয়েছে। কিন্তু কে শুনে তাহার কথা। ঘসিয়া ঘসিয়া মাথা মুছিয়া গিন্নি বলিলেন—ছোট বৌ, বিপিনের জলখাবারটা এনে দাও।

—এখন আর জল খাব না মা, একেবারেই খাব।

—একেবারেই খেতে পারবি কেন। সমস্ত দিন এই হটরানি, গলা যে শুকিয়ে কাট হয়ে আছে। একটু না-হয় আগে সরবৎ খা।......ছোট বৌ, দেখ ত খাবার হল। হয়ে থাকে ত সব এক সঙ্গেই এনে দাও, খেয়ে একটু শুক গিয়ে।··· কোথায় শুবি?

—কেন, আমার ঘরে।

—ও ঘরে ত মালতী ছেলে নিয়ে আছে।

—আমি তাহলে লাইব্রেরী ঘরে শোব। ...এই, কে আছিস।

রোহিণী অগ্রসর হইয়া বলিল—কেন দাদাবাবু।

—যা, নিধিদাকে বলগে লাইব্রেরী-ঘরে বড় কৌচখানার ওপর আমার বিছানা করে দেবে।

গিন্নি বলিলেন—তুই ঐ রাইবেরালীর মধ্যে কেমন করে থাকবি? চারিদিকে বই ঠাসা—গুমসো গুমসো চামসে চামসে গন্ধে ঘুম হবে কেন?

—বেশ হবে। বইয়ের গন্ধ আমাদের কাছে চন্দনের গন্ধের মতন।

গিন্নি তাঁহার একগুঁয়ে ছেলেটিকে ভালো করিয়াই চিনিতেন। তিনি আর কিছু বলিলেন না। বিপিন আহারে প্রবৃত্ত হইল।

আহার সমাপ্ত করিয়া বিপিন শয়ন করিতে চলিল। শয়নকক্ষের সম্মুখে গিয়া দেখিল একাকিনী মালতী বসিয়া আছে। বিপিন বলিল—একলা আছ মালতী?

মালতী হাসিয়া বলিল—আর ত আমি একলা নই। ভগবান ত আমার সঙ্গী জুটিয়ে দিয়েছেন!

কল্যাণময়ী জননীর মতো শিশুটিকে কোলে ধরিয়া মালতী বসিয়া আছে, বিপিন মুগ্ধ নেত্রে তাহাই দেখিতে লাগিল।

বিপিন একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া মালতী কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—রাত হয়েছে, আপনি শুতে যান।

বিপিন ধীরে ধীরে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্মভূমি

১

কোথায় আমার জন্মভূমি ? কোথা, কোন্ গগনের নীচে ?
কোথা হতে এলাম মর্ত্ত্য-বাসে ?
ভুলে গেছি ; কিন্তু স্মৃতির ছায়া লেগে আছে পিছে
কত ভাবি মনে নাহি আসে।

২

দিনের আলো আস্‌ছে নিভে, আস্‌ছে সন্ধ্যা, আস্‌ছে রাতি,
নীরবতা প্রসারিছে কায়া।
এস আমার চিরদিনের মৌন কান্নার সাথের সাথী,
ছড়িয়ে দিয়ে নির্ম্মমতার মায়া।

৩

আয় তমিস্রা আয়রে নিশা, দেখি তোদের পরপারে
জাগে কিনা উষার তরুণতা।
দেখি, যদি সেই প্রভাতের পাখীগুলির নাচগানে
মনে পড়ে জন্মভূমির কথা।

—•:•—

শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী

জ্যোৎস্না-নিশীথে

১

রজত-ধবল স্নিগ্ধ পূর্ণিমার তরল উচ্ছ্বাস
ঝরিয়া পড়িছে নিম্নে, পরিপ্লাবি' নিখিল আকাশ,
প্রকৃতির মুক্তবক্ষে ;—সে মোহন কোমল পরশে
কদম্ব শিহরি উঠে ব্যাকুলিয়া তরুণ উল্লাসে !
চিক্কনিয়া শিক্ত শ্যাম আকম্পিত অশ্বত্থপল্লবে
সুপ্তিমগ্ন সৌধশিরে চন্দ্রকর ঘুমায় নীরবে।
পূর্ণতোয়া স্রোতস্বতী কুলুকুলু যাইছে বহিয়া
উচ্ছ্বসিত সর্ব্ব অঙ্গে চূর্ণরশ্মি পুলকে মাখিয়া।

২

ক্ষমিয়ো আমারে, প্রভো, এই শান্ত সুপ্ত রজনীতে
দ্বিধা যদি জেগে উঠে চুপি চুপি হৃদয় নিভৃতে।
সবল দলিবে সদা পদতলে দুর্ব্বলের প্রাণ,
পিষ্টই পেষিত হবে—বিশ্বতন্ত্রে এই কি বিধান ?
স্বার্থের উলঙ্গ মূর্ত্তি লজ্জাহীন নাচিয়া বেড়ায়,
বিদ্বেষ মুখস্ পরি' ঢালে মধু দুষ্ট রসনায়,
মিথ্যা হইয়াছে দড়, প্রবঞ্চনা পর্ব্বত-প্রমাণ—
সত্যপন্থী ধর্ম্মভীরু বল, প্রভো, কোথা পাবে স্থান ?

৩

বিলাস অযথা স্ফীত শোষিয়াছে দরিদ্রের গ্রাস,
বিবেক, প্রতিভা, মেধা স্তব-তুষ্ট দাম্ভিকের দাস,
এ বৈষম্য তব রাজ্যে সাজে কি, হে রাজরাজেশ্বর ?
মূঢ়-বুদ্ধি বুঝিনাকো সন্দেহেতে ব্যাকুল অন্তর।
পুরাতন জীর্ণ পৃথ্বী আর, প্রভো, ভাল নাহি লাগে,
নিয়ন্ত্রিত নবীনের অভ্যুদয় আশা প্রাণে জাগে।
সত্য যুগ চলি গেছে বহুদিন এ মর্ত্ত্য ছাড়িয়া—
আবার ফিরিবে কবে, তারি তরে আছি তাকাইয়া।

৪

হে রুদ্র, সংহার-লীলা পুনঃ তব কর অভিনয়
ধ্বংস হোক্ দুষ্কৃতের, ভস্ম হোক্ পাপের নিলয়।
সেই ভস্মরাশি হ'তে দীপ্ত দৃপ্ত নবীন জীবন
ফুৎকারি' জাগায়ে তোল, ধরা হোক্ শান্তিনিকেতন।
মহাসমুদ্রের নীরে অবগাহি' উঠুক্ ধরণী
ডুবায়ে অতল তলে অতীতের কলঙ্ক কাহিনী।
বুদ্ধের বৈরাগ্য-দীক্ষা চৈতন্যের প্রেমের বিজয়,
যীশুর উদার ক্ষমা,—আর যেন ব্যর্থ নাহি হয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

নিরুপমা

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত "ফুলের মালা"

শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত

জল্পেশ্বরে শিবরাত্রি

আমরা যেখানে অবস্থিতি করি তাহার পনর মাইল উত্তরে প্রসিদ্ধ জলপাইগুড়ি জেলা। তাহার পশ্চিমে ভুটান ডুয়ারের অন্তর্গত ময়না গুড়ি পরগণার মধ্যস্থিত, জল্পেশ নামক স্থানে, একটি প্রাচীন বৃহদায়তন কারুকার্য্য সমন্বিত শিবমন্দির আছে। ইহা জল্পেশ্বর মন্দির নামে খ্যাত। ইহা জলপাইগুড়ি সহর হইতে পূর্ব্বদিকে আট মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানটি বিরল বসতি এবং জঙ্গলাকীর্ণ, তথায় যাইবার পথ অতিশয় বন্ধুর ও অসমতল। পথে কতকগুলি ছোট ছোট পার্ব্বত্য নদী আছে তাহার প্রশস্তি অল্প, কিন্তু তটভূমি অত্যন্ত উচ্চ। অন্যান্য সময়ে ইহার অধিকাংশই শুষ্ক বা স্বল্প জলধারা-প্রবাহিত থাকে কিন্তু বর্ষাগমে ইহাদের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই সকল কারণে এ পথে যাতায়াত করিতে হইলে হস্তি অশ্ব বা গোশকট ভিন্ন অন্য যানে যাইবার উপায় নাই।

প্রতি বৎসর শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে সেখানে একটি বৃহৎ মেলা হয়। এই সময়ে দেবাদিদেবকে দর্শন ও পূজা করিবার জন্য বর্ষে বর্ষে বহুলোক সমাগম হইয়া থাকে। আমরা ৺শিবরাত্রির দিন প্রত্যুষে গোযানে আরোহণ পূর্ব্বক ৫ মাইল দূরবর্ত্তী বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের চাঙ্গড়াবান্ধা নামক ষ্টেসন হইতে ট্রেণে চড়িলাম। তথা হইতে ৫।৬ মাইল দূরে ভোটপাটি নামক ষ্টেসনে নামিয়া পুনরায় গরুর গাড়িতে উঠিলাম। এই গাড়িও পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল, তানহিলে পাইবার উপায় নাই। নিকটবর্ত্তী লোকেরা এরূপ বন্দোবস্তে কেহ যায় না। সকলেই বরাবর গোশকটে যাইয়া থাকে। এই কয় মাইল রাস্তা পুষ্পকযানের আরোহণ সুখ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আমরা এই পন্থা অবলম্বন করিলাম।

পথে দেখিলাম অসাধারণ জনতা। বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবাকিশোর ও বালক, সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীতে এই জনসংঘ গঠিত। সকলেই পরিষ্কৃত, সুবেশধারী ও প্রফুল্লচিত্ত। এ দেশের স্ত্রীলোকেরা মস্তকাবরণ ব্যবহার করে না। মাথার চুল আঁচড়াইয়া পশ্চাতে ঝুঁটি বাঁধে, চুলের মধ্যে কোন অলঙ্কার পরিবার প্রথা নাই; কাপড় দুইখণ্ড ব্যবহার করে; একখণ্ড বক্ষস্থলের উপর দিয়া বাঁধে আর একখানা চাদর পুরুষ মানুষের মত ঘাড়ের উপর দিয়া গায়ে ফেলিয়া রাখে। পুরুষদের পরিচ্ছদে আধুনিক অনুকরণে কোট সার্ট পিরাণ প্রভৃতির প্রচলন হইয়াছে। বাড়িতে কিন্তু অধিকাংশ লোকেই কেবলমাত্র একটা কৌপিন মাত্র ব্যবহার করে। পথের ধারে শিমুল পলাস কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষ। লোকে দলবদ্ধ হইয়া সেই সব বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে আবার চলিতেছে। অনেকগুলি ছাগ মেষ কবুতর প্রভৃতিও বলিদানের জন্য নীত হইতেছে, এ প্রদেশে

সর্ব্বত্রই এই সকল উপকরণ মহাদেবের নিকটে বলিদান প্রদত্ত হইয়া থাকে।

সেই অসমতল উচ্চ নীচ পথে গো শকটের মহাআন্দোলনের মধ্যে পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ তটভূমি হইতে নদীগর্ভে মহাবেগে অবতরণের সময় শাখামৃগের মত ছই ধরিয়া ঝুলিয়া কোন মতে পতন হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। এইভাবে প্রায় ৪ মাইল পথ অতিক্রান্ত হইলে সকলে সোল্লাসে বলিয়া উঠিল "আমরা আসিয়া পড়িয়াছি ঐ যে ৺বাবার মন্দির দেখা যায়।"

অবশেষে খরস্রোতা ধবলা বা ধবলা নদী পার হইয়া আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। মন্দিরের নিকটেই আমাদের তাম্বু ফেলা হইয়াছিল। সম্মুখে একটি অনতিবৃহৎ পুষ্করিণী, মন্দিরের অপর পার্শ্বে আরও একটি এই প্রকার পুষ্করিণী আছে। কিন্তু বহুকাল সংস্কারাভাবে মজিয়া গিয়াছে জল একগলা মাত্র। স্থলজ ও জলজ উদ্ভিদ পচিয়া জলকে সবুজবর্ণ ও দুর্গন্ধময় করিয়া ফেলিয়াছে। তথাপি অদ্য সেই পুষ্করিণীর মাহাত্ম্যের সীমা নাই, অধিকাংশ লোকই তাহাতে স্নান করিয়া একেবারে জলকাদা গোলায় পরিণত করিয়াছে। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, কিন্তু কৌতূহল আমাদের বেশীক্ষণ বিশ্রাম করিতে দিলনা, উঠিয়া বস্ত্রাবাসের পার্শ্ব হইতে দেখিলাম পশ্চিম ও উত্তর দিকে যতদুর দেখা যায় কেবল লোক সমুদ্র। "জয় বাবা জল্লেশ্বরের জয় মহাকালের জয়" এইরূপ শব্দে কান ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। সুবৃহৎ মন্দির মধ্য হইতে মুহুর্মুহু ঘণ্টা-ধ্বনিসহ পূজারী ব্রাহ্মণগণের কণ্ঠ হইতে অবিশ্রান্ত "শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ" মন্ত্র খুব গম্ভীরভাবে উচ্চারিত হইতেছিল। আমরা বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া তখনই পূজা করিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় শুনিলাম, এক্ষণে সেখানে ভয়ানক ভীড়। মধ্যরাত্রে ময়না গুড়ির তহশীলদার বাবুর (মেলার ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী) স্ত্রীকন্যাগণ পূজা করিতে যাইবেন, তখন সমস্ত জনতা মন্দির হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। অতএব সেই সময় আমাদেরও যাওয়া ঠিক হইল। এতক্ষণ আমরা তাম্বুতে বসিয়া থাকিয়া কি করিব বলিয়া নিকটে আর কোন কিছু দ্রষ্টব্য আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে কিছুদূরে বন্নুয়া কালী, পাগলা কালী ও ধর্ম্মপাল মূর্ত্তি আছে। আমরা উৎসাহ সহকারে সেই সকল দেখিতে চলিলাম। মন্দিরের কিছু নিম্নে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত মাঠ। বারমাস এই স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝাউ বৃক্ষটিও কণ্টক গুল্মে আচ্ছন্ন থাকে। মেলার কিছু দিন পূর্ব্বে পরিশ্রমী দরিদ্র ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া এই সকল বৃক্ষ গুল্মাদি কাটিয়া শুষ্ক করতঃ আটি বাঁধিয়া রাখে। মেলায় সমাগত দোকানদার ও যাত্রিবর্গ রন্ধনার্থ এই সকল কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া লয়। তাহাতে এইসকল লোকের বিলক্ষণ লাভ হয়। এবং স্থানটিও পরিষ্কৃত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্য জন্তুর উপদ্রব হইতে যাত্রীদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে।

সেই সকল কর্ত্তিত বৃক্ষের মূল ও ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত কণ্টকসকল আমাদের

নগ্ন পদে বিদ্ধ হইয়া কষ্ট দায়ক হইলেও মুক্ত প্রান্তরের বিশুদ্ধ বায়ুতে প্রাণে অপূর্ব্ব সঞ্জীবতা প্রদান করিতেছিল। প্রায় এক পোয়া পথ অতিক্রম করিয়া আমরা মনুষ্যাবাসের চিহ্ন স্বরূপ সদ্য কর্ষিত ভূমি ও আম্রপনসাদী ফলবান্ বৃক্ষসমূহ দেখিতে পাইলাম। তাহার অল্প দূরেই একটী বৃহৎ বাঁশ ঝাড় অতিক্রম করিয়া একটি তৃণাচ্ছাদিত বাটিতে উপস্থিত হইলাম। বাটির প্রাঙ্গণে একটী কূপ কয়েকটি রক্তজবা ও করবী প্রভৃতি বৃক্ষ এবং একটি বৃহৎ বংশ দণ্ডে লোহিত বর্ণের পতাকা উড্ডীয়মান। ইহাই বমুয়া কালীর মন্দির। অধিকারী বা সেবাইত সেখানে সপরিবারে বাস করেন। অধিকারীপত্নী তৎকালে উদুখলে চাউল কুটিতে নিযুক্ত ছিল। আমাদের দেখিয়া আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করায় আমরা দেবী দর্শনের অভিপ্রায় জানাইলাম। সে তখন কার্য্য বন্ধ করিয়া ব্যস্ততা সহকারে এক গাছি সম্মার্জ্জনী হস্তে পার্শ্বস্থ কুটিরে প্রবেশ করিল, আমরাও তদনুবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম সেই কুটিরেই মৃণ্ময় কালিকা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা। এক পার্শ্বে একটি রুধিররঞ্জিত যূপ কাষ্ঠ ও খড়্গ, অন্য পার্শ্বে একটি কাষ্ঠময় দীপাধার। অন্য কোন পূজার সরঞ্জাম সে গৃহে নাই। পূজা অর্চ্চনা দূরে থাকুক বোধ হয় একপক্ষ কাল সে গৃহে মনুষ্যের পদার্পণ ঘটে নাই। সম্মার্জ্জনী দ্বারা আবর্জ্জনা রাশি পরিষ্কার করিতে করিতে অধিকারী পত্নী কৈফিয়ৎ দিল যে তাহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় সুতরাং প্রত্যহ পূজা অর্চ্চনা করিতে অসমর্থ। গোটা কতক পুষ্প ও চন্দন দিয়া নিত্য পূজা করিতে আপত্তি কি জিজ্ঞাসা করায় সে দন্তে জিহ্বা কাটিয়া বলিল "রক্ত না হলে কি কালীর পূজা হয়, যে দিন কেহ পাঁঠা বা পারাবত দিয়া মানসিক পূজা দেয় সেইদিনই পূজা হয়। তাহা ছাড়া অধিকারীকে চাষ বাস করিতে হয় অতএব সময় কই?"

সে স্থান হইতে দক্ষিণে পূর্ব্ব বর্ণিত পথে পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্মপাল ও পাগলা কালী দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম। এ স্থানটি একেবারে রাজ পথের ধারে। চতুর্দ্দিক খোলা, উপরে একটু টিনের আচ্ছাদন। এইখানে একটি প্রকাণ্ড পাষাণ বেদিকার উপর একটি ভগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তি তাহা তৈল ও সিন্দূরে এরূপ অনুলিপ্ত যে মূর্ত্তিটি যে কিরূপ তাহা বুঝিবার যো নাই। তাহার নিকটেই আর একটি ভগ্ন স্ত্রী দেবতার মূর্ত্তি, ইহা যে কোথায় ছিল, কি রূপেই বা এখানে এরূপ ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে তাহা কেহ বলিতে পারিল না। মূর্ত্তি গুলির উপর কিছু পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল ছিটান। প্রণামী পয়সা কুড়াইবার জন্য একটি লোক সেখানে বসিয়া আছে। প্রত্যাগমনকালে এবার রাজপথের উপর দিয়া আসা গেল, পথে পার্ব্বতী দেবী ও মহাকালের দুটি ক্ষুদ্র নূতন ও সুগঠিত মন্দির, ভিতরে মূর্ত্তিগুলি অভগ্ন এবং নিত্য পূজাদি হয়। পার্ব্বতীদেবীর নিকট অসংখ্য বলিদান পড়িয়াছে। নিকটেই বহু সংখ্যক বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী আখড়া করিয়াছে, তাহারা খোল ও করতাল সহযোগে কীর্ত্তন

গাহিতেছে, শত শত নাগা সন্ন্যাসী ভস্ম-ভূষিত নগ্নদেহে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধূনি জ্বালাইয়া গঞ্জিকাধূমপানে নিরত। পথের নিম্নে একটি প্রশস্ত তৃণাচ্ছন্ন স্থানে কতক-গুলি মাতাল একত্র হইয়া অস্বাভাবিক বিকট চীৎকারে উল্লাস ব্যক্ত করিতেছে, গণিকারও শুভাগমন হইয়াছে। এইগুলি পুণ্যস্থানের কণ্টক স্বরূপ।

তাম্বুতে আসিয়া দেখা গেল তখনও কিছু বেলা আছে। দুই খানি শকটে আরোহণ করিয়া আমরা মেলা দেখিতে অগ্রসর হইলাম। মেলা স্থল মন্দির হইতে প্রায় দুই রশি দূরে পশ্চিম দিকে ধবলা নদীর অপর পারে। মন্দিরের নিকটে পথের দুই ধারে ছোট ছোট দোকান। তাহাতে কলার পেটো ছোট করিয়া কাটিয়া প্রত্যেক খানিতে একটি কলা কিছু আতপ তণ্ডুল দুই চারিটি পুষ্প, বিল্বপত্র আর এক খানি করিয়া বাতাসা সজ্জিত। ইহার মূল্য চারি পয়সা। আর কতকগুলি ছোট কাচের শিশিতে একটু করিয়া ঘোলা জল, শোনা গেল উহা নাকি গঙ্গাজল, মূল্য প্রত্যেকটির দুই আনা। দোকানে ক্রেতার হুড়াহুড়ি এবং পয়সার ছড়াছড়ি। কারণ অধিকাংশ লোকেই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া ঐ সোপকরণ নৈবেদ্য একখানি এবং গঙ্গাজল এক শিশি সংগ্রহ করিয়া দেবাদি-দেবের পূজা করিতে যাইতেছে। পশ্চাতের পুষ্করিণী দোকানদারকে গঙ্গাজল দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিতেছিল সন্দেহ নাই। নিকটেই তেলে ভাজা, ঘিয়ে ভাজা ধূলিধূসরিত, মক্ষিকা কর্তৃক অর্দ্ধ ভক্ষিত মিষ্টান্নের দোকান। এতদ্দেশীয় বালক বালিকাগণ সেই সমস্ত মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া পরমানন্দে উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করিতেছে। ইহার ফলে মেলার পর প্রায়ই প্রতিগ্রামে কলেরার প্রকোপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দোকানগুলি অতিক্রম করিলে সারবন্দী ভিক্ষুকের দল, অন্ধ খঞ্জ কুষ্ঠি প্রভৃতি, সম্মুখে ছিন্ন বস্ত্র পাতিয়া তার স্বরে চীৎকার করিয়া ভিক্ষা মাগিতেছে দেখা যায়। তাহার মধ্যে দুই একটি দেবমূর্ত্তিও পূর্ব্বোক্তরূপে কাপড় বিছাইয়া বসিয়া আছেন।

তদনন্তর নদীর নিকটবর্ত্তী বিস্তৃত তট ভূমিতে অসংখ্য গো ও মহিষ শকট। ভদ্র গৃহস্থ যাত্রীগণ প্রধানতঃ এইখানে আড্ডা করিয়াছেন কারণ এখানে নির্ম্মল জল পাওয়া যায়, আর এই যায়গাটি মেলা ও মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করাও সুবিধা, আবার মন্দির সন্নিকটে সন্ন্যাসী বৈষ্ণব ভিক্ষুক প্রভৃতির যে উৎপাত কোলাহল তাহা হইতেও অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কোন কোন লোক শকটের নিকট ২খানা বাঁশ পুতিয়া তাহার উপর শতরঞ্চ চাদর প্রভৃতি টাঙ্গাইয়া ছোট ছোট তাম্বুর আকারে আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে। গো মহিষ গুলি শকটের যুপদণ্ডে আবদ্ধ হইয়া অর্দ্ধ মুদিত নেত্রে বিচালি চর্ব্বণে নিযুক্ত।

নদীর অপর পারে প্রায় এক মাইল পথ যুড়িয়া বিপণিশ্রেণী। এক এক প্রকার দোকান একটি পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোনটির নাম সওদাগর পটি, (মনোহারীর

দোকান) কোনটির নাম জুতা পটি, এইরূপে কাপড় পটি, বাসন পটি, ঘোড়াহাটি, গরু হাটি, কুকুর হাটি ইত্যাদি। এই মেলায় প্রায় ২।৩ লক্ষ টাকার মাল আমদানি ও বিক্রয় হইয়া থাকে। গো মহিষাদির আড্ডা নদীর ধারে। পূর্ব্বে এই মেলায় হস্তি পর্য্যন্ত ক্রয় বিক্রয় হইত।

তাহার পর রাত্রিকালে পূজা করিতে যাওয়া হইল। এক্ষণে জনতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এমন আকার ধারণ করিয়াছে যে গাড়ি পালকি দূরে থাক মানুষের যাতায়াতও কষ্টসাধ্য। আমরা আত্মীয় পুরুষগণের বেষ্টনের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বহু আয়াসে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলাম। মন্দিরের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুইটি দ্বার। আমরা পশ্চিম দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলাম। দ্বার হইতে প্রায় ৮।১০ হাত নিম্নে ভূগর্ভে দেব মূর্ত্তি, এখানে এইরূপ নিয়মেই মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পাথরের অপ্রশস্ত সিঁড়ি গুলি সমস্ত দিন সিক্ত বস্ত্রে সমাগত ব্যক্তিবর্গের বস্ত্রচ্যুত জলে এবং পদচ্যুত কর্দ্দমে ভয়ানক পিচ্ছিল হইয়াছে। প্রতিপদে পদস্খলনের আশঙ্কা, অতি সাবধানে নিম্নে অবতরণ করিয়া দেখাগেল মন্দিরটি বেশ বৃহৎমেঝিয়া, শুভ্র মর্ম্মর নির্ম্মিত। ধূপ ধুনার গন্ধে আমোদিত ভিত্তি গাত্রে ছোট ছোট কুলঙ্গি, তাহাতে দেবমূর্ত্তি—তাহার পাদ দেশে ঘৃত প্রদীপ জ্বলিতেছে। মন্দিরের মধ্য স্থলে একটি কুণ্ড তাহার মধ্যে জল্পেশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত। মন্দিরের অর্দ্ধাংশ পুষ্প বিল্বপত্র কদলী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। উপরের গম্বুজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অগণ্য তারকা রাজি সমন্বিত নীলাকাশ দেবাদিদেবের মন্দিরের চন্দ্রাতপ স্বরূপ হইয়াছে। পূর্ব্ব দ্বারের সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত ষণ্ড বা নন্দিকেশ্বর! তাহার পার্শ্বে ভিত্তি গাত্রে মন্দিরের উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। এমন বিশাল মন্দির সমস্তই, প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। উপরের গম্বুজ চূড়া সহ ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হয়। চূড়াটি প্রায় আধমাইল দূরে পতিত হইয়াছিল এবং অদ্যাপি সেইখানে পড়িয়া আছে। চূড়ার নামানুসারে ঐ স্থানটির নাম হইয়াছে "চূড়া ভাণ্ডারণী।"

শোনা যায় প্রথমত কামরূপের বর্ম্মণরাজ বংশীয় জল্পেশ্বর নামে রাজা স্বীয় নামানুসারে এই মূর্ত্তি স্থাপন করেন। মহম্মদ শার কামরূপ আক্রমণের সময় তাঁহার সৈন্যগণ কর্তৃক এই মন্দির বিধ্বস্ত হয়। তাহার পর অনেক দিন এ রাজ্য নেপাল রাজের শাসনাধীন ছিল। নেপালীগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী—এই কারণে এই শিব-মন্দির অযত্নে মৃত্তিকা স্তূপে পরিণত ও ভীষণ অরণ্যে সমাবৃত হইয়া যায়। পরে কোচ বিহারের রাজ্যের বর্ত্তমান রাজ-বংশের দ্বিতীয় পুরুষ মহারাজ বিশ্ব সিংহ এ প্রদেশকে স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লন। তাঁহার অধস্তন চতুর্থ পুরুষ মহারাজ প্রাণনারায়ণ এই অরণ্যে মৃগয়া করিতে আসিয়া ঘটনা ক্রমে এই মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন। তিনি বিপুল অর্থ ব্যয়ে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করায় তাঁহার পুত্র মহারাজ মোদনারায়ণ

নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া পিতার ইচ্ছানুরূপ দেব সম্পত্তি দিয়া পূজা অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাহার পর দুই তিন বার রাজবিপ্লব সংঘটিত হয়। অবশেষে এ সম্পত্তি কিছুদিন হইল ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের হস্তে আসিয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট উহার বিলি ব্যবস্থা করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা বর্ষে বর্ষে পূজারী-গণকে দিয়া আসিতেছেন। তাহাতেই পূজারীদিগের বৃত্তি ও পূজার্চ্চনা মন্দিরের আবশ্যক মত সংস্কারাদি একরূপ নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে এই আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইহাকে পূর্ব্বাবয়ব দেওয়া এক্ষণে দুরাশা মাত্র, কিন্তু মন্দিরের ছাদটি পুনর্নির্ম্মাণ ও আরও কতকগুলি অত্যাবশ্যক মেরামত কার্য্য সম্পন্ন হইলে এখনো কিছু-দিন দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহা পূর্ব্ব গৌরবের কিছু নিদর্শন দিতে পারে। কিন্তু এই কার্য্যের জন্যও অন্যূন ১৫ হাজার টাকা আবশ্যক। জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বৈকুণ্ঠ পুরের রাজবংশধর কুমার জগদিন্দ্রনারায়ণ রায় সাহেব এ বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীমতী অনুজা ঘোষ।

প্যারিসের পুলিস

প্যারিসের পুলিস বিভাগ বিদেশীর নিকট বড়ই রহস্যময়। সেখানে ভীষণ পাপের মূর্ত্তি—দুর্বৃত্তের সংখ্যা যেমন অধিক পুলিসের কার্য্যদক্ষতাও তেমনি প্রশংসনীয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের বৃহৎ প্রদর্শনীর সময় হইতে পুলিসবিভাগে একটি নূতন দল সংযুক্ত হইয়াছে। সন্তরণপটু পুলিস কর্ম্মচারী লইয়া দলটি সংগঠিত। তাহারা প্যারিসের নিকট সীন নদীর উপকূলে সতর্কভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। স্বেচ্ছায় দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ বা অন্য কোন কারণে জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করাই তাহাদের কর্ত্তব্য। মেলাদর্শনে দেশ বিদেশ হইতে আগত লোক সমাগমে অনেকের জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা; দুর্ঘটনা ঘটিবার, পাপকার্য্য অধিক পরিমাণে সাধিত হইবারও সময় ইহাই। ফরাসী দুর্বৃত্তেরা হতভাগ্য ব্যক্তিগণকে খুন করিয়া বা তাহা-দের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অধিকাংশ-স্থলেই তাহাদিগকে মৃত বা জীবন্ত অবস্থায় নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। সেই জন্যই প্রদর্শনীর সময় পুলিস বিভাগের এই নূতন দল গঠিত হইয়াছিল।

নগরের প্রধান পুলিস কর্ম্মচারী মেঁসো লেপাইন একজন বুদ্ধিমান লোক ছিলেন; তিনি অনেক নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার শাসনগুণে দুর্বৃত্তদিগের বড় সুবিধা হইত না। তিনিই সাইকেলা-রোহী পুলিস-দলের স্রষ্টা, এবং জলমগ্ন ব্যক্তির প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এই নূতন

দল গঠিত করেন। ইহারা নদীকূলস্থিল বাণিজ্যদ্রব্যসমূহও চোরের উপদ্রব হইতে রক্ষা করে। এই বিষয়ে ইংলণ্ডের "Thames Police" বিভাগের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

এই দল গঠিত হইবার পর হইতেই ইহার কর্ম্মচারীরা তাহাদের কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়া আসিতেছে। কত হতভাগ্য লোক প্রাণধারণে বীতরাগ হইয়া চিরশান্তি-লাভের আশায় স্রোতস্বতীসলিলে ঝাঁপ দিয়াছে, দুর্ঘটনাবশতঃ কত লোক জলে ডুবিয়া গিয়াছে, দুর্বৃত্তেরা কত আহত লোককে জলে ভাসাইয়া দিয়াছে, এই দলের কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য হাসিমুখে নিজেদের প্রাণ বিপদাপন্ন করিয়াছেন। এই সকল সাহসী লোকের কার্য্য-বিবরণী বিশেষ তালিকাভুক্ত হইয়া নদী-তীরস্থ আফিসঘরের প্রকাশ্য দেওয়ালে ঝুলান আছে। এই তালিকাপাঠে জানিতে পারা যায় যে, কত পুলিশ কর্ম্মচারী জলমগ্ন ব্যক্তিদের বাঁচাইতে গিয়া নিজেদের প্রাণ হারাইয়াছে।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি বেলী নামক একজন কর্ম্মচারী এই কার্য্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার মৃত্যুকাহিনী বড়ই করুণ। এই শোকসূচক ঘটনার পর হইতেই মেঁাসো লেপাইন একটি নূতন কৌশল উদ্ভাবন করেন। জলমগ্ন ব্যক্তিকে বাঁচাইবার জন্য তিনি একটি কুকুরের দল গঠিত করিয়া এই পুলিসবিভাগের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেন। প্রথম দুটি "নিউফাউন্ল্যাণ্ড" কুকুর লইয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। কুকুর দুটির দাম চল্লিশ পাউণ্ড। ইহাদের নাম রাখা হইয়াছিল—টার্ক ও সিজার। তাহাদের গলায় পুলিসের পোষাক-স্বরূপ নিকেলের গলাবন্ধন পরাইয়া দেওয়া হইল। এবং বিশেষ যত্নের সহিত তাহারা পালিত হইতে লাগিল।

যে রক্ষকের উপর এই পুলিস ও কুকুরের ভার অর্পিত হইয়াছে, তাঁহার নাম মেঁাসো গিলেমিন। নদীতীরে তাঁহার একটি আফিসঘর আছে। বাড়ীর নিম্নতলায় ছোট ছোট ঘর আছে। সেখানে জলপুলিসের আড্ডা। ঘরের আসবাব পত্র সমূহ অতি সামান্য। ঘরের ভিতর এমন কোন আরাম স্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা নাই, যাহার দ্বারা প্রলোভিত হইয়া কর্ম্মচারীরা জলমগ্ন ব্যক্তির অনুসন্ধানে তীরভ্রমণ ত্যাগ করিয়া সেখানে বিশ্রাম লাভ করিতে আসিবে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই পুলিস দলে কুড়িজন লোক ছিল। প্রথম দুটি কুকুর লইয়া পরীক্ষা করাতে এত সন্তোষ-জনক ফল লাভ হইয়াছিল যে, ক্রমে তাহারা সংখ্যায় আটটি হইল। ইহাদের সংখ্যা পুলিস কর্ম্মচারীদের সংখ্যার সহিত এক হয়, কর্ত্তৃপক্ষগণের তাহাই ইচ্ছা। সেইজন্য প্রত্যেক পুলিস কর্ম্মচারীকে নিজের ব্যবহারের জন্য স্বতন্ত্র একটি কুকুর দেওয়া হইয়াছে। কুকুরগুলি সবই শাবক; কোনটিরও বয়স এখনও এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই। তাহাদের শিক্ষা লাভের এই প্রাথমিক অবস্থা; কিন্তু ইতি-মধ্যেই তাহাদের বুদ্ধি অদ্ভুত বিকাশ লাভ করিয়াছে। জ্ঞানার্জ্জনে তাহাদের বলবতী ইচ্ছা ও তীক্ষ্ণ মেধা এবং অভীষ্ট কার্য্য-

সম্পাদনে তৎপরতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। নচেৎ এই প্রবন্ধের চিত্রিত ছবিগুলি তোলা অসম্ভব হইত; কারণ কুকুরের ফ'টো-গ্রাফ তুলিতে আলোকচিত্রকরগণকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হয়।

কুকুরদিগকে নিয়মিতরূপে বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা দেওয়া হয়। কর্ম্মচারীরা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া ইহাদের শিক্ষা দেয়! ফলে দেখা গিয়াছে যে, ইহাদের একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। সেইজন্য পৃথক পৃথক শিক্ষা দেওয়া হয়।

সিজার ও টার্ক কুকুর দুটি কিনিবার কিছুদিন পরেই একটি কৃত্রিম মনুষ্যমূর্ত্তি গঠন করিবার আদেশ দেওয়া হইল। ইহার দ্বারা জলমগ্ন ব্যক্তিকে কি প্রকারে উদ্ধার করিতে হইবে তাহাই কুকুরদের শিখান হইবে। এই গঠিত মূর্ত্তিই মেঁাসো ম্যানিকুইন! তাহার মূর্ত্তি ও খর্ব্বাকৃতি সত্ত্বেও তাহাকে দেখিতে জীবন্ত মনুষ্যমূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়। এক জন কর্ম্মচারী তাহাকে আফিসঘর হইতে নদীতীরে ধরিয়া লইয়া গিয়া জলে ফেলিয়া দিল। দুটি কুকুরই ইহাকে সত্য মনুষ্য বলিয়া মনে করিল।

দুটি কুকুরই তাহাদের কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য উৎসুক হইল। তাহাদের উপর যে কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহারা যে সে কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত তাহারা তাহাই দেখাইতে চায়। মেঁাসো লেপাইনের আদেশমত সিজার জলমগ্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে জলে ঝাঁপ দিল। মেঁাসো ম্যানিকুইন তখন স্রোতে ধীরভাবে গা ভাসাইয়া দিল। সিজার এই অদ্ভুত মূর্ত্তিটি নিরাপদে তীরের উপর তুলিল। টার্ককে যে তাহার কার্য্যদক্ষতা দেখাইতে দেওয়া হইল না, সেইজন্য সে ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। এবং ভবিষ্যতে তাহাকে এই কার্য্য করিবার সুবিধা দেওয়া হইবে না, এই ভয়ে সেও সিজারের সহিত জলমগ্ন ব্যক্তির জামাকাপড় কামড়াইতে লাগিল। এই কার্য্যে তাহাদের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া দর্শকগণ ভীত হইলেন পাছে তাহারা মেঁাসোকে কামড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে।

এই ব্যাপার দেখিয়া মোসো লেপাইন বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। কুকুরদের মনের ভিতরও যে লোকের প্রাণ রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি এরূপ আশ্চর্য্য বিকাশ লাভ করিয়াছে, এবং রীতিমত সুশিক্ষার সাহায্যে এই বিকাশ যে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিবে এ বিষয়ে তাঁহার অনুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এইরূপ প্রাণরক্ষাকারী কুকুরের দল গঠন করিতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

একদিন সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এই কুকুরের দলের অভিনয়-পাল্লা দেওয়া হইয়াছিল। এই উপলক্ষে যে কুকুরটি তাহার কার্য্যদক্ষতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিল, তাহার নাম সুলতান। ইহা একটি ধীরস্বভাব বুদ্ধিমান নিউফাউল্যাণ্ড কুকুর। ইহার শিক্ষার ভার "দুবয়" নামক একজন নিপুণ জলপুলিসের উপর ন্যস্ত ছিল। এই সঙ্গে সুলতান ও তদুদ্ধৃত মোসো ম্যানিকুইনের ছবি দেওয়া হইল।

সুলতান

কি রকম করিয়া জলমগ্ন ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করিতে হয়, সুলতান তাহা অতী সরলভাবে দেখাইয়া দিল। মোসো মানি- কুইনকে জলে নিক্ষেপ করিবার পরই সুল-তান নদীতে ঝাঁপ দিল এবং দ্রুত সাঁতার দিয়া জলমগ্ন মূর্ত্তির নিকট অগ্রসর হইল। পরে দৃঢ় অথচ ধীরভাবে ইহার জামা ধরিয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তীরে পৌঁছিলে পুলিসকর্ম্মচারীরা তাহাকে উপরে টানিয়া তুলিল।

কুকুরের শিক্ষার জন্য কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম রচিত হইয়াছে। রক্ষকেরা কুকুরদের বশীভূত করিবার সময় যে কথাবার্ত্তা কহে, তাহাও সংখ্যাবদ্ধ। জন্তুদের আদেশ করিবার সময় তাহারা কতকগুলি বাছা বাছা কথা ভিন্ন অপর কিছু বলিতে পায় না। কুকুরদিগকে প্রহার করা একেবারেই নিয়মবিরুদ্ধ। তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার অত্যাবশ্যক। আদেশ পালনের সময় তাহাদিগকে ভয় দেখান বা কোনরকম জোর জবরদস্তি করিতে নাই। তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাদের বাধ্য করিতে হয়। বশ করিবার সময় কোনপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের প্রলোভন দেখান একেবারে নিষিদ্ধ।

প্রত্যেক কুকুর কিনিতে কুড়ি পাউণ্ড খরচা হইয়াছে। তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। শীতের দিনে, নদীর জল একটু বেশী ঠাণ্ডা হইলে, সেদিন তাহাদের কার্য্যাভ্যাস বন্ধ থাকে। এবং তাহাদিগকে বিনা প্রয়োজনে নদী-

সুলতান জলমগ্ন মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে
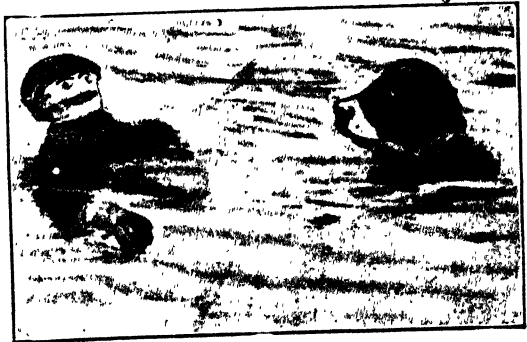
তীরে পাঠান হয় না। কোন কুকুর জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিলে, তখনই তাহাকে আফিসঘরে লইয়া যাওয়া হয়। এবং তাহার গা মুছাইয়া সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া দেওয়া হয়।

কর্ম্মচারীদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা যেন অপর লোককে আক্রমণ করিতে কুকুরদের উৎসাহ না দেয়। কারণ এই কুকুরেরা কেবল যে জলমগ্নব্যক্তিকে উদ্ধার করে তাহা নহে; ইহারা রাত্রেও অন্ধকারের মধ্যে তাহাদের প্রভুদের সহিত নদীতীরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

পুলিস কর্ম্মচারীদের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। জাহাজ হইতে মাল নামাইয়া নদীতীরে জমা রাখা হয়। মালের দাম হয়ত হাজার হাজার পাউণ্ড। ইহার লোভে অনেক চোর রাত্রিকালে চুরি করিতে আসে। জলপুলিসদিগকে দিনরাত্রি তাহা চৌকি দিতে হয়। সেই সময় চোর ও পুলিসদের মধ্যে সময় সময় মারামারিও হইয়া যায়। পুলিসের লোকেরা সশস্ত্র থাকিলেও অনেকে নিহত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকারীরাও নিরুদ্দেশ হইয়া যায়।

কুকুরদের সাহায্য এই উপদ্রব নিবারণের উপায়স্বরূপ; কারণ তাহারা দুর্বৃত্তদের সন্ধান করিয়া চীৎকার পূর্ব্বক প্রভুদের সংবাদ দান করিতে পারে। কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইহারা চোরদের আক্রমণ করে না। আদেশ পাইলেই তবে তাহারা নিজেদের ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় দিয়া থাকে।

ইহাদের পালনের খরচও নেহাৎ কম নয়। হৃষ্ট-পুষ্ট নিউফাউল্যাণ্ড কুকুরের ক্ষুধা বড় বেশী। তাহাদের খাদ্যের জন্য দিনে সাত পেন্স করিয়া খরচ হয়। ঋতু অনুসারে তাহাদিগকে ঠাণ্ডা বা গরম খাদ্য দেওয়া হয়। কার্য্যের অবসরে তাহারা আফিসঘরের পার্শ্ব সংলগ্ন একটি বড় বাড়ীতে বিশ্রাম করে। ইহাই তাহাদের বাসস্থান। প্রত্যেকের শয়নঘর পৃথক। তাহাদের প্রতি বিশেষ যত্ন লওয়া হয়।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক ভারত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কোম্পানীর ভারত শাসন

তিনটি ধাপ।

ক্লাইভের আমলে প্রতিনিধি শাসনতন্ত্র (Protectorate)। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ বঙ্গদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য পুনরাগমন করিলেন; তখন মান্দ্রাজ ও বোম্বায়ের প্রাধান্য বঙ্গদেশের নীচে ছিল। ক্লাইভ মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বঙ্গদেশের দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত

হইলেন। নবাব নিজামৎ আপন হস্তে রাখিলেন, শাসনকার্য্য ও বিচারের ভার গ্রহণ করিলেন। নবাবের কর্ম্মচারীরা তখনও রাজস্ব আদায় করিতে লাগিল, কিন্তু আদায় করিয়া ইংরাজের হস্তে উহা ন্যস্ত করিত। নবাবের দরবার ও শাসন-কার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ইংরাজ নবাবকে ৪২০,০০০ পৌণ্ড দিত। এই প্রতিনিধিত্বের ফলে কোম্পানী একটা রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি হইয়া দাঁড়াইল। ক্লাইভের ইচ্ছা ছিল,—কোম্পানী বণিক না হইয়া রাজ্যের অধিনেতা হইয়া উঠে। তাই তিনি কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিলেন এবং তাহাদিগকে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলেন। নূতন দেশ জয় করিবার চেষ্টা না করিয়া ক্লাইভ প্রদেশ ও রাজ্যাদি কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করাইয়া অথবা কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করাইয়া উত্তরপূর্ব্বাঞ্চলে কোম্পানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অযোধ্যা ও আলাহাবাদ এইরূপে হস্তগত হয়।

*
* *

প্রথম "গভর্ণর জেনেরাল" Warren Hastings-এর আমলে, ইংরাজ আধিপত্যের দ্বিতীয় ধাপ। তিনি প্রতিনিধি শাসনতন্ত্রের স্থলে সাক্ষাৎ-শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

মোটামুটিভাবে তাঁহার শাসননীতির মূলসূত্রগুলি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

ফোর্ট-উইলিয়ামে অর্থাৎ বঙ্গে, বোম্বায়ে ও মান্দ্রাজে তিন গভর্ণর। বঙ্গের গভর্ণর, গভর্ণর-জেনারাল এই নামে, দৌত্যকার্য্যে ও সামরিক কার্য্যে, উক্ত তিন বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। তাঁহার মন্ত্রিসভায় চারিজন সভাসদ্ ছিল। মতভেদ উপস্থিত হইলে, তাঁহারই মতের প্রাধান্য থাকিত। দুর্ভাগ্যক্রমে পার্লেমেণ্টের দ্বারা এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। ইহা হইতেই ক্রমাগত বিবাদ বিসম্বাদের সূত্রপাত হইত। অধিক সংখ্যার মত তাঁহার মতের বিরুদ্ধে হইলে, তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত অবৈধ উপায়ে তাহার প্রতিবিধান করিতেন।

বাঙ্গলার নবাবের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব বিনষ্ট হইল। তাঁহার অবসর-বৃত্তি কমাইয়া দেওয়া হইল। হেষ্টিংস্ নূতন কার্য্যনির্ব্বাহ প্রণালীর সৃষ্টি করিলেন। বঙ্গদেশ বিভিন্ন জিলায় বিভক্ত হইল। ইংরাজ-কলেক্টারেরা কর আদায় করিতে লাগিলেন। দেশীয় লোকেরা বিচার ও পুলিশের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

তার পর Hastings-এর রাষ্ট্র-নীতি। সম্রাট্ ও অধিকাংশ অধিপতিদিগের কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না। অবৈধ অধিকারের দাবী-গুলা, সম্রাট্ ও রাজাদিগের আদেশ-পত্রের বলে, বৈধতার একটা বাহ্য আকার ধারণ করিত। কিন্তু আর কিয়ৎবৎসরের মধ্যেই, ঐ সকল আদেশপত্রেরও মানমর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি অন্তর্হিত হইল। এখন, ভারতবর্ষের একজন প্রভু আবশ্যক—সেই প্রভু মারাট্টা-সংঘ হইবে, মহিশূরের সুলতান হইবে, না কোম্পানী হইবে? Warren Hastings বুঝিলেন,—কোম্পানী হয় সর্ব্বময় প্রভু হইবে, নয় কিছুই হইবে না। হেষ্টিংস্ ইচ্ছা করিলেন, কোম্পানীই সর্ব্বেসর্ব্বা হউক;—তাই মারাঠা

দিগের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ (১৭৭৮—৮১) ইংলণ্ডের ভাবী বিজয় ঘোষণা করিল।

*
* *

কর্ণওয়ালিসের আমলে ইংরাজ আধিপত্যের তৃতীয় ধাপ। (১৭৮৬—৯৩) Hastings প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্রের স্থলে সাক্ষাৎশাসন-তন্ত্র স্থাপন করিলেন। হেস্‌টিংস যে সকল প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেন, কর্ণওয়ালিস তাহাই বিধিবদ্ধ ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে বাঙ্গালার গভর্ণরের মত মন্ত্রিসভার অন্য সভাসদ্‌দিগের মতের উপর আধিপত্য করিবে, এইরূপ প্রচারিত হইল, এবং সমস্ত ভারতবর্ষে কোম্পানীর প্রতিনিধিস্বরূপ বাঙ্গালার গভর্ণরের কর্ত্তৃত্ব দৃঢ়ীকৃত হইল। বিচারের ভার দেশীয় লোকদিগের উপর ন্যস্ত হইল; প্রথমে কতকগুলি বিশেষ-মেজিষ্ট্রেট, আরও কিছুকাল পরে, কলেক্‌টর নিযুক্ত হইল। ইজারদারেরা, জমিদারেরা, প্রকৃত ভুস্বামী হইল। যে সকল চাষী সরকারের খাস প্রজা ছিল, তাহারা জমিদারের প্রজা হইল। রাজস্ব ও করস্বরূপ জমিদারেরা সরকারকে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সদর-খাজনা দিতে লাগিল। এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাজনার আয় বৃদ্ধি হইবে না, সরকার এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। এই চুক্তি বাঙ্গলায় "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" নামে খ্যাত।

*
* *

এই দ্বিতীয় যুগে, ভারতের উপর ইংলণ্ডের প্রভাব প্রকটিত হইতে আরম্ভ হয়—কিন্তু তাহা ভারতীয় ধরণে। ভারতে সফলতা লাভ করিবার জন্য কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ ভারতীয় রীতিনীতি অবলম্বন করিলেন;—সেই ষড়যন্ত্রের রুচি, সেই ধন লুব্ধতা তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইল। তথাপি এই বণিকেরা স্বকীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও দেশের অধিপতি হইয়া পড়িলেন, রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যশাসন করা তাঁহাদের আবশ্যক হইয়া পড়িল। তাঁহারা য়ুরোপীয় ধরণে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সাধারণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে শুধু কোম্পানীই একটা প্রণালী-বদ্ধ ও সব্যবস্থিত রাজশক্তি হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং তাঁহাদেরই জয় অবশ্যম্ভাবী হইল!

৩

তৃতীয় যুগ

তৃতীয় যুগে ইংলণ্ড সমস্ত ভারত জয় করিলেন এবং ভারতের উপর য়ুরোপীয় সভ্যতা চাপাইয়া দিলেন।

*
* *

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধে, য়ুরোপের ভিতরকার ভাবটা রূপান্তরিত হইয়াছিল। লাম্পট্যের স্থলে, রাজদরবারের শুষ্কতার স্থলে, অভিজাতবর্গের সন্দেহবাদের স্থলে, প্রথমে নিসর্গপ্রীতি ও রুসোর প্রচারিত ভাবুকতা, পরে বিপ্লবের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ, পরিশেষে ঔপন্যাসিকতা, ও মধ্যযুগের সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত বিশ্বাসাদি প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই সময়েই মহাপরাক্রান্ত ফ্রেডেরিকের যুদ্ধবিগ্রহ, নেপোলিয়নের রাষ্ট্র-

বিপ্লব, সমস্ত খণ্ড-রাজ্যদিগকে দিগ্‌বিজয়ের নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত করিল।

এই য়ুরোপীয় মর্ম্মভাবের অনুরূপ ইংলণ্ডের মর্ম্মভাব বিকাশ লাভ করিল। কিন্তু এই সকল য়ুরোপীয় ভাব য়ুরোপীয় মত ও বিশ্বাসগুলি ইংলণ্ডে একটু ইংরাজি ধরণ প্রাপ্ত হইল।

Wesleyan সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচার, ফরাসী বিপ্লবের দারুণ কাণ্ডের প্রতি একটা ভয়মিশ্র ঘৃণার ভাব, এবং ঔপন্যাসিক রুচি—এই সমস্ত কারণে ধর্ম্মশূন্যতার স্থানে গোঁড়ামী আসিল এবং নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যের স্থান, উচ্চকথার "মুখস্থ বুলী" (cant) আসিয়া অধিকার করিল। এই পরিবর্ত্তনটা বণিক ও রাষ্ট্রনৈতিক লোকদিগের উপর একটা শুভ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভাগ্যান্বেষীর পরিবর্ত্তে ইংলণ্ড, সৎচরিত্র সারবান কর্ম্মচারীদিগকে ভারতে পাঠাইতে লাগিলেন—যাহারা রাজ্য চালাইতে এবং লক্ষ লক্ষ লোককে বশীভূত করিতে সমর্থ।

পক্ষান্তরে, চতুর্দ্দশ লুইর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধবিগ্রহ, রাষ্ট্রবিপ্লব ও নেপোলিয়ন, এই সমস্ত—সামুদ্রিক আধিপত্য সুদৃঢ় করিবার জন্য এবং সমস্ত পৃথিবীময় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ইংলণ্ডকে প্রবৃত্ত করিল। আমেরিকার স্বাধীনতা হইতে ইংলণ্ডের এই শিক্ষা হইল যে, উপনিবেশগুলি সুশাসনের দাবী করে। নিজামের ও অন্যান্য মুসলমান অধিপতিদিগের দরবারে ফরাসী প্রতিনিধিগণের ষড়যন্ত্র এবং যে নেপোলিয়ন সেকান্দারের মত অভিযান আরম্ভ করিবেন বলিয়া কল্পনা করিতেন, সেই নেপোলিয়ানের কল্পনা ইংলণ্ডকে বরাবর সজাগ রাখিয়াছিল। তখন হইতেই, সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তিকে কি করিয়া দূরে অপসারিত করিবেন—ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতির তাহাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাই ইংলণ্ড ভূমধ্য সাগরে, জিব্রল্টার ও মল্টা স্থাপন করিলেন, এবং ইজিপ্টে, এসিয়া-মাইনরে, ইস্তাম্বুলে ইংলণ্ড হস্তক্ষেপ করিলেন। ইহা হইতেই প্রাচ্য সমস্যার উৎপত্তি; প্রশান্ত সমুদ্রে সেণ্ট-হেলেনা ও অন্তরীপ বিজয়।

ভারতযাত্রার যে দুই পথ সেই দুইটি পথের অধিকারী হইয়া ইংলণ্ড সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই বিজয় কার্য্যের ইতিহাসে দু'টি নাম বিশেষরূপে স্মরণীয়:—লর্ড ওয়েলেস্‌লি (১৭৯৭—১৮০৫) এবং লর্ড ড্যাল্‌হৌসি (১৮৪৮—১৮৫৬)।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি দেখিলেন, ভারতে তিন রাজশক্তি বিদ্যমান; একটি নামমাত্রসার,—মোগল সম্রাট; দুইটি প্রকৃত রাজশক্তি;—মারাঠা-সংঘ ও মহিশূরের মুসলমান রাজা। এই রাজ্য বিজিত হইল: তিপু সুলতান, কামান-গোলায়-ভগ্ন সেরিঙ্গাম দুর্গের রন্ধ্রমুখে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মারাঠা সংঘও পরাভূত হইল। মোগল-সম্রাট ও পেশোয়া কর্ত্তৃত্বহীন রাজ্যহীন রাজা হইয়া রহিলেন; তাঁহাদের শরীরের উপর, তাঁহাদের রাজধানীর উপর ইংরাজ সৈনিকের পাহারা বসিল। (১৭৯৮—১৮০৪)

লর্ড ওয়েলেস্‌লীর উত্তরবর্ত্তীরা যে যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন, ওয়েলেস্‌লীর কৃতকার্য্য দৃঢ়ীকৃত করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য

[illegible]। দুইটি প্রদেশ ইংরাজের অধিকার-ভুক্ত হইল:—আসাম (১৮২৬) ও সিন্ধুদেশ (১৮৪৩)। কিন্তু লর্ড ডালহৌসি শিখ সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া দিয়া, এবং পাঞ্জাব (১৮৪৯) দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ (১৮৫২), নাগপুর (১৮৫৩) ও অযোধ্যা (১৮৫৬) এই সকল প্রদেশকে অধিকারভুক্ত করিয়া ভারতবিজয় সম্পূর্ণ করিলেন। যে সকল রাজার রাজ্য স্বাধীন রহিল তাহারাও ইংরাজ-রাজ্যের দ্বারা বেষ্টিত হইল। ইহারাও কার্য্যতঃ কোম্পানীর অধীন হইয়া পড়িল।

*
* *

এই নূতন সাম্রাজ্যের জন্য শাসনকার্য্যের কতকগুলি নূতন মূলসূত্র আবশ্যক হইল।

ইংলণ্ড, স্বকীয় উপনিবেশ-রাজ্যের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে এবং যে বণিক-কোম্পানী ইংলণ্ডের জন্য একটা সাম্রাজ্য অর্জ্জন করিয়াছিল সেই কোম্পানীর তত্ত্বাবধান করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

Pitt, ১৭৮৪ হইতে ডিরেক্টারদিগের সভা হইতে পরিচালন কার্য্য উঠাইয়া লইয়া একটা তদারক-সভার উপর সেই ভার দিলেন। এই তদারক-সভা গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্য করিতে লাগিল। ইহার অনেকগুলি সভাসদ, রাজমন্ত্রী ছিলেন। এই সভার পঞ্চসভাসদের মধ্যে শীঘ্রই কেবল সভাপতি অবশিষ্ট রহিলেন। ডিরেক্টরগণ যে সকল বিধিব্যবস্থার প্রস্তাব করিতেন, সভাপতি তাহার অনুমোদন করিয়া বৈধ করিয়া দিতেন। কোন বিষয় খুব জরুরী হইলে তিনি ভারতের গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎভাবে পত্রব্যবহার করিতেন। ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন কাজ করিতে পারিত না।

পক্ষান্তরে, সমস্ত দেওয়ানী কর্ম্মচারী এমন কি গভর্ণর-জেনেরাল পর্য্যন্ত মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা ডিরেক্টদিগের ছিল। ইহা হইতেই যত ষড়যন্ত্র ও কলুষাচরণের উৎপত্তি। প্রত্যেক ডিরেক্টরের কতকগুলি কর্ম্মে লোক নিয়োগ করিবার ক্ষমতা ছিল। দেশীয় লোকের—এমন কি মুরব্বিহীন কোন ইংরাজেরও বড় কাজ পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ১৮১৩ ও ১৮৩৩ অব্দের দুই আইন অনুসারে কোম্পানীর বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু কোম্পানীর ভিতরের ভাবটা বণিক-সুলভ ভাবই রহিয়া গেল। আত্মীয়স্বজন ও অনুগত লোকদিগকে মোটা মোটা বেতন দিয়া কোম্পানী পূর্ব্বেকার লভ্যের অভাব পূরণ করিতে পারিল।

ইংলণ্ডে, কোম্পানী মন্ত্রিবর্গের উপদেশানুসারে কাজ করিতে লাগিলেন। ভারতে, মাদ্রাজ ও বোম্বায়ের গভর্ণর, বাঙ্গলার গভর্ণরের অধীন হইল। বাঙ্গলার গভর্ণরের নাম হইল, "ভারতের গভর্ণর জেনেরাল" (১৮৩৩ এর আইন)। এখনও গভর্ণর জেনেরাল বঙ্গবিভাগের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন কিন্তু শীঘ্রই কতকগুলি লেফটেনাণ্ট গভর্ণবের অধীনে এই বিভাগ কতকগুলি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত হইল। শাসন ক্ষমতার সহিত ব্যবস্থাপ্রণয়ণের ক্ষমতাও সংযুক্ত হইল। ১৮৩৩ অব্দ পর্য্যন্ত এই মন্ত্রিসভার সাহায্য সহকারে তিন গভর্ণরই এই অধিকার ভোগ করিতেন। কিন্তু এই

অধিকারটি তেমন সুনির্দ্দিষ্ট ছিল না। ১৮৩৩ অব্দের আইন অনুসারে বাঙ্গলার গভর্ণর ও তাঁহার মন্ত্রিসভা সমস্ত ভারতের উপর এই অধিকার পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইলেন, পক্ষান্তরে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বিভাগ স্বকীয় কর্ত্তৃত্ব হারাইল। (কেবল ১৮৬১ অব্দে এই বিভাগগুলি ব্যবস্থা প্রণয়ণের কর্ত্তৃত্ব আংশিকরূপে প্রাপ্ত হয়।) গভর্ণর জেনেরালের শাসন নির্ব্বাহক সভা ছাড়া একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভাও ছিল।

১৭৯৬ অব্দে সামরিক বন্দোবস্ত নূতন করিয়া গঠিত হয়। ইংলণ্ড রাজধানীর সংশ্লিষ্ট সৈন্য ছাড়া দুইটি সৈন্যমণ্ডলী ছিল। একটি য়ুরোপীয়, আর একটি দেশীয়। দেশীয় সৈন্যের উচ্চপদস্থ সেনানায়ক সমস্তই ইংরেজ। নিম্নশ্রেণীর সেনানায়ক দেশীয়। এই সৈন্য কোম্পানীর নিজস্ব সৈন্য; ডিরেক্টারেরা সকল পদেরই সেনানায়ক ও সৈন্যাধ্যক্ষকে মনোনীত করিতেন। সৈন্যসংখ্যা ক্রমাগতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১৮০৮ অব্দে, ১৫৪,৫০০ সৈন্য, তন্মধ্যে ২৪,৫০০ ইংরেজ এবং ১৩০,০০০ ভারতবর্ষীয়। ১৮৫৭ অব্দে, ২৩৩,০০০ ভারতবর্ষীয় এবং ৪৫,৩২২ ইংরেজ সৈন্য। (১)

*

* *

রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির হিসাবে কোম্পানীর কার্য্যপ্রণালীর উক্ত প্রকার মূলসূত্র ছিল। ১৭৭৪ হইতে ১৮৫৭ পর্য্যন্ত, এই সকল মূলসূত্র পরিপুষ্ট হইয়া উঠে—তবে অন্তর্নিহিত মূল-ভাবটির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু দেশীয় প্রজাদের সহিত কোম্পানীর সম্বন্ধ ও ব্যবহার, এই প্রকার মূলসূত্রের দ্বারা পরিচালিত হইত না।

কোম্পানীর রাষ্ট্রনীতি বুঝিতে হইলে, উঁহার বিভিন্ন প্রকারভেদের পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

ঊনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী-বিপ্লব হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলণ্ড অতি-উদারপন্থী হইয়া উঠেন। ভারতের স্বার্থের জন্যই ভারত শাসন করিতেছেন, এইরূপ প্রকাশ করিতেন।

ইহার জন্যই তিনটি সাধারণ নিয়ম ছিল,—প্রথম নিয়ম যথা;—যাহাতে ভারতবর্ষীয়েরা সহজভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে এবং তৎপ্রযুক্ত ইংরাজ শাসনের সুবিধা হৃদয়ঙ্গম করে। আর অভিযান নাই, যুদ্ধবিগ্রহ বিরল, যদি বা হয় স্বল্পস্থানে বদ্ধ, স্বল্পকালব্যাপী, এবং জনাধিকারের মূলসূত্রানুসারে পরিচালিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতার সময় যে সকল দস্যুদল গুম্ফিত হইয়াছিল, সে সকল দস্যুদল নির্ম্মূলিত হইল। প্রথমে পিণ্ডারী, তার পর ঠগের

(১) ডুপ্লের দেশীয় সৈন্যের আদর্শে ক্লাইভ মান্দ্রাজে ভারতীয় সৈন্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পরে বাঙ্গালায় সৈন্য গঠন করেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালার মুসলমান কৃষক শ্রেণী হইতে ও উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ হইতে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করেন। উপনায়কগুলি দেশীয় ছিল—যথা নায়ক (Sergent) জমাদার, সুবাদার, পুরাতন সুবাদার—(Subadar-Major)।

দল। প্রবল ও ন্যায়ানুগতশাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। (২)

দ্বিতীয় নিয়ম—ভারতবাসীদের সমস্ত প্রথার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানী মেথডিষ্ট খৃষ্টসম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে, যতই বর্ব্বর প্রথা হউক না কেন, কোম্পানী সে সমস্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। কোন বিধবা রমণী স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরিতে সম্মত আছে কি না, কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে প্রথমে তাহার তদন্ত করিতে হইত। যদি কোন বিধবা, স্বামীর চিতায় প্রবেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, তখন কোম্পানীর কর্ম্মচারীরাই ঐ অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করিত। কিন্তু আর একটি তৃতীয় নিয়ম ছিল—সেটি, কেবল ইংরেজের দ্বারাই ভারত শাসন করা। প্রধান প্রধান কাজের দায়িত্ব ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের উপর ছিল—দেশীয় লোকেরা অধস্তন পদে নিযুক্ত হইত। শুধু শাসনকার্য্য হইতে দেশীয়দিগকে বহিষ্কৃত করা নহে, তা ছাড়া সার্ব্বজনিক ব্যাপার হইতেও তাহাদের মনোযোগ অন্যদিকে ফিরাইয়া দেওয়া; তাহাদের শ্রেষ্ঠলোক একত্র হইয়া যাহাতে একটা দল গঠন করিতে না পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা; বুদ্ধিমান লোকেরা যদি ধনশালী হইবার চেষ্টা করে, তবে তাহাদের সেই চেষ্টায় বাধা দেওয়া।

কোম্পানীর এক কর্ম্মচারী এইরূপ কথা অসঙ্কোচে লিখিয়াছিল; যথা:—

"যাহার দ্বারা মনুষ্য প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হয়, সেই মনের উচ্চতা, সেই স্বাধীনতা, সেই চিন্তার গভীরতাকে দমন করা ভারতে সুবিধাজনক। এই সকল ভাব ও চিন্তা আমাদের শক্তির ও আমাদের স্বার্থের একান্ত বিরোধী...আমাদের সেনাপতির আবশ্যক নাই, রাজনৈতিকের আবশ্যক নাই, আমাদের আবশ্যক কেবল ভাল কৃষক। যদি আমরা সাহসী পুরুষ চাহি, উচ্চাভিলাষী পুরুষ চাহি, অক্লান্ত কর্ম্মী চাহি, মালাবার-প্রদেশে আমরা ঐ সব লোক এত অধিক পাইতে পারি যে তাহাদের দ্বারা সমস্ত ভারতের অভাব পূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু এই সকল লোক আমাদের পথের প্রতিবন্ধক হইবে—শুধু প্রতিবন্ধক নহে, সম্ভবত তাহা হইতে আরও খারাপ ফল হইবে। তাহাদের দ্বারা কিছুই ভাল হইতে পারিবে না। তাহারা যে কাজ সম্পন্ন করিবে, সেই পরিমাণে জনসমাজের কোন উপকার হইবে

(২) পিণ্ডারীর দলদিগকে মধ্যযুগের য়ুরোপের বড় বড় দলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই দলের মধ্যে সকল জাতীয় ও সকল ধর্ম্মের লোক ছিল। প্রধানতঃ জাঠ, আফ্গান, ও মারাঠা। মালোয়ার তাহাদের প্রধান আড্ডা ছিল, এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ১৫ বৎসর কাল ইহারা মধ্য-ভারতের প্রভু হইয়া পড়িয়াছিল। পিণ্ডারীদিগের প্রধান নেতা আমীর খাঁর একটি সুগঠিত সৈন্যমণ্ডলী ও কামান-সরঞ্জাম ছিল। ১৮১৭ অব্দে পিণ্ডারীদের বিরুদ্ধে Lord Hastings ১২০,০০০ সৈন্য সমবেত করিয়াছিলেন। Lord William Bentinck ঠগীদের দল বিনষ্ট করেন।

না। দায়ে পড়িয়া যাহাদিগকে পোষণ করিতে হইতেছে, ঐ সকল লোক যেন আমরা নূতন করিয়া সৃষ্টি না করি।" (৩)

* * *

১৮১৫ হইতে, ইংলণ্ডে একটা নূতন মনোভাব আবির্ভূত হইল। "টোরীরা" স্বয়ং ক্যাথলিকদের "স্বাধীনতা লাভের" প্রস্তাবে ভোট্ দিল। "হুয়িগ্‌রা" হৌস্ অফ্ লর্ডসে" "নির্ব্বাচন সংস্কারের" প্রস্তাব উপস্থাপন করে এবং এই নূতন নির্ব্বাচন-প্রণালী অনুসারে যে প্রথম নির্ব্বাচিত সভার অধিবেশন হইল, তাহাতে যে সকল মতের প্রবণতা প্রকাশ পাইল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সভাসমূহে অপরিজ্ঞাত ছিল। তাছাড়া সেই যুগে দার্শনিকেরা সকল মানবজাতির মধ্যে সাম্য-নীতি বিস্তারের উপদেশ দিতেছিলেন। সেই সময়ে Wilberforce ইংরাজ উপনিবেশগুলির মধ্যে দাসত্ব উঠাইয়া দিবার পক্ষে সাহায্য করিয়া, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে অন্তর-র্জাতীয় সম্মতি লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতেও এই ভাবটি প্রকটিত হইয়াছিল। যে আইনের পাণ্ডুলিপিতে কোম্পানীর অধিকারপত্র আবার নবীকৃত হয়, সেই ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের আইনের পাণ্ডুলিপির এক অংশে এইরূপ পরিলিখিত হয় যে, ভারতের লোক বা অধিবাসী মহারাণীর যে কোন প্রজা, কি ধর্ম্ম ঘটিত, কি জাতি ঘটিত, কি বর্ণ ঘটিত কোন কারণে সরকারের অধীনে কোন সরকারি পদে নিযুক্ত হইতে অসমর্থ বিবেচিত হইবে না। মেকলে সাহেব এই প্রস্তাবটি আরও পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"এই পাণ্ডুলিপির কতিপয় অংশ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ধর্ম্মঘটিত, জাতিঘটিত বা বর্ণঘটিত কারণে আমাদের কোন ভারতীয়প্রজা কোন সরকারী কাজকর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইবে না—এই প্রস্তাবটি যে, বিজ্ঞতা হইতে, উচ্চভাব হইতে, সাধু ইচ্ছা হইতে প্রসূত হইয়াছে তাহা বিলক্ষণরূপে উপলব্ধি হয়। অহংনিষ্ঠ ও সংকীর্ণমনা ব্যক্তিগণ আমাকে তত্ত্ববাগীশ বলিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু এই সকল উপহাস সত্ত্বেও আমি এই কথা বলিব,—আমি যে এই পাণ্ডুলিপির ঐ অংশের লেখায় সাহায্য করিয়াছি তজ্জন্য আমি আমার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করিব।.......ভারতবাসীদিগকে ভাল করিয়া বশে রাখিবার জন্য আমরা কি তাহা-দিগকে অজ্ঞ করিয়া রাখিব? অথবা ইহা কি সম্ভব বলিয়া কল্পনাও করিতে পারি, যে আমরা তাহা-দিগকে জ্ঞানশিক্ষা দিব অথচ তাহাদের কোন উচ্চা-ভিলাষ উদ্বোধিত হইবে না? কিংবা আমরা তাহাদিগের উচ্চাভিলাষ উদ্বোধিত করিব, অথচ আমরা তাহা বৈধ-রূপে পূর্ণ করিব না?......আমাদের বর্ত্তমান প্রণালীর প্রভাবে, ভারতে একটা সার্ব্বজনিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরিপুষ্ট হইতে পারে,—এমন কি এতদূর পরিপুষ্ট হইতে পারে যে উহা বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীকেও অতিক্রম করিতে পারে। সম্ভবতঃ আমাদের শাসনপ্রণালী এত উৎকৃষ্ট যে উহা আমাদের প্রজাদিগকে আরও এক উৎকৃষ্টতর শাসনপ্রণালীর যোগ্য করিয়া তুলিবে। য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানে সুশিক্ষিত হইয়া ভারতবাসীরা বোধ হয় ভবিষ্যতে য়ুরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দাবী করিবেন।

এমন দিন কি আসিবে?—আমি তাহা জানি না। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই এমন দিনের আবির্ভাব কে৷

(৩) Wiiliam Thackeray—মান্দ্রাজ বিভাগের কর্ম্মচারী Report Select Committee East India Commission.

ক্রমেই নিবারণ করিব না, কিংবা এমন কিছু করিব না যাহাতে করিয়া উহা পিছাইয়া পড়ে। যে সময়েই এই দিনের আবির্ভাব হউক না কেন, এই দিন ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটা পরম গৌরবের দিন। যে বৃহৎ জাতি দাসত্বের ও কুসংস্কারের নিম্নতম সোপানে নিপতিত হইয়াছিল, আমাদের সুশাসনে তাহারা পৌরজনের সমস্ত অধিকার লাভ করিল ইহা কি আমাদের কম গৌরবের কথা। আমাদের হস্ত হইতে রাজদণ্ড বিচ্যুত হইতে পারে, অভাবনীয় দৈবঘটনায় আমাদের গভীর রাষ্ট্রনৈতিক অভিসন্ধি গুলি ব্যর্থ হইতে পারে, বিজয়লক্ষ্মী আমাদের প্রতি বিমুখ হইতে পারেন. কিন্তু এমন কতকগুলি জয়ের কাজ আছে যাহা সর্ব্বপ্রকার বিপর্য্যয়ের অতীত। এই সকল জয়লাভ বর্ব্বরতার উপর শান্তিময় জয়লাভ। এই সাম্রাজ্য, আমাদের সাহিত্যের, আমাদের শিল্পকলার, আমাদের ধর্ম্মনীতির, এবং আমাদের বিধিব্যবস্থার অবিনশ্বর সাম্রাজ্য"।

১৮৩৩ অব্দের আইনের গূঢ় মর্ম্ম শুধু ইহাই ছিল না যে, কোম্পানীর অধীনে দেশীয় লোকেরা শাসন কার্য্যের অন্তর্গত অধিক কাজ প্রাপ্ত হইবে এবং উচ্চতর পদে নিযুক্ত হইবে, পরন্তু আর দুইটি পরিণাম ইহার অন্তর্নিহিত ছিল। যথা—বর্ব্বর ও অনিষ্টজনক প্রথা নিবারণ করিবার জন্য ইংরাজ-সরকার ভারতবাসীদিগের গার্হস্থ্য-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন; উহাদিগকে এইরূপ জ্ঞানশিক্ষা দান করিবেন যাহাতে করিয়া উহারা অঙ্গীকৃত কাজকর্ম্মের অধিকারী হইতে পারে। এইপ্রকার, উদারপন্থীদিগের শাসনপ্রণালী হইতে রক্ষণপন্থীদিগের শাসন প্রণালীর মূলগত প্রভেদ পরিলক্ষিত হইল। কোন এক ভিন্ন জাতিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য,—তাঁহারা আপনাদিগের অনভিমত প্রদর্শন করিতে এবং সেই জাতি যে সকল কুপ্রথার প্রতি দৃঢ়রূপে আসক্ত সেই সকল প্রথাকে উন্মূলিত করিতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না।

এই শাসনপ্রণালী—এই ফরাসীবিপ্লবের শাসন প্রণালী—যে সব জাতির সভ্যতা তেমন পরিপুষ্ট হয় নাই সেই সব জাতির সর্ব্বনাশ করে। যে সকল জাতি অপেক্ষাকৃত সুসভ্য, এই শাসনপ্রণালী তাহাদের মধ্যেও সাবধানেও বিশেষ বিবেচনা সহকারে প্রবর্ত্তিত করিতে হয়; কেননা মানব-সভ্যতা একরূপ নহে এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশও একরূপ নহে। প্রত্যেক জাতির দেশ, আবহাওয়া, ঐতিহাসিক ঘটনা, তাছাড়া সম্ভবতঃ কতক গুলি স্বাভাবিক গুণ, সেই জাতির সভ্যতাকে একটা বিশেষত্ব প্রদান করে।

১৮২৯ অব্দের রাজবিধি একটা নূতন রাষ্ট্রনীতি উদ্ঘাটিত করিল। এই রাজবিধি অনুসারে বিধবার সহমরণ নিষিদ্ধ হইল। এক বঙ্গদেশেই প্রতিবৎসর ৬০০ হইতে ৮০০ বিধবা সহমৃতা হইত। যাই হউক, এই আইন জারি হওয়ায় কোন বিদ্রোহ হয় নাই এবং রাজাদের মধ্যেও অল্পলোকই এই আইন লঙ্ঘন করিতে সাহস পাইত। (৪) অন্যান্য পরোয়ানায় দ্বারা নরহত্যা,

(৪) এক পত্রে Lady Amherst এইরূপ লিখিয়াছিলেন (১৮২৫):—

ওলাওঠা রোগে এক যুবকের মৃত্যু হয়, তাহার বিধবা সহমরণের সংকল্প করিল। সহমরণের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন হইল, মেজিষ্ট্রেটেরও হুকুম লওয়া হইল। নিকটতম আত্মীয়েরা চিতায় অগ্নি স্থাপন করিল, কিন্তু যখন অগ্নিশিখা ঐ রমণীর গাত্র স্পর্শ করিল, তখন তাহার সাহস চলিয়া গেল। চিতার ধূমে প্রচ্ছন্ন হইয়া, জনতার কোলাহল ও ঢাক ঢোলের কর্ণবধিরকারী শব্দের মধ্যে, সে কোন প্রকারে

ধর্ম্মঘটিত আত্মহত্যা এবং অতিরাত্র আত্মনিগ্রহ নিষিদ্ধ হইল।

১৮৪৫ অব্দের আইনে সর্ব্বপ্রকার দাসত্ব প্রথা রহিত হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সরিয়া চিতার তলদেশে যাইতে সমর্থ হইয়াছিল। এবং সেখান হইতে সে নিকটস্থ কোন জঙ্গলে পলায়ন করে। প্রথমে তাহার পলায়নের কথা কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু যখন ধোঁয়া কমিয়া গেল, তখন লোকেরা দেখিল, সে চিতার উপরে নাই। তখন তাহারা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, জঙ্গলের মধ্যে সবেগে প্রবেশ করিয়া, বিধবা বেচারীকে দেখিতে পাইল। তাহাকে টানিয়া নদীর ধারে লইয়া গেল এবং সেখানে একটা নৌকায় উঠাইয়া, নদীর মাঝখানে লইয়া গিয়া, তাহাকে নৌকার উপর হইতে জলে ফেলিয়া দিল। সে জলমগ্ন হইল। আর উঠিল না।" (Life of Lord Amherst—(by Thackeray Ritchie and Richardson Evans)

Lord William Bentinck সহমরণের প্রথা নিবারণের হেতু নির্দ্দেশ করিয়া যে মন্তব্য লিপি (১৮২৯) লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমরা সহমরণ হইতে দিই বা রহিত করি,—এই মীমাংসার উপর একটা গুরুতর দায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। প্রতি বৎসর শত শত দুর্ভাগ্য রমণীর নিষ্ঠুর ও অকাল মৃত্যু আমাদিগকে অনুমোদন করিতে হইতেছে অথচ উহা নিবারণ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত—একথা ভাবিলে কাহারও অন্তঃকরণ ভীতিবিহ্বল না হইয়া থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে আবহমানকাল পর্য্যন্ত যে মত চলিয়া আসিতেছে তাহারও মর্য্যাদা রক্ষা করা আবশ্যক, সে মতটি এই যে,—এতদিন যে প্রথা অবাধে চলিয়া আসিতেছে তাহা যদি রহিত করা যায়, তাহা হইলে ভারতের ইংরাজ-সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে, লক্ষ লক্ষ লোকের যে উন্নতি আমরা আশা করিতেছি সে সমস্ত আশার উচ্ছেদ হইবে; কেননা, আমাদের আধিপত্য রক্ষা করিতে পারিলে তবেই আমরা এই সকল আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিব।

তাহার পর Lord W. Bentinck তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মতামত সমালোচনা করিয়াছেন, যে সকল কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিয়াছেন, তাহাদের মত ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং তাহার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন;—যে হেতু এই নিষ্ঠুর প্রথাটি প্রধানতঃ বঙ্গদেশে প্রচলিত, এবং যেহেতু বঙ্গদেশের অধিবাসীরা এত হীনবীর্য্য যে তাহাদের দ্বারা বিদ্রোহ অসম্ভব, অতএব ইহার দরুণ বিদ্রোহের কোন আশঙ্কা নাই। তাছাড়া যে সকল জিলায় রাজপুরুষেরা "সতী" নিবারণ করিয়াছেন, সেখানে কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

আর এক কথা, বাঙ্গলার সৈন্য নিছক্ উচ্চবর্ণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের অসন্তোষে, কোন ভয়ের কারণ নাই। Lord W. Bentinck অনেকগুলি রাজপুরুষের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন—তাঁহারা বিদ্রোহ আশঙ্কা করেন না।

উপসংহারে Lord W. Bentinck কতকগুলি উন্নত ও বিজ্ঞজনোচিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমি কেবল একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করিব :—

"আমার প্রধান উদ্দেশ্য হিন্দুদের হিতসাধন করা। বিশুদ্ধতর নীতি অবলম্বন না করিলে ভবিষ্যতে হিন্দুরা কখনই উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য, তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে সর্ব্বপ্রকার হত্যাকলুষিত নিষ্ঠুর প্রথাসকল উঠাইয়া দিতে হইবে...আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, হিন্দুদিগকে আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশে আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। এ উদ্দেশ্য আমার আদৌ নহে। আমি একজন হিন্দু ব্যবস্থাপকের ন্যায় লিখিতেছি, অনুভব করিতেছি এবং আমার সন্দেহ নাই, অনেক জ্ঞানালোকসম্পন্ন সুশিক্ষিত হিন্দু এ বিষয় আমারই মতন চিন্তা করেন ও অনুভব করেন।"

Lord W. Bentinck-এর দুইটি হেতু ছিল। অনেকগুলি জ্ঞানালোকসম্পন্ন শিক্ষিত হিন্দু একজন বড় লেখক রামমোহন রায়ের মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৮১৮ অব্দ হইতে রামমোহন রায় সতী প্রথা রহিত করিতে চাহিতেছিলেন। পক্ষান্তরে গভর্ণরজেনারালের ঘোষণাপত্র কোন বিদ্রোহের উদ্রেক করিল না। উচ্চবর্ণের বাঙ্গালীরা প্রিভি-কৌন্সেলে আপিল করিল। স্বয়ং রামমোহন রায় লর্ডদের সভায় সাক্ষ্য দিলেন। (১১ জুলাই, ১৮৩২)

মৃত্যু-স্বয়ম্বরা

(১)

পেস্তানজী পারসিক বৈশ্য। তাঁহার পরিবারের মধ্যে পত্নী এবং অর্দ্ধস্ফুটন্ত গোলাপটির মত এক কিশোরী কন্যা সিরিন। পারস্য দেশে এই সময় বিদ্রোহ উপস্থিত'। এক দল ফৌজ ক্যান্টন্‌মেণ্টে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে। ইহাদের নিকট পেস্তানজীর বেশ পসার হইতে লাগিল। পেস্তানজীর নিকট প্রত্যহ ভৈরবজী নামে এক যুবক আসিত। ইহার কোন বিশেষ কাজ কর্ম্ম ছিল না। সুতরাং সময় পাইলেই সে পেস্তানজীর দাওয়াইখানায় আসিয়া বসিয়া থাকিত, অনেক কাজ কর্ম্ম করিয়া দিত, কখনও বা বৃদ্ধের সহিত গল্প করিয়া সময় কাটাইত, সন্ধ্যার সময় পেস্তানজী যখন কাজ সমাপ্ত করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া যাইতেন, যুবক ভৈরবজী তখন ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিত। এইরূপে বৃদ্ধ ও যুবকের সম্বন্ধ ক্রমশঃ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল।

ভৈরবজীর প্রতি পেস্তানজী যত অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন, পেস্তানজীর গৃহিণী যুবকটিকে ততই বিরক্তিভরে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ভাবিলেন বোধ হয় তাঁহার স্বামী এই অজ্ঞাত-কুলশীল ভৈরবজীর হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। তিনি তাই তাড়াতাড়ি কন্যার জন্য পাত্র ঠিক করিয়া ফেলিলেন,—বরপক্ষীয়দিগের সহিত কথাবার্ত্তা একরকম পাকাপাকি হইয়া গেল। ছেলেটি আসিয়া শুধু মেয়েটিকে একবার দেখিবার মাত্র অপেক্ষা। কিন্তু আজ নয় কাল বলিয়া সে আসিতে ক্রমাগতই বিলম্ব করিতেছে কেন? অবশেষে একদিন পত্র আসিল—"বিবাহ ঠিক। কন্যাকে লইয়া অবিলম্বে তাঁহারা জামাতার গ্রামে যাত্রা করুন।"

পেস্তানজী এই পত্রে মনে মনে দুঃখিত হইলেন কিন্তু গৃহিণীর মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি কেবল ভৈরবজীকে মনে করিয়া একটি স্নেহাকুল সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

সন্ধ্যায় যখন ভৈরবজী গৃহাভিমুখী হইত, জানালার ধারে সে প্রায়ই সিরিনকে দণ্ডায়মান দেখিত। গোধূলির আলোক তাহার মুখে পড়িয়া তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অধিকতর মনোরম করিয়া তুলিত। ভৈরবজীর সহিত দৃষ্টি মিলিত হইবা মাত্র সিরিন গৃহাভ্যন্তরে ছুটিয়া পলাইত। যুবক রাজপথে দাঁড়াইয়া ভাবিত "আহা! কি সুন্দর।" সুপ্ত এক অভাব বেদনা তাহার অন্তরে জাগরিত হইয়া উঠিত।

এক দিবস অপরাহ্নে ভৈরবজী পেস্তানজীর দোকানে আসিয়া দেখিল, দোকানের জিনিষপত্রগুলি সরান হইতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পেস্তানজী বলিলেন, "ভৈরব, আমার মেয়ের বিয়ে। তাই আমরা জামাইএর গ্রামে যাচ্ছি, সেখান থেকে

মেয়ের বিয়ে দিয়ে আবার এখানে ফিরে আসব।" ভৈরবজী কিয়ৎক্ষণ বাক্‌শূন্য থাকিয়া পরে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কবে সেখানে যাবেন ?"

"এই আসচে কাল।"

"আমি কি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি ?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই !" বলিয়া বৃদ্ধ পেস্তানজী অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। চিরপ্রফুল্ল ভৈরবজীর মুখ, আজ অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখিয়া তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতেছিল। ভৈরবজী পথে আসিয়া দাঁড়াইল। অস্তগামী সূর্য্যের শেষরশ্মিপাতে আকাশ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। বসন্তের সান্ধ্যসমীরণ যুঁইফুলের গন্ধ বহন করিয়া আনিতেছিল। চতুর্দ্দিকে কেবল আনন্দোৎসব। আর যুবক ভৈরবজীর মনে কিসের এ ঝড় বহিয়াছে! কি যেন দেখিবার প্রত্যাশায় ভৈরবজী জানালার দিকে চাহিল, কিন্তু হায়! শূন্য জানালা তাহার দিকে কঠিন ভাবে তাকাইয়া রহিল। যুবক পথের এক-ধারে বসিয়া পুরানো কথা ভাবিতে লাগিল। মন মাতান ফুলের গন্ধে চারিদিক পরিপূরিত; দুই একটি তারা আকাশে ঝিকমিকি করিয়া উঠিল। অন্ধকারে যখন সব আচ্ছন্ন হইল, রাজপথে লোক চলাচল যখন থামিয়া গেল, ভৈরবজী বাড়ী ফিরিবার মানসে গাত্রোত্থান করিল।

(২)

আজ পেস্তানজী স্ত্রী-কন্যাদিসহ জামাতার গ্রামে যাইবেন। অতি প্রত্যুষে যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। পথে একটি ক্ষুদ্র নদী পার হইতে হয়। নদীটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও উহার জল অতিশয় চঞ্চল—তরঙ্গমুখে একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই। ভৈরবজীর উজ্জ্বল চক্ষু রুদ্ধ গাম্ভীর্য্যে যেন অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। পেস্তানজী-গৃহিনী ভৈরবজীকে দেখিবামাত্র চটিয়া উঠিলেন—মুখে কিছু বলিলেন না, কেবল ভ্রূভঙ্গি করিয়া রহিলেন। নৌকা প্রস্তুত ছিল। সকলে উঠিতেই নৌকা খুলিয়া দেওয়া হইল।

তখন সবে মাত্র পূর্ব্বগগনে সূর্য্যের উদয় হইতেছিল। বিচিত্র গন্ধে বাতাস সুবাসিত। অনুকূল বায়ু পাইয়া নৌকাটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। প্রাতঃকালীন সূর্য্যরশ্মি নদীজলে পতিত হইয়া চারিদিক স্বর্ণময় করিয়া তুলিয়াছিল। নৌকার ছাতে চারি ব্যক্তি উপবিষ্ট। সর্ব্বপ্রথমে সিরিন তৎপরে তাহার মাতা ও পেস্তানজী এবং সর্ব্বশেষে ভৈরবজী আসীন। অন্যের অলক্ষ্যে ভৈরবজী মাঝে মাঝে সিরিনের দিকে চাহিতেছিল, চারিচক্ষুর মিলন হইলেই উভয়ে অন্যত্র দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেছিল। নৌকা দ্রুত চলিতে লাগিল, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই কূলে পৌঁছিবে। তীরের লোকজন অশ্ব যান সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। পেস্তানজী-পত্নীর আহ্লাদের সীমা নাই। কিন্তু সিরিনের মুখে বিষাদ ঘনীভূত হইয়া পড়িল। অন্যমনস্ক ভাবে সরিতে সরিতে যেন সহসা সে জলে পড়িয়া গেল। যুবক ভৈরবজীও মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া নদীতে লাফাইয়া পড়িল। নিমেষের মধ্যে তরঙ্গ

নদীর পাগল জল তাহাদের কোথায় লইয়া গেল কে তাহার ঠিকানা করিবে?

"কি হ'ল, কি হ'ল!" বলিয়া পেস্তানজী-পত্নী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

নৌকা তীরে লাগিল। কন্যাপক্ষকে সমাদৃত করিয়া লইবার জন্য লোকজন যানাদি সঙ্গে লইয়া স্বয়ং বৈবাহিক তীরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। নৌকামধ্যে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া বিস্মিত দ্রুতপদে তিনি নৌকায় উঠিলেন। রুদ্ধ নিশ্বাসে চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কন্যা কই?"

এক উন্মত্ত আর্ত্তনাদ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল,—"জলের মধ্যে—সে জলের মধ্যে; জলের দেবতা তাকে টেনে নিয়েছেন!"

"আর আমার পুত্র? ভৈরবজী! বর? সে কোথা? সে যে এই সঙ্গেই আসবে লিখেছিল?"

"ভৈরবজী! তোমার পুত্র! সেই বর! সেই আমাদের জামাতা! হায় হায়! একথা এখন জানিলাম—এখন যখন সব ফুরাইয়া গেল! হাঃ হাঃ!"

চতুর্দ্দিকে সেই হৃদয়বিদারক শব্দ বিকট ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—হাঃ হাঃ!

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর বন্ধুত্ব বঙ্গে আদর্শস্বরূপ ছিল। ইঁহাদের বন্ধুত্বের কথা বঙ্গদেশে সুশিক্ষিত সমাজে বিখ্যাত। ইঁহারা যখন উভয়েই বালক তখন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হইয়া প্রভাকরে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন তের কি চৌদ্দ বৎসর হইবে। উভয়েই কবিতা লিখিতেন। কখনও দেখাশুনা নাই, চোখোচোখি নাই, পত্রের দ্বারা এই সময় ইঁহাদের বন্ধুত্ব জন্মিল। ইউরোপের Royal lovers দের ন্যায় ভালবাসা জন্মিল। সর্ব্বদাই উভয়ে উভয়কে পত্র লিখিতেন, কখনও কখনও পত্রের ভিতর কবিতা থাকিত,—আদরের কবিতা কখনও গালাগালির কবিতা থাকিত। প্রভাকরে দ্বারকানাথ দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র কবিতাতে পরস্পরকে গালি দিতেন, সংবাদ পত্রে উহাকে কবিতা যুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন, রহস্যপ্রিয় দীনবন্ধুর জন্য উহা ঘটিয়াছিল।

আমার স্মরণ আছে, বহুকালের কথা সে,—একদিন একখানি পত্র পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র বড় হাসিয়া উঠিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে—পত্রে কি লিখিয়াছে?" তিনি কোন উত্তর না দিয়া আবার পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন, আবার হাসিলেন। এইরূপ বারংবার পড়িয়া পত্রখানি বাক্সের ভিতর রাখিলেন। আমি তখন 'দেখি দেখি' বলিয়া উহা তাঁহার

হাত হইতে লইবার চেষ্টা করিলাম—আমি তখন বালক, আমাকে ধমক দিয়া দাদা বাক্স বন্ধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবই এই-রূপ ছিল যে যদি কখনও কাহারও উপর বিরক্ত হইয়া ধমক দিতেন তাহার পরক্ষণেই আবার সেই ব্যক্তিকে ভাল কথা বলিতেন। এইস্থলেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না, পরক্ষণেই নরমস্বরে আমাকে বলিলেন, "তুমি কি বুঝিবে? ইহা কবিতা। দীনবন্ধু কবিতায় আমাকে গালি দিয়াছে।" আমি বলিলাম "আপনিও গালি দিয়া লিখুন।" উত্তরে তিনি বলিলেন "লিখব বই কি।"

আমি তখন দীনবন্ধুর নাম শুনিয়াছিলাম। প্রভাকর ও সাধুরঞ্জন সংবাদ পত্রে কবিতার নীচে দীনবন্ধুর নামও দেখিতাম।

দীনবন্ধুর বাল্যকালের পত্রগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের বাক্সের ভিতর থাকিত, সেগুলি কি হইল তাহা আমি জানিতে পারি নাই। ঐ পত্রগুলি যে এক্ষণে সাহিত্য সমাজের বিশেষ আদরের হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ পত্রের দ্বারা বিদ্রূপ করার অভ্যাস তাঁহাদের চিরদিনই ছিল। দীনবন্ধু কোন এক বিশেষ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে কাছাড়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সে স্থলের এক জোড়া জুতা, যাহা এখানে তখন পাওয়া যাইত না, বাটী ফিরিয়া আসিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন ও তাহার সহিত একখানি তিন কথার পত্র লিখিয়াছিলেন, যথা—"বঙ্কিম, কেমন জুতো!" পত্রখানি আমি পড়িয়াছি, অনেকেই পড়িয়াছেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরে কি লিখিয়াছিলেন তাহা তখন আমরা জানিতে পারি নাই। পরে দীনবন্ধুর অগ্রজের নিকট শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—"তোমার মুখের মতন।"

হাস্যরসে ও বাক্‌পটুতায় দীনবন্ধু অপরাজেয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, এইরূপ অনেকেই তাঁহার নিকট পরাস্ত হইতেন, কেবল এক ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে পরাভূত করিতেন। তিনি অতি সামান্য ব্যক্তি, অশিক্ষিত কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিবান্, ব্রাহ্মণ, কুলীনের সন্তান, স্বাধীন অর্থাৎ জমিজমা চাষবাস ইত্যাদিতে সচ্ছন্দে তাঁহার জীবন নির্ব্বাহ হইত। ইনি ভাঁড়ামিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। সেকালের বিখ্যাত ভাঁড় শান্তিপুরের গুরুচরণ বাঁড়ুয্যে ওরফে গুরোদুয্যে মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বাটীতে আসিতেন, কিন্তু এই ব্যক্তিকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। ইহার নাম—মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি নাচ দেখিয়া নাচিতে গান শুনিয়া গাহিতে শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও কোন ওস্তাদের নিকট শিক্ষা পান নাই। ইনি সর্ব্বদা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের বৈঠকখানায় থাকিতেন। একদিন কাঁঠালপাড়ার বাটীতে দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র এবং অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ভাটপাড়ার এক ভট্টাচার্য্য মহাশয় (পণ্ডিত মহাশয় নহেন) উপস্থিত হইলেন, শিষ্য-গৃহে আগমন উপলক্ষে ইঁহার সর্ব্বদা কৃষ্ণনগরে যাতায়াত ছিল। ভট্টাচার্য্যমহাশয় কথায় কথায় দীনবন্ধুর পত্নীর সুখ্যাতির কথা কহিতে

লাগিলেন। সকলেই আনন্দ সহকারে উহা শুনিতেছিলেন, কিন্তু উল্লিখিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজোড়া ঘুঙ্গুর পায়ে দিয়া একটী গীত ধরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। (ঘুঙ্গুর জোড়াটি ঐ ঘরে সংগ্রহ করা থাকিত):—গীতটি এই—

"কালা তাই বটে, কালা তাই বটে,
বাবলার গাছে গোলাপফুল ফোটে।"

এই গীত শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। দীনবন্ধুও খুব হাসিলেন। দীনবন্ধুর পত্নীর সুখ্যাতির পর এই গীতের অর্থ এই বুঝাইল যে দীনবন্ধু বাবলাগাছ ও তাঁহার পত্নী গোলাপ ফুল—বাবলা গাছে গোলাপ ফুল ফুটিয়াছে। ঐ দিবস হইতে দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়কে পত্নীসহোদরবাচক সম্বোধন করিয়া ডাকিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে নারাজ ছিলেন না। এই বৎসর শ্যামাপূজার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতাদ্বয় যখন কৃষ্ণনগরে দীনবন্ধুর সহিত দেখা করিতে যান তখন বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়কে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে দীনবন্ধু তাঁহার পত্নীর নাম করিয়া ইঁহাকে ভাই ফোঁটার দ্রব্যাদি দিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় উহা সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আহারের সময় বড় গোল বাধিল। ছাই পাঁশ গরুর চোনা ইত্যাদি বন্দ্যোপাধ্যায়কে খাওয়াইবার জন্য দীনবন্ধু অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইতে পারেন নাই। সাধ্বী পতিপরায়ণা যিনি ভাইফোঁটা দিয়াছিলেন তিনি অদ্যাপি জীবিতা।

যশোহরে দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের প্রথম চাক্ষুষ আলাপ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ঐস্থানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বাহাল হইয়া যান, দীনবন্ধু তখন ঐ ডিভিসনের পোষ্ট অফিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। এই দুই অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির মিলনে বঙ্গীয় সাহিত্যের কি শুভ ফল ফলিল তাহা বিস্তারিত করিয়া লেখা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষমতাতীত। এই মিলনের পর হইতে দুইজনে প্রবীণ লেখকের ন্যায় কলম ধরিলেন। একজন বঙ্গের প্রধান নাটককার হইলেন, দ্বিতীয় প্রধান ঔপন্যাসিক হইলেন। প্রথম ব্যক্তি নীলদর্পণ রচনা করিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি দুর্গেশনন্দিনী প্রণয়ন করিলেন। দীনবন্ধুর নীলদর্পন যে সাহিত্য সমাজে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। লং সাহেব কারারুদ্ধ হইলেন, একজন বড় সিভিলিয়ান অপদস্থ হইলেন ও অনুবাদক মাইকেল মধুসূদন দত্ত সুপ্রিমকোর্ট হইতে লাঞ্ছিত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন দীনবন্ধুর প্রথম নাটকখানি সর্ব্বাংশে শক্তিশালী এবং কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট। এই নাটকখানি ইউরোপে অনেক ভাষায় অনূদিত এবং সুদূর বোম্বাই সহরে পর্য্যন্ত অভিনীত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস সাহিত্য জগতে ভাষার ও ভাবের যে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছে তাহা বলাও নিষ্প্রয়োজন। দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাবে প্রথমত কলিকাতার সংস্কৃতওয়ালারা খড়্গ হস্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজিওয়ালারা অবশ্য দু'হাত তুলিয়া বাহবা দিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ

একটি সামান্য ঘটনা এস্থলে প্রকটিত করিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কোন পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতেন না, অথবা সহোদর ভিন্ন কাহাকেও সে পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করিতে দিতেন না। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে উহা কাঁঠালপাড়ার বাটীতে অনেককে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহার নিজের লেখনী শক্তির প্রতি তখন তাদৃশ বিশ্বাস জন্মে নাই, সেজন্য অন্যের মতামত জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। আমাদের পিতাঠাকুরের সহিত ও ভ্রাতৃপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অনেক ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিত, ভাটপাড়ার খ্যাতাপন্ন পণ্ডিতগণও আসিতেন; এক্ষণে তাঁহারা সকলেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কেবলমাত্র একজন জীবিত, তিনি কাশীবাস করিতেছেন! এক সময়ে বড়দিনের কি মহরমের ছুটিতে আমার ঠিক মনে নাই অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল, ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণও ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার হস্তলিখিত দুর্গেশনন্দিনী তাঁহাদের নিকট পাঠারম্ভ করিলেন। সকলে নিঃশব্দে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন, কেহ ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেও শ্রোতাগণ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। একটি দুইবছরের শিশু, ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার নিকট দাঁড়াইয়া খড়্‌খড়ির পাখি টানিতে লাগিল, সঞ্জীবচন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া ঐ ছেলেটিকে কোলে লইয়া বাহিরে চাকরদিগের নিকট রাখিয়া আসিলেন। শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অহিফেনভোগী ছিলেন, মুহুর্মুহুঃ তাঁহাদের তামাক আবশ্যক হইত, তাঁহারা তামাক ডাকিতে ভুলিয়া গেলেন। পণ্ডিতমহাশয়েরা নস্যের ডিবা খুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন কিনা সেটি আমি লক্ষ্য করি নাই, কেননা আমিও অনন্যমনে পাঠ শুনিতেছিলাম। একজন প্রাচীন ভদ্রলোক, মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন "আমরি আ,মরি! কি বক্তৃতাই করিতেছেন!" এইরূপে দুইদিনে গল্পপাঠ শেষ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম হইতে ধারণা ছিল যে, দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা ব্যাকরণ দোষে দূষিত। সেজন্য তিনি গল্পপাঠ শেষ হইলে উপস্থিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাষায় ব্যাকরণ দোষ আছে—উহা কি লক্ষ্য করিয়াছেন?" ৺ মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, (সংস্কৃত কলেজের ৺ হৃষিকেশ শাস্ত্রীর পিতা) বলিলেন "গল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে আমাদের সাধ্য কি যে অন্যদিকে মন নিবিষ্ট করি!" বিখ্যাত পণ্ডিত ৺ চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বলিলেন যে "আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণদোষ লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই সেই স্থানে ভাষা আরও মধুর হইয়াছে।" ভাটপাড়ার পণ্ডিতমহাশয়দিগের মতামত এস্থলে উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে তাঁহারা কলিকাতার পণ্ডিতদিগের অপেক্ষা কোন শাস্ত্রে খাট ছিলেন না। কিন্তু কলিকাতার যে সকল পণ্ডিত বাঙ্গালাভাষায় সংবাদপত্র চালাইতেন, তাঁহারাই কেবল নবীন লেখকের নবীন ভাষা অবতারণার অসমসাহসে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন।

দুর্গেশনন্দিনী প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ ৺ তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ভূদেববাবুর জামাতা) এবং সে কালের বিখ্যাত সমালোচক ৺ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য উহা পাঠ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিয়াছিলেন "তোমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তুমি দুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিবে, কিন্তু এই উপন্যাসটি যেমন সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিবে তেমন তোমার অন্য উপন্যাস করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ।" ক্ষেত্রনাথের ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইয়াছিল, যতদিন না দেবীচৌধুরাণী প্রকাশিত হইয়াছিল ততদিন দুর্গেশনন্দিনীরই বিক্রয় বেশী ছিল।

নবপ্রকাশিত সংকল্প মাসিকপত্রে কোন প্রসিদ্ধ লেখক "বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে "বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়া অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে দেখাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা গ্রন্থখানি প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।" কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক। আমি উপরেই বলিয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্র যখন দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন, তখন সঞ্জীবচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি অনুজের উপন্যাসখানি শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্যামাচরণও পরে উহা পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিতগণ মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন, তাঁহার অনুজ ৺তারাচরণ বিদ্যারত্ন (শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণের পিতা) যিনি পাণ্ডিত্যে দেশ বিদেশে জয়ী হইয়া দিগ্বিজয়ী উপাধি পাইয়াছিলেন ও চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি ১০।১২ জন ধুরন্ধর পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সর্ব্বদাই আসিতেন; তিনি তাঁহার ইংরাজি শিক্ষিত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুদিগের যেরূপ আদর সম্মান করিতেন ইঁহাদেরও সেইরূপ করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। ন্যায় কি দর্শনশাস্ত্রে ইঁহাদের সমকক্ষ ছিলেন না বটে, কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে এবং ইংরাজি সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন থাকাতে পণ্ডিত মহাশয়েরা বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত শাস্ত্র বিচারে হটিয়া যাইতেন। ভাটপাড়ার এক্ষণকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিবরাম সার্ব্বভৌম অষ্টাদশবৎসর বয়ঃক্রমে একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন, পণ্ডিতবর ৺হৃষিকেশ শাস্ত্রী যুবাবয়সে শ্লোক

রচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনাইতেন।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটপদে নিযুক্ত হইবার এক বৎসরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বিপত্নীক হইয়া পিতামাতার অনুরোধে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একবিংশতি বৎসর। বঙ্কিমচন্দ্র পঠদ্দশা হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। একে বি, এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তারপর দেখিতে সুপুরুষ একুশ বছরের যুবা, আবার তাঁহার পিতৃদেবের এ অঞ্চলে নামযশঃও ছিল, সুতরাং অনেক পাত্রী জুটিল। বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে ছুটি লইয়া বাটী আসিলেন; সুহৃদপ্রধান দীনবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্থানে স্থানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, পরে একটী পাত্রী মনোনীত করিয়া তাঁহাকেই বিবাহ করিলেন, ইনি অদ্যাপি জীবিতা আছেন।

যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুঁয়া মহকুমাতে ছিলেন, (এক্ষণে উহাকে কাঁথি মহকুমা বলে), তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবুও মধ্যে মধ্যে আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত। চাঁদপুরের কিছু দূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বনজঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে সেইবনে বাস করিত। কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ স্থান হইতে খুলনা মহকুমায় (খুলনা তখন জেলা ছিল না) বদলি হন। ঐ সময়ে ৩।৪ দিন বাটীতে অবস্থিতিকালে দীনবন্ধু আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটা প্রশ্ন করিলেন, যথা।—

"যদি শিশুকাল হইতে ষোলবৎসর পর্য্যন্ত কোন স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক দ্বারা প্রতিপালিতা হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায় কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে যদি কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজসংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্ত্তন হইতে পারে ও তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?" যখন বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে এই প্রশ্ন করেন,

দীনবন্ধু মিত্র

তখন সেইস্থানে কেবল সঞ্জীবচন্দ্র ও আমি উপস্থিত ছিলাম।

সঞ্জীবচন্দ্র বড় ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। তিনি বলিলেন 'যদি দরিদ্র ঘরে তাহার বিবাহ হয় তাহা হইলে মেয়েটা চোর হইবে, বনজঙ্গলে ভাল দ্রব্যাদি খাইতে পাইত না, সমাজে আসিয়া ভাল খাদ্যদ্রব্যাদি দেখিয়া বড় লোভী হইবে, দরিদ্রঘরে ভাল আহার জুটিবে না, পরের ঘরের চুরী করিয়া খাইবে, অলঙ্কারাদি চুরী করিয়া পরিবে।" পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে, পরে সন্তানাদি হইলে স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।" ভাবগতিকে বুঝিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের এ কথা মনোমত হইল না। দীনবন্ধু কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না।—ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাপালিক-প্রতিপালিতা কন্যাকে সমুদ্রতটবিহারিণী, বনচারিণী, সৃষ্টিছাড়া এক অপূর্ব্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গদর্শনে বিদায় প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"দীনবন্ধু আমার সাহিত্যের সহায়, সংসারের সুখদুঃখের ভাগী।" লিখিবার অবসর পাইলে দীনবন্ধুও নিশ্চয়ই ঐ কথাই বলিতেন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যশোহরে ইহাদের প্রথম চাক্ষুষ আলাপের পর ইঁহারা প্রবীণ লেখকের ন্যায় কলম ধরিলেন, উভয়ে যেন পরামর্শ করিয়া লিখিতে বসিলেন; ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনখানি পুস্তক, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী দীনবন্ধুর মতামত লইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। বিষবৃক্ষ প্রচারের কিছু পূর্ব্বে কি সেই সময়ে দীনবন্ধুর মৃত্যু হয়।

দীনবন্ধুর সমস্ত পুস্তক বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত লইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। "বিয়ে পাগলা বুড়ো" পুস্তকখানির প্রচার করিতে বঙ্কিমচন্দ্র নিষেধ করিয়াছিলেন, সেজন্য উহা অনেক দিবস অপ্রকাশিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত দীনবন্ধু-জীবনীতেও উহার উল্লেখ আছে। দীনবন্ধুর "লীলাবতী"-তে বঙ্কিমচন্দ্র স্থানে স্থানে লিখিয়াছিলেন, বন্ধুত্বহিসাবে, আমোদ করিয়া লিখিয়াছিলেন কিন্তু হাস্যরসে দীনবন্ধুর লেখার সহিত সুর মিলিয়াছিল কিনা, জানি না। বঙ্কিম- চন্দ্রের পুস্তকে কিন্তু দীনবন্ধু কখনও কিছু লেখেন নাই। তাঁহার কোন কোন পুস্তকে শিক্ষানবিশীরূপে তাঁহার অনুজ এই ক্ষুদ্র লেখক দুই এক পরিচ্ছেদ লিখিয়াছে বটে কিন্তু সে লেখা যে কিরূপ তাহা নিম্নলিখিত গল্পটি হইতে বুঝিতে পারিবেন।

কোন গৃহস্থের বাটীতে কৃষ্ণনগর ঘুর্ণির এক বিখ্যাত কারিকর নাম কালাচাঁদ পাল, দুর্গোৎসবে দশভুজার প্রতিমা গড়িত। ষষ্ঠীর দিন রাত্রিকালে বিদেশ হইতে বাটীর কর্ত্তা আসিয়া প্রতিমা দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কালাচাঁদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই দালানে একটি লোক দাঁড়াইয়াছিল, সে করযোড়ে বলিল, "আজ্ঞে, এ প্রতিমা আমি গড়িয়াছি।" কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" সে লোকটি বলিল "আমি কালাচাঁদের জ্যাংলো।" কর্ত্তা বিরক্ত হইয়া

কহিলেন, "না, তা কখনই হইতে পারে না, এ প্রতিমা কালাচাঁদ গড়িয়াছে।" সে ব্যক্তি পুনরায় বলিল, আমি উহাতে খড় জড়াইয়া এক মেটেমো করিয়াছি, আমার খুড়োমশাই দোমেটোমে করিয়াছেন, মুখ গড়িয়া বসাইয়াছেন।" তখন কর্ত্তা হো হো করিয়া হাসিয়া তাহাকে একটি টাকা বখশিশ দিলেন। আমি সেইরূপ দুই একটি পরিচ্ছেদে এক মেটোমো করিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র দোমে টোমে করিয়াছিলেন। কোন পরিচ্ছেদে কি ঘটনা লিখিতে হইবে তাহা তিনি বলিয়া দিতেন, আমি সেইরূপ লিখিতাম, পরে তিনি উহা তাঁহার লেখার সুরের সহিত মিলাইয়া লইতেন। আমি উপযাচক হইয়াই লিখিতাম, কখনও কখনও তিনি ইচ্ছা করিয়াও আমাকে লিখিতে বলিতেন।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বঙ্কিম ও দীনবন্ধু প্রসঙ্গ লিখিতে লিখিতে নিজের কথা কেন! একটা বিষয়ের কৈফিয়েৎ দিবার জন্যই নিজের কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

ভারতীর "বঙ্কিম যুগ" প্রবন্ধের লেখকের সহিত কথা প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম যে কৃষ্ণকান্তের উইলের কোন কোন পরিচ্ছেদে আর উহার উইলচুরি পরিচ্ছেদে আমার একটু আধটু লেখা আছে। এখন বুঝিতেছি, তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে পরিচ্ছেদটী সমুদয় আমার লেখা। তজ্জন্য ১৩১৮ সালের কার্ত্তিক সংখ্যার ভারতীতে "বঙ্কিম যুগ" প্রবন্ধে ভ্রমবশতঃ লিখিয়াছিলেন যে রোহিণী কৃষ্ণকান্তের হাস্যরসের কথোপকথনটি আমারই লেখা। আমি তাঁহাকে কখনও এমন কথা বলি নাই, যে ঐ অংশটুকু আমার লেখা। আমি যদি পূর্ব্ব হইতে তাঁহার নিকট পরিচিত থাকিতাম, তাহা হইলে তাঁহার এমন সাংঘাতিক ভ্রম হইত না। তাঁহার সহিত ঐ আমার প্রথম আলাপ। "উইলচুরি" পরিচ্ছেদে আমার কতটুকু লেখা আছে তাহা নিম্নে বুঝাইতেছি।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইলচুরি পরিচ্ছেদ লিখিতেছিলেন, এমত সময়ে পাঁচটার ট্রেণে কলিকাতা হইতে তাঁহার দুইটি বন্ধু আসিলেন, তিনি কাগজ কলম ফেলিয়া উঠিলেন, আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম "কি লিখিতেছিলেন বলিয়া দিন, আমি উহা লিখব।" তিনি আমার আব্দার রক্ষা করিয়া হাসিতে হাসিতে লিখিতে অনুমতি দিয়া ঐ পরিচ্ছেদে যাহা লিখিতে হইবে বলিয়া দিলেন। আমি তখন ঐ হাসির অর্থ বুঝিতে পারি নাই, পরে লিখিতে বসিয়া বুঝিলাম—দেখিলাম "ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিং কর্জ্জ লইয়া এই দলিল লিখিয়া দিয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন, মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোরক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।" এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন,—এই সুরে লেখা আমার অসাধ্য বুঝিয়া আমি এইস্থানে "রোহিণীকে আনিয়া কৃষ্ণকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করাইলাম এবং তাঁহাদের উভয়ের কথোপকথন আমার সাধ্যমতে লিখিলাম। পরদিন বন্ধুগণ চলিয়া গেলে বঙ্কিমচন্দ্র "কৃষ্ণ কান্তের উইল লিখিতে বসিয়া ঐ পরিচ্ছেদে আমার লেখার প্রথমাংশ অর্থাৎ রোহিণীর সহিত কৃষ্ণকান্তের আফিমের

ঝোঁকে কথোপকথন নূতন করিয়া লিখিলেন, আমার লেখার অবশিষ্ট অংশতে "দোমে টোমে" করিতে হয় নাই, তবে এক আধ স্থানে "মাটী" লাগাইয়াছেন।

বঙ্কিম চন্দ্রের জন্য কিছুকাল আমাদের পরিবারে প্রায় সকলেরই মধ্যে সাহিত্যানুশীলন অর্থাৎ literary activity জন্মিয়াছিল, কিন্তু বঙ্গদর্শনের বিদায়ের সঙ্গে উহার অবসান হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু উভয়ে আফিসের কি সাহেবসুভার কথা কহিতে ভালবাসিতেন না, ঐরূপ কথোপকথন তাঁহাদের ভাল লাগিত না। কিন্তু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মাত্রেই সাহেবের কথা ও আফিসের কাজ কর্ম্মের কথা না কহিয়া থাকিতে পারিতেন না। একরাত্রিতে কোন ডেপুটির বাড়ী একটা বড় ভোজ ছিল; ডেপুটিতে ডেপুটিতে ঘর পুরিয়া গিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতারাও উপস্থিত ছিলেন। একজন প্রসিদ্ধ ডেপুটী ইহার কিছু পূর্ব্বে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা এই সভাতে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিতেছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন :—

"ধন্য এক জনা হয়েছে,
পেখের কলম কানে দিয়ে সাহেবের সঙ্গে কথা কয়েছে।"

এই ডেপুটী বাবু বঙ্কিমের বন্ধু ছিলেন, সেই জন্য তিনি তাহাকে এরূপ ভৎর্সনা করিলেন। একজন ডেপুটী কোন বিশেষ সরকারী কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষেরা স্থির করিয়াছিলেন যে ঐ কার্য্য তিন বৎসরে শেষ হইবে, কেননা ঐ কার্য্য সম্পাদনের জন্য জেলায় জেলায় ঘুরিয়া অনেক বিষয়ের তদন্ত করিবার ছিল। কিন্তু ডেপুটী বাবুটী ঐ কার্য্য দেড় বৎসরে শেষ করিয়া বাহবা পাইয়াছিলেন। ডেপুটি বাবু তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও কি প্রকারে এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় দিতেছিলেন। পরিচয় শেষ হইলে দীনবন্ধু বলিলেন "ওহে—, তবে তুমিই বুঝি ত্রেতাযুগে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কাদগ্ধ করিয়াছিলে!"

ডেপুটি বাবুরা দীনবন্ধুকে যমের ন্যায় ভয় করিতেন, তাঁহার নিকটে বড় ঘেঁসিতেন না। কিন্তু নানা কারণে বঙ্কিম চন্দ্রের সহিত তাঁহারা আনুগত্য করিতেন।

দীনবন্ধু কলিকাতায় সদর আফিসে আসিলে পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টে তাঁহার একাধিপত্য জন্মিল। কত দরিদ্র সন্তানকে তিনি চাকুরী দিয়া অন্নদান করিয়াছেন তাহার গণনা হয় না। কাহাকেও কেরাণীগিরি, কাহাকেও সব পোষ্টমাষ্টারী, যে যাহার যোগ্য তাহাকে তাহাই দিতেন, সেজন্য উমেদারগণের মধ্যে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ছিলেন!

একদিন আমাদের বাটীতে "গোলামচোর" খেলা হইতেছিল, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "দীনবন্ধু বাবুর নিকট আমার এক দরখাস্ত আছে।" তিনি আমাদের পরিচিত কিন্তু স্বগ্রামবাসী নহেন, পার্শ্বস্থ একটি গ্রামে তাঁহার বাস। দীনবন্ধু তখন খেলিতে

বসিয়াছিলেন, বলিলেন "একটু বহ্নন পরে শুনিব।"

গোলাম চোর খেলা, পল্লিগ্রামে, কি নগরে, গৃহস্থের বাটীতে কি ধনাঢ্যের বাটীতে, সকল স্থানেই হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গের দুই প্রতিভাশালী ব্যক্তি কি প্রকারে সেই সামান্য খেলাতে আনন্দের সহিত যোগদান করিতেন, তাহা যদি এস্থলে উল্লেখ করি তাহা হইলে আশা করি পাঠকমহাশয়েরা বিরক্ত হইবেন না। আমাদের গ্রামস্থ ৭।৮ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। দীনবন্ধু, সঞ্জীবচন্দ্র ও আরও কয়েকজন লোক খেলা আরম্ভ করিলেন, তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও (যাঁহাকে দীনবন্ধু ভাই ফোঁটা দিয়াছিলেন) খেলিতে বসিলেন। দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল যে এই বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর করিয়া সাজা দেন, কারণ ইনি সকলকেই গালি দিতেন, কাহাকেও ছাড়িতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ ও আমরা অনেকে দীনবন্ধু এবং সঞ্জীবচন্দ্রের দলভুক্ত হইয়া খেলা দেখিতে লাগিলাম। বন্দ্যোপাধ্যায় যে নিঃসহায় ছিলেন এমন নহে, তাঁহারও দলে অনেক লোক ছিল। তন্মধ্যে একটী লোকের পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি, কেননা বঙ্কিমচন্দ্র কি প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের লইয়া বাটী আসিলে সর্ব্বদা আনন্দে থাকিতেন, তাহা এই পরিচয়ে কতকটা বুঝিতে পারিবেন। এই লোকটি ব্যবসাবাণিজ্য করিতেন কিন্তু বড় মূর্খ ছিলেন, আবার সেই সঙ্গে এইরূপ অভিমান ছিল যে চেষ্টা করিলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর ন্যায় লেখক হইতে পারেন—সর্ব্বদা লিখিবার জন্য 'subjebt' খুঁজিতেন। একদিন সঞ্জীবচন্দ্র বলিলেন "আপনি চূত ফল সম্বন্ধে লিখুন বেশ ভাল 'subject'।" মুখোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "চূত ফল কাহাকে বলে?" সঞ্জীবচন্দ্র বলিলেন "আম"।

কিছুদিন পরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটী প্রবন্ধ লিখিয়া আনিয়া আমাদের শুনাইলেন। প্রবন্ধটীর প্রথমাংশ আমার মনে আছে, উহা নিম্নে প্রকটিত করিতে ইচ্ছা করি, যদি পাঠকমহাশয়েরা রাগ না করেন।—

"আঁব অতি মিষ্ট, আঁব আবার অতি টক, বাগাতেঁতুলের মত টক, আঁব আঁশাল, কোন কোন আঁব আঁশাল হয় না কারণ ভাল গাছের আঁব আঁশাল হয় না— ইত্যাদি।" এই প্রবন্ধটির পাঠ শেষ হইলে আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ বাবু গম্ভীর ভাবে উহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, সকলেই প্রশংসা করিলেন, কিন্তু এক ব্যক্তি হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই হাসিতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সান্ত্বনা-বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, "তবে আমার প্রবন্ধটী ছাপাইয়া দিন।" বঙ্কিমচন্দ্র উহা হাত পাতিয়া লইলেন বটে, কিন্তু যেখানে রাখিয়াছিলেন সেইখানেই তাহা পড়িয়া রহিল। আমি উহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম এবং রহস্যের জন্য মধ্যে মধ্যে অনেককে পাঠ করিয়া শুনাইতাম,

উহার প্রথমাংশ আমার স্মরণ আছে। * * * খেলা আরম্ভ হইলে দীনবন্ধু, সঞ্জীবচন্দ্র এবং তাঁহাদের দলভুক্ত অনেকেই এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও অনেক কৌশল করিতে লাগিলেন যাহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় চোর হয়; কিন্তু "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি" দীনবন্ধু সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যেই একজন চোর হইলেন। তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহানন্দে ঘুঙ্গুরজোড়াটী পায়ে দিয়া রূপচাঁদ পক্ষীর একটী গীত ধরিয়া তাঁহাদের সম্মুখে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। নৃত্যগীত শেষ হইলে দীনবন্ধু তখন পূর্ব্বোক্ত উমেদার ব্রাহ্মণকে নিকটে বসাইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বড় গরীব, অনেকগুলি বিধবা, নাবালক, নাবালিকা, প্রতিপালন করিতে হয়, দিন চলে না, তাহার এক মাত্র পুত্র যদি একটা চাকুরী পায় তাহা হইলে অনেকগুলি ব্যক্তির জীবনরক্ষা হয়। দীনবন্ধু ব্রাহ্মণটিকে পুত্রের সহিত তাঁহার আফিসে যাইতে বলিলেন। কিছুদিন পরে শুনিলাম ব্রাহ্মণ পুত্রের পোষ্টআফিসে চাকুরীর জন্য নাম রেজিষ্টারী হইয়াছে, খালি হইলেই পাইবে, কিন্তু খালি কবে হইবে তার ঠিক নাই, একমাস হইতে পারে ছয়মাসও হইতে পারে; ইতিমধ্যে হুগলীর একটী ডেপুটী বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসিলেন, তাঁহার অধীনে রোডশেশ্ ডিপার্টমেণ্টে একটী চাকুরী খালি ছিল, ব্রাহ্মণ-পুত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ চাকুরী দেওয়াইলেন। আবার মাস দুই বাদে দীনবন্ধু উহাকে সাবপোষ্টমাষ্টারি পদে বাহাল করিয়া পরওয়ানা পাঠাইলেন। ঘটনাটি অতি সামান্য, এইরূপ উপকার অনেকেই করিয়া থাকেন, কিন্তু এই ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যের পরিচয় শুনিয়া দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র তাহার কষ্ট সত্বর বিমোচন করিতে কিরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় স্বরূপ উহা এ স্থলে উল্লেখ করিলাম!

আমি উপরে বলিয়া গিয়াছি যে নানা প্রকৃতির লোক বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। এখানে আর একটী লোকের কথা বলিলে সেকালের পল্লীগ্রামের কবির পরিচয় পাইবেন। ইঁহার নিবাস আমাদের বাটীর অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে মাদ্রালগ্রামে, নাম কৃষ্ণমোহন মুখুয্যে। ইনি সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন বাটীতে দোল দুর্গোৎসব হইত। ইনি একজন উপস্থিত কবি ছিলেন। এই কবি সর্ব্বদা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট আসিতেন, সকলেই তাঁহাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিত, কিন্তু কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করেন নাই। একদিন কবি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিলেন, "আপনি কখনও আমায় প্রশ্ন করেন নাই, আমার ইচ্ছা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই।" বঙ্কিমচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা"। অল্পক্ষণ পরেই একটি প্রশ্ন করিলেন—

"গগনেতে ডাকে শিবা হুয়া হুয়া করে।"

এই প্রশ্নে সকলেই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ কি উদ্ভট প্রশ্ন? যাহা কখনও পৃথিবীতে ঘটে নাই, তাহার কবিতা কিরূপে হইবে? আকাশে কখনও কি শেয়াল উঠেছে যে গগনেতে হুয়া হুয়া করে ডাকবে?"

এইরূপে সকলে পরস্পরে বলাবলি করিতেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র এই ভৎর্সনাতে মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, কবিবর মস্তক নত করিয়া ভাবিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া একটী কবিতা শুনাইতে লাগিলেন। ঐ কবিতার প্রথম দুই চারি পংক্তি শুনিবামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ঘাট হইয়াছে, আপনি অপরাজেয়"। পরে কবিবর সমুদয় কবিতাটি শুনাইলেন। উহার মর্ম্ম এই, লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হইলে ধন্বন্তরিপুত্র সুষেণের ব্যবস্থানুসারে হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিশল্যকরণীর পাতা আনিতে গিয়া উহা খুঁজিয়া না পাইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বত উপ্‌ড়িয়া লইয়া যাইতে যাইতে, পথিমধ্যে সূর্য্যদেবকে বগলে পুরিয়া লইয়া পাহাড় মাথায় করিয়া আসিতেছিলেন; ঐ পাহাড়ে বাঘভল্লুক, পশুগণ বাস করিত তন্মধ্যে শিবাগণ ভোরের সময় তাহাদের সংস্কারসিদ্ধ হুয়া হুয়া ডাক ডাকিয়া উঠিল; দারুণ গ্রীষ্মযন্ত্রণায় এক দম্পতি গৃহছাদে শয়ন করিয়াছিল, আকাশে ঐ হুয়া হুয়া ডাক শুনিয়া স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া স্ত্রী বলিল,—

"কভু শুনি নাই নাথ, ভুবন মাঝারে
গগনেতে ডাকে শিবা হুয়া হুয়া করে।"

পরোপকার দীনবন্ধুর জীবনের ব্রত ছিল, তাহার প্রথম পরিচয় নীলদর্পণ প্রচারে পাওয়া যায়। এ ত গেল একটা গুরুতর উদাহরণ। কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতে সর্ব্বদা উহার পরিচয় পাওয়া যাইত। যে ঘটনা অন্যের পক্ষে রহস্যজনক, দীনবন্ধুর নিকট উহা কষ্টকর বোধ হইত। একজন মাতাল ট'লে ট'লে খানায় পড়িতেছে, লোকে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছে, হাসিতেছে, কিন্তু দীনবন্ধু তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া তাহার সাহায্য করিলেন। এই গুণটি বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল। দীনবন্ধুর সম্বন্ধে একটি ঘটনা, যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা এখানে বলিব। বহুকাল হইল সপ্তমী কি অষ্টমী পূজার রাত্রিতে, দীনবন্ধু, কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় (দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা) ও আমি নৈহাটী ষ্টেশন হইতে প্রশস্ত বারাকপুর ফাডার রোড দিয়া বাটী আসিতেছিলাম। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক বিঘা পথ অন্তরে রাস্তার পশ্চিমদিগের ড্রেণে একটী ধবল পদার্থ দেখিলাম। মেটে মেটে জোৎস্না, ভাল বুঝিতে পারিলাম না, এই ধবল পদার্থটি কি? উহা মাঝে মাঝে নড়ায়, প্রথমে বোধ হইল একটা গরু ড্রেণে পড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম উহা গরু নয় একটা বাবু মাতাল ড্রেণে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা তিনজনে তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া দেখিলাম, একটী নবীন যুবা, পরিপাটি বেশবিন্যাস, কিন্তু খানায় পড়িয়া উহা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, তিনি আমাদের তিনজনেরই অপরিচিত। দীনবন্ধুর জিজ্ঞাসায় মাতাল বাবু বলিলেন তিনি কলিকাতা হইতে শ্বশুরবাড়ী আসিতেছিলেন। ষ্টেশনের বাবুদের সহিত শুড়ির দোকানে মদ খাইয়া শ্বশুরবাটী যাইতে যাইতে খানায় পড়িয়া গিয়াছেন। শ্বশুরের নামধামেরও পরিচয় দিলেন। তাহার শ্বশুর সেখানকার একজন সম্ভ্রান্ত লোক, আমরা

সকলেই তাঁহাকে জানিতাম। দীনবন্ধু শ্বশুরের নাম শুনিয়া বলিলেন "আপনি অমুকের জামাই!" এই কথাতে মাতালবাবু বলিলেন—"You know my father-in-law sir, then you are my father-in-law, sir, yes sir son.in-law sir, I sir son-in-law sir,"—এই বুলি ধরিলেন, যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন কেবল তাহার মুখে ঐ বুলি। দীনবন্ধু কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে তাহার উত্তর দিতে লাগিল কিন্তু শেষ কথাতে "Yes sir son-in-law sir." এই ধুয়া বরাবরই ছিল। পৃথিবীর উপরিস্থ পদার্থের প্রতি মধ্যাকর্ষণ শক্তি যেমন স্যার আইজ্যাক নিউটন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ঐদিন আমরা মাতালের প্রতি খানাডোবার আকর্ষণশক্তি আবিষ্কার করিলাম। কেননা মাতালবাবু যেদিকে খানা কেবল সেদিকেই টলিয়া টলিয়া আসিতেছেন, পূর্ব্বদিকে সমতল ভূমি, সেদিকে কোনমতে টলিবেন না; ইহা দেখিয়া দীনবন্ধু কোমরে চাদর জড়াইয়া তাহার বাম হাতখানি ধরিলেন। আমি দক্ষিণদিকে অর্থাৎ ড্রেণের দিকে দাঁড়াইলাম ও তাহাকে ঠেলিয়া রাখিতে লাগিলাম। এই প্রকারে কিছুদূর যাইয়া দীনবন্ধুর কষ্ট দেখিয়া আমি বলিলাম, "আপনি ছাড়িয়া দিন, আমি ড্রেণের দিকে আছি, কোনমতে বাবুকে খানায় পড়িতে দিব না।" তিনি বলিলেন, "না হে না"। তিনি আমাকে বিশ্বাস করিলেন না। আমার তখন ২২।২৩ বৎসর বয়স। পশ্চিমদিকে বৈদিকপাড়ার একটি গলি হইতে দুইটি বৈদিক ঠাকুর বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। দীনবন্ধুকে তাঁহারা চিনিতেন, আনন্দ সহকারে তাঁহার সহিত কথা কহিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দীনবন্ধু একজনের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "একি, ইনি কে!" তখন মাতালরাজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বুক চাপড়াইয়া "Son-in-law sir, yes sir son-in-law sir" বলিয়া তাঁহাদের দিকে ধাবমান হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দীনবন্ধু তাহার হাত ছাড়িলেন না। সহসা এইরূপ সম্বোধনে বৈদিক-ঠাকুরদ্বয় নিঃশব্দে টিকি উড়াইয়া দৌড়িতে লাগিলেন, তাঁহাদের চটিজুতার ফট্‌ফট্ শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিতে লাগিলাম—বৈদিক ঠাকুরেরা 'দাতাল মাতালকে' বড় ভয় করিতেন। এইরূপে প্রায় ১০।১৫ মিনিটে আমরা বাটী পৌছিলাম, পরে অনেকক্ষণ ধরিয়া দীনবন্ধুকে বাতাস দিতে হইল। যতক্ষণ রাস্তায় মাতালকে ধরিয়াছিলেন ততক্ষণ তিনি গম্ভীর ভাবে ছিলেন; এক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাদিগকে দেখিয়া নিজমূর্ত্তি ধরিলেন। ঘামিতেছেন, হাঁপাইতেছেন, আবার হাসাইতেছেন ও হাসিতেছেন। এখানে বলা বাহুল্য মাতালবাবুকে খাওয়াইয়া পাল্কি করিয়া শ্বশুরবাটী পাঠান হইল, শ্বশুরবাটী গ্রামান্তরে।

অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তি, যাহার পেশা মাতাল হইয়া খানায় পড়া, তাহাকে কে এরূপ যত্ন করিয়া আশ্রয় দিয়া থাকে? সে কেবল দীনবন্ধু। অন্য কোন ভদ্রলোক হইলে উহাকে খানা হইতে

তুলিয়া নিকটস্থ কোন দোকানে (ঐ স্থানে অনেক দোকান ছিল) রাখিয়া বাটী চলিয়া যাইতেন, আবার কেহ কেহ বা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেন, কিন্তু দীনবন্ধু অন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিপদগ্রস্ত লোককে প্রাণপণে সাহায্য করিতেন। করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার একটী বিশেষ রোগ ছিল, বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া যদি উহাকে নাটকোপযোগী মনে করিতেন, তাহা হইলে কোন নাটকে সে চরিত্রটী অঙ্কিত করিতেন। এই মাতাল বাবুই "সধবা একাদশীর' "ভোলা" মাতাল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক বন্ধু ছিল, দীনবন্ধুর অসংখ্য বন্ধু ছিল, কিন্তু ইঁহারা দুইজনে পরস্পরের প্রাণতুল্য বন্ধু ছিলেন। যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয় তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "সাহিত্যের সহায়" দীনবন্ধুর নিকট বিশেষ সাহায্য পাইবেন এমন ভরসা করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শন প্রকাশের অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। এই সময়ে তাঁহার জন্য বঙ্গসমাজের চারিদিক হইতে ক্রন্দনরোল উঠিল, কেহ বা সংবাদপত্রে, কেহ বা মাসিক পত্রিকাতে, কেহ বা কবিতাতে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল, ইহা অনেকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু দীনবন্ধুর শোকে বঙ্গদর্শনের যে কণ্ঠরোধ হইয়াছিল তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই। প্রায় তিন বৎসর পরে যখন বঙ্গদর্শন বিদায়গ্রহণ করিল তখন বঙ্কিমচন্দ্র ঐ বিদায়-প্রবন্ধে বঙ্গদর্শন-লেখকগণের নিকট কৃতজ্ঞতাস্বীকার করিতে গিয়া দীনবন্ধুর কথা উত্থাপন করেন। কিন্তু কিরূপ কাতরতার সহিত উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নিম্নের কয়েকছত্রে প্রকাশ পাইবে :—

"আর একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখদুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গী। সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই, এখনও আর কিছু বলিলাম না।"

বস্তুতঃ আমরা সকলেই লক্ষ্য করিতাম দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কথা উত্থাপন করিতেন না। যদি কেহ দীনবন্ধুর কথা বা তাঁহার রহস্যপটুতার কথা কহিত, তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের একটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত, তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। ইহাতে আমরা বুঝিতাম যে তিনি দীনবন্ধুর শোক ভুলিতে পারেন নাই, দীনবন্ধুর স্মৃতি তাঁহার কষ্টকর হইয়াছিল। প্রায় ৮।৯ বৎসর পরে "আনন্দ-মঠের" উৎসর্গ-পত্রে "কুমার সম্ভব"

হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, "হে ক্ষণভিন্ন সুহৃদ আমাকে ফেলিয়া কোথায় গেলে !!" বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলিয়াছিলেন দীনবন্ধু "আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু"।—বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় বড় স্নেহপ্রবণ ছিল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে লৌহ *

সমালোচনা

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম্ এ, এফ সি এস, রাজসাহী কলেজের রসায়ন-অধ্যাপক। ইংরাজী ভাষায় Iron in Ancient India নামে তিনি একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি গবেষণায় পরিপূর্ণ, ভাষাও প্রাঞ্জল, সুবোধ্য।

পুরাকালে লৌহ-সম্বন্ধে হিন্দুদিগের জ্ঞান কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, অধ্যাপক নিয়োগী উক্ত পুস্তকে তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার History of Hindu Chemistryতে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে, হিন্দুদিগের লৌহ ও অন্যান্য ধাতু-সম্বন্ধে কতদূর জ্ঞান ছিল, তাহার পরিচয় দিয়াছেন। পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করিলে, হিন্দুদিগের প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন গুলি দেখিলে এবং প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলন করিলে হিন্দুদিগের লৌহ-সম্বন্ধে জ্ঞানের কতদূর প্রসার ছিল, তাহাও জানা যায়। লেখনীমুখে সেই পরিচয় প্রকটিত করিয়া পঞ্চানন বাবু ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আমাদের ধারণা যে পুরাকালে যে কেবলমাত্র ভারতে নীতি ও দর্শন শাস্ত্রেরই চর্চ্চা হইয়াছিল, তাহা নহে; শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন নিয়োগী, বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতির গবেষণার ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে কি অর্থনীতি শাস্ত্রে, কি নৌ-বিদ্যায়, কি লৌহ-শাস্ত্রে প্রাচীন ভারত যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

বহু শতাব্দী ধরিয়াই ভারতে লৌহ প্রস্তুত হইতেছে ও ভারত হইতে পারস্য, আরব, মিশর ও য়ুরোপে সেই লৌহ রপ্তানি হইয়াছে।

বেদগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে বৈদিক যুগে আর্য্যগণ লৌহের ব্যবহার জানিতেন। ঋগ্বেদে "আয়াস" লৌহ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ব বেদে "আয়াস" শব্দের সুপ্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদের "কৃষ্ণায়াস" লৌহ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতে লৌহ-ব্যবহারের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। অসি, ভল্ল, কৃপাণ, বলৌহ, গদা, মুষল, শর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইত। মনুসংহিতায় লৌহময় পাত্রের সংস্কারের ব্যবস্থা আছে। সুশ্রুতে প্রায় একশত প্রকার লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রের নামোল্লেখ আছে। চাণক্যের "অর্থশাস্ত্রে" "আকারাধ্যক্ষ" ও তাহার কর্ত্তব্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বিজয়ী আলেকজন্দরকে পুরু অর্দ্ধ মণ লৌহ উপঢৌকন দিয়াছিলেন।

পুরাকালে লৌহ কেবল অস্ত্র-শস্ত্র-নির্ম্মাণেই

---

* Iron in Ancient India by Panchanan Neogi, M. A. F. C. S. Premchand Roychand Scholar, Professor of Chemistry, Government College, Rajsahi, Printed for, and Published by, the Indian Association for the Cultivation of Science, 210. Bow Bazar Street, Calcutta. Price Rs 2/4.

ব্যবহৃত হইত না; ভিষক-শাস্ত্রেও ইহার যথেষ্ট সমাদর ছিল। নাগার্জ্জুন লৌহ জারণ মারণ ও ভস্ম করিবার প্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

তাম্রপর্ণী নদীর কূলে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সমাধি-ভূমি খনন করিয়া নানাবিধ লৌহ যন্ত্র পাইয়াছেন—ইহাদের নির্ম্মাণ-কাল. স্থির করা সুকঠিন—কিন্তু বোধ হয় যে দাক্ষিণাত্যে শবদাহ-প্রথা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে শব-সমাধির যুগে এইগুলি নির্ম্মিত হইয়া সমাধি-মধ্যে নিহিত হইয়াছিল। কপিলাবস্তুর সাত ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে পিপ্রায়া নামক স্থলে পেপ সাহেব স্তূপ খনন করিতে করিতে দুইটী লোহার প্রেক, একটী লোহার গজাল ও একটী বল্লমের ফলা পাইয়াছেন; অনুমানে বোধ হয়, এইগুলি প্রথম কিংবা দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে তৈয়ারি হইয়াছিল। বুদ্ধ গয়ায় একটী স্তূপ খনন করিতে করিতে কতকগুলি লৌহময় পদার্থ পাওয়া গিয়াছে; অনুমান করা যায়, সেগুলি তৃতীয় খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তৈয়ার হইয়াছিল। কুতব.মিনারের সন্নিকটবর্ত্তী লৌহ স্তম্ভ বাইশ ফুট লম্বা, ব্যাস ১৬·৪ ইঞ্চি; ইহা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কীর্ত্তিস্তম্ভ; অন্তত ৪১৫ খৃঃ অঃ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সার রবার্ট হ্যাডফিল্ড এই লৌহের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন, ইহাতে নিম্নলিখিত মূল পদার্থগুলি আছে:

লৌহ	৯৯·৭২০	শতকরা
অঙ্গার	·০৮০	,,
গন্ধক	·০০৬	,,
সিলিকন	·০৪৬	,,
ফস্ফরাস	·১১৩	,,
ম্যানগানিস	·০০০	,,
	৯৯·৯৬৬	

উক্ত বিশ্লেষণ লইতে দেখা যাইতেছে, যে স্তম্ভটি বিশুদ্ধ wrought ironএ নির্ম্মিত, উহাতে ম্যান্-গানিস্ (manganese) নাই। এই স্তম্ভটী হিন্দুদিগের ধাতু-বিদ্যার একটী স্থায়ী গৌরব-কীর্ত্তি। Roscoe এবং Schorlemmer লিখিয়াছেন, "It is not an easy operation at the present day to forge such a mass with our largest rolls and steam-hammers; how this could be effected by the rude hand-labour of the Hindus, we are at a loss to understand", ফার্গুসন লিখিয়াছেন, "Taking 400 A. D as a mean date—and it certainly is not far from the truth—it opens our eyes to an unsuspected state of affairs to find the Hindus at that age capable of forging a bar of iron larger than any that have been forged even in Enrope up to a very late date, and not frequently even now."

পুরী, কণারক ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরে লোহার কড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লি ব্যতীত অপর দুই স্থানে দুইটী বৃহৎ লৌহস্তম্ভ আছে—একটী ধার নগরে, অপরটী আবু পর্ব্বতে। ধারস্তম্ভ ৪৩ ফুট ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ। ব্যাস ১০$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "Outside this fort of Dhar there is a Jami Masjid and a square pillar lies in front of the Masjid with some portion imbedded in the ground. When Bahadur Shah conquered Malava he was anxious to take the pillar with him to Guzerat. In the act of digging out, it fell down and was broken into two pieces (one piece 22 feet long and the other 13 feet)"

ধারস্তম্ভ সম্ভবতঃ দ্বাদশ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ধারস্তম্ভের ভগ্নাংশগুলি যদি সংযোজিত করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবী-বক্ষে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্তম্ভ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

১৪১২ খৃষ্টাব্দে আবু পর্ব্বতোপরি অচলেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; মন্দির-প্রাঙ্গণে একটী লৌহ-নির্ম্মিত ১২ফুট ৯ইঞ্চি উচ্চ ত্রিশূলাকৃতি স্তম্ভ বিদ্যমান আছে।

যজুর্ব্বেদে "সুর্ম্মী", রামায়ণ ও মহাভারতে

"শতাঘ্নী", "আগ্নেয়াস্ত্র", "নালিকাস্ত্র" প্রভৃতির উল্লেখ আছে। শুক্রনীতিতে "ক্ষুদ্রনালিকা" ও "বৃহৎ-নালিকা"র বর্ণনা আছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এখনও মোগল বাদশাহদিগের লৌহ-নির্ম্মিত বৃহৎ কামান বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। রেনেল সাহেব তাঁহার "Memoir of a map of Hindoostan" নামক পুস্তকে একটী ২২ ফুট ১০½ ইঞ্চি লম্বা কামানের বর্ণনা করিয়াছেন; ঢাকায় তিনি স্বয়ং অষ্টাদশ শতাব্দীতে উক্ত কামান দেখিয়াছিলেন; এখনও ঢাকায় একটী ১১ ফুট লম্বা কামান দেখিতে পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদে "জাহানখোসা" নামক কামান ১৭ ফুট ৬ইঞ্চি লম্বা; উহা ১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে ঢাকার জনার্দ্দন মিস্ত্রি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরেও অনেকগুলি পুরাতন কামান দেখিতে পাওয়া যায়। সুরভরে ২৪ ফিট লম্বা একটী কামান আছে; বিজাপুরে "লণ্ডা কেশব" নামক ২১ ফিট ৭ ইঞ্চি কামান আছে; গুলবার্গাতেও একটী বৃহৎ কামান আছে। "আইন আকবরীতে" "বন্দুক" তৈয়ার করিবার প্রণালী লেখা আছে। এখনও অনেক পুরাতন জমীদার ও রাজার গৃহে 'মোগলাই' বন্দুক দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে লৌহকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হইত, যথা, "মুণ্ড," "তীক্ষ্ণ," "কাণ্ড"; আবার "মুণ্ড" লোহ তিন ভাগে বিভক্ত করা হইত, যথা, মৃদু, কুণ্ঠ, কড়ার। 'তীক্ষ্ণ' লৌহ ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইত, যথা, খর, সার, হৃন্নাট্ট, তারাবর্চ্চ, বাজির, কাললৌহ। "কান্ত" লৌহ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইত, যথা, ভ্রামক, চুম্বক, কর্ষক, দ্রাবক, রোমকান্ত। "রসরত্ন-সমুচ্চয়," "রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ" প্রভৃতি পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থ-পাঠে মুণ্ড, তীক্ষ্ণ ও কান্ত লৌহ আধুনিক, cast iron, steel ও wrought iron অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

উড়িষ্যার লোহার কড়ি, দিল্লির থাম প্রভৃতি wrought iron এ তৈয়ারী। এই সকল

থাম কড়ি বোধ হয় ছোট ছোট wrought iron-এর টুকরা উত্তপ্ত করিয়া, পিটিয়া, যোড়া লাগাইয়া এক একটী করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে; কিন্তু এমনই নির্ম্মাণ কৌশল যে যোড় টের পাইবার কোনই উপায় নাই।

দিল্লির থাম প্রভৃতিতে অদ্যাবধি মরিচা পড়ে নাই। পঞ্চানন বাবু বলেন; "Two explanations are possible of this remarkable power of ancient specimens of iron of resisting corrosion—either there was something in the composition of the iron or that the beams were painted or both. To the author it appears that both the facts have operated in enabling the Indian iron pillars and beams to withstand the corroding influence of wind and rain... the one point remarkable regarding the composition of the Delhi iron, Singhalese iron and other specimens of ancient iron is that all these specimens of iron are free from manganese and sulphur and contain a tolerably high percentage of phosphorus."

হিন্দু বৈদ্যগণ Oxides of iron এবং sulphide of iron প্রস্তুত করিবার প্রণালী ও ব্যবহার জানিতেন; chloride of iron তৈয়ার করিতে জানিতেন, কিন্তু তাহা অল্পই ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অংশে আকরোদ্ভূত ধাতু-পিণ্ড হইতে লৌহ প্রস্তুত করা হইত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে গৈরিক (hamatide), তাপ্য (iron pyrites প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আইন আকবরীতে বাজুহা, বাঙ্গালা সুবা, কেড়োয়া, কাশ্মীর সুবা কুমায়ুন নিরমল ও ইন্দোরে লোহার খনি ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।

লৌহ প্রস্তুত করিবার প্রাচীন প্রণালী এখনও অশিক্ষিত লৌহকর্ম্মকারদিগের মধ্যে উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, বরদা, দাক্ষিণাত্য, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটদেশ ও যুক্তপ্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

"যুক্তি কল্পতরু" নামক প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে তরবারি অস্ত্র বারাণসী, মগধ, লঙ্কা, নেপাল, অঙ্গ, মহীশুর, সুরাট, ও কলিঙ্গে প্রস্তুত হইত।

পঞ্চানন বাবুর এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে অতীত গৌরবের কথা বিশদভাবেই মনে পড়ে। মনে হয় একদিন ভারত সুসভ্য জগৎকে লৌহ দান করিয়াছিল—মনে হয়, একদিন ভারতে এমন স্তম্ভ রচিত হইয়াছিল, যাহা এখনও বৈজ্ঞানিকের বিস্ময় উৎপাদন করে। কিন্তু যখন দেখি, যে প্রাচীন লৌহ-শাস্ত্রের জ্ঞান ক্রমে ভারত ভূমি হইতে লোপ পাইতেছে, তখন যুগপৎ হৃদয়ে এক গভীর দুঃখও জাগিয়া উঠে। কিন্তু আবার যখন মনে হয়, যে তাতা কোম্পানী আবার ভারতে লৌহ প্রস্তুত করিতেছেন, তখন এক প্রবল আশাও হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

এই শ্রেণীর গবেষণা-মূলক গ্রন্থের যত অধিক প্রচার হয়, ততই তাহা আমাদিগের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়। এই পুস্তক পাঠে আমরা আমাদিগকে চিনিতে পারি, এবং জগজ্জনকে আমাদিগের গৌরবের পরিচয় দিতে পারি। আশা করি, গ্রন্থকার মাতৃভাষায় পুস্তকখানির অনুবাদ করিয়া বঙ্গবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইবেন। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ ভালই হইয়াছে, মূল্যও অধিক নহে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু।

গোপালকৃষ্ণ গোখেল

প্রকৃতির ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত যখন শুষ্ক পত্র গুলি খসিয়া পড়ে তখন সকলেই আশায় বসিয়া থাকে আবার কবে তরুণ পত্রগুলি বসন্তলক্ষ্মীকে সুশোভিত করিয়া দিবে। কিন্তু যখন একজন মহাপুরুষ জীবনের ব্রত শেষ না হইতে হইতেই অকালে চিরবিদায় গ্রহণ করেন তখন সন্দেহী সংশয়ী মানুষ কোন বিশেষ কারণ খুঁজিয়া পায় না। মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখেলের অমূল্য জীবন অকালে পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর মত মহাসিন্ধুতে গড়াইয়া পড়িল—জীবনের মধ্যাহ্নেই তাঁহাকে চির-নিদ্রায় অভিভূত হইতে হইয়াছে—এইজন্যই আমাদের এত দুঃখ এত বেদনা। বর্ত্তমান সময়ে যে কয়েকজন ভারতবাসী জন্মভূমির সেবা করিয়া নিজের জীবন ধন্য করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত গোখেল তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া এই মহারাষ্ট্রতনয়ের খ্যাতি সমস্ত ভারতময় ব্যাপ্ত হইয়া আছে। আশা করা যায় এ খ্যাতি, চিরদিনের মত ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে।

বিলাতের বিখ্যাত রাজনৈতিক লর্ড রোজবেরী কবি বার্ণসের স্মৃতি সভায় একবার বলিয়াছিলেন "poverty produces masterpieces,—wealth smothers them"—গোখেলের বাল্যজীবনে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদেশের কোলহাপুর সহরে একজন নিতান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং অল্প বয়সেই পিতৃহীন হন; তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অতিকষ্টে শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। কোলহাপুর স্কুলে কিছুদিন পড়িয়া গোখেল বোম্বাই সহরের এলফিনষ্টন কলেজে গমন করেন; গণিতশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন সেই জন্য বি, এ, পাশ করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রবেশ করিবেন, তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ছিল; কিন্তু কোন কারণে বি, এ পাশ করিয়াও তাঁহার এ আশা পূর্ণ হইল না। যাহা হউক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ লাভ না করিতে পারিয়া তিনি ১৮ বৎসর বয়সে পুণা নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে শিক্ষকরূপে প্রবেশ লাভ করিলেন। এক্ষণে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের একটু ইতিহাস বলা আবশ্যক। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিলক প্রভৃতি কয়েক জন মহারাষ্ট্র দেশসেবক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয়টী স্থাপন করেন এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়টীকে আশ্রয় করিয়া Deccan Education Society স্থাপিত হয়। এই সমিতির চেষ্টায় এই স্কুলটী এক্ষণে বিখ্যাত ফারগুসন কলেজে পরিণত হইয়াছে; দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত কলেজ যে কত উৎকৃষ্ট হইতে পারে, ফারগুসন কলেজ তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত;—কতকগুলি উন্নতমনা লোকের স্বার্থত্যাগ এই শ্রীবৃদ্ধির একমাত্র কারণ। তাঁহারা মাসিক ৭০ টাকা মাত্র বৃত্তি লইয়া এই দেশহিতকর কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সিনিয়ার রাংলার পরাঞ্জপ্যে ও বিখ্যাত অর্থশাস্ত্রবিদ্ বামন গোবিন্দ কেল এই সামান্য বেতনে ফারগুসন কলেজে শিক্ষকতা করিতেছেন। গোখেল এইরূপে জীবন উৎসর্গ করিবেন কিনা প্রথমে কিছুই ঠিক ছিল না কিন্তু এই সৎ সংসর্গে আসিয়া তিনিও এই মহৎকার্য্যে জীবন অর্পণ করিলেন। অর্থশাস্ত্র ও ইতিহাস শিক্ষা দান করিবার ভার তাঁহার উপর পড়িল; কলেজে শিক্ষকতা করিয়া সামান্য যাহা কিছু সময় পাইতেন তাহা অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নেই অতিবাহিত করিতেন। দেশের আর্থিক অবস্থা বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞানের বীজ এই স্থানেই রোপিত হয়—অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অর্থশাস্ত্র বিষয়ক সমস্ত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া ফেলেন।

এদিকে মহামতি মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে পুণায় "সর্ব্বজনিক সভা" স্থাপন করিলেন। এই সভা সেই সময়ে সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক ও অন্যান্য আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল। রাণাডে সম্বন্ধে বিস্তৃত

বলা এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক, তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে ইংরাজ আগমনের পর হইতে মহারাষ্ট্র দেশে সামাজিক রাজনৈতিক ও অন্যান্য উন্নতির একমাত্র কারণ রাণাডে,—তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রেমপূতঃ জীবন তাঁহাকে চিরদিন দেশবাসীর নিকটে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিবে—তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞান ও দেশপ্রেমের প্রথম রশ্মিপাতে মহারাষ্ট্র ভূমির দুর্য্যোগগ্রস্ত নিশীথ-অন্ধকার কাটিয়া গেল। প্রাচীন ও নবীন যুগের সঙ্গমস্থলে রাণাডের স্থান যে কত উচ্চ তাহা শিক্ষিত মাত্রেই জানেন; সমস্ত দীনতা, খর্ব্বতা ও অপমানকে দগ্ধ করিয়া ভারতবর্ষকে সর্ব্ববিষয়ে উন্নত করিবার মানসে এই মনস্বী, কর্ম্মবীর মহাত্মা ও সরল মহাপুরুষটী নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গোখেলকে বুঝিতে হইলে তাঁহার গুরুর বিশেষত্ব বুঝিতে হইবে। রাণাডে যে দুইটি প্রধান শিষ্য রাখিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একটি চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, এখন কেবল আছেন কর্ম্মবীর স্যার নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকর।

এই সার্ব্বজনিক সভার মুখপত্র সম্পাদনের জন্য একজন প্রতিভাশালী যুবকের আবশ্যক হইলে রাণাডের চক্ষু সহজেই গোখেলের উপর পড়িল। রাণাডের তত্ত্বাবধানে গোখেল এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। রাণাডে এবং গোখেলের মিলন ভারতীয় ইতিহাসের একটী স্মরণীয় দিন। রাণাডের মত শিক্ষক পাইয়া কেবল যে গোখলে ধন্য হইলেন তাহা নহে—ইহা ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নূতন পন্থা খুলিয়া দিয়া সমস্ত দেশকে গৌরবান্বিত করিল। রাণাডের সংস্পর্শে আসিয়া গোখেল রীতিমত রাজনীতি চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে বোম্বাই প্রাদেশিক সমিতির সম্পাদক এবং ১৮৯৫ অব্দের জাতীয় মহাসমিতির পুনা অধিবেশনের সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় আয় ব্যয় সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার জন্য 'ওয়েবলি' কমিশন স্থাপিত হয়—এই কমিশনের সমক্ষে সাক্ষী দিবার জন্য মিঃ ওয়াচার সহিত গোখেল বিলাত গমন করেন। এই কমিশনের সম্মুখে তাহার প্রদত্ত বক্তব্য প্রকাশিত হইলে সকলেই তাঁহার সারগর্ভ যুক্তি ও দেশের আর্থিক অবস্থার যথাযথ বিবরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় কার্য্য আরম্ভ করিলেন; এই সময়ে মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছে,—দিন দিন অসংখ্য লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে, গোখেল এই সকল দেখিয়া এই প্লেগের মধ্যেও স্বেচ্ছাসেবকরূপে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহাতে বোম্বাইয়ের গভর্ণর লর্ড সেণ্ডার্স্ট পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ বৎসর ৭০ টাকায় কাজ করিয়া ফার্গুসন কলেজ হইতে বিদায় গ্রহণকালে তাঁহার ৪০ টাকা মাত্র পেনসন্ হইল, ইহাই তাঁহার একমাত্র অর্থ সম্বল ছিল। স্যার ফিরোজসা মেটা বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে গোখেল সর্ব্বসম্মতি ক্রমে বোম্বাই প্রদেশের সভ্য মনোনীত হন। এখন হইতে গোখলের প্রকৃত দেশসেবা আরম্ভ হইল। বহু বৎসরের গভীর চিন্তা ও কঠোর পরিশ্রমের ফল এই স্থানে পূর্ণমাত্রায় কার্য্যকরী হইল, অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নির্ভীক, স্বাধীনচেতা ও বিজ্ঞ রাজনৈতিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। ইউনিভারসিটি বিল, বঙ্গবিভাগ ও Official Secrets Bill সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেন। বজেট বিতর্কের সময় তাঁহার বক্তৃতা এত সুন্দর ও সারগর্ভ হইত যে একবার এই সময়ে গোখেলকে অনুপস্থিত দেখিয়া স্যার গাই ফিটউড উইলসন বলিয়াছিলেন' আমরা 'হ্যামলেটের অংশ বাদ দিয়া 'হ্যামলেট' অভিনয় করিতে যাইতেছি'।

এই সকল কাজে নিযুক্ত থাকিয়াও ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "ভারত সেবক সম্প্রদায়" স্থাপন করিলেন; এই সম্প্রদায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে কেবল মাত্র দরিদ্রের সেবা ও সামাজিক হিতসাধনে নিযুক্ত না থাকিয়া যুবক সম্প্রদায় যাহাতে রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তার

কার্য্যেও নিযুক্ত হইতে পারে তাহার চেষ্টা। এই সম্প্রদায় গোখেলের দেশপ্রাণতার অপূর্ব্বকীর্ত্তি; দেশের মঙ্গলের জন্য কি করিয়া জীবন উৎসর্গ করিতে হয় তাহা তিনি আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে সমবেত ভারতসন্তানগণ সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তাহার গৌরবান্বিত মস্তকে দেশ সেবার পুরস্কার স্বরূপ নেতৃত্বের মুকুট পরাইয়া দেন।

শ্রীযুক্ত গোখেল দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয় শ্রমজীবীদের দুঃখক্লেশ অবসান করিবার আশায় বড়লাটের আইন সভায় প্রস্তাব করেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় আর ভারতীয় মজুর পাঠান হইবে না। মহানুভব লর্ড হার্ডিং এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া কোন নূতন সুব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। সেখানে বুয়ার গভর্ণমেণ্ট এবং ভারতপ্রবাসী কর্ত্তৃক অত্যন্ত সাদরে গৃহীত হন। এতদিন পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অবস্থা যে কিয়ৎ পরিমাণে ভাল হইয়াছে তাহা গোখেল ও গান্ধীর পরিশ্রমের ফল।

গোখেলের শেষ কীর্ত্তি হইতেছে সমগ্রভারতে বাধ্যতা মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার চেষ্টা; জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ প্রয়োজন, এই শিক্ষার অভাবে দেশের সমস্ত মহৎ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, সেই জন্য বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় তিনি এই প্রস্তাব আনয়ন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গভর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Public Services Commission-এর সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন—যাহাতে এই কমিসনের ফলে ভারতবাসীরা গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মে প্রবেশলাভ করিতে পারে সেই জন্য পরিশ্রম করিতেছিলেন কিন্তু সে পরিশ্রম শেষ না হইতে হইতেই তিনি চিরবিদায় লাভ করিলেন। ইহাই তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী।

গোখেলের জীবন লীলা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু যে তাঁহাকে দেখিয়াছে সে তাঁহার উন্নত ললাটে জ্ঞানের প্রসারতা, স্নেহপূর্ণ আয়তনেত্রে ও মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ ভুলিতে পারিবে না। তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমন কালে স্বদেশহিতৈষণামন্ত্রে সকলকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেন অথচ তাঁহার কথায় বিদ্বেষ ছিল না; ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দোষ গুলি দেখাইবার সময় গুণগুলি ভুলিয়া যাইতেন না, এবং ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকিয়াই যে আমরা উন্নতির চরমশিখরে উঠিতে পারিব এই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানসূচক কার্য্যে পরিশ্রম করিতে করিতে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গেল কিন্তু তিনি সেবাব্রত হইতে কখনও বিরত হন নাই। কঠোর মানসিক পরিশ্রমে শনৈঃ শনৈঃ জীবনের প্রদীপ ক্ষীণ হইয়া আসিল—নিদারুণ রোগ যন্ত্রণায় শয্যাগত অবস্থার মধ্যেও তাঁহার চিরপ্রফুল্ল ও উৎসাহদীপ্ত বদন মলিনতাপ্রাপ্ত হইল না। মৃত্যুর সময় তিনি বলিয়া গিয়াছেন তাহার অসম্পূর্ণ কার্য্য গুলি যেন সম্পূর্ণ করা হয়।

মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার মনের দৃঢ়তা ও কমনীয়তা নষ্ট হয় নাই; যখন দেখিলেন মৃত্যুর অন্ধকার ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে, তখন তিনি ভগিনী কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন—কিন্তু এক বিন্দু দুঃখের অশ্রু গড়াইয়া পড়িল না—সকলকে বিদায় দিয়া প্রশান্ত—স্থির চিত্তে শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তার পর এক জন বন্ধুকে বলিলেন "জীবনের এপারে আমার সময় সুখেই কাটিয়াছে—এইবার পরপারে যাইবার ও দেখিবার সময় আসিয়াছে।" তাঁহার চির প্রফুল্ল সৌম্য কান্তির কাছে মৃত্যুর বিভীষিকা ছায়াপাত করিতে পারিল না; শান্ত সমাহিত চিত্তে চির বিশ্রাম লাভ করিলেন; মহাপুরুষের চরিত্রের মত মহাপুরুষের মৃত্যুও মহৎ।

গোখেল সম্বন্ধে আর একটী কথা উল্লেখ না করিলে তাঁহার ক্ষুদ্রজীবনী অসম্পূর্ণ হইবে। তাঁহার আজীবনব্যাপী চিন্তার একটী বিষয় ছিল—ভারতের চির দুঃখী কৃষকগণকে কি করিয়া সুখস্বচ্ছন্দের দিকে লইয়া যাওয়া যায়—এই জন্য তিনি ব্যবস্থাপক সভায় নানাপ্রকার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯০৫

খৃষ্টাব্দের বজেট বিতর্কসভায় তিনি এই দুঃখীকৃষকদের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা শিক্ষিতমাত্রেই অবগত আছেন।

গোখেল দেশের সেবা করিতে গিয়া কখনও কোন দল বা মতের সৃষ্টি করেন নাই। কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা বুঝিতেন তাহা পালন করিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই—এই জন্য তিনি অনেক বন্ধুর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার একমাত্র মত ছিল—"Trust no party, church or faction".

গোখেলকে ভালরূপে বুঝিতে হইলে তাঁহার বিরাট চরিত্র ও বিপুল মনুষ্যত্বকে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে; তিনি নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা যে সত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য এবং যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা যে কত উচ্চ এবং কত বিপদসঙ্কুল তাহা একবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে। তাঁহার মহৎ চরিত্রের কথা ভাবিতে গেলেই মনে হয়—তিনি মঙ্গলবিশ্বাসী Optimist ছিলেন। তিনি রাজনীতি প্রচার করিতে গিয়া কখনও ক্রন্দনের অভিনয় করেন নাই—দুঃখের মধ্যে, অপমানের মধ্যে এবং দারিদ্র্যের মধ্যেও যে এই দেশ আবার পূর্ব্বগৌরব লাভ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্য জাতির সহিত একাসনে বসিবে তাহা তিনি কোন দিন বিস্মৃত হন নাই। সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া তিনি দেশমাতার যে অপূর্ব্ব শ্রী দেখিয়াছিলেন তাহাই তিনি দেশবাসীর সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিতেন—কারণ এ দেশে 'অদৃষ্ট' নামক একটা বিরাট পাথর সমস্ত জাতির বুকের উপর বসিয়া আছে—এখানে মানুষ নির্জ্জীবতা লইয়া এক ক্ষুদ্র পরিধি রেখার মধ্যে পর্য্যটন করিতেছে, সেই জন্য এখানে আশার বাণী দরকার।

গোপালকৃষ্ণ গোখেল

সরলতা তাঁহার জীবনের আর একটী ভূষণ ছিল—এই সরলতা শুধু কেবল তাঁহার বসনেই ফুটিয়া উঠিত তাহা নহে, তাঁহার চরিত্রের প্রত্যেক স্তরে স্তরে বিদ্যমান ছিল—অথচ এ সরলতার নাম শৈথিল্য নহে, এই সরলতার গুণে তিনি সকলের সহিত সমানভাবে মিলিতে পারিতেন, সকলের দুঃখ বেদনার গভীরতাকে বুঝিতে পারিতেন।

শুধু রাজ-নীতি চর্চ্চা করাই যে দেশসেবার একমাত্র উপায় তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না; সেই জন্যই ভারতসেবকসম্প্রদায় স্থাপিত হয়। ভারতে এখন কোটি কোটি লোক আছে যাহারা রাজনীতির ছায়া মাত্র দেখে নাই—এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে তাহারা যদি বাঁচিয়া না উঠিতে পারে তবে রাজনীতি চর্চ্চা কাহার জন্য? এই অসংখ্য নরনারীর

জীবনে অরুণালোকের বিচিত্র রেখা প্রতিফলিত হয় নাই, দুঃখে ও দারিদ্র্যে তাহারা মৃতের মত পড়িয়া আছে—তাহাদের নিকট রাজনীতি তুচ্ছ—তাহাদের চিরশুষ্ক অন্তরে আশার বাণী ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—গোখেলের মত মহানুভব ব্যক্তির দৃষ্টি সেই দারিদ্র্যশীর্ণ বেদনাতুর ভারতবর্ষের দিকে পড়িল; তাহাদের দুঃখ মোচন করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল,—কারণ:—

"তোমার পক্ষী ধুলায় পড়ে,
কেমন করে সইব"?

তাঁহার চরিত্রের মধুরতা বর্দ্ধন করিত তাঁহার বিনয়; এত উচ্চ সম্মানলাভ এবং যশ এত খ্যাতি লাভ করিয়াও তিনি কোন দিন অহঙ্কার অনুভব করেন নাই, সেই সরলতা ও অমায়িকতা তাঁহার সমস্ত জীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল।

প্রবন্ধের শেষে তাহার বাঙ্গালী-প্রিয়তার কথা উল্লেখ করিব, কারণ দেখা যাইতেছে নানাপ্রদেশে এখন বাঙ্গালী বিদ্বেষ বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে—গোখেল বাঙ্গালীকে যে আমাদিগকে কিরূপ প্রীতিগৌরব দৃষ্টিতে দেখিতেন তাঁহার কথাতেই বুঝা যাইবে।

Where will you find another in all India to place by of Dr J. C. Bose or Dr P. C. jurist like Dr Ghosh or a Rabindranath Tagore? M these men are not mere fricks they are the highest products the race is regularly capable of such capacity can not, I re put down by coercion?*

গোখেল পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হই কিন্তু তাঁহার আত্মার বিমলজ্যোতি প্রত্যেক হৃদয়ে বিরাজ করিবে। দেহের সহিত তাঁহার নাম অন্তর্হিত হইবে অন্ধকারে তাঁহার বিমল যশঃপ্রভা বিলুপ্ত তাঁহার এই পবিত্র আত্মা সমস্ত লোকের হৃদ করিয়া চির দিন আমাদিগকে সৎপ যাইবে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র

অর্ঘ্য

মরণদূতের মালা তোমার
স্বর্গে নিলে টেনে,
ভারতবাসীর বক্ষে দারুণ—
বজ্র ব্যথা হেনে।
তপ্ত অশ্রু চক্ষে সবার
পড়ছে গ'লে গ'লে
"কোথায় বন্ধু ভারত বন্ধু"
এই কথাটি বলে।
সবার বক্ষে মেঘের উদয়
অশ্রু ঝরে চোখে,

তুমি-হারা ভারত মাতার
দারুণ ঘন শোকে।
তুচ্ছ করি রোগের ব্যথা
স্বার্থ পরিহরি।
দেশের কর্ম্মে সেবার ধর্ম্মে
মৃত্যু নিলে বরি।
কীর্ত্তি তোমার চির অক্ষয়
দেশের বুকে রবে;
মৃত্যু তোমার করলে অমর
মৃত্যু-ঘেরা ভবে।

শ্রীসুধাকান্ত রায়

* Gokhale's speech in the Supreme Lagislative Council at Simla (1907) passing of the Seditious Meetings Bill.

কলিকাতা, ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩, সানি পার্ক, বালি শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।